মাঘ ১৩৬৬

বিমল চক্রবর্তী

অসীম রায়

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

কার্তিক লাহিড়ী

রেভারেণ্ড ক্লীমেণ্ট মোরিস

অমল হালদার

অমল দাশগুপ্ত

নেপাল মজুমদার

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

জ্যোতির্ময় বসু

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

বশিক রায়

প্রদ্যোৎ গুহ

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মাঘ

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

পরিচয়
বর্ষ ৩১। সংখ্যা ৭
মাঘ ১৩৬৮

পশ্চিম বাঙলার অর্থনীতি ও বেকারসমস্যা

বিমল চক্রবর্তী

পশ্চিম বাঙলার সরকারী মহল থেকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হয় যে বাংলা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে মোটেই খারাপ না। কিন্তু বাঙলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণ না করে নিছক একটি দিকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করলেও আমরা এই সরকারী উচ্চকণ্ঠের জবাব পাই। যেমন ধরা যাক, বেকার সমস্যা। ২১-৭-৬১ তারিখে বিধান সভায় আমাদের শ্রমমন্ত্রী জনাব আবদুস সাত্তার সাহেব বলেছেন যে বাঙলায় বেকারের সংখ্যা ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা তার মধ্যে হল ২ লক্ষ ১৯ হাজার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দেশবাসীর অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য অন্যপ্রকার। [illegible] এমনকি সরকারী-পরিসংখ্যানও মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের উক্তি যে ভ্রান্ত, তা-ই প্রমাণ করে।

বেকার সমস্যার পরিমাণ ও প্রকৃতি

বেকার সমস্যার পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ে বেসরকারীভাবে চেষ্টা করেছেন শ্রীযামিনীরঞ্জন দাস তাঁর 'বাংলার বেকার সমস্যা ও তার প্রতিকার' বইটিতে। তাঁর মতে "১৯৫৭ সালের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় বাংলায় বেকার সংখ্যা বার লক্ষ এবং প্রতি বৎসর দুই লক্ষ হারে তা বাড়ছে," .. "বর্তমানে নারী ও পুরুষ বেকারের প্রকৃত সংখ্যা বেসরকারী হিসাবে যেটা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলেই মনে হয়—কুড়ি লক্ষেরও উপর। আর প্রতি বৎসর এই সংখ্যা অন্তত তিন লক্ষ হারে বাড়ছে (ঐ, পৃঃ ২)। যামিনীবাবু কোথা থেকে ঐ তথ্য পেলেন তা আমরা তাঁর বইটি থেকে জানতে পারি না। কিন্তু

যামিনীবাবুর বইটি ছাড়া কয়েকটি সরকারী রিপোর্ট আলোচনা করলেই আমরা বাংলাদেশের বেকার সমস্যা, তার প্রকৃতি এবং পশ্চিম বাঙলার এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক চিত্র সম্পর্কে অবহিত হই।

পশ্চিম বাঙলার শহরাঞ্চলে ১৬—৬০ বৎসর বয়সের মধ্যে কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা হল—৪২৮৫৯০০ জন, তাদের মধ্যে সারা বৎসর কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা হল—২০১৭৪০০ জন অর্থাৎ শহরাঞ্চলে সারা বৎসরে পূর্ণ বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ২২ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫ শত জন। গ্রামাঞ্চলে পূর্ণ বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা হল ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৪ শত জন। অর্থাৎ বাঙলাদেশে মোট পূর্ণ ও অর্ধবেকার অথচ কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা হল: ৩৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯ শত জন [১]। অবশ্য এই সংখ্যার পুরোটাই বেকার ধরা উচিত হবে না কারণ যে রিপোর্ট থেকে আমরা এই তথ্যগুলি ব্যবহার করছি তাতেই বলা হয়েছে যে ওই সংখ্যাতে কর্মক্ষম অথচ কাজ করতে ইচ্ছুক নন এমন সংখ্যাও ধরা হয়েছে। আমরা তাহলে মোটামুটিভাবে ৩০ লক্ষ লোককে বেকার ও অর্ধবেকার বলে চিহ্নিত করতে পারি। আর যদি আমরা বার্ষিক বৃদ্ধির হার সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের তথ্যের দিকে নজর দিতে হবে:

১৯৫৯ সালে রেজিস্ট্রিকৃত বেকার সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৫ জন, বছরের শেষে রেজিস্ট্রিকৃত বেকার সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার ১ শত ১৮ জন। ১৯৬০ সালে নভেম্বর মাস পর্যন্ত বেকার সংখ্যা হল—২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪ শত ৪২ জন [২]। গ্রামাঞ্চলের হিসাব নিয়ে এবং অ-রেজিস্ট্রিকৃত বেকার সংখ্যা ধরলে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৪ লক্ষেরও উপর অনুমান করতে হয়।

শতকরা হিসাবে বলা যায় যে কলিকাতায় কর্মে নিযুক্ত লোক সংখ্যার অনুপাতে বেকার ও কর্মপ্রার্থীর পরিমাণ হল শতকরা ২১.৪ ভাগ। সমস্ত শহরাঞ্চলের ওই হিসাবটি হল শতকরা ১৮.৪ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলে (নদীয়া ও ২৪ পরগণা) হল শতকরা ৭.১ ভাগ [৩]।

বেকার সমস্যার প্রকৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শহরে এবং গ্রামে (নদীয়া এবং ২৪ পরগণা) বেকার ও কর্মপ্রার্থীদের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি হল ১৬-২০ এবং ২১-২৫ বৎসর বয়োক্রমের ভিতর [৪]। বর্তমান কালের যুবকদের হতাশাবোধের কারণ অতি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। আবার গ্রামা-

থেকে শহরাঞ্চলে শিক্ষিত বেকার ও কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যা বেশি। শহরাঞ্চলের কর্মপ্রার্থীদের ৬ ভাগের ১ ভাগ হচ্ছেন অশিক্ষিত (গ্রামাঞ্চলে [illegible] অর্থাৎ শতকরা ৫০ জন); শহরাঞ্চলে কর্মপ্রার্থীদের শতকরা ২০ ভাগের শিক্ষার মান হল ম্যাট্রিক ক্লাস থেকে বি. এ. পাস পর্যন্ত। কলিকাতাতেই উদ্বাস্তু বেকার ও কর্মপ্রার্থীদের চাপ সর্বাধিক। আবার গ্রামাঞ্চলে অনুন্নত শ্রেণীর [illegible] বেকার সংখ্যা ভয়াবহ। শহরাঞ্চলে স্ত্রীলোক বেকার ও কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাও বিরাট, প্রায় ৫৭ হাজার কর্মপ্রার্থী এই শ্রেণীভুক্ত।

অনেকের ধারণা বাঙলাদেশের বেকারীর কারণ হচ্ছে অবাঙালী [illegible] কর্তৃক বাঙলা শোষণ; একথা ঠিক আমাদের রাজ্য-আয়ের একটি বড় অংশ অন্যান্য রাজ্যগুলিতে বেসরকারীভাবে হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু সেই অবাঙালী জনসমষ্টির ভিতর বেকারীর চাপ কিছু মাত্র কম নয়। বাঙলাদেশে অবাঙালী জনসমষ্টির তুলনায় অবাঙালী বেকারের অনুপাত হল শতকরা ৫·৩৯ ভাগ আর বাঙালী বেকারের অনুপাত হল শতকরা ৭·৩৩ ভাগ।

যদিও আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে শহরাঞ্চলে কর্মক্ষম লোকের শতকরা [illegible] ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৭·১৮ ভাগ লোক বেকার, কিন্তু এই তথ্যটি [illegible] অঞ্চলের সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করে না। সরকারী পরিসংখ্যানে যে দুটি জেলা প্রসঙ্গে তথ্য দেওয়া হয়েছে তাকে [illegible] বাংলাদেশের সামগ্রিক তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তবে বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশের শতকরা মাত্র ৪৮·৫৫ ভাগ চাষী সারা বৎসর চাষে নিযুক্ত থাকেন অথচ চাষবাস করেন এমন জনসংখ্যার পরিমাণ হল শতকরা [illegible] ভাগ। শতকরা ১৪·১৯ ভাগ চাষী বছরে চাষের কাজে নিযুক্ত থাকেন [illegible] মাস পর্যন্ত, শতকরা ১২·৭০ ভাগ চাষী ৭-৮ মাস পর্যন্ত এবং শতকরা [illegible] ভাগ চাষী ৯-১০ মাসের জন্য। এর একটা বিরাট অংশ বৎসরে চাষের কাজের পর বাকি সময়ে বেকার থেকে যায় (সমগ্র গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার প্রায় ৩৩ ভাগ)। কাজেই গ্রামাঞ্চলে অর্ধবেকারী ও পূর্ণবেকারীর সমস্যা শহরাঞ্চলের বেকারীর সমস্যা থেকে কম ভয়াবহ নয়।

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আমরা যে তথ্যগুলি উল্লেখ করেছি তা সরকারের পক্ষ থেকে পরিচালিত করা [illegible] এই বর্ষে যে Final Report…of Survey of unemployment—19[illegible]3

—এ০ রিপোর্টটির ফল্য ১৯৫৩ সাল সম্পর্কে। ইতিমধ্যে দুটি পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেছে; অতএব আগের চিত্র বর্তমানের "পরিবর্তিত" পরিপ্রেক্ষিতে খাটে না। কিন্তু আমরা একটু পরেই সরকারী তথ্য থেকেই দেখানোর চেষ্টা করব যে বর্তমানে অবস্থার তো উন্নতি হয়ই নি বরং আরও অবনতি হয়েছে।

অ ফসের চাকুরীর ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরীর স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এই নয় বৎসরে সরকারী চাকুরীর পরিমাণ বেড়েছে মাত্র ৭০ হাজার ৮০২টি এবং তারও বেশির ভাগ হল অস্থায়ী চাকুরীর ক্ষেত্রে। ১৯৫৮ সালে সরকার যে অফিসের চাকুরী দিয়েছেন তার ৪০·৩ ভাগ হল অস্থায়ী [৯]। আবার পশ্চিমবঙ্গের রেজিষ্টিকৃত কারখানার দৈনিক কর্মে নিযুক্ত গড় শ্রমিক সংখ্যাও আরেকটি চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটিত করে। ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৫৮ সালে এই নয় বৎসরে ওই সংখ্যাটি বেড়েছে মাত্র ২০ হাজারের কাছাকাছি; এবং আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, ওই সময়ের ভেতর সরকারী ও আধা সরকারী শিল্পসংস্থায় দৈনিক নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা কমে গেছে [১০]; আর এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, ওই নয় বৎসর হল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার "সাফল্যকাল" এবং "বৈপ্লবিক শিল্প-প্রগতিমূলক কর্মসূচী"—দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রায় অর্ধেক সময়।

বিভিন্ন জেলায় দৈনিক নিযুক্ত গড় শ্রমিক-সংখ্যায়ও ওই নয় বৎসরের ভেতর বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি। বর্ধমান জেলায় ওই সংখ্যাটি বেড়েছে প্রায় সাড়ে তের হাজার এবং কলিকাতা সমেত প্রায় অন্যান্য জেলায় ওই সংখ্যাটির বিশেষ পরিবর্তন হয় নি, কিন্তু ২৪ পরগণায় আসলে ওই সংখ্যা এই নয় বৎসরে কমে গেছে [১১]। এই প্রসঙ্গে আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল পশ্চিম বাংলার সরকারী ও বেসরকারী শিল্প সংস্থায় ১৯৫৫-৫৭ সালে গড়ে বার্ষিক মজুরীর প্রায় কোনোই পরিবর্তন হয় নি [১২]। আবার ১৯৬০ সালে নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে যে ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৪২ জন বেকারের নাম উঠেছিল তার ভেতর চাকুরী পেয়েছে মাত্র ১৪ হাজার ৩২৮ জন [১৩]।

অতএব বাকি থাকে কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্প। ১৯৫১-৫২ সালে ক্ষুদ্র শিল্প পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য আয়ের শতকরা ৫·৮১ ভাগ উৎপন্ন করেছিল কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে রাজ্য আয়ের শতকরা ৫·৭৫ ভাগ এই বিভাগ থেকে পাওয়া গিয়েছিল [১৪]। পশ্চিম বঙ্গের রাজ্য আয় সংক্রান্ত প্রথম রিপোর্টটিতে উঠে

করা হয়েছে যে জাতীয় আয়ের তুলনায় রাজ্য আয়ের বিরাট একটা অংশ যেমন আসছে খনি, বৃহৎ শিল্প, ব্যাঙ্কিং ও জীবনবীমা থেকে ঠিক তেমনি কৃষি, ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বনসম্পদজাত ভারতীয় জাতীয় আয়ের তুলনায় বাঙলার রাজ্য আয় অত্যন্ত সামান্য। আবার প্রথমোক্ত তিনটি শ্রেণী থেকে শেষোক্ত তিনটি শ্রেণীতেই বাঙালীদের নিয়োগ সংখ্যা আপেক্ষিকভাবে অনেক বেশি। এর খুব সাধারণ অর্থ হল-এই যে ভারতীয় যুক্তরাজ্যের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' গড়ার তাগিদে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশী বিদেশী বৃহৎ শিল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুপ্রেরণা দিয়েছেন অথচ ক্ষুদ্র শিল্প—যাতে বাঙালীরা বেশি পরিমাণে নিযুক্ত—বিভিন্ন অসুবিধার চাপে পড়ে দেশীয় অর্থনীতি থেকে উৎখাত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কৃষিতে যেখানে বাঙালীর সংখ্যা বেশি সেখানকার অবস্থাও প্রায় অনুরূপ।

১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত এই কয় বৎসরে কৃষি উৎপাদন ২২৫·৩৭ কোটি টাকা (রাজ্য আয়ের শতকরা ৩১·০৯ ভাগ) থেকে ১৮১·৬১ কোটি টাকায় (রাজ্য আয়ের শতকরা ২৪·৩৮ ভাগ) নেমে নেমেছে [১৫]। অর্থাৎ ভালো হওয়া তো দূরের কথা অর্থনৈতিক অবস্থা আরো অসহনীয় হয়ে উঠছে। কৃষিতে বাঙালী জনসমষ্টির বিরাট অংশই নির্ভরশীল। তবুও ভারতের কৃষি থেকে গড় আয়ের তুলনায় বাঙলার কৃষি থেকে আয় অত্যন্ত কম। অর্থাৎ আমাদের কৃষিও ক্ষুদ্র শিল্পের মতোই অবনোন্মুখ এবং মুমূর্ষু। আমরা ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাঙলার কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের অবস্থা দেখাবার চেষ্টা করেছি। এখন সরকারী মহল যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে অথবা সরকারী তথ্যই অবজ্ঞা করে উন্মাদের মতো যুক্তি দেখান যে ১৯২৬ সাল থেকে অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে গেছে, সেদিক থেকেও একটি তথ্য উল্লেখ করেই এই বিভাগের আলোচনা শেষ করা যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৫৯ সালে এবং ১৯৬০ সালে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে (পাদটীকায় ২-এর উল্লিখিত পুস্তক)। ঢাকা পরিসংখ্যান সংস্থার রাজ্য-আয় সম্পর্কিত প্রথম রিপোর্টের উক্তিটিকে আমরা বর্তমানকালের বাঙলাদেশ সম্পর্কেও ব্যবহার করতে পারি : "It would appear therefore that although the total income of the state as a whole is higher than the Indian average,......the economic condition of the indegeneous population would in fact be much

worse than the average condition of the population of other states of India. The apparent prosperity of west Bengal is very misleading" [১৮]।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য আয়

দেশের সমস্যা প্রসঙ্গে পশ্চিম বাঙলার রাজ্য আয়ের আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাজ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর রাজ্য আয় সংক্রান্ত প্রকাশিত দুটি রিপোর্ট অনুধাবন করলে সতর্ক ও বিবেকবান পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে সংখ্যাতত্ত্বকে ভয় করতে আরম্ভ করেছেন। রাজ্য আয় সংক্রান্ত প্রথম রিপোর্টে বিশেষজ্ঞের রাজ্য-আয় সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত সংযোজন করা হয়েছিল; কিন্তু দ্বিতীয় রিপোর্টটিতে এই ধরনের নামাত্মক মতামত খুব সচেতনভাবে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, কারণ পত্রিকাদের মতামত দিতে গেলে বর্তমান সরকারের এক-দশকের ব্যর্থতার ছবি এত স্পষ্ট হয়ে উঠত যা প্রধান বিরোধী দল কমিউনিস্ট পার্টিও হয়তো সংসদে উপস্থাপিত করতে পারত না।

রাজ্য আয় সংক্রান্ত প্রথম রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প এবং বন সম্পদে (সরকারী কাজ, ভৃত্যের কাজ এবং ডাক্তারী, ওকালতি প্রভৃতি সেবামূলক কাজ ছাড়া) বাঙালীরা অনেক বেশি পরিমাণে নির্ভরশীল ও কর্মে নিযুক্ত। আবার, বৃহৎশিল্প, খনিজ দ্রব্য এবং ব্যাঙ্কিং ও ইনসিওরেন্সে অবাঙালীর আধিপত্য অনেক বেশি। প্রথম রিপোর্টে (অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত) বলা হয়েছে যে ভারতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য আয়ের "proportion appears to be particularly high in the sectors of Mining, Large Industry and Banking and Insurance. The proportion, is, however very low the sectors of Agriculture, Small Industry and Forestry" [১৯]।

১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত রাজ্য আয়ের শতকরা হিসাবে কৃষি মারাত্মক অবনতির নজির তুলে ধরছে। ১৯৫১-৫২ সালে রাজ্য আয়ের শতকরা ৩৭.৯৭ ভাগ এসেছিল কৃষি, পশুপালন এবং চা শিল্প থেকে, কিন্তু এই খাতে ১৯৫৫-৫৬ সালে আয় উৎপন্ন হয়েছে রাজ্য আয়ের শতকরা ৩০.৪০ ভাগ। এই রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে যে কৃষির ভাগে আয় কম পড়ার অন্যতম প্রধান

কারণ হল কৃষি উৎপাদন [illegible] স্থিতি। আবার ১৯৫১-৫২ সালের [illegible] পরিসংখ্যান থেকে দেখানো যায় যে কৃষি ও উল্লিখিত শিল্পগুলি থেকে ১৯৫১-৫২ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালে ওই খাতে আয়ের পরিমাণ প্রায় ২২ কোটি টাকার মতো বেড়ে গেছে। আবার ক্ষুদ্র শিল্প খাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে রাজ্য-আয়ের তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পখাতে আয় সামান্য কমে গেছে। বনসম্পদে যে আয় হয়েছিল তা ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে খুব সামান্য বেড়ে গেছে। কিন্তু খনি, বৃহৎ শিল্প, ব্যাঙ্কিং এবং জীবন বীমা ও বৃহৎ ব্যবসায়ের প্রত্যেকটিতে এই সময়ে আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি ঘটেছে। এমন কি রাজ্য-আয়ের তুলনায় এই সব বিভিন্ন খাতে শতকরা ভাগেরও বৃদ্ধি ঘটেছে ''।

অথচ পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত এই সাত বছরে রাজ্য আয় বেড়েছে শতকরা ১৭ ভাগ। এই সব তথ্য থেকে যে কথা [illegible] হয়ে উঠছে তা হলো ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের হাতে জমছে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গড়া সমাজ-ব্যবস্থার মন্ত্রপ্রাণিত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য আয়ের বাড়তি অংশ ; আর জনসাধারণ—চাষী, মজুর এবং মধ্যবিত্তশ্রেণী ক্রমশ নিঃস্ব হবার মুখে। ১৯৫১-৫৬ সালের সব জিনিষপত্রের দামের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি, বাঙলার জনসাধারণের ভয়ঙ্কর বেকার সমস্যা, পরোক্ষ কর-বৃদ্ধি এবং ঘাটতি বাজেট-ভিত্তিক মূল্যনীতি—এই সব কারণগুলি আরো ত্বরান্বিতভাবে রাজ্য আয়ের অসম বন্টনে সাহায্য করেছে বলে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না।

উপসংহার

তাহলে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, গত দশবৎসরে বাঙলাদেশে কি শহরে, কি গ্রামাঞ্চলে বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে, দু-দুটি পরিকল্পনায় কিছুমাত্র কর্মসংস্থান হয় নি বললেই চলে, যদিও সরকারী অফিসের চাকুরী কিছু বেড়েছে, তবুও "সুখী ও সোনার বাঙলা" গড়ার পরিকল্পনা শিল্প মাধ্যমে লোকের কর্মসংস্থান ঘটাতে পারে নি। এমন কি পশ্চিমবঙ্গের মাথা পিছু আয় ভারতীয় মাথা পিছু আয়ের থেকে ১৯৫১-৫২ সালে এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে কম ছিল (১৯৫৫-৫৬ ভারতীয় মাথা পিছু আয় : পশ্চিমবঙ্গের মাথা পিছু আয়=৩০০ : ২৯৫)। আবার বর্তমান সময়ে মজুরী বাড়ে নি অথচ জিনিসপত্রের দাম ভীষণভাবে বেড়ে গেছে ; রাজ্য

আয়ের যেটুকু বৃদ্ধি ঘটেছে তাও গিয়ে জমেছে এদেশীয় এবং অবাঙালী বড়লোকদের হাতে। আর অবাঙালী বড়লোক শ্রেণীর হাত থেকে সেই আয় বেশ কিছু পরিমাণে (আনুমানিক, রাজ্য-আয়ের শতকরা ৩·৭ ভাগ—৭ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য) রাজ্যের বাইরে চলে গিয়ে রাজ্য-আয়ের পরিবর্ধন ঘটাতে পারেনি।

অথচ সবচেয়ে বড় সম্পদ আমাদের দেশে অপচিত হচ্ছে। আমাদের কি ভারতীয়, কি রাজ্য পরিকল্পনায় শ্রম-সম্পদকে কাজে লাগাবার কোনো সঠিক ও সম্পূর্ণ পরিকল্পনা নেই (অবশ্য না থাকাই স্বাভাবিক, কারণ সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে শ্রম-সম্পদের ব্যবহার দেশের রাজনৈতিক-আর্থনীতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের পরিচায়ক)। কিন্তু শ্রমের ব্যবহার না করতে পারলে তা নষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ বিনা ব্যবহারে শ্রম ধ্বংসশীল। রাজনৈতিক-আর্থনীতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন না করেও বর্তমান কাঠামোতেও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে, কৃষির আমূল সংস্কার করে, সমবায়ের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান তথা জনসম্পদের অপচয় রোধ করা যায়। কিন্তু তাহলে যে বর্তমান শাসকগোষ্ঠিকে গোষ্ঠিচেতনার ঊর্ধ্বে উঠতে হয়, তা কি তারা পারবেন ?

১। Final Report and consolidated Summary of Survey of unemployment in W. Bengal—1953 (State Statistical Bureau, 1955).

২। Monthly Statistical Digest, West Bengal, Feb. 1961, পৃঃ ১৬।

৩। Final Report…of Survey of unemployment 1953, পৃঃ ৮।

৪। ঐ, পৃঃ ৭।

৫। ঐ, পৃঃ ৭।

৬। ঐ, পৃঃ ১১।

৭। State Income of West Bengal—1948-49 to 1951-52 (State Statistical Bureau) রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে খনি, বৃহৎশিল্প, ব্যাঙ্কিং এবং বাণিজ্যবিভাগের আয় (এবং পরবর্তী State Income of West Bengal—1955-56 রিপোর্টে চা শিল্পকে আলাদাভাবে ধরা হয়েছে ; আমাদের হিসাবে চা শিল্পকেও ধরা হয়েছে) অবাঙালী এবং অভারতীয়দের হাতেই প্রধানত জমা হয়। যদি অনুমান করা যায় যে ওই সব খাতের শতকরা

৮০ ভাগের মতো অংশ অবাঙালী এবং অভারতীয়দের হাতে জমা হয় ১৯৫৫-৫৬ সালে রাজ্য আয়ে অবাঙালীদের অংশ ছিল অন্তত ২৬১·৮৪ কোটি টাকা। Family Budget Enquiry in 24 towns of West Bengal including Calcutta—1955-56 (S. S. B.—1960) রিপোর্টটিতে দেখা যাচ্ছে যে অবাঙালীরা তাদের আয়ের শতকরা ১২ ভাগ রাজ্যের বাইরে পাঠায় (Table no. 22, পৃ: ৩৯—৪১)। তাহলে দেখা যাবে যে ১৯৫৫-৫৬ সালে রাজ্য আয়ের (৮৪০·৪৭ কোটি টাকা) শতকরা ৩·৭ ভাগ রাজ্যের বাইরে চলে যায়।

৮। Final Report...of Survey of unemployment—1953. পৃ: ১৫।

৯। Statistical Abstract—W. Bengal, 1958, পৃ: ২৮৭।

১০। ঐ, Table no, 21·1, পৃ: ২৮৯-২৯০।

১১। ঐ, পৃ: ২৯৪।

১২। ঐ, পৃ: ৩০৭।

১৩। Monthly statistical Digest, W. Bengal, Feb. 1961, পৃ: ১৬।

১৪। State Income of W. Bengal, 1955-56, (State Statistical Bureau), Table no. 1·1, পৃ: ২৭।

১৫। ঐ, ঐ।

১৬। State Income of W. Bengal—1948-49 to 51-52, পৃ: ৪।

১৭। ঐ, পৃ: ৩।

১৮। State Income of W. Bengal—1955-56; পৃ: ২৭, Table no. 1·1; পৃ: ৬১, Table no. 1·4।

শান্তিনিকেতন ১৯৬১

অসীম রায়

এক

আন্দাজ করি সামনেই শিশু গাছ
কবিতায় তার যাতায়াত অব্যর্থ,
কিংবা অদূরে সাঁইথিয়াগামী ট্রেন,
যোগেনভিলার স্ফুটন্ত হাতছানি,
মাঠের ওপারে সাঁওতালদের গ্রাম
সেখানে আকাশ ভরেছে সূর্যোদয়।

ভালো লাগবার অনেক কিছুই আছে
অনুপস্থিত ভালো লাগবার মেজাজ,
অনুপস্থিত আমাদের চৈতন্যে
দিনগত পাপক্ষয়ের চেয়েও বড়
কোনো আগ্রহ, কোনো স্বপ্নই যখন
শূন্য তখনই স্বপ্ন দেখার সময়।

দুই

স্বপ্ন আসে ঊর্ধ্বশ্বাসে আঠারো বছরে
কিন্তু আটত্রিশে কিংবা আটান্নয়
তার দুটো ডানাই অকেজো,

পক্ষাঘাতগ্রস্ত দীন স্বপ্নের চেহারা
কী যে প্রহসন
সেই স্বপ্নের বালাই
ত্যাগ করে নির্মোহের শূন্য ছলনায়
কেউ মরে মস্তান তিমিরে।

আমরা বাঁচি স্বপ্ন ও কর্মের
নির্মম নিয়ত দ্বন্দ্বে, দ্বন্দ্বে দিন কাটে;
আশৈশব মৃত্যু ও অমৃত যে এত কাছাকাছি, এত
আতঙ্ক ও আনন্দের দ্বৈত সঙ্গীত
আমাদের জীবনের সর্বত্র বিস্তৃত
এতবার মৃত্যুর নিঃশ্বাস
আমাদে মুখে চোখে, এতবার
মোহিনী জীবন হাসে—
হে রবীন্দ্রনাথ তুমি দ্বৈতের অতীত ?
এ অমানুষিক
অপার্থিব নায়কের উত্তরীয় খুলে
মৃত্যু ও জীবনের সহজ সন্তান
আমাদের সহচর হও।

তিন

আশ্বিনেও মেঘের দামামা
জলে থৈ থৈ এ খোয়াই
ওপারে সূর্যাস্ত তার পৌরাণিক সৌন্দর্যে ঝলমল
ঊর্ধ্বলোকে পানকৌড়ি,

অকস্মাৎ ঢাক বাজে
বনের ওপারে কিংবা মনের এপারে
ঠিক বোঝা না গেলেও বোঝা যায়
যে দেহ বারে বারে আমাদের চৈতন্যে বিদেহী
যে সভায় পলাতক, বক্তৃতায় নীরব একান্ত
সে মলিন রেখা অবয়বে
রক্ত মাংস পেয়ে যায় ;
তারপর বাঁধের ওপরে
সাঁওতাল মেয়েরা হাঁটে
যেন তারা অর্ধনারীশ্বর
গতিতে আনন্দ, হাতে পায়ে পায়ে আনন্দ চমকায় ;
হাওয়া দেয়, হাঁস ডাকে।

সেই অজ্ঞাত হাওয়া

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

পশ্চাতে কাঁপে অবিসংবাদী হাওয়া।
হায় ঈশ্বর, লুকিয়ে রেখেছ পুচ্ছ।
বর্ণে আঢ্য মহার্ঘ সাজসজ্জা
ফাল্গুনে যত কিশোরীর মুখে লজ্জা,
তোমার পতাকা সজোরে রেখেছ উচ্চ;

হায় ঈশ্বর, অচেনা এ কোন হাওয়া?

কৈশোরে তুমি ছিলে না চপলমতি
সরল বালক ভরা লাস্যে ও হাস্যে,
পশ্চিমে ভক্তি-নিষ্ঠার নৈরাশ্যে
সম্প্রতি বায়ু সুতীব্র খরগতি;
কাব্যের স্রোতে চড়া পড়ে টীকা-ভাষ্যে
হায় নির্বোধ, অন্তিমে আনো যতি।

সংস্কৃতিবান বৃদ্ধের সন্ত্রাস:
অচেনা হাওয়ার ঢেউ ভাঙে এই দেশে
কোনো বাধা নেই লজ্জার, শ্রদ্ধার
অধুনা ইহারা খাপখোলা তলোয়ার
মানসম্ভ্রম তিস্তায় গেছে ভেসে;
(কিমাশ্চর্য! সত্যই সেলুকাস…)

অথচ প্রবাসে পশ্চিমী মানুষেরা
শিক্ষাদীক্ষা নিদারুণ সংস্কৃত,
কলকাতা তবু চিরকাল ভীত, মৃত
ত্রিলোচন তবু কপট অন্ধ এরা?
বেতার-বাণীতে স্পর্শকাতর লোকে
নেপথ্যে হাসে তির্যক কৌতুকে।

চতুর্দিকেই কালান্তরের হাওয়া—
অন্তর্যামী, লুকিয়ে রাখো হে পুচ্ছ।

আশ্বিনের দাবি

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

দৃপ্ত ঘোড়া, বেগবান দিন
রাত্রি স্থির বিনিদ্র প্রহরী
প্রহরে প্রহরে কাঁপে ছায়া
ছায়ার আড়ালে এক রোদ
ভালোবাসার গভীর হৃদয় :
আশ্বিনে না, অঘ্রাণেই দেবো,
গাছের সবুজ পাতা কাঁপে।
উধাও মাঠের ধারে পথ, মাটির পথের ধারে তাঁবু
তাঁবুতে হাওয়ার বেগ, ঝড় ?
ভালোবাসার গভীর হৃদয় :
অঘ্রাণে না, ফাল্গুনেই দেবো।
লণ্ঠনের টিম-টিমে আলোয়
এ-ওর মুখের দিকে চায়
চারিদিকে অন্ধকার, অন্ধকারে বুটের আওয়াজ।

ওরা কারা। চোখে যৌবন বসে আছে।
ভালোবাসার গভীর হৃদয়
বসে আছে প্রতীক্ষায়
কারখানায় পেটে পেটে পাথরের শিখা
হুগলীর কারাগারে
ভালোবাসার গভীর হৃদয় বন্দী।

আশ্বিনে না, ফাল্গুনেই দেখো
ঘাসে ঘাসে পাতার মর্মরে তার প্রতিধ্বনি
মাঠে মাঠে জলের গভীরে সেই স্বর
ভালোবাসার গভীর হৃদয়
এত অন্ধকার! এত অন্ধকার, এত।
আদিগন্ত অন্ধকারে
সহস্র চোখের তারা জ্বলে।

বন্দীনিবাস

কার্তিক লাহিড়ী

দূর থেকে শব্দ উঠে আসছে। শ্লথ, বিচ্ছিন্ন, অনিয়মিত, অ-সম-লয়—প্রায় অ-সৈনিকোচিত। অথচ যে দুজন কর্তব্যরত তাদের মাথায় লোহার টুপি, কাঁধে রাইফেল, পায়ে বুট-পট্টি, পরণে খাকি-পোষাক—রীতিমতো সশস্ত্র বাহিনীর সিপাই। আসছে কালীবাড়ির দিক থেকে স্টেশনের দিকে। স্টেশনের তে-মাথায় ডাক-বাংলোর সামনে পেট্রোল-পাম্প পর্যন্ত এসে একটু দাঁড়িয়ে এ-দিক ও-দিক চেয়ে হয়তো-বা কিছু কথা বলে, হয়তো-বা বিড়ি ধরিয়ে, হয়তো কিছু না বলে, চোখে চোখে নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফিরবে এই রাস্তা ধরে কালীবাড়ির দিকে।

কালীবাড়ি থেকে স্টেশনের তে-মাথা। আবার তে-মাথা থেকে কালী-বাড়ি। খট্-খট্…খটা-খ্—

অথচ রাস্তা তখন ফাঁকা, মুক্ত। শুধু সৈনিক দুজনের ছায়া সামনে দীর্ঘ হয়ে হয়ে হট করে দেহের সঙ্গে মিশে গিয়েই পেছনে চলে যাচ্ছে। পেছনে আবার দীর্ঘতর হয়ে হয়ে নিমেষেই সামনে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছে, আবার লম্বা হচ্ছে। অর্থাৎ রাস্তায় আলো আছে, কিন্তু আশ-পাশের বাড়ির অথবা দোকানের আলো এসে পড়ছে না রাস্তায়। ভেতর থেকে যে-কোনো আলো আসা নিষেধ। তাই বন্ধ আছে জানলা, কপাট ; বন্ধ আছে আলোর অবাধ সঞ্চরণ।

শব্দ এগিয়ে আসছে। আর এ-ঘরে আলো নেই—তিনজন শুয়ে আছে বিছানায়। একজন বালিশ থেকে মাথা তুলে ডুবে গেল বালিশের অন্ধকারে। আর একজন উঠে বসে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইল একটা খিস্তি দিয়ে, কিন্তু কথা স্পষ্ট হলো না। চোখ বিঁধিয়ে দেখার চেষ্টা করল তৃতীয় জনকে। খানিকটা আন্দাজেই বুঝল, তৃতীয়জন ঘুমিয়ে পড়েছে। যে-বালিশের আধারে হারিয়ে গিয়েছিল খানিকটা আগে মুখ তুলেই তার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হলো। বিরক্তি হঠাৎ ম্যালেরিয়া জ্বরের কাঁপুনির মতো সারা শরীরে

ছড়িয়ে পড়তেই সুইচ টিপে দিলো আলোয়। অন্ধকার ভেঙে খান্‌খান্‌। চিন্ময় চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে আলো সওয়াতে চাইল। কমল বালিশে মুখ গুঁজে থেকেই শব্দ করল "আঃ"। হর্ষ ঘুমিয়েই থাকল বাঁ পাশ ফিরে। চিন্ময় এবার উঠোনের মধ্য দিয়ে রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি পাঠাল। রান্নাঘর নিথর, নির্জন। হয়তো ভাত চড়েছে সবেমাত্র, অতএব চিন্ময় দ্বিগুণ বিরক্ত হয়ে আলো নিবিয়ে ধপ্‌ করে শুয়ে পড়ল। পাশের ঘরে একজন পড়ছিল টেবল-ল্যাম্পের আলোয়, দ্বিতীয়জন চৌকির ওপর জোড়াসন পেতে বসে মনে মনে হাসছিল। আর দুটি চৌকি ফাঁকা, লোক নেই। পড়ুয়া ছেলেটি পড়ছিল কবিতার বই। কিন্তু কিছুতেই ধারণায় আনতে পারছিল না কেমন করে "only by the form, the pattern,

Can words or music reach

The stillness,—"

কয়েকবার পংক্তি কটির অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে সরিয়ে রাখল বই। তাকাল বিজয়বাবুর দিকে। বিজয়বাবু গুম মেরে বসে আছেন, মৃদু হাসি মুখে। ভীষণ বিরক্ত হয়ে আবার একটা বই টেনে নিল এবং যে-কোনো পাতা উলটিয়েই একটা পাতা মেলে ধরল চোখের সামনে—"মোটকা মানুষ হোঁৎকা মুখ,

বুদ্ধি ভোঁতা আহাম্মুখ—"।

লাইন দুটো পড়েই হাসি চাপতে পারল না অরুণ। তাকাল আবার—ঠিক বিজয়বাবুর বর্ণনা। বিজয়বাবু তেমনি চুপ, নির্বিকার। শুধু আনন্দ পাচ্ছেন, আচ্ছা জব্দ হয়েছে মেসের লোক। যান না কেন বেড়াতে? বিজয়বাবু মনে মনে প্রতিপক্ষ দাঁড় করালেন। আর্মড-ফোর্স, ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে। প্রত্যেক দিন আমাকে বলা? কিন্তু বিজয়বাবু বেশিক্ষণ আনন্দ পেতে না পেতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন, মুখ আরও হোঁৎকা হয়ে ওঠে, হাসি দেখা দেয় মুখের কোণে।

সেই ঘরের সঙ্গে সমকোণে লাগাও ঘরে তাস-খেলা চলছে, অকশান ব্রীজ। ওই ঘরেরই চারজন খেলছে, একজন দর্শক অন্ধকার ঘর থেকে উঠে এসেছেন। দিলীপ আর মন্টু, সুবিনয় ও পরেশ। একটা দান শেষ হতেই সুবিনয় ঝাঁপিয়ে পড়ল, "আপনি কি মশাই, স্পেড-টা রিপিট করতে পারলেন না?"

—আমার নয়, সাত, আর দশ নিয়ে চার তাসে বিবি। আমি কি করে—

—তাহলে ওই সময়ই বিবি মারা উচিত ছিল।

দিলীপ পিট গুণে তক্ষুণে উই-এর ঘরে লিখল ফুশো।

—অনার্স ?

মণ্টু তাস দিতে থাকল।

—আপনার সঙ্গে খেলতে গেলেই মশাই—

—আপনি কি জানেন মশাই—

সুবিনয়, পরেশ ক্ষেপে উঠেছে। সেই দৃশ্য কল্পনা করে অরুণ চেঁচিয়ে পড়ে উঠল, "একটা শুয়ার আরেকটাকে, 'তুই বিড়াল না মুই বিড়াল'।"

—আঃ, বিজয়বাবু শব্দ করলেন।

অরুণ তির্যকভাবে দেখে হাসল, "আঁচড় কামড় চর্কিবাজী ধাই—"

—থামবেন, বিজয়বাবু ফিস ফিস করে গর্জালেন। রাস্তার পাশে ঘর। শেষে কি হাঙ্গামা বাঁধাবেন ?

—অ, অরুণ চোখ ওলটাল। বিজয়বাবু ভয় পাচ্ছেন, অতএব আরও চেঁচিয়ে উঠল অরুণ, খামচা খাবল ডাইনে বাঁয়ে—

—থামলেন, জোরে গর্জে উঠলেন বিজয়বাবু।

অরুণ থতমত এবং সেই অবস্থায় 'আমি এমন চেঁচিয়ে পড়ছি কেন' প্রশ্ন মনে হতেই দৃষ্টি সরিয়ে আনল দেয়ালের পর। শাদা দেয়াল। অরুণ অর্থ খুঁজে পেল না, শুধু বুঝল আগে সে এমন করত না। কথাটা উঠতেই অরুণ চমকে উঠল, না—না। এ-টা ঠিক নয়, আমি তো এমন করি না। তাকাল বিজয়বাবুর দিকে। বিজয়বাবুর চোখ গোল হয়ে উঠেছে, চুল খাড়া খাড়া, গা বেয়ে ঝরছে ঘাম। বিজয়বাবুকে ওই অবস্থায় আবিষ্কার করে নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকল অরুণ এবং বই বন্ধ করে উঠতে যাবে, সেই সময় মনে হলো, এখন তাহলে কি করি ? এখন মাত্র, ঘড়ির দিকে তাকাতে সাহস পেল না, কারণ সে যটা ভেবেছে বলে মনে করছে, ঘড়িতে আসলে তার একঘণ্টা নিশ্চয়ই কম বাজছে। কম বাজছে ? তাহলে কি করি ? অতএব বাধ্য হয়ে অরুণ আর একটা বই টেনে নিল।

অন্ধকার ঘরে কমলের প্রশ্ন—তা কেন ?

—এটা তাই। নাহলে হঠাৎ মাড়োয়ারীদের বিরুদ্ধে এই হৈ-হল্লোতের কারণ কি ? আসামে তারা সাহায্য করেছে আসামীদের ? তাহলে বুঝতে

পারছিস এতে লোকাল পলিটিক্‌সের চাল আছে। যে হর্ষ এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, সে-ই এখন বোঝাবার চেষ্টা করছে, "ক্যাপিটালিজমের নাভিশ্বাস উঠছে, দেখছিস না সারা পৃথিবীতে বর্ণবিদ্বেষের ঢেউ। এ না করলে তাদের—"

—থামা তোর ইজম্‌। চিন্ময় গর্জে উঠল, আজ সাতদিন ওই এক কথা, ক্যাপিটালিজমের নাভিশ্বাস। আর, দ্বিগুণ বিরক্ত হলো চিন্ময়, আর তোকেও বলিহারি যাই কমল, সাতদিন ওই এক কথা শুনছিস তবু তোর আশ মিটছে না।

হর্ষ চিন্ময়ের মুখ দেখতে পাচ্ছে না, তবু আগের অভিজ্ঞতায় এ-সময়ের চিন্ময়ের একটা চেহারা ভাসিয়ে নিতে পারল: বাঁ-কপালের শিরা প্রকট, নাক অ-স্বাভাবিক ফুলছে, কুতকুতে চোখ দুটো বড় হতে চাইছে, সারা শরীরের রক্ত ছুটে আসছে মুখে। হর্ষ হাসল, "আসল কথা যদি বলি তবে তো এখুনি তেড়ে মারতে আসবি। আমি বলছিলাম—"

অরুণ তখন মধ্যনাদে পড়ছে। খানিক আগে যে বিবেক দংশনে জর্জরিত হয়েছিল, পড়ার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে, তা সে ইতিমধ্যে ভুলে বসেছে। "ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর (বিজয়বাবুর রাগ চড়ছে), মাথায় বৃহৎ জটা (বিজয়বাবু এবার গর্জে উঠবেন), ধুলায় কাদায় কটা, মলিন ছায়ার মতো (এবার উঠবেন), ক্ষীণ কলেবর (হো-হো করে হাসতে চাইল অরুণ), ওষ্ঠে অধরেতে চাপি (বিজয়বাবুর মুখে কি হাসি আছে?) অন্তরের দ্বার ঝাঁপি (হাঁ, ঠিক), রাত্রি দিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে, তাই", অরুণ থামল, কই বিজয়বাবুর তো কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই, সেজন্য কি উনি রাত্রি-দিন এমন চুপ-চাপ বসে থাকেন? শুধু আপিস আর মেস, মেস আর আপিস। তবে কি বিজয়বাবুর কোনও তীব্র আঘাত আছে?

বিজয়বাবু অনড়, অটল। অরুণের চেঁচিয়ে পড়ার মধ্যে ছেলেমানুষি আবিষ্কার করলেন, ছোঁড়াটা ভেবেছে আমি ক্ষেপছি। আহাম্মক। আর তোরা যে নয়দিন, বিজয়বাবু বেরুনো বন্ধ হবার তারিখের সঙ্গে আজকের তারিখ মেলালেন, কত হুট-হাট্‌ খুট-খাট্‌ করতিস, এখন কি? হর্ষর বড় বড় বক্তৃতা, ইজম্‌ মারানো। যাক্‌ না দাঙ্গা থামাতে? কংগ্রেস-কে গাল দেওয়া—আরে ছোঃ, বিজয়বাবু বেশিক্ষণ চিন্তা করতে পারেন না, একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অতএব মুখ হোঁৎকা হয়ে উঠল, মুখের কোণে দেখা দিল

হাসি। দৃষ্টি নত করতে গলায় একটা আঘাত পেলেন, তাড়াতাড়ি ডান হাত উঠে এলো এবং সঙ্গে সঙ্গে অরুণের দিকে তাকালেন। অরুণের তাকানো দেখে শরীর শির শির করে উঠল, "ছোঁড়াটা বাইরেও যেতে পারে না"। এবং তারপরেই "একটু যে একা থাকব," ভাবতেই বিরক্তির স্রোত উত্তাল হয়ে উঠল। আর এই প্রথম ঘরে একা না থাকার জন্য ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বাইরে যাবে? প্রশ্ন হতেই মনে পড়ল, কারফিউ। সব বিরক্তি গিয়ে পড়ল কারফিউ-এর ওপর। তাস দিতে দিতে হাই তুলে দিলীপ হাঁকল, "মোহন, জায়গা কর্"।

—সে কি? বিধান ঘড়ি দেখল, এখন তো সবে আটটা।

—আটটা! দিলীপের মাথায় সময় একটা প্রচণ্ড বোঝা চাপিয়ে দিল। এতক্ষণ তাস খেলার পর যখন দশ-টা বাজার দুঘণ্টা দেরি আছে জানল, তখন হালই ছেড়ে দিল সে। দিলীপের হতাশ আট-টা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পরেশ তাস তুলতে গিয়ে থামল, এর কোনও মানেই হয় না। তাড়াতাড়ি তাস তুলে হরতনের টেক্কা, বিবি, নয়, ছয় পর পর সাজাতে সাজাতে নিজেকে অন্যমনস্ক করে তাস-খেলায় সমর্পণ করল নিজেকে।

বিধানের কথায় সুবিনয় যখন জানতে পারল, তখনও প্রায় দু-ঘণ্টা খেললে খেতে যাওয়া যায় এবং তারপরও একঘণ্টা জেগে থাকতে হবে, তখন, রাগে তার শরীর কড় কড় করে উঠল। তিন ঘণ্টা জেগে থাকতে হবে? কিছু করতেই হবে এ-সময়, হয় গল্প, না হয় তাস, না হয় শুয়ে থাকা, খিস্তি? যদি এই মাত্র খাওয়া হয় তবে? তবে কি ঘুম আসবে? সুবিনয় তাস তুলতে গিয়ে বলেই ফেলল, "না, ভালো লাগছে না।"

'না—ভালো লাগছে না' কথাগুলো সবার মনে ঢেউ তুলল। সবাই যেন একই সঙ্গে হাত গুটিয়ে নিল এবং সময় স্থির দাঁড়িয়ে গেল।

—তাহলে কি করবেন? বিধান প্রশ্ন করেই চুপ, কারণ সে তাস খেলতে জানে না, শুধু দেখে। এই দেখারও একটা শেষ আছে। তবু এই দেখেও তো সময় কাটছিল। সময় কাটছিল। বিধান হোঁচট খেলো। কোথায় কাটছিল? এতক্ষণ খেলার পর মাত্র আট-টা! বিধান দমে যেতে থাকল। কিন্তু খেলা থামলে আমি থাকব কি নিয়ে? তাকাল একবার।

বিধানের প্রশ্ন সবার মনে প্রশ্ন তুলল, তাই তো কি করা যায়?

—তাহলে হোক, কি করা যায়? যেন ক্লান্ত মৃত কতকগুলো লোক,

যাদের ইচ্ছে নেই, আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই। অতএব খেলতে হচ্ছে, খেলতে হবে বন্দীশালায় সময় কাটাবার জন্ত।

—হর্ষ, শুনেছিস নাকি ?

হর্ষ চুপ। কোনও উৎসাহ প্রকাশ করল না।

—কমলাপুর আর মিত্র পাড়ার বোর্ড থেকে রায় সাহেব আউস্ট হয়েছেন। বিরিঞ্চিলাল দিয়েছে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। শুনছি বেগুন-বাড়ি আর পলাশপুরে দাগা-মা মেজর শেয়ার কিনে নিয়েছে।

হর্ষ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, "দ্যাটস দি পয়েন্ট। তাই তো বলছিলাম এই হঠাৎ বাঙালী প্রীতির মূল কোথায়। সাধেই হরিসাধন মিত্র-কে দিয়ে এডিটোরিয়াল লিখিয়েছে মাড়োয়ারীদের বিরুদ্ধে। রায়সাহেব তো একটা গোলমালই চাইছেন। আরও তিনটে গার্ডেন যদি বিরিঞ্চি লাল নিতে পারে, তবে—"

—রাখ্ তোর বস্তা পচা কথা, চিন্ময় ফেটে পড়ল। গোলমাল করছে গুণ্ডারা আর উনি দেখছেন চা-বাগানের পলিটিকস।

—যা সত্যি তাই বলছি।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,। হঠাৎ—হঠাৎ কোনও জিনিষ হয় না, বুঝলি। চা-বাগান-গুলো বেহাত হয়ে পড়লে এমন-প্রীতি খুবই লক্ষ্য করবি। এখন যদি একটা বাধে তবে রায়সাহেবের পোয়া বারো।

—যা যা—গুণ্ডাদের ইয়েকে তোর ও-ভাবে—

চিন্ময়ের সঙ্গে লেগে গেল হর্ষর তর্ক। হর্ষ যত বোঝাতে চাইল, চিন্ময় ততই বুঝতে চাইল না। "দূর ভেরি, এর সঙ্গে কথা বলে," ভেবেই হর্ষ চুপ করে গেল। চিন্ময়কে সে একদম পছন্দ করে না। কথাও বলে না অ-প্রয়োজনে। কারফিউয়ের জন্ত বাধ্য হয়ে ঘরে থাকতে হচ্ছে, আর ঘরে বন্দী আছে বলেই কথা বলতে হচ্ছে, নইলে কে বলে ওর সঙ্গে কথা।

চিন্ময়ও রাগে গর গর করছিল এবং হর্ষর ওপর বিরক্ত হয়ে বাইরে যেতে চাইল অথচ বাইরে যাবার কথায় মনে হলো কারফিউ, অতএব চুপ করে বসে থাকতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সব রাগ গিয়ে পড়ল কারফিউ-এর ওপর।

মেসের সবাই যখন এমন একটি অধিকার হরণের ঘটনায় মুহ্যমান ঠিক সেই সময় একটা প্রচণ্ড গোঁ-গোঁ শব্দ স্টেশনের দিক থেকে এগিয়ে এসে

ঝাঁপিয়ে পড়ল মেসের ওপর। মেস-টা একটু আগে থেকেই নিরাশায় মরে যাচ্ছিল। তখন এই শব্দ মেসের মৃত্যুকে দ্রুততর করে চলে গেল রাস্তা কাঁপিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে সকলকে জানান দিয়ে। অরুণ আলো নিবিয়ে দিল, তাসের ঘরে বিধান। সব ঘর অন্ধকার, নিশ্চুপ। শুধু রান্নাঘরের ময়লা আলোর নিচে উনুনের সামনে বসে ঝিমুতে থাকল মোহন এবং ভাতের ফ্যান উপচে উপচে হাঁড়ির গা বেয়ে পড়তে থাকল উনুনে। মোহন ভাত চড়িয়েই যেন মরে গেছে।

ট্রাক এগিয়ে যাচ্ছে।

তপন তখন ডাক্তার পাড়ার রাস্তায় অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে দিতে চলেছে বাড়ির দিকে। খাঁ-খাঁ করছে পথ। দু-পাশের বাড়ির দরজা, জানালা বন্ধ। নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ যেন কেউ থাকে না পাড়ায়, প্রেতপুরী। তপনের শরীর ছম্ ছম্ করে উঠল। এখন যদি কেউ এসে সামনে দাঁড়ায়, পুলিশ! তপন হাঁটায় বেগ দ্রুত করল। কে যেন পিছন পিছন আসছে। কে? তপন মুহূর্তে মরে গেল। পুলিশ? কারফিউ অমান্য করেছে, আজ নিস্তার নেই। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার, তারপর—, কিন্তু যদি বাঁচা যায়? তপন শরীর কাৎ করল, যেন ওই কাৎ করলে দেখতে পাবে না পুলিশ এবং ওই অবস্থায় নিজের মধ্যে নিজে অসংখ্য বার বাঁচার চেষ্টা করে সেই ক্ষণটির প্রতীক্ষা করতে থাকল, যে-ক্ষণটিতে পুলিশ এসে তার কলার চেপে ধরবে, অথবা দূর থেকে 'দুম্' শব্দের সঙ্গেই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে।

হঠাৎ গোঁ-গোঁ শব্দ যেন কাছে এসে পড়ল। তপন মরিয়া হয়ে তাকাবার চেষ্টা করল এবং একটা "ভো—ট" শব্দ হয়েই শব্দটা মিলিয়ে গেল। তপন ধড়ে প্রাণ পেল। বড় রাস্তা দিয়ে মিলিটারি ট্রাক বেরিয়ে গেল ফায়ার বিগ্রেডের দিকে। তপন এগুলো। যাকে সে পুলিশ ভেবে মরে গিয়েছিল, তাকে একটা ঝোপ রূপে আবিষ্কার করে ক্ষেপে উঠল এবং বিনতাদের বাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে এতক্ষণ পুলিশ, কারফিউ-এর ভয়ে যে-রাগটা ভুলে গিয়েছিল, তা চাড়া দিয়ে উঠল: ঝাঁটা মারি কারফিউ-এর। কোথায় দাঙ্গা হচ্ছে, তা-না আমাদের পাড়ায়—

বিজ-বিজ করতে লাগল তপন। বিরক্তির কারণ এই যে, যবে থেকে কারফিউ চালু হয়েছে, তবে সে বিনতার সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। বাবা থাকেন বাড়িতে, তা ছাড়া বিনতার ছোট-ভাইটা এত পাকা যে তপন

কিছুতেই ওর উপস্থিতি সহ্য করতে পারে না। বাড়িতে এতগুলো লোক থাকলে কথা বলা যায় ? কিন্তু সময় কোথায় ? সকালে বিনতার স্কুল, দুপুরে তপনের আপিস। একমাত্র সন্ধ্যে ছাড়া দেখা করবার জো নেই। বাবা থাকেন না, পাকা ভাইটা না—দিব্যি ন-টা পর্যন্ত গল্প করা যায়। সন্ধ্যের পর অন্ধকার হলে পাড়ার ছেলেগুলোর অজস্র চোখ ডিঙিয়ে কোনোমতে একটা কৈফিয়ৎ তৈরি করে আসা সহজ হয়ে উঠে। পাড়ার ছেলেদের কথা মনে হতেই "লুকিয়ে প্রেম করি" শব্দগুলো যেন আপসে স্পষ্ট হয়ে উঠল তপনের মনে আর লুকিয়ে প্রেমের পর কারফিউ—ছ্যাঃ ছ্যাঃ—কারফিউকে ধিক্কার দিতে দিতে মনে হলো, কারফিউ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও তো বাতিল হয়ে যাচ্ছি। বিনতা যদি এ-সময় আমাকে আমার প্রেত বলে সন্দেহ করে ? কারফিউ হবার আগেই লুকিয়ে অন্ধকারে বাবা, বিজুকে এড়িয়ে দেখা করি আর এখন নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে দেখা করছি—একথা বিশ্বাসই করবে না বিনতা। আমাকে দেখে মনে করবে, আমি তপন নই, তপনের ছায়া। এ-কথা ভাবতেই তপনের শরীর গরম হয়ে উঠল এবং কারফিউ যে তপনকে তপনের প্রেত করে দিচ্ছে, আবার স্মরণ হতেই মনে মনে সে ক্রুদ্ধ হলো।

ঘরে ঢুকতেই মা বকে উঠলেন, "তুই কি শেষে অনাসৃষ্টি ঘটাবি ?"

তপন উত্তর দিল না, একেই বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ তার ওপর মা-র কথার জবাব দিতে গেলে খিঁচড়ে যাবে মন, তাই চুপ করে ঘরে চলে গেল।

একটা বাধাবে দেখছি। আজ বাজারে কাকে খুন করেছে, পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে, আমার ছেলে, মা ভাবনা শেষ না করতেই অজানা আশঙ্কায় একটা অদ্ভুত কিছু প্রত্যক্ষ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন তপনের ঘরে, "আজ কিছু হয় নি তো ?"

মা-র অবস্থা দেখে তপন হো হো করে হেসে উঠল, "হলে কি দেখতে আমায় ?" উত্তর দিয়েই তপন আবার ক্ষেপে উঠল, শা-লা, কারফিউকে বলিহারি। আজ দুদিন শান্ত আছে, তবু—সব রাগ গিয়ে পড়ল জেলার ডেপুটি কমিশনারের ওপর। কি অ্যাডমিনিস্ট্রেশান! অথচ এখন রাগতে গিয়ে বিনতার মুখ ভেসে উঠল। তপন শান্ত হলো, বিনতা যদি ভুল বোঝে ? —ভুল বোঝা উচিত নয়, মিলনপাড়ার ছোট্ট টিনের ছোট্ট একটি ঘরে দাঁত দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে ভাবল সরলা। স্কুলে যাবার পথেই তো বলে এলাম, এ-সময় পড়াতে যাব কি করে ? সকালে আমার স্কুল, দুপুরে ওদের।

সরলা স্ুঁচের ফোঁড় দিল, ন-মু-টা দিন যাচ্ছি না, নির্ঘাৎ মাইনে কাটবে। ন-দিনের মাইনে, হিসেব করতেই মাথা ঘুরে উঠল সরলার। সরলার সামনে একটা কালো মূর্তি এসে দাঁড়াল, দাঁড়িয়েই প্রায় বক্তৃতা দিয়ে ফেলল: ত্রিশ টাকা মাস হিসেবে ন-দিনের মাইনে ন-টাকা কেটে নিয়েছেন মন্মথবাবু। এরপর যতদিন যাবে না, ততটাকা কাটা যাবে, হয়ত চাকরিও যেতে পারে। তোমার আয়ে সংসার চলে, এই টাকা কাটার জন্যে তোমার পিতৃদেবের ওষুধ কেনা হবে না, ছোট ভাই সন্টুর স্কুলের মাইনে দিতে পারবে না। কারফিউ আর কিছুদিন চললে অন্ধকার দেখবে। ভাত চড়বে হাঁড়িতে একবেলা, সন্টু স্কুল থেকে এসে খেতে না পেয়ে ঘ্যান্তাবে, বাবার অসুখ বেড়ে যাবে, তোমার খাওয়া ঠিকমতো হবে না, মা-র কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ন্যাকড়া হবে। একদিন স্কুল থেকে আসার পথে মাথা ঘুরে—

সরলা ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইল কথাগুলো এবং তাড়াতাড়ি ফোঁড় দিতে থাকল কাপড়ে।

সৈনিকদের টহলের বিরাম নেই। মাথায় লোহার টুপি, কাঁধে রাইফেল, পায়ে বুট-পট্টি, পরণে খাকি ইউনিফরম। সৈনিকদের বুটের শব্দ রাস্তা দিয়ে ঘরে উঠে আসতেই সরলা সেলাই থামাল। ঘাড়টা পেছন দিকে ঠেলে, গলাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে, চোখের দৃষ্টি পাঠাতে চাইল পর্দার ফাঁক দিয়ে পাশের ঘরে, সন্টু আছে তো! প্রথমে ঠাহর না হতে একটু স্থান পরিবর্তন করল। কিন্তু ঘর অন্ধকার, বাবার অস্ফুট কাতরানি আর নিজের মনের অ-ভাবিত আশঙ্কা ডিঙিয়ে দৃষ্টি কিছুতেই সন্টুকে আবিষ্কার করতে পারল না। সন্টু বেরিয়েছে! একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশ ঘটেছে—মনের মধ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হতে না হতেই পাগলের মতো সেলাই ফেলে দিয়ে, মেঝের আঁচল লুটিয়ে, বেণীকে পিঠের ওপর ভাঙতে দিয়ে চৌকাঠে গুঁতো খেয়ে পর্দা প্রায় ছিঁড়ে ফেলার মতো করে ছুটে এলো এ-ঘরে।

—কে রে?

বাবার কণ্ঠ প্রশ্ন করেই চুপ। বাবার পাশে সন্টুকে অঘোরে ঘুমোতে দেখে আশ্বস্ত হলো সরলা। তবু তখনও বুক ঢিপ-ঢিপ, কারণ পল্টনদের জুতোর শব্দ তখনও মিলিয়ে যায় নি, যেতে যেতে যাচ্ছে না। আবার এসে বসল সেলাইয়ে। দু-এক ফোঁড় দিয়ে কেমন ক্লান্তি লাগল। সেলাই নামিয়ে রাখল। কি একটা করা হয় নি বলে মনে হলো সরলার। বিকেল থেকে

কি কি করা উচিত ছিল তার খতিয়ান নিতে গিয়ে দেখল, সব কাজই সে করেছে, অথচ মন বলছে—না, না। তবে কি টিউশানি করতে যাচ্ছি না বলে এমন মনে হচ্ছে? টিউশানির সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কারফিউ-এর কথা। অতএব কিছু বলার নেই, করার নেই, অতএব আবার মন দিতে হলো সেলাইয়ে।

"ইহা সুখের সময় ছিল, ইহা দুঃখের সময় ছিল", অরুণ সিগ্রেট ধরাল। কিন্তু প্রাত্যহিক অভ্যাসে যে বই টেনে নিয়ে পড়া প্রায় রুটিনের মতো এবং পড়তে পড়তে ঝিমুনো, পরে চট্ করে মশারি ফেলে দিয়েই ঘুম, তা আর সম্ভব হলো না। একবার টেনেই থমকে গেল ও সিগ্রেট টানতে ভুলল। "ইহা সুখের সময়, ইহা দুঃখের সময়—" মনে পড়তেই অরুণ মনে মনেই উত্তর দিতে লাগল আমাদের যুগ সুসময় নয়। কারণ কারফিউ জারি হয়েছে। শুধু এখানেই নয়, প্রায় সারা বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশে এই যন্ত্রণা। যন্ত্রণা, কারণ মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে না, না দিলে তাদের সুবিধে এবং ওদের সামনে থাকে সবকিছু আর আমাদের সামনে—অরুণ আর না ভেবে বই টান দিতে গেল। অথচ ধৈর্য কোথায়, বড় ক্লান্ত। সিগ্রেটের লম্বা ছাই গায়ের ওপর ঝরে পড়ল। বাঁ হাত দিয়ে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, চোখে ঘুম নেই। অরুণ চলে এলো সেই ঘরে যেখানে খাওয়ার আগপর্যন্ত চলছিল তাস খেলা।

ঘন ঘন দুটো টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে অরুণ প্রস্তাব দিল, "হবে নাকি এক হাত?"

প্রস্তাব জনসাধারণের সামনে ছোঁড়া হলো। জনসাধারণ মানে মেসের সবাই, বাদ শুধু বিজয়বাবু, বাদ শুধু বিধান। বিধান বয়েসে সর্ব কনিষ্ঠ বলে সে সকলের সামনে সিগ্রেট খায় না। তাই বসে আছে অন্ধকার ঘরে।

প্রস্তাব নিরর্থক, কারণ যারা তাস খেলছিল তারা ক্লান্ত। আপিস কারফিউ-এর জন্য বন্ধ হচ্ছে সাড়ে চারটের। মেসে এসে হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেতে না খেতে সাড়ে পাঁচ, পৌনে ছয়। বাইরে বেরুনো বন্ধ, এমনকি রাস্তার দিকের জানালা খোলা বে-আইনি, অতএব কি করা? অতএব খেলো তাস। কিন্তু একটা উত্তেজনায় মানুষ কতক্ষণ আটকে থাকে? ঝিমুচ্ছে সবাই। পরেশ ঝিমুতে ঝিমুতে পাঁচ-টার সময়কার মনটিকে হঠাৎ পেয়ে গেল, নির্মল মানুষ অবস্থা সন্ধ্যের দিকে খারাপ হয়। সে-সময় একা

কিন্তু, আমি না গেলে! নির্মল দাদু আমায় এত ভালোবাসেন। ওঁর কাছে বসলে এত শান্তি, আনন্দ অথচ অসুখের সময়ই যেতে পারছি না, পরেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল মনে মনে। শালা কারফিউ! সব রাগ গিয়ে পড়ল কারফিউ-এর ওপর।

আর সুবিনয়, দিলীপ এতক্ষণ বাঁধের ধারে কোন মেয়েটা কোনদিন কোন শাড়ি পরে আসবে এবং আজ যদি দেখা হতো তবে ডাক্তার পাড়ার মেয়েটার লাল, সুন্দর পাড়ার সেই লম্বা ফর্সা মেয়েটার বাদামি, বেঁটে আঁচিল-ওয়ালা মেয়েটার রেশমী শাড়ির ওপর সুপুষ্ট স্তনকে দেখতে পেত। আফশোষ হচ্ছিল দুজনেরই, তবু এই কল্পনার একটা শেষ আছে, ভাবতে ভাবতে তারা উভয়ে উভয়ের কাছে সরে এসেছিল এবং দুজনে দুজনকে স্পর্শ করে একটা উষ্ণ সুখ অনুভব করছিল। সুখ অনুভব করতে করতে হটাৎ দিলীপ সরে গেল, সুবিনয়ও—যেন দুজনে এটাকে অন্যায় মনে করেছে ঠিক একই সময়, যেন ওদের ভাবনা ঠিক একই পথে এগিয়ে চলে, একই জায়গায় থামে, হোঁচট খায় আবার চলে, সুতরাং শেষ হয়। অথচ সময় এগুচ্ছে না। এগুলে ঘুম পেত। চোখ জড়িয়ে আসত, তাই বসে থেকে থেকে হাঁফিয়ে উঠছে। না বসে উপায় নেই, বাইরে বেরুবে কি করে? আর সেই পাঁচ-টা থেকে হয় তাস, না হয় গল্প, না হয় পড়ানো—দ্যুৎ ছাই—

খোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-খোড়। আপিস যাও, মেসে এসো, বন্ধ হয়ে থাকো।

মন্টু খানিকক্ষণ হাতের পেশী নিয়ে ব্যস্ত হলো। তারপর পা, তারপর বুক, তারপর হাত, তারপর পা, তারপর বুক। তারপর হাত, তারপর পা,—হাত—পা, হাত-পা, তারপর—তারপর—

অতএব মন্টুও ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং রাগ গিয়ে পড়ল কারফিউ-এর ওপর। ক্লাবে না গেলে কি স্বাস্থ্য ঠিক থাকে? ব্যায়াম করে সকালে, কিন্তু সকাল ছ-টা পর্যন্ত কারফিউ আর এ-দিকে বিকেল পাঁচ-টা থেকে সুরু। কি করা যায় অতএব মন্টু ক্লান্ত এবং নিরুপায়। নিরুপায় অতএব আপন মনে পেশীগুলোর কথা ভাবতে লাগল।

বিধান সিগ্রেট খেয়ে এ-ঘরে এসে দেখল, এখানকার আবহাওয়া বিষণ্ণ, বিমর্ষ। যেন অনেকদিন কেউ বাড়ির খবর পায় না। বিধান শেষ টান দিতে গিয়ে বুঝেছিল, এমন আর ক-দিন চললেই সব ব্যাপার বানচাল হয়ে

যাবে। ইরিগেশনের দুজন, এগ্রিকালচারের একজন, সেটেলমেন্টের নরেশ, ডাব্লু-বি-এর শক্তি—কারুর সঙ্গে দেখা করা হচ্ছে না, অথচ এদের সঙ্গে না দেখা করলে আপিসের অন্যান্য কর্মীরা তড়কে যাচ্ছেন, বলছেন—এরা জয়েন না করলে চাকরি নিয়ে টানাটানি। কন্‌ভিন্স করতে হবে, আবার ওদিকে সেন্ট্রাল গবর্মেন্ট কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে হবে, তাদের স্ট্রাইকে—, বিধান ভাবতে পারল না। কি করে ভাববে? অতএব চলে এসেছিল এ-ঘরে। চেয়ে দেখল সবার মুখ গম্ভীর, সবাই কিছু চিন্তা করছে। কিন্তু কথাটা বলা দরকার, অতএব সে হর্ষের দিকে এগিয়ে এল।

হর্ষ চোখ বুঁজে পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ভাবছিল, কারফিউ জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের মনে জাগছে ফ্রাসট্রেশান। এমন কি আমার মনে, হর্ষ খেই হারিয়ে ফেলল এবং কি ভাবছিলাম, এই প্রশ্ন নিজেকে করে লজ্জা পেল। তবে কি পার্টি আপিসে যাচ্ছি না বলে হতাশা ঘিরে ধরেছে। হর্ষ বল সংগ্রহ করতে চাইল। সেই সময় বিধান সরে এল কাছে।

—হর্ষদা।

বিধানের স্বরে চোখ মেলল হর্ষ।

—কি করি বলুন তো? সামনে ডিমাণ্ড ডে অথচ কারফিউয়ের জন্য কয়েকজনের সঙ্গে মিট্ করতে পারছি না। মিট্ করতে না পারলে ভীষণ ক্ষতি হবে আমাদের। বিধানের কথা শেষ হতেই হর্ষের চোখে দৃষ্টি খেলে গেল। মুহূর্তে ওর সামনে আর একটা অর্গল খুলে গেল, আসামের দাঙ্গাকে বেশিদিন চালাতে দেওয়ার পেছনে সেন্ট্রাল গবর্মেন্টের তবে এই চাল আছে? দাঙ্গা চললে আসাম, আর বাংলাদেশে সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন বানচাল হয়ে যাবে, তখন আরও সুখে আরও দাপটে—

হর্ষ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বিধানের প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই এক লাফে উঠোনে নামল।

হর্ষর আচরণে চিন্ময় বিস্মিত হলো। এতক্ষণ সে যা চিন্তা করছিল, সেই চিন্তা চলতে চলতে হঠাৎ বাধা পেল। চিন্ময় বেশি ভাবতে পারে না। মিনিট পাঁচেক ভাবার পরই প্রথম ভাবনায় আসে এবং প্রথম ভাবনা থেকে আবার সুরু করে সেই ভাবনা যা সে মিনিট পাঁচেক ভেবেছিল। চিন্ময়ের ভাবনা প্রথমে বাড়ির কথা ভাবল। এক পলকে সে মা-বাবা, ছোটবোন সান্টু মিন্টুকে দেখতে পেল হাসি হাসি ভাবে, তারপর ভাবল বাড়ি যাওয়া

দরকার। তারপর ভাবল, বাড়ি যেতে গেলে সন্ধ্যে সাতটার ট্রেণে যেতে হবে, কিন্তু কারফিউ জারি পাঁচটায়, অতএব—চিন্ময় আর ভাবতে পারল না। আবার ফিরে এল প্রথম ভাবনায়। অর্থাৎ প্রথমে বাড়ির কথা ভাবল, একপলকে মা বাবা ছোট বোন সামু মিনুকে দেখতে পেল হাসি-হাসি ভাবে, তারপর ভাবল ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষ ভাবনায় এসে আবার প্রথম ভাবনায় চলে গেল। সেই সময়ই হর্ষকে একলাফে উঠোনে নামতে দেখেই সে-ও তড়াক করে নেমে পড়ল খাট থেকে এবং কিছু না ভেবেই চলে এল নিজের ঘরে।

কমল একটু ঘুম কাতুরে। এখন বেড়ানো নেই, অতএব ওই সময়টুকু ও ঘুমিয়ে কাটায়, কারণ করবার কিছু নেই। তাস খেলতে পারে না, বই পড়তে ভালো লাগে না, গল্পও বেশিক্ষণ করে না। সুতরাং ঘুম, অতএব সে ঘুমোয়। কিন্তু ঘুমেরও শেষ আছে! একটা মানুষ আর কতক্ষণ ঘুমুতে পারে? কমলের চোখ এখন ঘুমকে অস্বীকার করছে। কমল নিরুপায়, কমল অসহায়। তাই রাগ গিয়ে পড়ল কারফিউ-এর ওপর। কারফিউ না হলে তো ওই সময়টুকু বেড়াতে পারত সে।

বিজয়বাবু নির্বিকার। চৌকির ওপর বসে থাকেন, অতএব তাঁকে কারফিউ স্পর্শ করতে অক্ষম। সেজন্য তিনি এখন এই ঘরে এতক্ষণ পরে একলা থাকায় আরাম কুড়ুতে কুড়ুতে মেসের ছোঁড়াদের দুঃখে আনন্দ পেতে লাগলেন, ঠিক হয়েছে! ও ঘরে জুটেছে সব। যাও—অন্যে যখন আনন্দে হাসে, বিজয়বাবু তখন গম্ভীর হয়ে যান। মেসের লোকদের দুরাবস্থার কথা কল্পনা করতে করতে তিনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন। এবং আরও আরও আরও দুঃখ আছে কপালে ভাবতে ভাবতেই হাঁফিয়ে উঠলেন। মুখ হোঁৎকা হয়ে উঠল, মুখের কোণে দেখা দিল হাসি। বিজয় অপেক্ষা করতে থাকলেন ঘুমের জন্য। ঘুমের আগে সিগ্রেট টানার প্রতীক্ষায়।

সন্ধ্যা আর মা লুডো খেলছিল। তপন প্রথমে মা-র পক্ষ নিয়ে হৈ-চৈ করে সন্ধ্যাকে হারাবার চেষ্টা করল। মা-র হাতে দানই পড়ছে না, ওদিকে সন্ধ্যা দিব্যি গুটি পাকিয়ে নিচ্ছে। মা চালছেন, দান পড়ছে পোয়া কিম্বা দুই। তপনের ইচ্ছা করছিল মা-র হাত থেকে ছক-টা কেড়ে নিয়ে নিজেই চালে। কিন্তু সন্ধ্যার দুটো গুটি পাকতে দেখেই তপন ভীষণ ক্লান্ত বোধ করল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। না, ভালো লাগেনা, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে

মাত্র সাড়ে ন-টা আবিষ্কার করে আঁৎকে উঠল। এখনও দু-ঘন্টা জেগে না থাকলে ঘুম আসবে না। দু ঘন্টা! বাইরে যাবো? ভয় উঁকি দিল। অতএব বিছানা এবং বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে মা এবং সন্ধ্যা কি করছে, কি ভাবছে তা ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু কতক্ষণ ভাববে? অতএব এ-পাশ ও-পাশ, সুতরাং এ-পাশ ও-পাশ।

সরলা তখন সুতরাং অতএবের মায়া কাটাতে চেষ্টা করছে। মাকে দুধ-খই খাইয়ে জানলার ধারে সরে এসে জানলা খুলতে গিয়ে খেয়াল হলো, কারফিউ, অতএব জানলা বন্ধ রাখতে হবে, সুতরাং গরমে পচতে হবে। এই অতএব-সুতরাং কাটাতে গিয়ে আর এক খপ্পরে পড়ল, মন্মথবাবু যদি টাকা কাটেন—সরলার বুক কেঁপে উঠল এবং কোনো কাজেই আর মন বসল না। রাগ গিয়ে পড়ল দাদার ওপর, পড়ল মারপিট-এর ওপর।

এখন রাত বেড়েছে, অতএব যারা জেগে ছিল তারা ঘুমোবার চেষ্টা করছে। ঘরে ঢুকেই অরুণ অবাক হয়ে গেল বিজয়বাবুর অবস্থা দেখে। বিজয়বাবু পাগলের মতো কি খুঁজছেন একবার চৌকির তলায় গলা বাড়িয়ে, আর একবার বিছানার চাদর-তোষক সরিয়ে দিয়ে। অরুণ ঘরে ঢুকতেই বিজয়বাবু থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ-মুখ অসহায়, করুণ। অরুণের মনে হলো বিজয়বাবু কেঁদে ফেলবেন যেন। অরুণ বিমূঢ়, অনড়। পর মুহূর্তে বুঝতে পারল, বিজয়বাবু ঘুমুবার আগে সিগ্রেট খান, এখন তাই খুঁজছেন। বিদ্যুৎ চমকের মতো ত্বরিতে অরুণ একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দিল বিজয়বাবুর সামনে। বিজয়বাবু হে-হে-হা-হা একটা অস্বাভাবিক হাসি হেসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন সিগ্রেটের ওপর এবং নিয়েই জড়িয়ে ধরলেন অরুণকে। অরুণকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায় আজ প্রথম বিজয়বাবু অন্যের আনন্দ নষ্ট করার জন্য কষ্ট পেলেন। আর অরুণ একটা প্রচণ্ড আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠল। যে বিজয়বাবু কেনোদিন কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, গল্প করেন না, এমন কি তাকান না, সেই বিজয়বাবু জড়িয়ে ধরলেন অরুণকে? অরুণ পুরো ব্যাপারটাকে আবার ভাবতে গিয়ে অবাক হলো। যে ব্যাপারটি স্মরণে থাকা উচিত জীবনভর, সেই ঘটনাটি মনেই করতে পারছে না অরুণ, বড্ড ক্লান্ত। শুধু মনে হলো সেই পাঁচ-টা থেকে কেবল পড়ছে, বন্দী হয়ে আছে। একটা ভোঁতা প্রান্তির অভিজ্ঞতা। ঘুমের আয়োজন শুরু করতে যেত-কথায় তুলতে গিয়ে হোঁচট খেলো, এমন একটা ব্যাপার—একজন

মানুষ যে কোনও দিন ডেকে কথা বলেনি, হয়তো আর বলবে না, সে-ই আমাকে জড়িয়ে ধরল—একটা গোটা মানুষের ভালোবাসা—উঃ, অরুণ কেঁদে ফেলবে এবার। মানুষ মানুষকে ভালোবাসছে অথচ আমি সেই ভালোবাসা স্মরণ করতে পারছি না। অরুণ চারধার অন্ধকার দেখার আগেই বালিশ ঠিক করে লাফিয়ে উঠল বিছানায়, মশারি টাঙানো হলো না। মশারীর নিচে মানুষ, অতএব তারা অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। সকালে উঠলেই আপিস। আপিস ফেরৎ মেস—তারপর? সন্টু আর কমল ভাবতে চাইল না কারণ পারল না যেহেতু চোখের সামনে অন্ধকার। সরলা চোখ বুজেই দেখতে পেল বাবা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, এক ফাইল ওষুধের অভাব, সন্টুও ঘ্যাঙাচ্ছে। অথচ কি করব আমি? কারফিউ থাকলে—

আমি কি করতে পারি? একটা অসহায় ঢেউ উঠে ছড়িয়ে পড়ল, ছড়াতে ছড়াতে বড় হয়ে রূপ নিতে থাকল, আমরা কি করতে পারি? ঘুম থেকে উঠে আপিস, আপিস থেকে মেস, মেসের পর জানলা, কপাট বন্ধ। হয় তাস খেলা, না হয় খিস্তি। ধোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। পরেশ, সুবিনয়, চিন্ময়, হর্ষ, তপন—সব, সবাই ভাবছে, ভাবতে আরম্ভ করেছে।

একটা ছিদ্র দিয়ে আলো যেমন অবাধে চলে আসে অন্ধকারে, তেমনি এক অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্র পথে কয়েক ঘণ্টার আবশ্যিক আটকে থাকার যাতনা, স্বাধীনতা হরণের প্রচেষ্টা প্রথমে ক্লান্তি আনল। ক্রমে সেই ক্লান্তি ছড়াল সারা শরীরে, তারপর সারা জীবনে। ঘুম—খাওয়া—আপিস—মেস—স্কুল, স্কুল—বাড়ি—ঘুম। তারপর? তারপর? সেই একই স্রোত চিরজীবন? আমাদের কিছু করবার নেই? মানুষের কিছু করবার নেই? সেই একই বৃত্ত যার যে-কোনো বিন্দু থেকে সুরু করে আবার সেই বিন্দুতে পৌঁছনো। থোড়-বড়ি-খাড়া। একটা নিষ্করুণ, অসহায় আন্দোলন—যার কোনো মানে নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই। নেই—নেই—নেই। আবার সেই অসংখ্য 'নেই' এসে চাপ চাপ হয়ে বসল সবার মনে, অতএব ক্লান্তি নামল। ক্লান্তি বিরক্তি আনল এবং বিরক্তি উত্তাল হয়ে অবশেষে ফেটে পড়ল ক্রোধে—

—না, চলবে না।

—না। না। না—

যেন অসংখ্য প্রতিবাদ মাত্র একটি শব্দ 'না' হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। অথচ সেই বিরাট 'না' অসহায় ক্রোধ, নিরুপায় আক্রোশ, আশাহীন বেদনা,

তীব্র অভিমান, তীক্ষ্ণ ঘৃণা নিঃশব্দে ঢেউ তুলতে তুলতে লক্ষ লক্ষ রক্ত মাংসের শরীরের মধ্যে ফেটে গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে থাকল।

আশ্চর্য, শহরের আকাশে তখন খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে সুরু করেছে। জ্যোৎস্না সেই মেঘকে চিরে চিরে ছড়িয়ে পড়ছে। জ্যোৎস্না তিস্তার জলে। তিস্তার জল চঞ্চল, কয়লার জল স্থির।

আর সকলের মনের মধ্যে ফেটে পড়া অসংখ্য 'না', আক্রোশ, ক্রোধ, ঘৃণা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে পৌঁছুল আকাশের তলে।

অথচ নিচে তখন শব্দ। শ্লথ, বিচ্ছিন্ন, অনিয়মিত, অ-সম লয়—প্রায় অ-সৈনিকোচিত। খট্—খট্—খটা—খ—। ক্লান্তি, অনিদ্রা, অনাহারে মাথায় লোহার টুপি, কাঁধে রাইফেল, পায়ে বুট-পট্টি, পরণে খাকি ইউনিফরম —একদল মানুষ প্রাণপণে সৈনিকের কর্তব্য করতে চাইছে। তাদের পায়ের শব্দের সঙ্গে সৈন্যদের পূর্বপরিচিত চলার শব্দের কোনও সঙ্গতি নেই, মিল নেই।

খট্—খট্—খটা—খ—। ইউনিফরম পরিহিত একদল লোক সৈন্য হতে পারছে না, মানুষ হয়ে যাচ্ছে আর মানুষরা তখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

একটি বিবরণ

রেভারেণ্ড ক্লীমেণ্ট মোরিণ

"আদিতে ঈশ্বর ; তাঁর আরাধনা করি"। মণ্ট্রীল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার শাখার উদ্যোগে আয়োজিত সঙ্গীত বিভাগের গ্রীষ্ম শিক্ষাক্রমে 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য নন্দনতত্ত্ব' পর্যায়ে তিন সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনে ডক্টর রোজেটি রেনশ-র সঙ্গে একযোগে ও তবলিয়া মহাপুরুষ মিশ্রের সঙ্গত-সহযোগিতায় ভাষণদানকল্পে এসে কলকাতার আলী আকবর সঙ্গীত বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ ও ভারতের সরোদের গুণী কলাকার মান্যবর অতিথি ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ শান্ত ভক্তি-সমাহিত কণ্ঠে ঐ কথা কটি দিয়ে শুরু করলেন।

বক্তা বলে চললেন, "আমার অন্তরে ও আমার প্রার্থনায় জগদীশ্বরের পরেই যাঁর স্থান, তিনি সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী।" উৎসাহী ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা এবং ফরাসী ক্যানাডার সবচেয়ে প্রভাবশালী সঙ্গীতবিদ্যায়তনগুলির অধ্যাপকবৃন্দ ও বিভাগীয় প্রধানেরা। তাই সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠল: "আপনাদের সঙ্গীতের দেবী তো তাহলে আমাদের সেণ্ট্ সিসিলিয়ার মতোই ?"

ওস্তাদজী বিস্মিত। মণ্ট্রীলের ছাত্রেরাও যেমন ইতঃপূর্বে সরস্বতীর কথা শোনেননি, ওস্তাদজীও তেমনি কখনও পশ্চিমী সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কথা শোনেননি। এক নতুন জ্ঞানের উত্তরে আরেক নতুন জ্ঞান। ছাত্রেরা অল্প কথায় সিসিলিয়ার পরিচয় দিলেন। এই দৈত আবিষ্কারের আনন্দকে গুণিবর ভাষায় রূপ দিলেন: "আপনাদের সিসিলিয়া ও আমার সরস্বতী সঙ্গীতের রাজ্যে সহোদরা।"

তখনও তো একটিও সুর ওঠেনি ; কোনো তাত্ত্বিক তুলনায় প্রশ্নও না। তবু ভবিষ্যতের কর্মকাণ্ডের প্রতিশ্রুতি ঐ মুহূর্তেই রচিত হয়ে গেল। যেখানে মনন ও অন্তর, পূর্ব ও পশ্চিম, স্থির প্রত্যয় ও লক্ষ্যের একাগ্রতায় সেই গৌরবান্বিত সমাবেশে মিলিত হয়েছে, সেখানে সেই মুহূর্তেই সঙ্গীতের দুই মহিয়সী দেবী তাদের ওপর একযোগে আশীর্বাদ ঢেলে দিলেন।

ম্যাক্‌গিল্ বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যানাডা কলা পরিষদের সহৃদয় সহায়তায়

মন্ট্রিল বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দূরদর্শী ও পথপ্রদর্শককর এক কার্যক্রমের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব এইভাবেই শুরু হয়ে গেল।

প্রাচী-প্রতীচী সাংস্কৃতিক মূল্যসমূহের পারস্পরিক সমাদরের যে প্রকল্প ইউনেস্কো গ্রহণ করেছেন, তারই আদর্শমতে ইউনেস্কো ও ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুক্ত উদ্যোগে ১৯৫৮-১৯৫৯ সালে ডক্টর রেন্‌শ ভারতে ভারতীয় সঙ্গীতের যে গভীর জ্ঞানান্বেষণে নিযুক্ত হন, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর ক্যানাডা সফর তারই পরিণতি।

ভারতীয় ও পশ্চিমী সঙ্গীতের তুলনামূলক বিচারে শ্রীমতী রেন্‌শ কতদূর প্রাগ্রসর, তাঁর অধ্যয়নে তিনি কত গভীরে গেছেন, তার প্রমাণ এই শিক্ষা-ক্রমের আগাগোড়া দেখা গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশাল সেন্টারের অধ্যক্ষের সহৃদয় প্রসাদে যে পরিবেশ রচিত হয়েছিল, তাতে চক্ষু-কর্ণের সুখ ছিল ; সেখানে সাম্প্রতিকতম শ্রাব্যদার্শন সহায়কসমূহের আয়োজন ছিল। সেই পরিবেশে ডক্টর রেন্‌শ সরোদ ও তবলার পাশাপাশি কীবোর্ড-এ এবং টেপ ও রেকর্ডের বিরাট সমাবেশে পশ্চিমী-কণ্ঠসঙ্গীত, অর্কেস্ট্রা ও সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন—এতে খ্রীষ্টানিটির উদয় থেকে বর্তমান কাল অবধি সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত ছিল। অনুষ্ঠানকালে পর্দায় স্বরলিপি ও নির্দেশে পূর্ব-পশ্চিমী সঙ্গীতের তত্ত্ব তুলে ধরার সুযোগও তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

জানা থেকে অল্প-জানা পার হয়ে অজানায় পৌঁছবার সঙ্কল্প নিয়ে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ ও ডক্টর রেন্‌শ বিলাবল্ ঠাট দিয়ে শুরু করলেন। এই ঠাটের সাতটি স্বর পশ্চিমী সঙ্গীতে বহুল প্রচলিত মেজর স্কেলের সাতটি স্বরের অনুরূপ। এক্ষেত্রে বর্ণমালাভিত্তিক ডো স্বরগ্রামের চেয়ে সোল্-ফা স্বরগ্রাম অনেক বেশি কাজে লাগে ; এতে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি এই সপ্তস্বর ডো, রে, মি, ফা, সোল, লা, সি নামে পরিচিত।

অন্যান্য সঙ্গীতরসিকদের মতোই এই ছাত্রমণ্ডলী ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরগ্রাম সম্পর্কে এতদিন যা পড়েছিলেন, তাতে তাঁদের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় নি, তাঁরা বরং দুর্জ্ঞেয়তার ঘোরেই পড়েছিলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, এই বিজাতীয় স্বরগ্রামে প্রতি অক্টেভে সুষমধ্যবর্তী বাইশটি জটিল ইণ্টারভাল আছে। এইগুলি এমনই সূক্ষ্মতায় স্থাপিত যে ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে জন্মাবধি পরিচয় কিংবা দীর্ঘকালব্যাপী আস্বাদনের অভিজ্ঞতা ছাড়া পিচ্-এর ঐ সূক্ষ্ম পার্থক্য বোঝা যায় না, ভারতীয় সঙ্গীতের রস আস্বাদনও সম্ভব হয় না। ওস্তাদ

আলী আকবর খাঁ প্রভৃতি অঙ্কেতে সাতটি স্বরের উল্লেখ করায় পশ্চিমী দৃষ্টি-কোণের অনুকূল সহজবোধ্য, সরল ও সহজপ্রাপ্য গ্রন্থগুলি (আর তাও সংখ্যায় এত অল্প যে তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে ধরাও যায় না) থেকে যে সব ভুল ধারণা গড়ে উঠেছিল, তাতে ভারতীয় সঙ্গীতের রসবোধে পশ্চিমের কাছে এক অন্তরায় রচিত হয়েছিল। ওস্তাদজী কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই অন্তরায় ঘুচিয়ে দিলেন।

তখনকার মতো অবশ্য তিনি ঐ পথে আর এগোলেন না—এতেও তাঁর সুবিবেচনারই পুণঃ পরিচয় মিলল। তিনি দেখালেন, একই বিলাবল্ ঠাট থেকে আরোহী, অবরোহী, বাদী ও সম্বাদীর বৈশিষ্ট্যে বহু রাগ রচিত হতে পারে। শুধু এই তথ্যটুকু দিয়েই তিনি থামলেন না ; কোনো এক রাগের আরোহী ও অবরোহী, বিশেষ গুরুত্ববৎ স্বরবিশেষ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই তানসেন কিংবা অন্য কোনো প্রাচীন সঙ্গীতগুরু কিংবা তাঁর নিজের পিতৃদেব পদ্মভূষণ ডক্টর আলাউদ্দিন খানসাহেব রচিত, আবার কখনও সঙ্গে সঙ্গে রচিত নিজেরই এক বা একাধিক গৎ পরিবেশন করে তিনি সেই রাগরূপকে জীবন্ত করে তুললেন।

পশ্চিমী সঙ্গীতে যেমন কোনো একটি থীম্ বা মেলডি স্কেলের সবকটি স্বর ব্যবহার করতে পারে (করতেই হবে এমন কোনো কথা অবশ্য নেই), তেমনি কয়েকটি গৎ-এ এমন রাগের পরিচয় পাওয়া গেল, যাতে বিলাবল্ ঠাটের সাতটি স্বরই উপস্থিত, যেমন বিলাবল্ রাগ ও লুম। কিন্তু অন্য গৎ-এ ছয় বা পাঁচ স্বরের রাগও দেখা গেল, যেমন পঞ্চস্বর দুর্গা ও শঙ্করা ; অন্যদিকে মিশ্র রাগও আছে, যাতে আরোহীতে পাঁচ স্বর, অবরোহীতে সাত—মাড়-এর কথা মনে আসে ; পাঁচ, ছয় ও সাত স্বরের আরো নানা মিশ্রণও দেখা গেল। রাগের ঘোরে কিংবা পিছু-টানেই বাঁধা হোক, হালকা কিংবা দুষ্টুমিতে ভরাই হোক, প্রতিটি গৎ-ই এমন সুরময় যে ছাত্রেরা তাদের সহজেই মনে রাখতে পারেন ; এইভাবে বিলাবল্ ঠাটের অন্তর্গত বিভিন্ন রাগের তত্ত্বগত অঙ্কাদি কোনো সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই তাঁদের আয়ত্ত হয়ে যায়।

একই ভাবে অধ্যাপক খাঁসাহেব অতঃপর রাগ জৌনপুরী নিয়ে আশাবরী ঠাটের রাগব্যুৎপত্তিতে চলে গেলেন। আশাবরী ঠাট পশ্চিমী সঙ্গীতের ন্যাচরল্ মাইনর স্কেল্-এর নিকট আত্মীয়। আশাবরী ঠাটের ন্যাচরল্ সেকেণ্ড্ বা শুদ্ধ ঋষভের পরিবর্তে আশাবরী রাগের ফ্ল্যাট্ সেকণ্ড্ বা

কোমল ঋষভের প্রয়োগে মূল স্কেলের অনাত্মীয় স্বরের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখা গেল। পশ্চিমী সঙ্গীতে এই প্রয়োগরীতির উদাহরণ সহজলভ্য, কারণ অ্যাক্সিডেন্টাল অল্টেরেশনের প্রসাদে কোনো স্কেলের সত্তা অক্ষুণ্ণ রেখেও স্বরবিশেষের উঁচু-নিচু করা যায়।

আশাবরী রাগের কোমল ঋষভ স্বাভাবিকের চেয়েও আরেকটু নিচু, এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি শ্রুতির প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি বললেন, "এই স্বরটি যেন বিষের কৌটো। ডাক্তারেরা জানেন, রোগবিশেষে স্বল্প পরিমাণে ব্যবহৃত কোনো কোনো বিষ ওষুধ হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তেমনই সতর্ক-ভাবে ব্যবহার করলে আশাবরী রাগের অতি কোমল ঋষভ বা লো ফ্ল্যাট সেকণ্ড, সঙ্গীতের সহায়; কিন্তু তার ওপর একটু বেশি সময় দিলেই, বেসুরো শোনাবে; তাতে রাগের সৌন্দর্য বাড়বে না, সৌন্দর্য শেষ হয়ে যাবে।"

ছাত্রেরা বুঝতে পারেন যে ফ্ল্যাট, সেকণ্ডের যে সাধারণ ও কোমলতর রূপ সরোদে আঙুলের কাজে তোলা যায়, সমান সুরে বাঁধা কীবোর্ড-এর যন্ত্রে তাদের পাওয়া যাবে না। কিন্তু এই ইণ্টারভাল পশ্চিমী তারের যন্ত্র ভায়োলিন, ভায়োলা ও চেলো-য় এবং বায়বীয় যন্ত্রেও তোলা যায়। তাঁরা জানেন যে লোকসঙ্গীতে ও খালি গলার গানে এমনি অসম ইণ্টারভাল অনেক সময়েই পাওয়া যায়—অবশ্য এগুলি প্রায়ই গায়কদের অচেতনেই হয়ে যায়। কিন্তু ডক্টর রেন্‌শ তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, অনেক পণ্ডিতের মতে, মীড়ের সূক্ষ্ম বিবর্তন একদা পশ্চিমী সঙ্গীতবিধির স্বাভাবিক অঙ্গ ছিল। উদাহরণত, ষোড়শ শতক ও তৎপূর্ববর্তী কালের পলিফনিতে মেজর ও মাইনর সেভেন্‌থ্-এর, অর্থাৎ শুদ্ধ ও কোমল নিষাদের একযোগে ব্যবহার—অ্যাসেণ্ডিং মেলডিক লাইন-একটি এবং ডিসেণ্ডিং-এ অন্যটি—থেকে অনুমান করা যায় যে বর্তমানকালের কী-বোর্ডের চেয়ে কোনো উচ্চতর শার্প্‌ড সেভেন্‌থ্ ও কোমলতর ফ্ল্যাট্ সেভেন্‌থ্ তখন পাওয়া যেত। উপরন্তু, ঐ জাতীয় দৃষ্টান্ত বিরল নয়, বরং প্রায়ই পাওয়া যায়।

শ্রুতির তত্ত্বটি ভারতীয় সঙ্গীতের সবচেয়ে বিতর্কমূলক বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম। সেই তত্ত্বটি আলী আকবর খাঁ এত সহজ করে উপস্থিত করায়, এর সব রহস্যই কেটে যায়, ছাত্রেরাও পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন। তবু ছাত্রদের তো আগে হাঁটতে শিখতে হবে, তারপরে ছোটা। তাই ওস্তাদজী

ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির বিরাট চিত্রটি উদ্‌ঘাটন করবেন বলে স্থির করে আপাতত প্রসঙ্গটির আলোচনা মুলতুবী রাখলেন।

এবার একই স্বরের বিভিন্ন রূপ ব্যবহার করে এমন রাগের প্রসঙ্গ উঠল। খাম্বাজ শুদ্ধ ও কোমল নিষাদ, উভয়ই ব্যবহার করে। এখানেও ছাত্রেরা পরিচয়ের গণ্ডীর মধ্যেই রয়ে গেলেন। পশ্চিমী সঙ্গীতের মেলডিক মাইনর স্কেলে, সিক্স্‌থ্‌ ও সেভেন্‌থ্‌, ধা ও নি, আরোহীতে মেজর, অবরোহীতে মাইনর—এতেও তো একই ব্যাপার ঘটে। রাগ মাঝ-খাম্বাজে খাম্বাজ রাগের স্বরই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু থার্ড ও ন্যাচরল্‌ সেভেন্‌থ্‌-এর পরিবর্তে ফোর্থ ও লোয়ার ফ্ল্যাট্‌ সেভেন্‌থ্‌-এর ওপর জোর পড়ে। বাদী ও সম্বাদীর পরিবর্তে কেমন আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়, এই রাগটি বাজিয়ে অধ্যাপক খাঁসাহেব তার প্রমাণ দিলেন।

শুরুতে তিনি সবকটি গৎ-ই তিনতালে বাজিয়ে শোনান, কারণ সঙ্গতিয়ার ঠেকার ষোলটি মাত্রা চার-চারে ভাগ করে দেওয়া হয়—এতে পশ্চিমী সঙ্গীত-কারদের চার বীটের তালের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। কিন্তু বিলম্বিত গৎ-এ তিনি ছন্দ আনেন, মাত্রাগুলিকে দুই, তিন, পাঁচের অসম বিভাগে ভাগ করে দেন; এতে তবলিয়ার সমবিভাগের ঠেকার সঙ্গে অমিল ঘটে, কিন্তু যোগফলে ষোলটি মাত্রাই পাওয়া যায়। এইভাবে অধ্যাপক খাঁসাহেব দেখিয়ে দেন যে চারবার চার মাত্রাই ষোল মাত্রার যোগফলে অর্থাৎ তিন তালের এক আবর্তী বা বৃত্তে পৌঁছবার একমাত্র উপায় নয়। পরে তিনি দুই, তিন ও ততোধিক আবর্তীও ব্যবহার করে দেখান।

সিংকোপেশনের বিরোধী অসমমাত্রিক তালের দৃষ্টান্তও পশ্চিমে একেবারে অজ্ঞাত নয়; ক্রিশ্চান গীর্জার লিটার্জি গান গ্রেগোরিয়ান্‌ চার্ন্ট্‌-এ টাইম সিগ্‌নেচার এবং সাধারণ বারিং (barring)-এর ব্যবহারই নেই। লোক-সঙ্গীতে, যেমন হাঙ্গেরীর ক্ষেত্রে, পাঁচ, সাত এইরকম অসম মাত্রায় বিভাগ দেখা যায়। বার্টক্‌-এর সংগ্রহে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে; এগুলি অনেক সময়ই চলতি টাইম সিগ্‌নেচার ও বার লাইন্‌স্‌ গ্রহণ করে। তালের অসম স্পেসিং কোনো কোনো কালে দুর্লভ বলে গণ্য হলেও, একে স্বীকার করে নিলে (টাইম্‌ সিগ্‌নেচার-এর বারম্বার পরিবর্তন অসম বারিং (barring)-এর প্রসাদে চোখে পড়ুক না পড়ুক) একে পলিফনিক যুগ ও বিংশ শতাব্দীর এক গুরুত্বপূর্ণ রীতি-বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিতে হয়।

সঙ্গীতে যেখানে পরিচিত টাইম সিগনেচার-এর কৃপায় বার্ লাইনে সাজানো পর পর বার্-এ দেখা যায়, সবকটিতেই সমান সংখ্যক মাত্রা—সিম্পল্ টাইম্-এ ২, ৩, ৪ এবং কম্পাউণ্ড টাইম্-এ ৬, ৯ অথবা ১২—সেখানে সঙ্গীতকারেরা অসমমাত্রিক তালের কথা ভাবতেই পারেন না। এর কারণস্বরূপ বলা যায়, দীর্ঘকাল ধরেই এই ধারণা বর্তমান যে, বার্ লাইন্‌গুলির অর্থই হলো, সচরাচর প্রথম মাত্রায় জোর দিয়ে একই ভাবে পুনরাবর্তিত তাল।

এই বদ্ধমূল ধারণার একটি প্রমাণ এখানেই পাওয়া গেল। ছাত্রদের একটি ছোট ফরাসী-ক্যানেডীয় লোকগীতি গাইতে বলায় তাঁরা প্রতি চারটি মাত্রার প্রথমটিতে জোর দিতে থাকেন, কারণ যে কোনো চলতি সংস্করণে মাত্রাগুলিকে চার চার করে ভাগ করে দেওয়া আছে। ডক্টর রেন্‌শ কথাগুলিকে সুর না দিয়ে আবৃত্তি করতে বলার আগে পর্যন্ত তাঁরা বুঝতেই পারেন না যে এই সমমাত্রিক তালে কথাগুলির অর্থ একেবারেই উড়ে যায়। ডক্টর রেন্‌শ-র কথা শুনে তাঁরা বুঝতে পারেন যে অভ্যস্ত বার্ লাইন অগ্রাহ্য করে প্রতি আটটি মাত্রাকে ৪+৪ এর পরিবর্তে ৫+৩ এর বিভাগে ভাগ করলেই কথার স্বাভাবিক ছন্দ মেলডিতেও অক্ষুণ্ণ থাকবে। ডক্টর রেন্‌শ ছন্দ সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা আরো উদার করে নেবার আবেদন জানালে তাঁরা দেখতে পান যে চার বীট্ অন্তর বার্ লাইনের (bar line) আরেকটি লোকগীতিতেও ৭+৯—১৬ মাত্রার পরেই পুনরাবৃত্ত স্ট্রেস্ পাওয়া গেল।

পশ্চিমী সঙ্গীতে ত্রিতালের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়োগের আরো কয়েকটি দৃষ্টান্তের পর অধ্যাপক খাঁসাহেব দাদ্‌রা তালে গেলেন। এই তালেও তিনি অনেকগুলি গৎ বাজিয়ে শোনান, কতকগুলি সাধারণ তালে, কতকগুলি ছন্দে।

ডক্টর রেন্‌শ অতঃপর দেখান যে সিংকোপেশনের বিরোধী অসমমাত্রিক তাল বার্ প্রতি চার মাত্রার সুরে যেমন, তেমনই স্বাভাবিক টার্নারি (ternary) টাইম্ সিগনেচারের কোনো একটিতে বাঁধা সুরেও সহজলভ্য। তিনি বলেন, "এটা যে শুধু লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সত্য, তা নয়; পশ্চিমী সঙ্গীতের বিকাশের প্রতি পর্বেই এর দৃষ্টান্ত আছে, আদিমতম measured সঙ্গীত থেকেই এর হদিস মেলে।" উদাহরণত, আদিমতম কমিক অপেরা Adam de la Halle-এর ত্রয়োদশ শতকের 'Le Jeu de Robin et Marion'-এর নায়িকার গান, এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে জনসাধারণ ও সুরকারদের মধ্যে জনপ্রিয়

'L'homme arme' গানটি ট্রিপ্‌ল্ টাইম্-এ বাঁধা; কিন্তু কথাগুলির স্বর-ন্যাসে (accentuation) বার্ লাইনের তিন মাত্রার তালের পরিবর্তে অসম-মাত্রিক তালেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

কথাগুলির স্বরন্যাসে গানের তালের সংকেত পাওয়া যায় বলেই যে এই বৈশিষ্ট্যটি কেবলমাত্র কণ্ঠসঙ্গীতেরই অঙ্গ, তা-ও নয়। যন্ত্রসঙ্গীতকারদের কাছে সুপরিচিত ব্রাহ্‌ম্‌স্-এর অত্যন্ত প্রিয় এবং বাখ্ ও হাণ্ডেল্-এর ইনস্ট্রুমেন্টাল স্যুইট্-এর উল্লেখ্য ক্যাডেন্‌শিয়াল রীতি তিন-দুই ক্রস্-রিদম্ এই বৈশিষ্ট্যেরই সরলতম রূপ। এই রীতিটিকে প্রচলিত বিধির ব্যতিক্রম এবং সেই কারণে কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞদের চিন্তার বিষয় ও বিশেষ ঢঙ বা বিশেষ কালের অঙ্গ বলে ধরে নেবার কোনো কারণ আছে কি? কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের রাজ্যে এর সরল ও জটিলতর রূপের খোঁজ করা যাক না।

একথা তো সকলেই মানেন যে, নিতান্তই সাধারণ সুরকারদের মেলডি ও হারমনির চেয়ে পাশ্চমী সঙ্গীতের মহান্ স্রষ্টাদের মেলডি ও হারমনি অনেক সূক্ষ্ম, অনেক জটিল, অনেক সুসংবদ্ধ। কিন্তু তাঁদের তালের বেলায়? তাঁদের তাল কি সত্যিই অত সহজ, না, আমরাই বিভ্রান্ত হয়ে গেছি? মেলডি ও হারমনির মহত্তর কলানৈপুণ্যেই যদি সঙ্গীতের জগতের টম্-ডিক্-হ্যারি-দের ওপরে মহৎ শিল্পীদের স্থান নিরূপিত হয়, তবে সেই যুক্তিতেই কি বলা চলে না যে, সঙ্গীতগুণীদের তালও মিলিটারী মার্চ ও টি-টাইম্ মিউজিকের স্তরের অনেক ওপরে?

ছাপার হরফে বাঁধাধরা টাইম্ সিগ্‌নেচার ও বার্-লাইনে যা দেখি, কোনো রচনার তালের সমগ্র সত্য তারই মধ্যে নিহিত আছে, সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকেই বহু পশ্চিমী শ্রোতা দীর্ঘকাল ধরে তালকে সিমেট্রি-র নামান্তর ভেবে এসেছেন, তালের অন্য কোনো অর্থই ধরতে পারেননি। দীর্ঘকালের সেই ভ্রান্তির চাপে এঁদের কান নষ্ট হয়ে গেছে। এঁরা প্রায়ই সব সঙ্গীতকে জোর করে একই প্রচলিত তালে ফেলতে চান। এঁরা ভুলে যান যে, 'কর্নেল বোগী' বা 'ওয়াল্টজিং ম্যাটিলডা'-র একঘেয়ে বৈশিষ্ট্যহীন টাইম স্কীম সূক্ষ্ম অনুভবের স্পর্শে রচিত মহৎ কীর্তির ঐতিহ্যবহ তালের ওপর চাপিয়ে দিলে, তাল মারা পড়ে।

পশ্চিমী সঙ্গীতের অধ্যয়নে সচরাচর তালের যে সব নীতি প্রয়োগ করা হয়, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রয়োগবিধির আলোকে তাদের পূর্ণ মূল্যায়নে প্রবৃত্ত

হয়ে ডক্টর রেন্শ তাঁর ছাত্রদের বোঝাতে সমর্থ হন যে, অসমমাত্রিক তাল আমাদের সঙ্গীতে ক্ষণে ক্ষণে সহসা আবির্ভূত হয় নি, আমাদের সঙ্গীতে চিরকালই তার স্থান আছে। গুরুত্ব বিবেচনায় পশ্চিমী সঙ্গীতের সামগ্রিক চিত্রে অসমমাত্রিক তাল সমমাত্রিক তালের এতাবৎকাল প্রাপ্ত স্বীকৃতি দাবি করতে পারে।

ডক্টর রেন্শ মনে করেন যে, কাফী, ভৈরবী ও কল্যাণ ঠাট, অর্থাৎ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রো, মি ও ফা মোড্-এর গভীরতর অনুশীলনে আমাদের মধ্যযুগীয় ও রেনাইসান্স্ পর্বের সঙ্গীতের গভীরতর জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে। সহস্রাধিক বৎসরকাল ধরে প্রচলিত ঐ মোড্গুলির মধ্যে ধর্মীয় ও অনাধ্যাত্মিক সঙ্গীতের বিরাট সম্পদ নিহিত আছে - এই সঙ্গীতের এক বিরাট অংশ শুদ্ধ unharmonized মেলডি-রূপে বর্তমান—এবং এর অস্তিত্বের কথা খুব অল্পসংখ্যক পশ্চিমী সঙ্গীতকারই জানেন। তিনি বলেন, "সপ্তদশ শতাব্দীতে মেজর ও মাইনর স্কেলের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই মোড্গুলি লুপ্ত হয়ে যায় নি; কিন্তু সাধারণ শ্রোতারা এগুলি সম্পর্কে এত কম জানেন যে বাখ্ ও রাভেল্-এর মতো পরিচিত সুরকারের রচনা কিংবা লোকসঙ্গীতে এদের সাক্ষাৎ পেলেও এঁরা ধরতেই পারেন না, এদের প্রাপ্য সম্মানটুকুও দিতে পারেন না।"

এবার ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ স্থির করলেন যে, এতক্ষণ ধরে তাঁর বাজানো গৎ শুনে ছাত্রেরা বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছেন; এবার তাঁদের কাছে আলাপ বোঝাতে হবে। প্রধানত রিদমিক ও measured সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত পশ্চিমী সঙ্গীতকারদের কাছে গৎ-এর চেয়ে আলাপ দুর্বোধ্য বলে মনে হয়, কারণ এতে রিদমিক বন্ধ ও তাল, উভয়ই অনুপস্থিত।

গৎগুলির সাহায্যে তাঁরা যে জ্ঞানলাভ করেছেন, সেই জ্ঞানের পথ ধরেই বিমূর্ততর আলাপের দিকে এগোতে হবে—এই ইঙ্গিত দিয়ে তিনি অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের ধীর ক্রমবিকাশের পরিচয় দিলেন; এতে টেসিটুরা-(tessitura)-র বিশেষ ভূমিকা আছে। জোড়-এর স্বভাবজ রিদ্মিক পজ্ (rhythmic pause)-এর পর তিনি বিলম্বিত লয়ে রাগের সমগ্র চরিত্রটি প্রকাশ করলেন—এর মধ্যে তিনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ odd-note combinations, দীর্ঘ লহরী বা ট্রেমোলো-র কাজ প্রভৃতি নানা কলাকৌশলও পরিবেশন

করেন। শেষে ঝালার দ্রুত লয় ও প্লাকিং (plucking)-এর আশ্চর্য বৈচিত্র্যে শুণিবর তাঁর আলাপ শেষ করলেন। শ্রোতাদের মনে কোনো সন্দেহই রইল না যে, থীম্ বা তালের অন্তরায়হীন আলাপই রাগের অন্তরতম আত্মস্বরূপ।

কাফী, ভৈরবী ও কল্যাণ ঠাটের বিভিন্ন রাগের আলাপ সারা হলে, মহাপুরুষ মিশ্র একক তবলা বাদনের রীতিবদ্ধ, অসাধারণ ও স্মরণীয় এক দৃষ্টান্ত পরিবেশন করেন। বোল, টুকরা, রেলা, পুরণ প্রভৃতি বৈচিত্র্যের লয় বিলম্বিত করে তিনি অসীম ধৈর্যে বারবার ত্রিতালের ঠেকায় ফিরে এসেছেন। ফলে, ব্ল্যাক-বোর্ডে বোল পড়ে ছাত্রেরা ক্রমে ক্রমে তাঁর দ্রুততর বাদনও বুঝতে পেরেছেন। তারপর অর্ধেক স্পীড্-এ তিনি ঐ একই ধারাক্রমে বাজিয়ে শুনিয়েছেন, পরে পুরো স্পীড্-এ সবকটি বৈচিত্র্য (variation) বারবার বাজিয়েছেন। মেজাজের মাথায় তিনি আরো নতুন নতুন বৈচিত্র্য বাজিয়ে শুনিয়েছেন। ডক্টর রেন্‌শ-র অনুরোধে, তিনি দ্রুততর লয়ে সবকটি বোল আবৃত্তি করতে করতে বাজিয়ে গেছেন—একটি বোলও বদলে যায় নি। এতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে তাঁর আঙুলের কাজে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, তাঁর মন সবসময়েই সমান সতর্ক। তাঁর তবলা বাদনের শেষে বিপুল অভিনন্দনধ্বনির জবাবে, ভারতীয় তবলাবাদনের কলানৈপুণ্যের কিছু পরিচয় দিতে পারার আনন্দে তিনিও মৃদুহাস্য করেন।

রূপকতাল, ঝাঁপতাল এবং বার্টক, লাভিনো ও বাখ্-এর রচনা থেকে ৭ ও ১০ মাত্রার পশ্চিমী উদাহরণ নিয়ে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর অধ্যাপক খাঁ সাহেব আরেক নতুন অধ্যায় খুলে ধরলেন। পূর্বে আলোচিত কল্যাণ ঠাটের সঙ্গে ভৈরোঁ ঠাটকে (এই ঠাটের মাইনর সেকণ্ড্ ও মেজর থার্ড-এ এমন এক ক্রোমেটিক ইণ্টারভাল আছে যার তুলনা পাশ্চাত্য সঙ্গীতে সচরাচর প্রাপ্ত স্বরগ্রামে নেই) যুক্ত করে তিনি বললেন যে, বিশেষ বিশেষ ঋতুর সঙ্গে কিংবা বিশেষ প্রহরের সঙ্গে রাগবিশেষের যোগ দীর্ঘকালের প্রয়োগের অভ্যাসে বাঁধা সুনিশ্চিত স্বরের ওপর প্রতিষ্ঠিত—এটা শুধু সঙ্গীতের কথা নয়, সময়ের সমগ্র চরিত্র জুড়েই তা আছে।

এই সূত্রে ডক্টর রেন্‌শ বললেন যে, ডিসেম্বরে মাদ্রাজ ও বেথ্‌লিহেমের আবহাওয়া সম্ভবত একই রকম ; তবু, ক্যানাডার বরফ ও এভারগ্রীনের সঙ্গে পরিচিত বলেই মাদ্রাজের সেই আসল নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশে ২৫শে

ডিলেষর তাঁর কাছে কিছুতেই বড়দিন বলে মনে হয় না। আরো ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, অনুষঙ্গের এমনই গুণ যে সর্বকালীন মহত্ত্বের আস্বাদে ধন্য হলেও বড়দিনের মরশুমের সঙ্গে জড়িত হ্যাণ্ডেল্-এর 'মেসাইয়া' মধ্যগ্রীষ্মে বিসদৃশ ঠেকবে। ডব্যেয়র্-এর 'সেরেনেড' কেবলমাত্র তার কথার খাতিরেই, আর মোৎসার্ট্-এর 'আইনে ক্লাইনে নাখ্ট্মুযিক্' কেবল নাম মাহাত্ম্যেই 'নৈশ সঙ্গীত' বলে বিবেচিত। ঐ একই সুর অন্য গানের কথায় বসালে ডব্যেয়র্-এর গান হয়তো 'ওবাদ্' হয়ে দাঁড়াত; মোৎসার্ট্-এর স্যুইট্-এর অন্য নাম হলে হয়তো স্বচ্ছন্দে সকালের গান বলে তরে যেত।

গুণিবর তখন বলেন যে, উত্তরভারতীয় সঙ্গীতে গানের বিশেষ সময়টি কথা বা নামমাহাত্ম্যে নির্ণীত হয় না; সেখানে কেবল সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যই বিবেচিত হয়। উদাহরণত, দিনের শুরুর দিকে রাগগুলি দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ স্বরের ওপর জোর দেয়, পরের দিকে তৃতীয় ও সপ্তম স্বরের ওপর জোর দেয়, এইভাবেই চলে। এ নিয়মের অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে; অনেকগুলি রাগ সাঙ্গীতিক বৈচিত্র্যের প্রয়োজনেই সব সময়ের পক্ষেই উপযোগী। তিনি অবশ্য মেনে নেন যে, উত্তর ভারতে গানের কালোপযোগিতার প্রশ্ন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, দক্ষিণে ততটা নয়। তথাপি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে শিল্পী ও শ্রোতাদের অধিকাংশই এই দস্তুরে এত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন যে তাঁদের কাছে এই রীতি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

আমরা তো একেবারে অন্য দস্তুরে অভ্যস্ত; আমরা তাই অনেকেই ভেবেছিলাম যে এই তর্কের যে প্রমাণ তিনি দাখিল করবেন তার তত্ত্বগত আবেদনটুকুই সার হবে। তিনি বাজালেন যোগিয়া কালাংড়া। তখন ঘড়ির কাঁটা বারোটায় পৌঁছয়; কিন্তু তাঁর হাতের ছোঁয়া এত সংবেদনশীল যে আমরা প্রভাতবেলার অনুভূতি পেলাম। একটু পরেই তীব্র উজ্জ্বল রোদের মধ্যেই আমরা তাঁর শ্রী রাগের প্রগাঢ় রূপায়ণে গভীর রাত্রের রহস্য অনুভব করলাম। গুণিবর তাঁর শ্রোতাদের ওপর এমন এক ঘোর ছড়িয়ে দিলেন যে স্বয়ং ওয়র্ড্স্ওয়র্থ্-ও অপ্রত্যয়ের স্বেচ্ছাকৃত প্রত্যাহারের ততোধিক দাবি জানাতে পারতেন না।

একতাল ও চৌতাল, বারো মাত্রার এই দুটি তালে গৎ বাজিয়ে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ দেখান যে, পূরবী, মারওয়া, টোড়ী, ললিত প্রভৃতি ক্রোমেটিক ঠাটের অনেক রাগ, যেমন মালী, গৌড় ও গুর্জরী-টোড়ী, টোনিক্

ও ডমিনান্ট্ স্বরে দ্বৈত আপোজিওটুর (appogiature)-এর বিশিষ্ট প্রয়োগ ব্যবহার করে। যে স্বর দুটি এই আপোজিওটুর-এর জনক, তাদের পাশাপাশি সমান বিশিষ্টতায় না থেকে ডো-ও সোল্, অর্থাৎ সা ও পা, কিংবা ওদেরই কোনো একটির ওপরে ও নিচে দুটি অনুস্বর প্রায়ই পশ্চাদ্ভূমিতে অনেক পেছনে চলে যায়।

আবার পুরনো আলোচনায় ফিরে এসে অধ্যাপক খাঁ সাহেব ক্রিংতান ও গমকের কথা তুলে (এখানেও শ্রুতির পরিচয় পাওয়া যায়) বলেন যে, সুবেশী ভারতীয় রমণীর পক্ষে গহনা যেমন প্রয়োজন, কুপের‍্যা ও অন্যান্য অষ্টাদশ শতকীয় সুরকারদের কাছে অলঙ্করণ যেমন অপরিহরণীয় (এঁরা অঙ্গীগতভাবে এবং সজ্জাকল্পে, এই উভয় উদ্দেশ্যের সমাহারে অলঙ্করণ ব্যবহার করেছেন), ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এরা ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। এতে আরো একবার প্রমাণ পাওয়া গেল যে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য রীতির পার্থক্য প্রায়শই পরিমাণগত মাত্র। শুর্ণিবর অতঃপর মালকোষের মতো সরল পঞ্চস্বর রাগ থেকে শুরু করে গৌরী-মঞ্জরী ও সিন্ধু-ভৈরবীর মতো জটিল এগারো ও বারো স্বরের রাগ অবধি বিস্তৃত একটি রাগমালায় আলোচনার সমগ্র চৌহদ্দি পরিক্রমণ করেন। এই রাগমালায় ব্যবহৃত একটি ফরাসী-ক্যানেডীয় লোকসুরের গৎ-এ পূর্ব-পশ্চিমী রসের আমেজ পাওয়া গেল। অধ্যাপক খাঁ এবিষয়ে ডক্টর য়েন্‌শ-র সঙ্গে একমত যে, রাগমালা ভারতীয় শ্রোতাদের পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কিছু কিছু মৌলিক গুণের গভীরতর অর্থগ্রহণে সহায়ক হতে পারে। তাঁরা আশা রাখেন যে ম্যাক্গিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্ম শিক্ষাক্রমে সাফল্যমণ্ডিত 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য নন্দনতত্ত্ব'-র অনুরূপ এক পরীক্ষার আয়োজন তাঁরা ভারতেও কোনো একদিন করে উঠতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম শুরু হয়েছিল বিলাবল্ ঠাটের আলোচনায়; সবশেষে রাগের কথা। এক্ষেত্রেও রাগের সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় ও পশ্চিমী সঙ্গীতকারেরা নিজেদের আরো কাছাকাছি মনে করলেন। ভাগ্‌নারের অপেরার কাহিনী না জেনেও ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সহজেই 'ডাই মাইস্টারসিঙ্গার'-এর ঔদার্চার্য এবং 'ট্রিস্টান উণ্ড্ ইজোলডে'-র প্রিলিউডের মেজাজের পার্থক্য অনুভব করতে পারেন। বীঠোফেন্-এর সপ্তম সিম্ফনির শুরুর মুভমেন্ট মেজর কী-তে এবং নবম সিম্ফনির শুরুর মুভমেন্ট মাইনর কী-তে, একথা তাঁকে না বলা হলেও তিনি

সঙ্গে সঙ্গে দুটি রচনার বিশেষ মেজাজ ধরতে পারেন। মোড-এর বৈপরিত্যও যেখানে নেই, সেখানেও, জে. এস্. বাখ্-এর 'ওয়েল্-টেম্পার্‌ড ক্লেভিয়ার'-এর একাদশ মুড-এর ডি মেজর প্রিলিউড ও বি ফ্ল্যাট মেজর ফিউগ্-এর বিপরীত চরিত্রও তিনি ধরতে পারেন।

একইভাবে ছাত্রেরাও শুদ্ধভৈরবী রাগের আশাহীন বিষাদ অনুভব করতে পারেন, যেমন স্পষ্টভাবে তাঁরা পারেন বীঠোভেন্-এর তৃতীয় সিমফনির স্লো মুভমেন্ট ফিউনেরাল মার্চে; রূপ অপরিবর্তিত থাকলেও তাঁরা ভক্তি রসের অনুভূতি লাভ করেন, যে অনুভূতি তাঁরা পান প্যালেস্ট্রিনা মোটেট্‌স্-এ। অধ্যাপক খাঁ বলেন, ধ্রুপদী সঙ্গীতে উপস্থিত থাকলেও শৃঙ্গার রস ঠুংরী অঙ্গেরই প্রাণস্বরূপ। এই রসের উদাহরণে তিনি শুদ্ধ ঈ স্কেলের পরিবর্তে আরো ক্রোমেটিক সিন্ধু ভৈরবী রাগ ব্যবহার করেন; ছাত্রেরা এর মধ্যে শুবোয়ের-এর 'মোমেন্টস্ মিউজিকো' ও শোপ্যাঁ-র বহু 'নক্টার্ন'-এর রোমান্টিক স্পর্শ শুনতে পান। সব শেষে চোদ্দ মাত্রার ধামার তালে নিবদ্ধ গুজরী টোড়ী রাগের স্তম্ভিত করে দেওয়া পরিবেশনায় ছাত্ররা বীর রসের স্পষ্ট আস্বাদ পান; যে আস্বাদ তাঁরা পেয়েছেন ভের্দি-র 'আইডা'-র ভিক্টরি হিম-এ। যে বাখ্-এর কীর্তি পশ্চিমী সঙ্গীতের বেদগ্রন্থ স্বরূপ, সেই বাখ্-এর রচনায় এবং লা ফুন ও মোৎসার্ট-এর রচনায় ডক্টর রেন্‌শ চোদ্দ মাত্রার তালের দৃষ্টান্ত দেখান। অতঃপর গুরু ও ছাত্রেরা ভারতীয় ও পশ্চিমী সঙ্গীতের নানা রসের উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করেন।

ক্যানেডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ও ক্যানাডার ন্যাশনাল ফিল্ম বোর্ডের কর্তৃস্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দসহ সঙ্গীতজগতের অনেক গণ্যমান্য অতিথিই পর্যবেক্ষক হিসেবে শিক্ষাক্রমের কোনো কোনো অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রাচ্য-প্রতীচ্য নন্দনতত্ত্ব শিক্ষাক্রমের শেষ অধিবেশনে ইউনেস্কোর ক্যানেডীয় জাতীয় কমিশনের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী এ. পারাডিস্‌কে সাদর আমন্ত্রণ জানান।

ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠান এই অধিবেশনের আকর্ষণ। এই পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানটি অধিকাংশ সিম্ফনি বা কনসার্টো-র চেয়ে বেশি সময় নেয়। তবু যে মনোযোগী শ্রোতারা সযত্ন-বিকশিত আলাপ ও সুসংবদ্ধ গৎগুলির প্রতি পর্ব অনুধাবন করেছেন, দীর্ঘকাল তাঁদের কাছে দীর্ঘ বোধ হয় নি। সেই সঙ্গীত মনকে এমনভাবে বেঁধে রাখে, তার সমাপ্তি এমন অভিভূত

করে যে আঙুলের শেষ কাজটি শেষ হতে না হতে সকলে দাঁড়িয়ে উঠে শিল্পী ও তাঁর সহতিয়াকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন।

দীর্ঘক্ষণ ধরে স্পন্দিত সেই অভিনন্দনধ্বনি শান্ত হলে ইউনেস্কোর প্রতিনিধির চোখ দুটি অনুষ্ঠানের আশ্চর্য সার্থকতায় আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এটিকে "দেবদর্শন"স্বরূপ বলে বর্ণনা করে তিনি বলেন যে, তোতনাস্তিক ভাষণের মামুলি মন্তব্য বিনিময় এখানে ঘটে নি; এখানে পূর্ব-পশ্চিমের যে গভীর মিলন রচিত হয়েছে, তার মূল্য চিরকালীন, সরকারী তরফের স্বীকৃতি ও উৎসাহও তার প্রাপ্য।

যে বিদায়ী ভোজে গ্রীষ্ম শিক্ষাক্রমের সমাপ্তি ঘটল, সেখানে ছাত্রেরা ভারতের বহুশতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি, ওস্তাদজীর বহুমানভাজন পিতৃদেব পদ্মভূষণ ডক্টর আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের প্রতিভা, এবং তাঁর পুত্রের অনন্যসাধারণ সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। যে গভীর শ্রদ্ধা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তারই চিহ্নস্বরূপ তাঁরা গুণিবরকে, তাঁর সহতিয়াকে এবং ডক্টর রেন্‌শ-কে ধর্মীয় স্মারক চিহ্ন উপহার দেন।

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার উত্তরে অধ্যাপক খাঁ তাঁদের এই মর্মে উপদেশ দেন যে, তাঁরা যা শিখলেন তার চর্চা যেন অব্যাহত রাখেন। সেই শিক্ষা যেন তাঁদের ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, "আপনারা যদি আপনাদের দায়িত্বের অংশ পালন করেন, তবে দেখবেন, আমরা এই গ্রীষ্মে যে বীজ বপণ করলাম, সেই বীজ কালে কুসুমিত হয়ে উঠবে, সারা বিশ্ব জুড়ে তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেবে, শত শত বর্ষ ধরে তা বেঁচে থাকবে।" তাঁদের আরো একবার ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, "আর যা বলার ছিল সবই তো সুরের মধ্যেই বলে দিয়েছি।" তাঁর সঙ্গীত সম্পর্কে এর চেয়ে বড় আর কোনো সত্য নেই। তাঁর সঙ্গীত এক হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে অন্যদের হৃদয়ের গভীরে গিয়ে পৌঁছেচে, অতুল বাঙ্ময় এক ভাষায় প্রকাশ করেছে যে আমরা সকলে একই মানব পরিবারের সভ্য।

ভারতের কাছ থেকে যে প্রসাদধন্য শৈল্পিক ও মানবিক অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন, এই সহৃদয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতার অংশ বিনিময়ের সুযোগলাভে আনন্দ প্রকাশ করে ডক্টর রেন্‌শ বলেন যে, যাত্রী যখন বিদেশ থেকে ফিরে আসে, তখন সে স্বদেশকেই আরো ভালো করে চেনে, এ কথা তো সর্বজনীন সত্য। তাই, তাঁর মনে হয়, ভারতের সঙ্গীতের বিশাল প্রান্তরে

ছাত্রেরা যে ক্ষণকালের সঙ্গের সুযোগ পেয়েছেন, তার ফলে সেই সঙ্গীতরীতি যখন তাঁরা আরো ভালোভাবে বুঝবেন, তখন পাশ্চাত্যের সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁদের বোধ প্রসারিত হবে, গভীরতর হবে। শ্রীমতী রেন্‌শ তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন, "যে মন ভাবে, আর যে হৃদয় অনুভব করে, তারা তো মানুষেরই; পূবে পশ্চিমে তারা তো একই।"

পরিশেষে, মণ্ট্রীল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত পরিবারের প্রত্যেকের আশাকে বাণী রূপ দিয়ে ডক্টর রেন্‌শ ওস্তাদ আলী আকবর খাঁকে বল্লেন, "আবার আসবেন, অচিরে আসবেন, বারবার আসবেন।"

মণ্ট্রীল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব মিউজিকের ডীন রেজিনাল্ড হ্রীসেন্ট মোরিস লিখিত এই বিবরণমূলক নিবন্ধটির বাংলা ভাষান্তর করেছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক।

জাকোমো লেওপার্দি : সাহিত্য জিজ্ঞাসা

অমল হালদার

ইতালীয় কবি জাকোমো লেওপার্দিকে তাঁর স্বদেশবাসী স্থান দেয় মহাকবি দান্তের পরেই। লেওপার্দি প্রধানত নির্জনতা ও নৈরাশ্যের কবি। কিন্তু এমন কবিতা শুধু ইতালীয় সাহিত্যে কেন পৃথিবীর সাহিত্যেও কম্ আছে।

নৈরাশ্যপ্রিয় লেওপার্দির কবিতা জগৎপ্রিয় ইতালিবাসী ধর্মীয়-শ্রদ্ধা নিয়ে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে এটা বিরোধ মনে হলেও এই শ্রদ্ধার কারণ আছে। স্বদেশবাসীর কাছে তিনি শুধু নৈরাশ্যবাদীই নন, তিনি স্বদেশ-প্রেমেরও জলন্ত প্রতিমূর্তি। তাঁর কাব্য-সাধনা সেই সময়ে যখন খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ইতালী শুধু একটি ভৌগোলিক নাম মাত্র, যখন সে জাতীয় ঐক্যের জন্যে পাগল, যখন ইতালির ভাবনেতা মাৎসিনির নেতৃত্বে সংগ্রামীদল দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্রোহ প্রচার করে বেড়াচ্ছে, যখন ১৮৩০-এর ফরাসী বিপ্লবের বৈদ্যুতিক প্রবাহে সমগ্র দেশ আত্মচেতনায় জেগে উঠেছে। সেই আবেগ-বহ্নির ইন্ধন জুগিয়েছেন লেওপার্দি। 'ইল রিসর্জিমেন্তো' (জাগরণ) 'আল ইতালীয়া' (ইতালীর প্রতি) প্রভৃতি তাঁর কবিতা ছিল ইতালীয় মুক্তি-সংগ্রামের 'বন্দেমাতরম্'। তাই বঙ্কিমকে আমরা যেমন জাতীয়তাবাদের দীক্ষাগুরু বলে জানি, ইতালীয়দের কাছে লেওপার্দিও তেমনি এক শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। যেমন দান্তের কাব্য। 'দিভিনা কম্মেদিয়া' শুধু স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের রহস্যময় বিবরণই নয়, ইতালীয়দের জাতীয় চেতনায়ও উদ্বুদ্ধ করেছে এই মহৎ কাব্য। এইখানেই দান্তের সঙ্গে লেওপার্দির মিল।

কিন্তু অমিলও অনেক। সেটা জগতের চোখে। চরম একটা নৈরাশ্যবাদ, জীবনের প্রতি এক গভীর বেদনাবোধের জন্য লেওপার্দি পৃথিবীর কাছে পরিচিত। নিয়তির অমোঘ প্রভাবে জীবনের যে একটি নিদারুণ ট্র্যাজেডি আছে, তারই রূপ তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়ে চিরদিন মানবমন আকৃষ্ট করেছে।

ইতিহাসে ট্র্যাজিক কবি অনেক আছেন, কিন্তু লেওপার্দির মতো জীবনভরা

ট্র্যাজেডি অমই দেখা গেছে। প্রথম জীবনে বিকলাঙ্গের লজ্জার সঙ্গে যখন এসে মিলল অত্যধিক পড়াশুনোয় চোখ অন্ধপ্রায় হয়ে যাওয়ার হতাশা ও যন্ত্রণা, তখন থেকেই এই ট্র্যাজেডির শুরু। গৃহের অশান্তি আর ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় তার পরিপুষ্টি। নিঃসঙ্গ মৃত্যুতে এর করুণ পরিসমাপ্তি। মাত্র উনচল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন লেওপার্দি (১৭৯৮—১৮৩৭)। বালক বয়েসের অজ্ঞানতা পেরিয়ে স্বস্তি পান নি কোনোদিন। ভগ্ন দেহে, ভগ্ন মনে ইতালির এধার থেকে ওধারে ঘুরে বেড়িয়েছেন অতৃপ্ত আত্মার মতো। দেখেছেন জীবনের সম্ভাবনা, পৃথিবীর সৌন্দর্য; আবার দেখেছেন জীবন ও পৃথিবী কত অনিত্য। তখন মৃত্যুকে কামনা করেছেন বারবার। করেছেন মুক্তির জন্য। তাঁর কাব্যে তাই শুধু নৈরাশ্য নয়, এক ধরণের উপলব্ধির গাম্ভীর্যও আছে।

এ নৈরাশ্য অনেকটা আদর্শগতও। পুণ্য, ন্যায়, প্রেম, সুখের যে আদর্শ তাঁর মনে ধ্রুবতারার মতো স্থির ছিল, বাস্তব জীবনে তাদের দেখলেন কক্ষচ্যুত। দেখলেন মূল্য নেই সে আদর্শের, তা শুধু কল্পনার প্রতারণা, করুণ মরীচিকা। আদর্শের জয় এ জীবনে নয়, দুঃখ তাই অনিবার্য। ফলে নৈরাশ্যই অমোঘ দর্শন। ভগবান কি আছেন? বলি কি করে। প্রকৃতি? তার ছায়ায়, তার সৌন্দর্যে কি শান্তি আছে? তাই বা কি করে বলি? মানুষের সুখে দুঃখে যার প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই, সে তাকে সান্ত্বনা দেবে কি করে? এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড যার রঙ্গমঞ্চ, সেখানে মানুষ কি? ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যার কাজ, তার কাছে ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র ট্র্যাজেডির প্রাপ্য কি? উপেক্ষা। তাই বাঁচার চেয়ে না বাঁচাতেই শান্তি।

১৮১৯ থেকে ১৮২১ পর্যন্ত লেওপার্দি যে সব কবিতা লেখেন তাতে এ-ধরণের চিন্তাই প্রবল। 'প্যাস্সেরো সলিতারিও' (নিঃসঙ্গ চড়ুই) 'লেরা দেল দী দি ফেস্তা' (উৎসব-সন্ধ্যা) প্রভৃতি কবিতায় তিনি ব্যক্তিগত বেদনার সঙ্গে মিলিয়েছেন বিরাট বিশ্বে দুঃখের অনন্ত প্রয়োজনীয়তাকে। আকাশে বাতাসে বসন্তের স্পর্শ। উপত্যকায় অখণ্ড সংহতি। শূন্যে পাক দিয়ে উড়ে বেড়ায় কত পাখি। দিক-বিদিক থেকে আসে কত কি ডাক। চারিদিকে উৎসব-চঞ্চলতা। এর মধ্যে একটি চড়ুই নিঃসঙ্গ। ঘুরে বেড়ায় একাকী। গান গায় যতক্ষণ না দিনের শেষ মুহূর্তটুকু পর্যন্ত মিলিয়ে যায় রাত্রির অন্ধকারে। আর নিজের মনে দূরের থেকে চেয়ে চেয়ে দেখে সব কিছু। বছরের ফুলের ঋতু ফুরিয়ে যায় গ্রীষ্মে, সেই সঙ্গে জীবনেরও। কবি বলছেন:

"ওগো পাখি, আমিও যে তোমার মতন!
প্রথম যৌবনের হাসি আমোদ
আর প্রেমের দীর্ঘ দাপানো দিনগুলি
কেমন যেন অপরিচিত।
আমি যেন দূরে সরে যাচ্ছি—অনেক দূরে…
স্তব্ধতার মধ্যে ভেসে আসে কিসের শব্দ…
উৎসবের পোষাক পরে
যৌবন আজ বেরিয়ে এসেছে বাইরে,
পথে-পথে আনন্দ-বাতাস
হৃদয়ে খুশির ধারাজল।
আমি শুধু একা।
বসে আছি এত দূরে নির্জন নিবিড়।
দূরে পাহাড়ের-কোলে সূর্য ডুবে যায়,
ডুবে যায় চোখের পাতায়,
বলে যায় যৌবন বিদায়।…"

'উৎসব-সন্ধ্যা'তেও পার্থিব অনিত্যতার জন্যে করুণ বিলাপ:

"থেমে গেছে পথে শ্রমিকের গান।
তোলপাড় করে কান্না তুফান
ফুরায় পৃথিবী, ফুরায় জীবন
রাখে না তো পদচিহ্ন;
কালের প্রবাহে ভেসে যায় যায়,
কোনো কিছু নয় ভিন্ন।"

'উলতি-মো-কাস্তো দি সাক্যো' (সাক্যোর শেষ গান) কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন প্রতিকূল শক্তির প্রভাবে পুণ্যের আদর্শ কিভাবে পর্যুদস্ত। প্রকৃতি সুন্দরী কিন্তু নির্দয়া। মানুষকে দূরে রাখতে চায় ঠেলে। আর করতে চায় অপ্রতিরোধনীয় দুর্দশায় জর্জরিত। প্রকৃতির নেশাই যেন তাই।

"আমরা মরব।
ধরার ওপর থেকে সরে যাবে
অর্থহীন এই আবরণ

আত্মাকে নগ্ন করে দিয়ে চলে যাবে.
প্লুটোর প্রদেশে
উঁকি দেয় জরা ব্যাধি মৃত্যুর—
হিমশীতল ছায়া।
এত আশা, গৌরব আর আনন্দের
দু-চারটি ফুল;
তারি জন্যে এই প্রতিশোধ ?"

প্রতিশোধ ? আগে তাই মনে হতো বটে। কিন্তু এখন ? এখন মনে হয় মৃত্যু বুঝি মুক্তির দূত। এই জরা, এই ব্যাধি, এই অবশ্যম্ভাবী ট্র্যাজেডির হাত থেকে মুক্তি। লেওপার্দির কবিতার প্রথম দিকে দেখি মৃত্যু সেখানে ভয়দূতের মতো উপস্থিত। জীবনের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু প্রেয় নিষ্ঠুর হাতে তা ভেঙে ভেঙে দেওয়াই,যেন তার একমাত্র কাজ। কিন্তু শেষের দিকে, বিশেষ করে 'আমোরে এ মর্তে' (প্রেম ও মৃত্যু) কবিতায় এ ধারণা উল্টে গেছে। এখন জীবন প্রেয় নয়, জীবনের সৌকুমার্যকে যে প্রতিক্ষণে ধ্বংস করে দিচ্ছে, সেই মৃত্যুই এখন লেওপার্দির কাম্য। জীবন তাঁকে সার্থকতা দেয়নি, পৃথিবী তাঁকে শুধু লাঞ্ছিত করেছে। এখন তাই আশা, যদি মৃত্যুর মধ্যে এই অনন্ত বিপাক থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। একটি গদ্য রচনায় কবি বলেছেন: "সভ্য পৃথিবী তোমাকে চায়, ওগো মৃত্যু ! তুমি অসাধারণ। তোমার যে দান, সে তোমারই। নবীন উৎসাহের উষ্ণ প্রলেপ, নৈরাশ্যের হিমশীতল বেদনা, সে কি আর কেউ দিতে পারে ? পৃথিবী পাগল হয়ে খুঁজেছে নতুন সভ্যতার নির্দেশ, লক্ষ্য তার সর্বোৎকর্ষের দিকে। কিন্তু তুমি অচঞ্চল চিরস্থায়ী। তোমার জয় হোক !"

মৃত্যু সত্য। প্রেমও সত্য। এই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলার মধ্যে আনন্দের এই আয়োজন কেন ? ইচ্ছার আগুনে পুড়িয়ে মারবার জন্যে ? তা নয়। তবে ? আমাদের চোখে দু ফোঁটা জলের সমারোহ আনতে। বিদায়ের প্রতীক এই চোখের জল। চোখের জলেই আমরা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হই, উপলব্ধি করি মৃত্যুর সত্যতা। আর আমাদের মনের কোণে অলক্ষ্য উপস্থিতির মতো যে মৃত্যু চিন্তা রয়েছে, তারই গুণে আমাদের প্রেমে এত উত্তাপ, এত গভীরতা। এই উত্তাপ আর গভীরতাই তাকে সত্য করে তুলেছে। তাই মৃত্যু সত্য, প্রেমও।

প্রেম ও মৃত্যুর আগে 'আ সিলভিয়া' (সিলভিয়ার প্রতি) একটি পরম সুন্দর কবিতা। প্রেম ও মৃত্যুর সঙ্গে বিরোধ কবি কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি :

"ফুরিয়ে এসেছে আশা,
যৌবনের সুখস্বপ্ন
জাগো নাতো আর।
অশ্রুসিক্ত হে চাওয়া আমার,
তুমি কি গিয়েছ চলে?
এই বুঝি এ পৃথিবী?
এই সুখ, এই কাজ, এই প্রেম, এই ভালোবাসা?...
এই কি মানব-ভাগ্য?
সত্যের উদয় কালে তুমি চলে গেছ,
দূর থেকে দেখিয়েছ
একটি শীতল মৃত্যু আর—
একটি নগ্ন কবর।"

কিন্তু 'প্রেম ও মৃত্যু'তে আমরা দেখি ঠিক এর উল্টো ধারণা—

"আমার ভাবনা একে একে নিঃশেষ,
হৃদয় জুড়ে তোমার ভাবনা শুধু।
আছি সেদিনের প্রতীক্ষায়
যেদিন নিশ্চিন্ত মনে আমার ক্লান্ত মুখখানি
তোমার কুমারী বুকের গোপন আড়ালে
পড়বে ঘুমিয়ে।"

মৃত্যুর এই স্বীকৃতি নৈরাশ্যবাদীর শেষ অবলম্বন নয়। জীবন ও জগতের একটা উদ্দেশ্য খোঁজার প্রবল প্রয়োজন থেকে এর উৎপত্তি। লেওপার্দি জীবনের একটা অর্থ মৃত্যুর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু এও জেনেছিলেন, মৃত্যুর পরপার অনিশ্চিত। পার্থিব জীবন অনিত্য হলেও সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় মিলনে-বিরহে সমুজ্জ্বল। এর সঙ্গে যে তাঁর নাড়ির যোগ। একে কি ভোলা যায়? অন্তত যিনি কবি, দার্শনিক—নৈরাশ্যবাদী নন, তিনি কি ভুলতে পারেন? তাই আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যে দেখি, ঠিক পৃথিবী প্রীতি না হলেও পার্থিব জীবনের চিন্তায় একটা বেদনাময় আকুল ক্রন্দন।

'ইল ত্রামন্ত দেল্লা লুনা' (অস্তগামী চাঁদ) শেষ রাত্রির চাঁদের মতো একটা করুণ গাম্ভীর্যের রূপ পেয়েছে। এই কবিতার শেষ কটি লাইন তাঁর মৃত্যুর ছ ঘণ্টা আগে লেখা। তাই সে কটি লাইনের চিন্তাধারাকে আমরা শেষ নয় চরমতম অনুধ্যান বলেই ধরে নিতে পারি। তিনি বলেছেন :

"ওগো পাহাড়, ছোট পাহাড়
আর তুমি সমুদ্রের কূল।
নিভে গেছে সেই জ্যোতি পশ্চিম-আশায়
রাত্রির আঁধার পর্দা আলো করে দিয়েছিল যেবা।
অনাথ তোমরা তবু চেয়ো না বিশ্রাম।
আর তো কিছু পরে অন্য দিক পানে
আকাশ আলোয় সাদা, ফুটবে প্রভাত :
দিগন্তসীমায় পারে উঁকি দেবে রোদ,
তীব্র আগুনে তার প্রজ্বলিত হবে দশ দিক,
ভাসমান আলোকের প্রচণ্ড প্রবাহে
আকাশ বায়ুর যত ইথারীয় মাঠ।
কিন্তু মর এ জীবন, যৌবনের অবসানে হায়,
সে রঙে হবে না রাঙা, সে আলোকে নয়।
অন্তিম সময়বধি বিধবা যে চিরকাল তরে ;
রাত্রির আঁধার কালো, কারো জানি সীমা
কবরের অন্তহীন গুহার ভিতরে।"

তৎকালীন ইতালি ও তাঁর জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই লেওপার্দি বিচার্য। তাঁর জীবনবোধ ও হতাশা বিচার্য। এবং বাংলা ভাষায় প্রায় অপরিচিত এই কবির প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই লেওপার্দি সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতির অবতারণা।

কবিতাগুলি মূল ইতালীয়ান থেকে অনূদিত। লেওপার্দির কবিতা কোনো কোনো বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বর্তমান অনুবাদে মূল কবিতার স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য সর্বত্র রক্ষা করা যায় নি, একথা বলাই বাহুল্য—লেখক।

একটি রাজপথ : তমসায় ও আলোয়

অমল দাশগুপ্ত

শিল্পে ও সংস্কৃতিতে উন্নত মধ্য ইওরোপের একটি দেশের ইতিহাস একদা ঘন তমসায় লুপ্ত হয়েছিল। ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখটি ছিল বর্তমান যুগের এই চরমতম দুর্বিপাকের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা লাভের দিন। আডোল্ফ্-হিটলার এই দিনটিতেই জার্মানির চ্যান্সেলার হয়েছিলেন।

কিন্তু স্বয়ং ইতিহাসই যে এই দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে গোপনে অস্ত্র শানিয়েছিল তা সেদিন জানা যায় নি। জানার কোনো উপায়ও ছিল না। কারণ সেদিন এই দেশটির বিস্তৃত সীমান্তে কোথাও এমন একটি ছিদ্র ছিল না যা দিয়ে ইতিহাসের এই গোপন প্রস্তুতির খবর বাইরে এসে আশ্বাসের বাণী শোনাতে পারত।

তবুও এই দেশটির একটি রাজধানী ছিল যার নাম বার্লিন। বার্লিনের শ্রমিক-এলাকায় একটি রাস্তা ছিল যার নাম ভালষ্টাস্সে। এই রাস্তাতেই আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে—১৯৩৩ সালের ২২শে জানুয়ারি তারিখে—পঞ্চাশ হাজার পুলিশের পাহারায় নাৎসী আয়োজিত একটি মিছিল বেরিয়েছিল। এই ছিল কৃষ্ণ-যবনিকার সূত্রপাত। মিছিলের সদম্ভ হুঙ্কার ভালষ্টাস্সের টুঁটি টিপে ধরতে চেয়েছিল আর রাস্তার দু-পাশের বন্ধ জানলার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে ভালষ্টাস্সের জীবন কোনো রকমে অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল মাত্র। তারপরে ২৫শে জানুয়ারি তারিখে এই রাস্তাতেই আবার শোনা গিয়েছিল আর একটি মিছিলের পদধ্বনি। আর শোনা গিয়েছিল একটি গানের সুর, যে গান সারা পৃথিবীর শ্রমিকের। এই গানের সুর জানলায় জমে থাকা তুষারকে গলিয়ে দিয়েছিল আর ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল ভালষ্টাস্সের মানুষ। পুলিশের শাসানি এই মিছিলের গতিরোধ করতে পারে নি। জার্মানির ইতিহাসে এই ছিল শেষ আলোর দীপ্ত

রেখাপাত। তারপরে পুরো বারোটি বছর, অর্থাৎ একটি যুগ, জার্মানির ইতিহাস কালো অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছিল।

তবে ভালস্ট্রাসেনের সৌভাগ্য এই যে ধুলোয় আঁকা লক্ষ পদচিহ্ন মুছে যাবার পরেও একজন যুগচেতনাসম্পন্ন সাহিত্যিকের গোপন ও দুঃসাহসিক প্রয়াস রাত্রির অন্ধকারে অতন্দ্র থেকেছে। ফলে, ভালস্ট্রাসেকে ঘিরে আঠারো মাস ধরে যে সর্বগ্রাসী ঘটনার আবর্ত জেগেছিল, তা চিরকালের মতো হারিয়ে যায় নি, অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে নতুন দিনের আলোয় স্নাত হয়ে আমাদের হাতে পৌঁছেচে। এই সাহিত্যিকের নাম জান্ পেট্যারসেন, যাঁর সাহিত্যকৃতি বর্তমান গণতান্ত্রিক জার্মানিতে নানা পদকে ও সম্মানে উচ্চকণ্ঠে স্বীকৃত। ন' বছর ধরে তিনি ছিলেন এই রাস্তারই মানুষ এবং ফ্যাশিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এই আন্দোলনের যতটুকু অংশ ধরা পড়েছিল তাই নিয়েই তিনি ফ্রন্ট লাইনের সৈনিকের মতো নির্মম সরলতায় ও প্রায় রোজনামচার ভঙ্গিতে এক অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তবে স্বভাবতই সব কিছু খোলাখুলি লিখতে পারেন নি। প্রতিটি লাইনে সতর্কতার প্রলেপ দিতে হয়েছিল যেন গেস্টাপোর নৃশংস থাবা কোনোক্রমে লাইনটিকে নাগালের মধ্যে পেলেও আয়ত্তের মধ্যে না পায়। অর্থাৎ, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কায় থাকতে হত যে গেস্টাপোর অতর্কিত হামলায় পাণ্ডুলিপি না ধরা পড়ে। এই কারণেই পাণ্ডুলিপিকে এমন ভাষায় লিখতে হত যার সত্যিকারের অর্থটি থাকত প্রচ্ছন্ন।

ফলে ভালস্ট্রাসেনের কাহিনীর মতো এই পাণ্ডুলিপিটিরও নিজস্ব একটি কাহিনী গড়ে উঠেছে। ১৯৩৩ সালের ২১শে জানুয়ারি কাহিনীর শুরু আর ১৯৩৪ সালের ১৫ই জুন কাহিনীর শেষ। ভালস্ট্রাসে কেন্দ্রায়িত এই কাহিনীর ক্ষেত্র বিশেষ একটি এলাকার বাইরে প্রসারিত নয়। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ এলাকায় সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে ইতিহাসের আলোড়ন যত সামান্যই হোক না কেন, মহৎ তাৎপর্যের জন্যেই তা উপন্যাসের উপজীব্য। তবুও প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার যে ইতিবৃত্তটি আমাদের হাতে এসেছে তা শুধুই উপন্যাস নয়, তা ছাড়াও আরো কিছু। জান পেট্যারসেন্ বলেছেন—"ঘটনাগুলো যেমন ঘটেছে আমি লিখে গিয়েছি।" এই অতি-সরল বিবৃতি থেকে অবশ্য বোঝা সম্ভব নয় ঘটনাগুলোকে দেখা ছিল কতখানি দুরূহ, আর লেখা আরো কতখানি। ভালস্ট্রাসে থেকে মিনিট দশেকের হাঁটা পথে

ছোট্ট একটি কুঠরিতে বসে গেস্টাপো ও ঝটিকা-বাহিনীর সমস্ত তোলপাড়কে অগ্রাহ্য করে এই ইতিবৃত্তের রচনা। আবার, ঘটনাগুলো যেমন ঘটেছে তেমনি লিখে যাওয়া বলেই রচনাটি পাঠ করার সময়ে মনে হয়, অতীতের এক খণ্ডকালের মধ্যে যেন বিচরণ করছি। আর এই খণ্ডকালের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে শহীদের জীবনদানে, শহীদের মায়ের অশ্রুপাতে আর সংগ্রামী সৈনিকের নির্ভীক পদক্ষেপে কখন যেন আমাদের পাঠকসত্তার অস্তিত্ব লোপ পায়। আর তখন আমরাই রাত্রির অন্ধকারে চোরা-কুঠরিতে বসে বেআইনী ইস্তাহার ছাপাই, গেস্টাপোর শত অত্যাচারেও মুখ বুজে থাকি আর আকাশের দিকে মুঠি তুলে অঙ্গীকার জানাই যে শহীদের মৃত্যুর শোধ আমরা নেব। এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা মাত্র তিনশো পৃষ্ঠার একটি বইয়ের কালো হরফে বিধৃত হয়ে আছে।

আর এই তিনশোটি পৃষ্ঠার অভিযানও কম রোমাঞ্চকর নয়।

১৯৩৪ সালের শরৎকালে এই রচনার টাইপ-করা কপি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। একটি নয়, তিনটি কপি। দুটি কপিকে ওয়াটারপ্রুফ প্যাকেটে মুড়ে দুটি পৃথক জায়গায় মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়। আর অবশিষ্ট কপিটিকে গোপন পথে পাঠানো হয় হামবুর্গে আর ব্যবস্থা করা হয় যে একজন অজ্ঞাত-পরিচয় জার্মান নাবিক এই কপিটিকে ইংলণ্ডে পৌঁছে দেবে। কিন্তু এই ব্যবস্থাটি কার্যকর হয় নি। অনেক সপ্তাহ পরে খবর আসে যে জাহাজটি বন্দরে থাকার সময়েই শেষ মুহূর্তের তল্লাসী এড়াবার জন্যে পাণ্ডুলিপির সলিল-সমাধি হয়েছে।

অতঃপর দ্বিতীয় কপির যাত্রা শুরু। প্রথমে বিশ্বস্ত বন্ধুদের হাতে ড্রেসডেন পর্যন্ত। কথা ছিল ড্রেসডেন থেকে গোপন পথে চেকোস্লোভাকিয়ায় পাচার করা হবে। কিন্তু কয়েক মাস অপেক্ষা করার পরেও যখন আর কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না তখন ধরে নেওয়া হল যে এই কপিটিরও অপমৃত্যু হয়েছে। অতঃপর শেষ কপি। এবারে যাত্রার সঙ্গী হলেন লেখক নিজেই। ১৯৩৪ সালের খ্রীষ্টমাসের ছুটির সময়ে লেখক আর তাঁর একজন সঙ্গী ধড়াচূড়া পরে স্কীয়িং-এর সাজসরঞ্জাম নিয়ে হাজির হলেন নাৎসী জার্মানির সীমান্তে। লেখকের কাঁধের বোঝায় ছিল পাঁউরুটি, তারই মধ্যে লুকনো ছিল পাণ্ডুলিপির শেষ কপি। সীমান্তের নাৎসী প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে দুজনে শেষ পর্যন্ত হাজির হলেন প্রাগে। সেখানে তাঁরা শুনলেন যে পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় কপিটি

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসে এই পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে লণ্ডনে। পাঁচ মাসের মধ্যে চারবার পুনর্মুদ্রিত হয়ে বইটি সারা পৃথিবীতে এই বার্তা প্রচার করেছিল যে নাৎসী জার্মানির অভ্যন্তরে অন্য এক জার্মানিও আছে।

তবে খাস জার্মানিতে এই বইটির প্রকাশ ইতিহাসের পট-পরিবর্তনের মুখাপেক্ষী ছিল। যে পট-পরিবর্তনের সূচনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবং পরিণতি জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়। এইভাবে বইটির প্রথম প্রকাশের প্রায় দুই যুগ পরে জার্মানিতে বইটি আত্মপ্রকাশ করতে পারে এবং বইয়ের লেখক নানা সম্মানে সম্মানিত হন। তবে, যে-ভবিষ্যতের জন্যে এককালের শহীদরা জীবনদান করেছিলেন সেই ভবিষ্যতের বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই কালটির ইতিবৃত্ত যখন পাওয়া গেল তখনো কিন্তু দেখা যাচ্ছে জার্মানির পশ্চিমাংশে আবার সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। খুব সম্ভবত সেখানে আবার সেই এককালের শহীদদের মতোই নতুন করে জীবনদানের প্রস্তুতি চাই। এবং বর্তমান যেখানে অতীত, সেখানে ভবিষ্যতের পথ করতে হলে এমনি ধরনের বই নিঃসন্দেহে জোরালো হাতিয়ার। অন্যান্য দেশেও কখনো কখনো অতীতকে বর্তমান করে তোলার প্রচেষ্টা অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রেও এই খণ্ডকালের অভিজ্ঞতা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রেরণা দেবে।

Our Street : Jan Peterson. Seven Seas Books, Berlin. Distributor : National Book Agency Pr. Ltd., Calcutta. Rs. 2-50.

রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ

নেপাল মজুমদার

'জাতীয়তাবাদ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তাধারার উপর আজকাল প্রচুর আলোচনা, বিস্তর তর্কবিতর্ক হয়েছে। এ সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার উৎসটি কোথায় এবং তার ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণতির ধারাটিই বা কী এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণা বা চিন্তাধারার আলোচনা করতে গেলে তাকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করাটাই যুক্তিযুক্ত হবে।

আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনাকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে এসেছেন। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তিনি যে লেখনী ধারণ করে বা ভাষণ দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়; পরন্তু আমাদের জাতীয় আন্দোলনে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উগ্র ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সারা জীবন তিনি ক্ষমাহীন কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন এবং তার সঠিক মূল্যায়ন করে তার বিশ্বমানবতা ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত রাখবার চেষ্টা করেছেন। আর তাছাড়া আরো একটা বড় কথা, তিনি যে জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরে থেকে একটা নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয়তাবাদের আদর্শের সমালোচনা করেছিলেন, তা নয়। অবশ্য একথাও সত্য আজকাল আমরা যাকে "রাজনীতি করা" বলি, রবীন্দ্রনাথ তেমন কিছু রাজনীতি করেন নি। কিন্তু আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে তিনি একটি বিশিষ্ট সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে বিরাজ করছেন।

জাতীয় কংগ্রেসের তখনো জন্ম হয়নি। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দ-মোহন বসু, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজনে মিলে এদেশে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রবর্তন করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইলবার্ট

বিল' আন্দোলনের সময়ই 'জাতীয়তাবাদী রাজনীতি' কিছুটা স্পষ্ট রূপ নেয়। ঐ বৎসরই সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি কয়েকজনের চেষ্টায় 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' আহূত হয়। সেই সময় দেশের ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে 'নেশন' 'ন্যাশনালিজম' 'ন্যাশনাল ফণ্ড' 'ন্যাশনাল থিয়েটার' 'ন্যাশনাল পেপার'—এসব শব্দ নিয়ে জোর উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলতে থাকে।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ও বিস্ময়ের কথা, রবীন্দ্রনাথ শুরু থেকেই এই নব জাতীয়-উন্মাদনাকে একেবারেই সমর্থন করলেন না। এই সময় 'ভারতী' পত্রিকায় 'চেঁচিয়ে বলা', 'ন্যাশনল ফণ্ড', 'জিহ্বা-আস্ফালন', 'হাতে কলমে'—প্রভৃতি প্রবন্ধে ঐসব শূন্যগর্ভ জাতীয়তাবাদী আবেগ-উচ্ছ্বাসকে অত্যন্ত তীব্র ও কঠোর ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেন। 'নেশন', 'ন্যাশনালিজম'—এসব কথা বলতে গিয়ে নেতৃবৃন্দের ভাবাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসত। অথচ তাতে দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা এক বর্ণও থাকত না। দেশীয় 'সিবিলিয়নদের' দাবি-দাওয়া আর চাকরি-বাকরির দাবি-দাওয়া ছাড়া এই সব ন্যাশনালিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা যেন আর কিছুই ভাবতেও পারতেন না।

রবীন্দ্রনাথ তখনই এই 'ন্যাশনাল-উন্মাদনা'র কোথায় যেন এক মস্ত ফাঁকিবাজী আছে বলে আবিষ্কার করলেন। তিনি পরিষ্কার লক্ষ্য করলেন, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ শ্রেণী স্বার্থটাই তৎকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দের অ্যাজিটেশন আন্দোলনগুলিতে অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে।

ঐ সময় 'ন্যাশনাল ফণ্ড' (ভারতী ১২৯০ কার্তিক) প্রবন্ধে তিনি লিখলেন,

> "ন্যাশনল শব্দটার ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। ন্যাশনল থিয়েটার, ন্যাশনল মেলা, ন্যাশনল পেপর ইত্যাদি......। একমাত্র Political agitation-ই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।
>
> "...আমাদের দেশে political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা। ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই। ...গবর্মেন্টকে চেতন করাইতে তাঁহারা যে পরিশ্রম করিতেছেন, নিজের দেশের লোককে চেতন করাইতে সেই পরিশ্রম করিলে যে বিস্তর শুভফল হইত।"

সেই সময় থেকেই তিনি জাতির আত্মশক্তি অর্জনের উপর জোর দিতে শুরু করেন। আত্মশক্তি বলতে তিনি জনশক্তি ও জনচেতনা জাগ্রত করবার কথাই বললেন। তিনি বললেন, "বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা

বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না।" তিনি বললেন, ইংরেজ সাহেবদের অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিরোধ করে দেশের লোককে রক্ষা করো। আর তা হলে জাতির আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে এবং আত্মশক্তি অর্জন করবে।

একথা একশোবার সত্য, আমাদের মতো পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় দেশের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগঠিত করেছিলেন। এইদিক থেকে এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য অসীম। কিন্তু জাতীয়স্বার্থ বলতে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ শুধু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থই বুঝতেন। দ্বিতীয়ত আমাদের জাতীয়স্বার্থ ও বৃটিশ-এম্পায়ারের স্বার্থ সমঅর্থ সূচক বলেই তাঁরা মনে করতেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করা তো দূরের কথা বৃটিশ এম্পায়ারেরই পক্ষপুটের আড়ালে এঁরা আরো পরিপুষ্ট হতে চেয়েছেন। সেই কথাটাই সভা-সমিতিতে জোর গলায় তাঁরা ঘোষণা করতেন। এই দাস মনোবৃত্তিকে—এই ভিক্ষাবৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় বিদ্রূপ ও সমালোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকে কংগ্রেসের সভা সম্মেলনগুলিতে যোগদান করেছিলেন, জাতীয়-সংহতি ও ঐক্যের জন্য সারা ভারতবর্ষব্যাপী কংগ্রেসের মতো একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেছিলেন এবং গণতান্ত্রিক শাসন সংস্কার-মূলক কংগ্রেসের দাবিদাওয়াগুলি সমর্থন করেছিলেন—তা সত্য কিন্তু কংগ্রেসের নির্লজ্জ ইংরেজভক্তি ও ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি সমর্থন তো করতেই পারলেন না পরন্তু কঠোর ভাষায় তিনি তাকে বিদ্রূপ ও তিরস্কার করলেন। আর সবথেকে উল্লেখযোগ্য—আদর্শের ক্ষেত্রে তিনি 'জাতীয়তাবাদী' আদর্শকে গ্রহণই করতে পারলেন না।

রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর উত্তরণকালে ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় বিচরণ করেছেন। দেশের তো নয়ই—বিদেশেরও খুব কম মনীষীই তাঁর নাগাল পেয়েছেন বা পাশাপাশি সেদিন তাঁর সঙ্গে চলতে পেরেছেন। কিন্তু কবির সেই রাজনৈতিক ধারণার মূল বৈশিষ্ট্য কি?

পূর্বেই উল্লেখ করেছি—দেশের তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টারী রাজনীতি অভিভূত করেছিল। তাঁরা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে সেই আদর্শেই ছক কেটে চালনা করতে চেয়েছিলেন। এটা

তাঁদের এতখানি অভিভূত করেছিল যে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-নীতিকে তাঁরা কোথাও দেখতে পেলেন না। পরন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যকে তাঁরা বহু ভাগ্যবলেই পেয়েছেন এবং এশিয়ার পরিত্রাতা ও মুক্তিদাতা হিসাবেই তাঁরা যেন ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন বলে প্রচার করলেন।

পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়স থেকেই ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতিকে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন। 'চীনে মরণের ব্যবসায়', 'ইংরেজ ও ভারতবাসী', 'ইংরেজের আতঙ্ক', 'রাজনীতির দ্বিধা' প্রভৃতি প্রবন্ধে ইওরোপের বিশেষ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার তীব্র সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করলেন। এর ফলে রাজনীতি বিশেষ করে ইওরোপের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উপর তাঁর তীব্র সন্দেহ ও বীতরাগ জন্মাতে শুরু করে। এর অনতিকাল পরে 'বুয়র যুদ্ধ' ও চীনের 'বক্সার বিদ্রোহের' সময় ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কুৎসিত ও বীভৎস নগ্নরূপটা আরো পরিষ্কার দেখতে পেলেন। তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন, রাজনীতিতে আমরা যে জাতীয়তাবাদের পূজা করতে বসেছিলাম, ইওরোপীয় দেশগুলিতে তার পরিণতি কোথায় ও কোনদিকে চলেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশ ও বাজার লুটপাট করবার জন্ম সে দেশের গোটা 'দেশকে-দেশ' এই জাতীয়তাবাদের মদ খেয়ে মাতাল হয়ে হিংস্র শ্বাপদের মতো আপনাদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করছে। বর্তমান শতাব্দী আরম্ভ হলো এমনি করেই। বেদনাহত ক্রুদ্ধ কবি, এই সময়েই 'নৈবেদ্য'র একটি কবিতায় লিখলেন :

"শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্ত মেঘ-মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ংকরী
—প্রলয়মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্ক শয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতি প্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়,
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি গীতি।"

আর একটি কবিতায় লিখলেন :

"একের স্পর্ধা কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।
স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে, বিশ্ব ধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ—
... ...
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।"

ইওরোপীয় দেশগুলির জাতীয়তাবাদী সভ্যতাকে এমন কঠোর ভাষায় বিদ্রূপ ও সমালোচনা করতে এদেশের কোনো রাজনীতিবিদ বা কবি-সাহিত্যিককে তো নয়ই—সমকালীন পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো কবিকেই দেখা গিয়েছিল কিনা তাতে খুবই সন্দেহ আছে। স্মরণ রাখা দরকার বার্নার্ড শ-এর মতো বিবেকী চিন্তাবিদও খুব দ্ব্যর্থহীনভাবে বুয়রদের পক্ষে কথা বলতে পারলেন না। আফ্রিকায় ইংরেজের সোনার খনির লোভকে তিনি সমালোচনা করলেও পরিষ্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে ভর্ৎসনা করলেন না। গান্ধীজী যে তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজদের পক্ষ গ্রহণ করে তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সে ইতিহাসও স্মরণ রাখা দরকার।

ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে উগ্র-জাতীয়তাবাদ কী আকারে ও কীভাবে অভিব্যক্তি পাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তখন তা গভীর ভাবে লক্ষ্য করছিলেন। এই সময় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' নামে একটি প্রবন্ধে (১৩০৮ ; ১৯০১ বঙ্গদর্শন) তিনি লিখলেন :

"ইংলণ্ড বল, ফ্রান্স বল, আর সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে মতবিশ্বাসের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে রক্ষা ও পোষণ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সেইখানেই তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিষ্ঠুর, সেইখানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ এক মূর্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়।..."

কিন্তু ইওরোপীয় দেশগুলির এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রকৃতিটি কী? তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন :

"প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের।

"য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতিলাভ করে যে ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।

"স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। য়ুরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে তাহার পূর্বসূচনা দেখা যাইতেছে।

"ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'জোর যার মুলুক তার' এ-নীতি স্বীকার করিতে আর লজ্জা বোধ করিতেছে না।...

"রাষ্ট্রতন্ত্রে মিথ্যাচারণ, সত্যভঙ্গ, প্রবঞ্চনা এখন আর লজ্জাজনক বলিয়া গণ্য হয় না। যে-সকল জাতি মনুষ্যে মনুষ্যে ব্যবহারে সত্যের মর্য্যাদা রাখে, ন্যায়চরণকে শ্রেয়োজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্ত্রে তাহাদেরও ধর্মবোধ অসাড় হইয়া থাকে। সেইজন্য ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান, রুশ ইহারা পরস্পরকে কপট ভণ্ড, প্রবঞ্চক বলিয়া উচ্চস্বরে গালি দিতেছে।

"ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে য়ুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্য দিতেছে যে, সে ক্রমশই স্পর্দ্ধিত হইয়া ধ্রুবধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌভ্রাত্রের মন্ত্র য়ুরোপের মুখে পরিহাস বাক্য হইয়া উঠিয়াছে।"

বুঝতে কষ্ট হয় না, ইওরোপের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উপর কবির সন্দেহ ও বীতরাগটা কোথায় ও কেন। ইওরোপের জাতীয়তাবাদ যে 'National State'-এর মাধ্যমেই অভিব্যক্তি পাচ্ছে এবং এই National State'-এর আসল লক্ষ্য ও ঝোঁকটা হচ্ছে পরদেশ লুণ্ঠন ও পরজাতি বিদ্বেষ—তাও রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার দেখতে পেলেন।

কিন্তু তিনি মূল প্রশ্নের চাবিকাঠিটি 'ছুঁই-ছুঁই' করেও ছুঁতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথের ধারণা, পাশ্চাত্য দেশের 'নেশন' ও ন্যাশনাল-স্টেট ভিত্তিক সভ্যতাই হলো যত নষ্টের, যত সর্বনাশের কারণ। কখনও বা তিনি তাকে

রিপুর প্রবল তাড়না বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু এই সত্য তিনি দেখতে পেলেন না যে, ইওরোপের নেশন ও রাষ্ট্রগুলি সেখানকার পুঁজিবাদী-উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। পুঁজিবাদের বিকাশ ও ঐতিহাসিক স্বার্থের প্রয়োজনে নেশন ও ন্যাশনল-স্টেট গড়ে উঠেছে। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত কারণের মধ্যেই রয়েছে তার সাম্রাজ্যলালসা। কবির ভাষায়—লোভ, কামনা ও রিপুর প্রবল তাড়না যা অনায়াসেই মানবতা, ধর্মাধর্মবোধ ও ন্যায়নীতিকে পদদলিত করে চলেছে।

স্মরণ রাখা দরকার তখনও আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন হয় নি। স্বভাবতই তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টি অতীতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাঁর ধারণা হলো, ভারতের প্রাচীন সমাজ-সভ্যতার বৈশিষ্ট্যটুকু আশ্রয় করে জাতিনির্মাণের কাজে লাগতে হবে।

অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে একেবারে দূরে সরে থাকলেন। তৎকালীন দেশের গণতান্ত্রিক শাসনসংস্কারের পক্ষে তিনিই অত্যন্ত জোরালো ও তেজস্বিনী ভাষায় লিখতে লাগলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিলক ও নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারের পর 'সিডিশন বিল'-এর প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি যে জাতির পুরোভাগে এসে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন সে কথাও ভুলে যাবার নয়। ভারতবর্ষের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শাসকসম্প্রদায়ের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি যত তীব্র উত্তেজনাকর ভাষায় প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেছিলেন এমনটি আর দেশের কাউকেই দেখা যায় নি সেদিন। বরঞ্চ আশ্চর্যের কথা—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তখনও বৃটিশ-এম্পায়ার ও ইংরাজজাতির ন্যায়পরতা ও মহানুভবতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বক্তৃতা করতেন। রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় ইওরোপের সাম্রাজ্যলালসা ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করছিলেন বটে কিন্তু সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনিই সর্বপ্রথম একটি বলিষ্ঠ জাতীয় চেতনা ও স্বাদেশিকতাবোধ জাগ্রত করবার জন্ত দেশে আন্দোলন গড়তে চেষ্টা করছিলেন। মাতৃভাষায় শিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও প্রসারের জন্ত তিনিই সর্বপ্রথম তীব্র আন্দোলন চালাতে লাগলেন। আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ তখনও পর্যন্ত সাহেবী পোশাকে সাহেবী ঢঙে ইংরেজীতে বক্তৃতা করতেন। ১৮৯৭ সালে নাটোরে প্রাদেশিক কনফারেন্সে রবীন্দ্রনাথই কংগ্রেসের সভা-সম্মেলনগুলিতে ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায়

বক্তৃতা ও সম্মেলনের কাজ চালু করবার জন্যে এক তুমুল হট্টগোল ও আন্দোলন তুলেছিলেন, সে কথাও ভুলে যাবার নয়। কোট পেন্টুলাম পরা কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে ঐ সময়ই তিনি 'পরবেশ' কবিতায় লিখলেন :

"কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ।
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান?
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি এ কী অহংকার
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলংকার।"

ঐ সময় 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ' নামে অপর একটি কবিতায় বললেন :

"তোমার যা দৈন্য মাতঃ তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি!
পরধনে ধিক গর্ব? করি করজোড়,
ভরি ভিক্ষা ঝুলি?
পুণ্য হস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে,
তাই যেন রুচে;
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।"

এমনি তীব্র ছিল স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতি। এক কথায় তিনি আমাদের চিন্তায় ভাবনায় পোশাকে-আশাকে ভাবে-ভাষায় একটি সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু স্বদেশী কৃষ্টি গড়ে তুলবার জন্য আন্দোলন চালিয়েছিলেন।

কিন্তু ইওরোপের জাতীয়তাবাদী-রাজনীতির আদর্শকে তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। (১৩০৮ বা ১৯০১ বঙ্গদর্শন-এ) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'নেশন কী', 'হিন্দুত্ব', 'ব্রাহ্মণ', 'বিরোধমূলক আদর্শ' প্রভৃতি প্রবন্ধে নেশন ও ন্যাশনালিজম-আদর্শের বিস্তারিত সমালোচনা করলেন। 'বিরোধমূলক আদর্শ' প্রবন্ধে ইওরোপের 'ন্যাশনালিজম', 'প্যাট্রিয়টিজম' আদর্শের যে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলেন তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখলেন :

..."মিথ্যার দ্বারাই হউক ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষে

অন্য নেশনকে ক্ষুণ্ণ করিতেই হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাট্রিয়-টিজমের প্রধান অবলম্বন। গায়ের জোর, ঠেলাঠেলি, অন্যায় ও সর্বপ্রকার মিথ্যাচারের হাত হইতে নেশনতন্ত্রকে উপরে তুলিতে পারে, এমন সভ্যতার নিদর্শন তো আমরা এখনো য়ুরোপে পাই না।"

…"স্বার্থের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং স্বার্থের সংঘাতে মানুষকে অন্ধ করিবেই। ইংরেজ যদি সুদূর এশিয়ায় কোনো প্রকার সুযোগ ঘটাইতে পারে ফ্রান্স তখনই সচকিত হইয়া ভাবিতে থাকিবে, ইংরেজের বলবৃদ্ধি হইতেছে।…এক নেশনের প্রবলত্ব অন্য নেশনের পক্ষে সর্বদাই আশঙ্কাজনক। এ স্থলে বিরোধ বিদ্বেষ অন্ধতা মিথ্যাপবাদ, সত্যগোপন—এ সমস্ত না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।"

এই সঙ্গে তিনি দেশকে তখনই সতর্ক করে দিয়ে বললেন :

"আমরা যদি বাঁধি বোলে না-ভুলি, যদি প্যাট্রিয়টকেই সর্বোচ্চ বলিয়া মনে না করি, যদি সত্যকে ন্যায়কে ধর্মকে ন্যাশনলত্বের অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি, তবে আমাদের ভাবিবার বিষয় বিস্তর আছে।… ধর্মের দিকে না তাকাইলেও সুবুদ্ধির হিসাব হইতে এ কথা পর্যালোচনা করিতে হইবে যে, ন্যাশনাল স্বার্থের আদর্শকে খাড়া করিলেই বিরোধের আদর্শকে খাড়া করা হয়—সেই আদর্শ লইয়া আমরা কি কোনো কালে য়ুরোপের মহাকায় দানবের সহিত লড়াই করিতে পারিব?"

সত্য কথা এইকালে এই সব প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ এক 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের' আন্দোলন তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা হিন্দুয়ানার জন্য হিন্দুয়ানা নয়। তিনি মানবতা, সমাজবোধ ও ন্যায়নীতির এক মহান্ আদর্শের জন্য উপর ভিত্তি করে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ঐক্য গড়ে তুলতে চাইলেন। অর্থাৎ সেদিন তাঁর হিন্দুয়ানার মধ্যে মানবতা, সমাজবোধ, সমষ্টিচেতনা, সুবিচার ও ন্যায়নীতিটাই প্রবল ও মুখ্য হয়ে উঠেছিল এবং হিন্দুয়ানাটা হয়েছিল গৌণ।

কিন্তু ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জাতীয়তাবাদী সভ্যতার স্বরূপটা চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। স্মরণ রাখা দরকার রমাঁ রলাঁ কিংবা আরি বারবুসের মতো শিল্পীরাও তখনও ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তা-বাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে যোদ্ধার বেশে অবতীর্ণ হননি। এমনকি লেনিনও তখনও "Self determination of Nations"-এর উপর তাঁর বিখ্যাত

ঐতিহাসিক নিবন্ধ রচনা করেন নি। ১৯১৪ সালে লেনিনের ঐ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এর অনতিকাল পরেই ১৯০৪-৫ সালে কার্জনের 'য়ুনিভার্সিটি বিল' ও 'বঙ্গভঙ্গ বিল'-এর বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলাদেশে যে উত্তাল গণবিক্ষোভ ও স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার পুরোভাগে এসে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন—সে ইতিহাসও আজ প্রায় সকলেই জানেন।

সে এক তীব্র জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার যুগ। এই কালেই স্বদেশী-সমাজ, স্বদেশী শিক্ষা, স্বদেশী সংগীত, স্বদেশী আর্ট, স্বদেশী নাটক সৃষ্টি এবং স্বদেশী বস্ত্র ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের সময়ই রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'ও আমার দেশের মাটি', 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেশাত্ম-বোধক গানগুলি রচনা করেন।

কিন্তু সব থেকে বিস্ময়কর ও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একদিকে দেশের স্বাজাত্যবোধ ও স্বাদেশিকতাবোধকে জাগরিত করবার জন্য সর্ববিষয়ে অগ্রণী হলেন, অপরদিকে সেই সময় তিনিই পাশ্চাত্ত্য দেশের 'উগ্র-ন্যাশনালিজম' ও 'প্যাট্রিয়টিজম' সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করে দেশকে সে বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চাইলেন। এই সময়ই তিনি তাঁর বিখ্যাত 'ইম্পীরিয়লিজম' ও 'দেশের কথা' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। 'দেশের কথা' (বঙ্গদর্শন—১৩১১) প্রবন্ধে লিখলেন :

> …"প্যাট্রিয়টিজমের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা নহে। জিনিসটা বিদেশী, নামটাও বিদেশী থাকিতে দোষ নাই। যদি কোনো বাংলা শব্দ চালাইতে হয়, তবে স্বাদেশিকতা কথাটা ব্যবহার করা যাইতে পারে।"

> "স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের ঊর্ধ্বে আর কিছুকে স্বীকার না-করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থ যেখানে বাধে না সেইখানেই ধর্ম বল, দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে—কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয় তাহাই প্যাট্রিয়টিজম শব্দের পদবাচ্য।"

একটা দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বললেন :

"ইংরেজ কখনোই একথা ভাবে না যে, পৃথিবীতে ফরাসী সভ্যতার একটা উপকারিতা আছে, অতএব সে সভ্যতায় আঘাত করিলে সমস্ত মানবের সুতরাং আমাদেরও ক্ষতি। নিজের পেট ভরাইবার জন্য আবশ্যক হইলে ফরাসীকে সে বটিকার মত গিলিয়া ফেলিতে পারে।...এ'স্থলে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এশিয়া-আফ্রিকার ডালপালা সমস্ত মুড়াইয়া খাইলে কোনো দোষ দেখি না।"

এই হচ্ছে ইওরোপের 'ন্যাশনালিজম' ও 'প্যাট্রিয়টিজম'-এর প্রকৃত চেহারা। তাই তিনি স্বদেশী-উন্মত্ত দেশকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন :

..."এই সময়েই আমাদের মোহমুক্ত হওয়া দরকার। অনিবার্য্য প্রয়োজনে যাহা আমাকে লইতেই হইবে, তাহার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় মুগ্ধভাব থাকা কিছু নয়।. একথা যেন মনে না করি, জাতীয় স্বার্থ-তন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে—মনুষ্যত্বকে ন্যাশনলত্বের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনলত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তা আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে ন্যাশনলত্ব শুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে।"

লক্ষ্য করবার বিষয়, তখনও তিনি 'ধর্ম ও মনুষ্যত্ব'কে ন্যাশনলত্বের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বড় করে দেখবার আহ্বান জানাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধ বা স্বদেশপ্রেমের মধ্যে স্বদেশ ও স্বজাতি শ্রেষ্ঠত্ববোধের লেশমাত্রও স্থান নেই। একটা দৃষ্টান্ত দিলে জিনিসটা একটু পরিষ্কার হবে। রবীন্দ্রনাথের 'ও আমার দেশের মাটি' 'সার্থক জনম আমার', আর ডি. এল. রায়ের 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' গানটি কিছু আগে-পরে হলেও প্রায় একই সময়ে লেখা। তবু এই গানগুলির মধ্যে কী পার্থক্য! "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি"—একথা রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই বলতে পারলেন না। এর মধ্যে যে 'chauvinism'-এর কিছুটা গন্ধ আছে, সে-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই—আর এই chauvinism রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে, গানে কোথাও দেখা যায় না, সে যুগে আমাদের দেশে তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য যতই থাক না কেন।

অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন আমাদের জাতীয় স্বার্থের অথবা রাজনীতির প্রয়োজনে আমরা যেন ধর্মবোধ ও মনুষ্যত্বকে গৌণ ও লাঞ্ছিত এবং অবমাননা না করি। এক কথায় এই স্বদেশী উন্মাদনার মাঝে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে ও সচেতনভাবে দেশের রাজনীতিকে এক ধর্মহান মানবতা ও ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিলেন। বস্তুতপক্ষে গান্ধীজীর পূর্বেই ভারতের রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম Means ও End-এর বিতর্কটি উত্থাপন করেন।

ঠিক এই কারণেই এর অনতিকাল পরেই (১৯০৮ সালে) বাংলার বিপ্লবাত্মক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে কবি সমর্থন করতে পারলেন না। এই সময়ে 'পথ ও পাথেয়', 'সমস্যা', 'সদুপায়', 'দেশহিত' প্রভৃতি প্রবন্ধে এই মানবত্ব ও ন্যায়ধর্মের উপর তিনি বারবার গুরুত্ব আরোপ করলেন। 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ) বললেন:

"প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়—কোনো সংকীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপ করিতে গেলে একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না, কাজও নষ্ট হইবে।"

'দেশহিত' প্রবন্ধে বললেন (১৩১৫ আশ্বিন):

"ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য। ফললাভ চরম লাভ নহে। ধর্মলাভেই লাভ একথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।" কিন্তু কবির এই অভিযোগ শুধু দেশের সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধেই নয়—এ অভিযোগ প্রধানত এবং মূলত ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে—ইওরোপের উগ্র-জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে।

তাই এর কিছুকাল পরে ১৯১৪ সালে যখন মহাবিধ্বংসী প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল তখন এদেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই ইওরোপের ঐ যুদ্ধবাদী সভ্যতাকে তীব্র ও কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ ও ভর্ৎসনা করলেন। ঐ সময়েই 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে (সবুজপত্র, ১৯১৪) সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের আসল মর্মকথাটি ফাঁস করে তুলে ধরলেন। এ যুদ্ধ যে পৃথিবীর বাজার ও উপনিবেশ নিয়ে প্রভুত্বের লড়াই এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় ইওরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র—এ কথা রবীন্দ্রনাথই পরিষ্কার বিশ্লেষণ করে দেখালেন। স্মরণ রাখা দরকার, তখন গান্ধীজী থেকে শুরু করে জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই মহাযুদ্ধে ইংরেজকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিলেন। শুধু এদেশেই নয়—বার্ট্রাণ্ড রাসেল,

আইনস্টাইন ও রমাঁ রলাঁর মত দু-চার জন বিবেকী মানবপ্রেমিক ছাড়া সারা ইওরোপের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিবেকবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ নিজ দেশের সরকারকে সমর্থন করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন। পিতৃভূমি, স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থরক্ষার নামে সারা ইওরোপ এক ভ্রাতৃঘাতী মহাযুদ্ধের নিদারুণ বীভৎসতায় মেতে উঠল। যুধ্যমান দেশগুলির জাতিবৈরী ও পরজাতি বিদ্বেষ সারা পৃথিবীর পরিমণ্ডলকে বিষাক্ত করে তুলল।

রবীন্দ্রনাথ ইওরোপের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আসল রূপটা আরো স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করলেন।

১৯১৬ সাল। মহাযুদ্ধ তখন বীভৎসভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ জাপানে ও আমেরিকায় তাঁর অমর সৃষ্টি—যুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদ বিরোধী বক্তৃতাগুলি সেখানে পাঠ করেন। এইগুলিই পরে 'Nationalism' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

অবশ্য এই সব প্রবন্ধে তিনি যে খুব নূতন কথা কিছু বললেন তা নয়। বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকেই এই বক্তৃতাগুলির সার কথা তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন পূর্বেই তা উল্লেখ করেছি। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি আরো সুসম্বদ্ধভাবে 'Nationalism' সম্পর্কে তাঁর বিচার বিশ্লেষণ রাখলেন। এক জায়গায় তিনি বললেন :

'The Nation, with all its paraphernalia of power and prosperity, its flags and pious hymns, its blasphemous prayers in the churches, and the literary mock thunders of its patriotic bragging, cannot hide the fact that the Nation is the greatest evil for Nation, that all its precautions are against it, and any new birth of its fellow in the world is always followed in its mind by the dread of a new peril. Its one wish is to trade on the feebleness of the rest of the world, like some insects that are bred in the paralysed flesh of victims kept just enough alive to make them tooth some and nutritious. Therefore it is ready to send its poisonous fluid in to the vitals of the other living peoples, who, not being nations, are harmless. For

this the Nation has had and still has its richest pasture in Asia." [Nationalism—p. 29-30]

দৃপ্তকণ্ঠে কবি ঘোষণা করলেন, মহাযুদ্ধেই জাতীয়তাবাদের অন্তিমকাল সূচিত হয়েছে। তিনি বললেন :

"In this war the death-throes of the Nation have commenced···It is the fifth act of the tragedy of the unreal." [p. 44]

রণোন্মত্ত ইওরোপের আত্মাম্ভরিতাকে এতখানি কঠোর ভাষায় আর কেউ ভর্ৎসনা ও অভিসম্পাত জানান নি। স্মরণ রাখা দরকার ঠিক ঐ একই সময়ে লেনিন তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিবন্ধ 'Imperialism' গ্রন্থ রচনা করছেন। উভয়েরই আক্রমণের লক্ষ্য একই এবং সেটা হচ্ছে ইওরোপের পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির বিরাট পার্থক্য।

লেনিন তাঁর Imperialism গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বহু তত্ত্ব-তথ্য দিয়ে দেখালেন, পুঁজিবাদ তাঁর আপন স্বাভাবিক ধর্মে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে আর কয়েকটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবীর বাজার আর উপনিবেশের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মহাযুদ্ধ বাধাতে বাধ্য আর এই কাজে তারা নিজ নিজ দেশের জনসাধারণকে উগ্র-জাতীয়তাবাদের মদ খাইয়ে মাতাল করে তাদের যুদ্ধের কামানের খোরাক হিসাবে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ ইওরোপের সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাদী সভ্যতার উৎপত্তির কারণ তার পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত।

বলা বাহুল্য, সে-যুগে আমাদের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকেও পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন ; কিন্তু তিনি ন্যাশনালিজমকেই যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও যত কিছু অনিষ্টের মূল কারণ বলে অভিহিত করলেন। যেন কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশ তার 'জাতীয়তাবাদী' আদর্শ পরিত্যাগ করতে পারলেই সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের প্রবল তাড়না বা তাগিদ থেকে রেহাই পেতে পারে। এই সব দিক থেকে বিচার করলে, তাঁর 'ইম্পীরিয়লিজম', 'লড়াইয়ের মূল', 'বাতায়নিকের পত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার বিশ্লেষণ আপেক্ষিকভাবে

অধিক বিজ্ঞান-ঘেঁষা হয়েছে। অবশ্য 'বাতায়নিকের পত্র'তে সাম্রাজ্যবাদের বাহ্যিক ও মৌলিক কারণগুলির বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেও তিনি মাঝে মাঝে মানুষের লোভ ও রিপুর প্রবল তাড়নাকেই যত অনিষ্টের মূল বলতে চেয়েছেন। এক কথায় তাঁর চিন্তার মধ্যে তখনো একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি চলেছিল। কখনো তাঁর মনে হয়েছে, সর্বনাশের কারণটা হচ্ছে মানুষের spiritual, moral, ideal বা cultural অধোগতি ও অবনতির জন্য, কখনও বা মনে করেছেন socio-economic and political কারণের জন্য। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে তিনি মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্তও রেহাই পান নি।

কিন্তু পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি বিশেষ প্রগতিশীল এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে—একথা রবীন্দ্রনাথ তখনও খুব পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারেন নি। এমন কি তাঁর 'Nationalism in India' ভাষণেও তিনি পরিষ্কার বলিষ্ঠ কণ্ঠে ভারতের জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের দাবিটিও রাখতে ভুল করলেন। অবশ্য এর অনতিকাল পরেই দেশে প্রত্যাবর্তনের পর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামক প্রবন্ধে তিনি ভারতের জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের দাবিটি পরিষ্কার ঘোষণা করলেন। কিন্তু আদর্শের ক্ষেত্রে ভালো মনে কোনোদিনই তিনি 'জাতীয়তাবাদ'কে গ্রহণ করতে পারলেন না। পরন্তু এই সময় থেকেই তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন—সর্বদেশ এবং আন্তর্জাতিক মিলনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে দেশের মধ্যেই আলোড়ন তুলতে লাগলেন। মহাযুদ্ধের বীভৎসতার মধ্যেই কবি সর্বজাতিক মিলন-কেন্দ্র হিসাবে 'বিশ্বভারতীর' পরিকল্পনা করলেন। এর পর থেকে 'বৈদিক হিন্দুসভ্যতা' কিংবা 'বিশুদ্ধ ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতি' নিয়ে আর কোনদিনই তাঁকে মাথা ঘামাতে দেখা যায় না—যদিও ঋষি বাক্য ও উপনিষদের মহান শ্লোকগুলির উপর মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্তও ছিল অসীম শ্রদ্ধা। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের শ্রেষ্ঠ সব কিছু গ্রহণীয়কে আহরণ করে দেশকে ও জাতিকে তা আত্মস্থ করবার কথাই তিনি বলে এসেছেন। আবার 'ন্যাশনালিজম'-এর যেটুকু ভালো দিক সেটুকুও স্বীকার করে তার যথার্থ মর্যাদা দেবার জন্য বলে এসেছেন।

এই প্রসঙ্গে সর্বশেষে, কবির একটি রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ১৯৩০ সালে জেনেভায় যখন কবিকে Nationalism and

Internationalism সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা ব্যক্ত করবার জন্য অনুরোধ করা হয় তখন তিনি বললেন :

"Nationalism when sober is right. The idea that man should have no self at all is wrong, we cannot get rid of ourselves, we can get rid of our selfishness. In the same manner, nationalism when it is not the right spirit of a nation is like sentimentalism. Sentiments are not wrong in themselves, but a certain excess of sentiment is termed sentimentalism. In the same way a nation has its own self and that is valuable, we all have that difference. That is where we have the responsiblity to offer the best that we have to humanity. That very right of our national self should urge us to make the best contribution to the world."

এইটাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের Nationalism সম্পর্কে পরিণত চিন্তার প্রকৃত রূপ।

কিন্তু তবুও—" 'Nationalism' হচ্ছে একটা ভৌগলিক অপদেবতা"—ন্যাশনালিজম সম্পর্কে কবির ধারণার কথা বলতে গেলেই সর্বপ্রথমে কবির ঐ উক্তিটি বার বার মনে আসে। এমন কথা—এমন সংজ্ঞা পৃথিবীর আর কারুর কাছ থেকে বোধহয় শোনা যায়নি।

পুস্তক পরিচয়

মুখ॥ অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি. এম. লাইব্রেরি। পাঁচ টাকা॥

প্রমথ চৌধুরীর মেজাজ নিঃসন্দেহে গদ্যের মেজাজ—কিন্তু তাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। বরঞ্চ বুদ্ধির শিখায় উজ্জ্বল পথে যুক্তির দৃঢ় শৃঙ্খলায় চর্চা করেছেন বলেই রূপান্বেষায় দৃঢ়বন্ধনকে তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন সর্বতোভাবে। এই দৃঢ়বন্ধনের প্রতি আনুগত্যের আর এক প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর সনেটগুলিতে। চৌধুরী মহাশয়ের বুদ্ধি-প্রখর পথের প্রধান পথিকের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ ও অন্নদাশঙ্কর অন্যতম। এঁরা বাংলা গদ্যের বিরল পাদপ তৃণভূমিতে সুদৃঢ়সংহত শাল-মহিমায় বিরাজিত। এর মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় এই যে অন্নদাশঙ্কর তাঁর কীর্তির জন্য মুখ্যত তাঁর গদ্যের ওপর নির্ভরশীল হলেও—কবিতায় তাঁর স্বস্তির আশ্রয়কে সোৎসাহে ঘোষণা করতে কখনো পরাঙ্মুখ নন। অন্তঃশীলায় কবির মেজাজকে ধূর্জটিপ্রসাদ কখনো কখনো জানিয়ে ফেললেও, এ পর্যায়ে একমাত্র অন্নদাশঙ্করকেই দেখা যায় যে প্রকাশ্যে কবিতা রচনার কোনো উপলক্ষকেই তিনি অবহেলা করেন না। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয় যে তিনি চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় সনেটের দৃঢ় বন্ধনকে অনুশীলন না করেই, কিছুটা প্রায় উপেক্ষা করেই, তাঁর কবিত্বের পটাকাশে লিরিকের নানাকৃতি মেঘমালায় সমাবেশ ঘটিয়েছেন। অন্নদাশঙ্করের যে কোনো শিল্পকর্মের আলোচনায় এই প্রাথমিক সূত্রটি বিশেষ স্মরণীয়। বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারা থেকে রসাস্বাদনে অন্নদাশঙ্করের ক্লান্তি নেই। ছড়া লিখতে আলস্য নেই। রূপকের প্যাটার্ন গ্রহণেও তিনি যেমন নির্ভয়, রূপকথার ভাবলোকের ব্যবহারেও তিনি তেমনি আগ্রহী। লোকজীবনের দেশজ ধারায় অবগাহন ব্যতীত যে বাবু-বিকারের হাত থেকে মুক্তি নেই—শুদ্ধতার সন্ধানেই যে আমাদের ক্লাসিক এবং দেশজ লোকায়ত রসচর্যাকে আশ্রয় করা দরকার, তবেই যে দেড় শত বৎসরের ঔপনিবেশিক পঙ্গু মধ্যবিত্তের জীবনধারণা-ধারণার হাত থেকে রেহাই—রবীন্দ্রনাথে এ নির্দেশ স্পষ্ট, কবি বিষ্ণু দে-র চলিষ্ণু কবিত্বে তারই মহৎ উত্তরাধিকার।

অন্নদাশঙ্করও হয়তো তাই ভাবেন। তাই লোকসাহিত্যের ভাবভঙ্গিকে তিনি বারে বারে অনুশীলন করতে চান। কথাসাহিত্যিক হিসাবে একটা কথা তিনি স্পষ্ট বুঝেছেন যে আমাদের ছবিকে সমগ্র করে তুলতে হলে আমাদের ভাবলোকের সমগ্র প্রতিফলন দরকার। সেই ভাবলোককে কবি-মন নিয়ে অন্নদাশঙ্কর ভালোবেসেছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা, হাসনসখি, কিরণমালার নিজস্ব জগৎ এ সব কিছু যেমন তাঁর কল্পনাকে দুলিয়েছে তেমনি তাঁর মধ্যে সঞ্চার করেছে এক বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা। তাই বারে বারে নায়ক নায়িকার জীবনসূত্রে তিনি দেশের ঐতিহ্যগত ভাবলোককে গ্রথিত দেখতে চান। সত্যাসত্য-এ রূপক-নির্মিতির প্রয়াসের মূল প্রেরণা এখানে। হাসন-সখিতে, রত্ন ও শ্রীমতীতে দেশের ভাবলোকের ব্যবহার এই উদ্দেশ্যে। স্বভাবতই এটা অন্নদাশঙ্করের মাত্র রুচি-বিলাস নয়। দেশ কালের একটা অংশকে নয়, গোটা দেশকে, তার আবহমান কালকে অন্নদাশঙ্কর পাত্র-পাত্রীর জীবনে উপলব্ধি করতে চান। তাঁর ব্যর্থতা নিশ্চয় আছে। কিন্তু তাঁর বিষয়-চেতনাকে ভালোবাসবে না এমন সমালোচক নিশ্চয় কেউ নেই।

সুখ উপন্যাসের নায়িকার নাম মালা। রূপকথার নায়িকা কিরণমালার নামে তার নাম। মালার বাবা চান মালাকে এমন শিক্ষায় সম্পন্ন করতে যাতে ব্যক্তি হিসাবে পূর্ণতা অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। মা মনে করেন সে শিক্ষায় কী লাভ যে শিক্ষা তাঁর মেয়েকে মেয়ে হিসেবে সার্থকতার পথে নিয়ে যাবে না। বাবা চান মেয়ে মনুষ্যত্ব অর্জন করুক। মা চান মেয়ে বধূত্বের গৌরবে ভূষিত হোক। স্বভাবতই মায়ের সংসার-বুদ্ধিই এক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে। মালার জন্য পাত্র খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। এ ব্যাপারে উৎসাহী সহায়ক শিল্পী দেবপ্রিয়—যে মালার মাকে বলে মাসিমা, বাবাকে মেসোমশাই, মালার রূপে যে দেখে শিল্পের বৈভব। পিতার ভাবলোক থেকে নেমে এসেছে যে মেয়ে তার বর যোগাড় করা সোজা নয়। মালার স্বয়ম্বর পরীক্ষা পেরিয়ে যাওয়া পাণিপ্রার্থীদের পক্ষে সম্ভব হল না। ইতোমধ্যে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ-দাঙ্গা নানা বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে বাঙলাদেশকে পেরিয়ে যেতে হচ্ছে। মালাদের পরিবারকেও মাঝে মাঝে সে আগুনের আঁচ স্পর্শ করল। শিল্পী দেবপ্রিয় দায়ে অদায়ে এই পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—নির্লোভের নিরাসক্তি নিয়ে। আর মালা মাঝে মাঝে উচ্চারণ করেছে তার অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয়—সে মায়া পাহাড়ে যাবে। আনবে সোনার শুক-

পাখি, মুক্তাঝরার জল। মালা নিবিষ্টভাবে দেবপ্রিয়কে বলেছিল—অরুণ বরুণ কিরণমালা। কিরণের মতো আমিও চলেছি মায়াপাহাড়ের পথে। দুর্গম পথ। পাথরের পর পাথর। যত সব পথিক রাজপুত্র। পথে প্রাণ দিয়েছে। আনতে হবে মুক্তাঝরার জল। সে জল ছিটিয়ে দিলে ওরা বাঁচবে। আনতে হবে সোনার শুকপাখি। সে পাখি ঘরে নিয়ে ওরা সুখী হবে। পারব কি আমি আনতে? পারব কি ওদের বাঁচাতে ও সুখী করতে? না ওদেরি মতো পাথর হয়ে যাব? মালার এই ভাবাবেশ উপন্যাসের সমগ্র সুর-সংহতির মূলে অনেকখানি বারিনিষেক করেছে। ভারত-ইতিহাসের রক্তাক্ত বন্ধুর উপত্যকায় মালার প্রত্যয়-গম্ভীর ঘোষণা নৈতিক পুনরুজ্জীবনের মতো ধ্বনিত হয়েছে। সুতরাং মালা সেই রূপকথার রাজপুত্রের মত কাউকে যদি না পায় স্থগিত রাখবে তার বরমাল্য দান। নানা অভিজ্ঞতার শেষে মালা যখন মালার মতোই একটা মেয়ে হিসেবে নিজেকে উপলব্ধি করল তখন শিল্পী দেবপ্রিয় একদিন তাকে চমকে দিয়ে নিজেকে নিবেদন করে—"তোমার চোখের সামনেই একটা পাথর পড়ে আছে। সে রাজপুত্র না হলেও তুমি তাকে জীবন দিতে পারো।" মালা উত্তর দেয়—"তুমি রাজপুত্রই। রূপলোকের রাজপুত্র।" বই এখানেই শেষ নয়। গান্ধিজী হত হলেন। সারা ভারতের শোকের মুহূর্তে বিহ্বল মালা সান্ত্বনা খুঁজে পেল গান্ধিজীর আত্মদানের সার্থকতায়। সে বলল—(স্বস্তি) "পেলুম এই কথা জেনে যে পথিকদের একজন এতদিনে মায়াপাহাড়ে পৌঁছে গেছেন। নিয়ে এসেছেন মুক্তাঝরার জল। ছিটিয়ে দিয়েছেন পাথরের গায়ে। তার পর অদৃশ্য হয়ে গেছেন।" এখন বাকি থাকে সোনার শুক-পাখি। সেটি আনতে যাবে কে? মালা তারও জবাব দিল দেবপ্রিয়কে। বলল—"সেটি আনতে যেতে হবে মায়াপাহাড়ে নয়। রূপলোকে। সেও এক মায়ার রাজ্য। সেখানে যাবে তুমি।" মানুষের সংগ্রাম আর শিল্পীর সংগ্রামের নৈতিক তাৎপর্যের উপলব্ধিতে বই সমাপ্ত হল। সমস্ত উপন্যাসের অনিবার্য রস-পরিণাম রচনা করেছে মুক্তার মতো জমাট গদ্য। আর তার অন্তরাশ্রয়ী কবিত্বের দ্যুতি, সেই রসলোকের অক্ষয় দান। দেবপ্রিয়ের শেষ তিনটি সম্বোধন, দেবি, সখি ও প্রিয়ে যেন তিনটি সোপান পাঠককে নিয়ে যায় আনন্দের মহাকাশের কাছে। এখন এর অন্তরলোকের পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

এ সংক্ষিপ্তসার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মালা এ উপন্যাসের প্রধান চালিকাশক্তি। মালাকে স্পষ্ট করে তোলার ওপরে উপন্যাসের সার্থকতা নির্ভরশীল। সে কথা উপলব্ধি করেই অন্নদাশঙ্কর মালাকে প্রথাগত পরিবেশের হাত থেকে সরিয়ে তাকে মানুষ হতে দিয়েছেন তার পিতৃমানসলোকে। মালার বাবা মালাকে প্রকৃতি চিনিয়েছেন। সদসৎ-এর পার্থক্য বুঝিয়েছেন। বলে দিয়েছেন কী গ্রাহ্য, কী ত্যাজ্য। তাই বলে মালা কিন্তু তার বাবার অনুকৃতি নয়। শাশ্বত নারীত্বের প্রাণময়ী শক্তিতে সে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে চাইল। এই ওঠাটা উপন্যাসের আধারে ঠিক ভাবে আধারস্থ হয়নি বলে উপন্যাসের মাঝের অংশ বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। লেখক নিশ্চয় জানতেন যে মালাকে কিরণমালার আদর্শে গড়ে তোলার ওপরে বেশি জোর দিলে কিরণমালা-পরিকল্পনা প্রাধান্য বিস্তার করবে। তাহলে আদর্শের কাছে জীবন্ত মানুষটা গৌণ হয়ে পড়বে। তখন তা হবে দুষ্ট শিল্প বা 'ব্যাড্ আর্ট'। এই সঙ্কট থেকে মালাকে বাঁচানোর জন্য লেখক কিরণমালা-প্রসঙ্গকে মালার ভাবলোকের বিষয় করেছেন। তার মনোলোকের সঙ্গে রূপকথার বিশ্বাসের জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে উপন্যাস নীরব। এই নীরবতা না থাকলে, রূপকথার জগৎচারিণী মালার মনোলোক উপন্যাসের বিষয় হলে, লেখককে সে ক্ষেত্রে থীমের আতিশয্যের হাত থেকে বাঁচার জন্য বদলাতে হত প্রসঙ্গ-প্রকরণ সবই। কিন্তু সে অভিপ্রায়ের লোভে লেখক তাঁর সরল সুন্দর বক্তব্যকে ছাড়তে স্বীকৃত নন। কাজেই মালার ভাবলোকই হল তাঁর বিষয়। সরল প্রসঙ্গ প্রকরণেই তিনি রইলেন সন্তুষ্ট।

এবং আমরা সকলে জানি এ বিষয় অন্নদাশঙ্করেরই বিষয়। এ কথা ঠিক নয় যে অন্নদাশঙ্করের মানুষগুলো শুধু কথা বলে। এও ঠিক নয় যে তারা শুধুই ভাববিলাসী, কাজেই বাক্যবিলাসী। তারা কথা বলে, প্রচুর বলে, সুন্দর বলে—কিন্তু সে কথাগুলো তাদের চরিত্রের অংশ। কথার ভিতর দিয়ে তারা তাদের বুদ্ধিপ্রধান ভাবনাকে প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সে ভাবনার দ্বারাই তারা বিশিষ্ট হতে চায়। এর শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা দুয়ের বিষয়েই অন্নদাশঙ্কর সচেতন। তাই দেখা যায় তাঁর উপন্যাসেই তিনি ভাবনা-প্রধান চরিত্রগুলির পাশে পাশে এমন এক-আধটি চরিত্রের উপস্থাপনা করেন যারা একান্তই সহজ গোত্রের মানুষ। সত্যাসত্য-এ সে দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। সুখ উপন্যাসে এ বিষয়ের আরো শক্তিশালী নিদর্শন আমরা পেলাম। মালা ছাড়া এই উপন্যাসে যিনি আমাদের ক্ষণে ক্ষণে মুগ্ধ করেছেন তিনি মালার

মা। এই সহজ স্বাভাবিক সাংসারিক চেতনাসর্বস্ব মহিলাটি, উপন্যাসের উপসংহারে দেবপ্রিয় মালাকে বিবাহের প্রস্তাব করলে,—দেবপ্রিয় তুমি—বলে যে কান্নাটি কেঁদেছেন তাতে মালার কাব্যময় উক্তি ভেসে গেছে। মালার মা উপন্যাসে আছেন বলেই উপন্যাসে আর সকলকে সজত বলে মনে হয়। যে যতই বাড়াবাড়ি করুক আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি মালার মা আছেন, তিনি ঠিক সময়ে ঠিক মন্তব্যটি করবেন। মালা দেবপ্রিয়কে শেষ আশ্বাসে বলেছে যে সে দেবপ্রিয়কে সংসারের ধান্দা থেকে বাঁচাবে—এ প্রতিশ্রুতির শক্তি সত্যই মালা কোথায় পেয়েছে তা জানতে হলে তাকাতে হবে মালার মায়ের দিকে। মালার বাবার শিক্ষা মালাকে টানলেও, সে টানে পথ চলবার শক্তি মালার মায়ের জীবন থেকেই সে পেয়েছে। মালা এবং মালার বাবার সম্পর্কে এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সত্যাসত্য উপন্যাসের উজ্জয়িনী এবং উজ্জয়িনীর বাবার কথা। কিন্তু মিলটুকু এই পর্যন্তই। বরঞ্চ উজ্জয়িনীর সঙ্গে মালার অমিল অনেক বেশি চোখে পড়ে। উজ্জয়িনী খুঁজতে বেরিয়েছিল নিজের ভালোবাসার সার্থকতা। পক্ষান্তরে মালার অভিষ্ট শুধু নিজেকে ঘিরে আবর্তিত নয়। এ দিক থেকে মালা অন্নদাশঙ্করের নায়িকা-পর্যায়ে আর এক অগ্রসর সৃষ্টি। কিন্তু এই নায়িকা অন্নদাশঙ্করেরই নায়িকা। উজ্জয়িনী এবং মালার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাপ্তিতে, বাসনা আর তৃপ্তিতে ব্যবধান সহজে দৃষ্টি-গোচর হয়। কিন্তু কী করে চাইতে হয়, প্রমাণ করতে হয় চাওয়ার শক্তিকে—সে ব্যাপারে দুজনেই সমান চঞ্চল, সমান তৎপর, সমান নিঃশঙ্কিনী। এ ধরনের নায়িকা সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে অন্নদাশঙ্করের অন্যতম দান। এরা বারে বারে জীবনের ভাঙাগড়া টানাপোড়েনের দায়ে নিজেদেরও ভাঙে গড়ে।

এ উপন্যাসে আগেই বলেছি যে এই ভাঙাগোড়ার ব্যাপারটি আমাদের সর্বত্র প্রত্যয় উৎপাদন করে না। কিরণমালার পর্দা কেমন করে মালার মনে দানা বাঁধল এবং কেমন করে কিরণমালা থেকে আবার সে মালা হয়ে গেল লেখক সে ব্যাপারটি সম্বন্ধে যেন তত আগ্রহী নন। অথচ এটা যে একটা প্রধান ব্যাপার বারে বারে হাড়ের পাহাড় রক্তের নদীর প্রসঙ্গ ফিরে আসায় তা বোঝা যায়। লেখক মালাকে দুরূহ সাধনায় ব্রতী করাতে চান কিন্তু নিজে প্রসঙ্গ প্রকরণের ব্যাপক ও গভীর পরীক্ষায় সাহসী হলেন না কেন তা বোঝা গেল না। উপন্যাসের শেষের দিকে যখন রূপকথার অতি ক্ষীণ ফ্রেমটুকুও ভেঙে গেল—এবং তা ভেঙে না গেলে লেখকের জীবন-ব্যাখ্যা পূর্ণার্থ লাভ

করত না—তখন সে ভাঙনের কোনো প্রতিক্রিয়া আমরা অনুভব করি না। আমাদের কাছে দেবপ্রিয়র সোনার শুকপাখি আনতে যাওয়ার প্রসঙ্গটা শুধু কথা। সেই কথার সামনে মালা তার সমগ্র চতুষ্পার্শ্বের যন্ত্রণাময় হিংসা আর হননকে ভুলতে পারল যে-রূপলোকের প্রসঙ্গে সে-রূপলোক সম্বন্ধে তার আগ্রহের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব-পরিজ্ঞাত নই। ফলে মালার পরিশেষ বা উপসংহারে চতুরঙ্গ-র দামিনীর স্তায় স্বাভাবিকের সন্ধান প্রধান হয়ে উঠল না এটা দেখতেই পেলাম—অথচ তখনও যে-দুরূহ-ব্রতের সে সন্ধানী তাকে ভালো করে চেনা গেল না।

অন্নদাশঙ্কর নিশ্চয় সমালোচকের সান্ত্বনার ধার ধারেন না। আমাদেরও স্পর্ধা নেই যে তাঁকে সমালোচনার উপসংহারে পেশাদার সান্ত্বনা দেব। তাহলেও সত্যার্থেই এই কথা বলা দরকার যে সুখ বাংলা কথা-সাহিত্যের খোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-খোড়ের রাজত্বে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ভালো-লেগেছে বলেই মনের কথা সব বলতে চেয়েছি। বইটির ভূমিকাতে লেখক বলেছেন রূপকথার নির্যাস নিয়ে কাহিনী রচনার সাধ ছিল। ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদে বলেছেন "সুখ যদিও রূপকথার নির্যাস দিয়ে গঠিত তবু নিজে একটি রূপকথা নয়। সে অভিলাষ আমার অপূর্ণ রয়ে গেল।" শেষ উক্তিটির জন্ত মনে হয় যে বোধহয় শুধু নির্যাস নয়—রূপকথার কাঠামোর ব্যবহার সম্বন্ধেও লেখকের কোনো অভিপ্রায় থেকে থাকবে। Hardy-র উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচকেরা তাঁর উপন্যাসের ballad tale-এর প্যাটার্নের কথা বলেন। উপন্যাসে লোকসাহিত্যের নির্যাস এবং বিন্যাস দুয়ের ব্যবহারের পূর্ব নিদর্শন বিদ্যমান। লেখক যদি 'কিরণমালা'র সমগ্র প্যাটার্নকে উপন্যাসের আধারে মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে একালের গল্প বলতেন তাহলে গভীরতর সার্থকতার সন্ধান তিনি পেতেন। লোকসাহিত্যের প্যাটার্ন এবং নির্যাস লোক-জীবনের নিজস্ব পরিবেশের আপন সম্পদ। পাত্রপাত্রীকে যদি সেখানে স্বয়ম্ভু বলে মনে হয় তবে সে প্যাটার্ন ও নির্যাস বৃহত্তর তাৎপর্য বহন করে না। মেসোমশাই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব। মালাদের পরিবারও বাঙালী গেরস্থ পরিবারের প্রতিনিধি নয়। ফলে পটভূমিকাতেই লোকসাহিত্যের আত্মার সমর্থন ছিল না। অপূর্ণ সাধকে পূর্ণ করার জন্ত অন্নদাশঙ্করকে পূর্ণতর প্রয়াস করতে হবে। তাঁকেই করতে হবে। কেন না সেই ভাষা তাঁর হাতে আছে। সেই অনুরাগ তাঁর মনে আছে। সেই জীবনবোধ তাঁর হৃদয়ে আছে। যার

ফলে তিনি বলতে পারেন: "এ যেন অমাবস্যায় মাঝে একটি রঙমশাল জ্বালানো। সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যা হয়ে যায় দেয়ালী।" মনে পড়ে যায় বিষ্ণু দে-র বিখ্যাত উক্তি:

> "জ্বালাও দীপাবলী, অমার যেশ
> স্বচ্ছ উষা বটে মুছবে কাল—
> আমার প্রেম আলো, আঁধার দেশ
> আঁধার পৃথিবীতে ক্ষেতে কলে
> খামারে কারখানায় এ অমাবস্যা
> মিলাও দেয়ালীতে বিলাও শেষ।"

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার। র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব। তিন টাকা।

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে রবীন্দ্রচর্চায় দেশব্যাপী উৎসাহ স্বাভাবিক। বিশ্বের সর্বত্র যখন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও মনীষা অভিনন্দিত হচ্ছে, তখন স্বদেশবাসীরা তাঁকে নিয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নানা পত্র পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ছাড়াও অনেক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার গ্রন্থটিও সুবিশাল রবীন্দ্রকীর্তির পর্যালোচন।

লেখক ইতোমধ্যে ভাষা ও জাতিসমস্যা বিষয়ে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রস্তাব লিখে সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার গ্রন্থটিও তেরোটি প্রস্তাবের সমষ্টি। প্রস্তাবগুলি নাতিদীর্ঘ; বক্তব্য প্রাঞ্জল। অন্ধ সংস্কার-প্রবণতার বিরুদ্ধে, মানুষের অপমানের বিরুদ্ধে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, অপরাজেয় মানবতাবাদ প্রভৃতি অধ্যায়ের বক্তব্য সময়োচিত হয়েছে। উপনিষদের কবি, ভূমার কবি, অরূপরসিক ইত্যাদি অভিধায় রবীন্দ্রনাথকে "খ্যাতির মঞ্চে সংকীর্ণ বাতায়নে" বন্দী করে রাখা হয়। রবীন্দ্রনাথ যেন সত্য-শিব-সুন্দরের অলৌকিক আলোর প্রতীক, জীবন সংগ্রামের কেউ নন। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের গ্রন্থটি সেই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে সহায়ক হবে। রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক প্রচুর উদ্ধৃতি থাকায় যাঁরা কবির সুবিপুল প্রবন্ধসম্ভারের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁরাও উপকৃত হবেন।

কিন্তু লেখকের উপস্থাপনারীতি খুবই ত্রুটিপূর্ণ। ভাষায় সাংবাদিক দ্রুততা এবং বক্তৃতার চিহ্ন প্রায় সর্বত্র। বিশ্লেষণ অল্প বলে লেখকের মন্তব্যগুলির উগ্রতা অহেতুক মনে হয়। লেখক বলেছেন, "প্রথমতঃ, দেখা উচিত যে তাঁর চিন্তার অগ্রগতি কোন পর্যায়ে এসে থেমে গেছে, না, এগিয়ে চলেছে এবং দ্বিতীয়তঃ, এগিয়ে গেলে তা গতির ছন্দে সেই বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর গণ্ডীকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে চলেছে কিনা।...যদি রবীন্দ্রনাথকে অন্তরের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করতে বসে তাঁর অসঙ্গতিগুলিকে না দেখি তবে যাঁরা অধ্যাত্মবাদী ধারাটিকেই প্রাধান্য দেন তাঁদের জবাবে কিছু বলার থাকে না। আবার যদি অসঙ্গতি খোঁজার চেষ্টাটাই বড় হয়ে ওঠে তাহলে রবীন্দ্রনাথের সুমহান অবদানকে বোঝাও সম্ভব হবে না এবং তাঁর উত্তরাধিকারকে কাজে লাগানোর পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সেই উত্তরাধিকারের অপব্যাখ্যা করার সুযোগ পাবে।" (১৯ পৃঃ) বক্তব্য যথার্থ; রবীন্দ্রভাষ্য রচনার পূর্বে লেখকের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি অঙ্গীকার করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ ধরনের মন্তব্য রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চা নয়, রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার তো নয়ই। যান্ত্রিক বিচারের ভ্রান্তি সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করলেও সত্যেন্দ্রবাবু নিজে প্রায়শ যান্ত্রিক বিভাজনের ছকে আটকে পড়েছেন। 'সঠিক দ্বন্দ্ব-মূলক পদ্ধতি' বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন জানি না, লেনিনের 'তলস্তয় প্রসঙ্গে' প্রবন্ধগুলিতে বোধহয় দ্বন্দ্বমূলক সাহিত্য-বিচারের সার্থক নিদর্শন আছে। সত্যেন্দ্রবাবু সে-রীতি আশ্রয় করে লিখলে মার্কসবাদী লেখকদের রবীন্দ্রচর্চায় একটি অভাব পূরণ হত।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী অভিধা সদ্যোচ্চারিত নয়, অথচ সত্যেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের ঐ দিকগুলি শুধু স্পর্শ করে গেছেন, আলোচনা করেন নি। "তিনি ছিলেন একাধারে ঋষি ও কবি।"—এ ধরনের বাক্য আকস্মিক (৬ পৃঃ) মনে হয়। তবু রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার সাধারণ পাঠককে ভ্রান্তি নিরসনে সাহায্য করবে। গোষ্পদে মহাকাশ প্রতিবিম্বিত করা দুরূহ কর্ম। সেই কর্মের যথাসাধ্য প্রয়াস করেছেন সত্যেন্দ্রবাবু। মানুষের অপমানের বিরুদ্ধে, হিন্দুমুসলমান সমস্যা, অপরাজেয় মানবতাবাদ রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠের সৎ নির্দেশিকা।

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

মধুসূদন (অন্তর্জীবন ও প্রতিভা)॥ — শশাঙ্কমোহন সেন। প্রতাপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। এ. মুখার্জি এণ্ড কোং। চার টাকা॥
মধুসূদন: কবি ও নাট্যকার। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। এ. মুখার্জি এণ্ড কোং। সাড়ে তিন টাকা॥

প্রথম বইটি বিখ্যাত পুরাতন বইয়ের পুনর্মুদ্রণ। বইটির গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে বলবার দরকার করে না। যোগীন বসুর ও নগেন্দ্রনাথ সোমের বই যেমন মধুসূদন সম্পর্কে তথ্যের প্রধান আকর, তেমনি এ বই মধুসূদনের মানস বিশ্লেষণের পথে বলতে গেলে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এর পরে মধুমানস-সন্ধানী যে কটি বই বেরিয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই কোনো না কোনো ভাবে এ বই থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে এবং অনেকে তাঁদের বইতে শশাঙ্কমোহন সম্পর্কে সকৃতজ্ঞ উল্লেখও করেছেন।

এক হিসেবে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের বই শশাঙ্কমোহনের ঠিক বিপরীত কোটিতে। এ বইতে ডঃ সেনগুপ্ত মধু-মানসের বিশ্লেষণ বা অনুসন্ধান করতে চান নি, সাহিত্যের মহাজন-উক্ত মূল কতকগুলি সূত্রকে অবলম্বন করে মধুসূদনের গ্রন্থগুলির বিচার করেছেন।

বইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতামালার সংকলন। চারটি এর ভাগ। প্রথমে মহাকাব্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মধুসূদনের মহাকাব্যের আলোচনা। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে গীতিকাব্য ও নাটকের বিশ্লেষণ।

এর মধ্যে মহাকাব্যের সংজ্ঞা-সন্ধানের আলোচনাটি বিশেষ উপাদেয়। মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অ্যারিস্টটল ও প্রাচ্য আলঙ্কারিকদের মতের বিশদ বিচার করেছেন লেখক এই পরিচ্ছেদে। এর থেকে উদ্ভূত সূত্রের প্রয়োগে মধুসূদনের তিলোত্তমা-সম্ভব ও মেঘনাদ বধ-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন তার পরে। এই অধ্যায় দুটির উল্লেখযোগ্য বিষয়: মেঘনাদ বধ সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে ডঃ সেনগুপ্তের মত প্রকাশ। যেমন, লক্ষ্মণ কর্তৃক অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদের হত্যা প্রসঙ্গে প্রচলিত মত এই যে এতে রামলক্ষ্মণের কাপুরুষতাকেই যেন কবি দেখাতে চেয়েছেন এবং মেঘনাদ সম্পর্কে তাঁর অতিরিক্ত সহানুভূতির স্বাক্ষরও এটি; মেঘনাদের

অসহায় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কবি পাঠকের সমস্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন রাক্ষস-পক্ষে। ডঃ সেনগুপ্ত এই মত মানেন নি। তিনি মধুসূদনের স্বপক্ষে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, ভারতীয় মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যই হল যে তা উচ্চনীতি-বিধৃত। "মধুসূদনের কাব্যে যে লক্ষ্মণকে দেখিতে পাই তিনি এক বিশ্বব্যাপী নৈতিক শক্তির প্রতিনিধি।·· লঙ্কার অধীশ্বরী দেবতা এই নীতির লঙ্ঘনে বিচলিত····। ···যে মারীচ সীতাহরণে রাবণের সহায়ক হইয়াছিল সে তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া নিজের প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা দিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে, যে চরাচরব্যাপী শক্তির কাছে ইন্দ্রজিৎ পরাস্ত হইয়াছেন, লক্ষ্মণ তাহার উপলক্ষ্য মাত্র। লক্ষ্মণের বাহুবলকে প্রাধান্য দিলে এই মহাকাব্যোচিত সর্বব্যাপকতা নষ্ট হইয়া যাইত।······যে ধর্মকে পরদার-নিরত পরস্ত্রী-অপহারক রাবণ পদদলিত করিয়াছেন তাহা রাক্ষসেরাও স্বীকার করেন এবং রাক্ষসরাজমহিষী চিত্রাঙ্গদার খেদোক্তিতে তাহার অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি পাওয়া যায়।···ভারতবর্ষীয় মহাকাব্যের সর্বাপেক্ষা বড় কথা হইতেছে আদর্শের বিশুদ্ধতা। ভীষ্মের বাহুবল কাহারও অপেক্ষা কম নয়, চরিত্রবলে তিনি সকলের চেয়ে বড়। কিন্তু নৈতিক আদর্শের বশবর্তী হইয়াই তিনি অধর্মের পথ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং অর্জুনের কাছে তিনি ও অন্যান্য কৌরব সেনাপতিরা যে পরাস্ত হইয়াছেন তাহা বাহুবলের কাছে বাহুবলের পরাজয়মাত্র নহে, উন্নততর নীতির কাছে নিম্নতর নীতির পরাভব। তাঁহাদের ব্যক্তিগত শৌর্য ও ব্যক্তিগত চরিত্রবল এই বৃহত্তর নৈতিক সংঘর্ষকেই চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে।"

তৃতীয় অধ্যায় গীতিকাব্যের আলোচনা। এর মধ্যে তিনি বীরাঙ্গনা-কেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যদি অন্তর্ভুক্ত বীরাঙ্গনাকে গীতিকবির সৃষ্টিই বলি, তবে নিশ্চয়ই এ স্বর এলিয়ট-বর্ণিত "কবির তৃতীয় স্বর।" এ কথাও হয়তো বলা যায় যে আধুনিক বাংলা নাট্যকাব্যের প্রাথমিক সাক্ষাৎ এই বীরাঙ্গনাতেই পাওয়া যাবে। কয়েকটি 'পত্রিকা' এমন নাটকীয় মুহূর্তে বিন্যস্ত, কয়েকটি লিপি-ভাষণ এমন নাট্যগুণান্বিত যে বলতে দ্বিধা থাকে না, এখানে নাটক ও কবিতা একটি সূত্রে বাঁধা পড়েছে। বীরাঙ্গনায় নাট্যকার মধুসূদন ও কবি মধুসূদন সম্মিলিত। মেঘনাদেও এ ঐক্য দুর্লক্ষ্য নয়। এই দিক থেকে বীরাঙ্গনা-র আলোচনায় চমৎকার একটি সুযোগ ছিল। কিন্তু ডঃ সেনগুপ্ত এ দিকটায় দৃষ্টি দেন নি।

অবশ্য গ্রন্থ শেষ করে আরও একটা অতৃপ্তি থেকে যায়: মধুমানস থেকে

একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থগুলির আলোচনা করেছেন সমালোচক। এবং এইখানেই আলোচ্য গ্রন্থ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত কোটির।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ॥ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। বাণী নিকেতন। তিন টাকা॥

বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ॥ বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। বাণী নিকেতন। তিন টাকা॥

আলোচ্য গ্রন্থদুটিই তৃতীয় সংস্করণের মুখ দেখছে। সুতরাং পাঠক মহলে গ্রন্থদ্বয় নিজগুণেই সুপরিচিত। বেশ কিছু কাল আগে প্রাবন্ধিক হিসাবে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তরুণ মহলে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং তাঁর অজস্র পাঠক নতুন রচনার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করত। বর্তমান সমালোচকও তাদের অন্যতম। রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থদুটি আবার প্রকাশিত হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই সুখের বিষয়। বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ-এ রবীন্দ্র প্রতিভার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণকে সঠিক বলেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক চিন্তা এবং সংগৃহীত তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্র প্রতিভার সামগ্রিক বিশ্লেষণ বলে স্বীকার করতে সংকোচ হয়। রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথও কবির আশীর্বাদ পেয়েছে। এই গ্রন্থে দুইবোন, মালঞ্চ, বাঁশরী, চার অধ্যায় এবং শেষের কবিতাকে মোটামুটি ভাবে ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণে এই বিচারও অসম্পূর্ণ। কিন্তু যতদূর মনে হয় সে দিন এই জাতীয় বিচার বিশ্লেষণের আগ্রহ ছিল একটা বিরাট স্পর্ধার বিষয়। শ্রী চট্টোপাধ্যায় যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আজও তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। কারণ রবীন্দ্রনাথের আলোচিত গ্রন্থকটির মনস্তাত্ত্বিক বিচার আজও সম্পূর্ণ হয়নি। তাই শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টা এখনও বরণীয়।

অথ নট ঘটিত॥ সূত্রধার। বসুধারা প্রকাশনী। তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.॥ সহজ ও মিষ্টি করে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস বিবৃত করতে চেয়েছেন সূত্রধার। ইতিহাসকে ইতিহাস রেখেও সহজ ও মিষ্টি অর্থাৎ 'রম্য' করে তোলা যায়। দেশ-বিদেশে এ ধরনের গ্রন্থের অভাব নেই। সেখানে ইতিহাস তার সমস্ত

অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে বিরাজমান। কিন্তু অথ নট ঘটিত গ্রন্থে সূত্রধার বাংলা রঙ্গমঞ্চের জটিল বিকাশপদ্ধতিকে ঐতিহাসিকের চোখ দিয়ে না দেখে কথকের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছেন বলে এই গ্রন্থ যতটা জন-মন-রঞ্জক ঠিক ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে ঘটনাগুলি নির্ভুল হবার জন্য ও রচনাগুণে এই গ্রন্থ এক ধরনের পাঠকদের তৃপ্তি দেবে বলে আশা করা যায়।

জ্যোতির্ময় বসু

ফুলিঙ্গ ॥ বার্ণিক রায়। কবিপত্র প্রকাশনী। দু টাকা পঁচাত্তর ন. প.॥
যবনিকা ॥ নীরেন গুপ্ত। ভবানীপুর বুক ব্যুরো। আড়াই টাকা॥
অতলান্ত ॥ প্রণব বসু। গ্রন্থজগৎ। দেড় টাকা॥

উনিশ শো চুয়াল্লিশের পূর্বে অধিকাংশ বাংলা নাটকই রচিত হয় পেশাদার থিয়েটারের, ব্যবসায়িক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। চুয়াল্লিশ সালের 'নবান্ন' থেকে বাংলায় নবনাট্য আন্দোলনের শুরু। আর এই নবনাট্য আন্দোলন বাংলা নাটককে শুধু যে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়েছে তা নয়, তাকে জীবনমুখীও করে তুলেছে। এই ধারায় অনুপ্রাণিত কিছু নাট্যকার তাই দর্শকদের চিত্তবিনোদনকেই একমাত্র কর্তব্য বলে গ্রহণ করেন নি, নাটকের মাধ্যমে আধুনিক জীবনের নানা জটিল প্রশ্নের গ্রন্থি উন্মোচনের দায়িত্বও নিয়েছেন। ফুলিঙ্গ-গ্রন্থে সংকলিত সাতটি নাটিকার রচয়িতা শ্রীবার্ণিক রায়ের নাট্যরচনায় সেই দায়িত্ব গ্রহণেরই আভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু ঐ আভাসমাত্রই পাওয়া গেল। নাটকের স্বনির্ধারিত সংজ্ঞার কৃত্রিমতা তাঁর প্রত্যেকটি নাটিকার পূর্ণবিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'নিবেদন'-এ তিনি বলেছেন, নাটক সম্বন্ধে তাঁর মনে এক বিশ্বাস রয়েছে। "মানুষ নিজেকে প্রকাশ করবার সহজাত ইচ্ছাতেই নাটক সৃষ্টি করে না। আসলে তার মনে একটি নাটকীয় ইন্‌স্টিংক্ট রয়েছে। সেই অজানিত নাটকীয় সত্তাটিই বাইরের সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের রূপ ধারণ করে।" কিন্তু একদিকে মানুষের মন আর সেই মনের যে কোনো ইন্‌স্টিংক্ট, অন্যদিকে সমাজ—এই দুই দিকের কোনোটিই স্বাধীন স্বতন্ত্র নয়, পরস্পর নির্ভর। তাই ইন্‌স্টিংক্টের উপর সমাজের যে কাজ, সে কাজ ইন্‌স্টিংক্ট-নিরপেক্ষ নয়। পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার ফলে দুই পক্ষেরই আপেক্ষিক অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষকে পরিবর্তিত রূপ দান

করে। একাধারে স্রষ্টা ও সৃষ্টি এই দুই পক্ষের পরিবর্তনের ও পরিবর্তিত রূপের আপেক্ষিক অবস্থার পার্থক্য কোনো নির্দিষ্ট কাল পরিমাণে বিধৃত হয়ে নাটকের সৃষ্টি করে।

উইল-কে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিলে বলা যায়, প্রত্যেকটি নাটিকাতেই শ্রীবার্ণিক রায় তাঁর স্বনির্ধারিত সংজ্ঞাকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। সেদিক থেকে তিনি নিষ্ঠাবান। কিন্তু সংজ্ঞার কৃত্রিমতার ফলে অধিকাংশ চরিত্রই কৃত্রিমতাদোষ মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে নি। পেণ্ডুলাম নাটিকার মিত্রা তার সমস্ত দুঃখ নিয়ে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, মাস্টারমশাই মিত্রাকে পরবর্তী সংলাপে এগিয়ে দেবার সূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছেন। ক্ষণিকের আবির্ভাবে অনীতা শুধুমাত্র এক বিচ্ছিন্ন উত্তেজনার প্রতিমূর্তি। আর সময় সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পাখির খাঁচার দোলন-গতির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। আমার এ ধূপ না পোড়ালে নাটিকার অনন্ত চরিত্র তার সংশয় নিয়ে, অনীতা ও অজিত তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে নাটকীয় সংসক্তিবিহীন ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা কক্ষে উপস্থিত। তাই স্ফুলিঙ্গ নাটিকার অমিত তার জ্ঞান, শিক্ষা, দীক্ষা সমস্ত কিছু নিয়েও কৃত্রিমভাবে অসহায় হয়ে আত্মহত্যায় নিঃশেষ হয়ে যায়। নীল রক্ত নাটিকায় অমিত তার দেশের বিফলতা নিয়ে, অন্ত তার পরিবেশ-বিচ্ছিন্নতা নিয়ে মীনাকে কেন্দ্র করে পরস্পরের প্রতি কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক ভাবে হিংস্র। মা নাটিকায় শমিকের বিচ্ছিন্ন স্বগতোক্তি মা বা বোনের চরিত্রমানস-উদ্ভূত আলোচনা-কক্ষের সঙ্গে সংঘাত-সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত নয়। অথচ বাঁধ নাটিকায় অসিত-বুলবুলির ক্ষেত্রে রচয়িতা অংশত সক্ষম। কারণ কিছু কিছু অংশে চরিত্র দুটি তাদের নিজ নিজ দুঃখের পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও পরস্পরের সঙ্গে নাটকীয় সংসক্তির দ্বারা সংযুক্ত। প্রত্যেকটি নাটিকায় নাট্যনির্দেশের মধ্যে রচয়িতার থিয়েটার সম্পর্কে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার অভাবের পরিচয়ই প্রকট। অথচ প্রত্যেকটি নাটিকাতেই জীবনমুখী প্রশ্ন করার চেষ্টা শ্রীবার্ণিক রায় করেছেন—যদিও সে সমস্ত প্রশ্ন সুগঠিত নয়। গদ্যে রচিত হয়েও কিছু কিছু অংশের কাব্যময়তায় রচয়িতার ক্ষমতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। তাই উল্লিখিত সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও, নাটক ও থিয়েটার-ভাবের আনুপাতিক সমন্বয়ের উপস্থিতি বার্ণিক রায়ের ভবিষ্যৎ নাট্যরচনাকে সার্থক করে তুলবে বলেই মনে হয়।

শ্রীনীরেন ভঞ্জের যবনিকা চারটি একাঙ্কিকার সংকলন। নাটিকা চারিটির নাম যবনিকা, অমীমাংসিত, ত্রয়ী ও সকলি গরল ভেল। যবনিকা নাটিকার স্বললিত ও নিরঞ্জনের মধ্যে প্রেমের ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুস্বরূপ অলকার উপস্থিতি। অলকা চরিত্রের আলোচনা কক্ষ স্বললিতের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে এবং নিরঞ্জনের সঙ্গে গোপন প্রেমের সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত। একই আলোচনা-কক্ষের দুই বিপরীত অংশের সংঘাতের মাধ্যমে নাটিকা পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় এবং শেষ পর্যন্ত অলকা স্বললিতের সঙ্গে আপাত-স্বাভাবিক সম্পর্কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মনোরম বিন্যাসের ফলে নাট্যকৌতূহল সর্বত্রই সমান। কিন্তু শেষের সম্পর্কের আপাত-স্বাভাবিকতা নাটিকাটির বাস্তবতা সম্পর্কে মনকে সংশয়ান্বিত করে তোলে। ত্রয়ী নাটিকা কিন্তু এই ত্রুটি থেকে আংশিকভাবে মুক্ত। অতনুকে কেন্দ্র করে নীপার ও স্বলতার প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং পরিণতিতে নীপার প্রেম আপন মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। পরিণতি স্বাভাবিক হলেও নীপা চরিত্রের আলোচনা-কক্ষে পরিমিত পরিসরের অভাব। অতনু চরিত্র কোনো মুহূর্তেই সূত্রধারের ভূমিকা থেকে চরিত্রের পর্যায়ে উন্নীত নয়। সকলি গরল ভেল কৌতুক নাটিকা। কৌতুককর পরিস্থিতি সৃষ্টিতে ও কৌতুকবহ সংলাপ রচনায় নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অমীমাংসিত নাটিকার ঘটনাস্থল এক রেস্তোরাঁ, আর চরিত্র বলতে সেই রেস্তোরাঁর কিছু খরিদ্দার। কেন্দ্রীয় চরিত্র বিনয় সম্পর্কে নানা কাহিনী। এই সমস্ত কাহিনীর সমন্বয়ে চরিত্র সম্পর্কে একটি মীমাংসায় হয়তো আসা যায়; কিন্তু প্রায় শেষ মুহূর্তে এক ভদ্রমহিলার আবির্ভাব চরিত্রটিকে পুনরায় অমীমাংসিতের পর্যায়ভুক্ত করে তোলে। কিন্তু নাটিকাটিতে ঘটনা ঘটাবার প্রয়োজনেই যেন চরিত্রদের উপস্থিতি। এর ফলে কোনো চরিত্রই সংলাপের মাধ্যমে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি। প্রত্যেকটি চরিত্র সংলাপের বাহক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ শ্রীনীরেন ভঞ্জ সংলাপকে যদি চরিত্রমানসের প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে পারতেন, তবে নাটিকাটি সার্থক হয়ে উঠত।

প্রণব বসুর অতলান্ত নাটিকার অনাদিবাবুর স্ত্রীর মৃত্যুকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবার সাহসের অভাব ছিল। তাই নিজেকে তিনি—স্ত্রীর মৃত্যু হয় নি—এই মিথ্যা মোহের বশবর্তী করে নিয়েছিলেন। মিথ্যা ধারণা করে নিয়েছিলেন যে পুত্র কল্যাণের সঙ্গে কণিকার বিবাহে তাঁর স্ত্রীর সম্মতি

নেই। অথচ তাঁর এই সব ধারণার কোনো কারণ দেখানো হয় নি। নাটক তৈরি করার প্রয়োজনে তাঁকে দিয়ে ধারণা করিয়ে নেওয়া হয়েছে মাত্র। কল্যাণ বা কণিকা কেউই মিথ্যা ধারণা দূর করে দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করে নি। এমন কি ডাক্তারও নয়। অথচ এদের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে সুন্দর একটি নাটক রচিত হতে পারত। কল্যাণ, কণিকা ও ডাক্তার তিনজনেই অনাদিবাবুর অসুস্থ কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন অনাদিবাবুর 'করেনারি অ্যাটাকে' মৃত্যুর মতো অতিনাটকীয় পরিণতিকে মঞ্চে উপস্থিত করার জন্য, অনাদিবাবুকে দীর্ঘায়ু করার জন্য নয়। কোনো চরিত্রই যুক্তিসঙ্গত পরিবেশ নিয়ে নাটিকায় উপস্থিত নয়। বত্রিশ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র নাটিকা পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত। এক দৃশ্য আপন গতিতে পরবর্তী দৃশ্যের সূত্রপাত করে নি। পরিণতির কথা ভেবে প্রত্যেকটি দৃশ্যকে বিচ্ছিন্নভাবে কল্পনা করা হয়েছে। সংলাপও অভিনয়বহ নয়। প্রণব বসুর ভবিষ্যৎ সার্থক নাট্যরচনা ও একনিষ্ঠ নাট্যানুশীলনের অপেক্ষা রাখে বলেই মনে হয়।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

কাঞ্চনরঙ্গ॥ শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র। গ্রন্থপীঠ। আড়াই টাকা॥

নাটকটির প্রথম দিকে সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা রীতি গৃহীত হয়েছে। সূত্রধার ও নটী তাদের সহজ হাস্য পরিহাসিকতার মধ্য দিয়ে প্রস্তাবনায় নাটকীয় কাহিনীর চুম্বক বলে দিয়েছে। তাদের বলার সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের অভিনয় শুরু হয়ে গেছে। বর্তমান নাটকে এই আঙ্গিক কতখানি অনুসরণযোগ্য, ঐতিহ্যের দাবি এক্ষেত্রে শুধু আঙ্গিক-চর্চায় পর্যবসিত কিনা— এ প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যায়।

নাটকে মূল প্রতিপাদ্য হলো এই যে, টাকা না থাকলে মানুষকে ঘৃণা করা হয়, টাকা পেলে সেই ভৎসিত বা ঘৃণিত মানুষই সমাজের উচ্চ প্রাঙ্গণে আদৃত হয়। নাটকের নায়ক চরিত্র পাঁচুর জীবনকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তবে, নাটকটিতে কোনো ব্যাপক ও গভীর জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হয় না।

নাটকটি কমেডি বলেই লটারির টিকিটের ভুল নম্বর টেলিগ্রাম মারফৎ সংশোধিত হয়ে এসেছে। কিন্তু শিল্পচৈতন্যের দিক থেকে ও

বাস্তবতার দাবিতে নাটকটির শেষ হওয়া উচিত ছিল সেখানে—যেখানে পাঁচু টাকা পাওয়া ও না-পাওয়ার সংবাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় নিজের আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একাকী জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হতে প্রস্তুত হয়েছে। লটারির টাকা পাওয়া আর জুয়ো খেলে টাকা পাওয়া একই। সুতরাং লটারির টাকা পাওয়ার সংবাদে ভালো মানুষের কাছে ভগবানের নিরপেক্ষ ন্যায়-নীতির করুণা কল্পনা মানবিক সত্যকে অস্বীকার করে। ফলে কাঞ্চন-রঙ্গের রঙ্গ শেষ পর্যন্ত রঙ্গেই নিঃশেষিত।

চরিত্রসৃষ্টি অধিকাংশই টাইপে পর্যবসিত। এক অর্থবৃত্তকে কেন্দ্র করে সকলের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, সামান্য মানব রসের জারক মিশিয়ে ঘটনামূলক নিছক হালকা কমেডি রচনাই কাঞ্চনরঙ্গের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকীয় চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতে ও চারিত্রিক অসংলগ্নতায় যে স্বতঃস্ফূর্ত হাসির উচ্ছ্বাস—তা এখানে নেই। অভিনয়ের সাফল্য, সাহিত্য-রসাস্বাদনের সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত নয়—কাঞ্চনরঙ্গে এ কথা আবার প্রমাণিত হলো।

মাণিক রায়

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

রিচার্ড হেনরি টনি (Tawney) রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, অভিনেতাও না—ব্রিটিশ লেবার পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও তিনি প্রধানত ছিলেন সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষক। স্বভাবতই তাঁর মৃত্যু সংবাদ (লণ্ডন, ১৬ই জানুয়ারি) এদেশের সংবাদপত্রে উপেক্ষিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হয় এদেশের সমাজবাদী আন্দোলনে টনির প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। ত্রিশের যুগে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা—যাঁরা সমাজবাদকে বরণ করেছেন—তাঁরা অনেকেই টনির কাছে নানানভাবে ঋণী।

পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কথা—আজ সে-সব দিন আরো দূর মনে হয়—মার্কস এঙ্গেলস লেনিন-এর বই তখন এদেশে সুলভ ছিল না। ছ'পেনি দামের পেঙ্গুইন সংস্করণে টনির 'রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড রাইজ অব ক্যাপিটালিজম' পড়ে অনেকেই তখন ধর্মের অহিফেনের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। তাঁর 'ইক্যুয়ালিটি' ও 'অ্যাকুইজিটিভ' সোসাইটিও হয়তো অনেককেই সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে।

টনির সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করবার অবশ্য অন্য কারণও আছে। টনি জন্মেছিলেন এই কলকাতা শহরেই, ১৮৮০ সালে। তাঁর বাবা সি. এইচ. টনি ছিলেন কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ। কিন্তু সেটা গৌণ কারণ। কেননা, কলকাতায় জন্মালেও ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল সামান্যই। ল্যাস্কির মতো টনির সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগটা মোটের উপর আত্মিক—যদিও এমন ব্যক্তিও হয়ত দু-একজন পাওয়া যাবে যাঁরা লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্‌স বা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছেন।

অবশ্য টনির সঙ্গে আমাদের মতের মিল যতটুকু, অমিল তার থেকে কম নয়। টনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক সমাজবাদী। বিপ্লবী পন্থায় তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি মনে করতেন ভালো মানুষেরাই ভালো সমাজ গড়তে পারে—শুধু অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর হলেই ভালো সমাজ, সমাজবাদী সমাজ গড়ে উঠবে না। এ যুক্তির মধ্যে সত্য হয়তো কিছু আছে—আজ সমাজবাদীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কাল থেকেই দেশে সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হবে এমন

অবাস্তব ধারণা আজ আর নিশ্চয়ই কেউ পোষণ করেন না। সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ সাধারণ মানুষের মধ্যে চারিয়ে যেতে সময় লাগে। এই সময়টা এমন কি চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরও হতে পারে। প্রবাদই আছে অভ্যাস যায় না মলে। কিন্তু কথা হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর ব্যাতিরেকে কি এই পরিবর্তন সম্ভব? অন্তত আজ পর্যন্ত ইতিহাসে তার কোনো ইতিবাচক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

টনি অবশ্য অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতেন না—কিন্তু তিনি মনে করতেন নিয়মতান্ত্রিক পথেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হবে। বিপ্লবী পন্থার বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি ছিল এই যে "Men donot burn down the house which they intend to occupy, even though they regard its existing tenant as public nuisence." (Equality. p. 99) এই যুক্তির গলদ স্পষ্ট। বাড়ি ভেঙে না ফেললেও পূর্বতন পাজী মালিক ফের যাতে বাড়ির দখল নিতে না পারে লোকে নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়ত, বাড়িটাকে নিশ্চয়ই সংস্কার করে নিজেদের ব্যবহারোপযোগী করে নেয়। তথাকথিত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি এই দিক থেকেই ব্যর্থ। বাড়ির পুরনো মালিকদের ক্ষমতায় পুনর্বার আরোহনের পথ তা বন্ধ করতে পারে না। লেবর পার্টি পাঁচ বছরে যদি কোনো কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, কনজারভেটিভ পার্টি ক্ষমতায় ফিরে এসে অনায়াসে তা বাতিল করে দিতে পারে। এরকম দৃষ্টান্ত ইংলণ্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাসেই যথেষ্ট পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, নিয়মতান্ত্রিক সমাজবাদী দলগুলোর মধ্যে বাড়িটা সংস্কারের আগ্রহেরও অভাব দেখা যায়। বিলেতের লেবর পার্টি একাধিকবার গভর্ণমেন্ট গঠন করেছে কিন্তু পুঁজির ক্ষমতাকে চূর্ণ করবার কোনো প্রয়াসই তারা করে নি। কাণ্ড দেখে ফেবিয়ানদের খপ্পরে-পড়া ভালো মানুষ বার্ণার্ড শ-কেও বলতে হয়েছে সেলাইয়ের কল যদি বা ডিম প্রসব করতে পারে—বিলেতের লেবর পার্টি সমাজবাদ কখনও প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না।

অবশ্য অবস্থা বিশেষে নির্বাচন মারফতেই সমাজবাদী কি সাম্যবাদী দল হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পাবে আর সেই নির্বাচনী বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি জনজাগরণের তরঙ্গ এতটা উত্তাল হয়ে ওঠে, যার ফলে পুঁজিতন্ত্রের প্রতিরোধ ক্ষমতাই আর থাকবে না সে ক্ষেত্রে হয়তো পার্লামেন্টে বিল পাশ করেই সমাজবাদী ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব। কিন্তু বিনা রক্তপাতে বা

পার্লামেন্টে বিল পাশ করে হলেও একে নিয়মতান্ত্রিক পথ বলা সঙ্গত নয়। এটাও বিপ্লবী পন্থাই। রক্তপাত বা গৃহযুদ্ধ আর বিপ্লব সমার্থক শব্দ নয়। রক্তপাত বা গৃহযুদ্ধ মারফৎ ফ্যাশিস্তরাও ক্ষমতা দখল করে কিন্তু তাকে কেউ নিশ্চয়ই বিপ্লব বলবে না। বিপ্লব বলতে বোঝায় বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বদলে এক উন্নততর সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ কি ভাবে ক্ষমতা দখল করা হল সেইটে বড় কথা নয়, ক্ষমতা দখলের পর কি করা হল সেইটেই বড় কথা। লেবার পার্টি নির্বাচনে জিতে যদি উৎপাদন ব্যবস্থা জাতীয়করণ করত, যদি সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিলোপ ঘটাত, যদি সমাজবাদী বণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন করত অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বদলে সমাজবাদী ব্যবস্থার প্রবর্তন করত তাহলে কেউই তার সমালোচনা করত না। কিন্তু লেবর পার্টি তা করে নি। লেবার রাজত্বের পরও সামাজিক অসাম্য বিলেতে তেমনই আছে। আছে যে 'ইকুয়ালিটি'র সংশোধিত সংস্করণে টনিই তা দেখিয়েছেন।

কিন্তু পথের ব্যাপারে টনির সঙ্গে আমাদের মতের অমিল থাকলেও একথা অবশ্যই স্বীকার করে সামাজিক অসাম্য সম্পর্কে তার বিরাগ ছিল আন্তরিক। তিনি তার নিজের মত করে সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামও করেছেন। বিশেষ করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা সামাজিক অসাম্যকে বাঁচিয়ে রাখে তার বিরুদ্ধে, the…school for the well-to-do পাবলিক স্কুল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর আজীবন সংগ্রাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর বইগুলি থেকেও সমাজবাদী আন্দোলন দীর্ঘকাল পরে অনেক শাণিত অস্ত্র।

প্রদ্যোৎ গুহ

বিয়োগপঞ্জী

অমরেন্দ্র ঘোষের জীবনাবসান হয়েছে।

অল্প বয়েসে 'কল্লোল' পত্রিকায় তিনি একটি গল্প লেখেন। তারপর সুদীর্ঘকাল প্রায় অজ্ঞাতবাসে কাটিয়েছেন। সাহিত্যে সহজ সাফল্যের নেশা পরিহার করে, 'কল্লোল'-কালীন সাহিত্যিক সৌখিনতার আবহাওয়া থেকে দূরে বাসা বেঁধে তিনি নিজেকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। বরিশালের মানুষ। তাঁর মতো পূর্ববঙ্গের নদী-মাটি ও জীবনের এমন ব্যাপক পুংখানুপুংখ পরিচয় বহন করে অল্প লেখকই বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন। দেশ বিভাগের পর অমরেন্দ্র ঘোষ প্রবীণ বয়েসে কলকাতায়

আসেন। টালিগঞ্জের একটি ব্যারাকবাড়ির একটিমাত্র টিনের ঘরে সপরিবারে তাঁর দিন কেটেছে। ঐ ঘরেই তিনি সাহিত্য সাধনার দীপ জ্বেলেছিলেন। ঐ ঘরেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

কিছুকাল একটি রেশনের দোকানে সামান্য চাকরি করেছিলেন। তারপর সে কাজটিও গেল। ভগ্নস্বাস্থ্য, দুরারোগ্য ব্যাধি, অনিশ্চয়তা ও অপরিসীম অর্থকষ্ট—এই ছিল তাঁর চোদ্দ-পনেরো বছরের শহরবাসের ইতিকথা। কিন্তু অমরেন্দ্র ঘোষ হার মানেন নি। আপন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এক আশ্চর্য বিশ্বাস ও ইতিহাসচেতনা লাভ করেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে মাথা উঁচু করে বেঁচেছেন। বাংলা সাহিত্যের যে পর্বটি চরিত্রহীনতার কলঙ্কে মসীলিপ্ত, সেই পর্বে যে দু-একজন চরিত্র বজায় রেখেছেন, অমরেন্দ্র ঘোষ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

'চরকাশেম' প্রকাশিত হওয়ার পর অমরেন্দ্র ঘোষ রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। একটিমাত্র উপন্যাস লিখে এমন খ্যাতি অল্প লেখকই পেয়েছেন। তারপর ক্রমাগত তিনি উপন্যাস লিখে গেলেন। অর্থের প্রয়োজনে সাধ্যের অতিরিক্ত লেখা লিখলেন। তদুপরি ছিল ভগ্নস্বাস্থ্য। ছিল অনিশ্চয়তা। লেখাগুলিতে তার ছাপ পড়ল।

লেখক হিসেবে অমরেন্দ্র ঘোষ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। 'দক্ষিণের বিল' 'জোটের মহল' তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রয়াস। তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রবল মাত্রায় উদ্দেশ্যবাদী। যেন নিজের দর্শন প্রচারের জন্যই তিনি কাহিনী বেছে নিতেন। কিন্তু তাঁর সেই অমোঘ প্রতিভা ছিল না যার প্রকাশ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে সহজলক্ষ্য। ফলে অমরেন্দ্র ঘোষের অধিকাংশ রচনায়ই দেখি সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত অথচ সৃষ্টি কর্ম যেন অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করার সময় ও সুযোগ তিনি পান নি।

ফলে জীবিতকালেই অমরেন্দ্র ঘোষ খ্যাতির উচ্চচূড়া থেকে বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সেই ব্যাপ্ত ও গভীর অভিজ্ঞতাকে খানিকটা মধ্যবিত্তসুলভ রঙীন পোষাক পরান নি বলে, তাঁর সেই উচ্চ কণ্ঠ শ্রেণীচেতনাকে প্রতি মুহূর্তে সঙীনের মতো উদ্যত রেখেছেন বলে সাহিত্যের মুরুব্বীশ্রেণীও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষান্তি দিয়েছিলেন। জনপ্রিয়তার মোহে এক বিশেষ ধরণের সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করতেও তিনি চান নি। তাই শেষ জীবনে তিনি ছিলেন একা। কিন্তু এই নতুনতর

ব্যর্থতার মধ্যেও অমরেন্দ্র ঘোষ হার মানলেন না। শেষের দিকে নগরজীবনের অভিজ্ঞতাও তাঁর রচনায় এসেছিল। কিন্তু গ্রামের মতো নগরের চরিত্র উদ্ঘাটনে পারদর্শিতা তাঁর ছিল না।

ইতিহাস আর মানুষে ছিল তাঁর অপরিসীম বিশ্বাস। বারবার তাঁর অনুরাগী দেশবাসী তাঁদের সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা নিয়ে নিঃস্ব সাহিত্যিকের ত্রাণে ছুটে এসেছেন। বারবার অমরেন্দ্র ঘোষ এইভাবে নতুনতর বিশ্বাসে বেঁচে উঠেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর এই কঠোর জীবনসংগ্রাম ও আশ্চর্য কিছু অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি 'জবানবন্দী' নামে লিখে গেছেন। এটি আজও অপ্রকাশিত।

শেষ দিকে অমরেন্দ্র ঘোষ এক নতুনতর নিরীক্ষার পথে পা দিয়েছিলেন। 'নাগিনী মুদ্রা' উপন্যাসটি ও আরও কিছু রচনায় লেখকের এই বিকাশোন্মুখ মনের পরিচয় পাই। কিন্তু এ পথ তাঁর অভ্যস্ত পথ ছিল না। জানি না সময় পেলে অমরেন্দ্র ঘোষ এই নতুন আঙ্গিকে কোনো নবতর চরের কথা লিখতেন কিনা।

কিন্তু সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বিষয় মহিমায়, বিশেষ রচনা গুণে ও বক্তব্যের দৃঢ়তায় তিনি স্মরণযোগ্য।

হায় হায়াবৃত্তা

এক বছর আগে ঔপনিবেশিকতাবাদী ঘাতকদের হাতে প্যাট্রিস লুমুম্বা নিহত হয়েছিলেন। সমস্ত পৃথিবীর শুভবুদ্ধি ও বিবেক আর্তনাদ করে উঠেছিল। কৃষ্ণমহাদেশের এক জননায়ক বলেছিলেন লুমুম্বার মৃত্যুতে গোটা আফ্রিকার লাঞ্ছনা।

এক বছরেও কঙ্গো-সমস্যার সমাধান হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির বশম্বদ মোক্তার রাষ্ট্রসংঘ নির্লজ্জ চাতুরিতে একের পর এক দিন গ্রহণ করে ক্রমাগত সময় অপহরণ করছে। আর সুবিশাল কঙ্গোভূমিতে ষড়যন্ত্র, লুণ্ঠন ও বিভেদ অব্যাহত।

লুমুম্বার রাজনৈতিক অনুগামী গিজেঙ্গা বন্দী হয়েছেন। এই বিশাল রাষ্ট্রের নির্বাচিত মন্ত্রীসভার সহকারী প্রধানমন্ত্রীকে একটি খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে। লুমুম্বার মতোই তাঁকে ঘিরেও নানা গুজব। হায়! মুক্তি ও বিকাশের জন্য এই কৃষ্ণভূমিতে আর কত রক্ত অঞ্জলি দিতে হবে?

সার্থক জনম আমার

পদ্মা ও মেঘনায় জোয়ার এসেছে। কিন্তু মার্শাল আয়ুব খাঁর দীর্ঘ শ্বাসরোধকারী মিলিটারী শাসনের বিরুদ্ধে ঢাকার ছাত্রসমাজ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

কুখ্যাত মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে এই ছাত্রসমাজই একদিন ভাষার দাবিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। ঘৃণ্য মিলিটারী শাসনের বিরুদ্ধে আজ তাঁরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবিতে আবার পথে নেমেছেন।

সরকারী সেনশারব্যবস্থার প্রকোপে পূর্ববঙ্গের কোনো খবর সহজে বাইরে আসছে না। কিন্তু একথা ধ্রুব বুঝেছি, পাকিস্তানের রহস্যময় রাজনীতিতে আরও এক পটপরিবর্তন আসন্ন।

শেষ সংবাদ

: আন্তঃ আমেরিকান সংস্থা থেকে কিউবার বহিষ্কার প্রস্তাব অনুমোদন করাতে গিয়ে দেখা গেল দক্ষিণ আমেরিকায় মার্কিনী পররাষ্ট্রনীতি এক গভীর সংকটের সম্মুখীন।

: পশ্চিম ইরিয়ানে ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের অভিভাবকত্বকালে এশিয়ায় মার্কিনী পররাষ্ট্রনীতি নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

: সিংহলে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রয়াস ব্যর্থ।

: ফ্রান্সে আলজিরিয়ার প্রশ্নে ফাশিস্ত এস. এস. ও. সংগঠনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে দেশবাসীর অভ্যুত্থান সম্ভবত ইওরোপেও এক নতুন জাগরণ ডেকে আনছে।

: গোয়ার ব্যাপারে পর্তুগাল ক্রুদ্ধ, ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা ক্ষুব্ধ।

: আফ্রিকা অশান্ত।

: বার্লিন।

সমস্ত পৃথিবীতে নাটো জোটের নেতা হিটলারের ভূতপূর্ব সহকারী হয়সিঙ্গারের বিচার দাবি।

মাত্র কয়েকদিনে পৃথিবীর রাজনৈতিক আকাশে এই অষ্টগ্রহের সমাবেশ ব্রহ্মাণ্ডের শান্তি সমৃদ্ধির অভিভাবক প্রেঃ কেনেডিকে বড়ই বিব্রত করেছে। প্রেঃ অধুনা অধ্যাত্মবাদী, এমন কি ভারতীয় মতে যাগযজ্ঞাদিতেও বিশ্বাসী। তাই বিশ্বহিতায় এতদ্দেশীয় ধর্মযজ্ঞে তাঁর হয়ে আহুতি দেবার জন্য এই মার্চ মাসে প্রচুর আমেরিকান তেল সহ শ্রীমতী জ্যাকেলিন কেনেডী আসছেন।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়
বর্ষ ৩১। সংখ্যা ৮
ফাল্গুন। ১৩৬৮

রবীন্দ্রনাথ ও নন্দনতত্ত্ব

ধীরেন্দ্রনাথ রায়

'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছিলেন ১৩৩৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত 'আধুনিক কাব্য' নামক প্রবন্ধে, এবং তখন ইহার দ্যোতনাকে সুস্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন যে বিদেশীয় শব্দের ইহা প্রতিশব্দ—Aesthetics—তাহাকে বন্ধনীর মধ্যে স্থাপনের। 'নন্দনতত্ত্ব' ও 'এস্থেটিকস' মূলগতভাবে সমার্থক কি না, এই দার্শনিক বিচারের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কাব্য-সাহিত্যের বিচারে যাহাকে বলা যাইতে পারে এস্থেটিক দৃষ্টিভঙ্গী তাহার প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে অতি প্রাচীনকাল হইতেই। কারণ, কাব্য-সাহিত্যের বিচারে বহিরঙ্গ স্তর ভেদ করিয়া গভীরতর স্তরে উপনীত হইলেই এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় যাহাদের বিস্তার সাহিত্যের চেয়ে ব্যাপকতর। যেমন, রস কাহাকে বলে, সৌন্দর্য কাহাকে বলে, ললিতকলা কাহাকে বলে, ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের সামগ্রিক বিচারের উদ্দেশ্যে ইওরোপে প্রধানত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দর্শনশাস্ত্রের একটি বিশেষ বিভাগের উদ্ভব হয়, যাহার নাম 'এস্থেটিকস'। চিত্র, সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পকলার-ও বিচার ইহার অন্তর্ভুক্ত। 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটিকে এই বিশিষ্ট অর্থে বোঝাই ছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘজীবনব্যাপী সৃষ্টিশীলতা যে সাহিত্যের গণনাতীত প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, সঙ্গীত, চিত্র ও নৃত্যছন্দ প্রভৃতিতেও যে তাঁহার নবনব অবদান পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—ইহা আজ বিশ্ববিদিত। তাঁহার এই পরমবিস্ময়কর বহুমুখিনতা সত্ত্বেও ইহাও অস্বীকার

করা যায় না যাহা তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহার জীবনের 'বিদায়কালে'—"একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।" নানাবিধ শিল্পকলার সহিত যে প্রত্যক্ষ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ছিল বিশ্বমানবের ইতিহাসে তাহার তুলনা অতি বিরল। তবুও তাঁহার আলোচনা-ভিত্তিক রচনাসম্ভারের অধ্যয়নে দেখা যায় নন্দনতাত্ত্বিক চরিত্রের প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যিক সমস্যার বিশ্লেষণেই. তাঁহার চিত্ত ছিল উন্মুখ ও লেখনী স্বচ্ছন্দগতি। বর্তমান প্রবন্ধে তাই স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য-বিচারের মাধ্যমে সৌন্দর্যসৃষ্টির সমস্যা প্রাধান্য পাইবে।

নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে ইহা সুস্পষ্ট যে অন্তত প্রাক্-আধুনিক যুগে যাঁহারা তাত্ত্বিক হিসাবে আচার্যস্থানীয়, যেমন ভরত ও আরিস্টোটল, হেগেল ও অভিনবগুপ্ত, শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান নাই। অন্যদিকে মহৎশিল্পী হিসাবে যাঁহাদের আসন বিশ্বপূজ্য, যেমন কালিদাস ও চণ্ডীদাস, দান্তে ও শেক্স্পীয়র, তাঁহাদের শিল্পতাত্ত্বিক মতামত প্রায় অজ্ঞাত, মূলত অনুমানসাপেক্ষ। উভয় ক্ষেত্রে কীর্তিমান ব্যক্তিদের আবির্ভাব দেখা যায় আধুনিক যুগেই। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই অন্যতম। কাব্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিক নানা প্রশ্ন তাঁহার চেতনায় নাড়া দিয়াছিল ও তিনি এই সম্পর্কে নানাবিধ অধ্যয়নেও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে রচিত হয় প্রায় ৬৫ বৎসর আগে, অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি কবিতা যাহাকে নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের ভূমিকারূপে ব্যবহার করা যায়। কবিতাটির উপাধি 'পূর্ণিমা', ১৩০২ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ, এক পূর্ণিমার রাত্রিতে রচিত, এবং 'চিত্রা'-য় সংকলিত। আশঙ্কা হয়, কবিতাটি 'সঞ্চয়িতা'-র অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাহার প্রাপ্য প্রসিদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাই সেটিকে এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল।

"পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা
সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা
করিবারে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনার তত্ত্ব ; পড়ে হয় শেখা
সৌন্দর্য কাহাকে বলে—আছে কি কি বীজ
কবিত্ব কলায় ; শেলি, গেটে, কোলরিজ

কার কোন্ শ্রেণী। পড়ি পড়ি বহুক্ষণ
তাপিয়া উঠিল শির, শ্রান্ত হলো মন,
মনে হলো সব মিথ্যা; কবিত্ব কল্পনা
সৌন্দর্য স্বরুচি রস সকলি জল্পনা
লিপি-বণিকের; অন্ধ গ্রন্থকীটগণ
বহু বর্ষ ধরি শুধু করিছে রচন
শব্দ-মরীচিকা জাল, আকাশের পরে
অকর্ম আলস্যাবেশে ঝুলিবার তরে
দীর্ঘরাত্রিদিন।

অবশেষে শ্রান্তি মানি
তন্দ্রাতুর চোখে, বন্ধ করি গ্রন্থখানি
ঘড়িতে দেখিনু চাহি—দ্বিপ্রহর রাত্তি,
চমকি আসন ছাড়ি নিবাইনু বাতি।
যেমনি নিবিল আলো, উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্তদ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দিক হতে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবন বিপ্লাবিনী মৌন সুধা হাসি।
হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অনন্তের অন্তর-শায়িনী। নাহি সীমা
তব রহস্যের। এ কি মিষ্ট পরিহাসে
সংশয়ীর শুষ্কচিত্ত সৌন্দর্য উচ্ছ্বাসে
মুহূর্তে ডুবালে? কখন দুয়ারে এসে
মুখানি বাড়ায়ে, অভিসারিকার বেশে
আছিলে দাঁড়ায়ে, একপ্রান্তে স্বর্গরানী,
সুদূর নক্ষত্র হতে সাথে করে আনি
বিশ্বভরা নীরবতা। আমি গৃহকোণে
তর্কজাল বিজড়িত ঘন বাক্যবনে
শুষ্কপত্র পরিকীর্ণ অক্ষরের পথে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে,
তোমারি সন্ধানে। উদ্‌ভ্রান্ত এ ভক্তেরে

এতক্ষণ ঘুরাইলে ছলনায় ফেরে।
কি জানি কেমন করে লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে
হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী। মুগ্ধ কর্ণপুটে
গ্রন্থ হতে শুটিকত বৃথা বাক্য উঠে
আচ্ছন্ন করিয়াছিল কেমনে।না জানি
লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌন বাণী।"

এই কবিতাটি হইতে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় ইওরোপীয় রোমান্টিক যুগের নন্দনতত্ত্ব কিরূপ আগ্রহের সহিত রবীন্দ্রনাথ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে কবি রবীন্দ্রনাথের মতে প্রত্যক্ষ অনুভূতির অভাবে সমালোচনার তত্ত্ব সর্বৈব বৃথা।

অথচ দেখা যায়, একা রবীন্দ্রনাথ নন, শেলি-গেটে-কোলরিজ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিরাও বহু অমূল্য সময় অপচয় করিয়াছেন এই পথে। কিন্তু সত্যই কি "অপচয়"? সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে সৃষ্টি ও বিচার কি প্রকৃতই পরস্পরবিরোধী? মূল্যজ্ঞানের, বিচারবোধের অভাবে কি মহৎশিল্পের সৃষ্টি সম্ভব? অপর দিকে, অনুভূতির ব্যাপকতার, ভাবাবেগের গভীরতার অভাবে কি সমালোচনা ব্যক্তিগত মতামতের সংকীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে? তাই মনে হয়, যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রকৃত কবিতার উৎস, প্রকৃত নন্দনতত্ত্বের উৎসও তাহাই। শিল্পকর্মের সৃষ্টি ও শিল্পতত্ত্বের বিচার—অন্তরের গভীরে প্রোথিত একই মূল হইতে ইহারা উদ্ভূত; পার্থক্য আসে পরে, একই কাণ্ড হইতে বিস্তৃত ভিন্নমুখ বৃহৎ বৃহৎ শাখার মতো।

নন্দনতত্ত্বের একটি প্রধান ধারার মূল বক্তব্য এইরূপ: শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পীর প্রধান উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশ। শিল্পী যাহা আপন অন্তরে উপলব্ধি করেন, আপন শিল্পপ্রতিভায় তাহাকে রূপ দিয়া আপনার বাহিরে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রূপন-কর্মেই তাঁহার চরম আনন্দ, চরম সার্থকতা। রবীন্দ্ররচনায় অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন, এইরূপ মতের সমর্থনে নানা উক্তি তাঁহার সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর যত্রতত্র ছড়ানো আছে। কেবল প্রয়োজনের তাগিদে এখানে তাদের কয়েকটি উদ্ধৃত হইতেছে।

"আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে

বিচিত্র করে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হলে মানুষকে মন-মরা করে।

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন, বহু হব, নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। একেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে এক আছে সে'ও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্বর্য তার সেই বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা, রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারি প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি'—এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।

বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়। তার যে রস সে অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ আকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার কাঠি-ছোঁয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সত্তায়। তাই সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ-দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানি নে।" [সাহিত্যতত্ত্ব, প্রবাসী, ১৩৪১ বৈশাখ]

নন্দনতত্ত্বের এই বিশেষ ধারার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রয়োগে ও বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন অপূর্ব দক্ষতা। রূপনার প্রতিভা, "রূপদক্ষ"[১] হইবার নৈপুণ্য, অতি অল্প লোকেরই করায়ত্ত। ইহার প্রকৃতি রহস্যাবৃত। ইচ্ছাশক্তি দিয়া, অধ্যবসায় দিয়া ইহাকে অর্জন করা যায় না। এই রহস্যলোকে রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন অজস্র আলোকপাত নানা উপমায় নানা উদাহরণে, যাহাতে তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি হইয়া উঠিয়াছে উপাদেয়, নূতন একজাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির মতো। এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়ে 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'-র কথা। বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, সংলাপের নাটকীয়তায় ও সরস প্রকাশভঙ্গির ঔজ্জ্বল্যে এ গ্রন্থটি কেবল রবীন্দ্র-সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও, আমার বিশ্বাস, অতুলনীয়।

কিন্তু এ কথা কিছুতেই ভোলা চলে না যে নন্দনতত্ত্বের বা সাহিত্য-

১। "এই "রূপদক্ষ" কথাটি আমার নূতন পাওয়া। Inscription অর্থাৎ একটা প্রাচীন লিপিতে পাওয়া গেছে, আর্টিস্টের একটা চমৎকার প্রতিশব্দ।"—রবীন্দ্রনাথ

বিচারের মূল উদ্দেশ্য নূতনতর সাহিত্যসৃষ্টি নয়। নন্দনতত্ত্ব শেষ বিচারে দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত, তাহার বিশিষ্ট অঙ্গ। নন্দনতত্ত্বের যে ধারাটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মতামতে প্রতিফলিত তাহা মূলত ভাববাদী, তাহা সমাজ ও ইতিহাস নিরপেক্ষ, সুতরাং অবৈজ্ঞানিক। মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্যে বা শিল্পে সৃজনীপ্রতিভা যুক্তি বা বিজ্ঞান দিয়া অর্জন করা না গেলেও সাহিত্যের ও শিল্পের বিচার, অর্থাৎ নন্দনতত্ত্ব তত্ত্বহিসাবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে, যুক্তিমার্গকে, উপেক্ষা করিতে পারে না। সাহিত্য-সৃষ্টিকে অহৈতুক, সাহিত্যের উৎকর্ষকে অনির্বচনীয় ও তাহার আনন্দকে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর বলিলে নন্দনতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শিথিল হইয়া যায়।

এই ভাববাদী দার্শনিক ভিত্তির অন্যান্য গুরুতর অসম্পূর্ণতাও আছে। কোনো লেখকের আত্মার প্রকাশ কেন ও কিভাবে অগণিত বিভিন্ন পাঠকের আত্মাকে সংক্রমিত বা অভিভূত করিতে পারে, একই লেখকের মূল্যায়ণ কেনই বা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকারের হয়, ও এই ধরনের নানা প্রশ্নের হদিস বিশুদ্ধ ভাববাদের পাদপীঠ হইতে পাওয়া যায় কি না তাহা গভীর বিচারসাপেক্ষ। ইহাও আমাদের অভিজ্ঞতা যে সব শিল্পকর্মের আনন্দ-মূল্য এক স্তরের নয়। কবিমাত্রেই নন কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ। কেবল শিল্পচাতুর্য বা আঙ্গিক-কুশলতা দিয়াও বিচার সম্পূর্ণ হয় না। তাহা হইলে হয়তো ভারবি কি মাঘকে বসাইতে হয় কালিদাসের চেয়ে উচ্চতর স্থানে, শেলির চেয়ে স্যুইনবার্ণকে। এ ধরনের প্রশ্ন যে রবীন্দ্রনাথের মনেও দেখা দিয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় তাঁহার 'সাহিত্যে নবত্ব', 'আধুনিক কাব্য' প্রভৃতি নানা প্রবন্ধে। পাওয়া যে যায় তার একমাত্র কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণত ভাববাদী, সমাজ ও ইতিহাস নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানবিমুখ ছিলেন না। তাঁহার জীবনের সুবিপুল কর্মকাণ্ডের কথা বাদ দিয়াও তাঁহার সাহিত্যিক প্রবন্ধাবলীতেও ইহার নিদর্শন না থাকিয়া পারে নাই। আবার কয়েকটি উদ্ধৃতি নেওয়া যাক।

> ক। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, আমরা জ্ঞানত কি অজ্ঞানত মানুষকেই সবচেয়ে বেশি গৌরব দিয়ে থাকি? আমরা যদি কোনো সাহিত্যে অনেকগুলো ভ্রান্তমতের সঙ্গে একটি জীবন্ত মানুষ পাই সেটাকে কি চিরস্থায়ী করে রেখে দিই নে? জ্ঞান পুরাতন ও অনাদৃত হয় কিন্তু মানুষ চিরকাল সম্মান করতে পারে। সত্যকার

মানুষ প্রতিদিন যাচ্ছে এবং আসছে, তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখি, এবং ভুলে যাই, এবং হারাই। অথচ মানুষকে আয়ত্ত করার জন্যেই আমাদের জীবনের সর্বপ্রধান ব্যাকুলতা। সাহিত্যে সেই চঞ্চল মানুষ আপনাকে ধরে রাখে; তার সঙ্গে আপনার নিগূঢ় যোগ চিরকাল অনুভব করতে পারি।

খ। প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া প্রথম দরকার। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে, যার দ্বারা প্রতি নিয়ত আমরা শিকড়ের মতো বিচিত্র রসাকর্ষণ করছি, সেইগুলোর জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলা, তার নূতন নূতন ক্ষমতা আবিষ্কার করা, চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগসাধন করে ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ করে তোলা—সাহিত্য এমনি করে আমাদের মানুষ করছে। সাহিত্যের শিক্ষাতেই আমরা আপনাকে মানুষের ও মানুষকে আপনার, বলে অনুভব করছি।

গ। প্রকাশটাই হচ্ছে সাহিত্যের প্রথম সত্য। কিন্তু ঐটেই কি শেষ সত্য?

সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশমাত্র, কিন্তু তার পরিণাম সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ। আমরা কেবল দেখিনে প্রকাশ পেলে কি না, দেখি, কতখানি প্রকাশ পেলে। দেখি, যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং হৃদয়ের তৃপ্তি হয়। সেই অনুসারে আমরা বলি অমুক লেখায় বেশি অথবা অল্প সত্য আছে। কিন্তু এটা স্বীকার্য যে, প্রকাশ হওয়াটা সাহিত্যমাত্রেরই প্রথম ও প্রধান আবশ্যক। বরঞ্চ ভাবের গৌরব না থাকলেও সাহিত্য হয়, কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না বরঞ্চ মুড়ো গাছও গাছ, কিন্তু বীজকে গাছ বলা যায় না।

যে নিবন্ধমালা হইতে এই উদ্ধৃতিগুলি গৃহীত তাহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। ইহারা রচিত হয় নাই সাধারণের সমক্ষে মুদ্রিত প্রকাশের প্রচলিত তাগিদে, রচিত হইয়াছিল কবিবন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সহিত পত্রযোগে সাহিত্যবিষয়ে আলোচনার জন্ত। রবীন্দ্রনাথ লোকেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "লেখা সম্বন্ধে তুমি যে

প্রস্তাব করেছ সে অতি উত্তম। মাসিকপত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্রলেখা অনেক সহজ।" পরে উভয়েরই পত্রাবলী নিবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায়। এই যৌথ প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের অংশ 'পত্রালাপ' নামে প্রথমে 'সাহিত্যের পথে' সংকলনের প্রথম সংস্করণে ও অধুনা 'সাহিত্য' সংকলনের নবতম সংস্করণে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু লোকেন্দ্রনাথের অংশ বর্তমানে লোকচক্ষুর প্রায় অগোচর। গ্রন্থপরিচয়ে বিশ্বভারতী প্রকাশনের সম্পাদক কেবল এইটুকু বলিয়াই দায়মুক্ত হইয়াছেন: "কৌতূহলী পাঠক সাধনায় লোকেন্দ্রনাথের পত্রপ্রবন্ধগুলিও পাইবেন; 'সাহিত্যের সত্য', 'সাহিত্যের উপাদান' এবং 'সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ' শিরোনামে ১২৯৮ চৈত্র, ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ এবং ১২৯৯ শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।" আপন রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের সম্পাদনায় আপন ঘনিষ্ঠতম সাহিত্যিক বন্ধুর প্রতি এই অবহেলায় রবীন্দ্রনাথ যে কি পরিমাণে বেদনার্ত হইতেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একটি বিশেষ যুগের রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তির বিকশনে লোকেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল তুলনাতীত। 'পত্রালাপ'-এর পর্বে, ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে লোকেন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের পুরোভাগে। কেবল ইংরেজি সাহিত্য নয়, সমগ্র ইওরোপীয় সাহিত্যে তাঁহার ছিল প্রত্যক্ষ ও প্রগাঢ় অধিকার। তিনিই ছিলেন তখনকার যুগে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অনুরাগী ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক। তাঁহার সাহিত্যিক মতামতকে রবীন্দ্রনাথ কতদূর শ্রদ্ধা করিতেন তাহার অবিস্মরণীয় নিদর্শন থাকিয়া গিয়াছে বিশ্ববিখ্যাত 'উর্বশী' কবিতার প্রকাশনে। এখন সকলেই জানেন এই কবিতাটি আটটি স্তবকে সম্পূর্ণ। অথচ বহু বৎসর ধরিয়া কবিতাটি মুদ্রিত হইত ছয়টি স্তবকে, শেষ দুইটি স্তবক বাদ দিয়া। একমাত্র লোকেন্দ্রনাথের অভিমত-অনুসারে রবীন্দ্রনাথ নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাকে এইভাবে ছিন্ন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কোনো এক সংখ্যা 'পরিচয়'-এ 'কবিতার বক্তব্য' নামক প্রবন্ধে আমি এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলাম। এখানে তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এখন আমার বক্তব্য কেবল এইটুকু যে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বাঙালীর মধ্যে লোকেন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি আর কেহ যদি বিশ্বকবির সাহিত্যিক চেতনাকে প্রভাবিত করিয়া থাকেন, তাহা আমার অজ্ঞাত। দুঃখের বিষয় লোকেন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনায়

প্রায় কিছুই বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত নাই। রবীন্দ্র-প্রতিভার সৌর-জগতে লোকেন্দ্রনাথের প্রভাব যেন একটা লুপ্তগ্রহের অস্তিত্বের মতো। তাঁহাকে বাদ দিয়া রবীন্দ্রকাব্যের বিবর্তনের বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথেরই রচনা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির দুই ধরনের উদ্ধৃতিমালা দিয়া, আশা করা যায়, দেখানো গিয়াছে যে নন্দনতত্ত্বের মৌলিক প্রশ্নাবলীর বিচারে তাঁহার মানসলোকে ছিল স্বতোবিরোধিতা বা দ্বৈতভাব। এই দ্বৈতভাবের উপস্থিতি, দেখা যায়, কোনো কোনো বিজ্ঞ ও রসজ্ঞ রবীন্দ্র-সমালোচককে বিব্রত করিয়াছে। বর্তমান বৎসরে শারদীয় বিশেষ সংখ্যার 'স্বাধীনতা'-য়, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'শিল্পবোধে গান্ধী টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক মনোজ্ঞ প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

> "শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীর ব্যক্তিজীবন যে বৃহৎ সমাজজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং এই কারণেই শিল্পকর্মও যে সামাজিক অন্যান্য সকলপ্রকার কর্মের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত রবীন্দ্রনাথ এই কথাটা সব সময় স্বীকার করিতে চাহেন নাই, বরঞ্চ তাঁহার ভিতরে এই কথাটা অস্বীকার করার প্রবণতাই দেখা দিয়াছে অধিক সময়ে। সময়ে সময়ে রবীন্দ্রনাথকে খুব জোর করিয়াই এই কথা আমরা বলিতে দেখিয়াছি যে শিল্প-প্রতিভা সকল সমাজ ও ইতিহাস বিবর্তন নিরপেক্ষ শিল্পীর সম্পূর্ণ নিজস্ব ধর্ম। × × × কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টিকে সমগ্রভাবে বিচার করিলে ইহাই রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধের শেষ কথা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। (অথচ) গানে কবিতায় আলোচনায় এ-জাতীয় কথা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না।"

এই বিরোধিতার সমাধানকল্পে দাশগুপ্ত মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে যে প্রণালীর প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নন্দনতত্ত্ব-বিচারে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অনুরূপ। এই পদ্ধতিতে দেখানো হয় যে কোনো বৃহৎ আইডিয়া চিরন্তন স্থিতিশীল নয়, তাহারই অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট হয় তাহার বিপরীত আইডিয়া। সুতরাং আইডিয়ার জগতে প্রগতির জন্য বস্তুজগতের বা সমাজজীবনের প্রভাব গৌণ। আজ ইহা সকলেরই সুবিদিত, এই আকাশচারী হেগেলীয় দ্বান্দ্বিককে মার্কস ও এঙ্গেলস কিভাবে মাটিতে নামাইয়া আনিয়া স্থাপিত করেন বৈজ্ঞানিক বনিয়াদের উপর। রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃত চরিত্র বুঝিতে গেলে আমাদেরও প্রয়োজন আছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগের,

এবং এই প্রচেষ্টায় আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক হইতে পারে লেনিনের প্রবন্ধাবলী, তলস্তোই-এর বিচারে।

লেনিনের সূত্রানুযায়ী রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিচারে সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁহার ব্যক্তিগত বা স্বেচ্ছানির্দিষ্ট ব্যাপার নয়। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের যে যুগে রবীন্দ্র-প্রতিভা সৃষ্টিশীল সে যুগের বাঙালীসমাজের অভ্যন্তরে ছিল ক্রমবর্ধমান স্বতোবিরোধিতা। এই স্বতোবিরোধিতার অপূর্ব শিল্পসম্মত ভাস্বর প্রতিফলন হইতেছে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য। সমাজের দৈনন্দিন জীবনে যেমন একই কালে প্রচলিত ছিল গরুর গাড়ির ও রেলের গাড়ির ব্যবহার, রবীন্দ্রমানসেও তেমনই একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল ছিল সনাতন উপনিষদের প্রতি আনুগত্য ও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ। রেলের গাড়ির তুলনায় গরুর গাড়ির প্রচলন ব্যাপকতর হইলেও রেলের গাড়ির প্রভাবই ছিল ভবিষ্যতের অভিমুখে। উপনিষদের বিশ্ববীক্ষাও তেমনই রবীন্দ্রমানসে ব্যাপকতর হওয়া সত্ত্বেও ইওরোপ হইতে আগত বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষাকে আত্মস্থ করিতে পারাই রবীন্দ্রপ্রতিভার তর্কাতীত গৌরব। এই দুই বিভিন্ন কালধর্মী বিশ্ববীক্ষাকে সমীকরণের প্রচেষ্টা সহজে সাধিত হয় নাই। নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে সমগ্র মানব-সমাজের পূর্ণ কল্যাণের লক্ষ্যপথে। মনে রাখিতে হইবে, যে বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষা ভারতে আসিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসরণে তাহার ভিতরেও ছিল প্রকাণ্ড বিরোধিতা। তাহার একদিক ছিল ভারতের সনাতন সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধ্বংসশীল, অন্যদিক ভবিষ্যতের স্বাধীন জাতিগঠনের অভীপ্সার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টিশীল। কেবল ইহাই নহে। মানব-ইতিহাসের সামগ্রিক বিচারে ফিউডালবাদী সমাজ-ব্যবস্থার তুলনায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা উন্নততর পদক্ষেপ হইলেও, ইহার মানবিক অগ্রগতির অনিবার্য শর্ত ছিল শ্রেণী-স্বার্থের ঘনিমা, শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠাতেই হইতে পারে যাহার একমাত্র পরিণাম। এই পরিণামের স্বপ্ন ও ইহার জন্য সংগ্রামকে বলা যায় বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষার মহত্তম অংশ। ঔপনিষদিক বিশ্ববীক্ষা ও আধুনিক বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষা একই পর্যায়ের না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের সচেতন সংবেদনশীল মানসলোকে ইহাদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত না হওয়াই হইত অস্বাভাবিক, অনৈতিহাসিক। এই দ্বন্দ্বকে ভারতীয়

আদর্শের সহিত ইওরোপীয় আদর্শের দ্বন্দ্ব বা প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব, এইভাবে দেখিলে, মনে হয়, ঠিকভাবে দেখা হইবে না। সম্প্রতি যে তর্ক উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের কাব্য-অনুপ্রেরণা কতখানি ভারতীয় ও কতখানি পশ্চিমী, যান্ত্রিক বস্তুবাদের পাদপীঠ হইতে তাহাকে মনে হয় অবাস্তব, ভিত্তিহীন। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠদান যেমন সমগ্রভাবে মানবীয়, ইওরোপের বুর্জোয়া সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠদানও সেইরূপ সমগ্রভাবে মানবীয়। ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির যে যুগোপযোগী মানবিক আবেদন ছিল তাহা বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের মানবিকতাও সেইরূপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজ শাসনের সূত্র ধরিয়া ভারতে বুর্জোয়া অর্থনীতি অনুপ্রবেশ করিলে ভারতীয় সমাজ বিশ্ববুর্জোয়াসমাজের অঙ্গীভূত হইল। বহু শতাব্দীব্যাপী ফিউডাল ভাবধারার মর্মে গিয়া আঘাত করিল নবাগত বুর্জোয়া মূল্যবোধ, ও তাহার ফলে সৃষ্ট হইল বিশ্বমানবিকতার একটি বিশিষ্ট রূপ। বিদেশাগত আপেল ফলের চাষ ভারতের ভূমিতে ফলাইল ভারতীয় আপেল—যাহা জীনাস হিসাবে বিদেশীয় হইলেও স্পীশিজ হিসাবে ভারতীয়। স্মরণ করা যাক রবীন্দ্রনাথের উক্তি: "হোমরের মহাকাব্যের কাহিনীটা গ্রীক, কিন্তু তার মধ্যে কাব্য-রচনার যে আদর্শটা আছে যেহেতু তা সার্বভৌমিক এইজন্যেই সাহিত্যপ্রিয় বাঙালীও সেই গ্রীক কাব্য পড়ে তার রস পায়। আপেল ফল আমাদের দেশের অনেক লোকের পক্ষেই অপরিচিত, ওটা সর্বাংশেই বিদেশী—কিন্তু ওর মধ্যে যে ফলত্ব আছে সেটাকে আমাদের অত্যন্ত স্বাদেশিক রসনাও মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার করে নিতে বাধা পায় না।" এখানে এই মন্তব্যের প্রয়োজন আছে যে রবীন্দ্রনাথের রসনা স্বাদেশিক হওয়া সত্ত্বেও কালোপযোগী শিক্ষায় ছিল মানবিক, তাই আপেলের স্বাদকে মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার করিয়া লইতে তাহা বাধা পায় নাই। কিন্তু যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত একান্তভাবে ভারতীয়, কালোপযোগী শিক্ষায় বঞ্চিত, তাঁহাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খাটে না। ভারতীয় হইয়াও ভারতে-জাত আপেল ফলকে তাঁহারা সুচক্ষে দেখিতে পারেন কি না, ভারতীয় পূজা-আচারে এই উপভোগ্য ফলটির এখনও কোনো শাস্ত্রসম্মত স্থান আছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও জিজ্ঞাসা করা যায়, উপনিষদের বাণীর যে ধরনের ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ প্রচার করিতেন তাহাকে কি বলা যায় সনাতন? বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীহেমন্ত

গঙ্গোপাধ্যায় বিগত শারদীয় সংখ্যা 'আন্তর্জাতিক' পত্রে 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে বলিতেছেন : "একথা ধ্রুবসত্য যে রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে উপনিষদের মন্ত্রগুলি ব্যবহার করেছেন তা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণার সহিত মেলে না। 'মানব সত্য' প্রবন্ধটি যদি "মানুষের ধর্মের" সারাংশ হয়ে থাকে, তবে এই সত্য কোনো অলৌকিক পারলৌকিক মুক্তির বাণী নয়, ইহলোকের মহামানবের পরম সৌভ্রাত্র ও শান্তির বাণী।" সনাতন বিশ্ববীক্ষার সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষার এইখানেই পার্থক্য।

এই পার্থক্যের আর একটি মনোজ্ঞ নিদর্শন আছে রবীন্দ্রনাথের এক কবিতায়। ভারতীয় কাব্যের ক্ষেত্রে কালিদাসই রবীন্দ্রনাথের গুরু, ভার্জিল যেমন ছিলেন দান্তের, ইহা সঙ্গতভাবেই বলা যায়। যে নবরত্নের মাঝে কালিদাস ছিলেন প্রথম রত্ন, সে যুগে জন্ম হইলে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্রস্তুত ছিলেন সে শ্রেণীতে হইতে দশমরত্ন অর্থাৎ 'লাস্ট বয়'। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জন্ম হইল কয়েক শত বছর পরে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে নয়, ইংরেজের রাজধানী কলিকাতায়। তাই তিনি পরিহাস ছলে হইলেও বলিতে পারিলেন এই সত্যকথাটি যে "কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে গর্বে বেড়াই নেচে।" এ গর্বের কারণ এই নয় যে রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে কবি হিসাবে তাঁহার প্রতিভা কালিদাসের কবিপ্রতিভা হইতে উচ্চতর, কারণটি এই যে তিনি জানিতেন যে তাঁহার যুগ কালিদাসের যুগের চেয়ে উন্নততর। "তাঁহার কালের স্বাদ-গন্ধ আমি তো পাই মৃদুমন্দ, আমার কালের কণামাত্র পান নি মহাকবি।" রবীন্দ্রনাথের আনন্দের প্রকৃত কারণ এই যে তিনি উত্তরাধিকারী নন কেবলমাত্র ভারতের কালিদাসের, তিনি উত্তরাধিকারী বুর্জোয়া জগতের শ্রেষ্ঠ মানবিক কবিদের।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতীতিতে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের প্রভাব ছিল অসামান্য, ইহা সকলেরই জানা কথা। প্রত্যেক মনোযোগী বাঙালী পাঠক জানেন, কীট্স্‌-এর "Beauty is truth, truth beauty", এই বিতর্কমূলক উক্তিটিকে আলোচনা রবীন্দ্রনাথ কতবার কতরকমে করিয়াছেন। উক্তিটি যতই বিখ্যাত হোক, ইহার সঠিক অর্থনির্ণয় তত সুসাধ্য নয়। ইংলণ্ডের পণ্ডিতসমাজ এখনও এ বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়াছেন কি না আমার জানা নাই। অথচ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশীয় সাহিত্য-সমালোচক

চের্নিশেভস্কি হেগেলের ভাববাদী দ্বান্দ্বিক দর্শনের প্রতিবাদে মানবজীবনে সত্যের সহিত সুন্দরের যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন তাহাতেই যেন কীটস্-এর উক্তির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

> "Beautiful is that being in which we see life as it should be, according to our conception; beautiful is the object which expresses life, or reminds us of life. By real life we mean not only man's relations to the objects and beings of the objective world, but also his inner life. Sometimes a man lives in a dream, in that case the dream has for him the significance of something objective."

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবিত্ব' নামক প্রবন্ধে চের্নিশেভস্কি-র এই ব্যাখ্যা আমি যখন উদ্ধৃত করি তখন আমার জানা ছিল না যে ইহার প্রায় অনুরূপ উক্তি রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও আছে। অথচ ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ চের্নিশেভস্কি-র রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন না। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের উনবিংশ অধিবেশনের উপলক্ষ্যে যে অভিভাষণ রবীন্দ্রনাথ লেখেন, তাহা পরে 'পঞ্চাশোর্দ্ধম্' নামে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। তাহাতে আছে:

> "যেটাকে মানুষ পেয়েছে সাহিত্য তাকেই যে প্রতিবিম্বিত করে, তা নয়; যা তার অনুপলব্ধ, তার সাধনার ধন, সাহিত্যে প্রধানত তারই জন্য কামনা উজ্জ্বল হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। বাহিরের কর্মে যে প্রত্যাশা সম্পূর্ণ আকার লাভ করে নি, সাহিত্যের কলারচনায় তারই পরিপূর্ণতার কল্পরূপ নানা ভাবে দেখা দেয়।"

সাহিত্যের ছাত্রমাত্রেরই জানা কথা, অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সুষমাকে জীবনের সত্যে রূপায়িত করার প্রেরণা শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ। বিশেষ করিয়া পরাধীন দেশে জন্মিলে স্বদেশের ও স্বজাতির গ্লানি ও লাঞ্ছনা প্রকৃত কবির চেতনাকে বর্তমানের অভিশাপ হইতে ভাবয়ুতের সার্থকতার সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে প্রাণময় করিয়া তোলে। স্বদেশের মুক্তির আকূতির সঙ্গে সর্বমানবীয় মুক্তির আহ্বান একাত্ম হইয়া যায়। কবির কবিতা

তখন কেবল আর আত্মপ্রকাশের আনন্দে তৃপ্তি পায় না, তাহা হইয়া ওঠে শক্তিমান প্রহরণ—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসুন্দরের বিরুদ্ধে। তাই বলা যায়, ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের সহিত ইয়েটস-এর প্রথম সাক্ষাৎ হইতে যে নিবিড় আত্মিকতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহা কোনোক্রমেই ছিল না আকস্মিক। ভারত ও আয়র্লণ্ড, দুই দেশই তখন ইংলণ্ডের শাসনাধীন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আইরিশ উদাহরণের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তাই তখনকার পরাধীন আয়র্লণ্ডের জাতীয় কবি ইয়েটস পরাধীন ভারতের জাতীয় কবির অন্তরের বাণী আপন অন্তর দিয়া বুঝিতে পারিলেন। সত্যের সহিত সুন্দরের বিরোধ কি নিবিড়ভাবে ইয়েটস-এর অন্তরকে মথিত করিত তাহা দেখা যায় ছয় একটি লিরিকে, 'The Wind Among the Reeds' হইতে গৃহীত।

"All things uncomely and broken, all things worn out and old,
The cry of a child by the roadway, the creak of a lumbering cart,
The heavy steps of the ploughman, splashing the wintry mould,
Are wronging your image that blossoms a rose in the deeps of my heart.
The wrong of unshapely things is a wrong too great to be told;
I hunger to build them anew and sit on a gree know apart,
With the earth and the sky and the water, remade, like a casket of gold
For my dreams of your image that blossoms a rose in the deeps of my heart."

চিরকালের সৌন্দর্যের প্রতীক গোলাপকে অবলম্বন করিয়া ইয়েটস-এর এই সংগ্রামী কবিতা কি মনে পড়াইয়া দেয় না চিরকালের মঙ্গলের প্রতীক শঙ্খকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা, 'বলাকা' হইতে গৃহীত।

"চলেছিলেম পূজার ঘরে
　　সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
　　কোথায় শান্তিস্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
　　হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত
　　তোমার মহাশঙ্খ।

...　　...　　...

জানি জানি, তন্দ্রা মম
　　রইবে না আর চক্ষে
জানি শ্রাবণ-ধারা-সম
　　বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউবা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
　　সুপ্তির পর্যঙ্ক
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
　　তোমার মহাশঙ্খ।
তোমার কাছে আরাম চেয়ে
　　পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
　　পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,

বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক প্রাক্কালে রচিত এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বাগত আহ্বান জানাইয়াছেন এক নূতন বিশ্বযুগকে, বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পূর্বেই ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবে যাহার ঐতিহাসিক সূচনা। বিশ্বব্যাপী ধনবাদের অন্তিম পরিণতি যে বিশ্বব্যাপী সমাজবাদে, বুর্জোয়া সংস্কৃতির মানবিকতা যে সমৃদ্ধতর ও পূর্ণতর হইবে সমাজবাদী মানবিকতায় তাহা তখন স্পষ্ট বোধগম্য না হইলেও এখন দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই সুমহান পরিণামের পথে এখনও আছে বহুকালব্যাপী সংগ্রাম ও সংঘর্ষ। এই বিঘ্ন-রুক্ষ পথে চলিতে গিয়া মানবজাতি যেন অসময়ে অবসন্ন না হইয়া পড়ে, যেন ইয়েটস-এর গোলাপের স্বপ্নকে ও রবীন্দ্রনাথের শঙ্খের আহ্বানকে বিস্মৃত না হয়, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের ইহাই হইল শেষ শিক্ষা।

রবীন্দ্র-শান্তি-মেলায় আলোচনা-পর্যায়ের ১০ই মার্চের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের অনুসরণে লিখিত—লেখক।

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার ঐতিহ্য

গোপাল হালদার

কথাটা শেক্স্পীয়রের সম্বন্ধেই বলা হয় "myriad minded." রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও তা কম সত্য নয়। তিনি সহস্রমনাঃ, myriad minded. রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর-একটি কথাও সেরূপ সত্য, তিনি অখণ্ডমনাঃ। সকলরূপকে নিজ নিজ রূপে দেখা তাঁর কারয়িত্রী প্রতিভার ধর্ম। সকলরূপকে তেমনি সমগ্রভাবে দেখাও তাঁর ভাবয়িত্রী প্রতিভার নিয়ম। সহস্রমনাঃ রবীন্দ্রনাথ তাই অখণ্ডমনাঃ রবীন্দ্রনাথও। সেই বিচিত্রকে যেই ঐক্যের দৃষ্টিতে তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন তাকে নানা নামেই চিহ্নিত করা যায়। তবে "মানুষের ধর্মের" কবির সেই জীবনদর্শনকে মানবতা বলাই শ্রেয়ঃ। অবশ্য একটু বিশেষ অর্থের মানবতা কারণ, "তিনি ভূমা।" "কিন্তু মানবিক ভূমা।" কথাটায় কোনো অস্পষ্টতা তিনি রাখেন নি—"আমার বুদ্ধি মানব বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব হৃদয়, আমার কল্পনা মানব কল্পনা।" এই মানবতা যেমন সমস্তকে অতিক্রম করে প্রকাশিত, তেমনি সমস্তকে অধিকার করেও প্রকাশিত।

গোড়ার এই কথাটা মনে রেখেই আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় গ্রহণ করতে চাই। যা তাঁর খণ্ডকাল ও দেশকে অতিক্রম করে যায় তা কতটা তাঁর খণ্ডকাল ও দেশকেও অধিকার করে আছে, তা না জানলে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে সম্পূর্ণ জানা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ "মানব-সত্য" উপলব্ধি করে মানুষের তিনটি জন্মভূমি স্বীকার করেছেন; "সমস্ত জাতির পৃথিবী", "সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক", "সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ"। কবির মতে সকল মানুষেরই তাতে জন্মাধিকার। কিন্তু আমরা জানি এই পরমজন্মভূমি জন্মসূত্রে লাভ হয় না, জীবন সূত্রে তা অর্জন করতে হয়। এবং জন্মসূত্রে মানুষ একটি বিশেষ পরিবেশেরই বিশেষ স্থান, কাল ও চেতনার উত্তরাধিকার-ই লাভ করে। রবীন্দ্রনাথও একটি বিশেষ ভূখণ্ডে, একটি বিশেষ কালে এবং বিশেষ এক চেতনার উন্মেষ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রপ্রতিভা এই বাঙালী পরিবেশকে অধিকার করেই

বিকশিত হয়েছে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত থেকেই মানব-সত্যে সমুত্তীর্ণ হয়েছে, ভূমি থেকে পৌঁছেছে ভূমায়। শুধু তাই নয়। প্রতিভা যেহেতু নব-নবোন্মেষ-শালিনী, তাই রবীন্দ্রপ্রতিভা সেই জন্ম ক্ষেত্রকেও নতুন উন্মেষের মধ্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে, তাকে দিয়েছে নতুন ঐতিহ্য, মানবতায় নতুন অধিকার।

রবীন্দ্র পটভূমি

নিজের জীবনের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার পটভূমিকা নির্দেশ করে গিয়েছেন। তিনটি প্রবল প্রয়াসের মধ্যে তাঁর বাল্য ও যৌবন উদ্‌যাপিত। একটি রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন, দ্বিতীয়টি বঙ্কিম পরিচালিত সাহিত্যিক আয়োজন আর তৃতীয়টি জাতীয় আন্দোলন—যা, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়, আসলে জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার বহুমুখী উদ্যোগ। সমগ্রভাবে এই তিন প্রয়াসকে আমরা সচরাচর একটি কথাতেই ব্যক্ত করে থাকি—বাঙলার তথা ভারতের রেনেসাঁস বা জাগরণ। এ জাগরণের কেন্দ্র তখন বাঙলা দেশ। তার প্রকাশ দেখা দেয় জাতীয় জীবনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে—প্রথম সংস্কার আন্দোলনে, তারপর সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশে, আর শেষে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রাণময় উদ্বোধনে। তিনটির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে আজীবন সংযুক্ত ছিলেন, তা সুপরিজ্ঞাত। এ কথা তাই অবিস্মরণীয়—রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি বাংলা দেশ; বাঙালীর স্মৃতিলোক, বাঙালী ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সমাবেশে যা রচিত; এবং তৃতীয়তঃ সর্বমানবচিত্ত-মহাদেশের সেই প্রাঙ্গণটি, যেটি বাঙালী চিত্তের অঙ্গন, যেখানে তার জন্মকালে রেনেসাঁসের আলোড়নে আধুনিক যুগধর্ম বা মানবতার আধুনিক চেতনা উন্মেষিত হয়ে উঠছিল। এই পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন—উনবিংশ শতকের বাঙলাদেশের পরিবেশে, আর জাতীয় জীবনের সেইক্ষেত্র থেকেই অতিক্রান্ত হয়েছেন মানব-ভূমায়—ভূমিভ্রষ্ট নয় যে ভূমা।

কথাটা 'বাঙালিয়ানা'র বশে বলছি না, বরং বলছি অন্য কারণে। প্রথমতঃ রবীন্দ্র-প্রতিভা জিজ্ঞাসায় সৎ-পদ্ধতি নির্ণয়ের দাবিতে, দেশের মাটি জল থেকেই প্রাণরস গ্রহণ করে কি করে তা বিশ্বাভিমুখে আত্মবিস্তার করেছে, তাই হওয়া উচিত সে জিজ্ঞাসায় স্বাভাবিক পদ্ধতি। দ্বিতীয়তঃ, বাঙলা সাহিত্য ও জাতীয়জীবনে রবীন্দ্রপ্রতিভা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তা-ও

অনুধাবন করা উচিত। কবির শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রপ্রতিভার জিজ্ঞাসায় 'পাশ্চাত্য প্রভাবের' ও বিশ্বমুখিতার কথা যত বিঘোষিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বাঙালী ঐতিহ্যের কথা বা বাঙালী ভূমিকার কথা তত আলোচিত হয়েছে কিনা জানি না। অপর দিকে, আবেগ-আতিশয্যে আমরা বাঙালীরা তাঁকে "আমাদের" বলে নিশ্চয়ই গর্ব করেছি; কিন্তু কী অর্থে তা সত্য সম্ভবত তা যথেষ্ট পরিমাণে বুঝে দেখতে চাইনি। পরিমিত পরিসরে সেই কথাটিই আমার আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথকে একান্তভাবে বাঙালী বলে সীমাবদ্ধ করাও যেমন আমার বিবেচনায় হাস্যকর, রবীন্দ্রনাথের জন্মক্ষেত্র যে বাঙলাদেশ, তাঁর সৃষ্টিক্ষেত্র বাঙলা সাহিত্য, তাঁর চিত্তক্ষেত্রও বাঙালী চিত্তের সুমহৎ বিস্তার, এই কথা অস্বীকার করা আমার মতে তেমনি অসম্ভব।

এই শেষ কথাটা অবশ্য পরিষ্কার করে বোঝার অপেক্ষা রাখে। বাঙলাদেশে এমন বাঙালী ভাবুক ও লেখক এক সময়ে যথেষ্টই ছিলেন যাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে এ কথায় আপত্তি তুলতেন। কেউ মনে করতেন, বাঙালী ঐতিহ্য নয়, বিশ্বভাবনার শূন্যলোকেই রবীন্দ্রনাথ বিচরণ করতেন। আবার কেউ মনে করতেন বাঙালী ঐতিহ্য অপেক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাই রবীন্দ্রপ্রতিভাকে প্রভাবিত করেছে বেশি। 'নারায়ণ'-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা মনে করতেন, বাঙালী প্রাণের মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের শিকড় নেই, পরভুক্তের মতো তা আলো আহরণ করে বিশ্বভাবনার আকাশ থেকে। পরবর্তীকালে মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রকৃতিতে বাঙালী স্বাধীন চিত্ততার, যুক্তিবাদিতার ও মানবধর্মিতার যুগোপযোগী প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন (Golden Book of Tagore-এ লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রায় সেই সময়েই মোহিতলাল মজুমদারের মতো রবীন্দ্রভক্ত সমালোচক রবীন্দ্রসৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন বাঙলার জীবন-নিষ্ঠ সাধনার পরিবর্তে ভারতীয় অধ্যাত্মনিষ্ঠ সাধনার আতিশয্য। বিপিনচন্দ্র বাঙলার বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধনধারার প্রবল গ্রহণ শক্তির ও উদার মানবতার বিকাশ দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথে। মোহিতলাল বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধরণের জীবনলীলা স্বীকৃতিরই অভাব দেখলেন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে; পেলেন উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও অধ্যাত্মচেতনার একাকারিতা। বোঝা যায়, মোহিতলালের চক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঙালী ঐতিহ্যে বিরোধ মূলগত। বিপিনচন্দ্র নিশ্চয়ই ভিন্ন মতাবলম্বী।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ

এমন লোক বোধহয় কমই আছেন যাঁরা মনে করেন বাঙালী সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে মূলগত বিরোধ আছে। বাঙালী সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ জানা তাই আবশ্যক, আর ঐতিহ্য কথাটারও অর্থ পরিষ্কার করে বোঝা প্রয়োজন। কারণ, নিশ্চয়ই বাঙালী সংস্কৃতি একটা বিশিষ্ট জিনিস—যদিও সে বৈশিষ্ট্য কী—নব্যন্যায় না তন্ত্র না বৈষ্ণব সাধনা, কোন্‌টি কোন্‌টি বাঙালী মানসের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তা নিয়ে তর্ক চলে। কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য কি ভারত-সংস্কৃতিতে অগ্রাহ্য? তাই ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝাও দরকার। কারণ, বাঙালী, হিন্দুস্থানী, তামিল, তেলেগু সকলের দেশকে নিয়ে যেমন ভারতবর্ষ, তেমনি এই বাঙালী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সকল জাতিকে নিয়েই ভারতীয় 'মহাজাতি'। ভারত-সংস্কৃতিরও তাই দু-টি রূপ আছে। একটি সর্বভারতীয় বা Pan-Indian সাধারণ (Common) রূপ—তা বাঙলার সংস্কৃতিরও আপনার, তামিল তেলেগুর হিন্দুস্থানী-মারাঠীরও আপনার। কারও পর নয়, কারও একারও নয়। এই কেন্দ্রমূলকে আশ্রয় করেই ভারতীয় বিভিন্ন জাতির স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। আবার সকলের বৈশিষ্ট্যকে তখন সম্মেলিত করে দেখা যায় ভারত-সংস্কৃতির আর-এক রূপ—তার সর্বসম্মেলিত বা Composite রূপ। মধ্য যুগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় সাধনায় যত বৈচিত্র্য দেখা দিক তা সকলই মূল ভারতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে; বাঙালী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সকল ভারতবাসীর সেই Pan-Indian heritage, সমান উত্তরাধিকার। বৈদিক সাধনা, পৌরাণিক হিন্দু সাধনা, বৌদ্ধ সাধনা, জৈন সাধনা প্রভৃতি এ-রূপই সকলের আপনার। স্থান ও কাল ভেদে এসব সাধনায় যত বৈচিত্র্য বিকশিত হোক তার কোনো রূপই বাঙালীর, হিন্দুস্থানীর, তামিলের কারও পর নয়, কারও একারও নয়। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথা ওঠে কতকটা মধ্য যুগের চৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতির সাধন ধারা প্রসঙ্গে। বৈষ্ণব, শিখ প্রভৃতি কোনো কোনো গোষ্ঠীর তা বিশিষ্ট সাধন ধারা এবং ভারতের সর্বত্র তা সম প্রচলিত নয়। কিন্তু তা-ও মূল ভারতীয় সাধনারই প্রকাশ, সেই সাধনার অন্তর্ভুক্ত, এবং সর্বস্বীকৃত। এরূপ মূল ও বহুবিচিত্র ধারার সমবায়ে ভারতের সম্মেলিত সংস্কৃতি গঠিত। বাঙালী সংস্কৃতিও তাই এই ভারত (Composite) সংস্কৃতির এক ধারা,

আর সেই Pan-Indian heritage বা সর্বভারতীয় উত্তরাধিকারও তাই বাঙলার ঐতিহ্যের এক প্রধান অঙ্গ।

বাঙালী ঐতিহ্যের স্বরূপ

যিনি মনে করেন উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ বাঙালী বৈশিষ্ট্যের বিরোধী তিনি যে শুধু ভারত-সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধেই অজ্ঞ তা নয়, বাঙালী সাধনা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধেও ভ্রান্ত। কারণ নিছক বাঙালী বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঙলার সংস্কৃতি ও বাঙালী ঐতিহ্য গঠিত নয়—কোনো ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিই সেরূপ গঠিত হয় কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ যা বাঙলার সংস্কৃতি বা বাঙলার ঐতিহ্য সমগ্রভাবে তার পরিচয় গ্রহণ করলে দেখি—তার একটি অংশই মাত্র বাঙলার নিজস্ব। বাঙলাদেশের মাটি-জল ও লোকজীবন তার আশ্রয়, বাঙলার লোক-মানসে তার উদ্ভব। বিদেশী পরিভাষার অনুসরণে এই নিজস্ব বাঙালী অংশকে বলতে পারি Matter of Bengal, খাঁটি বাঙলার সম্পদ। মঙ্গলকাব্যের কথায় ও পদাবলীর ভাব সম্পদে তার উপাদান মিশে আছে, নিশ্চয়। কিন্তু নব্যন্যায়, তন্ত্র বা বৈষ্ণবসাধনা—তার অবিমিশ্র ফল কিনা সন্দেহ। বরং ছড়া, গান, রূপকথা, উপকথা এবং সহজিয়া সাধনার নানা সূক্ষ্ম স্থূল ভাবে ও রূপে বাঙালী লোক-জীবনের ও লোক-মানসের সেই দান সঞ্চিত হয়ে আছে অনুমান করতে পারি। লোকচিত্তের এই সম্পদ নানা ভাবেই এখন আচ্ছন্ন, কিন্তু তা লুপ্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ। যন্ত্রশিল্পের প্রচণ্ডতায় যদি এই লোক-জীবন উন্মূলিত হয়ে যায় তখনি আসবে তার বিলুপ্তির দিন—তার পূর্বে নয়।

কিন্তু বাঙলার এই নিজস্ব বস্তুকে আচ্ছাদিত করেই বাঙলার সংস্কৃতিতে বহুযুগ থেকে এসে মিশেছে সেই সর্বভারতীয় সম্পদ ও ভারতের সম্মেলিত সংস্কৃতির উপকরণ। বিদেশী পরিভাষার অনুসরণ করে একে বলতে পারি—এ হচ্ছে বাঙালী ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত Matter of Indian world, ভারতীয় সম্পদ। এ-যে কত বিরাট ও বিচিত্র উত্তরাধিকার এক সময়ে আমরা তা বিস্মৃত হয়েছিলাম, আমরা মনে করতাম—স্মৃতি, শাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ, কিংবা পৌরাণিক হিন্দু সাধনাই বুঝি আমাদের সব। বৈদিক সংস্কৃতিও প্রায় অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল। এখন আমরা জানি—বৈদিক বা পৌরাণিক হিন্দু সাধনাই শুধু নয়, বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি প্রাচীন সাধনা, এমন কি মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনও আমাদের

এই ভারতীয় উত্তরাধিকারেরই অন্তর্ভূক্ত। তৃতীয় যে সম্পদ আমাদের ঐতিহ্যে এসে মিশেছিল এই দুয়ের তুলনায় তা ক্ষীণকায়। তা Matter of Perso-Arabic world, পার্শী-আরব্য সংস্কৃতি প্রবাহ- মুসলমান বাঙালীর ধর্মাচরণে ও বাঙালীর আইন-আদালতে, পোষাকে-পরিচ্ছদে তা কতকটা স্থায়ী হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ এই পার্শী-আরব্য-সংস্কৃতি মধ্যযুগেরই চিত্তসম্পদ। সেই দিক থেকেও ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনায় তার চিত্তসম্পদ কম বিচিত্র, কম শক্তিমান, কম মহত্বপূর্ণ। যেটুকু অভিনবত্ব তাতে ছিল তা মধ্যযুগের ভারতীয় মরমিয়া সাধনায় ও লোকসাধনায় গ্রাহ্য হয়েছে। তা ছাড়া সিন্ধী, পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী জীবনে তা বিস্তার লাভ করবার যতখানি অবকাশ পেয়েছে বাঙালী জীবনে ততখানি সময় ও সুযোগ সে পায় নি। অষ্টাদশ শতকের উচ্চবর্গের মধ্যে তা প্রসারলাভ করতে না করতেই তার পথ বন্ধ হয়ে গেল ইংরেজদের রাজ্যলাভে—আর মধ্যযুগের অবসানে। এল যুগান্তর ও আধুনিক যুগের দুকূল-প্লাবী জোয়ার। তাতে অবশ্য চতুর্থ এক মহাসম্পদও লাভ হলো।

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভেই আমাদের বাঙালী জীবন এই সমাগত আধুনিক যুগের ঘাত-প্রতিঘাতে নবায়িত হতে আরম্ভ করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দান বহন করেই এতদিন পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঙালী ঐতিহ্য রচিত হচ্ছিল। তাকে কেন, সমস্ত ভারত-জীবনকেই আবর্তিত করল ইতিহাসের নতুন শক্তি। এই যুগধর্মকে গ্রহণ করতে না পারার অর্থ মৃত্যু। ইতিহাসের এই শক্তিকে আপনার করে নেবার সাধনা বাঙলাদেশে আরম্ভ হলো রামমোহন থেকে। তাতেই আরম্ভ হলো চতুর্থ এক নূতন সম্পদ। এ সম্পদকে সাধারণত বলা হয় Matter of Western World—পাশ্চাত্য জগতের সম্পদ।

ঐতিহ্যের রূপান্তর

এই আখ্যাটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। কিন্তু সেজন্য এইখানে ইতিহাস-বোধের একটু প্রয়োজন। তা না থাকলে দু রকমের ভুল আমরা করি। প্রথমতঃ মনে করি ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি বুঝি একটা স্থাণু জিনিস, তার পরিবর্তন নেই। কালে কালে তার পুনরাবর্তন ও অনুবর্তনই চলে; যুগান্তরেও তার রূপান্তর নিষ্প্রয়োজন, কারণ, রূপান্তরের অর্থ তার স্বধর্মচ্যুতি। বলা বাহুল্য, একথা সত্য হলে বাঙালী ঐতিহ্য গঠিত হতেই পারত না, বাঙালী ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় উত্তরাধিকারকে

আপনার করেই আমাদের এই ঐতিহ্যের জন্ম। মধ্যযুগের পার্শী-আরব্য দানকে গ্রহণ করতে তো তার বাধে নি। যুগান্তরে আধুনিক যুগধর্মই বা তা হলে তার অস্বীকার্য হবে কেন? বরং, বলা যায় "সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারেনা।" এই রূপান্তরের প্রচেষ্টায় তার প্রাণশক্তি পায় নূতন প্রকাশ, সে অর্জন করে নূতন জীবনচর্যা, সৃষ্টি করে আপনার নূতন ঐতিহ্য।

দ্বিতীয় ভুলটি এই—এই নবাগত চিত্তসম্পদকে অনেকেই মনে করেন 'পাশ্চাত্ত্য' জীবনধর্ম, আর তাই 'প্রাচ্য' জীবনাদর্শের তা প্রতিকূল। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা বুঝতে পারি এই জীবনচর্যা একান্তভাবে পাশ্চাত্ত্যের নয়, কোনো দেশ বা মহাদেশ বিশেষের নয়। এ সামাজিক বিবর্তনেরই ধর্ম। সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষার সহায় নিলে একটি কথাতেই তার স্বরূপ নির্দেশ করা যায়—এ হচ্ছে 'বুর্জোয়া বিকাশ', অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ও বুর্জোয়া জীবন-চর্যার বিকাশ। এই বিকাশেই সাধারণভাবে বলা যায় সকল সভ্যতার 'মধ্যযুগ' শেষ হয়, 'আধুনিক যুগ' আরম্ভ হয়। এই জীবনচর্যার মূল সত্য হল 'Rights of Man' মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তি স্বাধীনতায়, যুক্তিবাদিতায়, রাষ্ট্রজাতিক আত্মপ্রকাশের প্রয়াসের সঙ্গে এই মানবতাবোধই তখন পরিব্যাপ্ত হয় Man's man for a' that. অবশ্য একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, এই 'বুর্জোয়া ব্যবস্থা' আজ বাসি মাল। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ থেকে তা সাম্রাজ্যবাদী পর্বে পৌঁছয়। আপনার শ্রেষ্ঠ নীতিসমূহও সে তখন ত্যাগ করে—বিংশ শতাব্দী থেকে উন্নততর সমাজব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। আধুনিক যুগধর্মের আশ্রয় এখন সমাজতন্ত্রী-ব্যবস্থা, বুর্জোয়া-ব্যবস্থা নয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের, ন্যায়-নীতির-ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠ মুখপত্র ছিল বুর্জোয়াতন্ত্র, আধুনিক যুগের দিকে তা-ই প্রথম পদক্ষেপ, এই কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু মধ্যযুগের সমাজের তুলনায় বুর্জোয়া সমাজই উন্নতির বাহন; তখনকার বুর্জোয়া-বিকাশও তাই শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণযোগ্য। এ বিকাশ প্রথম ঘটেছে পাশ্চাত্ত্য দেশে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে। তাই ইংরেজ এই চিত্তসম্পদের প্রথম অধিকারী, তারপর তার অধিকারী অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জাতি—প্রাচ্যদেশে তা আসে আরও পরে। তাই আধুনিক যুগধর্মের মধ্যে ইংরেজি বৈশিষ্ট্য ও 'পাশ্চাত্ত্য' বৈশিষ্ট্যের ছাপ যথেষ্ট থাকবারই

কথা। কিন্তু "এহ বাহ্য"। মূল কথাটা এই যে, তা হচ্ছে 'বুর্জোয়া-ধর্ম'—যুগধর্মের প্রাথমিক রূপ। Right of man, মানব মহিমা, বুদ্ধির মুক্তি, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, জাতীয় মুক্তির প্রেরণা এ সবই আধুনিক যুগধর্ম—মধ্যযুগের পাশ্চাত্য ভূমিতেও এসব অগোচর ছিল, প্রাচ্য ভূমিতেও অগোচর ছিল। তা স্বীকৃত হয়েছে বুর্জোয়া বিকাশে আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে। আর পাশ্চাত্য সমাজেও তা গৃহীত হয় যখন প্রাচ্য সমাজ বুর্জোয়া বিকাশে উদ্যোগী হয়—মধ্যযুগ ছাড়িয়ে প্রবেশ করে আধুনিক যুগে। মধ্যযুগ প্রাচ্যেও যা পাশ্চাত্যেও তা। প্রভেদ যা তা প্রকৃতিগত নয়, আধারগত, বাহ্য ও আকারগত। এই আধারগত বৈশিষ্ট্য ধরে সেই যুগধর্মকে 'পাশ্চাত্যগুণ' বলা এখনও সুপ্রচলিত। রবীন্দ্রনাথও 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্য' প্রভৃতি শব্দ এরূপ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এরূপ 'প্রাচ্য' বলতে বোঝায় মধ্যযুগের প্রাচ্য,—বুর্জোয়া বিকাশের পূর্বেকার প্রাচ্য। অথচ পাশ্চাত্য বলতে বোঝানো হয় আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য—বুর্জোয়া বিকাশে সমুত্তীর্ণ পাশ্চাত্য। ঐতিহাসিক বুদ্ধিতে এই Matter of the Western World-কে 'বুর্জোয়া চিত্ত সম্পদ', অন্ততপক্ষে, 'আধুনিক যুগধর্ম' (Modernism) বলাই শ্রেয়; তা হলে অনেক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

এখন পূর্ব প্রসঙ্গে আসা যাক। কথাটা এই—রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই আধুনিক যুগ-প্রকৃতি ভারতীয় সমাজে উন্মেষিত হতে আরম্ভ করে। বাঙলা দেশই হয় তার বিকাশক্ষেত্র। বাঙলার ঐতিহ্যের তখন মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের কাল। রবীন্দ্রনাথও 'কালান্তর' প্রভৃতি বহু প্রবন্ধে এই যুগ-বিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। একইকালে তখন রেনেসাঁসের তাড়নায় ঘটে ঐতিহ্যের নবাবিষ্কার ও যুগধর্মের প্রবর্তনায় ঘটে ঐতিহ্যের নবায়ন। এই রেনেসাঁসের প্রেরণায় স্বাভাবিকভাবেই পার্সী-আরবী সম্পদ গৌণ হয়ে যায়, কিন্তু ভারতীয় সম্পদ ও বাঙলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নবপ্রাণ লাভ করে। আবার, আধুনিক যুগধর্ম বা বুর্জোয়া ভাব-সম্পদের প্রেরণায় বাঙলার ও ভারতের জাতীয় জীবনে রূপান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে। এটা বাঙলারই ঐতিহ্যের শক্তির পরিচায়ক যে, ভারতের মধ্যে এই ভাবসম্পদকে গ্রহণ করার মতো যোগ্যতার প্রমাণ বাঙালীরাই প্রথম দিয়েছে—রামমোহনের ধর্মসংস্কার, বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনা, আর বাঙলার জাতীয় মুক্তির আন্দোলন বাঙালীর সেই চিত্তসম্পদেরই পরিচায়ক। আর সেই বাঙালী চিত্তসম্পদের

শ্রেষ্ঠ প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মধ্যেই আমাদের ঐতিহ্যের সেই উজ্জীবন ও রূপান্তরের সামঞ্জস্যময় প্রকাশ সার্থক হয়েছে—এই কথাটিই বুঝবার মতো, এবং তা বুঝে রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালী ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ আলোচ্য।

রবীন্দ্রসাহিত্য ও বাঙালী-জীবন

বাঙালী জীবনের মধ্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল প্রোথিত, এ সত্য প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয় তাদের কাছে বাঙালী ঐতিহ্য সম্বন্ধে যাদের ধারণা অস্পষ্ট—যারা মনে করে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়তা বুঝি তার বাঙালীত্বের পরিপন্থী, কিম্বা বাঙালী ঐতিহ্য বুঝি মধ্যযুগের ধারাতেই আবর্তিত হবে, আধুনিক যুগের নিয়মে রূপায়িত হবার মতো যোগ্যতা বা আবশ্যকতা তার থাকতে নেই। এরূপ ভুল ধারণা না থাকলে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে বাঙালী ঐতিহ্যেরই সুমহৎ প্রকাশ বলে গণ্য করা স্বাভাবিক।

বাঙালী জীবনের মধ্যে যে স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত, একথা প্রমাণ করা নিষ্প্রয়োজন। বাংলার মাটি, বাংলার জল থেকে প্রাণরস গ্রহণ করতে না পারলে তিনি সত্য হতে পারতেন না। তাঁর নিসর্গ-কবিতায় বাংলার প্রকৃতি যদি রূপলাভ না করত তা হলেই আশ্চর্য হবার কথা। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি—হয়তো বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ভিন্ন তাঁর তুলনা নেই। তাঁর নিসর্গ দৃষ্টিতে যে অধ্যাত্মানুভূতি দেখা যায় তা যতটা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় তদপেক্ষাও ভারতীয় চিত্তসম্পদেরই সুপরিচিত লক্ষণযুক্ত —যে ভারতীয় সম্পদে বাঙালীরও উত্তরাধিকার। প্রকৃতির শান্ত গভীর উজ্জ্বল মধুর সকল রূপ সম্বন্ধেই তিনি সচেতন। ঋতুরঙ্গের প্রতিটি আবর্তনে তিনি সংবেদনশীল। কিন্তু, বাংলার প্রকৃতি, বিশেষ করে গঙ্গা-পদ্মাবিধৌত এই শ্যামলভূমি বাংলাদেশ এবং কতকাংশে লালমাটির এই রাঢ়ভূমি যে তাঁর কবিতায়, গানে, গল্পে, বর্ণনায়, পূর্বাপর আত্মবিস্তার করে আছে, তা স্থূল দৃষ্টিতেও প্রত্যক্ষ। কবিচৈতন্যে যে কত সূক্ষ্মভাবে এই বাংলার প্রকৃতির রূপ মিশে আছে তা অনুভব করা যায় তাঁর রূপকল্পের বিশ্লেষণে, কিম্বা তাঁর বর্ষার কবিতার কথা ও সুরে, শরৎ-বর্ণনার শুভ্র আলোক-অঞ্জলীতে। বাঙালী কবি ভিন্ন কার কল্পনায় সম্ভব হতো 'সোনারতরী'? সে কবিতার সমস্ত পরিবেশটিই বাংলার, বিষণ্ণ বঞ্চিত বাঙালী কৃষক জীবনই সেই রূপকের আধার। একথা কি মিথ্যা যে, কৃষ্ণকলি তাকেই কবি বলেছেন—ময়নাপাড়ার মাঠে

দেখেছিলেন যার কালো হরিণচোখ—সে মেয়ে চিরন্তনী, সেই শ্যামলা বাংলাদেশ। এরূপই বলা যায়, বাঙালীচিত্তের গীতিপ্রবণতার ঐতিহ্য মিশে আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, গানে, এমনকি ছোটগল্পেও। যে ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা গীতিকবিতার অপেক্ষা কম নয়, তা যেন বাংলার মাটি-জল-আকাশে ঘেরা জীবনরঙ্গের শ্রেষ্ঠ কাব্য, প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বিত পরিচয়। এই কারণেই কি বিদেশীদের নিকট রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সরস মাধুর্য সহজগ্রাহ্য হয় না ?

চিত্তসম্পদের বিচারে, বাংলার বৈষ্ণব-লীলারসের নতুন পরিবেশন যে রবীন্দ্রকাব্যে ও গানে ঘটেছে, একথা বহু প্রচলিত। কথাটা সত্যই উল্লেখযোগ্য। কারণ, বৈষ্ণব-রস-সম্পদে রামমোহন ও বঙ্কিম প্রভৃতি বাংলার রেনেসাঁসের পুরুষেরা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। সম্ভবত মহর্ষিও তাতে স্বস্তিবোধ করতেন না। তাই রবীন্দ্রচেতনায় রাগানুগা ভক্তি ও লীলা কীর্তনের পদাবলীর এই আকর্ষণ নিশ্চয়ই স্মরণীয় জিনিস। এক অর্থে তিনি বঙ্কিমের অপেক্ষাও বেশি বাঙালী। কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষনীয়—রবীন্দ্রনাথ 'উজ্জ্বল নীলমণি'র নির্দেশিত পথে পদরচনা করেন নি, রস-আস্বাদনও করেন নি। সেই প্রেমোন্মত্ততা ও রস-বিহ্বলতা 'চতুরঙ্গ'-এর কবির কাম্য ছিল না। কাব্যরসিক, জীবনরসিক হিসাবেই তিনি প্রধানত বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তেমনি কি শিব-উমা ও নটরাজ-।শবের কল্পনাও তাঁর কবি চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে নি ? আসলে তত্ত্বের দিক থেকে সম্ভবত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা কবীরই ছিলেন তাঁর নিকটতর। আসলে বাংলার বৈষ্ণব প্রেরণা অপেক্ষা বাংলার বাউলের প্রেরণাতেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এই কথা এ প্রসঙ্গেই উপলব্ধি করা উচিত যে, নব্যন্যায়, তন্ত্রসাধনা, বৈষ্ণবসাধনা অপেক্ষাও লোকচিত্তের গভীরেই খাঁটি বাংলার ঐতিহ্য নিহিত আছে। এই লোকচিত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় আত্মীয়তা ছিল। বাংলার ছড়া, গান, রূপকথা, এসবেরও উদ্ধার ও প্রথম সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী হন। তেমনি শিল্পসম্মত পদ্ধতিতে আপন সৃষ্টির মধ্যেও সেই ছড়া, গান, সুর এবং লোকসংস্কৃতির ভাবলোক ও রূপলোককে আত্মসাৎ করতে ছাড়েন নি। একটু অন্তর্দৃষ্টি থাকলে, রবীন্দ্রচেতনায় বাংলার লোকসংস্কৃতির রেশ যে বহুভাবে মিশে আছে তা অনুভব করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব অপেক্ষা তা কম গভীর নয়।

অবশ্য শুধু বাংলার মাটি, বাঙলার জল ও বাংলার স্বকীয় উদ্ভাবনা দিয়েই

বাংলার মানুষের চিত্তদেশ গড়ে ওঠে নি। বাংলার স্মৃতিলোক ভারতীয় উত্তরাধিকারেও পরিপুষ্ট—প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল ভারতীয় উত্তরাধিকারই তার আপনার। আর, রবীন্দ্রনাথ এই কথা সুস্পষ্ট করে তুলেছেন—এই ভারতীয় চিত্তসম্পদের শ্রেষ্ঠ প্রকাশও বাঙালী ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতমানস

ভারতীয় সাধনার যেরূপ সর্বাঙ্গীন পরিচয় আমরা রবীন্দ্রসাধনায় লাভ করেছি তা মহাভারত ছাড়া আর কোথাও পাইনা। বৈদিক কাল থেকে পৌরাণিক কালের সূচনা পর্যন্ত সুদীর্ঘ, বিচিত্র ভারত-জীবন মহাভারতের মধ্যে বিধৃত আছে। পৃথিবীতে এমন মহৎগ্রন্থ আর নেই। কিন্তু ভারতজীবন ও ভারতসাধনা সে যুগের পর স্তব্ধ হয়ে থাকে নি। বহুবিচিত্র বৌদ্ধ সাধনায় ও সুদীর্ঘকালীন জৈন সাধনায় ভারতসাধনা পরিস্ফুট হয়েছে। গুপ্তযুগের হিন্দু পুনরুজ্জীবনে, কালিদাস প্রভৃতির কাব্যে ও তৎকালীন শিল্পে তার নূতন অভ্যুদয় ঘটেছে। তারও পরে ইসলামীয় ঘাত-প্রতিঘাতে নানা সাধুসন্তের সাধনায় তা বিকশিত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় সাধনার এই বৈচিত্র্যময় ঐক্যের অনুধাবন যদি কোনো একটি প্রতিভার দানে করতে হয় তবে একমাত্র রবীন্দ্রপ্রতিভাতেই তা সম্ভব। যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রসাহিত্য শুধু উপনিষদের বাণীতেই প্রবুদ্ধ, তাঁরা বিস্মৃত হন—মহাভারতের সত্য-ই কি তিনি কম সঞ্জীবিত করেছেন, শিব মহেশ্বর বা নটরাজের ধারণাকেই কি তিনি কম স্বীকৃতি দিয়েছেন? তারপর, রবীন্দ্রপ্রতিভা বৌদ্ধ সাধনার গভীর সত্যকেও আমাদের সাহিত্যে পুনরুজ্জীবিত করেছে। কালিদাসের শিল্প-সুষমা ও জীবনাদর্শ তা আপন সৃষ্টিতে সঞ্চারিত করেছে। মধ্যযুগের সাধক সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধনাকেও তা অপূর্ব রস-নিষেকে জীবন্ত করে তুলেছে। মহাভারতের পরে ভারতীয় চিত্তের কাব্য-সুষমাময় ও সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ রবীন্দ্রসাহিত্যেই সম্ভব হয়েছে। আমরা গৌরব করতে পারি—বাংলাভাষার আধারেই ভারতের এই যুগে যুগে প্রকাশমান বাণী প্রথম সার্থক রূপ লাভ করেছে।

ভারতমানসের এই প্রকাশ যে বাঙালী ঐতিহ্যেরই প্রকাশ, এ কথা আমরা পূর্বেই অনুধাবন করেছি। এই প্রসঙ্গটি এখন শুধু বোঝা প্রয়োজন : এ শুধু প্রকাশ নয়, বিকাশও। রামমোহন থেকেই আমাদের দেশে এই ভারত সাধনার পুনরাবিষ্কার আরম্ভ হয়। অবশ্য তাতে আমাদের পথ প্রদর্শন করেন

এশিয়াটিক সোসাইটির মানববিদ্যার পণ্ডিতগণ। মধ্য যুগের গতানুগতিক অভ্যাসের মধ্যে, ন্যায়-স্মৃতি-জ্যোতিষের বিচার বিতর্কের মধ্যে ভারতের সেই চিত্ত সম্পদের কতটুকু ছিল জীবিত? মধ্যযুগের বাঙালী ঐতিহ্যে কতটুকু সন্ধান পেতাম আমরা বেদ ও উপনিষদের সংস্কৃত ভাষার বিচিত্র ঐশ্বর্যের, বৌদ্ধ সাধনার বা জৈন সাধনার? আধুনিক যুগে প্রবেশের ফলেই আমরা জানলাম এই মহান ভারতবর্ষকে, তার মহৎ সভ্যতাকে, আমাদের বিস্মৃতপ্রায় এই উত্তরাধিকারকে। বেদ ও উপনিষদের সঙ্গে নূতন করে পরিচয় হলো, বুদ্ধ ও অশোক পুনরাবিষ্কৃত হলেন। এমনকি সংস্কৃতিরও মহান্ সম্পদের পুনরুদ্ধার তখন থেকে সম্ভব হলো। কথাটা এই: এ শুধু পুনরুদ্ধার নয়, রেনেসাঁসের এই দানে তখন বাঙলার ঐতিহ্য নবায়িত হতে আরম্ভ করে। ভারত-সংস্কৃতির এই আবিষ্কারের অর্থ এই উত্তরাধিকারের নবমূল্যায়ন—আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিক চক্ষে, মানবতার নূতন আলোকে। সেই আলোকেই বাংলার ঐতিহ্যের তখন থেকে রূপায়ণ আরম্ভ হয়—রামমোহনের মুক্ত বুদ্ধিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টিতে ও জাতীয় জীবন রচনার প্রয়াসে; এবং শেষে জাতীয় আন্দোলনে জাতীয় জীবনের বহুমুখী রূপায়ণের সাধনায়। এই তিন ধারারই যখন পরিণতি ঘটল রবীন্দ্রকৃতিতে, তখন মধ্যযুগের বাঙালী ঐতিহ্য রূপায়িত হতে হতে লাভ করল রূপান্তর। পূর্বেকার বাঙলা ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙলার এই নবায়িত ঐতিহ্যের যে যোগ নেই তা নয়। সেই লোকসংস্কৃতির উপকরণ, সেই সর্বভারতীয় উত্তরাধিকার, এমন কি পার্শী-আরব্য সঞ্চয়, কিছুই অচল হয় নি। কিন্তু সবই রামমোহনের পর থেকে নবায়িত হয়ে স্বীকৃত হয়, আধুনিক যুগের যুক্তি ও শিল্পাদর্শ, জীবনবোধ ও মানবতাবোধের পরীক্ষায় যা উত্তীর্ণ তাই গ্রাহ্য। মধ্যযুগের বাঙলা ঐতিহ্যের সঙ্গে তাই এই বাঙালী ঐতিহ্যের পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত।

রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের পরে বঙ্কিমের দানকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ এই পার্থক্যই অনুভব করেছিলেন—"কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য।" এরূপ বিস্ময়েই আমাদের আবার অভিভূত

করে যখন শতবর্ষ পূর্বেকার বাঙলা সাহিত্যের সূচনাকে আজকের বাঙলা সাহিত্যের সম্পদের সঙ্গে তুলনা করি। মধুসূদন-বঙ্কিম যার সূচনা, রবীন্দ্রনাথে তা লাভ করেছে পরিণত শ্রী ও শক্তি। বাঙলা সাহিত্যের আজও অভাব অনেকদিকে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাপ এই কথাতেই করা যায় যে—বাঙলা সাহিত্য আজ সৃষ্টি-সম্পদে ও ভাব-সম্পদে যথার্থ আধুনিক-সাহিত্য, বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে তার স্থান এখন স্বীকৃত। সহস্রমনাঃ রবীন্দ্রনাথ মানবচিত্তের সমস্ত প্রকাশেই যেমন তাকে সার্থক দান করেছেন, তেমনি একটি অখণ্ডবোধেও তাকে দীক্ষিত করে গিয়েছেন। সেই বোধ মানবতাবোধ—বাঙলা সাহিত্যের এইটিই বিশিষ্ট রবীন্দ্র-ঐতিহ্য।

আমাদের জাতীয় জীবনের দিক থেকেও আবার এই কথাই বলা যায়। আমাদের জাতীয়তায় রবীন্দ্রনাথের দান কর্মে, চিন্তায় ও রসসম্পদে অসামান্য। যেমন, 'স্বদেশী সমাজ'-এ ও আত্মশক্তির নীতিতে তা সুস্থির ভিত্তিভূমির সন্ধান দিয়েছে। বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের প্রকাশ উদ্ঘাটন করে তা মহাজাতি গঠনের পথ নির্দেশ করেছে। কিন্তু জাতীয়তার সাময়িক প্রয়োজন ছড়িয়েও রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে জানতেন বলেই তিনি আমাদের জাতীয়তাকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত থাকবার শিক্ষাও দিয়ে গিয়েছেন। সমাজ সংগঠনের বাস্তব ক্ষেত্রে তাই অভিপ্রেত ছিল বিজ্ঞানের কল্যাণকর প্রয়োগের দ্বারা ধনসৃষ্টি, আর সমবায়িক নীতিতে সমাজবিন্যাসের দ্বারা সামূহিক কল্যাণ—সম্ভবত Cooperative commonwealth রূপে জাতীয় জীবনের বিকাশ। কিন্তু এই সমস্ত সামাজিক যান্ত্রিক নীতি পদ্ধতি ও কৌশল মোটেই আসল কথা নয়, তা শুধু বিশেষ আদর্শ উপলব্ধির উপায়। সেই বিশেষ আদর্শ 'সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব'। "রাষ্ট্রের প্রশস্ত ভূমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষবর্জিত হয়ে থাকে।" কিন্তু "স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্য রূপে পাওয়া"তেই জাতীয়তার সার্থকতা। 'ন্যাশনালিজম'-এর বুর্জোয়া সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনকে এই বিশ্বমানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দান সেই 'ভারততীর্থ'র আদর্শ, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বিশ্বমানবের মিলনব্রত উদ্‌যাপনের দায়িত্ব।

এই মানবতার ঐতিহ্যই রবীন্দ্রঐতিহ্য। রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার লাভ করেছি

বলেই এই রবীন্দ্রঐতিহ্যও আমাদের বাঙালীর ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যে আমাদের বাঙালী চিত্তক্ষেত্র শুধু আধুনিক কালের চিত্তসম্পদকে গ্রহণ করেছেই প্রস্তুত হয়নি, আগামী কালের চিত্তসম্পদ সৃষ্টিরও প্রেরণা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙলার ঐতিহ্যকে রূপায়িত করেন নি তাতে নতুন ঐতিহ্যও সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তাঁর প্রতিভার দানে আমাদের অতীতকালীন ঐতিহ্য বর্তমানে পৌঁছে আগামী কালের দিকে উন্মোচিত হয়ে চলছে। তাই এই বাঙলা দেশ, বাঙালী জীবন ও বাঙলার চিত্তভূমিতে জন্মেও এই সত্য উপলব্ধি করবার দায়িত্বও একালের বাঙালী লাভ করেছে—"মানুষ জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে।...তার তৃতীয় বাসস্থান মানবচিত্তের মহাদেশ॥"

শান্তিনিকেতন বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে (২৫শে জানুয়ারি, ১৯৬২) পঠিত।

আদর্শ ও বাস্তব

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

জীবন যখন একান্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে, তখন জীবিকা অর্জনের পন্থা ও পদ্ধতি নিয়ে মানুষের আর কোনো বাচ্‌বিচার থাকে না; সে তখন কুৎসিৎ হতেও লজ্জা পায়না। আবার আদর্শ যখন ব্যোমচারী ও উৎকটভাবে সাত্বিক হয়ে ওঠে, বাস্তব তখন লজ্জায় আধমরা হয়ে যায়। দর্শন যদি মাটি ছেড়ে যায়, ধর্ম তখন মাটি কামড়ে, কাদা মেখে বীভৎস হয়ে ওঠে।

দর্শনে ও ধর্মে, আদর্শে ও বাস্তবে, জীবনাদর্শে ও জীবিকাসংস্থানের মধ্যে যখন গাঁটছড়া পড়ে তখন তাকে পাকা গাঁটকাটাও ছিন্ন করতে পারে না।

মানুষ জীবনকে সার্থক করার জন্য তার অর্থ খুঁজছে যুগযুগান্ত থেকে, তাই এত মত, এত পথ। অসংখ্য গুরু, অবতার ও দেবতা—সকলেই জীবন-দর্শনের দাওয়াই বিজ্ঞাপিত করছেন।

রবীন্দ্রনাথও আদর্শ প্রচার করেছেন এবং জীবনের কর্মে তা রূপান্তরিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে গুরুদেব নামটি পেয়ে তিনি কখনো গুরুগিরি করেন নি। তিনি নিবিড় ভাবেই মানুষ ছিলেন, নিজ জীবনে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিচিত্রের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। মুক্তি তিনি চাননি। রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শে ছিল সবার মুক্তি কামনা।

আজকার দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন একটা উন্মাদাগারে বাস করছি। প্রশ্ন জাগে মনে—এর থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে কে, শান্তি আনতে পারে কে। সে পারে কবি। রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' স্মরণীয়: "একদিন ওরা ভাববে রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই। দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—জয় আমাদের হাল, লাঙল, চরকা, তাঁতের। তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।"

প্রশ্ন ওঠে রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বিদ্রূপ করে পুরুত ঠাকুর বলেন কবিকে—"তখন যদি রথ আর একবার অচল হয়, বোধ করি তোমার

মত কবিরই ডাক পড়বে—তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা"। কবি বলেন "নিতান্ত ঠাট্টা নয়, রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে।"

"রথ তারা চালায় কিসের জোরে?"

"গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে। আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে। মরে মানুষ অসুন্দরের হাতে, চালচলন যার একপাশে বাঁকা। আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মানো কঠোরকে—অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে। বাইরে ঠেলা মারার উপর বিশ্বাস, অন্তরের তালমানের উপর নয়।"

ছন্দ-ছাড়া, তালভঙ্গ হয়েছিল বলেই তো উর্বশীর নির্বাসন হয়েছিল অমরাবতী থেকে।

আজ দিকে দিকে শান্তির বাণী ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু কোথাও শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, বিশ্রাম নেই, স্তব্ধতা নেই। "ভিতরে রস না জমিলে বাইরে কি গো রঙ ধরে"—বাউলের গান মনে হচ্ছে। যে জন শান্তির বাণী শোনাচ্ছে, তার মনে সে 'শান্তম' এর স্থান করে নেয় নি। আমাদের পূজা-পার্বণে শান্তিবচন পাঠ হয়—তার ফলও যেমন নিষ্ফল, আজ জগৎব্যাপী শান্তি শান্তি রব তেমনি অনেকক্ষেত্রে expediency-র স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যখনই মানুষ ভুলে গেছে সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ধর্ম ও নীতির উপর, তখনই কোন্ অদৃশ্য রন্ধ্র দিয়ে শনি প্রবেশ করেছে—কত ছদ্মবেশে, কত ছদ্মনামে। বিষিয়ে তুলেছে বিশ্বকে তার নিশ্বাসে! সর্ব মানবের কল্যাণ-কামনা যদি সুবিধাবাদের স্তর থেকে উদ্ভূত হয় ও কল্যাণ-সাধনা যদি বিশেষ মত বা গোষ্ঠির সমর্থন সাপেক্ষ হয় তবে সেখানেও বিধাতার বজ্র পতিত হয়। সেই জন্ত বারে বারে পৃথিবীতে যুদ্ধ এসেছে, আসছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন বা জীবন আদর্শের মূলকথা হচ্ছে 'মানুষের ধর্ম'। আজ কবির মূল্যায়ন করার সময়ে যেন আমরা তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার কথা পাশ কাটিয়ে না যাই। কবির বিবিধ কর্ম ও বিচিত্র বাণীর স্তূপ নির্মাণ করে তাতে সন্ধ্যা-আরতি দিতে পারি, কিন্তু তা স্তূপ পূজা হবে—বোধিচিত্তর প্রাপ্তি হবে না। কবির জীবন দর্শন জানবার প্রয়াস যেন হস্তিদর্শনন্যায়ে পরিণত না হয়। কিন্তু চারি দিকের আলোচনা থেকে মনে হয়—এ যেন অন্ধের হস্তী দর্শনই হচ্ছে। কেউ ধরছে হাতির শুঁড়, কেউ দাঁত, কেউ পা, কেউ লেজ,

প্রত্যেকেই মনে করছে সেটাই হাতি ; আর তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও বিতণ্ডা ; অবশেষে জীবন্ত দাহ, নির্বাসন, জেহাদ, ক্রুসেড্ চলেছে। কেউ বলছি, রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব—কারণ তাঁর কাব্য থেকে অসংখ্য উদাহরণ জমা করা যায়। কেউ বলছেন তিনি রুদ্রের সাধক—শিব-রুদ্রের বহু উপমা তাঁর কবিতায় আছে। কেউ বলছেন তিনি অজ্ঞেয়বাদী, যেহেতু কয়েকটি কবিতায় ও গানে তিনি অজানার জয় গেয়েছেন। তাঁকে আমরা কেউ দেখছি স্বাদেশিক, কেউ আন্তর্জাতিক রূপে ; কেউ শিক্ষাব্রতীরূপে, কেউ নটের সাজে। বিচিত্রের দূত কবিকে, যার যেমন প্রয়োজন, তেমনি বর্ণনা করেছেন। সবই হয়তো সত্য। এ সমস্তকেই তিনি স্বীকার করেছিলেন নিজের মতো করে।

কবির জীবনদর্শনের মূল উৎস ছিল গায়ত্রী ছন্দে উদ্‌গীত সাবিত্রী মন্ত্রের ধ্যান এবং উপনিষদের "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" বাণী। ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে কবির আবির্ভাব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মবাদ নিয়েই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত। কবির বিচিত্র জীবনধারার মধ্যে তার কোনো নির্গলিত বাণী কি আমরা পাই? পাই—সেই বাণী হচ্ছে এগিয়ে চলার বাণী—"আগে চল্ আগে চল্ ভাই।" কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। অতীতকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি। অতীতের সঙ্গে আত্মিক যোগকে মেনে নিয়েই তিনি এগিয়ে চলেছিলেন।

বর্তমানকে কবি উপেক্ষা করেন নি—তার নিদর্শন রয়েছে তাঁর রাজনীতিক, সমাজনীতিক, আর্থনীতিক প্রবন্ধ ও পত্রধারার মধ্যে। দেশের বা বিদেশের কোনো অন্যায় অবিচারকে কবি নীরবে সহ্য করেন নি। তাঁর কবিহৃদয় আঘাত পেত, বেদনা অনুভব করত সমাজে তালভঙ্গ হলে। তাই তিনি নির্ভয়ে বলে যেতেন আপন কথা। অন্তরের অনুভূতি রূপ নিত কাব্যে, গানে, নাটকে।

অরসিক সমালোচকদের লেখনী থেকে এমন কথাও বের হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ এই সব পাঁচ-মেশালী কাজে মন না দিলে সাহিত্য আরও সম্পদবান হতে পারত। হয়তো হতো, কিন্তু তা এমন বিচিত্র রসে পরিপুষ্ট হতো কিনা সন্দেহ। অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও বর্তমানের সঙ্গে ভাবীকালের ভাবনার গঙ্গাধারা বইত না—তা এমন ভাবে বিশ্বপ্লাবী হতো না।

আফ্রিকার নবজাগৃতির পটভূমিকা

অংশু দত্ত

আফ্রিকা মহাদেশের সর্বত্র আজ যে অশান্ত আলোড়ন দেখা যাচ্ছে তার প্রকৃতি বুঝতে গেলে যেতে হবে এর পটভূমিকায়। অনুধাবন করতে হবে— আফ্রিকার সনাতন কৌমসমাজ কেমন ছিল, কিভাবে তার পরিবর্তন সুরু হলো, কী সেই পরিবর্তনের রূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং সর্বশেষে সমাজদেহে এই বিরাট ওলটপালটের প্রভাব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেমন করে ও কতদূর পর্যন্ত পড়েছে।

আফ্রিকার সাম্প্রতিক নবজাগৃতির দুটি দিক লক্ষণীয়: প্রথমত এতদিন পর্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন যে সব কৌমসমাজ বেঁচে ছিল তাদের অনেকের বর্তমান ভগ্নদশা এবং দ্বিতীয়ত প্রাচীন সমাজের ভাঙনের পাশাপাশি এক নতুন সমাজের ভিত্তি-পত্তন।

স্বভাবত আফ্রিকার মতো বিশাল ও বৈচিত্র্যময় মহাদেশে প্রাচীন সমাজের অবক্ষয় ও নতুন সমাজের প্রস্থাপনের প্রক্রিয়া একহারে চলছে না। কোথাও এর গতি শ্লথ (যেমন মোজাম্বিক, দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেনীয় উপনিবেশসমূহ), কোথাও বা এর পদক্ষেপ দ্রুত (যেমন ঘানা, সেনেগাল প্রভৃতি দেশ)। এমন কি কোনো একটি দেশে যে পরিমাণে প্রাচীন সমাজের অবক্ষয় হচ্ছে সব সময় ঠিক সেই পরিমাণে যে নয়া সমাজ গড়ে উঠেছে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কঙ্গোর কথা ধরা যাক। বেলজিয়ানরা আসার আগে দাসব্যবসায়ের বিভীষিকায়, লেওপোল্ডের নেতৃত্বে স্বাধীন কঙ্গো-রাজ্যের ('কঙ্গো ফ্রী স্টেট') আমলে কনসেশনভোগকারী কোম্পানীগুলির জুলুমে ও পরে মুদ্রাকেন্দ্রিক আধুনিক অর্থনীতির দাবিতে কঙ্গোদেশের একটা প্রধান অংশের পুরনো সমাজ প্রচুর আঘাত খেয়েছে। কিন্তু প্রাচীন সমাজদেহ যে পরিমাণে ছত্রভঙ্গ হয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণে কি নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে? নতুন সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য হলো পুরনো দিনের কৌমভিত্তিক সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর জনসমষ্টির মধ্যে সমবৈশিষ্ট্য-চেতনার উদ্ভব। সমগ্র কঙ্গোবাসীদের মানসে সমবৈশিষ্ট্যচেতনা যে খুব

গভীর শেকড় গাড়তে পারেনি, তার প্রমাণ তো স্পষ্ট। আর যতদিন না এই চেতনা দানা বেঁধে ওঠে ততদিন কোনো দেশ জাতিতে পরিণত হয় না। তাকে বড় জোর এক ভৌগোলিক নামই দেওয়া যায়।

আফ্রিকার দেশগুলিতে সমবৈশিষ্ট্যচেতনা বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। এর একেবারে প্রাথমিক স্তর হলো সেটি যখন একাধিক অনুরূপ কৌম তাদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম বা সংস্কৃতির সাদৃশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে এক সংগঠন গড়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ আমরা ট্যাঙ্গানাইকার চাগা কৌমসমূহের সাধারণ সংগঠনের উল্লেখ করতে পারি। আবার কখনও কখনও বহুদিন এক সরকারের সাধারণ আইন ও সাধারণ শাসনের অধীনে থাকার পর বিসদৃশ কৌমগুলির মধ্যেও সমবৈশিষ্ট্যচেতনা জেগে উঠতে পারে। আফ্রিকা বিভাজনের সময়ে ইওরোপীয় প্রতিযোগীরা নিজ নিজ অধিকৃত দেশগুলির রাজনৈতিক সীমারেখা নৃতত্ত্ব বা ভাষাতত্ত্বের মানদণ্ডে টানে নি। এর ফলে অনুরূপ এমনকি একই কৌমের লোকেরা অনেকসময় দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার ইউই কৌমের লোকেরা তো ত্রিধাবিভক্ত হয়েছিল: তাদের এক অংশ পড়েছিল তৎকালীন বৃটিশ উপনিবেশ গোল্ডকোস্টে, অন্যভাগ বৃটিশ অছিরাজ্য টোগোল্যাণ্ডে ও তৃতীয় আর এক ভাগ যুক্ত হয়েছিল ফরাসী অছিরাজ্য টোগোল্যাণ্ডে। এইভাবে নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের সীমানার সঙ্গে রাজনৈতিক সীমানার গরমিল হওয়ায় অনেক দেশে একাধিক বিসদৃশ কৌমের সমাবেশ হয়েছিল। কিন্তু এমন পার্থক্য সত্ত্বেও দীর্ঘদিন একভাবে শাসিত হওয়ার ফলে অধিবাসীদের অন্তত একাংশের মনে জন্ম নিতে পারে এক আঞ্চলিক চেতনাবোধ। পূর্বতন বৃটিশ উপনিবেশ গোল্ডকোস্টে (বর্তমান ঘানা) বহু কৌমের বাস এবং তাদের কারো কারো মধ্যেকার (যেমন ফান্তি ও আশান্তি) শত্রুতা বহুদিনের। তা সত্ত্বেও ঘানার এক বৃহৎ অংশ সেখানকার সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে 'ঘানীয়' বোধ ও চেতনা জাগাবার জন্যে অত্যন্ত সচেতনভাবে যত্নবান।

আরো উচ্চস্তরে, একাধিক দেশ নিয়ে সমবৈশিষ্ট্যচেতনা জাগাবার চেষ্টা কোনো কোনো নেতৃস্থানীয় মহলে করা হচ্ছে। পূর্ব ও মধ্য-পূর্ব আফ্রিকার বৃটিশ-শাসিত দেশগুলির সমস্যা অনেকাংশে এক। তাদের অনুরূপ প্রয়োজন মেটাবার জন্য রয়েছে পূর্ব আফ্রিকা হাই কমিশন। সম্প্রতি কেউ কেউ এইসব দেশগুলি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছেন।

সর্বশেষে সমগ্র মহাদেশের, এমনকি আফ্রিকার বাইরের নিগ্রোদেরও একাংশের মধ্যে জন্ম নিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ হিসাবে সমবৈশিষ্ট্যচেতনা, যা বহু-বিঘোষিত প্যান-আফ্রিকান আন্দোলনের মানসিক বনিয়াদ। মার্কিন-নিগ্রো-নেতা দ্যু বোয়ার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস, গার্ভের নেতৃত্বে পরিচালিত 'ফিরে চলো আফ্রিকায়' আন্দোলন ও গত কয়েক বছরের সরকারী বেসরকারী বহু সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই প্যান-আফ্রিকান মনোভাবের কিছুটা পরিচয় আমরা পেয়েছি।

মোদ্দা কথা তাহলে এই দাঁড়ায়, নয়া সমাজের বাহকস্তম্ভ হলো সঙ্কীর্ণ কৌমগণ্ডী ছাড়িয়ে বৃহত্তর জনসমষ্টি সম্পর্কে মমত্ববোধ ও সমবৈশিষ্ট্যচেতনা—যা আমাদের এক দেশ, এক সরকারের অধীনে বাস করতে ও এক আদর্শের রূপায়নে সংগ্রাম করতে প্রেরণা যোগায়।

অবশ্য কোনো সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশে এক এক ধরণের চেতনার স্তর থাকা সম্ভব। যেমন, অশিক্ষিত ও রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে অনগ্রসর লোকেরা স্বকীয় কৌমবন্ধনকে সবার ওপরে স্থান দিতে পারে; 'আলোকপ্রাপ্ত' অংশ হয়তো বহুকৌমভিত্তিক রাষ্ট্রগড়ার স্বপ্ন দেখছে। তাছাড়া, একই লোকের মধ্যে একাধিক সমবৈশিষ্ট্যচেতনার সহাবস্থান সম্ভব: নিজ কৌমের লোকদের সম্পর্কে এক ধরণের আবেগ ও প্রত্যয়, নিজশ্রেণী সম্বন্ধে আরে এক ধরণের বোধ, স্বকীয় ধর্মের প্রতি হয়তো অন্যধরণের মমত্ব। এর মধ্যে ঠিক কোন্ সমবৈশিষ্ট্যচেতনাটি রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রগঠন ব্যাপারে অন্য চেতনাগুলির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে তা সাধারণভাবে বলা অসম্ভব। তবে এটুকু সুনিশ্চিত যে, এক-কৌমিক সমাজের ওপর ভিত্তি করে আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামো দাঁড়াতে পারে না; কারণ এক-কৌমিক সমাজের লোকবল, ধনবল ও বাহুবল বর্তমান জগতের কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

সমবৈশিষ্ট্যচেতনার অসমান স্তর ছাড়া তার বিভিন্ন রূপের কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার। সমবৈশিষ্ট্যচেতনা ও পরশাসনবিরোধী মনোভাব ও প্রতিরোধ যে সব সময় পরিষ্কার রাজনৈতিক রূপ নেবে এমন কোনো কথা নেই। বহু ক্ষেত্রে সমবায় জাতীয় শিক্ষা এমন কি বিশেষ কোনো ধর্মীয় আন্দোলনের আড়ালে আফ্রিকায় আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামী মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে (উদাহরণ: ট্যাঙ্গানাইকায় সমবায় আন্দোলন, ঘানায় জাতীয় শিক্ষা

আন্দোলনের প্রবর্তন, পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গোর কিম্বাঙ্গু-প্রবর্তিত সংগ্রামমুখী নবধর্ম-আন্দোলন)।

স্বভাবত সনাতন কৌমবন্ধন যতদিন অটুট থাকে, ততদিন বৃহত্তর সমাজের চেতনা জাগতে পারে না। অতএব এই অর্থে আমরা বলতে পারি, সনাতন কৌম সমাজের ভাঙনে নতুন সমাজের বীজ গুপ্ত আছে। এখন, এই প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ভেঙে যায় কেমন করে, সে কথায় আসা যাক।

দুই

ইওরোপীয় প্রভুত্ববিস্তার যেমন ভারতবর্ষের সনাতনী সমাজব্যবস্থায় সুদূর-প্রসারী পরিবর্তনের কারণ, আফ্রিকার দেশগুলিতেও তাই। এতদিন যেসব অঞ্চলের আধুনিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো বৃহদায়তন সাম্রাজ্যসমূহে, যাদের প্রাণকেন্দ্র ছিল ইওরোপে। অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত যেসব দেশ পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাদের বিচ্ছিন্নতা এবার শেষ হয়। এবং বলা বাহুল্য এর প্রভাব সনাতন কৌমসমাজে না পড়ে পারে নি।

অবশ্য, সর্বক্ষেত্রে কৌমসমাজের ধ্বংসসাধন ইওরোপীয় শাসন কর্তৃপক্ষের সচেতন ও সুপরিকল্পিত নীতি ছিল, একথা বলা যায় না। বরং, অনেক সময় (যেমন, ইদানীংকালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের ইওরোপীয় শাসকেরা চেষ্টা করছেন) কর্তৃপক্ষ প্রয়াস পেয়েছে কৌমসমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার। তবু সামগ্রিকভাবে ইওরোপীয় প্রভু কর্তৃক আধুনিক শাসনযন্ত্র স্থাপন, বাণিজ্য ও মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রসার ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইওরোপীয় ও এশীয় ঔপনিবেশিকদের বসতি স্থাপন পরোক্ষভাবে কৌমসমাজের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে।

নিরন্তর আন্তঃকৌম দ্বন্দ্ব বন্ধ করা হলো ইওরোপীয় শাসন স্থাপনের সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ এক ফল। এক কৌমের সঙ্গে অন্য কৌমের দ্বন্দ্ব ও কখনও কখনও রক্তাক্ত যুদ্ধ বন্ধ করে কৌমের সাধারণ লোকের কাছে কৌমপ্রধানকে ছোট করা হয়েছে। যুদ্ধ পরিচালনা বহুক্ষেত্রে কৌমপ্রধানের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। ইওরোপীয় শাসন বলপ্রয়োগের ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে কৌমপ্রধানের পদমর্যাদা খর্ব করেছে। কৌমপ্রধানের অন্য বহু ক্ষমতাও ইওরোপীয় সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। আর বাকি

যে ক্ষমতা তাঁদের রাখতে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি তাঁরা প্রয়োগ করতে পারেন বিদেশী প্রভুদের অনুগত কর্মচারী হিসাবে। এককথায়, পূর্বে কৌমপ্রধান রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা নিজপদে কেন্দ্রীভূত করে সমগ্র কৌমকে যেমনভাবে ঐক্যবদ্ধ রূপ দিতেন, ইওরোপীয় আমলে তা হবার আর উপায় নেই। অন্তনিরপেক্ষ শাসক হিসাবে কৌমপ্রধানদের অবলুপ্তি এক হিসেবে কৌমসমাজের আত্মসম্পূর্ণতার ধ্বংসের সূচক।

ইওরোপীয় শাসনপ্রতিষ্ঠার আনুষঙ্গিক অন্ত একটি ব্যাপার হলো নতুন রকমের কর স্থাপন। কৌমশাসনে কৌমপ্রধানকে হরেক রকমের ভেট ও উপহার দেবার প্রথা আফ্রিকার সমাজগুলিতে প্রচলিত ছিল। ইওরোপীয় শাসকেরা এসে যে করটির প্রবর্তন করলেন তা পণ্যের বদলে মুদ্রায় দেয়। আধুনিক শাসন চালাবার জন্তে কর হিসাবে প্রদত্ত এই অর্থ যে অতিপ্রয়োজনীয় সেকথা অনস্বীকার্য। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এই, বহুক্ষেত্রে রাজভাণ্ডারের আয়ের চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণে এই মুদ্রাকর বসানো হয়। কর দেবার জন্ত আফ্রিকানদের প্রয়োজন টাকার। এবং সে-টাকা উপার্জন করা যায়: (ক) যাদের হাতে টাকা আছে সেই ইওরোপীয়দের জন্ত কাজ করে; কিংবা (খ) বাজারে বিক্রি করে টাকা পাওয়া যায় এমন ফসল উৎপাদন করে।

প্রথমটার পরিণতি হয়েছে কৌমসমাজ থেকে দলে দলে আফ্রিকানদের শহরাঞ্চলে খনি-এলাকা ও বাগিচায় গমনে। একথা সত্য যে এমনভাবে যারা গেছে তাদের এক ভগ্নাংশ মাত্র চিরকালের জন্ত গাঁ-ছাড়া হয়েছে। অর্থাৎ, বেশিরভাগই কিছুদিনের জন্ত "টাকা কিনতে" বাইরে গেছে, তারপর গাঁয়ে ফিরে এসেছে, পরে আবার বাইরে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ঘর-বাহির' করার এক দৃষ্টান্ত মিলবে 'কাইসকামাহক' গ্রাম্য সমীক্ষায়:

নাম: সমীক্ষায় নাম দেওয়া হয় নি।

নারী না পুরুষ: পুরুষ।

জন্ম: ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

শিক্ষা: প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত।

প্রথম কবে কাজ করতে গ্রামের বাইরে যায়: ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তার বয়েস ১৬ বছর।

ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮ থেকে মার্চ, ১৯০৯: দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় জার্মান পশ্চিম আফ্রিকান রেলপথে কাজ করে।

মার্চ, ১৯০৯ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯১১ : বাড়িতে থাকে।
সেপ্টেম্বর, ১৯১১ থেকে এপ্রিল, ১৯১২ : প্রিটোরিয়ায় খনিশ্রমিক।
এপ্রিল, ১৯১২ থেকে ডিসেম্বর, ১৯১২ : বাড়িতে থাকে।
ডিসেম্বর, ১৯১২ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ : উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।
সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ থেকে নভেম্বর, ১৯১৩ : বাড়িতে থাকে।
নভেম্বর, ১৯১৩ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯১৬ : উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।
সেপ্টেম্বর, ১৯১৬ থেকে মার্চ, ১৯১৭ : বাড়িতে থাকে।
মার্চ, ১৯১৭ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ : উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।
সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ থেকে নভেম্বর, ১৯১৭ : বাড়িতে থাকে।
নভেম্বর, ১৯১৭ থেকে নভেম্বর, ১৯১৯ : উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।
নভেম্বর, ১৯১৯ থেকে ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ : বাড়িতে থাকে—এই সময় তার বিবাহ হয়।
ফেব্রুয়ারি, ১৯২১ থেকে জুলাই, ১৯২১ : কেপটাউনে গৃহস্থবাড়িতে চাকরের কাজ করে।
জুলাই, ১৯২১ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ : বাড়িতে থাকে।
সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ থেকে জুন, ১৯২৪ : কেপটাউনে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে।
জুন, ১৯২৪ থেকে নভেম্বর, ১৯২৪ : বাড়িতে থাকে।
নভেম্বর, ১৯২৪ থেকে নভেম্বর, ১৯২৫ : কেপটাউনে মজেল ডেয়ারীতে দুধ বিলি করার কাজ করে।
নভেম্বর, ১৯২৫ থেকে ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮ : বাড়িতে থাকে।
ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮ থেকে নভেম্বর, ১৯৩০ : বেনোনির ইস্পাত কারখানায় কাজ করে।
নভেম্বর, ১৯৩০ থেকে অক্টোবর, ১৯৩১ : জোহানেসবার্গে এক ইলেকট্রিক কোম্পানিতে কাজ করে।
অক্টোবর, ১৯৩১ থেকে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ : জোহানেসবার্গে গৃহস্থবাড়িতে চাকরের কাজ করে।
সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ থেকে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ : বাড়িতে থাকে।
ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ থেকে মার্চ, ১৯৩৮ : উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।
মার্চ, ১৯৩৮ থেকে নভেম্বর, ১৯৩৯ : বাড়িতে থাকে।
নভেম্বর, ১৯৩৯ থেকে মে, ১৯৪০ : উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।

মে, ১৯৪০ থেকে নভেম্বর, ১৯৪৩ : জোহানেসবার্গে খনিশ্রমিক।
নভেম্বর, ১৯৪৩ থেকে মে, ১৯৪৫ : বাড়িতে থাকে।
মে, ১৯৪৫ থেকে নভেম্বর, ১৯৪৫ : উইটওয়াটার্সর‍্যাণ্ডে খনিশ্রমিক।
নভেম্বর, ১৯৪৫ থেকে আজ পর্যন্ত : বাড়িতে আছে।

অজ্ঞাতনামা এই আফ্রিকান ১৬ থেকে ৫৩ বছর পর্যন্ত শ্রমিক হিসাবে কাজ করেছে। ৩৭ বছরের কর্মজীবনে সে রেলপথ ও খনিশ্রমিক, গৃহস্থবাড়ির ভৃত্য, রাজমিস্ত্রী, দুধ সরবরাহকারী, ইস্পাত কারখানায় মিস্ত্রী, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী প্রভৃতি অনেক রূপে ছ-টি বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছে। তেরোবার সে বাইরে গেছে আর বাড়ি ফিরেছে এবং সবশুদ্ধ ষোলবার চাকরী বদলিয়েছে।

'কাইসকামাহক' সার্ভের কর্তারা মন্তব্য করেছেন: এই শ্রমিকটির জীবনেতিহাস সাধারণভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকদের কর্মে অস্থায়িত্বের এক যথোপযুক্ত দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। এর ফলে নগরগামী শ্রমিকরা স্থায়ীভাবে শহরের বাসিন্দা হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু এই আসা-যাওয়ার ফলে যে তার কৌমবন্ধন অংশত শিথিল হয়ে পড়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যতই দিন যাচ্ছে, ততই ক্রমশ বেশি সংখ্যায় আফ্রিকানরা শহরের দিকে ছুটছে। হিসেব করে দেখা গেছে ১৯২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের আফ্রিকান অধিবাসীদের মাত্র ১৩% শহরাঞ্চলে বাস করত। ১৯৫০ সালে এই অনুপাত বেড়ে হয় ২৫%। বাসুতোল্যাণ্ডের মোট সাতলক্ষ অধিবাসীর একলক্ষ লোক সব সময়ই দক্ষিণ আফ্রিকায় খনি, শিল্প ও বাগিচায় কর্মব্যস্ত থাকে। তেভিড্‌সনের সংখ্যানুযায়ী ১৯৫৩ সালে তৎকালীন বেলজিয়ান কঙ্গোর আফ্রিকান অধিবাসীদের এক-চতুর্থাংশ কৌম এলাকার বাইরে বাস করত, যেখানে ১৯৪৬ সালে এই অনুপাত ছিল এক-ষষ্ঠাংশ।

উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় আফ্রিকানদের শহরবাসের তাৎপর্য কী? প্রথমত কৌমসমাজের বাইরে যারা যায়, তারা নতুন নতুন লোকের নতুন নতুন সমাজের সংস্পর্শে আসে। ফলে, অন্তত কিছু পরিমাণে তাদের মানসিক সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। শহরে গিয়ে চটকদার ভোগ্যবস্তুর সন্ধান পেয়ে এদের অনেকে কর দেবার জন্য যেটুকু প্রয়োজনীয় তারও অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনে সচেষ্ট হতে পারে। এর জন্যে প্রয়োজন হয় আরও বেশিদিন ধরে কৌম সমাজের বাইরে কাজ করা। এদের দৃষ্টান্ত অনেককে প্রেরণা যোগায়।

এমনি করে ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় লোকের সনাতনী কৌম-অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীলতা কমে যায়।

অন্যদিকে কৌমসমাজ থেকে দলে দলে লোক অন্যত্র চলে যাওয়ার দরুণ এতদিনকার প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ কৌম-অর্থনীতি ভীষণভাবে আঘাত খেয়েছে। এ পর্যন্ত কৌমসমাজের প্রয়োজনীয় পণ্যের মোটামুটি উৎপাদন হতো কৌম-সমাজের ভেতরেই। এখন এতগুলি শক্ত, সমর্থ লোকের কৌমসমাজত্যাগের ফলে খাদ্যোৎপাদনের কাজ ব্যাহত হয় এবং অনেকক্ষেত্রে বাইরে থেকে খাদ্য আমদানীর ওপর কৌমসমাজকে নির্ভর করতে হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির বিনাশ কৌমসমাজের ধ্বংস ঘনিয়ে আনে।

বহু লোকের সনাতন সমাজ ত্যাগের ফলেই শুধু কৌম-অর্থনীতিতে ভাঙন ধরে নি। আমরা আগে বলেছি অর্থোপার্জন করা যায় গ্রামে বসেই, অর্থকরী ফসল উৎপাদন করে। আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে এমনি করে তুলো, কফি, তামাক, কোকো, চীনেবাদাম, এমনকি সাইসাল পর্যন্ত আফ্রিকান কৃষকেরা উৎপাদন করছে। এভাবে অর্থোপার্জনের জন্য গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেতে হয় না (বিক্রয় উদ্দেশ্যে ছাড়া)। কিন্তু তাই বলে এর দ্বারা কৌম-অর্থনীতি যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এমন কথা বলব না। কারণ, পূর্বোক্ত ফসল-উৎপাদন, বাজারে বিক্রয় ও লব্ধ অর্থে প্রয়োজনীয় দ্রব্য (অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যও) ক্রয়ঃ এই সব কার্যকলাপ কৌমসমাজ ছাড়িয়ে সারা দেশব্যাপী যে অর্থনীতি-ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে (এবং যার সঙ্গে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিরও যোগাযোগ আছে) তার অংশীভূত। অন্যভাবে বলা যায়, কৌম-অর্থনীতির স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরিপন্থী হলো এই সব কার্যকলাপ।

আরো একটু এগিয়ে গিয়ে আমরা বলতে পারি, এই সব কার্যকলাপে বিশ্ব-অর্থনীতির সঙ্গে আফ্রিকার দেশসমূহের যোগসাধনই সূচিত। সামগ্রিকভাবে আফ্রিকা কতখানি বিশ্ব-অর্থনীতির অঙ্গীভূত হয়েছে তার ইঙ্গিত আমরা পাই দুটি হিসাব থেকেঃ

[ক] বিশেষ বিশেষ পণ্যের পৃথিবীর সামগ্রিক উৎপাদনের কতখানি আফ্রিকা নিয়ন্ত্রণ করে ও মোট বিশ্ববাণিজ্যে আফ্রিকার অংশ কতটা।

[খ] আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিশ্ব-অর্থনীতির যোগসাধনের এক তুলনামূলক বিচার চলতে পারে কোথায় কতখানি বিদেশী মূলধন লগ্নী হয়েছে তার হিসাবে।

১৯৫০ সালে সারা পৃথিবীতে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের ৫.৫%, কোকো উৎপাদনের ৫০% ও উদ্ভিজ্জ তেলের প্রায় ৮০% উৎপন্ন হয় আফ্রিকায়। খনিজদ্রব্যকে পৃথকভাবে ধরলে তার হিসাব দাঁড়ায় এই :

আফ্রিকায় উৎপন্ন		কয়লা	সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের			১·৩%
„	„	বক্সাইট	„	„	„	১·৫%
„	„	লৌহ	„	„	„	২%
„	„	স্বর্ণ	„	„	„	৩৮·৫%
„	„	হীরক	„	„	„	৯৮%

বিশ্ববাণিজ্যে আফ্রিকার অংশ যৎসামান্য ও অন্যান্য মহাদেশের থেকে যে অনেক কম সেকথা অনুমান করা শক্ত নয়। ১৯২৯ সালে পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের মাত্র ৪·৬% আফ্রিকার ভাগে ফেলা যেত। আজ আফ্রিকার সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্য মূল্য ও পরিমাণে অনেক বাড়লেও, পূর্বোক্ত শতকরা হার বেড়েছে কিনা সন্দেহ। আফ্রিকার সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যের মূল্য ও পরিমাণ বেড়েছে একাধিক কারণে :

প্রথমত, আফ্রিকা মহাদেশে মুদ্রা-অর্থনীতি ও বিনিময়-ব্যবস্থা প্রসারের ফলে সেখানে বিদেশে রপ্তানীর জন্য পণ্যোৎপাদন ক্রমশ বাড়ছে। ভাষান্তরে, আফ্রিকা বিশ্বশ্রমবিভাজনের অংশীদার হচ্ছে। দ্বিতীয়ত লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের সুদ দেবার জন্য রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াতে হচ্ছে। কোনো ব্যক্তি-বিশেষের দিক থেকে দেখলে, অর্থোপার্জনের স্পৃহা ও প্রয়োজন দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে অর্থকরী ফসল উৎপাদন ও খনি-কারখানায় আফ্রিকানদের কর্মগ্রহণের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান।

বিশ্ববাণিজ্যে আফ্রিকার অংশ ছাড়া, লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের পরিমাণ দিয়ে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে বিশ্বঅর্থনীতির যোগসাধন কতটা হয়েছে তার এক তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। সাহারার দক্ষিণস্থিত আফ্রিকায় দেশী পুঁজিপতিশ্রেণী না থাকায় গোড়া থেকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশী মূলধনের চাহিদা ছিল প্রচুর। এবং এর প্রধান নিয়োগক্ষেত্র ছিল খনি, রেলপথ ও বাগিচা। অধ্যাপক হার্বার্ট ফ্র্যাঙ্কেলের হিসাবানুযায়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগে আফ্রিকায় মোট লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের পরিমাণ ছিল £১৩০ কোটি। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ নিয়োজিত হয় রেলপথ-নির্মাণে। অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্কেল মন্তব্য

করেছেন, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যে সব ঋণ করেছেন তার ৭৫% ছিল রেলপথ নির্মাণ, চালু রেলপথ আধুনিকীকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য। রেলপথ নির্মাণে সবচেয়ে বেশি খরচ করে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন (£১৬·৭ কোটি), তারপর পর্যায়ক্রমে পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো (£৩·৮ কোটি), পূর্বতন ফরাসী সাম্রাজ্য (£৩·২ কোটি), রোডেশিয়া ও ন্যায়াসাল্যাণ্ড (£২·৬ কোটি), কেনিয়া-উগাণ্ডা (£২·৩ কোটি), নাইজেরিয়া (£২·৩ কোটি), পর্তুগীজ সাম্রাজ্য (£২·২ কোটি)।

অবশ্য দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার অসমতার জন্য পূর্বোক্ত হিসেব থেকে সঠিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্কেল ওপরের দেশগুলির মাথাপিছু লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের হিসেব দিয়েছেন:

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন	£৫৫·৮
উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া	£৩৮·৪
তৎকালীন বেলজিয়ান কঙ্গো	£১৩·০০
পর্তুগীজ সাম্রাজ্য	£৯·৮
ট্যাঙ্গানাইকা, কেনিয়া ও উগাণ্ডা	£৮·১
তৎকালীন বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকা (অর্থাৎ সিয়েরালিওন, গ্যাম্বিয়া, ঘানা ও নাইজেরিয়া)	£৪·৮
তৎকালীন ফরাসী সাম্রাজ্য	£১·৩

শ্রীফ্র্যাঙ্কেল তাঁর তথ্য থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন:

[ক] আফ্রিকায় লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের একটা বৃহদংশ নিয়োজিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে (৪২·৮১%)। অতএব, দক্ষিণ আফ্রিকান অর্থনীতি যে মহাদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

[খ] যে সব অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানেই বিদেশী মূলধনের বৃহত্তর অংশ গেছে, যথা, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া ও পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো।

[গ] মোট লগ্নীকৃত মূলধনের মধ্যে সরকার-নিয়ন্ত্রিত মূলধনের অনুপাত ৪৪·৭২%। তৎকালীন বৃটিশ আফ্রিকান সাম্রাজ্যে এই অনুপাত ছিল ৫৭·৬৮%।

শ্রীফ্র্যাঙ্কেলের বই প্রকাশিত হয় তিন দশক আগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

পরে আফ্রিকায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার খুব দ্রুত বেড়েছে। পরে ইংল্যাণ্ডের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকার 'দি অ্যাফ্রিকান রেভলুশন' নামক বিশেষ সংখ্যায় (১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮) হিসেব দেওয়া হয়েছে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকান কিম্বার্লেতে প্রথম যখন হীরক আবিষ্কৃত হয় তখন থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাহারার দক্ষিণে অবস্থিত আফ্রিকায় ৩০০০ কোটি টাকা নিয়োজিত হয়। কিন্তু যুদ্ধোত্তর একটি মাত্র দশকে (১৯৪৫/৪৬—১৯৫৫/৫৬) প্রায় ততখানি মূলধন আফ্রিকায় এসেছে। অবশ্য দেশনির্বাচনে যুদ্ধোত্তর কালেও পুঁজিপতিদের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। 'ইকনমিষ্ট'-এর মতে, ১৯৪৭ সালের পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে ১,০০০ কোটি টাকার বেশি মূলধন নিয়োজিত হয়েছে। পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো এবং উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়ায় এর পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে ১,০০০ কোটি ও ৫০০ কোটি টাকার কাছাকাছি।

এই মূলধনের এক বৃহদংশ গেছে ফরাসীরা যাকে বলে 'অ্যাঁফ্রাস্ত্রুক্ত্যুর' তার গঠনে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র তো কারখানা নির্মাণেই নয়। কারখানায় পণ্য উৎপাদন ও সে পণ্য বিক্রয়ের জন্য আরও অনেক আনুষঙ্গিক জিনিষ দরকার: রাস্তাঘাট, রেলপথ, বন্দর, শ্রমিকদের গৃহসংস্থান, এমনকি কারিগরী শিক্ষা পর্যন্ত। শিল্পায়নে এই সব দিকের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য অনেক মহলে আজকাল 'অ্যাঁফ্রাস্ত্রুক্ত্যুর' বা 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গোয় ১৯৪৯ সালে গৃহীত দশবার্ষিকী যোজনায় ৪৪% অর্থ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পৃথক করে রাখা হয়। মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রের ১৫৫ কোটি টাকার যোজনায় এক-চতুর্থাংশ যায় একই খাতে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে প্রথম ৭০০ কোটি টাকা রেলপথ উন্নয়ন ও প্রসারে ব্যয় করার কথা হয়। পরে প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকা যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় আরও ১২½ কোটি টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিছুদিন আগে, এর ওপর আরও ৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন আফ্রিকায় দেশগুলির বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের পক্ষে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা তো স্পষ্ট। সঙ্কীর্ণ কৌমগণ্ডী ভেঙে ফেলার পক্ষে এ জিনিষ যেমন প্রয়োজনীয়, বৃহত্তর সমবৈশিষ্ট্য-চেতনার উন্মেষের পক্ষেও তেমন। অতএব, পরিবহন ব্যবস্থার প্রগতি প্রকারান্তরে নয়া সমাজ গঠনের সম্ভাবনা সূচিত করে।

বিদেশী মূলধন লগ্নীর অন্যতম ক্ষেত্র হলো সাইসাল, কফি, রবার, তুলো, চা ইত্যাদির বাগিচা। জলবায়ু ইওরোপীয় বসতির অনুকূল হওয়ায় পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার অনেকাংশে ইওরোপীয়রা স্থায়ীভাবে বসতি করেছে; বিরাট বিরাট জমি নিয়ে আধুনিক কায়দায় বহু মূলধন ঢেলে চাষাবাদ করছে। কেনিয়া, ট্যাঙ্গানাইকা, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে অনাফ্রিকান বসতি দ্বারা এই সব দেশের প্রাচীন সমাজ নানাভাবে প্রভাবিত। এই প্রভাবের রাজনৈতিক দিকটা আমরা সবাই জানি। এখানে অন্য দিকের আলোচনায় আসা যাক।

ইওরোপীয় কৃষি মানেই হলো মুদ্রাব্যবস্থানির্ভর আধুনিক অর্থনীতি। ইওরোপীয় কৃষি আবাদযোগ্য জমির অনেকাংশ ও বহু আফ্রিকান শ্রমিককে এমন অর্থনীতির মধ্যে নিয়ে এসেছে। তাই পূর্বোক্ত দেশসমূহে সনাতন স্বয়ংসম্পূর্ণ কৌম-অর্থনীতির ভাঙনের পক্ষে সহায়ক হয়েছে ইওরোপীয় বসতি।

ওপরের বক্তব্য আমরা কোনও মূল্যবিচারের প্রশ্নে না গিয়েই পেশ করছি। ইওরোপীয় বসতি ভালো কি খারাপ সে বিচার করার প্রয়োজন এখানে নেই। স্পষ্টত, ইওরোপীয় বসতি আফ্রিকানদের অনেক দুঃখদুর্দশার কারণ। এবং হয়তো ইওরোপীয় বসতি ছাড়াও পূর্বোক্ত দেশসমূহে মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রসার অসম্ভব হতো না। কিন্তু ইতিহাসে কী না হলে কী হতে পারত এই ধরণের গবেষণা নিষ্ফল। কতকগুলি দেশে অনাফ্রিকান বসতি হয়েছে এটা ঐতিহাসিক সত্য এবং ইওরোপীয় বসতি মুদ্রাকেন্দ্রিক অর্থনীতির সম্প্রসারণ করেছে, এটাও ঐতিহাসিক ঘটনা।

ইওরোপীয় বসতি ও বাগিচার প্রসারে বহু দেশে আফ্রিকানদের জমি হস্তান্তরিত হয়েছে ইওরোপীয়দের কাছে। এই হস্তান্তর-প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে, সেখানে ৮০% এর-ও বেশি জমি থেকে আফ্রিকানরা বঞ্চিত। তার পরে আসে দক্ষিণ রোডেশিয়া (৪৯%), পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গো (৯%), কেনিয়া (৭%), এবং উত্তর রোডেশিয়া (৪% এর কিছু কম)।

ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকরা শুধু অনেক পরিমাণে জমিই নেয়নি। তারা দখল করেছে উর্বর ও অবস্থানের দিক থেকে সুবিধাজনক জমি। তার ফলে আফ্রিকান অঞ্চলে ভিড় বেড়েছে, অযত্ন ও যথেচ্ছ ব্যবহারে জমির উর্বরা শক্তি কমে গেছে এবং কৌমকৃষি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে

সৃষ্টি হয়েছে এক ভূমিহীন শ্রেণীর, যার অস্তিত্ব কখনও আফ্রিকান সমাজে ছিল না।' এই ভূমিচ্যুত আফ্রিকানরা ভীড় বাড়িয়েছে অন্ত যেসব কৌম এখনও জমির মালিক তাদের এলাকায়, কিংবা গেছে শহরাঞ্চলে, অথবা ইওরোপীয় কৃষিক্ষেত্রে কৃষি-শ্রমিক হিসেবে। এদের দুঃখদুর্দশা ও তুলনায় ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকদের ধনপ্রাচুর্য প্রায়শই ভূমিচ্যুত আফ্রিকানদের করেছে সংগ্রামমুখী। জমিবঞ্চিত কিকিয়ুদের বিক্ষোভ যে মাউ মাউ আন্দোলনে বিস্ফোরিত হয় একথা তো সর্বস্বীকৃত।

ভূমিহীন গ্রামের লোকেরা শহরে গেছে জীবিকার্জনের তাগিদে। যারা ভূমিহীন নয়, তাদের অনেককেও কৌমসমাজ থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে কর দেবার অন্ত অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়। তার ওপর অনেকে গেছে ভোগ্যবস্তুর আকর্ষণে। অর্থোপার্জন করে একটা সাইকেল কি একটা সেলাইকল কেনার আকাঙ্ক্ষা অনেক যুবককে টেনে নিয়ে গেছে শহরের দিকে। এ ছাড়া শহরের অন্ত আকর্ষণও আছে। কৌমসমাজে যারা বিদ্রোহী তাদের অনেকে শহরাঞ্চলে এসেছে কৌমনিয়ন্ত্রণমুক্ত হবার চেষ্টায়। কোনো কোনো অঞ্চলে শহরে হালচাল ও আদবকায়দা সামাজিক পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। টমাস হজকিনের ভাষায় ('ন্যাশনালিজম ইন কলোনিয়াল আফ্রিকা'): অনেক যুবকের কাছে শহরে যাওয়াটা হলো সাবালকত্ব-প্রাপ্তির প্রাক্কালে কৃত আচার-অনুষ্ঠানের আধুনিক সংস্করণ। শহরে ছাপ না থাকলে কোনো যুবকের পক্ষে নারীর প্রেমলাভ শক্ত হতে পারে।

অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার পূর্বোক্ত কারণসমূহের মধ্যে দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক শ্যাপেরা তাঁর 'মাইগ্র্যান্ট লেবার অ্যাণ্ড ট্রাইব্যাল লাইফ' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু তথ্যপ্রমাণ পরিবেশন করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো শহরে ২৭১ জন আফ্রিকানকে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে উত্তর পাওয়া যায় নিম্নরূপ:

১১৯ জন বলে তারা শহরে যায় কর দেবার অর্থসংগ্রহ করতে।
৮৩ „ „ „ „ „ কর দেবার অর্থসংগ্রহ ও জামাকাপড় কেনার জন্ত।
৩৯ „ „ „ „ „ দারিদ্র্যের জন্ত।
২৯ „ „ „ „ „ জামাকাপড় কিনতে।

১৬ জন বলে তারা শহরে যায় জামাকাপড় ও গরুবাছুর কিনতে।
৫ " " " " " মা-বাপকে দিতে।
মাত্র ৬ " " " " " শহরের চটুল আকর্ষণে।

অধ্যাপক হ্যাপেরা অনুসন্ধান করে যা আবিষ্কার করেছেন মহাদেশের অন্যত্র তার কিছু ইতরবিশেষ হতে পারে। কিন্তু কমবেশি সর্বত্র সাধারণ এক প্রবণতা দেখা যায় যে প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই আফ্রিকানদের শহরমুখী অভিযান চলেছে। নাটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থবিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'দি আফ্রিকান ফ্যাক্টরী ওয়ার্কার' নামক গ্রন্থের তথ্যেও তার সমর্থন মেলে।

কিন্তু উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, ফলপ্রাপ্তি এক। অর্থাৎ কৌমসমাজ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে, ফুঁ দিয়ে ফোলানো বেলুনের মতো শহরগুলি ক্রমে স্ফীতাকৃতি ধারণ করছে এবং উত্তরোত্তর বেশি সংখ্যায় ও বেশি অনুপাতে লোক সনাতনী বদ্ধ কৌমগণ্ডী থেকে মুক্তির সুযোগ পাচ্ছে। এক কথায় গ্রামের লোকের শহরাভিমুখে যাত্রা দুটি জিনিষের সূচক: (ক) কৌম-সমাজের ভাঙন, ও (খ) কৌমনিরপেক্ষ বৃহত্তর সমাজ গঠনের সুযোগ। সুযোগ বলা হলো এই কারণে যে কোনো শহরের বিভিন্ন কৌম থেকে লোকেরা একত্রিত হলেই যে তারা সবাই মিলে বৃহত্তর সমাজ গঠন করবে, এমন কোনো কথা নেই।

বিভিন্ন দেশে শহরমুখী অভিযান কতখানি শক্তি অর্জন করেছে তার উত্তর মিলবে শহরগুলির বর্ধমান আয়তন ও লোকসংখ্যায়:

ডাকার (সেনেগাল)	বামাকো (মালি)	বাঙ্গুই (মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র)
১৯১০ ... ২৪,৯১৪	১৯৪১ ... ২২,০০০	
১৯৩১ ... ৫৩,৯৮২		১৯৪৫ ... ২৫,০০০
১৯৫৫ ... ৩০০,০০০	১৯৫৫ ... ১০০,০০০	১৯৫৫ ... ১০০,০০০

লাগোস (নাইজেরিয়া)	লেওপোল্ডভিল (কঙ্গো)	এলিসাবেথভিল (কঙ্গো. কাতাঙ্গা)
১৯১০ ... ৭৪,০০০	১৯৩৫ ... ২৬,৬২২	১৯৪০ ... ২৭,৭৮৯
১৯২১ ... ১২৬,০০০	১৯৪০ ... ৪৬,৮৮৪	
১৯৫৫ ... ২৭০,০০০	১৯৫৫ ... ৩৪০,০০০	১৯৫৫ ... ১২০,০০০

সাতটি দক্ষিণ রোডেশীয় শহরে আফ্রিকান পুরুষদের সংখ্যা ১৯৩৮ সালে ৪৫,৮৩৮ থেকে ১৯৫৬ সালে ১৯৮,৪৫২ হয়েছে, অর্থাৎ বিশ বছরে চার গুণেরও বেশি বেড়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের '১৯৫০ সাল থেকে আফ্রিকার অর্থনৈতিক সমীক্ষা' নামক রিপোর্টে বিভিন্ন দেশে শহরবাসী আফ্রিকানদের সংখ্যাবৃদ্ধির নিম্নোক্ত ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ;

দেশ	শহরবাসী আফ্রিকানরা সমগ্র জনসংখ্যার কত অংশ						
পূর্বতন ফরাসী ক্যামেরুন	১৯৩১ সালে	২·৪%	থেকে	১৯৫৭ সালে	৫·৫%		
পূর্বতন ফরাসী বিষুবরৈখিক আফ্রিকা	১৯৩৬	„	১·৭%	„	১৯৫৬	„	৪·৪%
পূর্বতন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা	১৯৩৬	„	১·১%	„	১৯৫৬	„	৪·১%
ম্যাডাগাস্কার (বর্তমানে মালাগাসী প্রজাতন্ত্র)	১৯২৬	„	৩·৯%	„	১৯৫৬	„	৫·৬%
পূর্বতন ফরাসী টোগোল্যাণ্ড	১৯৩৬	„	১৮%	„	১৯৫৬	„	৩·৭%

সমগ্র অবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাহলে এই : প্রাক্‌-ইওরোপীয় যুগে আফ্রিকান কৌমসমাজ ছিল মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। ইওরোপীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে নানা কারণে কৌমসমাজে ভাঙন ধরেছে। মুদ্রাকেন্দ্রিক বিনিময় অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও ক্রমে সম্প্রসারিত হচ্ছে। উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় আফ্রিকানরা শহরের দিকে আসছে এবং এদের মধ্যে অনেকে কৌমপ্রভাবমুক্ত হচ্ছে। এমনিভাবে এক কৌমনিরপেক্ষ বৃহত্তর সমাজ-সত্তায় চৈতন্যোদয়ের ভিত্তি ক্রমশ শেকড় গাড়ছে।

তিন

কোনো দেশের আফ্রিকানদের কৌমবন্ধন অতিক্রম করে সামগ্রিক ঐক্য-প্রতিষ্ঠার দিক থেকে পূর্বোক্ত কথাগুলি প্রাসঙ্গিক। কিন্তু ঐক্যপ্রতিষ্ঠার সুযোগ ছাড়া জনসাধারণের সংগ্রামমুখিতা এবং সংগ্রামকার্যকারিতাও আমাদের বিবেচ্য বিষয়। একই সঙ্গে আন্তঃকৌম ঐক্য ও জনসংগ্রামের সম্ভাবনা মেলে নয়া শ্রেণীবিন্যাসে। প্রাক্‌-ইওরোপীয় যুগে কৌমসমাজের স্তরবিন্যাস ছিল সহজ। বেশির ভাগ কৌমে একদিকে থাকতেন কৌমপ্রধান, অন্যদিকে সাধারণ মানুষ। বহুক্ষেত্রে কৌমপ্রধান হতেন একাধারে শাসক, বিচারক, রাজনৈতিক নেতা, আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় সেনাপতি, যাদুকর ও পুরোহিত।

কোনো কোনো কৌমে কৌমপ্রধান ছাড়া ও সব ব্যাপারে উপদেশ দেবার জন্ত থাকতেন সম্মানিত বৃদ্ধের দল (এই ধরনের শাসনব্যবস্থাকে নাম দেওয়া হয়েছে জেরোন্টোক্রেসি বা বৃদ্ধতন্ত্র)। এককথায়, শ্রমবিভাগের সীমাবদ্ধ প্রয়োগ, উৎপাদনযন্ত্র ও পদ্ধতির পশ্চাৎপদতা এবং উদ্বৃত্ত সম্পদের অপ্রাচুর্যের জন্ত সনাতনী কৌমসমাজে বহুশ্রেণীর উদ্ভব হতে পারে নি।

কিন্তু পূর্ববর্ণিত কারণে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নয়া অর্থনীতির উপহার এসেছে নয়াশ্রেণীবিন্যাসের রূপ ধরে। বিস্তৃত জমি হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে কেনিয়ার মালভূমিতে জন্ম নিয়েছে একদল ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। কঙ্গো (পূর্বতন বেলজিয়ান), মধ্য আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে যেখানে খনি, কারখানা, বাগিচা ও পরিবহন ব্যবস্থা উন্নতিলাভ করেছে, সেখানে আবির্ভূত হয়েছে এক শহুরে শূন্যবিত্ত শ্রমিক শ্রেণী (মার্কসীয় পরিভাষায় প্রলেতারিয়েতের সবচেয়ে কাছাকাছি যারা আসে)। নাইজেরিয়া, ঘানা ও উগাণ্ডায় আফ্রিকানরা অর্থকরী কৃষির দিকে ঝুঁকেছে। নাইজেরিয়ায় উদ্ভিজ্জ তেলের রসদ, ঘানায় কোকো, উগাণ্ডায় তুলো প্রভৃতি অর্থকরী ফসল আফ্রিকান কৃষকেরা উৎপাদন করছে। এই ধরনের প্রচেষ্টায় সাফল্যে এই সব দেশে উদ্ভব হয়েছে এক ভূমিবান সম্পন্ন কৃষকশ্রেণীর। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে (যেমন কঙ্গো, ট্যাঙ্গানাইকার কোনো কোনো এলাকা) আফ্রিকানরা ব্যবসায় বাণিজ্যে পর্যন্ত হাত দিয়েছে। সর্বোপরি, অর্থনৈতিক প্রগতি ও শিক্ষার বিস্তার অনেক দেশে শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক, কারিগর ও দক্ষ শ্রমিক, অফিস-আদালতের কর্মচারী প্রভৃতি উপশ্রেণীর সৃষ্টি করেছে যারা একত্রে এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে পরিচিত (সেনেগাল, ঘানা ও নাইজেরিয়া)।

কোনো একটি শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত একটি কৌম থেকে আসে না, আসে বিভিন্ন কৌম থেকে। এক নিয়ম মেনে এক সঙ্গে কাজ করতে করতে, এক শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হয়ে এবং একই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার ফলে এদের মধ্যে যোগাযোগ ও ভাবের আদানপ্রদান ঘটবে, এটা আশা করা যায়।

কিন্তু নবশ্রেণীবিন্যাস সংগ্রামমুখিতা ও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক

আন্দোলনের কার্যকরতা বাড়ায় কী ভাবে? নতুন পরিবেশে, অনাফ্রিকানদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে এবং কখনও কখনও কিছুটা লেখাপড়া শিখে এইসব নতুন শ্রেণীতে মিলিত জনগণ কৌমসমাজবদ্ধ জনসাধারণের চেয়ে অনেক সহজে রাজনৈতিক চেতনা লাভ করতে পারে। এই চৈতন্য শুধুমাত্র নিজেদের দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা ও বিদেশীদের প্রভুত্ব সম্পর্কিত নয়, নিজেদের সম্ভাব্য শক্তি সম্বন্ধেও বটে। বিশেষ করে, পরিবহন ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ কারখানা, বিদ্যুৎ কোম্পানী ইত্যাদির শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাস জাগে যখন তারা উপলব্ধি করে দেশের অর্থনীতি ও শাসনযন্ত্র কতবেশি তাদের ওপর নির্ভরশীল; তাবান্তরে, সুপরিকল্পিত ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হলে কত সহজে দেশের স্বাভাবিক জীবন অচল করে দেওয়া যায়। যত বেশি সংগঠিত হোক, যত আক্রমনাত্মক হয়ে উঠুক না কেন, বিশেষ কোনো কৌমের পক্ষে কি সারা দেশ অচল করে দেওয়া সম্ভব? এছাড়া নবোদ্ভূত শ্রেণীসমূহের নেতারা নিজেদের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে আধুনিক কায়দায় প্রচার করতে জানেন; কখন সংগ্রাম করতে হয় বা সংগ্রামের হুমকি দিতে হয় পক্ষান্তরে কখন আপোস করতে হয়, সারা দেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির খবর রাখেন বলে, সে সব কথা তাঁদের পক্ষে বোঝা সহজ হয়।

তাই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যখন শ্রেণী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়, তখন আমরা আশ্চর্যবোধ করি না। কোৎ দিভোয়ার-এ (হস্তিদন্ত উপকূল) 'স্যাদিকা আগ্রিকোল আফ্রিক্যাঁ' ও উগাণ্ডার 'আফ্রিকান ফার্মাস ইউনিয়ন' নামে কৃষকপ্রতিষ্ঠানদ্বয় নিজ নিজ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছে। নাইজেরিয়া, ঘানা ও কোনো কোনো পূর্বতন ফরাসী উপনিবেশে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর ছাত্র যুবকেরা আন্দোলনের একস্তরে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছে।

শিল্পায়ন সীমাবদ্ধ হওয়ায়, সংখ্যার দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণী দু-একটি দেশ ছাড়া কোথাও উল্লেখযোগ্য নয়। শ্রীটমাস হজকিন তাঁর 'ন্যাশনালিজম ইন কলোনিয়্যাল আফ্রিকা' নামক গ্রন্থে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে শ্রমিক-শ্রেণীর যে আয়তন উল্লেখ করেছেন তার হিসেব আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি।

দেশ	শ্রমিকদের সংখ্যা	সমগ্র জনসংখ্যার কত অংশ	শ্রমিক ইউনিয়ন সমূহের সভ্যসংখ্যা
পশ্চিম আফ্রিকা ভূতপূর্ব ফরাসী	৩,৫০,০০০	২.০%	৭০,০০০
ভূতপূর্ব ফরাসী			
বিষুবরৈখিক আফ্রিকা	১,৯০,০০০	৪.২%	১০,০০০
ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্র	১,২৫,০০০	৪.০%	৩৫,০০০
নাইজেরিয়া ও			
পূর্বতন বৃটিশ ক্যামেরুন—	৫,০০,০০০	১.৫%	১,৫০,০০০
ঘানা	২,০০,০০০	৬.৫%	২৫,০০০
সিয়েরা লিওন	৮০,০০০	৪.০%	২০,০০০
গ্যাম্বিয়া	৫,০০০	২.৫%	১,৫০০
কঙ্গো ও রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি	১০,০০,০০০	৮.৫%	৬,০০০
উগাণ্ডা	২,৮০,০০০	৪.০%	১,৫০০
কেনিয়া	৬,৫০,০০০	৮.০%	৩২,০০০
ট্যাঙ্গানাইকা	৪,০০,০০০	৬.০%	৪০০
ভূতপূর্ব বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড	২,০০০	০.৩%	×
ভূতপূর্ব ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড	২৫,০০০	২.০%	৩,৭০০
জাঞ্জিবার	৫,০০০	৪.০%	৯০০
উত্তর রোডেশিয়া	২,৫০,০০০	১৩.০%	৫০,০০০
দক্ষিণ রোডেশিয়া	৫,৩০,০০০	২৪.০%	×
নায়াসাল্যাণ্ড	১,২০,০০০	৫.০%	১,০০০
সুদান (পূর্বতন ইঙ্গ-মিশরীয়)	২,০০,০০০	২.০%	১,০০,০০০

শ্রী হজকিনের হিসাবমতো এই শতাব্দীর মাঝামাঝি (কোন্ বছরের হিসাব উল্লেখ না করলেও হজকিন যেসব পত্রপত্রিকা ও রিপোর্ট ভিত্তি করে পূর্বোক্ত হিসাব দিয়েছেন, সেগুলি থেকে মনে হয় তাঁর হিসাব ১৯৫০-১৯৫৩ সালের) তৎকালীন ঔপনিবেশিক আফ্রিকায় শ্রমজীবীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র। এর মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ যে স্থায়ী শ্রমিক বনে যায় নি, সেকথা আমরা আগেই বলেছি।

শ্রমজীবীদের সংখ্যাল্পতা ও অস্থায়িত্ব ছাড়াও উল্লেখ করতে হয় যে অনেক দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কর্তৃপক্ষের সুনজরে ছিল না এবং কোনো কোনো সরকার শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন বেআইনী ঘোষণা করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের লোকদের মিশ্র ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ, অথচ আফ্রিকান শ্রমিকদের ইউনিয়ন রেজিস্ট্রি করা হয় না। দক্ষিণ

রোডেশীয় সরকার বরাবর আফ্রিকান শ্রমিক ইউনিয়নকে বিষদৃষ্টিতে দেখেছে। পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গোতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন আইন সম্মত ছিল না। সে বছর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলেও নিয়ম করা হয় যে প্রতি ইউনিয়নের সভায় অনেক রাজকর্মচারী উপস্থিত থাকবে। এই নিয়মের ফলে সেখানকার শ্রমিক সংস্থাগুলি স্বাধীনভাবে বাড়তে পারে নি।

কিন্তু এতসব অসুবিধা সত্ত্বেও অধিকাংশ আফ্রিকান দেশে শ্রমিক আন্দোলন রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষ সমর্থন জুগিয়েছে। ১৯৩৭ সালে ফ্রান্সের 'ফ্রঁ পপ্যুলেয়ার' সরকারের আমলে ফরাসী আফ্রিকান সাম্রাজ্যে সর্বপ্রথম আইনসঙ্গত শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। ভিশি আমলে কিছুদিন মন্দা পড়ার পর যুদ্ধোত্তর কালে আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলিতে শ্রমিক আন্দোলন আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গিনিতে শ্রীসেকু তুরে-র ক্ষমতাপ্রাপ্তি শ্রমিক নেতা হিসাবে। ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্রে অধুনা নিষিদ্ধ 'য়্যুনিওঁ দে পপ্যুলাসিওঁ' কামেরুনেজ্-এর (ইউ. পি. সি.) অন্যতম প্রধান সহায় ছিল জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন। অন্যান্য দেশের মধ্যে বেলজিয়ান কঙ্গোয় সংগ্রামী রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু হয় বেকার শ্রমিকদের বিক্ষোভে। কেনিয়ায় ১৯৫২ সালে ঘোষিত 'জরুরী অবস্থা'র শুরু হয় ১৯৫০ সালের সাধারণ ধর্মঘট থেকে। পরবর্তীকালে সেখানকার অন্যতম নেতা শ্রীটম এম্বোয়া শ্রমিক সংগঠক হিসেবে নিজের প্রভাব বিস্তার করেন। উত্তর রোডেশিয়ার 'তাম্র এলাকায়' ১৯৩৫, ১৯৪০, ১৯৫২, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালের শ্রমিক ধর্মঘট আফ্রিকানদের সংগ্রামাত্মক চেতনার পরিচায়ক। নাইজেরিয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবতারণা হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৫ সালের সাধারণ ধর্মঘট, ১৯৪৯ সালে এনুগু শহরে খনিশ্রমিকদের ওপর গুলি-চালনা ও তার প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘট এবং পরের বছর ইউনাইটেড আফ্রিকা কোম্পানীর বিরুদ্ধে সফল ধর্মঘট তার সাক্ষ্য দেয়। ঘানার সাধারণ নির্বাচনে শ্রীনক্রুমার কনভেনশন পিপ্‌ল্‌স্ পার্টির জয়লাভে অনেকখানি সহায়তা করে ১৯৫০-এর সাধারণ ধর্মঘটকে।

কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন ছাড়া, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠানগুলি আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামে যে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছে, সেকথা আমরা আগে বলেছি। সম্প্রতিকালের নেতাদের বেশির ভাগ এসেছেন এই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও বিভিন্ন পেশা থেকে। ঘানার শ্রীনক্রুমা

লেখাপড়া করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে। নাইজেরিয়ার বর্তমান গভর্ণর জেনারেল শ্রীআজিকিওয়ে-ও ('জিক' নামে খ্যাত) শিক্ষা পেয়েছেন আমেরিকায়। তিনি একাধারে সাংবাদিক, লেখক ও পেশাদারী রাজনৈতিক নেতা। কঙ্গোর লুমুম্বা ছিলেন সরকারী কর্মচারী। নায়াসাল্যাণ্ডের হেস্টিংস বাণ্ডা পেশায় চিকিৎসক। ট্যাঙ্গানাইকার জুলিয়াস নিয়েরেরে এক মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। কেনিয়ার জোমো কেনিয়াট্টা লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স এর ছাত্র।

মুক্তি সংগ্রামের এই সব নেতাদের প্রেরণার উৎস কোথায়? কোন্ আদর্শে তাঁরা উদ্বুদ্ধ? প্রধানত ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর বহুবিচিত্র ভাবাদর্শ তাঁদের নাগালের মধ্যে এসেছে। ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, মিশর ও প্যান-ইস্লামিক বন্ধন, সমাজতন্ত্র, পশ্চিমী গণতন্ত্র—এইসব আদর্শের কিছু না কিছু প্রভাব সংগ্রামী নেতৃত্বের অংশবিশেষে কোনো না কোনো সময়ে পড়ে। নতুন আফ্রিকার নেতাদের জীবনী তার অজস্র প্রমাণ দেবে।

চার

সমস্ত ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়াল। আফ্রিকার রাজনৈতিক চৈতন্যোদয়কে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। ইওরোপীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আফ্রিকান দেশসমূহে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এসেছে। এইসব পরিবর্তনের ফলে একদিকে সনাতন কৌম সমাজের ভাঙন এবং অন্যদিকে বহুকৌমভিত্তিক নবশ্রেণী বিন্যাসের জন্ম সূচিত হচ্ছে। তাই সঙ্কীর্ণ কৌমগণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর-সমাজচেতনা বিকাশের সুযোগও ক্রমশ মিলছে।

উন্নততরে গিয়ে এই চৈতন্যের পরিণতি হয় জাতীয়তাবোধে। বৃহত্তর সমাজচেতনার সংগ্রামে রূপায়ন ও সেই সংগ্রামের নেতৃত্বে নবোদ্ভূত শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও স্বাধীন বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আফ্রিকার বিভিন্ন নেতার এইসব শ্রেণীতে জন্ম এবং এইসব শ্রেণীর নেতা হিসেবে তাঁদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার পূর্বোক্ত অবদানের অন্যতম লক্ষণ।

আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ

অশোক রুদ্র

দু দুটো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পিছনে ফেলে আসা গেছে, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বছরও কাবার হয়ে এল। দেশ স্বাধীন হয়েছে চৌদ্দ বছর হলো, সময়টা কম না। সেই ত্রেতা যুগে, যখন মানুষ শতশত বছর বাঁচত, তখনও এই চৌদ্দ বছরের মধ্যেই অরণ্যকাণ্ড লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত হয়ে সীতার পুনরুদ্ধার পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল। কর্ষণজীবী সভ্যতাকে পরাস্ত করে তার উপর আকর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকে রবীন্দ্রনাথ সীতাহরণের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আমাদের নয়াদিল্লীর বাল্মিকীরা তাঁদের সীতাহরণের পালায় কতদূর অগ্রসর হলেন? চৌদ্দ বছরে পালা শেষ করার প্রতিশ্রুতি তাঁরা দেন নি, তাঁরা আরও চৌদ্দ বছর সময় চেয়েছেন, ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তাঁদের আঁক কষা আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে শুধু একটা জিনিসই বুঝে দেখবার চেষ্টা করব। গত দশ বছরের অভিজ্ঞতা এবং আগামী পনের বছরের প্রতিশ্রুতি—এই দুয়ে মিলে কি ধরনের সোনার লঙ্কার ছবি ১৯৭৫ সালের দিগন্তে অঙ্কিত হয়? সেখানেও কি সীতা আম্রকুঞ্জে ক্রন্দনরতা, নাকি কোনো স্বর্ণগবাক্ষে তার সুখী কল্যাণী মুখচ্ছবি শোভা পায়? তাছাড়া ঐ রাবণের প্রাসাদের কতটা সত্যি সোনা আর কতটাই বা নিতান্তই রাংতা?

সরকারী আঁক অনুসারে ১৯৬০ সালে ভারতীয়দের গড়পরতা আয় ছিল মাসে সাড়ে সাতাশ টাকা, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ের সংসারকে যদি একটি সাধারণ ভারতীয় পরিবারের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে ধরা যায় তো তার গড়পড়তা মাসিক আয় ছিল ১৩৭.৫ টাকা। এই আঁকে ভুলচুক কতটা আছে তা নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাব না; তেমনি আমেরিকা বা গ্রেট্-ব্রিটেন বা সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় আমাদের জীবনমান ঠিক কতটা নিচে তার আলোচনাও পাড়ব না। এই তুলনায় সংখ্যাতাত্ত্বিক জটিলতা অনেক; তাছাড়া প্রয়োজনও নেই। আমাদের জীবনমানটা কোথায় তা নিশ্চয়ই আমরা হাড়ে হাড়ে জানি।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনা সম্পর্কেও অল্পবিস্তর কিছু আন্দাজ দেওয়া হয়েছে। তাতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, ১৯৭৫ সালের মধ্যে গড়পরতা জাতীয় আয়কে মাসিক ৪৪ টাকায় তোলা সম্ভব হবে। আপাতত ধরে নেওয়া যাক যে আঁকটা নির্ভুল, সত্যিই এতটা উন্নতি সম্ভব হবে। জীবনমানের মূল্যায়নে উন্নতি কতটা হবে তার অনুমান পাঠকের কল্পনাশক্তির উপরই ছেড়ে দেওয়া গেল। শুধু একটু স্মরণ করিয়ে দিই যে গড়পড়তার হিসেবে খেয়াল না রাখলে নানান রকম ভুল ধারণা হওয়া সম্ভব। যেমন জাতীয় আয়ের সবটাই কিছু সাধারণ পরিবারের হাতে আসছে না। তার মধ্যে কোম্পানীর মুনাফার অংশ আছে, আছে সেই অংশ যাকে কেটে সরকারী তহবিলে চালান করা হচ্ছে কর হিসেবে। এও স্মরণীয় যে অর্থনৈতিক বৈষম্য যতদূর জানা যায় কমছে না, বাড়ছে। ১৯৬০ সালেই বৈষম্য এতটা ছিল যে গড় যদিও ১৩১'৫, দেশের শতকরা ৯০ ভাগ জনগণেরই পারিবারিক আয় ছিল মাত্র ৯২৲ আর সর্বোচ্চ ১০ ভাগের আয় ছিল ৪৫৫৲। নিম্নতম ১০ ভাগের পারিবারিক আয় ছিল ২৩৲। বৈষম্য যদি নাও বাড়ে তো ১৯৭৫ সালে নিম্নতম দশভাগের গড় আয় হবে ৫৫৲ আর উচ্চতম ১০ ভাগের ৬৯০৲। এতেও সব বলা হল না। ১৯৭৫ সালে জনসংখ্যা হবে ৮২ কোটি, নিম্নতম ১০ ভাগেও লোক থাকবে ৮ কোটির বেশি। তাদের মধ্যেও কি বৈষম্য থাকবে না? থাকবে বইকি। যদি আরও সূক্ষ্মতর বিভাজনে যাওয়া যায় তো দেখা যায় নিম্নতম শতকরা ১ ভাগ লোক, যাদের সংখ্যা হবে ৮২ লক্ষ, তাদের মাসিক পারিবারিক আয় হবে মাত্র মাসে ১৬৲। আর এজাতীয় সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়ার প্রয়োজন দেখি না। সংক্ষেপে বলা যায় আজ থেকে পনের বছর পরেও মহানগরীর রাস্তার ফুটপাতে অর্ধনগ্ন ও রুগ্ন স্ত্রী পুরুষ ও শিশুদের শুয়ে থাকতে দেখা যাবে। বড় বড় প্রাসাদ এখন যত আছে তার চেয়ে অনেক বেশি হবে সন্দেহ নেই, তাদের চাকচিক্যও এখনকার চেয়ে অনেক বেশি থাকবে, কিন্তু তাদের আশেপাশে খড়কুটো ছালা ও টিনের তৈরী কুঁড়ের সংখ্যাও হ্রাস পাবে না। ঠিক আশেপাশে হয়তো নাও থাকতে পারে। দারিদ্র্যের যে কদর্য প্রকাশ এখন অনেক ভারতীয় নগরীর শোভার হানি ঘটায় তাকে হয়তো নগর পরিকল্পনার দৌলতে আড়াল করে ফেলা হবে। কিন্তু লোপ পাবে না।

কিন্তু পরিকল্পনাকারেরা শুধু যে জাতীয় আয়ের লক্ষ্য স্থাপন করেছেন

তাতো নয়, তাঁরা আরও বলেছেন যে এই পনের বছরের মধ্যে ভারত অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন অর্জন করতে সমর্থ হবে। এখন তো আমাদের বিদেশ থেকে ধারকর্জ করে পুঁজিনিয়োগের কাজ চালাতে হচ্ছে। পনের বছরের মধ্যে আমাদের অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয় গতি সঞ্চারিত হয়ে যাবে। ধারকর্জ করার দরকার পড়বে না। নিজেদের সামর্থ্যেই নিজেরা এগিয়ে চলব। বিদেশী মুদ্রা যদি কিছু আসে তো তাকে ভিক্ষা করে আনতে হবে না, মুনাফার আকর্ষণে তা যেচে আসবে।

এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে এ প্রতিশ্রুতি ফাঁকা। জাতীয় আয়ের উন্নতির যে আঁক কষা হয়েছে তার মধ্যে সুবিধামত কিছু কিছু জিনিস ধরে নিয়ে এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে হয় আমরা স্বাবলম্বী হব এবং আমাদের প্রগতির হারকে অনেক কমিয়ে আনব, নয় পরিকল্পিত হারে এগিয়ে যাব কিন্তু একই সঙ্গে বৈদেশিক কর্জে আকণ্ঠ ডুবে যাব। কি কি জিনিস সুবিধা-মত ধরা হয়েছে দেখা যাক। আঁকে দুটো জিনিস দরকার পড়ছে, এক হলো সঞ্চয়ের হার, আরেক হলো আয়বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজিনিয়োগের হার, যাকে ইংরিজিতে Incremental capital output ratio বলা হয়ে থাকে। সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় হারটিকে আমরা ICOR বলে উল্লেখ করব, বাংলা পরিভাষা ব্যবহার করে ভাষাকে ভারাক্রান্ত করব না। পরিকল্পনাকারেরা ধরে নিয়েছেন সঞ্চয়ের হার ১৯৬৫ সালে ১১·৫%এ, ১৯৭০ সালে ১৫·৫%এ, এবং ১৯৭৫ সালে ১৮·৫%এ পৌঁছুবে। আর ICOR সম্বন্ধে ধরা হয়েছে যে তৃতীয় পরিকল্পনায় জন্য তা হবে ২·৩, এবং চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ৩·১ করে। এই দুইটি পর্যায়ের হার ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে যে বৈদেশিক কর্জের প্রয়োজন চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনাতে তৃতীয় পরিকল্পনার স্তরেই নিবদ্ধ থাকবে। এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তটার যথার্থতা পরীক্ষা করতে তাহলে আমাদের হারগুলোর যথার্থতা পরীক্ষা করতে হয়। এই পরীক্ষাটা, বলাই বাহুল্য, স্বনির্ভর হতে পারে না, একে হতে হবে তুলনামূলক। আমাদেরই দেশের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা তথা অন্যান্য নানান দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যা বলা যায় তা এই যে সঞ্চয়ের হারকে খুব বেশি করে ধরা হয়েছে এবং ICORকে ধরা হয়েছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকমের নিচুতে। ICOR যত কম হবে, একই পরিমাণ আয়বৃদ্ধির জন্য পুঁজির দরকার পড়বে ততই কম। অতএব

সঞ্চয়ের হারকে অতিরিক্ত করে ধরে নেওয়া এবং ICOR-এর জন্ত অস্বাভাবিক রকমের কম সংখ্যা ধরা দুই দিক থেকে বৈদেশিক কর্জের প্রয়োজনকে কম করে দেখিয়েছে। ভারতবর্ষে সঞ্চয়ের হার পঞ্চম দশকের গোড়ায় ৫% ছিল মাত্র। দশবৎসরের পরিকল্পনার ফল হিসেবে সে হার ৮%-এ উঠেছে বলে দাবি করা হয়েছে সরকারী পক্ষ থেকে যদিও বেসরকারী কোনো কোনো মহল থেকে বলা হচ্ছে যে সঞ্চয়ের হার এরই মধ্যে ১০%-এ উপনীত হয়েছে। এই শেষোক্ত অনুমান সত্য প্রমাণিত হলেও সঞ্চয়ের হারের অধিকতর বৃদ্ধির জন্ত যে লক্ষ্যস্থাপন করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না। যে কোনো দেশেরই সঞ্চয়ের হার নির্ভর করে তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর, যে ব্যবস্থা আয় এবং বিশেষ করে তার উদ্বৃত্ত অংশের উৎপাদন তথা বণ্টনের বিন্যাসকে নির্দিষ্ট করে। এই উৎপাদন ও বণ্টনের বিন্যাস অবশ্য সঞ্চয়ের হারকে সম্পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট করে না, তারা সেই হারের একটা উচ্চতম মাত্রাকে বেঁধে দেয়। অবস্থা বিশেষে সঞ্চয়ের হার এই মাত্রার নিচে থাকতে পারে কিন্তু তা ছাড়িয়ে কখনও উঠতে পারে না। ভারতবর্ষের সঞ্চয়ের হারকে যদি ৫% থেকে ৮% অথবা ১০% এও তোলা সম্ভব হয়ে থাকে তো তাতে দুটো জিনিস প্রমাণ হয়। এক, গত দশবছরে দেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যেটুকু পরিবর্তন হয়েছে, তাতে সঞ্চয়ের হারের ঊর্ধ্বতন মাত্রাকে কিছু পরিমাণে তোলা গেছে; দুই, শুরুতে যে সঞ্চয়ের হার ছিল তা তদানীন্তন ঊর্ধ্বতন মাত্রার নিচে ছিল। কিন্তু একথা কি ধরে নেওয়া যায় যে এখনও সেই মাত্রা এতই উঁচুতে রয়েছে যে আর পনেরো বছরের মধ্যে সঞ্চয়ের হার ১৯-২০%-এ পৌঁছুতে পারবে? অন্যান্য দেশের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখি যে সমাজতন্ত্রী দেশগুলির বাইরে খুব কম দেশেই সঞ্চয়ের হার এতটা উঁচুতে উঠতে পেরেছে। বাস্তবিক পক্ষে কেবলমাত্র জাপান, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়াই পেরেছে এতটা উঁচু হারে পৌঁছুতে। যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডার মতো উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেও এই হার অনেক নিচুতে। সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে অবশ্য সঞ্চয়ের হার উঁচুতেই হয়ে থাকে. কিন্তু তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করে কোনো লাভ নেই। আগামী পনেরো বছরের মধ্যে এমন কোনো ব্যাপক পরিবর্তন কি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে আশা করা যায় যা এই হারের ঊর্ধ্বতন মাত্রাকে এতটা উঁচুতে তুলতে পারবে? কংগ্রেসী অর্থনীতির কাঠামোটা এই গত চোদ্দ বছরে তো বেশ পরিষ্কারভাবেই দানা বেঁধেছে।

কোনো মূলগত পরিবর্তনই তো কোনো ক্ষেত্রে হওয়ার বাকি নেই। তা সত্ত্বেও যেটুকু পরিবর্তন আশা করা যায় তা হল প্রথমত অর্থনীতির সরকারী বিভাগ বা পাবলিক সেকটারের সম্প্রসারণ এবং দ্বিতীয়ত কৃষিতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিয়ৎপরিমাণ প্রসার ও প্রতিষ্ঠা। এছাড়া বেসরকারী মহলের শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের জায়গায় যৌথ প্রতিষ্ঠানের আকার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়। এই ত্রিবিধ পরিবর্তনই সঞ্চয়ের হারের ঊর্ধ্বতন মাত্রাকে উন্নত করবে সন্দেহ নেই এবং সেই প্রবণতাকে আরও বলবৎ করবে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি, কারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রেখেও যদি জাতীয় আয়ের পরিমাণকে বাড়ানো হয় তো শুধু সেই কারণেই সঞ্চয়ের পরিমাণ কিছু পরিমাণে বাড়বে আশা করা যায়। এই সমস্ত কটি যুক্তি মেনে নেবার পরও সঞ্চয়ের হারের জন্য যে লক্ষ্যস্থাপন করা হয়েছে তাদের অত্যুচ্চ বলে মনে হয়। নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত অনুমানের কথাই যদি বলতে হয় তো বলব চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার জন্য গড় হিসেবে সঞ্চয়ের হারকে ১২·৫% ও ১৫%-এর চেয়ে বেশি বলে ধরে নেওয়াতে ভুল করার সম্ভাবনা খুব বেশি থেকে যাবে।

ICOR সম্বন্ধে বলার কথা এই যে জাপান ও পশ্চিমের উন্নত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির দেশগুলিতে এই হারের পরিমাণ ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত বিস্তৃত। এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতেও এই হার কদাচিৎ ৩-এর কম হয়, অনেক সময়ে তা ৪·৫% পর্যন্ত ওঠে। ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতাতেও দেখি, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই হার হয়েছিল ৩.৭%। এ প্রশ্নটা মনে না এসেই যায় না, ৩·৭%-এর থেকে এ হার তৃতীয় পরিকল্পনায় ২·৩%-এ নামানো হবে কি উপায়ে? নামানো যে যায় না এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সমাজব্যবস্থায়, উৎপাদন পদ্ধতির এবং পরিকল্পনার কলাকৌশলে হয়তো এমন পরিবর্তন আনা চলতে পারেও বা যাতে করে ভারতবর্ষের তৃতীয় পরিকল্পনায় পুঁজিনিয়োগের ফলোৎপাদনকারী ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পাবে যার তুলনা অন্য কোনো দেশে কদাচিৎই মিলেছে। কিন্তু তাহলে তো অন্তত যে যে উপায়ে এই অসাধ্য সাধন ঘটানো হবে তাদের আবিষ্কার করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা দুটো তন্ন তন্ন করে তুলনা করে দেখলেও এমন কোনো প্রকৃতিগত উন্নতিই প্রথমোক্তটিতে চোখে

পড়ে না যাতে এই জাতীয় আশাবাদিতা সমর্থিত হতে পারে। তাছাড়া আরও একটি কথা। কোনো অত্যন্ত বিচক্ষণ উপায়ে যদি বা পুঁজিনিয়োগকে এতটা ফলপ্রসূ করা যায়ই তো সে ক্ষমতাকে ধরে রাখা যাবে না কেন? চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় জন্ত ICORকে আবার উন্নত হতে দেওয়া হয়েছে কেন? এসব প্রশ্নের শুধু একটা জবাবই গ্রাহ্য এবং তা এই যে তৃতীয় পরিকল্পনায় জন্ত যে ICORকে কম করে ধরা হয়েছে তা নিতান্তই সংখ্যাতাত্ত্বিক অসাধুতা—পুঁজিনিয়োগের এতটা ফলপ্রদ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার ICOR দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চেয়ে কম হওয়ার কোনোই হেতু নেই।

একথা তাহলে জোর করেই বলা যায় যে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির জন্ত যে লক্ষ্যস্থাপন করা হয়েছে তাতেও পৌছানর কোনো সম্ভাবনাই নেই যদি না আরও অনেক বেশি বৈদেশিক ঋণের সাহায্য না নেওয়া হয়। এই সম্পর্কে আমি নিজে সামান্ত একটু আঁক কষেছি। এই আঁক নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সরল ও অগভীর, কিন্তু সরকারী পরিকল্পনাকারেরা যে আঁকের সাহায্যে তাঁদের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি স্থাপন করেছেন তার তুলনায় কিছু উপেক্ষণীয় নয়। যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তা অত্যন্ত লোমহর্ষক। দেখি যে জাতীয় আয়কে যদি সত্যি ১৯৭৫ সালে মাসিক গড়পরতা ৪৪ টাকায় উঠতে হয় তো আমাদের বৈদেশিক ঋণকে ১৮,০০০ কোটিতে পৌছুতে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনার আঁক অনুসারে ১৯৬৫ সালে এই ঋণের পরিমাণ ৩,৫০০ কোটি মতো হওয়ার কথা। সাড়ে তিনহাজার কোটির ঋণ থেকে ১৮০০০ টাকার ঋণে পরিণত হয় যে উন্নয়নের পদ্ধতিতে তার মারফৎ অর্থনীতি স্বাবলম্বী হয়ে যাচ্ছে বলাটা খানিকটা মস্করার মত শোনায় নাকি?

বিকল্প আঁক অনুসারে দেখা যায়, যদি বৈদেশিক কর্জকে ১০,০০০ টাকার নিচে রাখতে হয় তো গড় মাসিক পারিবারিক আয়ের হার কম করে হলে ১৭৫টাকায় এবং বেশি করে হলে ২০০ টাকার পৌছুতে পারবে মাত্র। এই তো গেল আয়ের হিসাব। অন্ত একটা হিসাব করেও আমাদের ভবিষ্যৎ যে কতটা আশাহীন তার পরিমাণ পেতে পারি। সে হল বেকার সমস্তার আয়তন বিচার। একথা তো জানা যে আমাদের দেশে সমস্তাটা, এক শহরে মধ্যবিত্তের বাইরে, চাকুরিহীনতার নয়, তা হল কর্মক্ষম বয়ঃপ্রাপ্ত জনসংখ্যার অনুপাতে অর্থকরী কর্মসুযোগের অভাবের। ফলে বেকার সমস্তার আয়তন

পরিমাপ একটা জটিল ব্যাপার, প্রায় সময়েই প্রশ্নোত্তরভিত্তিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় বেকারের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্যভাবে আসে। পরিকল্পনাকারেরা বেকারের সংখ্যা না গুণে বেকারত্বের পরিমাপ করেন একদিকে কর্মক্ষম জনতার সংখ্যা রেখে এবং অপরদিকে সেই জনতার কতটা অংশকে পূর্ণমাত্রায় কর্মের সুযোগ দেওয়া যায় তার পরিমাণ রেখে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখানো হয়েছে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় উদ্বৃত্ত জনশক্তির পরিমাণ ছিল ৫৩ লক্ষ এবং তার অন্তে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯০ লক্ষে। ৫৩ লক্ষ সংখ্যাটি কতটা নির্ভরযোগ্য জানি না, মনে হয় অত্যন্ত বেশিরকম কম করে ধরা। কিন্তু আগের মতই আপাতত আমরা সরকারী তথ্য মেনেই চলব। প্রারম্ভিক বিন্দুর জন্য, দৃষ্টি নিবদ্ধ করব প্রগতির হার যা দেখানো হয়েছে তার উপর। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচবছরে কর্মক্ষম জনসংখ্যা বাড়বে ১৭০ লক্ষ আর কর্মসুযোগ বাড়বে ধরা হচ্ছে ১৪০ লক্ষের আন্দাজে, ফলে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি বেড়ে ১২০ লক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু এখানেও আবার একটা সংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধাবাদিতা ধরা পড়ে যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভিজ্ঞতায় দেখি, কর্মসুযোগ সৃষ্টির হার ছিল প্রতি ১১০০০ টাকা পুঁজিনিয়োগে একজনের কর্মসংস্থান। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার কালে যদি ১৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করতে হয় তো সে হারকে হতে হবে প্রতি ৮০০০ টাকা নিয়োগে একজনের কর্মসংস্থান। কি উপায়ে এই হারকে এতটা নিচে নামানো হবে তা কোথাও বলা নেই। অতএব, আবার আমাদের এই হারকে অগ্রাহ্য করতে হয়। একটু কম করে যদি ভবিষ্যতের জন্য হারটিকে কর্মসুযোগ প্রতি ১০,০০০ টাকা করেও ধরে নিই, ১৯৭৫ সালের মধ্যে যে নূতন কর্মসুযোগের সংযোজন আশা করা যায় তার সংখ্যা হল ৬৪০ লক্ষ, আর পরিকল্পনা অনুসারে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা একই কালে বাড়বে ৭ কোটি। ফলে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি ৯১ লক্ষ থেকে ১৫০ লক্ষে পরিণত হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পনের বছর পরেও, বৈদেশিক কর্জ এখনকার চেয়ে পাঁচগুণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও, বেকার সমস্যার কোনোই কিনারা হবে না। কিন্তু বৈদেশিক কর্জকে যদি ১০,০০০ টাকার নিচে রাখা হয়, তাহলে একদিকে আয়বৃদ্ধি যেমন খুবই সামান্য হবে, অপরদিকে কর্মসুযোগের বৃদ্ধিও ৪·৫ কোটির বেশি হবে না, ফলে উদ্বৃত্ত জনশক্তির পরিমাণ ৩·৫ কোটিতে দাঁড়াবে।

নিত্যব্যবহার্য কিছু সামগ্রী এখনই বা পড়ে কতটা করে আমাদের

জোটে আর কতটা করেই বা আরও পনের বছর পরে জুটবে তার তুলনা করলে আমাদের জীবনমান কোথা থেকে কোথায় যাবে তার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। চাল গম এবং অন্য খাদ্যশস্য এখন জোটে মাথাপিছু দৈনিক সাড়ে সাত ছটাক হিসেবে, ১৯৭৫ তা জুটবে পৌনে নয় ছটাক হিসেবে। তেল ঘি এখন জোটে মাসে ৭ ছটাক হিসেবে, পনের বছর তা জুটবে সাড়ে নয় ছটাক হিসেবে। চিনির হিসাব তথৈবচ। চা ও কফি এখন মাথাপিছু মাসে ১ আউন্স মতো করে মাত্র জোটে, তা বেড়ে ১·৩ আউন্স হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। কেরোসিন তেলের খরচ এখন মাথাপিছু মাসে মাত্র সাড়ে ছয় ছটাক, আরও তিনটি পরিকল্পনা পার হওয়ার পর তা নয় ছটাকে পরিণত হবে। বিদ্যুতের ব্যবহার এখন মাসে মাথাপিছু ৩০০ ওয়াট্, তা ৮০০তে পরিণত হবে বলে মনে হয়। লজ্জানিবারণ ও শীততাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সাধারণ একজন ভারতবাসীর গড় হিসেবে জোটে ১৬ গজ সুতির কাপড় বছরে, তার জায়গায় জুটবে ১৯ গজ করে। আর উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখন যেমনটি আছি আরও পনের বছর পরেও মোটামুটি সেই রকমটিই থাকব। Alice in wonderland-এর alice বলে, "In our country, you'd genarally get to somewhere else—if you ran very fast." তার উত্তরে Red Queen বলে, "A slow sort of country ! now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place." আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতিটাও মনে হচ্ছে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটা। কিন্তু এটুকু বললেই যথেষ্ট বলা হয় না। এটুকু বললে বলাটা নিতান্তই একপেশে হয়ে যায়। যে ধরনের মাপজোক নিয়ে হিসেবে নেমেছি তাতে যে প্রগতির প্রতিশ্রুতি আমাদের সামনে মেলা হয়েছে তা নগণ্যই ঠেকে বটে। কিন্তু তাই বলে সমস্ত প্রগতিটাকেই তুচ্ছ মনে করে উড়িয়ে দিলে চরম আত্মবঞ্চনা করা হবে। অন্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে এই প্রগতির অন্য একটা দিকও ধরা পড়বে। তার আলোচনাটা এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশের জন্য মুলতুবী রাখা গেল।

জালের আড়ালে, রাজা

সিদ্ধেশ্বর সেন

জালের ওধারে সেই যে রাজা, নন্দিনী
পউষের মাঠের শিশির, তার নয়
পৃথিবীর সপ্রতিভ আলো, বন-প্রান্তরের যত হাওয়া,
সব আগে
রঞ্জনের অগাধবিস্ময়

সমস্ত, সমস্ত বর্ণস্বাদগন্ধ ফিরে, ফিরে আসে
ও যে প্রেমিক, প্রেমিক
বিদ্রোহ তো তার, অনুরাগে

জটিলআড়াল, হায়, প্রাণপাত দেহ,—কে
লুটায়
মৃত্যুর পিছল হাত, খনিজ-কন্দর হ'তে হাত,—রাজা

রঞ্জনের পথে পথে তোমার চলার জালা, ধনী

অগণ্য আড়ালে ধ্বস, ধ্বজা-
দণ্ড, সে ধূলায়
প্রতীক্ষায়প্রেমে অশঙ্কিনী

কেউ না, ও কে কাদের রাজা ৷

দ্রষ্টা

আলেক্সান্দর পুশ্‌কিন

তৃষার্ত হিয়া সুন্দর-সন্ধানে
ফিরিতেছিলাম মরুময় দেশে আমি,
এ-হেন সময়ে পথের প্রান্তখানে
দীপ্ত সে এক দেবদূত এলো নামি'।
হালকা হাতেই ছুঁলো সে আমার চোখ
স্বপ্নে যেমন নামে ঘুম আঁখিপাতে :
অমনি সে-চোখে জাগে ভবিষ্যলোক
দ্রষ্টার চোখ লভি অনুকম্পাতে।
কান যেই ছুঁলো, ভরে গেল দুই কান
গানে-গর্জনে, তুমুল অট্টরবে :
শুনি—আক্ষেপে খসে' আকাশের প্রাণ
পাখায় ঝাপট পরীদের দূর নভে,
শুনি—সমুদ্রতলে ঘোরে সরীসৃপ,
প্রাণরসে ভরে ওঠে-যে সরস শাখী।
মুখে ঝুঁকে পড়ে টেনে ছিঁড়ে লয় জিভ
দেবদূত সেই—রসনা পাপের পাখি—
ছিঁড়ে লয় যত মিথ্যা, অলস ভাষা,
অধরোষ্ঠের মাঝখানে দেয় মুছে
সুতাশখের দ্বিজিহ্ব-বিষদংশা,
রক্তে মাখানো হাত দেয় মুখে গুঁজে।

খোলা তরবারে চিরে সে আমার বুক
হৃৎপিণ্ডটা উপড়িয়ে করে বার,
মুক্ত-কপাট হাহা-করা সিন্দুক
ফের ভরে এক জলন্ত অঙ্গার।

কতকাল ছিনু প্রাণহীন, তারপর
দৈববাণীতে শুনিলাম কার স্বর:
"ওঠো, জাগো, তুমি শোনাও আমার বাণী,
আমার ইচ্ছা-তাড়িত হও না পার
সমুদ্র-মরু, হানো বাণী সন্ধানী—
মানবহৃদয় পুড়ে হোক ছারখার।"

তিন উৎস

আলেকসান্দর পুশকিন

বিস্তৃত বিশাল এই পৃথিবীর ক্ষেত্রে সকরুণ
তিন রহস্যের নদী স্বচ্ছ, প্রবাহিত ;
একটি উৎস যৌবনের—ঝর্ণাধারা উন্মত্ত, দারুণ,
কল্লোলিত জল ছোটে ঝিকিমিকি, সিক্ত ;
অন্য উৎস কাস্তেলিয়া—ঊর্মিমালা দৈবী প্রেরণায়
সঙ্গীতে মাতায় মন, চেতায় বন্দীকে ;
সর্বশেষ উৎস যেথা, হৃদয়ের উৎক্ষেপ জুড়ায়,
সুশীতল বহে জল বিস্মৃতির দিকে।

আশা

মিহাইল লের্মন্তভ

নন্দনবনবিহারিনী মোর পাখি।
সারা দিনমান সাইপ্রিস-শাখে বসে
ভাখে দিবালোক উড়ে যায়, ভাখে নাকি?
সারাদিন তবু গান গায় নাকো ও-সে।
পিঠে ওর নভোনীলিমায় আভালাগা.
উজ্জ্বল লাল মাথাটি; আগুন-রঙা
দুটি ডানা, তায় সোনার আভাস জাগা—
আকাশ যেমন উষার আলোয় ভাঙা।
কেবল পৃথিবী নিঝুম যখন ঘুমে,
রাতের কুয়াশা গড়ায় ছড়ায় চুপে,
সে মাতে গোপনে সঙ্গীত-মরশুমে
নিখিলচিত্তহারিণী মোহিনী রূপে।
এমনই সে-সুর, দুঃখ-নিগড় ভুলে
গলা দিতে হবে আমাকে-তোমাকে-তাকে,
ললিত রাগিনী প্রাণ বুকে রাখে তুলে—
যেমন পরম বন্ধু, ঘরে যে থাকে।
কতদিন ঝড়ঝঞ্ঝায় শুনেছি-যে
সেই গান, আহা, সে-গানে জীবন 'সাধি,
আহা, পাখি মোরে শান্তি দিয়েছে কী-যে,
শুনি, গান শুনি, আশায় হৃদয় বাঁধি।

সম্মিলিত যাত্রা

ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি

শহরে বাগান মাড়াও মাড়াও বিদ্রোহী পদভরে।
মাথা উঁচু রাখো! ঝোড়ো টুপিটা আকাশে দিক না লাফ।
দুনিয়ায় মোরা দ্বিতীয় প্রলয়—ছড়াই বাইরে-ঘরে
পৃথিবীর প্রতি শহর আমরা ধুয়ে মুছে করি সাফ।

পায়ে পায়ে ছোটে নানারঙ-দিনগুলি।
বছর গড়ায় ধীরেসুস্থেই খুবই
গতি আমাদের ইষ্ট, যেন না ভুলি।
হৃৎপিণ্ডটা বাজে বুঝি দুন্দুভি।

আমাদের চেয়ে দামি সোনা কই, বলো তো হে যাদুকর?
বুলেটের হুলে বিষ কত আছে শুনি?
আমাদের এই গান হতে কোন্ অস্ত্র-সে খরতর?
আমাদের সোনা হৈ-হৈ আর হল্লোড়—নাও শুনি'।

সবুজ সবুজ, ঢাকুক সবুজ ঘাসে
চলে-আসা দিন, ফেলে-আসা দিন যতো।
রামধনু—রঙে ঝলমল নীলাকাশে।
ছোটে টগবগ বছর ঘোড়ার মতো।

গ্রহদের মুখ চেয়ো না, ভেবো না স্বস্ত্যয়নের কথাও;
আমাদের গান গ্রহতারাদের সওয়ার।
নক্ষত্রকে পিছে ফেলে মোরা জীবন্ত হব উধাও—
ধাত্রী মোদের সপ্তর্ষিকে শুধাও জবাব তার।

আনন্দসুধা পান করো, হাঁকো হৈ!
শিরা দপ্‌দপ্ বসন্ত বন্যায়।
ওঠো, বুক বাঁধো! ঘা মারো, মারো ঘা, ওই!
শোনো, বুকে বুকে বাজের ঝন্‌ঝনায়।

অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

শিকার-কাহিনী

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

ঘুরে ফিরে কাছে আসতে হয়। কাছে এসে কথা বলতে হবেই। অন্তত না বলে নিস্তার নেই। ফুল তা জানে। এবং হয়তো জানে বলেই আরো উদাস, আরো গম্ভীর, আরো নিস্পৃহ সাজা যায়। তার মানেই, নিজেকে কাবুলের কাছে আরেকটু আকর্ষণীয় করে তোলা। জানতে তো বাকি নেই কেন কাছে আসা, কেন কাছে আসে সবাই। তাছাড়া সে আর কাবুল। কে-ই বা কার কাছে আজো অজানা, অচেনা হয়ে আছে? তাদেরও চেনে সবাই।

—"যাবে নাকি?" কানের কাছে আবার ফিসফিসিয়ে ওঠে। মুখ দেখে বিশ্বাস করা কষ্টকর, কথাটা কাবুলের। কারণ, ও এখন অন্য দিকে তাকিয়ে। চোখে মুখে কিসের নিস্পৃহতা। নাকি অন্যমনস্কতা? বোঝা ভার। কাছে দূরে নানা বয়সের মেয়ের জটলা। কাবুল কাকে দেখে? ফুল বিস্মিত বোধ করে না। কিন্তু ভেতরে ঈর্ষা কী আদৌ অস্থির করে না? সুন্দরী না হোক, সে-ও তো মেয়ে। যৌবনে পা দিয়েছে কবে আর! দেহের বাঁধুনি অটুট। বয়েসের বোঝা-পড়া মুলতুবি রেখে, এ বয়সে শরীর দিয়েই সৌন্দর্যের ঘাটতি পূরণ কত সহজ।

প্ল্যাটফরমের শক্ত শানের গায়ে জুতোর নাল ঠুকে ঘোড়ার মতো পায়চারি করছে আরেকজন। সে শোভন সিং। মাঝে মাঝে কী ভেবে দাঁড়ায়। ঘাড় উঁচিয়ে ভিড়ের ভেতরে কাকে খোঁজে। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘুরে ফিরে চোখ জোড়া ফুলের মুখের ওপরে পড়বেই। আর চোখাচোখি যদি হলোই, না হেসে রেহাই পাওয়া দায়। অন্তত ঠোঁটের কোনে হাসির তানটুকু জীইয়ে রাখতে হয়। অবস্থা গতিকে না হয় ঘর ছেড়ে স্টেশনে, প্ল্যাটফরমের ভিড়ে হাওয়া খেতেই আসে। তাই বলে এঁটুলির মতো গা থেকে ভদ্রতা-বোধটুকুও নখে টিপে বাতিল করে দেবে, নাকি দেওয়া যায়? তা ছাড়া কৃতজ্ঞতা বলে যে বস্তুটি সমাজে, সংসারে, সভ্যতায় এখনো সজ্ঞা হয়ে বেঁচে

আছে, এক কথায় তুড়ি মেড়ে তাকেই কি উড়িয়ে দেয়া চলে, না উচিত? একটু আগে আদর করে কাছে ডেকে গোটা একটা পানই মুখে গুঁজে দিয়েছে। অমন করে কে দেয়, দিতে পারে কখন? আহা, জর্দার স্বাদ জিবে জড়িয়ে আছে এখনো। —"আমাদেরও সাধ-আহ্লাদ আছে, বুঝলে ফুলরানী। আমরাও মানুষ।"

—"এইবার এতক্ষণে বুঝলাম সেকথা।"

—"মাঝে মাঝে এই পোড়া চোখ দুটোও দেখতে চায় তোমাকে।"

—"মাইরি।" আকাশ থেকে মাটিতে পড়ার ভানটুকুই নিখুঁতভাবে ফোটাতে চেয়েছিল। না পেরে ফিরে এসে খুঁত খুঁত করছিল সেই কথা ভেবেই। এখন তাই চোখ টিপে আশস্ত হলো ফুল। বাপের বয়সী এমন নাবালকের ইচ্ছাকে খায়েল করেই না আরাম?

সেই শোভন সিং মক্কেল পাকড়াবার ফাঁকে তাকে দেখছে। তাকেই পেতে চাইছে এখন। মানুষের মন-মেজাজের ঠিকানা ফুলের জানা।

ঘুরে দাঁড়ায় ফুল। কোমর থেকে বাঁ হাতখানা নামিয়ে দেহের সমান্তরাল করে ঝুলিয়ে দেয়। যেন এই হাতের করণীয় আর কিছু নেই। করবার ক্ষমতা বলতে কিছু নেই। শাড়ি-ব্লাউজে ঢাকা কাঁধের তলায় সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বাড়তি, অপ্রয়োজনীয় একখানা হাত। গোল কব্জিটা কী নিটোল, মসৃণ বাদামী চামড়ার গায়ে তুলির আঁচড়ে টানা জল-রং কাঁচের চুড়ি-কটা অবধি শব্দহীন।

পা দুটো টন-টন করছিল। মাংসল উরুর ভেতরে সরু আর শক্ত হাড় দুটো ব্যথায় চিন-চিন করছে এবার। এক নাগাড়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়। অস্বস্তির সীমা ছাড়াতে থাকে ফুল। কার যেন কথা ছিল আসার। সে এখনো এল না। রং মাখা ঠোঁটের কোনায় ব্যথার আর বিরক্তির আভাস স্পষ্টতর হতে চাইল। বাঁ পায়ের ওপর শরীরের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে ডান পা-টা এক পাশে ছড়িয়ে দিল। ইংরেজী বর্ণমালার প্রথম অক্ষরের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। দূর থেকে মনে হবে, কোনো কারণ বশত একটা পা না জানি ছোটই হবে ফুলের। লাল টকটকে শাড়িটা সর্বাঙ্গে অগোছালো ভাবে জড়ানো। এমন রোদ্দুরে ফুল আগুন হয়ে জলছে।

ঘুরে ঘন্টি বাজিয়ে জানিয়ে দিলে কে, গাড়ি আসছে। যত দূরে চোখ যায় চেয়ে রইল ফুল। ব্রীজের গায়ে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন হাতগুলিই রোদ্দুরে শুকোতে

দিয়েছে কে। এঞ্জিনের ধোঁয়া চোখে পড়ছে না এখনো। নিচে মাটি খুঁড়ে অসংখ্য কেন্নো ওপরে উঠে এসেছে। গায়ে গা লাগিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে এখন। লাইনের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ফুল তাই আকাশ দেখে। আকাশ এখন টল-টলে নীল দীঘি। কাটা ঘুড়ির মতো চিলটা ভাসতে ভাসতে লাট খাচ্ছে। আস্তে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ছোট হচ্ছে ক্রমশ। দেখতে-দেখতে চিলটা ছোট্ট প্রজাপতি হয়ে গেল। আরো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ফুল চোখ নামাল। কারণ গাড়ির শব্দ শোনা গেল তখন। ব্রীজের তলা দিয়ে গাড়িটা হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে আসছে। প্ল্যাটফরম ছুঁই ছুঁই করছে এবার। নড়ে চড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ফুল। গা ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা হতে চাইল। ওর চোখে মুখে কিসের উৎকণ্ঠা। সর্বাঙ্গে কার প্রতীক্ষা। নড়ে চড়ে পা দুটো গুছিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঈষৎ চঞ্চল মনে হলো ওকে।

আবার চেয়ে থাকা। কামরায় কামরায় খুঁজে দেখার পালা শুরু। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়। সে আসেনি। অথচ অন্ধকার মাঠে বসে কত আদর। গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ কোমর জড়িয়ে সেই মন ভাতানো অশ্রাব্য সব কথা। পকেটে পয়সা ছিল না? ও-কটা পয়সা হাতে গুঁজে দিয়ে না শোনালেই কী হতো না তখন? কে চেয়েছিল? মাথার দিব্যি দিয়েছিল কে?

রুমালে হাত মুছতে মুছতে বলেছিল, "এসব কিছু না, বুঝলে ফুলু? শুধু এরই জন্যে সময় পেলে ছুটে আসি ভেব না। আসলে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। দুদিন দেখতে না পেলেই মন কেমন করে। তোমার করে না ফুলু?"

আবার আদর করে ফুলু ডাকা হয়। ফুল না। ঝামার মতো খসখসে ধারালো গালটাই ফুলের নরম ময়দার ড্যালার মতো চিবুকে ঘসতে ঘসতে কথা বলে কেন। ফুল উত্তর না দিয়ে বাঁ হাতে পয়সার ছোট্ট সুন্দর ব্যাগটাই বুকের তলায়, ব্লাউজের আড়ালে চালান করে দেয়। ডান হাতে গলা জড়িয়ে ধোঁয়াটে গন্ধমাখা পুরু কালচে ঠোঁটের ওপরেই পাতলা আর রক্তাক্ত ঠোঁট দুটি চেপে রাখে ফুল। বোবা হয়ে যায় লোকটা। বলার মতো আর একটি কথাও খুঁজে পায় না। বরং পোষমানা বেড়ালের গলায় সেই অস্পষ্ট সুখের গোঙানী শোনা যায়।

—"কবে আসবেন আবার ?" ট্রেনের জানলায় হাত রেখে ফুলের সেই শেষ প্রশ্ন।

"কালকেই আসতে হবে ফের, কালকেই। আজ আর ভালো করে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব না ফুল।"

বিশ্বাস না করে উপায় ছিল আর ? আশ্বস্ত হয়েছিল ফুল। নির্দ্বিধায় আংটিটা আঙুল থেকে খুলতে দিয়েছিল। কথা ছিল, পছন্দসই পাথর-বসানো আরো একটা নিয়ে আসার। কেউ তো দেয় না। ও তবু মুখ ফুটে বলেছিল। মাপ না দিলে জানা যায় ?

সাত-সাতটা দিন কেটে গেছে। গলা টিপে আশাটাকে মেরে ফেলা তবু অসম্ভব মনে হয়। যদি আসে। ভাবতে রোমাঞ্চ লাগে। নইলে এমন দুপুরে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। উড়ু উড়ু করে মন। ধান্দা কি একটাই ফুলের ? ঝামেলা কি এতই কম ? তবু সব ভুলে দাঁড়িয়ে থাকার সাধনায় মগ্ন হতে হয়। রোজ রোজ একটি মাত্র মানুষের খোঁজে অন্তত একবার এইখানে আসতে হয়। সে যদি তবু আসে। পুরোপুরি হতাশ হতে পারে না। ভয় হয়। ভয় আর কষ্টের একটা মিশ্রিত অনুভূতিই আপাতত আবিষ্ট করে রাখে। অবশ্য নিছক একা একা লাগার কোনো মানেই নেই। কারণ, ইচ্ছে হলেই সঙ্গী জুটিয়ে নেয়া যায়। যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। নিজের তরফ থেকে একটুখানি ইসারা চাই শুধু। সামান্য ইঙ্গিতের অপেক্ষা। ফুল তা জানে। আর জানে বলেই মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করে না। বরং "দেখাই যাক" ধরনের এক অনিচ্ছাকৃত উদাসীনতাকে লাই দিয়ে, পোষ মানিয়ে বুকের গোপনে বড় করতে চায়। অন্তত জীইয়ে রাখার সাধ তো তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দিতে পারে না।

ভয়ঙ্কর ক্লান্ত মনে হয়। শরীর মন ভেঙে পড়তে চায়। কাঁদবার একটু ঠাঁই চাই এখন। নিজেকেই অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় চিৎকার করে গালাগাল করার মতো নির্জনতা। এই দুঃখ কোথায় লুকোবে ফুল। এই পরাজয়ের, এই গ্লানির কথা শোনাবার ঘুগ্যি কে ? কই, বিশ্বাস করার মতো মানুষ যে চোখেই পড়ে না আর। ভরসা করার মতো একটি মুখও মনে পড়ে না। অথচ বিশ্বাস করেছিল ফুল। কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিল তখন। সমস্ত অসহায়তা থেকেই চিরকালের মতো মুক্তি পেতে চেয়ে ক-দিনের আলাপে, ঘনিষ্ঠতায় লোকটাকে ভেবেছিল আপনার চেয়ে আপন। নির্বান্ধব

পৃথিবীতে তার একমাত্র অবলম্বন ভেবে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। হায়রে দুরাশা!

—"তোমার মতো কাউকে এতদিন খুঁজছিলাম। আমি তোমাকে সব সময়ের জন্তে চাই ফুলু।"

—"শুনলে ভয় করে যে!" ফুল না কেঁপে পারে নি। তখন কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ। চোখের সামনে স্পষ্টতর হতে চাইছিল একটা আগুন-লাগা অন্ধকার রাত্রি। আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। মাংস-পোড়া গন্ধটা টের পাচ্ছিল ক্রমশ। ভয়ঙ্কর আনন্দে, উত্তেজনায় কারা মেতে উঠেছিল। তাদের হাতে বর্শার ফলাগুলি হিংস্র শ্বাপদের জিবের মতো লকলক করছিল। আর দাউ দাউ করে জলছিল অসংখ্য মশাল। সেই রক্তাক্ত আলোয় আভা লেগে কয়েকটি পরিচিত, নিষ্পাপ, করুণ মুখ সহসা বীভৎস আক্রোশে জলে উঠেই ছাই হয়ে গেল। শিকারের চারপাশে আদিম পুরুষেরা তখন দিশে হারিয়ে নাচছিল। অনেক দূরে নদীর ওপারে আকাশ-জোড়া বিশাল প্রান্তর অসংখ্য কঙ্কাল করোটি বুকে নিয়ে হয়তো এখনো শ্মশান হয়ে পড়ে আছে। মুহূর্তে এইসব দৃশ্য ফুলকে ব্যাকুল করে তোলে। সে তাই ভয়ে-ভাঙা গলায় প্রায় না-শোনার মতো বলে, "বিশ্বাস হয় না। বুক কাঁপে।"

—"এ্যাই ভাখো! তোমার চোখেও যে জল আসে ফুলু! কাঁদবার মতো কী বলেছি আমি?" সারা মুখে একই সঙ্গে বিরক্তি আর অস্বস্তি ফুটিয়ে চেয়ে থাকে লোকটা। বোকার মতো আরেকবার জড়িয়ে ধরতে চায়। বলে, "আমাকে ভয়?"

ধরা দেবার বদলে সরে যায় ফুল। আগে আগে ছুটতে থাকে। গঙ্গার ধার থেকে স্টেশনেই পালিয়ে আসে।

এইখানে দাঁড়িয়ে কথা দিয়েছিল আসবে। যেমন সবাই দেয়। অনেকেই দিয়েছে ফুলকে। তাদের কাউকে মনে পড়ে, আবার পড়েও না কাউকে।

হাঁটতে হাঁটতে ফুল সেই পুরনো, পরিচিত জায়গাটায় এসে দাঁড়ায়। এইখানে দাঁড়ালে ফাঁকা লাগে। জায়গাটা নির্জন। এখানে দাঁড়ালে সবাইকে দেখা যায়। লাইনের এপারে-ওপারে যে আছে, যা কিছু আছে, সব। ফুল তাই নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে দেখে। দেখে আর ভাবে। আলতো ভাবে পিঠ আর মাথার পেছনে চালতের মতো গোল আর প্রকাণ্ড খোঁপাটাই স্টেশনের নাম লেখা হলদে বোর্ডের গায়ে চেপে ধরে। ঝিমুনি আসছে। ঘুম পাচ্ছে

এখন। সারাটা দুপুর এমনি একলা কাটাতে হবে হয়তো। কেউ আসবে না। কাউকে পাওয়া যাবে না আর।

এমনি করেই বেলা যায়।

সারাটা সকাল ঘুরে বেড়িয়েছে। অকারণ চা খেয়েছে কয়েকবার। ইচ্ছে ছিল না, তবুও। মনে মনে ঘরে ফেরার সাধ আর বুঝি নেই। কিন্তু কোথায় যাবে এবার। বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিশুর সঙ্গেই কথা হয় খানিক।

—"কাবুল যে। ছাড়া পেলি কবে?"

—"এক হপ্তা হয়ে গেছে।"

—"বাড়ি যাসনি?"

—"না।"

—"কেন?"

—"বাবার বউটা আমাকে দেখলে কেমন নাক সিঁটকোয় যে বিশে।" কথায় কথায় বেপরোয়া হতে চাইলেও কাবুলকে এখন অসহায় দেখায়। লক্ষ্য করে বিশু, জেল থেকে রোগা হয়ে ফিরেছে। চোখের কোণে কালি জমেছে। কাজল পরেছে মনে হয়।

—"তোর মা হয় না?" ছিপি খোলা বোতলের সোডা উথলে গড়িয়ে পড়ে আর কি। ঢোক গিলে হাসিটাকে হজম করে বিশু।

—"আমার জন্তে কালীকে দেখতে গিয়েছিল বিধু ডাক্তার, তোর মনে আছে? কিন্তু লোভ সামলাতে না পেরে নিজেই বিয়ে করেছে।"

বিশু আর এগোতে সাহস পায় না। কাবুলকে চেনে, মনের মুগ্যি কথা না পেলে ছুরি বের করবে এখুনি। যা ওর স্বভাব। জেলের ভাত ছাড়া মুখে আর কিছুই রোচে না। অথচ একসঙ্গে পড়তে গিয়েছিল কলেজে। ভাবলে অবিশ্বাস্ত ঠেকে সব। গৌরীর গায়ে হাত তুলে কলেজের পাট চুকিয়ে দিল কাবুল। ওদের ভালোবাসার গল্প কে না জানে?

—"কী করবি এখন?" বিশু হাত ধরে—"চ, চা খাবি আয়।"

বিষ নজরে দেখে সবাই। একসঙ্গে সব ক-টি চোখেই ভিড় করে সন্দেহ আর শঙ্কা। ফেরায় করে না কাবুল। লক্ষ্য করে না কাউকেউ। চা খেতে খেতে অন্তমনস্ক হতে চায়।

বাইরে এসে শোভন সিংয়ের কাঁধে হাত রাখে। বিশুকে বলে, "চলি।"

—"কী ব্যাপার ?" আঁতকে ওঠে শোভন।

—"কটা প'সা চাই। পকেট গোরস্তান হয়ে আছে মাইরি। মাল খেতে চাইছে প্রাণটা।" কাবুল দাঁত বের করে।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে স্টেশনে এসে হাজির। তাছাড়া ঠাঁই কোথায়! একপাল শ্যাল-কুকুরের বাচ্চার মাঝখানে বিধু ডাক্তার তো কালীকে নিয়েই মশগুল!

মাঝে মাঝে হাওয়া বয়। উষ্ণ, অবাধ্য বাতাস। চোখ মেলে তাকাতে হয়। হাওয়ার হাতে ছেঁড়া কাগজ, ময়লা ন্যাকড়া, শুকনো পাতা আর ধুলোর ঘূর্ণি দেখে দেখে একসময় চোখ জ্বালা করে। জ্বলে পুড়ে ছাই হতে চায় সমস্ত শরীর। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। আনমনা আকাশ দেখে ফুল। দেখার তান ?

প্ল্যাটফরমের কোনাকুনি চায়ের দোকান। ট্রেনটা ছেড়ে দিলে আবার নির্জন, নিঃশব্দ। কে কোথায় চলে গেল! সেই ভীড় নেই, সেই কোলাহল। কিছুক্ষণ পায়চারি করে দু-বার সামনে এসে আবার এগিয়ে গেল কাবুল। কী বলবে, কী বলা যায়, কী করা যায় এখন ? দ্বিধা না ভয় না দুর্বলতা বোঝা ভার। মাঝে মাঝে এমনি অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে কিনা মনেই পড়ে না। হয়তো আজকের মতো এমন করে হয়নি কখনো। তাই অস্বস্তি বোধ করে। চলে গেলেই হতো। আবার সেই বিকেলে গাড়ি। ততক্ষণ বসে থাকতে হবে। অথচ কেন, কার জন্যে বসে থাকবে জানে না বলে কষ্ট পাচ্ছে এখন। আফসোস হচ্ছে। শেয়ালদা ইস্টিশানে চলে গেলেই হতো। ফাঁকা ফাঁকা লাগত না। দেখা হয়ে যেত কারো সঙ্গে। অথচ কী-জন্যেই যে গেল তখন। পা-দানিতে পা রেখে পিছিয়ে এল ফের। ওকে দেখল, ওঠেনি। ওর চোখ কাকে খুঁজে বেড়ায়। কাকে ?

শালার নিকুচি করেছে অত ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাবার। মনে মনে নিজেকে, নিজের আহাম্মকপনাকেই খিস্তি করার ঝোঁক চেপে যায়। রাগে জ্বলতে থাকে কাবুল।

ফি-বেস্পতিবারেই কোমরে গেঁজলে বেঁধে কলকাতা যায় মদন ঘোষ। পিছু নিলে কী ক্ষতি ছিল তখন ? তা না, মাগী তখন এমন করে তাকালে। যেন বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙাচ্ছে! ছেনাল আর কাকে বলে। চিনতে কি

ন-শো পঞ্চাশ বছর লাগে ?- কাবুল চেনে, জানে কোন্ বস্তু আসলে কী। আর এতো ফুল ! চোখের সামনে ঝাঁখ ঝাঁখ করে ঝিঝি হলো মেয়েটা। কাবুল ওর নাড়ি-নক্ষত্র না জানে কী ?

ধুলো শুঁকতে শুঁকতে নেড়ি কুত্তাটা পায়ের কাছে আসে। পা দেখে থমকে যায় বুঝি। লেজ নাড়তে নাড়তে খুশি জানায়।

তাড়িয়ে দিল না ফুল। সরে দাঁড়াবার কথাটা ভাবল না একবার। বরং আড়চোখে আরেকবার শোভন সিংকে দেখে। পেট মোটা চামড়ার ব্যাগটা বার করে পয়সা গুনছে। নোট বার করে দেখাতে চাইছে বার বার। হাসি পেল, তবু হাসল না ফুল। বরং আরো উদাস, আরো কঠিন হতে চেয়ে দুই চোখ ছড়িয়ে দিলে দূরে, অনেক দূরে। প্রায় নির্জন প্ল্যাটফরমের ওপরেই কয়েক চক্কর ঘুরে বেড়াল একা। আর ঠিক তখুনি, শূন্যে ঝুলন্ত গোল আর প্রকাণ্ড ঘড়িটা দেখা গেল। সময়ের দুই পাড়ে কালো নিস্পন্দ দুটি হাত যীশুর অন্তিম ছবিটি মনে পড়ায়। কত আর বয়েস হবে তখন যেদিন ইতিহাসের পাতায় ছবিটি খুঁজে পেয়েছিল ফুল ! বাড়ি বেচা টাকার আদ্ধেক ভাগ বুঝে নিয়ে শ্বশুরের কাছে চলে গেল কাকা। বছর না ঘুরতে বস্তির ঘরে উঠে আসতে হলো মা-বাবার সঙ্গে। মরবার আগে বাবাকে তাই নিয়ে কত কথাই না শুনিয়েছে মা, উঠতে বসতে খোঁটা দিয়েছে।

—"এই তো মায়ের পেটের ভাইয়ের নমুনা। লেখা-পড়া শিখিয়ে সর্বস্বান্ত হলে, এখন দেখে না ? দেখতে আসে না তোমাকে ?"

—"আহ্ বড় বউ !" লাঠি হাতড়াতে হাতড়াতে বাধা দিতে চাইত বাবা। মুখে চোখে অস্বস্তি আর বিরক্তির অভিব্যক্তিটুকুই আরো পরিষ্কার করে ফুটিয়ে তুলত, "কপাল ছাড়া দোষ কার দিই বলো তো ? বরং এসো তার চাইতে আমরা ক্ষমা করি সবাইকে।"

কথা শুনে কাঁদতে বসত মা। সেই মা মরে গেলে ছ-মাসের বেশি টিঁকতে পারে নি বাবা। বাবার আগে ছোট ভাই তিনুকে বলে গেল, "তোর দিদি রইল। ওই তোর মা, ওই তোর বাবা।"

বাজারে বাবার নাম করে সেই তিনুও একদিন কোথায় চলে গেল। বছর ঘুরে এল, তবু ফিরে আসার নাম নেই !

দুই চোখ ছলছলিয়ে ওঠার আগেই চারদিক গমগম করে ওঠে। লাইনের

ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে একটা আধ মাইল লম্বা সরীসৃপ। মাল-গাড়িটার এখানে থামার গা নেই আদৌ। ফুল গাড়ি দেখে। কান পেতে শব্দ শোনে, চাকার শব্দটা দূরে মিলিয়ে গেলে আবার সামনে তাকাবার পালা। নিস্পন্দ ঘড়ির নিচে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কাবুল। সামনে দাঁড়িয়ে শোভন। কী বোঝাতে চায় ওকে! কাবুল হাত পাতে। ব্যাগ খুলে টাকা বার করে লোকটা। প্যান্টের পকেটে টাকা সুদ্ধ হাতটা ঢুকিয়ে মাথা কাত করে কাবুল। ক-টাকা গুণে দেখবার অবসর বুঝি নেই আর। কাবুলকে সহসা ব্যস্ত আর তৎপর মনে হয়। টাকার কথা ভাবলে গা শির শির করে। মন খারাপ হয়ে যায় ফুলের। ফিলে-ভেটার কথা মনে পড়ে। পেটের ভেতরে সেই গোঁয়ার, অবাধ্য পশুটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। গা বমি বমি। রগ দুটো টিপ টিপ করে।

হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল। একটা চাপা আর অস্ফুট গোঙানী কেমন ভীত, সন্ত্রস্ত এবং চঞ্চল করে তুলল সবাইকে। ফুল ভয় পেল। মাল-গাড়িটা পেরিয়ে যেতেই সবাই ছুটোছুটি শুরু করেছে। একসঙ্গে ছুটে চলেছে সবাই। ফুল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে ভিড়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

চোখ মেলে দেখা যায় না। ফুলের শরীর হিম হয়ে আসে।

—"ইস, বাচ্চা ছিল হে পেটে!" আফসোস জানায় বুড়ো মতো লোকটা।

—"একটা না, তিন-তিনটে বাচ্চা।" কুলিটা মাথা নাড়ে।

থুথু ছিটিয়ে নাকে রুমাল চাপা দিলে কাবুল। তেরচাভাবে শরীরটা দোফালা হয়ে গেছে!

—"কুত্তাটা ছিল কার? কার কুত্তো মুখে নিয়ে ছুটে যাচ্ছিল হে?" টিকিট চেকার কুলিটার মুখ দেখল। কুত্তোর মালিক এগিয়ে এল না।

এক ফোঁটা রক্তের দাগ লেগে নেই কোথাও। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। জিবের ওপর নাচানাচি করছে মাছি। এরই মধ্যে খবর পেয়ে গেছে। নাড়ি-ভুঁড়ির সঙ্গে লেপটে রয়েছে তিনটে অপুষ্ট বাচ্চা। আধখানা শরীর স্লিপারের ওপরে শুইয়ে, বাকি আধখানা লাইনের বাইরে ফেলে রেখে দৈত্যের মতো গাড়িটা এখন কোথায় চলে গেছে। লাইনের গায়ে থেঁতলানো মাংসের শুকনো দাগটুকু পর্যন্ত লেগে নেই।

মিলের হাজিরাবাবু এসেছিল মাসতুতো বোনকে নিয়ে। মোটা টাকায় চেক লিখিয়ে নিয়েছিল বিধুডাক্তার। মেয়েটা বাঁচেনি। তার পরেই হাজিরাবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ পত্র গেল বিধুডাক্তার। টাকাটা অবশ্য ভোগে লাগাতে পারেনি।. হিন্দী ছবির নায়ক হতে চেয়ে বোম্বে পালিয়ে গিয়েছিল কাবুল। কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিয়েও খোঁজ পায়নি কেউ।

খোঁয়া ওঠা সেই কুকুরটাই। একটু আগে ফুলের পা শুঁকতে গিয়েছিল। দৃশ্যটা দুই চোখে বান ডেকে আনে। একটা অদেখা আতঙ্ক তলপেট থেকে বুকের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসতে চাইছে। অন্ধকার হয়ে আসে সব। মাথা ঘোরায় সেই অচেনা রোগটাই ফের পেয়ে বসে ওকে। একে একে সবাই চলে গেল, ও তবু দাঁড়িয়েই থাকে। পা চালাবার ভরসা অথবা সাহস খুঁজে পায় না। কাবুল হাত চেপে না ধরলে ও হয়তো পড়ে যাবে এক্ষুনি।

কিন্তু কাবুল তা করে না। বরং আরো শোভন, আরো শালীন হতে চায়। দিনের আলো কিনা প্রচণ্ড ভাবে উজ্জ্বল, উত্তপ্ত করে রেখেছে চারদিক। তাই খোলাখুলি সব কথা বলা, সবকিছু চাওয়া ঝকমারি। বাক্স-প্যাটরায় বন্দী বাতিল দামী পোশাক-আশাকের মতো ছেঁড়া-খোঁড়া মনের এই দুর্বর্ব কামনা-বাসনাগুলিকেও বাইরে প্রকাণ্ড দিবালোকে টেনে আনা আর দায় নয়, দুঃসাহস। কাবুল তাই বুঝে-সমঝে বলতে চায়। অনভ্যস্ত, আনাড়ি তো না। জানে, মতলব হাসিল করার কায়দা কসরৎ সব।

—"আজ তাহলে চলে যাব ফুল ?" উত্তরের কেবিন ঘরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে কাবুল। কেমন সহজ সুরে, নির্বিকারভাবে বলে যায়। যেন ফুলের আশায় ঘুরে বেড়িয়েছে সারাদিন। ফুলের জন্যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা। নইলে কত কাজ কাবুলের।

চমকে ওঠার ভঙ্গিটা নিখুঁতভাবে ফোটাতে গিয়ে আরেকবার হিমশিম খেল। কিন্তু বিচলিত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে বেশিক্ষণ লাগে না। ফুল বলে, "কোথায় ?"

—"দেখি কোথায় যাওয়া যায় !" যেন বিশ্ব-সংসারের বাইরে অন্য কোনো জায়গা ঠিক হয়ে আছে। ইচ্ছে হলে কাবুল এখন সেইখানেই চলে যেতে পারে। মুখে-চোখে তেমনি এক অপার্থিব বিশ্বাস ফুটিয়ে মহাপুরুষের মতোই উদাস, উন্মনা হতে চায় ও।

ফুল দেখে। দেখে হাসি পায়। সারাদিনে এই বুঝি প্রথম কৌতুকে

কেটে পড়ার সাধ ওকে মরিয়া করে তোলে। কিন্তু না, নিজেকে সংযত করে রাখাই সমীচিন। বরং পা টিপে টিপে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে এগিয়ে যাওয়াই উচিত। দীর্ঘশ্বাসে বুক কাঁপিয়ে বলে, "বাড়ি যাওনি ?"

মাথা নাড়ে কাবুল। করুণ হাসি হেসে বলে, "কার বাড়ি কে যায় !"

কথা না বাড়িয়ে ফুল এবার হাঁটতে শুরু করে। লাইন ধরে সোজা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। কাবুল তখনো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ঘেয়ো কুকুরের মরা দেহটাই দেখছে। সবকিছু গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। ফুল, সেই চেনা ফুলকেই এখন অচেনা লাগে। রাগের বদলে ও এখন অস্বস্তি বোধ করে। নির্দ্বিধায় যেতে পারছে কই ?

কিন্তু আড়ষ্টতা ভাঙাতে নিজেই এগিয়ে আসে ফুল। না এসে লাভ ? মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। হা পিত্যেশ নিয়ে চেয়ে থাকতে হবে, চেনামুখ যদি কাছে আসে কেউ।

—"কী হলো আবার ?" কণ্ঠে ব্যস্ততা আর বিরক্তি ফুটিয়ে চেয়ে থাকে ফুল। "চুপসে গেলে যে ? যাবার সাধ ফুরিয়ে গেল ? ভালো।" মাথা বাঁকাল ফুল। কাবুলের সেই অনেক দেখা, অনেক জানা মনোহর হাসিটাই হেসে দেখাল। এক মুহূর্তের জন্যে মাজনের বিজ্ঞাপনের একটা ছবিই হয়ে গেল ফুল।

—"না, কিছুনা। একটু দম নিলাম আর কি। চলো।" পা ঝাড়া দিয়ে কাবুল এবার সঙ্গ নিল।

তারপর ওরা হাঁটতে থাকে পাশাপাশি। কখনো আগে পিছে চলতে শুরু করে। রেল লাইন ছেড়ে বাঁধানো সড়ক, সড়ক ছেড়ে মাঠ, মাঠ ছেড়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। কথা হয় টুকটাক। আবার হয় না কিছুই। প্রাণের কথা বলা কী এতই সহজ, এত শীগগির কী বলা যায় সব ? দেনা-পাওনার সমস্ত হিসেব মেটাতে সময় চাই, নির্জনতা চাই। যে কারণে শহর ছেড়ে এতদূরে ছুটে আসা।

—"চা খাবে ?" সামনে ছোট্ট চায়ের দোকান। দোকানী ঝিমোচ্ছে। দেখে থমকে দাঁড়াল কাবুল।

মাথা কাত করে ফুল। ওরা এগিয়ে গেলে দোকানী খাতির করে বেঞ্চি পেতে দেয়।

চা খেয়ে ফুল বলে, "ঝিছিমিছি হাঁটতে ভাল লাগে না। এমন জানলে কে আসে।"

—"পয়সা দিচ্ছি না! মাগনা প্রেম বিলোচ্ছ নাকি?" সেই-কাবুলের গলা শোনা গেল এতক্ষণে, যার নামে শহর কাঁপে ঘৃণায়, রাগে, ভয়ে। হাজত যার বাসঘর, জেল যার সংসার। কালোয়ার শোভন সিংয়ের সাকরেদ সেই কাবুলই কথা বলছে এখন।

গতি শ্লথ হয়ে আসে। এগিয়ে যাবার সাহস আর খুঁজে পায় না ফুল। দ্বিধা সঙ্কোচের জড়তা কাটিয়ে পুরোপুরি নির্ভয় হতে পারে না। আড়চোখে সর্বাঙ্গ দেখে নেয় একবার। অন্য সময় হলে হাসি পেত। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর কপালের ঠিক ওপরেই ফেনিয়ে তোলা রুক্ষ চুল, মোটা আর রোমশ হাতের কব্জিতে বাঁধা কালো তার, কোমরে জড়ানো চামড়ার বেল্ট, এমনকি পায়ে রবারের চটিটা পর্যন্ত দেখে ফিরে যাবার সাধটাই বুঝি তীব্রতর হতে চায়।

কাবুল টের পায়। বাঁ হাতখানা কাঁধের ওপরে রাখে। ফুল ততক্ষণে শক্ত, কাঠ হয়ে গেছে।

—"কী গো, আমাকে তুমিও ভয় করতে শুরু করলে, ফুল?"

চেষ্টা করে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে ফুল। বলে, "কেন? সাপ, না বাঘ তুমি?"

—"সবাই কেন একথাটা বোঝে না ফুল?" গলাটা ভেজা ভেজা শোনাল। হঠাৎ বড় অসহায়, বড় করুণ মনে হলো কাবুলকে। ফুল বিস্মিত হতে চাইল। "চলো আরেকটু এগোই। ফাঁকা দেখে একটা গাছতলায় বসব।" কাঁধ থেকে শক্ত থাবাটা আলগা হয়ে কনুইয়ের কাছে নেমে আসে। বগলের তলায় হাত রাখে কাবুল। গা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে থাকে ফুল।

মাতালের মতো টলতে টলতে সূর্যটা এবার আকাশের কোনে কাত হয়ে পড়তে চাইছে। মাতালের চোখের মতো রং হয়েছে রোদের। নির্জন ছায়ায় দাঁড়িয়ে কাবুল কী ভাবে। মাথার ওপরে ছাতা মেলে ধরেছে বিরাটাকার প্রাচীন এক বট। কচিৎ পাখি-পাখালির ডাক শোনা যায়। আশ-পাশে ভাট আর আশ-শেওড়ার জঙ্গল। চারদিক ছায়া ছায়া। ভয় আর বিষাদে থমথমে।

বুকের ঢাকনা সরিয়ে আঁচলটা কোলের ওপরে জড় করে রাখল ফুল।

প্রায় অনুচ্চারিত কণ্ঠে বলল, "বেলা যে যায়, বসো। ফিরতে হবে না আবার?" পা দুটো সামনে ছড়িয়ে হাত দুটো কনুই থেকে ভেঙে ঈষৎ ক্লান্ত ভঙ্গিতে আধশোয়া হয়ে থাকে ফুল।

স্থির, অপলক দুটি চোখে কাবুল তখনো দেখছে। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে শোভন সিংয়ের দেওয়া টাকার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে নিঃশ্বাস ক্রমশ উষ্ণ আর ঘন হচ্ছে কাবুলের। চোখ চেয়ে ফুলকে দেখার সাহস যেন নেই আর। বরং অক্টোপাসের মতো বটের মোটা আর জীর্ণ অসংখ্য শেকড় চোখে পড়ে। অজস্র আঙুলে পৃথিবীর অতল অন্ধকারকেই আঁকড়ে আছে কত যুগ, কত শতাব্দী ধরে। মৃত মরালের মতো জটগুলি মাটির গভীরে মুখ ডুবিয়ে রেখেছে লজ্জায়। অবিচ্ছিন্ন ছায়ার দিকে তাকালে সৃষ্টির আদিমতম অন্ধকারকে আবিষ্কার করা যায়। পৃথিবীর প্রথম পুরুষের চোখে কাবুল এইসব দেখে।

ধনুকের মতোই নরম দেহখানা দুমড়ে, মুচড়ে প্রায় শুইয়ে রেখেছিল। কাবুলের দিকে চেয়ে বিরক্তি বোধ করে ফুল। স্বরে অধৈর্য মিশিয়ে ডাকে, "কী, অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ যে?" খপ করে হাত ধরে বুকের ওপরে টেনে নেয় কাবুলকে। তার উদোম কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরে কাবুল বলে, "তোমার আর লজ্জা করে না, না?"

ফুল তখন কথা বলে না। বলতে পারে না। চোখের পাতা বুজিয়ে বিচিত্র হাসে।

কাবুল চুমো খায়।

—"মাঝে মাঝে আমারও ইচ্ছে হয়—" ফুল বুঝি ঘুমিয়ে পড়বে এখুনি। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

—"কী?" সাঁড়াশির মতো দুই শক্ত পেশল বাহুর চাপে ফুলকে বুকের ভেতরে পিষে, গুঁড়িয়ে ফেলতে চায় কাবুল। বলে, "কী ইচ্ছে তোমার?"

—"মা হতে ইচ্ছে করে।" যেন গোঁয়ারের মতো ফুল বলে ওঠে।

একটু আগে দেখা মরা কুকুরের ছবিটা চোখে ভাসে। হঠাৎ গা ঘিন-ঘিন করে কাবুলের। নিজের অজান্তে দেহ-মন শিথিল হয়ে আসে। হাত দুটো অবশ হয়ে যায় মুহূর্তে। ফুল অবাক না হয়ে পারে না।

—"তুমি কাউকে ভালোবাসনি কোনোদিন, কোনো মেয়েকে?"

—"না।" চোয়াল কঠিন হলো কাবুলের। কী ভেবে ফের বলে,

"ভালোবাসা-টাসা আমার আসে না ফুল। মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু বুঝিনে। মন-টন বাজে, বোগাস সব।"

—"অ।" ফুল ভয় পেল, আহত হল যেন।

—"কালীকে ভালোবাসতাম। বিধু ডাক্তারের বউকে।"

—"তোমার মা যে।" আতকে উঠল ফুল।

—"ছাই। বিধু ডাক্তার আমার মাকে মেরে ফেলেছে।" গলা বুজে আসছে কাবুলের। ফুল টের পায়।

—"কেন? কী করেছিল তোমার মা?"

—"কিছুই করেনি। মাকে মেরে বিধু ডাক্তার লাইফ্ ইন্সিওরের টাকা বাগিয়েছিল।"

ফুল চমকে ওঠে। কাবুল টের পায়, ও কাঁপছে।

—"আমার মাকে মেরে কালীকে বিয়ে করল। কালী ভালোবাসে টের পেয়ে তাড়িয়ে দিলে আমাকে।"

—"তুমি আর ও-বাড়ি যাওনা?"

—"না।"

আর কোনো কথা নেই। দুজনেই চুপচাপ। দুজনেই বিষন্ন। কেউ কাউকে মুখ দেখাতে চায় না আর।

অন্ধকার মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে হাই তোলে কাবুল। এক-দুই করে আকাশের তারা গোনে ফুল। ফিরে যাবার কথা মনেই পড়ে না আর। কাবুল ভাবে, ফুল একদিন ট্রেনের তলায় গলা দেবে। কিন্তু ওর গর্ভের অন্ধকারে ঘুমন্ত শিশুটির মুখ হবহু তারই মতো। কথাটা ভাবতে গিয়ে এক অজানা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে কাবুল।

কাবুলের কথা ভাবতে গিয়ে কান্না পেল ফুলের। ওর দুঃখ ওকে একা, অসহায়, নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। মুহূর্তের জন্তে কাবুলকে নিষ্ঠুর কিংবা ঘৃণ্য ভাবতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল ফুলের। কী একটা গোপন আর জরুরি কথাই বলতে চেয়ে পারে না। কৃমির মতো দানা পাকিয়ে গলার কাছেই এসে যায় কথাটা। কণ্ঠনালী ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে তখন।

প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে কাবুল বলল, "কত?"

ফুল উদাস কণ্ঠে বলল, "যা হয় দাও।"

আস্ত পাঁচটাকার নোটটা হাতে গুঁজে দিয়ে কাবুল হাসতে হাসতে বলে, "বেঁচে থাকলে দেখা দিও আবার, বুঝলে?"

৬

হিরোশিমা : ভস্ম-সন্ততি

দেবেশ রায়

শুধুমাত্র একটি নাম নয়, হিরোশিমা আজ একটি প্রতীক। প্রতীক : মানুষের চরম মূঢ়তা ও অবিনশ্বর শপথের। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট সকালে হিরোশিমা ইতিহাসে সেই মর্যাদা পেয়েছে ; সুমের, আক্কাড, ব্যাবিলন, হরপ্পা, এই সকল নাম ইতিহাসের এক-এক পর্বের পরিণামকে ও শিক্ষাকে অঙ্গীকার করে যেমন মর্যাদা পেয়েছে।

গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে সেই সকল ব্যক্তিকে যাঁরা এখনও মানববাদী হওয়ার সাহস রাখেন। আলবেয়ার কামুর একটি বক্তৃতার একটি বাক্যকে প্রপদ হিসেবে উৎসর্গপত্রে উদ্ধার করা হয়েছে—"আমাদের ইতিহাসে ক্রিয়াশীল মৃত্যু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আর একবার প্রকাণ্ড যুদ্ধ করবার জন্য পুনর্জাত হওয়ার অভিপ্রায়ে, প্রলয়কালে নিজেদের জন্য একপ্রকার জীবনযাপনের শিল্প তাদের বের করে নিতে হয়েছিল।"

গ্রন্থটি পড়বার পর কিন্তু প্রথম বাক্যটিই ধ্রুবপদ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। মনে হয়, লেখক নিজেই সেই দিনগুলির কথা বলতে বলতে মনুষ্যত্বে নিজের বিশ্বাসকে একেবারে অটুট রাখতে পারছিলেন না। হাত থেকে বিশ্বাসের পাত্র পড়ে গেছে, আঁচড় পড়েছে পাত্রের গায়ে, মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ হয়েছে জীবনের পাত্রে—তারপর লেখক সে পাত্রটিকে নিজের ওষ্ঠের কাছে তুলে ধরেছেন। আর যেহেতু এ-গ্রন্থে হিরোশিমা যখন শপথের প্রতীক, তখন পাশুপাত অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত, মৃত্যুকে আক্ষরিক অর্থে পেরুনো, সেই প্রতীক আমাদের সকলের চেয়ে আপন, সকলের চেয়ে নির্ভরযোগ্য আত্মীয় হয়ে ওঠে। 'মনুষ্যত্ব' একটি ভাববাদী শব্দ আর থাকে না বা রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাস।

বস্তুত গ্রন্থের উৎসর্গপত্রেই লেখক সমস্ত গ্রন্থের মূল কথাটিকে ধরে

Children of the Ashes (The Story of a Rebirth). Robert Jungk. Heinemann. 25 Sh.

দিয়েছেন। এ গ্রন্থের বিষয়—আণবিক বোমায় হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন মূল্যবোধগুলি কী করে চুরমার হয়ে গেল, আর কী করে সেই মূল্যবোধ পুনরুপার্জনের জন্য সংগ্রামী এক প্রজন্মের শুরু হলো। গ্রন্থের নাম 'ভস্ম-সন্ততি', কিন্তু, দ্বিতীয় নাম 'পুনর্জন্মের কাহিনী'। এই বিষয়কে তিনি গ্রন্থের নামে ও উপনামে, উৎসর্গে ও উদ্ধৃতিতেও সংকেতিত করেছেন।

গ্রন্থকার য়ুঙ্ক (আন্দাজে উচ্চারণ লিখলাম) এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন যে, হিরোশিমা তাঁকে আবেগ ও ঘৃণার স্রোতে টেনে নিয়ে যাবে, কিন্তু তাতে তাঁর মুখ দিয়ে অভিশম্পাত বর্ষিত হবে, এ গ্রন্থ কোনো বার্তা বহন করবে না। তাই তৎকালীন পত্রিকার সংবাদ, জীবিত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, সরকারী দলিল, আন্তর্জাতিক দলিল প্রভৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে সিদ্ধান্তে আসার সময় একটি ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, বা, একটি বাক্যের গঠনে, বা, একটি প্রশ্নে—তিনি নিজের সমস্ত আবেগকে প্রকাশ করেন, ফলে তাঁর বক্তব্য পাঠককে বাস্তব অবস্থায় একেবারে সম্মুখে নিয়ে যেতে সফল হয়। যেমন :

"বোমা পড়ার অনেকদিন আগেই এগারো বৎসরের কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের তাদের স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে দূরের গ্রামগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যখন এই ভয়ঙ্কর সংবাদ সেই গ্রামগুলিতে পৌঁছল, বয়স্করা বাচ্চাদের কানে যাতে এ সংবাদ না যায় তার চেষ্টা করলেন। কিন্তু, শিগ্‌গিরই পার্বত্য ও সমুদ্রোপকূলস্থিত গ্রামগুলিতে 'আণবিক নরকের' উদ্বাস্তুর ভীড় এত বেড়ে গেল যে, স্কুলের ছেলেমেয়েদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হলো : যে-শহরকে তারা এখনো 'দেশ' বলে ভাবে, সেখানে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু হয়েছে।

"...কিন্তু অধিকাংশ শিশু বৃথা অপেক্ষা করছে। তারা স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তারা রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত বা হিরোশিমা যাবার পথে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, এই আশায় যে, তাদের প্রিয়জন হয়তো আসবে।

"অবশেষে, কিছু ছেলে, বলা বাহুল্য সবচেয়ে সাহসী, ধৈর্য হারাল। তারা নিজেরা বাবা-মায়ের সন্ধানে নগরে যাবে স্থির করল। অন্যেরা তাড়াতাড়ি তাদের অনুসরণ করল। এবং শেষে মেয়েরাও আর বসে থাকতে রাজি হলো না। পায়ে হেঁটে, ট্রাক ধরে, চোরাই সাইকেল চেপে, বা ট্রেনে বিনা-টিকিটে চড়ে, তারা ধ্বংসস্তূপে ফিরে আসতে পারল।

"কিন্তু মাত্র কিছু ছেলেমেয়ে তাদের মা বাপকে ফিরে পেল। হিরোশিমার ছয় হাজার—কোনো কোনো মতে এমন কি দশ হাজার শিশু এই ঘটনায় তাদের মা বাবাকে হারিয়েছে। সুতরাং, এখন, তারা নিজেদের পথ বেছে নিতে অগ্রসর হলো"—(৬৮-৬৯ পৃঃ)। এর আগেই কিন্তু শ্রীযুক্ত যুক্ত বলে নিয়েছেন: "চুগোকু শিমবুন'-এর পুরনো ফাইলে দেখা যায় এই সময় একটি নতুন দুর্ভাবনা হিরোশিমায় গোচরীভূত হলো। জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক অধোগতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হলো। প্রায় প্রতিদিন খুন রাহাজানি বলাৎকার ছেনতাই এইসব খবর আসতে লাগল। এমন কি কাঠের তৈরি অত্যন্ত জরুরি চিঠির প্রথম বাক্সগুলি বসানোর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে নিয়ে গিয়ে, জ্বালানি হিসেবে পোড়ানো হতো। অবশেষে, ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে এই সংবাদপত্র ক্রম-ঊর্ধ্ব অপরাধ-তরঙ্গের ভয়াবহ ঘটনা বর্ণনা করে ব্যাখ্যার চেষ্টা করল:

"নভেম্বর মাসে প্রাপ্ত, হিরোশিমা ও প্রতিবেশী অঞ্চলের অপরাধ সংখ্যা, ইতিমধ্যেই সমগ্র যুদ্ধকালের অপরাধ সংখ্যার সমান।......সংবাদপত্রগুলি প্রাক্তন সামরিক কর্তা, শাসনকর্তা, নগরকর্তা ও অফিসকর্তাদের ব্যর্থতার খবর প্রকাশ করেছে। ফলে, গতকালের নেতাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণার তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছে। আজকের অপরাধমূলক কার্যকলাপের কৈফিয়ৎ হিসেবে এই কারণ দর্শানো হয়...বলা হয়: প্রাক্তন শাসকশ্রেণী তার রাজনৈতিক ও সামরিক অধিকার তছরূপ করেছে; সুতরাং আজ আমাদের চুরি করার অধিকার।" (পৃঃ ৬৭)

এই হচ্ছে লেখকের পদ্ধতি। একই সঙ্গে পরপর দুটি অনুচ্ছেদে তিনি যথাক্রমে বাস্তব ক্ষতির তালিকা ও মানসিক ক্ষতির তালিকা পেশ করেন। দীর্ঘশ্বাস বা অভিসম্পাতের সীমা আছে। এই সর্বনাশের সমান ওজনের আবেগ প্রকাশ প্রায় অসম্ভব। তাই শ্রীযুক্ত যুক্ত একেবারে প্রায় নিরাসক্ত তথ্য-সংগ্রাহকের ভঙ্গি নিয়েছেন। ফলে একদিকে যেমন তাঁর গ্রন্থ শুধুমাত্র "মানসিক সর্বনাশের" পরিচায়ক আরো কতকগুলি জাপানি বা আমেরিকান রচনা থেকে পৃথক হয়েছে, তেমনি, অপর দিকে "বাস্তব ক্ষয়-ক্ষতির" সরকারী নিষ্প্রাণ তালিকা থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে।

আণবিক বোমা পড়বার পর ঐ অঞ্চলের প্রথম পুনর্প্রকাশিত সংবাদপত্র। ৩১ আগস্ট '৪৫

হিরোশিমা সম্পর্কে আমেরিকান আচরণ ও আমেরিকার প্রতি হিরোশিমা-বাসীর আচরণ লেখক বাস্তব নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। ৬ই আগস্টের তিনদিন পর থেকেই জাপানি ডাক্তাররা আণবিক অসুস্থতার কারণ ও চিকিৎসাপদ্ধতি নির্ণয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। চুতা তামাগোয়া, সিসি ওহাসি, হাচিয়া, মাসাও ৎসুজুকি প্রভৃতি জাপানি চিকিৎসকগণ আণবিক বোমার ফলে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মারাত্মক অসুস্থতার চিকিৎসা আবিষ্কারে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন কিন্তু সামরিক কর্তাদের নির্দেশে তাঁদের মাঝপথে থেমে যেতে হয়েছে, রিপোর্ট প্রকাশ সম্ভব হয় নি, এমন কি শবব্যবচ্ছেদের অধিকার পর্যন্ত তাঁদের দেওয়া হয় নি। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় আণবিক রশ্মির সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক মাসাও ৎসুজুকি তাঁর চিকিৎসক বন্ধুদের কাছে শরীর অভ্যন্তরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর আয়নকারী রশ্মির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে, তথাকথিত বিষ-বাষ্পের প্রভাবের উপমা ব্যবহার করেন বলে দখলকারী আমেরিকান শাসকগোষ্ঠী দ্বারা অভিযুক্ত হন এবং ১৯৪৭ সালে বরখাস্ত হন। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়: আণবিক বোমা পড়ার পরপরই জাপানি সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'দোমি'-র প্রতিনিধি কাতাসিমা তাঁর নিহত পিতামাতার অস্থিগুলি ব্যাগে পুরে ছুটে ছুটে সংবাদ সংগ্রহ করে; কোথাও কবর দেওয়ার জায়গা ছিল না, "তিনি জাপানি ডাক্তারদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসস্তূপে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন আর পিঠের ওপর বাক্সের মধ্যে তাঁর বাবা মার টুকরো টুকরো হাড় ঝন্ ঝন্ করে বাজত"—(প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, পৃঃ ৩৮)। এই নতুন অসুস্থতার সংবাদ লিসবনে পাঠাতে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে মাত্র দু-একদিন দেরি করেছিলেন বলে, পৃথিবীর কেউ কোনোদিন আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ঠিক পরবর্তী অসুস্থতা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারল না, কারণ 'দোমি' সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কাজের ওপর বিস্ফোরণের কয়েকদিনের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল বিজয়ী পক্ষের সদরদপ্তর থেকে, আর সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠানটিকে একেবারে ভেঙে দেয়া হলো। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়: দখলকারী সেনাদল হিরোশিমায় আসার আগে তাঁদের আপ্যায়নের জন্য ও তাঁদের হাত থেকে কুলবধূদের বাঁচাতে হিরোশিমার শ্মশানে বেশ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মাত্র চোদ্দ দিন যেতে না যেতেই ছোট ছোট দল দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে পাঁচশত মেয়ে সংগ্রহ করল। এদের মধ্যে খুব কম অংশ এই পেশার অন্তর্গত। অধিকাংশকেই তাঁদের

বাবা-মা বেচে দিয়েছিল। এক হিরোশিমা থেকেই আরো দুইশত মেয়ে সংগৃহীত হয়েছিল। সেই কঙ্কালাকীর্ণ ও আর্তনাদ-ছিন্ন শ্মশানে দশটি গণিকালয় স্থাপিত হলো একমাসের মধ্যে। আর যেদিন অষ্টম সেনাবাহিনীর ৩৪তম পদাতিকদল হিরোশিমায় পদার্পণ করল, গণিকালয়গুলিকে আলোক-সজ্জিত করে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়—অ্যাটমিক বোম ক্যাজুয়ালটি কমিশনের বিরুদ্ধে জাপানে এই মনোভাব গড়ে উঠেছিল যে, আণবিক বোমা ফেলে মানুষের শরীরে তার প্রতিক্রিয়া দেখে পরবর্তী যুদ্ধে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই আমেরিকানরা এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে বলেই এখানে গবেষণা আছে, চিকিৎসা নেই। এবং তারা সমবেত কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিল "আমরা গিনিপিগ হব না।" আর আমেরিকানদের আণবিক অসুস্থতার চিকিৎসার বিরুদ্ধে এই স্থির কার্যকলাপ দেখে ডাঃ বাৎস্‌মোত্তো সিদ্ধান্তে এসেছেন—"এই কমিশন কোনোপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব সৃষ্টি করতে প্রস্তুত নয়।" এই কারণেই আণবিক বোমার ফলে বিধ্বস্ত হিরোশিমা সম্পর্কে আমেরিকান সরকার কোনো সময় কোনো বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হয় নি। এবং ১৯৪৫-এর অক্টোবরে দখলকারী সেনাদলের প্রবেশের পর কেউ ভ্রমক্রমেও আমেরিকানদের দায়ী করতে সাহসী হতো না। তাই, নিহত অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিস্তম্ভে শুধু লেখা আছে "শান্তিতে বিশ্রাম করো। আর ভুল হবে না।" কিন্তু সেই স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচনের সভাতেই অনেক নিষ্ঠাবতী খ্রীষ্টান আমেরিকান মহিলা চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—"অন্তত একটি সত্য কথা বলার দিন আজ এসেছে যে, হিরোশিমায় আণবিক বোমা ফেলে আমরা অমানুষিক অপরাধ করেছি।" শুনলে আশ্চর্য হতে হয়—দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের জন্য জাপানি সরকার একটি জনশৃঙ্খলা আইন পাশ করে, কিন্তু তা প্রয়োগের অধিকার থাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের। হিরোশিমার জনদরদী মেয়র এ আইন প্রয়োগ করতে অসম্মত হন বলে দখলকারী আমেরিকান সেনাদলের প্রধান দপ্তর কুরেতে ডেকে নিয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করা হয়। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর পাঁচ বৎসরও উত্তীর্ণ হওয়ার আগে এই হিরোশিমাই কোরিয়া যুদ্ধে আমেরিকান সেনাবাহিনীর একটি প্রধান ঘাঁটিতে রূপান্তরিত। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, আজকের হিরোশিমার প্রধান আয়: আমেরিকান অস্ত্র-শস্ত্রকে জাপানি সৈন্যের উপযুক্ত করে

পরিবর্তিত করার ও আমেরিকা থেকে পাঠানো বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্রের টুকরো অংশ জোড়া লাগানোর কারখানা থেকে।

সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যুদ্ধের মনোভাব ঠিক বোঝা গেল না। বার তিনেক তিনি অর্ধ-স্পষ্টভাবে সোভিয়েত রাশিয়াকেও বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠী রূপেই বর্ণনা করতে চেয়েছেন। যুদ্ধোত্তর জাপানে শ্রমিক আন্দোলন সুরু করেছিল কম্যুনিস্ট পার্টি, সারা পৃথিবীতে যে-শান্তি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে তার প্রধান সমর্থক সোভিয়েত রাশিয়া—এ-সব কথা সত্যসন্ধ ঐতিহাসিকের মতো স্বীকার করেও, এমন কি পৃথিবীর প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ সাহায্য ভাণ্ডার যে গড়ে উঠেছিল সোভিয়েত রাশিয়ারই চেষ্টায় ও নেতৃত্বে—একথা স্পষ্টভাবে বলেও সম্ভবত সকল শ্রেণীর ও মতের বিবেকবান মানুষের কাছে নিজের বক্তব্য পৌঁছে দিতেই নিজেকে সকল দলমতের ঊর্ধ্বে মানবতাবাদী বলে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয়েছে। শ্রীযুক্ত যুদ্ধ সত্যই মানবতাবাদী। তাই তিনি সোভিয়েত রাশিয়া সম্বন্ধে নীরবতা, ও বারকয়েক অস্পষ্টভাবে দোষারোপ—এ-ছাড়া কিছু করেন নি। এতে অবিশ্যি আমি তত দোষ দেখি না। কারণ এ বই সেই যুদ্ধবিরোধী শান্তির কথা বলে, যার আহ্বান প্রথম জানিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া। নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও বৃহত্তর সুখশান্তি একমাত্র কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রই চাইতে পারে। খানিকটা অকারণ নিন্দা আছে জেনেও যে-কোনো কম্যুনিস্ট এ বইকে অভিনন্দিত করবেন এই কারণে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জঘন্যতম অপরাধের কাহিনী এখানে বিবৃত হয়েছে।

তবে মতাদর্শের দিক থেকে শ্রীযুক্ত যুদ্ধ ব্যক্তিবাদী। তাঁর বই উৎসর্গ করা হয়েছে মানবিকতাবাদী ব্যক্তিগণকে। তাঁর গ্রন্থের অনেক চরিত্র, পৃথক পৃথকভাবে ও স্ব স্ব পথে এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। এবং ব্যক্তিগত প্রায়শ্চিত্তই যে পাপস্খালনের একমাত্র পথ এমন ইঙ্গিতও অনেকবার আছে। হিরোশিমার নতুন নগরপাল সিঙ্কো হামাই, আণবিক বিস্ফোরণের পর হিরোশিমায় এসে আণবিক ধ্বংসের নজির সংগ্রাহক ও বর্তমানে আণবিক যাদুঘরের অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ শোগো নাগাওকা, আমেরিকার নর্মান কাজিন্‌স্, আমেরিকার কতিপয় ডাক্তার যাঁরা আমেরিকান নির্দেশ অমান্য করে জাপানি মেয়ে বিয়ে করে জাপানেই থেকে গেছেন—এঁদের প্রত্যেকে নিজস্ব পথে, নিজস্ব শক্তিতে হিরোশিমার পুনর্জন্ম সাধন করেছেন।

সর্বোপরি আছে ইকিরো কোয়ামোতো, টকি উয়েমাৎসু, কাজুয়ো এম…।

এঁরা এই বইয়ের নায়ক নায়িকা। কোয়ামোতো সেই ব্যক্তি যে আণবিক বিস্ফোরণের পর পাপবোধের তাড়নায় নিজের দেহমনপ্রাণ সমর্পণ করেছিল আর্তের সেবায়, যে একটি অনাথ শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ বা একটি রোগার্ত মানুষের সঙ্গে গল্প করার সময়ের জন্য যুদ্ধোত্তর বেকার-সমস্যা-কাতর জাপানেও নিশ্চিত স্থায়ী চাকরি ছেড়ে দেয়—এবং যে হিরোশিমায় প্রথম একটি মেয়েকে, দেহের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকে, ভালোবাসল। এই শ্মশানের মধ্যে কোয়ামোতো ও উয়েমাৎসুর ভালোবাসার কাহিনী যে বাস্তবনিষ্ঠা ও মানবিকতা নিয়ে লেখক বর্ণনা করেছেন, তাতে সত্যি সত্যি মাঝেমাঝে শিহরিত হতে হয়। তারপর, বিয়ের সময়েও যখন তারা প্রতিজ্ঞা করে—আমরা কোনো ছেলেমেয়ের জনক-জননী হব না, যদি তারা আণবিক রোগগ্রস্ত হয়ে জন্মায় —তখন হিরোশিমার সঙ্কট মানবতার সঙ্কটে রূপান্তরিত হবে।

কাজুয়ো এম···সেই ব্যক্তি যে আণবিক বিস্ফোরণের পর সনাতন মূল্যবোধ নিয়ে ধ্বংসের বিরুদ্ধে বাঁচতে চেয়েছে, কিন্তু জাপানের সামগ্রিক অধঃপতন তাকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার চেষ্টায় প্রবৃত্ত করাল। সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর হত্যা-প্রবৃত্তি তার মধ্যে এত গভীরে প্রবেশ করল, যে, পটাশিয়াম সায়ানাইড ব্যবহার করে একেবারে নাবালক কিশোর অনভিজ্ঞ হত্যাকারীর মতো চারটি লোককে হত্যা করে বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল "আমি মৃত্যুদণ্ড চাই।"

কোয়ামোতো, উয়েমাৎসু ও কাজুয়ো এম-এর চরিত্র রূপদী উপন্যাসের চরিত্রের মতো করে লেখক সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এর একটিও যে তাঁর 'সৃষ্টি' নয় তার নজির হিসেবে কারাগারের দেয়ালে আঁকা কাজুয়ো এম-এর একটি অসাধারণ আত্মপ্রতিকৃতির প্রতিলিপি দিয়েছেন। স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই এই গ্রন্থ দলিল যারা প্রমাণসাপেক্ষ ঘটনা ও মহৎ শিল্পবিষয়কে একই সঙ্গে প্রকাশিত করে অত্যন্ত বড় কীর্তি স্থাপন করেছে।

পরিশেষে বলা হয়েছে: এই গ্রন্থের লেখকও হিটলারের জেলে জীবনের মূল্যবান অনেকগুলি বছর খুইয়েছেন। তাই তিনিও নিজে 'Survivor' হিসেবে আহ্বান জানিয়েছেন: "···I know that we, the generation of those who 'got through', must devote our entire strength to ensuring that our children do not merely survive, as fortuitously as we did...only : this must be his most serious and even sacred task."

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান। বিমানবিহারী মজুমদার। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ছয় টাকা।

সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সঙ্গে শিল্পীদের সম্পর্ক সাহিত্যজিজ্ঞাসুদের আগ্রহের বিষয়। কিন্তু, কবিত্বের দুর্মর প্রেরণায়ই শিল্পী ঐতিহ্যের ধারায় তাঁর কবি-স্বভাবের স্বকীয়তাই কেমনভাবে পুষ্ট করে তোলেন, সে বিষয়ে সচেতন না থাকলে ঐ সম্বন্ধ-বিচার ঋণগ্রহণের ফিরিস্তিতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, গবেষক পণ্ডিতদের কৃপায় বোকাচ্চিওর কাছে চসরের কাহিনীগত ঋণের বহর আমরা জেনেছি। কিন্তু সে জ্ঞানে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের ইংরেজ কবির শিল্পমাহাত্ম্য বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র সুবিধে হয় না। কাব্যের সৃষ্টিময়তায়ই ঐতিহ্যের যা কিছু তাৎপর্য লক্ষণীয়; ভাবাভঙ্গি, ছন্দ, অলঙ্কার, পংক্তিগত খুচরো মিল, অথবা কবিকর্মের বিচার ছেড়ে বিশুদ্ধ ভাবগত সাদৃশ্য সন্ধানে নয়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ শিল্পীর ক্ষেত্রে এ ধরনের সরলীকরণ অত্যন্ত বিপজ্জনক: রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের কবি নিশ্চয়ই, কিন্তু সরল বিশ্বাসের নিরঙ্কুশতায়, ব্রাহ্মণদক্ষিণার মতো তিনি এ দেশকে পাননি, নিজস্ব কবিস্বভাবের দ্বন্দ্বময় প্রক্রিয়ায়ই তাঁকে ভারতবর্ষ গড়তে হয়েছে।

দুর্ভাগ্যত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তো আমাদের কাছে অনেকটা পরিমাণেই একাকার জড়পিণ্ডবিশেষ, আর আমরা যখন তার চর্চায় উৎসাহী হই, তখন তাকে মন্ত্রপূত, ফেটিশ্ করে তুলি মাত্র। তাই তথ্য কিংবা তত্ত্বগত বিচারের ঐতিহাসিক আড়ম্বর বা দার্শনিক বিজ্ঞতা এখানে সহজেই শিল্পকর্মের মূল্যায়নের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। বিদেশের সাহিত্যরসিক পণ্ডিতেরা যখন প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তখন তাতে আমাদের কবিতার বোধ বিস্তৃত হয় বলেই জ্ঞানের দিকটিও যথার্থ গভীর হয়, কুরটিউস বা ক্ল্যুনর সাহেবদের ইওরোপের মধ্যযুগীয় সাহিত্যালোচনায় আমরা এভাবেই উপকৃত হই।

বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান' বইটিতে ঐ বিভ্রান্তির বিড়ম্বনায় রবীন্দ্রনাথের

শিল্পকর্মের প্রতি স্পষ্টতই অবিচার করেছেন দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের বিকাশে তাঁর বৈষ্ণবপদাবলীর চর্চা কতটা তাৎপর্যপূর্ণ, সে সাহিত্যজিজ্ঞাসার পটে তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর মূল্য নিরূপণ করেন নি, বাহ্যিক সাদৃশ্য উদ্ধারেই তাঁর বিশ্লেষণকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অন্যপক্ষে, পদাবলী সাহিত্যকে শিল্পকর্ম হিসেবে না দেখে একটি বিশিষ্ট ধর্মসাধনার অংশরূপে গ্রহণের মনোভাবই প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছেন এবং বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকৃত পদাবলীর ব্যাখ্যায় ও অন্যত্র সে ধর্মসাধনার বিধি যে কিভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে, সে বিষয়ে প্রতিপদে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ভোলেন নি।

বইটির প্রথম দিকেই, চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের ঐক্য প্রতিষ্ঠাকামী চেষ্টায় রুষ্ট একদল লোক কলসীর কানা ছুঁড়ে মেরে তাঁর ক্ষতি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র'-র সে উক্তিটি তুলে সমালোচক মন্তব্য করেন: "কবি পদাবলীসাহিত্য যেমন যত্নের সহিত পড়িয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের জীবনী গ্রন্থগুলি তেমন ভাল করিয়া পড়েন নাই। পড়িলে, নিত্যানন্দের মারখাওয়ার কথা শ্রীচৈতন্যে আরোপ করিতেন না।" রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মর্মানুসন্ধানের সূত্রে বৈষ্ণবপদাবলীর ঐতিহ্য বিশ্লেষণের বদলে বহিরঙ্গ তথ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার দরুণ কবির নিতান্তই আলঙ্কারিক উক্তিটি তাঁর কাছে এমন বিচ্ছিন্ন, তাৎপর্য-হীন গুরুত্ব পায়। কিছু পরেই লেখক বলেন, কবি বৈষ্ণবদর্শন, জীবনচরিত বা প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা জাতীয় উপাসনাগ্রন্থের মতবাদ মেনে নিতে পারেন নি। 'পদাবলীর মাধুর্যবিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে কবির পদাবলী ব্যাখ্যায় চমৎকারিত্ব স্বীকার করেও তাঁর বৈষ্ণবধর্মবিধি লঙ্ঘনের প্রতিটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে লেখক উৎসুক। জ্ঞানদাসের পদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এই উক্তিটি পাই: "জ্ঞানদাসের পদের মধ্যে এ ধরনের কোন কথা যে আছে তাহা সাধারণ পাঠকের চোখে পড়ে না" এবং এ ব্যাখ্যা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রবর্তিত ভজনপ্রণালীর বিরোধী। "তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি" বলরাম দাসের এই পদটির রবীন্দ্রনাথকৃত বিশ্লেষণকে "অচিন্তিত-পূর্ব ব্যাখ্যা" আখ্যা দিয়ে বিমানবাবু বলেছেন যে অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাখ্যাও নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবেরা মেনে নিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী'র পদবিন্যাসরীতি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য এই:

গৌরাঙ্গলীলাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা পদাবলীর আধ্যাত্মিক রহস্যের চাবিকাঠি বলে মনে করেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে লীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বাসুদেব ঘোষের একটি পদকেও স্থান দেন নি। 'পদরত্নাবলী'র পদসন্নিবেশের মাধুর্য থাকলেও দু-একটি জায়গায় লীলার বিধিসম্মত পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয় নি। খণ্ডিতা ও কলহান্তরিতার পদ রবীন্দ্রনাথ ধরেন নি, কারণ, "শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র পছন্দ করিতে পারেন নাই।" রবীন্দ্রনাথের 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রবন্ধটির ত্রুটি সন্ধানই সব থেকে বিস্ময়কর: "রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতিকে সুখের কবি বলিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে বিদ্যাপতি বুঝি তাঁহার অল্প বয়সেই সকল পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—"বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডিদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।" কিন্তু এখন তাঁহার ভণিতাংশে মিথিলার রাজা ও রাজপুরুষদের উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে যে তিনি রবীন্দ্রনাথেরই ন্যায় সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন।" বিদ্যাপতির পদাবলীতে রাধার যৌবনবিলাস যে ভাবে ফুটেছে, তা-ই রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন, কবির বয়স নিয়ে কোথাও মাথা ঘামান নি। ওটা বিদ্যাপতির নিজস্ব কবিস্বভাবের প্রবণতার বিষয়, তাঁর বয়সের ব্যাপার নয়।

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবপদাবলীকে শুধু সাহিত্যের দিক থেকেই গ্রহণ লেখক নিজেই যখন বহুবার উল্লেখ করেছেন, তখন বৈষ্ণবধর্মমতের সঙ্গে কবির বিরোধ প্রদর্শনে এই প্রযত্ন অস্বস্তিকর লাগে। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবেরা রবীন্দ্রনাথের পদাবলীর ব্যাখ্যা মানতে পারেন কি পারেন না, সে প্রশ্ন কি তাঁর সাহিত্যিক মূল্যবোধ এবং সৃষ্টির ক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক? রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বৈষ্ণবপদাবলীর চর্চা যে লেখকের বিশেষ মনঃপূত হয় নি, সামান্য একটু সতর্ক পাঠকের কাছেই সেটা ধরা না পড়ে পারে না। অন্য কোনও কারণে নয়, রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই 'পদকল্পতরু'র প্রাণহীন কনভেনশন মানেন নি, এবং ঐ কনভেনশন পাকাপোক্ত হওয়ার আগেই যা কিছু শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপদাবলী রচিত হয়ে গিয়েছিল। অজস্র অক্ষম, অনুকরণসর্বস্ব আলঙ্কারিক পদের তুচ্ছতার মাঝখানে মানবিকরসসমৃদ্ধ যে সমস্ত বৈষ্ণবপদ মেলে তাদের আশ্চর্য প্রাণময়তায় বৃন্দাবনের গোস্বামীবৃন্দ ও অন্যান্য বৈষ্ণব পণ্ডিতদের রসতত্ত্ব অপেক্ষা বোধহয় চৈতন্যদেবের জীবনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষপ্রেরণা এবং 'সদুক্তি কর্ণামৃত', 'অমরুশতক', 'প্রাকৃতপৈঙ্গল', 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়',

'গাহাসত্তসঈ' প্রভৃতিতে সঙ্কলিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত-অপভ্রংশ প্রেমকবিতার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাব অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাব্যের যোগ যখন প্রত্যক্ষ থাকে, তখনও শিল্পের ক্ষেত্রে কবিকে কোনও-ক্রমেই তথাকথিত নৈষ্ঠিক ধর্মসাধক হলে চলে না। সেন্ট টমাস একুইনাসের কাছে দান্তের 'ঋণ' উল্লেখযোগ্য হলেও তাঁর কাব্য ঐ খ্রীষ্টীয় সন্তের তত্ত্বের নিখুঁত ছাঁচে ঢালাই জিনিস নয়, নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানেরা সেজন্য ক্ষুব্ধ হলেও কাব্যপাঠকদের অশান্তির কোনও কারণ ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈষ্ণব কবিতায় লেখকের ধারণামতো বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে তাঁর বিরোধকে প্রকাশ করেন নি, শিল্পের ঐ সত্যকেই রূপায়িত করেছেন।

আসলে বিমানবাবু ব্যক্তিগত পক্ষপাত ছাড়া আলোচনার কোনো নিরিখই স্থির করতে পারেন নি বলে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্যহীনতার পরিচয় সুস্পষ্ট। কোনও নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ এবং তৎসঞ্জাত সুশৃংখল বিচারবিশ্লেষণের পদ্ধতির অভাবে আমাদের অ্যাকাডেমিক সাহিত্যালোচনা যে কত বিশৃংখল হতে পারে, 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান'-এ তার অনেক প্রমাণই মেলে।

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে পদাবলীর স্থান নির্ণয়ে লেখক বলেন, কবি প্রথমে বৈষ্ণব পদাবলীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনুকরণ করেন, পরের ধাপে পদাবলীর অনুসরণে বহু কবিতা-গান রচিত হয়, তৃতীয় স্তরে এই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত কান্তভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু কবিতা-গান সৃষ্টি করেন, তারপরেই তাঁর রচনায় পদাবলীর বিকীয়মান প্রভাব লক্ষণীয়। অনুকরণের প্রথম পর্ব, অর্থাৎ 'পদকর্তা রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়টির উপজীব্য 'ভানু সিংহের পদাবলী': রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পকর্মের বিচারে তুচ্ছ এই রচনাটির জন্যেই প্রায় তের পাতা ব্যয় করতে হয়েছে। প্রথম দিকে সমালোচক আমাদের জানান, 'ভানুসিংহের পদাবলী'র অন্তর্গত একটি পদে ভানুসিংহ রাধাকে অভিসার থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য যেভাবে নিষেধ করেন, কোনও বৈষ্ণব-কবির পক্ষে তা অকল্পনীয়। বিশুদ্ধ কাব্যরসের দিক দিয়ে 'ভানুসিংহের পদাবলী'র শেষ দুটিকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পদ বলেছেন বিচারবিশ্লেষণ ছাড়াই, আবার একই সঙ্গে রাধিকার ভাববিশ্লেষণে ষোড়শ সংখ্যক পদটিকে পদাবলী সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর রুচিগত ঝোঁক যে কোন্ দিকে, তার আর একটি ইঙ্গিত অনুধাবনীয়। ষোড়শ সংখ্যক-

পদটি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের পর তিনি লেখেন : "এখন প্রশ্ন হইতেছে যে যে-গ্রন্থে এমন সুন্দর পদ আছে তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে এত সংকোচ বোধ করিয়াছেন কেন? তাহার কারণ তিনি বৈষ্ণব সাধনাকে, রাধাকৃষ্ণের যুগল মধুর রসের উপাসনাকে নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারেন নাই।" তাহলে নিছক অনুকরণেই রাধিকার ভাববিশ্লেষণের অমূল্য পদরচনা সম্ভব? এর আগেও তো কবির কুণ্ঠার কারণের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : "তিনি পদাবলীর ভাষা ও আঙ্গিককে নকল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবীয় ভাবানুভূতিকে নিজের সাধনার দ্বারা আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই।"

'ভগ্নহৃদয়'-এ রবীন্দ্রনাথ পদাবলীর উপজীব্য পরকীয়া প্রেমের মর্মকথাই চপলার মুখে বসিয়েছেন এবং এই কাব্যের নলিনীর একটি উক্তি গোবিন্দদাসের পদানুসরণেই রচিত, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র "রিম্‌ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে" গানটি জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের বর্ষার পদের অনুসরণের ফল, রবীন্দ্রনাথ 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট'-এর বসন্ত রায়ের মুখে খণ্ডিতার পদ দিয়েছেন এবং 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এ কৃষকদের কণ্ঠে গোষ্ঠের গান লাগিয়েছেন, 'কড়ি ও কোমল'-এর কয়েকটি কবিতায় পদাবলীসুলভ বাঁশি বাজানো ও বাঁশির সুর শ্রবণজাত আকুলতা প্রকাশিত, পদাবলীর বিরহ কবিতার সঙ্গে 'মায়ার খেলা'র বিরহ বেদনার মিল, 'মানসী'র 'একাল ও সেকাল'-এ মানুষের মনে বৃন্দাবনলীলার মায়ার প্রভাব প্রদর্শন, 'রাজা ও রাণী' নাটকে ইলার সখীদের ("ঐ বুঝি বাঁশি বাজে") পদাবলীর ভাষায় গান, 'কল্পনা'র 'স্পর্দ্ধা' কবিতার সঙ্গে "শ্রীরাধার রসোদ্গারের পদাবলীর কিছু সাদৃশ্য," জীবন দেবতাকে প্রথমে প্রিয়া রূপে উপলব্ধি করলেও শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব সাধকের মতো কবির নিজেকেই তার প্রেম পাত্রী রূপে দেখা—প্রাক্-'গীতাঞ্জলি' যুগের কাব্যে যান্ত্রিকভাবে পদাবলীর প্রভাবের এই যে সমস্ত দৃষ্টান্ত লেখক (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের গৌণ কবিতাগুলিতে) প্রদর্শন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের জটিল বিকাশের সমগ্রতা বুঝতে তা আমাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না, অর্থাৎ এই "প্রভাবের" স্বরূপ নির্ণয়ের কোনও দায়িত্বই তিনি গ্রহণ করেন নি।

এই ধরনের বিচ্ছিন্ন প্রভাব অন্বেষণের আগ্রহাতিশয্যে আক্ষরিক অর্থের ওপর নির্ভর করে পণ্ডিতব্যক্তিরাও মাঝে মাঝে বিচারবিভ্রাটে আমাদের সত্যি বিমূঢ় করে তোলেন। 'প্রাক্-গীতাঞ্জলি যুগের কাব্যে পদাবলীর প্রভাব'

অংশে লেখক 'কণিকা'র 'অজ্ঞাত'র কবিতার ব্যাখ্যায় বলেছেন: কবি এখানে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সাধকের মতো প্রার্থনা করছেন যেন পরজন্মে তিনি ব্রজের রাখাল বালক হতে পারেন। এই কি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবের নমুনা? রবীন্দ্রনাথের এই লঘু চালের কবিতায় ঈসথেটিক সংবেদ্যতা, সৌন্দর্য রুচির-প্রয়োজনেই বৈষ্ণবপদাবলীর চিত্রগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, বৈষ্ণব সাধকের প্রার্থনার সঙ্গে তার ক্ষীণতম সাদৃশ্যও নেই। রাখাল বাঁশি ইত্যাদি শব্দ পেলেই সমালোচক বৈষ্ণব প্রভাব খোঁজেন। 'পদাবলীর বিলীয়মান প্রভাব' অংশে আছে: 'পূরবী'র তপোভঙ্গ-কবিতায় "কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে" এই অংশটি কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার অনুসরণে রচিত। প্রভাবসন্ধানী পাণ্ডিত্যের পরিবর্তে আলোচ্য কবিতাটিকে কবিতা হিসেবে পড়লেই যে কোনও পাঠক বোঝেন যে মহাদেবের রুদ্ররূপের সৃষ্টিময়তায় যে প্রতীকী বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিকে বেঁধেছেন, তাতে কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা আসার সুদূরতম সম্ভাবনাও ছিল না। 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর মুখের "ভালোবাসি ভালোবাসি / এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি" এই গানে শুধু বাঁশি শব্দটির সূত্রেই বৈষ্ণব প্রভাবানুসন্ধানও কম বিচিত্র নয়।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদারের মতে, 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি' রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম উপলব্ধির স্বর্ণময় যুগ এবং এর পেছনে আছে পদাবলীর কান্তভাবের অনুপ্রেরণা। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের পটে 'গীতাঞ্জলি'র সাহিত্যিক নির্ধারণের প্রশ্নটি ছেড়ে দিয়ে নিছক প্রভাবের দিকটি ধরতে গেলেও আমাদের সংশয় ঘোচে না। বৈষ্ণব পদাবলীর ভিত্তি বৈষ্ণবধর্ম-সাধনার সঙ্গে যে কবির বিরোধ সমালোচক একবার উল্লেখ করেছেন, নিজের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সঙ্গে বৈষ্ণবীয় মাধুর্যরস মেলাতে পারেন নি বলেছেন, সেই কবির ধ্যানে কান্তভাবের প্রভাব যে কি ভাবে পড়তে পারে বোঝা সত্যি কঠিন। 'গীতাঞ্জলি'-'গীতালি'র মাহাত্ম্য যতই থাকুক, তাঁর শেষ বিচারে—"গীতাঞ্জলি-গীতালির কবিকে বৈষ্ণব বলা চলে না।" গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধ্যসাধনের নিক্তিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে ওজন করলে হয়তো তা "অনেক পরিমাণে হাল্কা" বোধ হতে পারে, কিন্তু আধুনিক মানুষের কঠোর জীবনসংগ্রামের মধ্যে 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি' এমন এক "স্বর্গীয় সুধা" পরিবেশন করে যা পান করলে দিব্যানুভূতির শক্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়।

'পদাবলীর বিলীয়মান প্রভাব' অংশের একটি উক্তি চূড়ান্ত বিচারহীন

প্রগল্‌ভতায় একেবারে মারাত্মক। সমালোচক 'চতুরঙ্গ'-এ শ্রীবিলাসকে দামিনীর বরণের তাৎপর্য অনুধাবনের কিছুমাত্র চেষ্টা না করেই অবলীলাক্রমে মন্তব্য করেন: "দামিনী শচীশের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাইবে না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া নিজেকে প্রলোভনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য শ্রীবিলাসকে বিবাহ করিল। এখানে পদাবলী সাহিত্যের পরকীয়া প্রেমের যেন ডিগ্‌বাজি খাওয়ান হইল। রাধা বিবাহিতা বটে কিন্তু তাঁহার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কোন দৈহিক বা মানসিক সম্বন্ধ নাই; গোবিন্দদাসের মতে তিনি গৃহপতি মাত্র, প্রাণপতি নহেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ সাতাশ বৎসরে লিখিত অনেকগুলি গল্পে ও উপন্যাসে দেখাইয়াছেন যে নারী প্রাণ দিয়া একজনকে ভালবাসে, কিন্তু বিবাহ করে অন্যকে। রাধাকে অল্প বয়সে আত্মীয়স্বজন বিবাহ দিয়াছিল, বিবাহ ব্যাপারে তাঁহার কোন মতামত ছিল না। আর চতুরঙ্গের দামিনী, শেষের কবিতার লাবণ্য, বাঁশরীর সুষমা প্রভৃতি একজনের সঙ্গে প্রেম করিয়া অন্যকে বিবাহ করে। এ যেন পরকীয়া প্রেমের প্যারডি।"

এবম্বিধ বিচারবোধে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার শেষ ভাগে পদাবলীর বিলীয়মান প্রভাবের কারণ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা যে উপেক্ষিত হবে তা সহজেই বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত কবির ওপর উপনিষদের প্রভাব, বোদ্‌লেয়ার প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য কবিদের প্রভাব ইত্যাদি জাতীয় প্রবন্ধাদিতে চিন্তার যে অসংযম ও দায়িত্বহীনতা লক্ষ্য করা গেছে, শ্রীবিমানবিহারী মজুমদারের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাবমূলক সম্পর্ক বিষয়ক রচনাটি তা থেকে মুক্ত নয়। তাঁর মতো প্রবীণ বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকে এই হিড়িকে আমরা কিছুটা স্থৈর্যই আশা করেছিলাম।

বইটিতে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' সংযোজিত হয়েছে, এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বাল্মিকী রামায়ণ। আশালতা সেন। প্রাপ্তিস্থান: সজনী। তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

শ্রীযুক্তা আশালতা সেন বিরচিত, শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রকাশিত 'বাল্মীকি রামায়ণ', যুদ্ধকাণ্ড, সারাংশের পদ্যানুবাদ পড়িলাম। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভালো, দামও জনসাধারণের পক্ষে সুলভই বলিতে হইবে।

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ'-এর অনুবাদ আংশিক ও পূর্ণাঙ্গ গদ্যে ও পদ্যে এতাবৎকাল অনেকগুলিই আছে। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' ভারতীয় মানসের গঠনোপাদানের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিলে অধিক বলা হয় না। সেই মহাগ্রন্থের জনপ্রিয় পদ্যানুবাদ বাঙলাতেও আছে, হিন্দীতেও আছে। এখনও বাঙলার ঘরে ঘরে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' পয়ার ছন্দে পঠিত ও শ্রুত হইয়া থাকে। মুসলমান আমলেও তাহার সমাদর কম ছিল না। বহু প্রাচীন কাল হইতেই বাঙলাদেশে রামায়ণের অনুবাদ ইতিহাস পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্তা আশালতা সেনও পূর্বোক্ত ধারার অনুসরণ করিয়া এই নূতন প্রচেষ্টা করার জন্ম আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

লেখিকা সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞা, এজন্ম তাঁহার অনুবাদ প্রায়শই মূলের সংস্কৃতানুগ। ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ করিলেও লেখিকা দীর্ঘমাত্রা ও ছন্দে স্বকীয় একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাতে এই পদ্যানুবাদ বিশিষ্টরূপে মূলরচনার মতোই প্রতিভাত হইতেছে। কদাচিৎ মূলানুগ অনুবাদ হয় নাই এমনও পরিলক্ষিত হয়—সেখানে মাত্র ভাবানুসরণ বা ছায়ানুবাদ করা হইয়াছে। এবিষয়ে আদিকাণ্ড, ১ম সর্গ শ্লোক ৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। এরূপ কয়েকস্থলে আছে। সম্ভবত তাহা অনুবাদের সৌকর্যরক্ষার্থ অপরিহার্য বোধেই করা হইয়াছে।

বইখানিতে একটু নূতনত্ব আছে। 'বাল্মীকি রামায়ণ'-এর বিশালতা পরিহার করিয়াও লেখিকা উক্ত গ্রন্থের সমগ্রতা তাঁহার অনুবাদের মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন; আদিকাণ্ডের প্রায় সমস্তটা মূল ও তাহার অনুবাদের মাধ্যমে, প্রস্তাবনারূপেই বাল্মীকি 'রামায়ণ'-এর মূল ঘটনার বিন্যাস করা হইয়াছে; আর, তাহার পরে যুদ্ধকাণ্ডের স্থান; যুদ্ধকাণ্ডের কিয়দংশের মূল এবং সমস্তটির অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। সমগ্রতার প্রয়োজনেই হয়তো এরূপ বিন্যাস লেখিকা সুচিন্তিতভাবে করিয়াছেন। তবুও মনে হয় অংশত মূল এবং কিছুটা অনুবাদ এই ভাবে নির্বাচন না করিলে হয়তো গ্রন্থের উৎকর্ষ আরো বাড়িত। অবশ্য গ্রন্থের কলেবর তাহাতে বাড়িত সন্দেহ নাই। কোথাও কোথাও মূল আছে আবার সর্বত্র নাই এরূপ প্রণালী অনুসরণ করায় বুদ্ধি বা চিন্তার মধ্যে একটু অসুবিধা ঘটে। এজন্ম, লেখিকার কাছে অনুরোধ করি, পরবর্তী সংস্করণে তিনি যেন সমগ্র মূল ও তাহার অনুবাদ দেন, নতুবা মূল একেবারে বর্জন করেন। দুই পদ্ধতির যে কোনও একটি রাখিলে তাঁহার গ্রন্থের সমাদর বাড়িবে বই কমিবে না।

অরুণা হালদার

নীলনদের তীরে লেখক সম্মেলন

কায়রোতে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়ে গেল ফেব্রুয়ারি মাসে। ভারতবর্ষের লেখকদের নেতৃত্ব করেছেন ডঃ মুল্‌করাজ আনন্দ। বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রথম আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল তাশখন্দে, দু বছর আগে। সেখানে ভারতীয় লেখক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন বাংলাদেশের সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য তাশখন্দ সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছিল বলে শোনা গিয়েছিল। সম্মেলনে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী প্রস্তাবের খসড়ায় নিরপেক্ষ ভারতের প্রতিনিধিদলের নেতা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের গন্ধ পেয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক অত্যাচারে ধর্ষিত এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের প্রতিনিধিরা ভারতের এই বিস্ময়কর নিরপেক্ষতায় সেদিন অবাক হয়েছিলেন। সাহিত্যে রাজনীতিকে যাঁরা এড়িয়ে চলেন কার্যকারণে তাঁরাই রাজনীতি আমদানি করেন এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। কায়রো সম্মেলনে ভারতীয় লেখক প্রতিনিধিদলের নেতা ডঃ মুল্‌করাজ আনন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসনক্লিষ্ট মানুষের মুক্তির সপক্ষে রয়েছে ভারতের লেখকগোষ্ঠী। এ বিষয়ে নিরপেক্ষতার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ন্যায়বিচার ও অন্যায় নিপীড়নের মধ্যে লেখকরা নিশ্চয়ই ন্যায়ের পক্ষে "কমিটেড"। সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে বিশ্বশান্তি সংসদকে অভিনন্দন জানিয়ে বাণী পাঠানো হয়। এশিয়া ও আফ্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে আফ্রো-এশীয় সংহতি কমিটি এবং আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন। বিরুদ্ধবাদীরা এই সম্মেলনকে রাজনীতির মঞ্চ বলে নিজেরাই কুটিল রাজনৈতিক চক্রান্তের সুড়ঙ্গপথে বিচরণ করবেন। কিন্তু দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিক মানবমৈত্রী সচেতন এবং মরমী শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে আজকের যুগে একটি জরুরি কর্তব্য। এই দায়িত্ব লেখকের স্বাধীন অস্তিত্বের পক্ষেও আজ অপরিহার্য। কায়রোর এই সম্মেলন এশিয়া ও আফ্রিকার লেখক শিল্পীদের সেই মহান

দায়িত্ব পালনের পথ প্রদর্শন করল। ঔপনিবেশিক শাসনে ক্লিষ্ট দেশগুলির মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করবার জন্য শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্যবাদীরা যে অপচেষ্টা চালিয়েছে তার অশুভ প্রতিক্রিয়া থেকে নিজের ভাষা ও শিল্পকে উদ্ধার করবার জরুরি কর্তব্যকর্মে লেখক ও শিল্পীদের আত্মনিয়োগের আহ্বান এই যুগের। আফ্রিকার মানুষের নিজস্ব ভাষাকে সাম্রাজ্যবাদীরা লুপ্ত করে দিয়েছিল; দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বহু জাতির নিজস্ব ভাষাকে বর্বর সাম্রাজ্যবাদীরা প্রায় উপভাষায় পরিণত করে তাদের জায়গায় বিদেশীভাষাকে দিয়েছিল আধিপত্য। আফ্রিকার সোয়াহিলি ভাষার অস্তিত্বই বিপন্ন। আলজিরিয়ায় ফরাসীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যন্ত আরবীভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। জাতির প্রাণসত্তাকে নষ্ট করবার এই চক্রান্তের বিরুদ্ধেই আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা, জাতীয় স্বাধীনতা ও মানবমুক্তির উজ্জ্বল পবিত্র লক্ষ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত না হওয়ার সঙ্কল্প নিয়েই দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন কায়রোতে সমাপ্ত হয়েছে।

নাজিম হিকমেত : ৬০তম জন্মদিন

তুরস্কের বিপ্লবী কবি, বিশ্বশান্তির অক্লান্ত যোদ্ধা, মায়াকভস্কির বন্ধু নাজিম হিকমেত ষাট বৎসরে পা দিলেন জানুয়ারি মাসে। বাংলাদেশের মানুষ হিকমেতের কবিতার সঙ্গে পরিচিত। এগারো বছর আগে তিনি নিজের দেশের ফ্যাসিস্তদের কারাগার থেকে দীর্ঘ দণ্ডভোগের পর মুক্তি পেয়ে অসম সাহসিকতায়, নিজের জীবন বিপন্ন করে, সমুদ্রে নৌকো ভাসিয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক দেশের উদ্দেশ্যে। সমুদ্রগামী একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের মালবাহী জাহাজ সেই নির্ভীক যোদ্ধাকে সমুদ্রবক্ষ থেকে সাদরে তুলে নেন। হিকমেতের এই চাঞ্চল্যকর মুক্তি সেদিন বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করেছিল। হিকমেত সারা দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের ভালোবাসার ধন। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সেই তুরস্কের প্রতিক্রিয়াশীলদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। মস্কোর প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে এসে যোগ দিলেন হিকমেত। তাঁর প্রথম নাটক '২৮শে জানুয়ারি' অভিনীত হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দিয়ে। এ সময়েই তিনি মায়াকভস্কির সংস্পর্শে আসেন। দুই

বিপ্লবী কবির মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় তখন থেকেই। কুড়ির দশকে সাম্রাজ্যবাদের দালালরা যখন তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন তিনি আবার নির্বাসন নিলেন ইওরোপের দেশে দেশে, সোভিয়েত ইউনিয়নে। তুর্কী ভাষায় তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হলো বাকু থেকে। ১৯২৮ সাল স্বদেশে ফিরবার অনুমতি পেলেন তিনি। কিন্তু জাহাজ থেকে মাটিতে পা দেবার আগেই হিকমেতকে গ্রেপ্তার করা হলো। কিন্তু গণদাবিতে ভীত তুর্কী প্রতিক্রিয়াশীল সরকার সাধারণ মানুষের কবি নাজিম হিকমেতকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। হিকমেত এবার তাঁর অগ্নিবীণায় সুর চড়ালেন। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। বিদ্রোহের উস্কানি দেবার অভিযোগে হিকমেতকে সামরিক আদালতের সম্মুখীন করা হলো। ইতিমধ্যে তুরস্কের সঙ্গে হিটলারের জর্মনীর দোস্তি হয়েছে। গোপন বিচারে হিকমেতের কারাদণ্ড হলো আঠাশ বছর। তিনি লিখলেন :

"This time it was rather long
But life, my beloved,
Is a chain heavy with promises."

কারান্তরালে নিপীড়নের ফলে রোগাক্রান্ত কবিকে স্থানান্তরিত করা হলো হাসপাতালে। বিশ্বব্যাপী লেখক ও সংস্কৃতিবিদরা হিকমেতের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুললেন। ১৯৫১ সালে হিকমেত মুক্তি পেলেন এবং সে সময়েই তিনি সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে চলে এসেছেন স্বাধীনতা ও মানবমর্যাদার পীঠভূমি সমাজতান্ত্রিক পূর্ব ইওরোপে। হিকমেত আজ পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের গর্ব। বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক। কায়রোতে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের অন্যতম সংগঠক। এবং তিনি বলেন :

"Thus I have freed myself
From all big words
All question marks.
Calmly I entered the ranks
Of the great struggle."

মানুষের ধ্রুবতারা নাজিম হিকমেতের এই জন্মদিন আরও অনেক, অনেকদিন ফিরে ফিরে আসবে যতদিন না প্রত্যেকটি মানুষ অত্যাচার আর অবিচার থেকে মুক্তি না পাবে। হিকমেত শতায়ু হয়ে থাকবেন আমাদের মাঝখানে।

আঁরি আলেগের মুক্তি

আলজিরিয়ার লেখক ও সাংবাদিক আঁরি আলেগ ফরাসীদের কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় ১৯৫৯ সালে সাংবাদিকতার জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই সংবাদ অনেক সংবাদপত্রেই সেদিন প্রকাশ করা হয় নি। কিন্তু পরবর্তী একটি সংবাদ না ছেপে পারে নি অনেক খবরের কাগজ। বিপ্লবী যোদ্ধা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আঁরি আলেগ ফরাসী কারাগার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি আজ চেকোস্লোভাকিয়ার সমাজতান্ত্রিক মানুষদের সঙ্গে বাস করছেন। 'আলজের, রেপাব্লিকেন' পত্রিকার ডাইরেক্টর আঁরি আলেগকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯৫৭ সালে কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল। বিনা বিচারে তিন বছর আটক থাকার পর অন্যান্য আলজিরীয় দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের সঙ্গে ১৯৬০ সালে আঁরি আলেগকে সামরিক আদালতের সামনে হাজির করা হয়। ফরাসী ফাসিস্তরা আলেগকে দশ বছর কারাদণ্ড দেয়। ১৯৬০ সালের শেষ দিকে আলেগকে আলজিরিয়া থেকে ফ্রান্সের রেনেস কারাগারে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে এই অসমসাহসী, অকুতোভয় দেশপ্রেমিক আলজিরীয় সাংবাদিক ও সাহিত্যিক কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হন। কারাগারে কী ভাবে তাঁকে দিনের পর দিন ফরাসী ফাসিস্তদের চরমা জিজ্ঞাসাবাদ করতো, কী ধরনের নির্যাতন তাঁকে সহ্য করতে হতো আলেগ তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'লা কোশ্চেন'-এ তার বর্ণনা দিয়েছেন। প্যারিস থেকে তাঁর আরেকটি বই বেরিয়েছে গত বছর। নাম 'প্রিজনার্স অব ওয়ার'। আলজিরিয়ার কুখ্যাত বারবারুস কারাগারে বন্দী নির্যাতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। আঁরি আলেগের মুক্তি আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের পথে এক নির্ভীক নিশ্চিত পদক্ষেপ।

কিউবার লেখকদের স্কুল

বিপ্লবী কিউবায় সংবাদপত্রের লেখকদের জন্য যে বিদ্যালয়টি রয়েছে সমগ্র লাতিন আমেরিকায় তা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। বাতিস্তার আমলে কিউবায় স্বাধীন সংবাদপত্র ও লেখকের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবার মুক্তির পর লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জনতার আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে শিল্পকর্মের মাধ্যমে রূপ দিতে আহ্বান করা হয়। বিদেশে নির্বাসিত লেখক ও সাংবাদিকরা নতুন কিউবার মুক্ত আকাশের তলায়, নিজেদের জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। একদা নোয়কা এসেছিলেন

কিউবায়। সেদিন তিনি হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। আজ তিনি বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন কিউবা আমেরিকার ভূমণ্ডলে এক আশ্চর্য মুক্তির নক্ষত্র। সমগ্র লাতিন আমেরিকার অভ্রান্ত দিশারী ধ্রুবতারা। কিউবার এই সাংবাদিক বিদ্যালয়ের জন্য কাস্ত্রো সরকার একটি রোটারী প্রেস দিয়েছেন। সেখান থেকে শিক্ষার্থী সাংবাদিকরা নিজেদের দৈনিক পত্রিকা ও সাহিত্য সাময়িকপত্র প্রকাশ করে লেখায় হাতেখড়ি দিচ্ছেন। কয়েক বছর আগেও কিউবায় এটা ছিল অভাবিত। স্কুলের সাংবাদিকরা এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মুখপত্র 'আলমা মেটার' পত্রিকা প্রকাশনায় সক্রিয় সহযোগিতা দিচ্ছেন। সংবাদপত্রের পাশাপাশি রয়েছে বেতার ও টেলিভিশনে প্রচার শিক্ষণ ব্যবস্থা। কাস্ত্রো সরকার শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেবার জন্য এই স্কুলে একটি বেতার ট্র্যান্সমিটার দিয়েছে। নতুন কিউবার সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সংবাদ প্রচারিত হয় নিয়মিত এই শিক্ষার্থীদের বেতার প্রতিষ্ঠান থেকে। এই তরুণ লেখক ও সাংবাদিকদের শিক্ষা-পাঠ্যসূচীর সমাপ্তি অধ্যায়ে লিখতে দেওয়া হয় একটি ঐতিহাসিক ঘটনার রেখাচিত্র বা রিপোর্টাজ। সে ঘটনাটি হলো কাস্ত্রোর নেতৃত্বে গেরিলাবাহিনীর 'দীর্ঘ অভিযান'—সিয়েরা-মেস্ত্রার পার্বত্যাঞ্চল অতিক্রম করে তারকুইনো পর্বতশীর্ষ আরোহণের কাহিনী, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল কিউবার মুক্তি অভিযান। লেখকদের এই স্কুলের স্নাতকদের ডিপ্লোমা দেবার সময় একটি অঙ্গীকার করানো হয়। সে অঙ্গীকার মাতৃভূমির স্বার্থ ও জনগণের বিপ্লবের স্বার্থ রক্ষার জন্য। কিউবার লেখক ও শিল্পীরা সানন্দে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন কিউবার মানুষের এই ঐতিহাসিক সাফল্যকে চিরস্থায়ী করতে।

সোভিয়েত দেশে বৃটিশ পত্রিকা

পশ্চিমীদের অপপ্রচারের বলিষ্ঠ উত্তর হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বৃটিশ সরকারকে অনুমতি দিয়েছেন রাশিয়ায় বৃটিশ পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারের জন্য। রুশভাষায় এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে। নাম হবে 'এ্যাংগলিয়া'। সোভিয়েত ইউনিয়নে ৮৪টি শহরে এই বৃটিশ পত্রিকা প্রচারিত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচারের জন্য পশ্চিমী দেশগুলি পত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন সংস্থাগুলোকে অবাধ অধিকার দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ তার সমুচিত উত্তর দিয়েছে নিজের দেশে এই পুঁজিবাদী সরকারের পত্রিকা অবাধ প্রচারের সুযোগ দিয়ে। সোভিয়েত সমালোচকরা এই ছোট্ট ঘটনা থেকে অনেক গভীর তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পারেন। রাশিয়া আজ পৃথিবীর মানুষের মহত্তম আশার প্রতীক, নিপীড়িত মানুষের সহধর্মী যোদ্ধা, তার দ্বার আজ সকলের জন্য উন্মুক্ত। কারণ তার দুর্গ আজ এমন শক্তিশালী, লিলিপুটদের সাধ্য নেই তার প্রাচীরের একটি ইটও খসাতে পারে।

অরুণ দেব

না ট্য প্র স ঙ্গ

কয়েকটি অভিনয়

গত ১১ই ডিসেম্বর বহুরূপক সম্প্রদায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে তাঁদের নতুন নাটক শ্রীপরেশ ধর রচিত 'কালপুরী' মঞ্চস্থ করলেন। মৃত্যুর পর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ কালপুরীতে বিচারের অপেক্ষায়। কালপুরীর শাসনকর্তা যমরাজ তাঁদের বিচার করছেন। নাটকের এই বিচার কাহিনীর মাধ্যমে নাট্যকার দেশের শাসক সম্প্রদায়, শাসনব্যবস্থা, তরুণসমাজ প্রভৃতি অনেক কিছুকেই সমালোচনা করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার ফলে নাট্যকারের সমালোচনা কোথাও সার্থক হয়ে ওঠেনি। একমাত্র ঠাণ্ডামল ঠনঠনিয়া চরিত্রটি কিছুটা স্বাভাবিক——বাকি সমস্ত চরিত্রই যুক্তিহীন বক্তব্যের আধার মাত্র। নাটকের দৃশ্য একটিই এবং দৃশ্য পরিকল্পনায় অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্বল নাটকের নিতান্তই সাধারণ অভিনয় দৃশ্যসজ্জাকে কোনো সময়েই নাটকের থিয়েটার-ভাবের সঙ্গে একাত্ম ক'রে তুলতে পারে নি। রবীন দাসের আলোকসম্পাত প্রশংসনীয়।

গত ২৪শে ডিসেম্বর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে সুন্দরম সম্প্রদায় তাঁদের 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট' নাটক মঞ্চস্থ করলেন। বাংলা নাটক—কিন্তু ইংরাজী সংলাপে ভর্তি। নিতান্তই সাধারণ এক রহস্য কাহিনীর নাট্যরূপ। বিদেশী কাহিনী অনু-সরণের প্রচেষ্টা প্রকট। প্রথম ও শেষ দৃশ্যে নাট্যবস্তু কিছুটা ঘনীভূত। মধ্যবর্তী অংশে অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করে কৃত্রিম উপায়ে দর্শককে মূল রহস্য-সমাধানের পথ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। দৃশ্যসজ্জা সাধারণ পর্যায়ের। উদ্ভট আলোকসম্পাত ও সুরসংযোজনা নাটকের অগ্রগতির পথে বাধাই সৃষ্টি করেছে। অভিনয়াংশে শিল্পীদের নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজসম্পর্কবিহীন অপরাধমূলক এই নাটকের অভিনয়ে নবনাট্যের কোনো লক্ষণই উপস্থিত নয়।

গত ৮ই জানুয়ারি বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রান্তিক শাখা

রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' মঞ্চস্থ করলেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায়। নাটকের প্রথমেই নৌকাডুবির ঠিক পরবর্তী ঘটনা। রমেশ ও কমলা ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কোন মতে তীরে এসে উঠেছে। মূল নাটক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি দৃশ্যের মাধ্যমে এই ঘটনাকে উপস্থিত করা হয়েছে। মনে হলো নাটকের সংহতির দিকে দৃষ্টি না রেখে, দৃশ্যটির সাহায্যে আলোক-সম্পাতের কৌশল ও আলোকসম্পাতের সাহায্যে দৃশ্যটির বর্ণ সমারোহ দেখানোই একমাত্র উদ্দেশ্য। অথচ সে উদ্দেশ্যও সফল হয় নি। অযৌক্তিক আলোকসম্পাত, দৃশ্যসজ্জার দীনতা, রমেশ-কমলার শুষ্ক বসন সমগ্র উপস্থাপনাকে হাস্যকর করে তুলেছে। সমগ্র নাটকটি অল্পক্ষণ-স্থায়ী বেশ কয়েকটি খণ্ড দৃশ্যে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ড দৃশ্যও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। এর ফলে নাটকটির কোনো মুহূর্তই রবীন্দ্র রচনার গভীরতা অর্জন করে নাটকীয় সংকট মুহূর্তে পরিণত হতে পারে নি। নাটক রচনার ত্রুটির ফলে রমেশ, হেমনলিনী ও কমলা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব কোথাও তাদের নিজস্ব আলোচনা-কক্ষ নিয়ে উপস্থিত নয়। অক্ষয় যেন এক খল-নায়ক—ভঙ্গি যেন বিদূষকের। অন্নদা-বাবু যেন বিবাহের ঘটক। সংলাপে সস্তা উত্তেজনা আনার চেষ্টায় যোগেনের মুখ দিয়ে যত্র-তত্র ইংরাজী কথা বলিয়ে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের গতি-বিধি নিয়ন্ত্রণের কাজও ত্রুটিপূর্ণ। বিভিন্ন দৃশ্যে পাত্র-পাত্রীদের একই অবস্থানের বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি। কয়েকটি দৃশ্যে লঘুভাব অযথা প্রাধান্য পেয়েছে, এবং লঘু ভূমিকার অভিনেতারা যথাসাধ্য অতি অভিনয় করে গেছেন। নৌকাডুবির নাটকীয়-গতি পরিণতির দিকে ক্রমশ শ্লথ হয়ে এসেছে। নাট্যরূপকার নিজের ইচ্ছামতো শেষাংশকে পরিবর্তন করে নিয়ে কমলার চরিত্রমানসকে রমেশের সঙ্গে যে সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তারই অনিবার্য পরিণতি কমলার আত্মহত্যা। নৌকাডুবি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের কমলার চরিত্র-মানস রমেশের সঙ্গে ঐ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে অগ্রসর হয় নি। নাট্যরূপে মূল চরিত্রমানসকে অবিকৃত রাখাই উচিত ছিল। কমলা চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন শ্রীমতী শমিতা বিশ্বাস। হেমনলিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী চিত্রা মণ্ডল ও শৈলর ভূমিকায় শ্রীমতী রেবা রায়চৌধুরী যথাযথ। রমেশের ভূমিকায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় সুযোগ যা পেয়েছেন তার সদ্ব্যবহারই করেছেন। অন্নদাবাবুর ভূমিকা অতি অভিনয় দোষে দুষ্ট। সঙ্গীতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নাম রয়েছে। কিন্তু সেদিক

থেকেও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অভাব। আর আবহ সঙ্গীতের দিক থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও, হঠাৎ মাঝে কেন গীর্জার সঙ্গীত-ধ্বনি ব্যবহার করা হলে, তাও কিছু বোঝা গেল না। বিচ্ছিন্ন প্রথম দৃশ্যটি বাদে বাকি সমস্ত অংশে তাপস সেনের কাজ প্রশংসনীয়। আলোকসম্পাত কোথাও নাটককে অতিক্রম করে যায় নি।

গত ১২ই জানুয়ারি মিনার্ভা মঞ্চে ক্যালকাটা থিয়েটার্স মঞ্চস্থ করলেন বিজন ভট্টাচার্য রচিত ও পরিচালিত 'ছায়াপথ' নাটক। মহানগরীর রাজপথের এক দিকে গ্রামের ছিন্নমূল কৃষক পরিবার ও ভিক্ষাজীবীরা, আর এক দিকে পচাই মদের দোকান। এ নাটকের একটি মাত্র দৃশ্য! সেই একটি মাত্র দৃশ্যের পটভূমিকায় থিয়েটার-ভাব-সম্পন্ন আলোচনাকক্ষের মাধ্যমে ঐ চির-পথচারীর দল আর ঐ কৃষকদম্পতি নাটকীয় সংঘাতকে স্বচ্ছন্দ পরিণতির দিকে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এ নাটকের পাঁচ ভিক্ষু রসে কখনো বা নির্মম কৌতুকের দীপ্তি, কখনো বা দুর্বিসহ বেদনার মর্মান্তিকতা। পেশাদার ভিক্ষাজীবীদের পাশাপাশি নিরুপায় ভিক্ষাবৃত্তির বৈপরীত্য, বিকলাঙ্গ ভিক্ষুক তরুণীর জীবনতৃষ্ণা এ নাটকের বিভিন্ন আলোচনাকক্ষকে আশ্চর্যভাবে বাস্তব করে তুলেছে। অবাস্তব ভাবাবেগকে কোথাও প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি। পরিচালনায় পরিমিত সাংকেতিকতার আশ্রয় নিয়ে মঞ্চে বাস্তবানুগ পরিস্থিতি সৃষ্টির ফলে নাটকের প্রচ্ছন্ন আশাবাদিতার সুরটি এর আপাত-বিমর্ষতাকে সহজেই অতিক্রম করে গেছে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সম্মিলিত অভিনয়ের সাফল্য বিস্ময়কর। ব্যক্তিগত অভিনয়ে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর স্মরণীয় অভিনয় করেছেন মাতালবেশী বিজন ভট্টাচার্য। ক্যালকাটা থিয়েটার্সের 'ছায়াপথ' নবনাট্য-আন্দোলনের পুরোধা শ্রীবিজন ভট্টাচার্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্মের নিদর্শন।

শৌভনিক সম্প্রদায় তাঁদের নতুন নাটক 'ল' ল' না' নিয়ে মুক্ত-অঙ্গনমঞ্চে নিয়মিতভাবে অভিনয় করে যাচ্ছেন। নাটক রচনা করেছেন শ্রীমতী নিবেদিতা দাস। নাটকের নামের প্রথম দুটি 'ল' কিন্তু বাংলা 'ল' নয়, ইংরেজী এল্-এ-ডব্লু অর্থাৎ 'ল' কথার বাংলা বানান এবং শেষের 'না'টি আদি ও অকৃত্রিম বাংলা। বাংলা ভাষায় নাট্যকারের মনোমতো নাম নিশ্চয়

খুঁজে পাওয়া যেত, এই খিচুড়ি ভাষা ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন ছিল না। বংশপরম্পরায় কোর্টঘর করে সর্বস্বান্ত হওয়ায় মেজর বিনয়েন্দ্র রায় উকিল-ব্যারিস্টার-এটর্নীর নাম সহ্য করতে পারেন না। এদিকে তাঁর দুই শিক্ষিত মেয়েই বধূ হিসাবে নির্বাচন করে বসে আছেন এটর্নী আর ব্যারিস্টারকে। এই নিয়ে সমস্যা, আর এই সমস্যার সমাধানেই এই নাটক 'ন' ন' না'। খাদ্য সমস্যা থেকে আরম্ভ করে ট্রামে-বাসে দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত সমস্যা ছাড়াও এই আরেকটি সমস্যা থাকতে পারে আর শৌভনিক সম্প্রদায় তাঁদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের অন্যতমকে অর্থাৎ "কর্মশ্রান্ত ব্যথিত সমস্যা-জর্জরিত দেশবাসীকে উন্নততর জীবনে উদ্বুদ্ধ করা"কে সফল করে তোলার জন্যই এই নাটক মঞ্চস্থ করেছেন—এই দুই সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার পর নাটকটি উপভোগে আর কোনো বাধা থাকে না। পরস্পর বিপরীত আপাত উদ্ভট আলোচনাকক্ষকে পাশাপাশি সাজিয়ে সংলাপের মাধ্যমে হাস্যরস সঞ্চারিত করে দেওয়ার ব্যাপারে শ্রীমতী দাস ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য সমস্ত অধ্যায়ে এই ক্ষমতার প্রকাশ সমানভাবে হয় নি। ফলে নাটকটি প্রথম, তৃতীয় ও ষষ্ঠ অধ্যায়েই উপযুক্ত কৃতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে, বাকি অধ্যায়গুলিতে নয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে নীতার ভূমিকায় নিবেদিতা দাস, রীটার ভূমিকায় বিনতা রায়, মেজর রায়ের ভূমিকায় বীরেশ মুখোপাধ্যায়, সত্যেনের ভূমিকায় গোবিন্দ গাঙ্গুলী, গোবর্ধনের ভূমিকায় অশোক মিত্র উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। রীটা-নীতার পিতা, অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের জজসাহেবের ভূমিকাটিও সুঅভিনীত। পরিচালনা নিতান্তই সাধারণ শ্রেণীর। সম্মিলিত অভিনয়ের দিকটা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অবস্থান-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নাটকের বিভিন্ন মুহূর্তকে গড়ে তোলার কোনো চেষ্টাই করা হয় নি। আলোকসম্পাত বৈশিষ্ট্য বর্জিত। মঞ্চসজ্জা যথাযথ।

সংবর্তক এক নতুন নাট্য সম্প্রদায়। এঁদের প্রথম প্রয়াস শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস রচিত দুটি নাটিকা 'জীবনতৃষ্ণা' ও 'আমরা অমৃত হব' এবং এই প্রথম প্রয়াসেই সংবর্তক সম্প্রদায় নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার রূপে স্বীকৃতি পাবার দাবি রাখেন। দুটি নাটিকাই আলোচনামূলক। অনেকের ধারণা আলোচনামূলক নাটক অভিনয়ে সাফল্য লাভ করে না। কিন্তু আলোচনা-

মূলক নাটক রচনায় ও অভিনয়ের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। সংলাপ শুধু যুক্তিপূর্ণ হলেই চলবে না, অর্থের ও ধ্বনির সংঘাতের মাধ্যমে'অভিনয়বহ-ও হওয়া চাই। অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থেকেই অভিনয় করতে হবে। বৎসরাধিককাল পূর্বে অক্স্‌ফোর্ড থিয়েট্রিকাল কম্পানী বার্নার্ড শ-র 'ম্যান্ এ্যাণ্ড সুপারম্যান্' নাটকের আলোচনামূলক অংশ 'ডন্ জুয়ান্ ইন্ হেল্' নিউএম্পায়ার মঞ্চে উপরের পদ্ধতিতে মঞ্চস্থ করে আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

বর্তমান যুগের জটিলতার পটভূমিকায় মধ্যবিত্ত সমাজের তরুণ-তরুণীর মনের মতো করে জীবনকে পাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রচিত 'জীবনতৃষ্ণা' নাটিকা। নাটিকার শেষে অল্পক্ষণের জন্ত তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব। বাকি অংশ পরস্পরের জীবনবোধ সম্পর্কে নায়ক-নায়িকার আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। অথচ এই আলোচনা কোথাও নীরস তত্ত্বালোচনায় পরিণত হয় নি। সুন্দর এক প্রেমের কাহিনীর বিষাদমণ্ডিত উপসংহারকে মঞ্চে উপস্থিত করেছে। দ্বিতীয় নাটিকার বিষয়বস্তু বিশ্বশান্তি। এক অধ্যাপক, তাঁর কন্যা, ভৃত্য, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এক মেজর ও শান্তির আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহকারী কয়েকজন যুবক—এঁদের মধ্যেই আলোচনা। এক্ষেত্রেও আলোচনা কোথাও নীরস হয়ে ওঠে নি। প্রত্যেকটি চরিত্রমানস তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও আলোচনাকক্ষ নিয়ে উপস্থিত হয়ে ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে নাটিকাটিকে সুস্থ উপসংহারের অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সে উপসংহার—শান্তির মধ্যেই জীবনের স্বাক্ষর, বাঁচার জন্যই শান্তির প্রয়োজন। নাটিকা দুটির রচনায় শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সকলেই নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন এবং দুটি নাটিকাতেই নায়িকার ভূমিকাভিনেত্রীর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মঞ্চের কাজ যথাযথ। নাটিকা দুটি গত ২০শে জানুয়ারী শনিবার প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হলে মঞ্চস্থ হয়েছে।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

'মধুর জীবন'

সাধারণের রুচি এবং শিল্পের দাবি এই দুই প্রয়োজন না মেটাতে পারলে কোনো চিত্রপরিচালকের পক্ষে দীর্ঘকাল ভালো ছবি করে যাওয়া সম্ভব নয়। সাধারণের রুচি মেটানোতে বামপন্থী শিল্পীর আগ্রহ বেশি থাকা স্বাভাবিক বলেই হয়তো বিশ্বের চলচ্চিত্র শিল্পের অনেক দিকপালই স্পষ্টত বামপন্থী। ইতালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক ফেদেরিকো ফেল্লিনি এই দলভুক্ত। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর উষ্মা এবং মানবিক সম্পর্ক আবিষ্কারের দুরূহতা তাঁর প্রিয় বিষয়-বস্তু। প্রথম ছবি 'লা স্ত্রাদা'র পর থেকেই তাঁর নাম দে সিকা, রোসেলিনীর সঙ্গে উচ্চারিত হয়। প্রসঙ্গত মিকেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনি ও তিনি নিও-রিয়ালিসমের যুগে রোসেলিনির কাছে কাজ শেখেন।

যদিও নিও-রিয়ালিসম কথাটির কোনো অর্থ হয় কিনা সে বিষয়ে ফেল্লিনি স্বয়ং সন্দেহ প্রকাশ করেন, তবু ফেল্লিনির ছবি তথাকথিত ইতালির নিও-রিয়ালিসমের গণ্ডীর বাইরে পড়ে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাস্তবকে নিয়েই ফেল্লিনির কাজ এবং বক্তব্যনিষ্ঠার দিক দিয়ে তিনি নিও-রিয়ালিস্টদের চেয়ে কিছুমাত্র হীন নন। তবে যে দীনদরিদ্র সমাজ নিয়ে দে সিকার 'বাইসিকল থীপ' ও 'উমবার্টো ডি' কিংবা ভিসকোন্তির 'লা টেরা ট্রেমা' গড়ে উঠেছে, ফেল্লিনির শেষ ছবি 'লা দোলচে ভিতা'র বক্তব্যে তার সঙ্গে কোনো সংস্রব নেই। মানুষের মনের দারিদ্র্যই ছবিটির প্রধান উপজীব্য।

ছবিটি গতবছর কান-এ প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিল। প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটিও পায়। তাছাড়া ইওরোপের বাজারে এ ছবি যত টাকা সংগ্রহ করেছে সেরকম আর কোনো ছবি সম্প্রতিকালে করেনি। ইতালীর ফিল্মের বাজার শোনা যাচ্ছে বদলে গেছে মাত্র এই একটি ছবির গুণেই। বক্তব্যনিষ্ঠ পরিচালকরা কাজ পাচ্ছেন বেশি। এদিকে আবার ইতালী ও ইওরোপ জুড়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভ আর ধিক্কারও শোনা গেছে, ঠিক যেমন প্রশংসার ঝড়ও বর্ষিত হয়েছে এ ছবিটির ওপরে।

সাড়ে তিন ঘণ্টার ছবি সেন্সারের কাঁচির দৌলতে দু ঘণ্টায় হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। অনেকেই ছবিটি দেখে হতাশ হয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন দুর্বোধ্য। কারণ 'মধুর জীবন' আখ্যাত এই ছবিটিতে মধুর জীবনের

প্রতি ক্ষুরধার বিদ্রূপ ও প্রকৃত মধুর জীবনের অন্বেষা দেখাতে গিয়ে পরিচালক কাহিনী বা প্লট সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করেছেন। দ্বিতীয়ত ছবিটির ভাষান্তর অর্থাৎ ইংরাজী ডাবিং অস্পষ্ট ও ছবিটি সেন্সরের কাঁচির প্রভাবে খণ্ডিত বা অসম্পূর্ণ। তাছাড়া এ ছবিতে পরিচালক ফেদেরিকো ফেল্লিনি নিতান্ত বক্তব্যনিষ্ঠ হওয়ায় সাধারণ পুরস্কৃত ছবি-সুলভ চমকপ্রদ দৃশ্য বা কায়দা একেবারে নেই। যা আছে তা দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। সাতটি দিন ও সাতটি রাত্রির ঘটনা পরিচালকের অসীম ক্ষমতার গুণে প্রায় সাঙ্গীতিক সংহতি পায়। এ সংহতিতে ঘটনাসূত্রের কোনো সাহায্য তো নেইই বরং ঘটনাসূত্রের আপাত আকস্মিকতায় বারবার এ সংহতিতে আঘাত পড়ে। নিজের বক্তব্যকে স্তরে স্তরে ঘটনাপারম্পর্যে গেঁথে ফেল্লিনি বিভিন্ন mood transition-এর মধ্য দিয়ে এক সামগ্রিক সংহতি এনেছেন, যেরকম সংহতি বর্তমান লেখক কোনো শিল্পমাধ্যমে দেখেননি। Picaresque কাহিনীর মাধ্যমে এরকম সংহতি সাধারণত আসে না।

ইওরোপীয় এবং ইতালিয় জীবনের সঙ্গে অপরিচিতি সত্ত্বেও 'দোলচে ভিতা' প্রচণ্ড নাড়া দেয়। মার্চেল্লো মাস্ত্রোই আনি অভিনীত মার্চেল্লো নামক এক কুৎসাজীবী সাংবাদিকের জগৎ এই 'দোলচে ভিতা'। ছবির প্রথম দৃশ্যে মনে পড়ে মিকেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনির কথা: "There is an authentic Catholic nostalgia in Fellini's works."

একটি হেলিকপটার থেকে ঝুলন্ত এক যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি (Christ giving alms) রোম শহরের ওপর দিয়ে ছায়া ফেলে চলে যায়। তারপরেই কেটে পরিচালক দেখান—এক বোধিসত্ত্বের মুখ ও মালয়ের নাচ। সেই নাইটক্লাবে মার্চেল্লোর নির্দেশে তাঁর ক্যামেরাম্যান পাপারাচ্চো একটি যুগলের ছবি তোলে।

উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায় এর প্রত্যেকটি কিভাবে ছবিটির সঙ্গে যুক্ত। ছবির শেষ একটি সরল মেয়ের মুখ দিয়ে, যাকে দেখে মার্চেল্লোর মনে হয়েছিল ফ্রা এঞ্জেলিকোর আঁকা দেবদূতের মুখ।

প্রাচ্যের কথা ফিরে আসে ছবির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে—স্টাইনার নামক মার্চেল্লোর বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে যখন স্টাইনার মার্চেল্লোকে বলে "I am afraid of peace" ও নিজের ছেলে মেয়েদের দেখিয়ে বলে যে এই সমাজে বিশ্বাস রেখে সুখের ঘর গড়ে তুলো না, একা লড়াই করো—তখন বা-

তার আগে শুনতে পাই স্টাইনারের এক বন্ধুর প্রাচ্যপ্রীতি ও এক প্রাচ্যদেশীয় মেয়ের গান। এখানে এবং পরের দৃশ্যে দীপ্ত Air India বিজ্ঞাপনে দেখা যায় প্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টার ব্যর্থতা।

ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্ত ক্যামেরাম্যানদের উন্মাদ প্রচেষ্টা ও গাড়ির ভোঁ ভোঁ শব্দের পৌনঃপুন্ত উপস্থাপনার পর মার্চেল্লোর বন্ধু স্টাইনার-এর কাছে আমরা আসি। তার সঙ্গে দেখা চার্চে। সে বাজায় বাখের অর্গ্যান ফিউগ ইন ই মাইনর (বুক নং ৪)। তার বাড়িতে পরদিন মার্চেল্লো ও তার অবিবাহিতা সঙ্গিনী অ্যানাকে দেখা যায়। সেখানকার শান্তিতে মার্চেল্লো জীবনের ভঙ্গি বদলানোর কথা বললে স্টাইনার বাধা দেয়। ফুলের মতো শিশুদের দেখিয়ে প্রশ্ন করে পরদিন ওদের জীবনে কি আছে? টেপ রেকর্ডে গৃহীত হয় স্টাইনার-এর কথা: তার সত্যি চেহারা এক আঙুলের মতো ছোট।

তারপর হঠাৎ মার্চেল্লো ও অ্যানার কলহান্ত-মিলন ভেঙে আসে "That one telephone call". নিজের ছেলেমেয়েকে খুন করে স্টাইনার-এর আত্মহত্যা। আবার টেপ বাজে। পুলিশের জবাবে মার্চেল্লো বলে "perhaps he was afraid…Not in the way you mean." তারপর স্ত্রীকে সেই খবর দেওয়ার সময় ক্যামেরার ভীড়। বলিষ্ঠ নিষ্ঠুর হাতে ফেল্লিনি গড়ে তুলেছেন সম্পূর্ণ ঘটনাটি।

Syliva নামক বিখ্যাত অভিনেত্রীর রোমে আগমন, মার্চেল্লোর বাবার রোমে আগমন ও চা-চা নাইটক্লাবে যাওয়া, castle sequence, ও মার্চেল্লোর নতুন চাকরি (filmstan-এর advertising man) পাওয়ার জন্ত স্ট্রিপটিজ সম্বলিত পার্টি ইত্যাদি আরো কয়েকটি দৃশ্ত ছবিতে আছে। প্রত্যেকটি দৃশ্ত উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে শুরু হয়ে নিখুঁতভাবে despair-এ গিয়ে শেষ হয়। তার মধ্যে তীক্ষ্ণ শ্লেষ পাওয়া যায়, যেমন Sylivaর শেয়াল ডাকায় বা বেড়ালপ্রীতির দৃশ্তে। তাছাড়া পাওয়া যায় সহানুভূতি। Ynonne Furneux অভিনীত ফরাসী মেয়েটি বা Anouk Aimee অভিনীত কোটি-পতি মাদেলিনা এবং সবচেয়ে বেশি মার্চেল্লোর নিজের অন্বেষা ও সে অন্বেষার একাগ্রতার অভাব ও হতাশা নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট। ফ্লুনো রোটার সঙ্গীত, ওতেলো মারতেল্লির ক্যামেরার কাজ, গেরার্ডির (Gherardi) দৃশ্তপট—সব মিলে ফেল্লিনি এক বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন "which surge

forward in a compelling Rhythm." তাছাড়া যদিও আপাতভাবে যৌনলালসা ছবির বিষয়বস্তুর এক অঙ্গ, তবু "fellini's films have always been without sensuality. Androgynous men and women populate the world of his twilight moods." এজন্যই হয়তো কলকাতার সাধারণ দর্শকরা হতাশ ও চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

'দোলচে ভিতা' দেখার পর বোঝা যায় কেন 'Sight and Sound' বা 'Films and Filming' জাতীয় বৃটিশ কাগজ এ ছবিকে "Fellini's elaborate, repititious attack on Roman corruption and decadence. Plenty of extravagant set pieces. Not enough detachment", বলে উড়িয়ে দিতে চান (Winter 60-61, Sight & Sound)

বৃটিশ মেজাজে এরকম উলঙ্গ সত্য সহ করা মুস্কিল। তাই দেখি প্রবীণ সোভিয়েত পরিচালক ও সমালোচক Sergei Gerasimov-এর উচ্ছ্বাস :

"Fellini is not a mild artist ; his guiding principle is the healing of Society's ills by the bitterest of medicines. In this, his latest work, he has achieved results of a very high standard. He is not sparing of stark revolting scenes from this 'Sweet' life, against which he levels the entire emotional impact of his film." (March 1961, Soviet number, Films and Filmings)

এরকম ছবি ইওরোপে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় দেখে খুশি লাগে।

বিষ্ণু দে

একটি পৌরাণিক উপাখ্যানে সৃষ্টির বিবরণ

"শরৎকালে পরিষ্কার আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অগণ্য তারকা-পুঞ্জের মধ্যে মধ্যে সময়ে সময়ে অস্পষ্ট শ্বেতনীহারের ন্যায় কোন পদার্থ লক্ষিত হয়। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে উহা আরও পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সে সব আর কিছু নহে, মালমসলা সংগ্রহ রহিয়াছে, এখনও পৃথিবী বা সৌর-জগৎ গঠিত হয় নাই। নীহারের ন্যায় লক্ষিত হয় বলিয়া কেহ কেহ উহাকে নীহারিকা বলেন।"

এই লাইন কয়টি কোনো বিজ্ঞানের বই থেকে উদ্ধৃতি নয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বাল্মীকির জয়' রচনার অংশবিশেষ। ১২৮৮ সালে—অর্থাৎ আজ থেকে আশি বছর আগে—রচনাটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। আশি বছর আগের অধিকাংশ বিজ্ঞানের বই এতদিনে অচল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই বইয়ে কথাপ্রসঙ্গে এমন কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা আছে যা আজকের দিনেও তথ্যমূল্য হারিয়ে ফেলেনি। তাই বলে 'বাল্মীকির জয়' কোনো ক্রমেই বৈজ্ঞানিক রচনা নয়। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনা সম্পর্কে বলেছেন, "দুঃখের বিষয়…আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, এখানি কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহা পদ্যে লিখিত নহে, সুতরাং সমালোচক সম্প্রদায় ইহাকে কাব্য বলিবেন না। ইহা নাটক নহে, আমি নিশ্চিত জানি; কেন না, ইহা কথোপকথনে বিন্যস্ত নহে। ইহাকে নভেলও বলিতে পারিলাম না, কেন না, ইহাতে নায়ক নাই, নায়িকা নাই, ভালবাসা নাই, কোর্টশিপ নাই, বিবাহ নাই, লুকোচুরি মারামারি খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কথা আছে, কিন্তু পুরাণ নহে; দিগ্বিজয়ের কথা আছে, কিন্তু ইতিহাস নহে; একটি সৃষ্টির বিবরণ আছে, কিন্তু বিজ্ঞান নহে; নক্ষত্র-নীহারিকার কথা আছে, কিন্তু জ্যোতিষ নহে; মনুষ্যকে পশু করিবার কথা আছে, অথচ 'Origin of Species' নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভুত কিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।"

কিম্ভুতকিমাকার হোক, কিন্তু আশি বছর পরেও স্বীকার করতে হবে পদার্থটির রচনাসৌকর্য অতুলনীয়। শুধু কল্পনাশক্তির নিদর্শন হিসেবে নয়,

একটি পৌরাণিক উপাখ্যানকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপনায় সার্থকতম দৃষ্টান্ত হিসেবেও।

এই রচনায় একটি সৃষ্টির বিবরণ আছে। একটি পৌরাণিক উপাখ্যানে সৃষ্টির বিবরণে আধুনিক বিজ্ঞানকে আশ্রয় না করলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু একজন সার্থক লেখককে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও অবশ্যই সমকালীন হতে হবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই রচনাতেও সমকালীনতার সমস্ত লক্ষণ পুরোমাত্রায় পরিস্ফুট। এবং এই কারণেই রচনাটি কালোত্তীর্ণ।

প্রমাণ হিসেবে এই পৌরাণিক উপাখ্যানের সৃষ্টির বিবরণটিকে আধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা যেতে পারে। বিবরণের শুরু এইভাবে :

"যে দিন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মা ও ব্রহ্মর্ষিবর্গের সহিত বিবাদ করিয়া ধবলগিরির উচ্চশৃঙ্গে আরোহন করেন, সেই দিন প্রথমতঃ ঐ সকল নীহারিকা তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শূন্যপথে তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তীরের ন্যায়, বাষ্পীয় শকটের ন্যায়, তড়িতের ন্যায় রাজর্ষি বিশ্বামিত্র আকাশ পথে গমন করিতে লাগিলেন। প্রতিমুহূর্তে শত সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। নিজে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ, তৎপশ্চাত আগুল্ফ বিলম্বিত পিঙ্গলবর্ণ জটাজুটভার। সূর্য্যকিরণে ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ জ্বলিতেছে। দিবসে দেখিয়া পৃথিবীস্থ লোক অকাল উল্কাপাতবৎ মনে করিতে লাগিল।"

শূন্যপথের গতিকে তিনটি উপমার সাহায্যে বোঝানো হয়েছে—তীরের ন্যায়, বাষ্পীয় শকটের ন্যায়, তড়িতের ন্যায়। এই উপমা তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ। আশি বছর আগে নিশ্চয়ই ফোটোন রকেটের কথা জানা ছিল না, কিন্তু বিপুল মহাশূন্যকে অতিক্রমণের জন্যে তড়িত-বেগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত ছিল। আর যিনি যোগবলেই আকাশপথে গমন করতে পারেন, তেজস্ক্রিয়তা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে যাঁকে স্পেস-স্যুট গায়ে চাপাতে হয় না—তিনিও কিন্তু তড়িত-বেগটি অর্জন করেন ছুটি অনিবার্য ধাপ পার হয়ে।

"সূর্য্যকিরণে ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ জ্বলিতেছে।" পৃথিবী থেকে মনে হলো যেন একটি অকাল উল্কাপাত। অকাল কেন? পৃথিবীর ওপর তো সারাবছরেই উল্কাপাত হচ্ছে—কখনো বেশি, কখনো কম। অকাল সম্ভবত এই কারণে যে এই উল্কাপাতটি দিনের বেলায়, যখন আকাশের কোনো জ্যোতিষ্কই দৃশ্যমান নয়। নইলে, "সূর্য্যকিরণে ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ জ্বলিতেছে"—এই দৃশ্যবস্তুটি গ্রহ

বা নক্ষত্র বা ধূমকেতু হওয়াই সঙ্গত ছিল। বশিষ্ঠ কিন্তু ধূমকেতুই ভেবেছেন।

মহাকাশচারী তিতোভ যখন পৃথিবীতে ফিরে আসছিলেন তখনকার একটি দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "ভোস্তোক-২ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘনস্তরে প্রবেশ করল। ব্যোমযানের উত্তাপ-নিরোধক খোলসটি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। উত্তপ্ত খোলসের সংস্পর্শে এসে বাতাসে আগুন ধরে গেল।...আগুনের রঙ গোড়ায় ছিল কমলা, তারপরে লালচে, তারপরে টকটকে লাল, তারপরে ঘন লাল। ব্যোমযানকে ঘিরে নানা রঙের আগুনের শিখা পাক খেতে লাগল। আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে চোখে ধাঁধা লেগে গেল আমার।"

এই সময়ে ভোস্তোকের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর মানুষ কিন্তু অনায়াসেই মনে করতে পারত যে অকালে উল্কাপাত হচ্ছে। তবুও দুটি দৃশ্য এক নয়। "সূর্য্যকিরণে ধক্‌ধক্ ধক্‌ধক্ জলিতেছে"—এই জলা কিন্তু বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণ-জনিত নয়, সূর্যের আলোর প্রতিফলন মাত্র। প্রতিমুহূর্তে শত সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করার ফলে এই জলন্ত বস্তুপিণ্ডটির অবস্থান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে। কাজেই উল্কাবৎ হাওয়াটা নিতান্তই একটা চোখের ভুল মাত্র।

তারপরে আছে আকাশপথের দিগ্‌নির্দেশ।

"বিশ্বামিত্র ক্রমে বায়ুপথ, ক্রমে স্থিরবায়ুপথ, ক্রমে কারণবারিপথ, ক্রমে মঙ্গলকক্ষ, ক্রমে বৃহস্পতিকক্ষ, ক্রমে সমস্ত গ্রহকক্ষ, অতিক্রম করিয়া অন্ত সৌর-জগতে উপনীত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার গ্রহ উপগ্রহ পার হইয়া তৃতীয় সৌর-জগতে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে সৌর-জগৎ হইতে সৌর-জগৎ, তারপর কত সৌর-জগৎ পার হইয়া নিবাত, নিস্তব্ধ, নিঃসংজ্ঞ, নিঃশব্দ, অপ্রতর্ক্য অপ্রকাশ্য, শূন্যময় অনন্তে উপনীত হইলেন। উহা অনন্ত, অনাদি, গাঢ়, সুগভীর, অকূল, অতল, অলক্ষ্য, অপার, আকৃতিবিহীন ভীমপারাবারবৎ। আর গ্রহনক্ষত্রাদি নাই, ক্রমে তাহারা দূরতর হইতে লাগিল।...বহুদূরে এই অনন্তমধ্যে যাইয়া তিনি ক্ষীণালোকে দেখিতে পাইলেন, কোন অলক্ষ্য কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে আবর্তক্রমে অগাধ, অসীম, অসংখ্য, অনন্ত পরমাণুরাশি ক্রমাগত ঘুরিতেছে।"

যাত্রাপথে প্রথমে পড়ছে মঙ্গলকক্ষ, তারপরে বৃহস্পতিকক্ষ, তারপরে অন্যান্য গ্রহের কক্ষ। শুক্র বা বুধের কক্ষ পাওয়া যাচ্ছে না। তার মানে, যাত্রা

যদিও যোগবলে কিন্তু তা যথেচ্ছ নয়। জ্যোতির্বিদ্যার ছক নির্ভুলভাবে অনুসরণ করে নির্দিষ্ট একটি দিকে যাত্রাপথটি প্রসারিত। এবং এই যাত্রাপথে সৌরজগতের পর সৌরজগৎ পার হতে হচ্ছে।

সকলেই জানেন আমাদের এই পৃথিবী একটি মাঝারি গ্রহ। আমাদের এই সূর্য একটি মাঝারি তারা। যে বিশেষ গ্যালাক্সিতে সূর্যের অবস্থান—যার নাম মিল্কি ওয়ে—সেখানে সূর্যের মতো তারা রয়েছে পনেরো হাজার কোটি। আবার, মহাকাশে গ্যালাক্সিও এই একটি নয়, আজ পর্যন্ত দূরবীণের সাহায্যে মানুষের দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত প্রসারিত তার মধ্যেই আরো অন্তত দশ কোটি। এক-একটি গ্যালাক্সির ব্যাস একলক্ষ আলো-বছর এবং মোটামুটি সমান দূরে দূরে ছড়িয়ে থেকে এই দশকোটি গ্যালাক্সি প্রায় একশো কোটি আলো-বছর ব্যাসের গোলক পরিমাণ স্থান জুড়ে আছে। এই হচ্ছে বিপুল মহাবিশ্বের অতি সংক্ষিপ্ত একটি ছবি। এই মহাবিশ্বে আমাদের সূর্যের মতো আরো কোটি কোটি নক্ষত্রের নিজস্ব গ্রহমণ্ডল আছে। আর এই কোটি কোটি গ্রহমণ্ডলের যেখানেই জীবনধারণের উপযোগী আবহাওয়া তৈরি হয়েছে সেখানেই জীবন আছে। বিশ্বামিত্র তাঁর যাত্রাপথে এমনি ধরনের অনেকগুলো গ্রহমণ্ডল পার হয়ে গিয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি যে শূন্যময় অনর্ন্তে উপস্থিত হয়েছিলেন তার বর্ণনাও অনেকগুলি বিশেষণের সাহায্যে দেওয়া হয়েছে। শূন্যময় বিশেষণটিও লক্ষ্য করবার মতো। এই শব্দটির মধ্যে যেন একটি অস্তিত্বের ঘোষণাও পাওয়া যায়। এবং শেষ পর্যন্ত এই ঘোষণাকে সত্য প্রমাণিত করেই অনন্ত পরমাণু-রাশির আবর্তন।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, গ্যালাক্সির যে বিশেষ এলাকার কথা বলা হচ্ছে তা একটি অন্ধকার নীহারিকার এলাকা। বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন, প্রত্যেকটি গ্যালাক্সিতেই এমনি অন্ধকার নীহারিকার বিস্তৃত এলাকা আছে।

অতঃপর সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সূত্রপাত।

"বিশ্বামিত্র তথায় ধ্যানবলে জানিলেন, অগাধ, অনন্ত, শূন্যগর্ভে অসংখ্য নীহারিকা আছে। তখন তিনি সেই সমস্ত নীহারিকা যোগবলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কত অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাদি যে সেই অগঠিত পদার্থরাশি মধ্যে আকৃষ্ট হইতে লাগিল, কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্র অতিক্ষীণালোকে দেখিতে লাগিলেন, যেন প্রকাণ্ডকায় জলজন্তু সমূহ জলোন্মথনে ভীত হইয়া

কাচস্বচ্ছতড়াগের তলদেশে অদ্ভুতভাবে কোনো নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইতেছে। অথবা যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডসমূহ দুই প্রতিকূল বায়ুতে প্রতাড়িত হইয়া এক স্থানে সমবেত হইতেছে।

যখন ইচ্ছামতসংখ্যক নীহারিকা উপস্থিত হইয়াছে দেখিলেন, তখন তিনি যোগবলে সেই সমস্ত নীহারিকা একত্র করিয়া তাহাতে ঘূর্ণীগতি সমুৎপাদন করিলেন। প্রত্যেক নীহারিকা আপন কেন্দ্রে ঘুরিতে লাগিল আর সমস্ত নীহারিকা ঐককেন্দ্রিক হইয়া ঘুরিতে লাগিল। ঘূর্ণীগতি মুহূর্তে মুহূর্তে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে নিমেষে কোটি কোটি, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, বৃন্দ বৃন্দ, খর্ব্ব খর্ব্ব, নিখর্ব্ব নিখর্ব্ব, পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ ক্রোশ ঘুরিতে লাগিল। যতই ঘুরিতে লাগিল, ততই পরমাণু সমূহ নিকটবর্ত্তী হইতে এবং ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। ক্রমে যত অধিক ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত প্রকাণ্ড পরমাণুরাশি জলিয়া উঠিল। পরার্দ্ধ ক্রোশ দূরে নক্ষত্র ছিল, কোথায় লুকাইয়া গেল। গাঢ়ান্ধকার ভেদ করিয়া, তমোরাশিকে নূতন পৃথিবী হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া, চিরান্ধকার অনন্ত গর্ত্তগহ্বর আলোকিত করিয়া, সেই অনন্ত দিক্‌প্রসারী আলোকপরম্পরা নব নব বেশে পলে পলে ছয় কোটি ক্রোশ পর্যটন করিয়া বশিষ্ঠকে সংবাদ দিবার জন্য ধাবিত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ আলোক উত্তম হইয়াছে। তাঁহার সৌর-জগতের সূর্য উত্তম হইয়াছে। কোটি কল্পেও এ অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে না।"

অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে, একটি নক্ষত্রের জন্ম হলো। রুশ বিজ্ঞানী শ্মিট (Schmidt) সৃষ্টি রহস্যকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে এই বিবরণের আশ্চর্য মিল আছে। প্রথমত প্রয়োজন "ইচ্ছামতো সংখ্যক নীহারিকা", তারপরে "ঘূর্ণীগতি," তারপরে "আপন কেন্দ্রে" আবর্তন ও "ঐককেন্দ্রিক" আবর্তন। এই প্রক্রিয়াটি চলতে চলতেই আরো "অধিক ঘনীভূত" হওয়া, আরো অধিক "উষ্ণতা বৃদ্ধি", এবং শেষ পর্যন্ত "সমস্ত প্রকাণ্ড পরমাণুরাশি জলিয়া" ওঠা।

নীহারিকা হচ্ছে ধুলো ও গ্যাসের মেঘ। ধুলো মানে কঠিন অবস্থার পদার্থ। এই ধুলো ও গ্যাসের মেঘে যদি একটি আবর্তন থাকে তাহলে ধুলোর কণা ও গ্যাসের কণা ঠোকাঠুকি করবেই। দুটি গ্যাসের কণার মধ্যে ঠোকাঠুকি হলে তাদের বেগ কমে না, ঠোকাঠুকি হবার আগেই

তারা দু-দিকে ছিটকে যায়। কিন্তু দুটি ধুলোর কণার মধ্যে ঠোকাঠুকি হলে তাদের বেগ কমে ও খানিকটা উত্তাপ সৃষ্টি হয়। আর ঠোকাঠুকি হবার পরে অনেক সময়ে কণাদুটো গায়ে গায়ে জুড়ে যায়। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে ধুলোর কণাগুলোর মধ্যে অনবরত ঠোকাঠুকি চলে, তাদের বেগ কমে আর গায়ে গায়ে লেগে গিয়ে জমাট বাঁধতে বাঁধতে ক্রমশ তৈরি হয় বৃহৎ একটি বস্তুপিণ্ড। এবং এই বস্তুপিণ্ডটি যতই বৃহৎ হয় ততই তার অভ্যন্তরের চাপ ও উত্তাপ বাড়ে। শেষ পর্যন্ত এই বস্তুপিণ্ড যখন এতই বৃহৎ হয়ে ওঠে যে তার ভর আমাদের এই সূর্যের ভরের কাছাকাছি না হোক অন্তত তার পঁচিশ ভাগের একভাগ—তাহলেই বস্তুপিণ্ডটি হয়ে ওঠে পুরোপুরি একটি নক্ষত্র। অর্থাৎ এ অবস্থায় বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরের চাপ ও উত্তাপ এত বেশি হয় যে বস্তুপিণ্ডের হাইড্রোজেন পরমাণুর পক্ষে স্থির থাকা সম্ভব নয়, তা ফেটে যায়, আর ফেটে গিয়ে শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয় হিলিয়াম পরমাণুতে। আর এই প্রক্রিয়ায় নিঃসৃত হয় বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক তেজ। কোটি কোটি বছর ধরে এই তেজের যোগান অব্যাহত থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গ্রহ ও নক্ষত্রের তফাতটা চোখের দেখায় যাই মনে হোক না কেন, আসলে কিন্তু ভরের কম বেশি হওয়ার ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। পৃথিবী যে নক্ষত্র হয় নি তার কারণ পৃথিবীর ভর খুবই কম। এত কম ভরের বস্তুপিণ্ডের অভ্যন্তরের উত্তাপ ও চাপ এত বেশি নয় যে পরমাণু ফাটতে শুরু করবে। পৃথিবী তো দূরের কথা, পৃথিবীর চেয়ে অনেক গুণ বড় বৃহস্পতিও গ্রহই থেকে গিয়েছে।

নক্ষত্র তৈরি হবার পরে নক্ষত্রকে ঘিরে একই প্রক্রিয়ায় একটি গ্রহমণ্ডলও তৈরি হতে পারে।

এই প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে আপত্তি ওঠার কথা নয়। তখন জার্মান দার্শনিক কান্টের মতো অনায়াসেই যেন বলতে পারা যায়, খানিকটা মহাশূন্য (space) যদি থাকে আর খানিকটা বস্তু (matter) যদি পাওয়া যায় তাহলে গোটা একটা বিশ্ব আমরাও তৈরি করে নিতে পারি।

পৌরাণিক উপাখ্যানের বিশ্বামিত্রও স্পেস ও ম্যাটার দুই-ই পেয়েছিলেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল পৃথক একটি বিশ্ব।

"কিয়ৎক্ষণ জলিতে থাকিলে বিশ্বামিত্র বলিলেন, "বৃধ হউক;" এমনি সেই

ঘূর্ণ্যমান জলন্ত পদার্থ হইতে এক খণ্ড বাহির হইয়া গিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া উহারই চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল এবং ক্রমে শীতল হইয়া বুধগ্রহরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, বুধ উত্তম হইয়াছে। অনন্তর কহিলেন, "শুক্র হউক," অমনি সেই জলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর একখণ্ড ছুটিয়া গিয়া দূরে উহারই চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, শুক্র উত্তম হইয়াছে। আবার বলিলেন, "পৃথিবী হউক," অমনি আবার সেই জলন্ত ঘূর্ণ্যমান পদার্থরাশি হইতে আর একখণ্ড ছুটিয়া গিয়া পাহাড়-পর্বত-নদ-নদী-দ্বীপ-সাগরবতী পৃথিবীরূপে পরিণত হইল। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, এ পৃথিবীর সহিত পুরাতন পৃথিবীর তুলনা হয় না। এইরূপে সেই অগাধ পরমাণুরাশি হইতে এক এক করিয়া তিন দিনের মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, হর্শেল, নেপচুন, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি আমাদের সৌর-জগতে যাহা-যাহা আছে, বিশ্বামিত্র তৎসমুদয়ই সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার পৃথিবী আমাদের পৃথিবী হইতে কোটি গুণে বড় হইল, সূর্য কোটি গুণে বড়। পৃথিবী হইতে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি প্রকাণ্ড দেখাইতে লাগিল।"

এখানে বলার কথা এই যে শ্মিটের তত্ত্ব অনুসারে সৌরমণ্ডলের উৎপত্তি জলন্ত গ্যাসীয় অবস্থা থেকে নয়—সূর্যকে ঘিরে পাক খাওয়া ধুলো ও গ্যাসের ঠাণ্ডা মেঘ থেকে। সূর্যের বস্তুপিণ্ড থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা অংশ থেকে গ্রহমণ্ডল তৈরি হয়নি। কিন্তু এ তত্ত্ব নিতান্তই আধুনিক কালের। আশি বছর আগে প্রকাশিত একটি পৌরাণিক উপাখ্যানের সৃষ্টি-ব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব নিশ্চয়ই আশা করা চলে না।

অমল দাশগুপ্ত

কেটি কোলভিজ্‌

১৯৪৫ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত ড্রেসডেন শহরে যখন কেটি কোলভিজ্‌ মারা যান, তখন তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে পিকাসো বলেছিলেন : শিল্পের ক্ষেত্রে নির্ভীকতম সৈনিকটিকে এবং জার্মান জনসাধারণের সবচেয়ে শক্তিশালী মুখপাত্রটিকে আমরা হারালাম।

শিল্পীজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোলভিজ্‌ নির্মম সততা আর অনন্যসাধারণ শিল্পদক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন সাধারণ মানুষের সামাজিক দৈন্য আর যন্ত্রণার কথা, তাদের সংগ্রামের কথা। ১৮৬৭ সালে কোলভিজের জন্ম। ৭৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি কাল ধরে সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের, সমাজের নিচের তলার মানুষের দুঃখ-জর্জরিত জীবনের আর তাদের প্রতিরোধের জলন্ত ইতিহাস বিবৃত হয়ে আছে কোলভিজের লিথোগ্রাফ-এচিং-কাঠখোদাইগুলিতে। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতিবাদ হিসেবে শিল্পকে ব্যবহার করা ছিল তাঁর খুব সুস্পষ্ট লক্ষ্য। এবং এর জন্যে তাঁকে মূল্য দিতে হয়েছিল—নিজের জীবনের মূল্য।

কোলভিজের মহৎ শিল্পীজনোচিত সততাই তাঁকে এনে দাঁড় করিয়েছিল হিটলারী নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে একেবারে সামনের সারির সৈনিকদের দলে। ফলে, জার্মান অ্যাকাডেমি অফ আর্টস থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন; শিল্পী হিসেবে তিনি যেসব সম্মান পেয়েছিলেন, হিটলার সে সব কেড়ে নেয়; পরে তাঁর ছবির প্রদর্শনী একেবারে বেআইনী করে দেওয়া হয়; জার্মানির সমস্ত আর্ট গ্যালারি আর মিউজিয়ম থেকে তাঁর ছবি সরিয়ে ফেলা হয়; নাৎসী পুলিসের খানাতল্লাসী লেগেই ছিল তাঁর স্টুডিওতে। শেষ পর্যন্ত অনিবার্য ভাবেই বন্দিনী হলেন কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পের কাঁটাতারের বেড়াজালে। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এই বন্দিনী অবস্থাতেই ড্রেসডেনে কেটি কোলভিজের মৃত্যু হয় ২২শে এপ্রিল, ১৯৪৫ তারিখে দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর।

গত নভেম্বর মাসে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে যে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী শান্তি-মেলা বসেছিল, সেই মেলায় একটি মণ্ডপে কেটি কোলভিজের ৭০টিরও

বেশি গ্র্যাফিক রচনা দেখার দুর্লভ সুযোগ স্থানীয় চিত্ররসিকরা পেয়েছিলেন। প্রত্যেকটি ছবি দর্শকদের অভিভূত করার মতো এবং শিল্পীর সামাজিক ভূমিকার প্রশ্নটি নিয়ে যেসব শিল্পী দ্বিধাগ্রস্ত তাঁদের উপলব্ধিকে সুস্পষ্ট করে তোলার মতো।

কোল্‌ভিৎসের রচনাবলীতে প্রধান মর্মবস্তু হিসেবে বারে বারে এসেছে: সামাজিক বৈষম্যজনিত যন্ত্রণাবোধ; মাতৃত্ব; আর, মানুষের মুখ—যে মুখগুলির প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিচরিত্রে উদ্‌ভাসিত। শ্রমজীবী সংগ্রামী মানুষগুলির এইসব মুখ দৃঢ়তা-কোমলতায়, ঘৃণায়-প্রীতিতে, হতাশা-প্রত্যয়ে আশ্চর্য রকম জীবন্ত। মানুষের প্রতি এই শ্রদ্ধাভরা ভালোবাসা, চিত্রিত বিষয়ের সঙ্গে চিত্রীর এই আত্মসমীকরণ কোল্‌ভিৎসের রচনাবলীকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। তাঁর কোনো রচনাতে ভঙ্গির প্রাধান্য বিন্দুমাত্র নেই, ফর্মের দিকে চেষ্টাকৃত নজর নেই, এমন কি প্রতীকের ব্যবহারও খুব কম। বিষয়বস্তুর দুঃসহ বাস্তবতাকে জোরালো করে তুলতে গিয়ে স্বভাবতই ফিগারগুলির অঙ্গ সংস্থানকে প্রয়োজন মতো বিষমানুপাতিক (ডিস্‌টর্ট্‌) করে নেওয়া হয়েছে—কিন্তু তাও করা হয়েছে খুব সংযতভাবে—এতো সংযতভাবে যে কোথাও অতিনাটকীয়তা প্রশ্রয় পায় নি। চিত্রালঙ্কার বর্জন করার ফলে এবং প্রধানত ভাস্কর্যানুসারী ও ফ্রেম-নিরপেক্ষ মডেলিং-এর সাহায্যে ভোল ও ভর আনার ফলে তাঁর ফর্ম এমন একটা সমাহৃত রূপ পেয়েছে যা দর্শকমনকে প্রবল ভাবে নাড়া দেয়।

কোল্‌ভিৎস নিজে বলেছেন: খুব ছেলেবেলা থেকেই তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন "কর্মরত শ্রমিকের হারকিউলিসের মতো দেহভঙ্গি আর চলমান জনতার বর্ণাঢ্য গতিচ্ছন্দ" দেখে। তাঁর সৃষ্টির পেছনে এই হলো "প্রধান প্রেরণা।" তাছাড়া পারিবারিক সূত্রেও তিনি বিপ্লবী ভাবধারার উত্তরাধিকার পান: তাঁর পিতা ও পিতামহ দুজনেই ছিলেন মধ্য-উনিশ শতকের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। শিল্পীজীবনের গোড়াতেই কোল্‌ভিৎস তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন: "স্বীকার করি শিল্পের একটা উদ্দেশ্য আছে; সমসাময়িক কালের ওপরে আমি ছাপ রেখে যেতে চাই।" এটা ছিল সেই সময়কার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সাধারণভাবে সবচেয়ে লক্ষণীয় একটা প্রবণতা। কোল্‌ভিৎস্‌ মেহনতী মানুষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন দুটি উপলব্ধির ভিত্তিতে: একদিকে তাদের নিদারুণ দারিদ্র্য দেখে তিনি যেমন যন্ত্রণা ভোগ

করেছেন, অন্যদিকে তেমনি নতুন এক ঐতিহাসিক শক্তিকে তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন—যে-শক্তি মানুষের মুক্তিকে সব সময়ে পূর্ণতর করে তুলছে। কোল্‌ভিৎসের রচনাবলীতে তাই আমরা দেখি একই সঙ্গে দৈন্যদারিদ্র্যের দুঃসহ রূপ, অন্যদিকে মুক্তির জন্যে সংগ্রামের বীর্যময় অভিব্যক্তি।

কোল্‌ভিৎসের চারটি খুব বিখ্যাত চিত্রমালা হল 'তাঁতীদের বিদ্রোহ' (দুটি লিথোগ্রাফ ও চারটি এচিং); 'কৃষকদের লড়াই' (৭টি এচিং); 'যুদ্ধের খতিয়ান' (৬টি কাঠখোদাই); এবং 'প্রোলেটারিয়াট কোলিও' (৩টি কাঠখোদাই)। প্রথম দুটি চিত্রমালা জার্মান ইতিহাসে দুটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের চিত্ররূপ এবং শেষোক্ত দুটি সমকালীন বিশ্বের সাধারণ ইতিহাস। এই চিত্রমালাগুলির প্রত্যেকটি ছবিই দুর্বিষহ দারিদ্র্য আর দুর্জয় প্রতিরোধ-সংগ্রামের অবিস্মরণীয় আলেখ্য। লড়াইয়ের পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত তাঁতীদের বৈঠক, বন্দুক-বর্শা-ডাণ্ডা নিয়ে তাদের মার্চ করে এগিয়ে চলা, ভাঙাচোরা তাঁতগুলির পাশে তাদের রক্তাক্ত মৃতদেহ ('তাঁতীদের বিদ্রোহ'); ধর্ষিতা কৃষকনারীর বুকভাঙা আর্তনাদ, খামারঘরে কৃষকদের বন্দুক-বারুদ মজুদ করা, সংঘর্ষ-মৃত্যু আর তারপরে বন্দী কৃষকদের ফাঁসি ('কৃষকদের লড়াই'); যুদ্ধে যাবার জন্যে তৈরি বালকবয়সী স্বেচ্ছাসৈনিক, বিধবা ক্ষুধার্ত জননী, বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির সামনে নিঃস্ব জনসাধারণ ('যুদ্ধের খতিয়ান'); ক্ষুধার্ত বেকার শ্রমিক, মায়ের কোলে মুমূর্ষু শিশু, মিছিলের মানুষগুলির জলন্ত চোখ ('প্রোলেটারিয়াট কোলিও')—প্রত্যেকটি ছবি আমাদের কালের জীবন্ত ইতিহাস।

কোল্‌ভিৎসের এই ছবিগুলি দেখে ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছিলেন: "আমাদের কালে মেহনতী শ্রেণীর মুক্তি-সংগ্রামকে প্রথম সার্থক চিত্ররূপ দিয়েছেন এই মহৎ শিল্পী। শিল্পের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে কেটি কোল্‌ভিৎসের মনে কোনোদিন কোনোরকম দ্বিধা জাগে নি।"

রবীন্দ্র মজুমদার

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী : অজয় ঘোষের স্মরণে

নির্বাচনের উদ্যোগপর্বে আমরা যাঁকে হারিয়েছি নির্বাচনের এই শান্তিপর্বে তাঁর জন্য শোকসন্তাপ প্রকাশের সার্থকতা বিশেষ নেই। কিন্তু অজয় ঘোষের আকস্মিক বিয়োগ বিস্মৃত হবার মতো নয় এবং এই নির্বাচনে রচিত ধূলি-কর্দমের পাড়ে আরও বেশি করে তা স্মরণীয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে রাজনীতি এত গুরুতর সাধনা যে, শিক্ষা সাহিত্যের রসোপভোগের অবকাশ তাঁর বেশি জোটে না, তা নিয়ে চিন্তা আলোচনা প্রভৃতি দূরের কথা। অজয় ঘোষের পক্ষেও সাধারণ ভাবে এই কথা সত্য। কিন্তু কমিউনিজম একটা জীবন দর্শন, সামগ্রিক সাধনা। মানুষ যে রাজনৈতিক জীব এ কথাটা অ্যারিস্টটলের আমল থেকে যেমন সত্য, মানুষ যে রসগ্রাহী জীব একথাটাও তেমনি হোমারের আমল থেকে সত্য। তাই, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে যদিও দেশের সামাজিক রাষ্ট্রীয় রূপান্তরই ছিল প্রধান সাধনা, পৃথিবীব্যাপী মানুষের জয়যাত্রা ও ভারতীয় সংস্কৃতির রূপান্তরও ছিল তেমনি তাঁর চিন্তার বিষয়। স্বল্প করে হলেও সে ক্ষেত্রে অজয় ঘোষের যে বিনীত জিজ্ঞাসা ও সহজ সহযোগিতা লাভ করা যেত, তা বিশেষ করে মনে রাখবার জিনিস। তাঁর দৃষ্টি ছিল ব্যাপক, রসবোধ ছিল স্বচ্ছন্দ, অকৃত্রিম ছিল সাংস্কৃতিক কর্মে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। সেই সূত্রে মানুষ অজয় ঘোষকেও দেখা যেত— কোনো সময়েই কারও নিকট তিনি 'দুর্দর্শ' ছিলেন না—অমায়িক, অকপট, একান্তভাবে কর্তব্যনিষ্ঠ হলেও যুক্তিতে-স্বচ্ছন্দ আলাপে প্রীতি-সরস সুহৃদ।

জন্মসূত্রে বাঙালী হলেও জীবনসূত্রে অজয় ঘোষের স্বভাষা ছিল উর্দু, আর কর্মসূত্রে লেখ্য ভাষা ইংরেজী। যৌবনে পদার্পণ করতে না করতেই তিনি উত্তর ভারতের বৈপ্লবিক দলের অন্তর্ভুক্ত হন, তারপর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাদির শেষে দীর্ঘকাল হাজত ভোগ করে এসে ভারতের বিপ্লবীদের অনেকেরই মতো অন্তর্ভুক্ত হন কমিউনিস্ট আন্দোলনে ও কমিউনিস্ট পার্টিতে। জাতীয় বিপ্লব যে একদিকে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবেরই প্রাথমিক রূপ, অন্যদিকে

বিশ্ব-বিপ্লবেরই এক একটি পদচিহ্ন—এ বোধ বিপ্লবের যুগে একটা অদ্ভুত কিছু নয়। বিপ্লবের নিজ নিয়মেই—যাঁরা কমিউনিস্ট নন, শুধুই চান স্বদেশের যুগোচিত উন্নয়ন—ইন্দোনেশিয়া থেকে ঘানা পর্যন্ত বহু দেশের সেই শ্রেষ্ঠ স্বদেশ প্রেমিকদের কি আমরা দেখি না এই বিপ্লবী ভূমিকায়? অজয় ঘোষের মতো লোকেরা এই জাতীয়মুক্তির তপস্যার কেন্দ্রটিকে মানবমুক্তির তপস্যার কেন্দ্ররূপেও উপলব্ধি করেই জীবনের ব্রত আরও মহৎ চেতনায় উদযাপন করেছেন। এটি নিশ্চয়ই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটা গৌরবের ঐতিহ্য। আর যাঁরা কমিউনিস্ট নন, জাতীয় আন্দোলনের মহান ঐতিহ্যেই মানুষ, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের মতো তাঁরাও আন্তরিক ভাবে উপলব্ধি করেন—অজয় ঘোষের মৃত্যু একটা "জাতীয় ক্ষতি"।

জাতীয় সত্তার মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিরও সত্তা যে নিহিত এ সত্য কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষেই অস্বীকার করার কারণ নেই। "স্বজাতির মধ্যে সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্যে স্বজাতিকে সত্য রূপে অনুভব" করা—ভারত ইতিহাসের এই যদি রবীন্দ্রনাথের মতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ হয় তা হলে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতারই মূলকথা এই ভারতীয় আদর্শ। অজয় ঘোষ অন্তত নিজ জীবনে তা অনুসরণ করেছেন।

ভারতের একাধিক ভাষার সঙ্গে পরিচয় ও সমগ্র ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে আত্মীয়তা আবাল্য লাভ করায় তিনি ভারতের আধুনিক পর্বের নির্মীয়মাণ সমাজজীবন ও সংস্কৃতির জটিলতা অনুসন্ধিৎসুর মতো স্বচ্ছ দৃষ্টিতে অনুধাবন করতে পারতেন। তেমনি এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারত ইতিহাসের উদ্‌যাপনীয় ঐক্যকে স্থির চিত্তে উপলব্ধি করাও ছিল তাঁর স্বভাবগত। আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য যে আমাদের ভারতীয় সংহতিরই আর এক পীঠ, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। তেমনি এই সংহতি ও বৈচিত্র্যের অদ্ভুত সাধনা যে এ যুগে একমাত্র সমাজতন্ত্রী পথেই উদ্‌যাপিত করা যায় এ বিষয়েও তিনি ছিলেন নিঃসংশয়। আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির এই 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা'ও তাই 'সমাজতন্ত্রী মানবতার'ই ভারতীয় সাধনা। এ মানবতা অবশ্য কোনো একটা মতবাদ বা তপস্যা নয়, একটা সাধনা। অদূরস্থিত মৃত্যুর ঘনায়মান ছায়ায় দাঁড়িয়েও অজয় ঘোষ দ্বিতীয় 'জাতীয় সংহতি সম্মেলন'-এ শান্ত সুস্থির আন্তরিকতায় সমস্যা ও সমাধানের যে আলোচনা উত্থাপন করেন উদ্যোক্তাদের মধ্যে তা অনুসরণ করবার মতো অভিপ্রায়

ছিল কিনা জানি না। কিন্তু তা অনুধাবন করার ইচ্ছাটুকু থাকলেও এই নির্বাচনের মধ্যে ধূলিকর্দমের ঝড় এমন ভাবে উত্থিত হতে পারত না। আর নির্বাচনের শেষে দেখতে হত না উত্তর ভারতের আকাশ ছাওয়া সামন্ত আঁধি, আর সমস্ত ভারতে আসাম থেকে তামিলনাদ পর্যন্ত ক্রমঘনায়িত আত্মনাশের অপছায়া।

নির্বাচনের শেষেও তাই অজয় ঘোষকে স্মরণ করি শুধু শোকার্ত হৃদয়ে নয়—শ্রদ্ধায় ও শান্ত সাহসের সঙ্গে—কী জাতীয় ক্ষেত্রে, কী আন্তর্জাতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে—তাঁর নিরাভিমান ঐক্য-সাধনা একটি মূল্যবান ঐতিহ্য।

সজনীকান্ত দাস

বাঙালীর পক্ষে এই ১৩৬৮ সাল বহু বিয়োগ বেদনার বৎসর। গত ২৮শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২) সজনীকান্ত দাস ৬২ বৎসরের মধ্যভাগেই অকস্মাৎ হৃদরোগে ইহলোক ত্যাগ করলেন। আমাদের মতো যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সুহৃদ (তাঁদের সংখ্যাও সামান্য নয়), এই বন্ধু বিয়োগ যে তাঁদের জীবনে কী শোকাবহ ব্যাপার তা পরিমাপ করা অপরের পক্ষে অসম্ভব। আত্মীয় বিয়োগ বিধুর তাঁর পরিবার পরিজনকে আমরা আমাদের ঐকান্তিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সজনীকান্তের শক্তি ছিল সুপ্রচুর—আমাদের এই কথা শুধু বন্ধুসুলভ অতিশয়োক্তি নয়। কারণ, জীবন দৃষ্টিতে, সামাজিক আদর্শে, কর্মক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতো বন্ধুদেরও অনেক বিষয়েই মতান্তর সুবিদিত। তথাপি কয়েকটি বিষয়ে আমাদের সংশয় নেই—সজনীকান্ত শক্তিধর পুরুষ ছিলেন। সে শক্তির কিছু পরিচয় রক্ষিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে, রচনায়। কিন্তু তার অনেকটাই ব্যয়িত হয়েছে সাময়িক পত্রের সাময়িক ধূম্র-সমারোহে। সেখানকার সহজ-লভ্য সার্থকতায়, খ্যাতিতে এবং খাতিরে একটা মোহ ও উত্তেজনা আছে। সমকালীন সাধারণের নিকট সজনীকান্তের সেই সংগ্রামোদ্যত পরিচয়টাই বড় হয়ে রয়েছে—সজনীকান্ত 'শনিবারের চিঠি'র বিদ্রূপ-বিশারদ সম্পাদক, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় এবং বাক্যকৌশলে যিনি সকল খ্যাতি ও সকল ব্যক্তিত্বকে জর্জরিত করতে সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু সজনীকান্তের এইটুকুই যথেষ্ট পরিচয় নয়। অবশ্য ঐরূপ উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃতি ঘটা অনিবার্য এবং সজনীকান্তেরই

তা ঘটত। তার অপেক্ষা দুঃখের কথা—এই প্রযোচনায় সজনীকান্তের সাহিত্যশক্তি পূর্ণপ্রকাশের অবকাশ গ্রহণ করতে পারে নি। কবিযশ ছিল তাঁর জীবনের প্রধান প্রার্থনা—তিনি তা লাভ করেছেন। কিন্তু যে পরিমাণে তাঁর কবিত্বশক্তি ছিল সে পরিমাণে সেখানে তাঁর সাধনার সুযোগ হয় নি। অবশ্য ব্যঙ্গ কবিতায় ও ছন্দের সরস ও অভাবনীয় কারুকর্মে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তা যথেষ্ট। অসামান্য স্মৃতিধর মানুষ হিসাবে গবেষণায় তাঁর অদ্ভুত যোগ্যতা ছিল এবং বাঙলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম পর্বের আলোচনায় তিনি সাধনা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্য সাধকদের কীর্তিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহচর্যে তিনি সকলের গোচর করেছেন—সজনীকান্তের এ কীর্তি অবিনশ্বর। প্রকৃত কুশলতা ছিল তাঁর গদ্য রচনায়। তিনি 'সাধু'-রীতির সদর্প পথিক হলেও তাঁর হাতে বাঙলা ভাষা হাসত, নাচত, কাঁদত, ফুঁসত—এবং অদ্ভুত চতুরতায় আবার সকৌতুকে আত্মসম্বরণ করতেও জানত। কিন্তু সাময়িক কর্মেই এ গদ্য অধিক উৎসর্গীকৃত হয়েছে। এবং আরও একটি কথা, যে 'সমালোচনার' জন্য তিনি বহু পরিচিত, 'শনিবারের চিঠি'র সেই সমালোচনা সূত্রে যতটা এ গদ্যের ধার পরীক্ষিত হয়েছে ততটা সাহিত্যাদর্শের ও সমালোচনা রীতির মান অবিকৃত বা পরিশোধিত হয় নি। সজনীকান্ত প্রাণেমনে রবীন্দ্রকাব্যে মুগ্ধ ছিলেন—এবং রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষের প্রমাণ-অন্বেষণে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা তাঁর নিষ্ঠা ও রবীন্দ্রভক্তির অক্ষয় প্রমাণ। আশ্চর্য নয় সজনীকান্ত প্রত্যেক বুদ্ধিমান বাঙালীর মতোই জীবনযাত্রায় আধুনিক পদ্ধতি মান্য করতেন। আশ্চর্য এই যে সামাজিক বিচারে বা সাহিত্য বিচারে তিনি সেই আধুনিকতাকেই করেছিলেন তাঁর বিদ্রূপের লক্ষ্য। আধুনিকতার বিরোধিতার ঐতিহ্যও বাঙলাদেশে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমল থেকেই প্রতিষ্ঠিত। সজনীকান্ত সেই ঐতিহ্যের আধুনিক এবং সুযোগ্য বাহক। এই হিসাবে রবীন্দ্র ঐতিহ্যেরই তিনি প্রতিবাদী। এই আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধ তাঁর শক্তির সম্পূর্ণ প্রকাশের পক্ষে বাধা হয়েছে। এ কথা তাঁর কবিতা, বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসের পাঠকেরা অনুভব করতে পারবেন। সাহিত্যের যে অগ্রগতির প্রেরণা ও পরীক্ষার প্রবণতাকে তিনি বাণবিদ্ধ করতেন তাতে তাঁর আন্তরিক বিরাগ কতটা ছিল বলা দুঃসাধ্য। অন্তত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়োগকালে আমরা দেখেছি সজনীকান্তের সেই অদ্ভুতশক্তি স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা,

এবং সেই সাহিত্য প্রতিভার সবল স্বীকৃতি। এই অকৃত্রিম স্বীকৃতি বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে খুব সুলভ নয়।

বাঙলা সাহিত্যের বহু দিকে এই প্রবল মানুষের অভাব অনুভূত হবে। সজনীকান্তের ও 'শনিবারের চিঠি'র মূল সাহিত্যকর্ম, আদর্শ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু যা তিনি দিয়েছেন তাঁর সে দানকে যেন আমরা অকৃত্রিম স্বীকৃতি দিই। কারণ, তা সামান্য নয়॥

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শেষ পর্যন্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আমাদের নিরাশ করেছেন। আমরা প্রায় বিশ্বাস করেছিলাম তিনি শতজীবী হবেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মতো যে দু-চারজন অশীতিপর বাঙালীকে দেখে আমরা আশ্বস্ত বোধ করতাম যে, বাঙালীও বার্ধক্যে অবনত না হতে পারে, তার মধ্যে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন সম্ভবত জ্যেষ্ঠ। ডাঃ যদুনাথ সরকার পূর্বেই গত হয়েছেন। এখন এই ফাল্গুনেই হেমেন্দ্রপ্রসাদকে আমরা হারালাম। দুঃখ বা শোক করবার মতো কারণ থাকত না—যদি দেখতাম বার্ধক্য এঁদের পক্ষে দুর্ভার বোঝা। হেমেন্দ্রপ্রসাদ যেরূপ দৃঢ় সতেজ পদক্ষেপে এসে সভার সমিতিতে দাঁড়াতেন, যেরূপ স্বচ্ছন্দ দেহে ও মনে ট্রামে গিয়ে উঠতেও দ্বিধা করতেন না, আর যেরূপ অম্লান দেখতাম তাঁর বুদ্ধি, তাঁর বহু সঞ্চিত স্মৃতির ভাণ্ডার, তীক্ষ্ণ বাক্যযোজনায় ও যুক্তি রচনায় শক্তি, তাতে সত্যই কামনা করতাম তিনি শতজীবী হোন এবং আমাদের মনে আরও এরূপ আশ্বাস সঞ্চার করুন। আশা পূর্ণ হলো না—আমাদের বিবেচনায় অকালে তিনি তাঁর প্রিয় বাঙালী জাতিকে ত্যাগ করে গিয়েছেন। সান্ত্বনা এই—দানে তাঁর কার্পণ্য ছিল না। আজীবন তিনি বাঙালী ভাষার সেবা করেছেন—যখন রবীন্দ্রনাথও ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের দুর্বোধ্য কবি, সেই ছাত্রজীবন থেকে হেমেন্দ্রপ্রসাদ বাঙলা সাহিত্যের উদ্যোগী ও উৎসাহী যাত্রী। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ কত অশ্রান্ত ও বিচিত্র পথেই যে তিনি সেই দিন থেকে বিচরণ করেছেন তার সংবাদ সংগ্রহ করাও আজ কঠিন। মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সেই সাহিত্য-সঙ্গীতের আসরের কথা একালের সাহিত্যিকরা অনেকেই শোনেনও নি। তবে হেমেন্দ্রপ্রসাদের প্রধানত পরিচয় সাংবাদিক জগতের জ্যোতিষ্করূপে—অরবিন্দ-বিপিন পালের সঙ্গে যিনি ইংরেজীতে সহকারিতা করেছেন, সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেদিনের

'বেঙ্গলী'তে কলম চালিয়েছেন, প্রথম মহাযুদ্ধে ইওরোপের রণাঙ্গণে প্রেরিত হয়েছিলেন সরকারের দ্বারা, 'বসুমতী'তে যিনি পূর্বাপর অজস্র সম্পাদকীয় লেখা লিখেছেন, আমৃত্যু ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার অধ্যাপনায় নিযুক্ত; সবচেয়ে প্রধান কথা—যাঁর স্মৃতি ছিল প্রখর, আর সযত্নে যিনি সংগ্রহ করে রেখে গিয়েছেন সংবাদপত্রের পুরনো প্রমাণমালা—আজ তাঁকে হারিয়ে মনে হলো আমরা যেন একটা জীবন্ত পাঠগৃহকে হারালাম। তাঁর সংগ্রহমালা সুরক্ষিত হলে হয় তো খেদ কতকটা মিটবে।

'ক্যাজুয়েলটি'

যুদ্ধে নাকি সত্য হয় প্রথম 'ক্যাজুয়েলটি'। ভারতীয় নির্বাচন সে অর্থে যুদ্ধ নয়। কারণ, তার অনেক আগেই সত্য একেবারে সিংহমার্কা 'সত্যমেব জয়তে' রূপে ক্যাজুয়েলটি হয়ে গিয়েছে। কাজেই নির্বাচনে তার ক্যাজুয়েলটি হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ভোটাভুটি সত্য দিয়ে হয় না, সত্য আশ্রয় করেও হয় না। হয় ক্ষমতার জন্য, অর্থ ও অনর্থকে আশ্রয় করে। অর্থ ও অনর্থের ব্যবহার সব রকমেই এ ক্ষেত্রে fair। আর যুগটা যখন সেনাপাওনার যুগ তখন কেন মনে করব অর্থটা অনর্থ, কিম্বা অনর্থ বস্তুটা নিরর্থক?

"সকল মানুষেরই দাম আছে"—তবে সাংবাদিকের থেকে বিসম্বাদিকের দাম ভোটের দিনে আরও বেশি। মানুষের থেকে অনেক বেশি দাম মর্কটের এবং সংস্কৃতির থেকে বিকৃতির। বাজারটায় যখন পড়তা তখন সংস্কৃতির ব্যাপারী কি above the battle থাকবে? আর তার চোখের সামনে দিয়ে নির্বাচনের 'বাস' সর্বজাতীয় যাত্রী নিয়ে ধুলো উড়িয়ে, পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে, যান্ত্রিক বিষাণ বাজিয়ে চলবে রাজপুরীর দিকে? আমরা অন্তত সংস্কৃতি-কর্তাদের এ রকম আচরণের কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাই না। তাশখন্দে না হয় 'কলোনিয়ালিজম' শব্দটাই অস্পৃশ্য এবং তাতে সাহিত্যিক অধ্যাত্ম-শুচিতা বিনষ্ট হয়। কিন্তু তাই বলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো দিন রাজনীতিকে পরিত্যাজ্য মনে করেন নি। যে বাঙালী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা সোভিয়েত-এর বোমা-বিস্ফোরণে শিউরে উঠেন, তাঁদের কেউ কেউ আবার ব্রিটিশ-মার্কিন বোমা-পরীক্ষায় এখন হয়তো রোমাঞ্চিত হন—কারণ তাঁরা রবীন্দ্র-মানবতার ঐতিহ্যবাহী। আর রবীন্দ্রনাথ যদি দিল্লীর পরে মনুমেন্টের তলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকেন, তা হলে বারাসতের মাঠেই বা

উদয়শঙ্কর-অমলাশঙ্কর ছুটে গিয়ে দাঁড়াবেন না কেন? রবীন্দ্রনাথ বাণীর পশারী, ওঁরা ভঙ্গির ব্যবসায়ী। এই ঘোড়ের চালের মুখে যদি মন্ত্রী মহাশয় আপনাকে বাঁচাতে উদয়শঙ্করের ফুটো নৌকোকে চাপান দেন, শম্ভুবাবুদের আড়াই-চালের অশ্ব নীতিকে আঁকড়ে ধরেন, আর মনোজবাবুদের গজ-গতিকেও বিনা অঙ্কুশেই তাড়িত করেন, তা কি তাঁদের অপরাধ? উদয়শঙ্কর রাজনীতি বোঝেন না (এ সত্য কথা কে না মানে?), তিনি মন্ত্রীনীতিরই অনুগামী (এ কথা বা কে না মানে)। এরূপেই উল্টোদিকে শম্ভু মিত্র রাজনীতি ছাড়া কিছুই করেন না, একথাও তিনি এবং সকলেই স্বীকার করবেন। তা হলে তাঁর রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি ও হুমায়ুনী কাব্যামৃত পরিবেশন অর্থনীতি হতে যাবে কেন? আমরা বিশ্বাস করি, তাও রাজনীতি, তবে এ ক্ষেত্রে মন্ত্রীর রাজনীতি—জনসমাজের রাজনীতির থেকে অনেক বেশি বা দামী। কারণ, জনতার রাজনীতি তো কুড়ি বৎসর শম্ভুবাবু দেখেছেন, কই, কুড়ি বৎসরেও তো সে রাজনীতির কোনো ফল দেখেন নি? শুধু 'ফেলই' দেখেছেন—১৯৪৩ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত এই তো অভিজ্ঞতা। অথচ এ কালের মধ্যেই মন্ত্রীদের রাজনীতির প্লাবন তো পদবীতে-পারিতোষিকে-সম্মানে-সংগঠনে কত খ্যাত-অখ্যাত এবং কুখ্যাত—কত ক্ষেত্রকেই সুজলা, সুফলা করে তুলল। তিনি বা এমন সুফলা রাজনীতিকে আশ্রয় করতে সক্ষম হবেন না কেন? মনোজ বসুর তো চিরদিনেরই কথা "ভুলি নাই"—"রাজনীতিও চিনি, সাহিত্যও চিনি, কিন্তু ব্যবসা ভুলি নাই।" তিনি চীনময় হোন্, রুশময় হোন্, বাঙময় হোন্—দেশে দেশে যতই ঘুরুন, যতই নাচুন, যতই হাসুন, যতই ভালোবাসুন—আহার্যপাত্রে যেমন, আহরণ ভাঁড়ার সম্বন্ধেও তেমনি তাঁর সেই একই কথা "ভুলি নাই।"

কেউ ভুল করেন নি—সংস্কৃতির থেকে বিকৃতির দামটা যখন বেশি সংস্কৃতিকে ক্যামুফ্লেজটি হতেই হবে, Every man has his price. এটাই এই নির্বাচনী রাজনীতির শিক্ষা।

গোপাল হালদার

পাঠকদের প্রতি

গত সংখ্যায় আমরা 'পরিচয়'-এর দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এই সংখ্যায় তার কিছু কিছু কার্যকরী করা হয়েছে।

- নিউজপ্রিন্টের বদলে এই সংখ্যায় পুরু অ্যান্টিক কাগজ ব্যবহৃত হয়েছে।
- পৃষ্ঠা-সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।
- কয়েকটি নতুন ফিচার শুরু করা হয়েছে।
- প্রচ্ছদ-চিত্র বদলানো হয়েছে। চিত্রের একটি প্রতিলিপিও দেওয়া হয়েছে।
- রচনার মানও কিছুটা উন্নত করা গেছে।

আশা করা যাচ্ছে

- পৃষ্ঠা-সংখ্যা আরও বাড়ানো যাবে।
- আরও কয়েকটি নতুন ফিচার শুরু করা যাবে।
- রচনার মান আরও উন্নত করা যাবে।
- বৈশাখ থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা যাবে।

এই উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করতে গিয়ে ব্যায় অনেক বেড়েছে। চার আনা মূল্য বৃদ্ধি করেও সে ব্যায় সঙ্কুলান হবে না—যদি না 'পরিচয়'-এর বিক্রয় সংখ্যা বাড়ে

আমাদের বিজ্ঞাপনভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। পাঠকদের কাছেই তাই আমাদের আবেদন জানাতে হচ্ছে :

আরও ভালো, আরও বড় 'পরিচয়'-এর জন্ম আপনি নিজে গ্রাহক হোন। আপনার বন্ধুকে গ্রাহক করুন। উপহার হিসেবে প্রিয়জনকে 'পরিচয়'-এর গ্রাহক করে দিন।

ল্যান্ডস্কেপ — দেবকুমার রায়চৌধুরী

সূ চী প ত্র

চৈত্র ১৩৬৮

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩০ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩১ । সংখ্যা ৯
চৈত্র । ১৩৬৮

বোদল্যার এবং বোদল্যার-কাব্যের অনুবাদ

অরুণ মিত্র

আত্ম-দর্শনেই বোদল্যার[1]-এর শ্রেষ্ঠতা এবং বোদল্যার-এর শোচনীয়তা। তাঁর আগে এমন ক'রে কেউ নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত হননি। কবিদের মধ্যে তিনিই যে প্রথম নিজের দিকে তাকালেন এমন নয়, অনেকেই তাকিয়েছিলেন, বিশেষত অব্যবহিত পূর্বের কবিরা। বস্তুত তাঁদের সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর সাদৃশ্য যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর মতো অনুসন্ধান তাঁদের ছিল না। আত্মকেন্দ্রিত দৃষ্টির পথে তিনি পৃথিবীর মুখ দেখার চেষ্টা করেন। কে আর এত একাগ্র চেতনায় দুই জগৎকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন? অন্তরের রাজ্যে বোদল্যার-এর অন্বেষা ছিল যেমন সচেতন তেমন ক্লান্তিহীন। আবিষ্কারীর মতো। যে অন্ধকার অতলে নামতে ভয় করে, সেখানে নেমে তিনি তাঁর মানুষী প্রকৃতিকে উদ্ঘাটিত করেন এবং তাতে সব মানুষের প্রতিফলন দেখেন। এই স্বরূপ-উদ্ঘাটন কবিতার মাধ্যমে, অতএব কবিতায় তিনি তাঁর পূর্ণ সত্তাকেই নিযুক্ত করেন। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, কবিতা এবং জীবন তাঁর কাছে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কবিতার এই নিরবচ্ছিন্ন একান্ত জীবন-সংযোগের রূপ বোদল্যারেই আমরা প্রথম পেলাম। তিনিই দেখালেন, কবিতা রচনা এবং কবিতা ও জীবন সম্বন্ধে ভাবনা পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো। এক নতুন আদর্শ পরবর্তী কবিদের সামনে স্থাপিত হলো। কবিতা যে এক উচ্চতম বৃত্তি এবং তার সঙ্গে যে অন্য কিছুর বিনিময়

১। বোদল্যার লেখাই ভালো। 'বোদলেয়ার' লিখলে শেষে দুটো স্বরধ্বনি আসে : এ এবং আ। কিন্তু ফরাসী উচ্চারণে মাত্র একটা ধ্বনি। অ্যা ধ্বনিকে একটু দীর্ঘ ক'রে বললে অনেকটা ঠিক হয়।

চলে না, এই ধারণা তিনি তাঁর চিন্তা ও জীবন দ্বারা সঞ্চারিত করেন। অর্থ, যশ, সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন; কবিতার প্রতি আনুগত্য বৈষয়িক আসক্তিকে তাঁর মনের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দেয়নি। যেহেতু কাব্য তাঁর কাছে খেলার বিষয় ছিল না, সেহেতু তার পদ্ধতি-প্রকরণ সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। শব্দের মূল্য, প্রয়োগের যাথার্থ্য, ছন্দ, মিল ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ও পরিশ্রমের শেষ ছিল না। এও কবিকর্মীদের সামনে এক নতুন দৃষ্টান্ত।

বোদল্যায়-এর কবি-স্বভাবে প্রধান প্রেরণা ইন্দ্রিয়ানুভূতির। তারই স্পর্শে চোখ খুলে তিনি নিজের ভিতরে তাকিয়েছেন। পৃথিবী তাঁর মধ্যে যে অনুরণন জাগিয়েছে তাও যেন তাঁর স্নায়ুরই অনুরণন। তাঁর কল্পনা হৃদয়োচ্ছ্বাসকে অবলম্বন ক'রে বিস্তৃত হয়নি। তিনি মূলত অনুভবের কবি। ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রখর ক'রে তিনি সমস্ত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন এবং জীবনের রহস্য অনুসরণ করেছেন। অনুভব-আশ্রয়ী কবিতার অন্যতম উদ্গাতা তিনি। শুধু তাই নয়, স্বপ্নপ্রয়াণে, অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যের উন্মোচনে এবং তাবার যাদুকরী ক্ষমতার অনুধ্যানে তিনি কবি-শিল্পীর এক নতুন ভূমিকায় ইঙ্গিত দেন। বাহ্য জগৎকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করার কথাও এই সঙ্গে তিনি বলেন। বস্তুপুঞ্জ এক গোপন সত্যের ব্যঞ্জনামাত্র, বর্ণ গন্ধ ধ্বনির মধ্যে মূলত কোনো ভেদ নেই, তারা এক আইডিয়ারই সঙ্কেত এবং কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থগুলিকে উপমা হিসেবে ব্যবহার ক'রে অন্তরালবর্তী সত্যিকার জগৎকে উন্মোচিত করবে, এই তাঁর বক্তব্য। অবশ্য এ-সব বোদল্যায়-এর মৌলিক কোনো চিন্তা নয়। একাধিক পূর্বগামীর চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তিনি কাব্য-ভাবনায় তা গ্রহণ ক'রে এবং কবির জীবন ও আচরণের সঙ্গে তা যুক্ত ক'রে এক অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেন। দ্রষ্টার ভূমিকায় ব্রতে আকুল র‍্যাবোর পক্ষে তাই বোদল্যায়কে "প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, এক সত্যিকার দেবতা" ব'লে উচ্ছ্বসিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

অতএব বিভিন্ন দিক থেকে বোদল্যায় আগামী কাব্যের এক উৎসস্থল। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সব রকম নতুন কাব্য-প্রয়াণের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তিনি রেখে যান। বরং উল্টে এই কথাই বলা যায় যে, তাঁর স্থির সঙ্কীর্ণ মানস-পরিসরে ওরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন সম্ভবই ছিল না। তাঁকে পথপ্রদর্শক এই হিসেবে ধরা যায় যে, তাঁর চিন্তায় ও চেষ্টায় এমন কিছু

কিছু বীজ ছিটিয়ে ছিল যা পরে বিভিন্ন কবিকর্মী আহরণ ক'রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বপন করেন এবং সযত্নে বড় ক'রে তোলেন। যে-সব মহীরুহ আকার নেয়, বোদল্যার নিশ্চয়ই তাদের কল্পনা করেননি। ভের্‌লেন, র‍্যাঁবো, মালার্মে এবং আরও পরে ভালেরি ও সুররেয়ালিস্টরা তাঁর কাছ থেকে যে প্রেরণাই পেয়ে থাকুন, তাঁর সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান বিস্তর। তবু বোদল্যার কাব্যের নতুন পর্বের অর্থাৎ আধুনিক কাব্য ব'লে যাকে অভিহিত করা হয় তার প্রারম্ভ-সীমা। সেদিক থেকে তাঁর গুরুত্ব ঐতিহাসিক।

বোদল্যার নিজের অন্তরে অবগাহন ক'রে যে মানুষটিকে দেখেছিলেন এবং যার মুখের আদলে অন্য মানুষদের মুখ মিলিয়েছিলেন, সে মানুষটি কিন্তু অসুস্থ। অবশ্য অংশত সে অসুস্থতা নতুন যুগের এক নাগরিক অসুস্থতা। যুগের ছাপ তাতে আছেই। কিন্তু এও ঠিক যে, মানুষ বোদল্যার শরীরে ও মনে অসুস্থ ছিলেন। শিশুকাল থেকেই তাঁর স্নায়ু পীড়িত এবং তাঁর মন পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক কারণে তিক্ত ও অস্থির। পরস্পরের প্রতিক্রিয়ায় এরা আরও জর্জর হয়েছে। অনিয়মে ও ব্যাধির আক্রমণে শরীর ভেঙে পড়েছে। মন নানান উদ্ভাবনে বার বার উদ্ধার খুঁজেছে, আর ব্যর্থ হয়ে শুরু করেছে আত্মনিগ্রহ অথবা এক সঙ্কীর্ণ বিদ্রোহ। তাঁর বাক্যে ও বেশভূষায় অন্যকে বিস্মিত করবার, সন্ত্রস্ত করবার যে প্রবণতা দেখা যেত, তা অংশত এই বিদ্রোহের একটা প্রকাশ মনে হয়। কবি ব'লে তাঁর মধ্যে স্বভাবগত উদ্দীপনা ছিল; কিন্তু তারই সঙ্গে উল্টোপিঠে ছিল এমন এক জীবন-বিমুখতা যা স্বাভাবিক নয়। "শৈশবেই আমার হৃদয়ে আমি দুই বিরুদ্ধ ভাব অনুভব করেছি: জীবনের বিভীষিকা এবং জীবনের উন্মাদনা। বিচলিত-স্নায়ু নিষ্কর্মার চরিত্র এটা।"—এ তাঁর নিজেরই কথা। শেষ পর্যন্ত অস্বাভাবিকতা যেন তাঁর এক বিলাসেই দাঁড়িয়েছিল। মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে তাঁর ডায়েরীতে তিনি লেখেন: "আমার হিস্টিরিয়াকে আমি উপভোগের সঙ্গে এবং সন্ত্রাসের সঙ্গে বর্ধিত করেছি।"

তাঁর কবি-সত্তা অবশ্যই স্বপ্নের জগতে উত্তরণ চেয়েছে। তাঁর অলস উপভোগ-বাসনার সঙ্গে সমঞ্জস এক আশ্চর্য দেশের কল্পনা তিনি করেছেন। সুন্দরকে অন্বেষণ করেছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি, জীবন তাঁকে শূন্যতার বোধই দিয়েছে। তাঁর মনের ভিতরকার বিভীষিকা ও নৈরাশ্য তাঁকে আরও বেশি চেপে ধরেছে। তিনি জীবনের রহস্য সন্ধানে বেরিয়ে নিজের অন্তরে এবং

মানুষের অন্তরে দেখেছেন পাপের রাজত্ব। দেখেছেন, শয়তান সুতো ধ'রে আমাদের সকলকে নাচাচ্ছে। আদি পাপের বোধে তাঁর মন আচ্ছন্ন ছিল, অথচ শয়তানের হাত থেকে পরিত্রাণের সম্ভাবনা তিনি দেখেননি। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি পাপের আলিঙ্গনে নিজেকে আরও ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে আলিঙ্গনের মধ্যে জ্ঞান হারাতে চেয়েও তিনি জ্ঞান হারাননি। বোধলুপ্তি তাঁর কখনও ঘটেনি। অনুভূতির পাশাপাশি অপ্রমত্ত বুদ্ধি সব সময়ই তাঁর মধ্যে বাস করেছে। বিকৃত অস্তিত্বের দৃশ্য বার বার তাঁর মনশ্চক্ষুর সামনে এসেছে। প্যারিসের নগর-জীবনের যে অংশ কাতর, মলিন, বিকৃত, তা স্বভাবতই তাঁর সৃষ্টির একটা পটভূমি হয়েছিল। এ রকমভাবে বাঁচলে এক ধরনের মানসিক অকাল-বার্ধক্য অবশ্যম্ভাবী (পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তিনি শরীরেও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন)। তাঁর কবিতায় তাই পড়ি: "আমি এক বর্ষণ-ক্লিষ্ট দেশের রাজা, ধনী কিন্তু ক্ষমতাহীন, যুবক তবু অত্যন্ত বৃদ্ধ।" (Spleen-৩)

অতএব জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা আসা অস্বাভাবিক নয়, বরং অনিবার্য। এই বিতৃষ্ণা তাঁর কাব্যে ওতপ্রোত। এ এক শোচনীয় মানসিক অবস্থা যা তিনি তাঁর কাব্যে অসাধারণ ক্ষমতায় চিত্রিত করেছেন। অনীহা ও বিষাদ তাতে অবশ্যই আছে, কিন্তু তিক্ততাও আছে। এবং উগ্রতা তা থেকে দূরে নয়। তাঁর 'Ennui'-র ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় তাঁর 'Spleen', যাকে একজন ফরাসী সমালোচক "নিশ্চল উগ্রতা" ব'লে বর্ণনা করেছেন। তাঁর নৈরাশ্য এবং বিক্ষোভের অবস্থান পাশাপাশি।

বোদল্যার-এর ট্র্যাজিডি হলো এই যে, এ অবস্থা থেকে তিনি নানা উপায়ে উদ্ধার পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পাননি। প্রণয় ও যৌনতা, নেশা ও স্বপ্ন (আমার মনে হয়, এমনকি তাঁর তত্ত্বগুলোও) যেন তাঁর অভ্যন্তরীণ শূন্যতা ও বিশৃঙ্খলাকে ভুলবার চেষ্টা। তাঁর জীবনযাত্রায় ও কাব্যে এ চেষ্টার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। তিনি সফল হননি, কারণ তাঁর বুদ্ধি ও চেতনাকে তিনি ঘুম পাড়াতে পারেননি। La Fontaine du Sang কবিতায় তার স্বীকৃতি অকপট। ঘুরেফিরে তিনি নিজের অস্তিত্বের দৈন্তকে দেখেছেন, যাকে মানুষেরই অস্তিত্বের রূপ ব'লে তাঁর মনে হয়েছে। পরিচিত পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছেন: "যেখানে হোক, যেখানে হোক, এই পৃথিবীর বাইরে।" অজানায় ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্তে অস্থির হয়েছেন। অবশেষে

সতৃষ্ণভাবে তাকিয়েছেন মৃত্যুর দিকে: "হায় মৃত্যুই সান্ত্বনা, সে-ই বাঁচায়। সে-ই হল জীবনের লক্ষ্য।" (La Mort des Pauvres)। তাঁর কাব্যে মৃত্যু এক আচ্ছন্নতার মতো বিরাজমান। কিন্তু মৃত্যুর বিস্ময় তাঁকে আকৃষ্ট করলেও শেষ পর্যন্ত তা আর বিস্ময় থাকে না। কল্পনায় তার পরেও নিজের চেতনা ও মুক্তি জেগে থাকে। এই চরম দুর্ভাগ্যের অভিব্যক্তি Le Rêve d'un Curieux। এর পরে আর কি থাকতে পারে, ঘুরে ফিরে সেই জীবনের গহ্বরে মাথা কোটা ছাড়া?

বোদল্যার-কাব্যে মহত্ব যদি কিছু থাকে, তবে তা অন্য এক নতুন জীবনের জন্যে কবির আকাঙ্ক্ষায় নিহিত। যদিও এ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গতি কিছু নেই, তবু তার একটা ধ্বনি আছে তাঁর কাব্যে। শিল্পের শ্রেষ্ঠতা স্মরণ এবং শিল্পের মাধ্যমে এক অসামঞ্জস্যবিনাশী রহস্যময় ঐক্যে উপনীত হওয়ার কল্পনা তার সঙ্গে যুক্ত। বাঁচবার জন্যে তাঁর প্রয়াসের সেই চিহ্নও ইতস্তত কিছু আছে। আর আছে কয়েকটি কবিতার বিপুল গাম্ভীর্যে এক ক্ষণিক প্রশান্তির স্বর। ঐটুকুই আলো। নইলে তাঁর কাব্যের আবহাওয়ায় হাঁপ ধ'রে আসে। গহ্বর ও কারাগারের অস্তিত্ব সেখানে সর্বব্যাপী। পাপবোধে, শয়তানের লীলায়, যৌনতা-জড়িত বিক্ষেপে, অবসাদে, বিতৃষ্ণায় এবং এক মুক্তিহীন বিকারগ্রস্ততায় জীবনের রূপ সেখানে অভিভূত। তা ছাড়া তাঁর কাব্যে পরিসরের স্বল্পতা এবং পুনরাবৃত্তি ক্লান্তিও আনে। কিন্তু তাঁর কবি-শক্তিকে অস্বীকার করা অসম্ভব। পরন্তু তাঁর শক্তির কারণেই তাঁর সৃষ্টি আরও কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এক যন্ত্রণা-জর্জর মানুষকে প্রত্যক্ষ ক'রে যন্ত্রণা পাই। নিজের প্রতিরূপে যে মানুষকে তিনি এঁকেছেন, সে সম্ভোগ ও বিতৃষ্ণায় সদাবিক্ষিপ্ত, ঈশ্বরে উন্মুখ হয়েও শয়তানের দ্বারা কবলিত। এ রূপ একটা অবস্থায় সত্য হলেও হতে পারে, কিন্তু বোদল্যার তাকে অনারোগ্য এবং ভবিষ্যৎহীন ক'রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আধুনিকতার আদি কবির চোখে এই মানুষ। কিন্তু সে নিশ্চয় অবক্ষয়ের মানুষ। সেই মানুষকে তিনি বিসূচিকা-রোগীর অন্তিম চেতনার মতো প্রখর চেতনা নিয়ে এঁকেছেন এবং সেটাকেই জীবনের রূপ ভেবেছেন। তাঁর এই চেতনায় আশ্চর্য না হয়ে আমরা পারি না। কিন্তু জীবনের রূপ?

বোদল্যার-কাব্য সাধারণভাবে আর আমাদের ভাবনা-সংলগ্ন হতে পারে না। মানুষের সত্তা অপ্রতিকার্যভাবে দূষিত, এই উপলব্ধি তার ভিত্তি এবং

শহরের ও শূন্যতার অনুভব তার আধার। এ উপলব্ধি ও অনুভবকে সবল ক'রে বাঁচা মানে না বাঁচা। (বোদল্যার আরও বাঁচলে তাঁর কাছে কবিতা লেখারই কোনো অর্থ কি আর বেশিদিন থাকত?) জীবনের দারুণ অধৈর্য ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আজ জীবনের আগ্রহ কম প্রবল নয়। তার উদ্যমও। বোদল্যার-এর আত্মপীড়িত পরিক্রমায় আমাদের উচ্ছলতা দূরে-থাক যন্ত্রণারও প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাব না। কিন্তু ইতিহাসের পটে সাহিত্যের বিবর্তনে এ কাব্যের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এ কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের অবশ্যই উচিত। শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রায় সম্পূর্ণ বোদল্যার-কাব্য (-পদ্য) বাংলায় অনুবাদ ক'রে সেই পরিচয় ঘটালেন। এজন্তে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য। তবে বোদল্যার সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিকোণ পৃথক। স্পষ্টতই তিনি বোদল্যার-এর একান্ত ভক্ত। তাঁর ভূমিকা পড়লে মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত কাব্যে বোদল্যার যেন উচ্চতম শিখর, যেন তা আমাদের সামনে এক চূড়ান্ত আদর্শ। এই কাব্যে যা কিছু লক্ষণ আছে সবই যে সাহিত্যের মহালক্ষণ তা বোঝানোর জন্তে তিনি চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক শ' বছর আগেকার অবক্ষয়-ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করা কি সম্ভব? তবে এটা বলা উচিত যে বোদল্যার-এর নিঃশর্ত প্রশস্তিতে বুদ্ধদেব বসু একক নন। নানা দেশের নানা সমালোচক তাঁর সঙ্গী। ভূমিকায় বোদল্যার ছাড়াও অন্ত লেখকদের বিষয়ে এমন মন্তব্য আছে যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। যেমন, লা ফঁতেন সম্বন্ধে মন্তব্য। তাঁকে কি অত সহজেই বালক র‍্যাঁবোর জবানিতে অকবি ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায়? লা ফঁতেন-এর 'সিরিস্‌ম্‌' যাকে বলা হয় তা কি একেবারেই ভুয়ো? তিন শ' বছর আগে যিনি এক আধুনিক ছন্দের সূচনা করেছিলেন, তাঁর শিল্পী-ক্ষমতা কি সাহিত্য-বিচারে খুব তুচ্ছ? আসলে বুদ্ধদেব বসু বলতে চান রোমান্টিক যুগের আগে ফ্রান্সে সত্যিকার কোনো কবিতাই লেখা হয়নি। মনে হয়, তিনি যেন ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কাব্যকলা ও কাব্যভাবনা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রত্যাশা করেন এবং তা না পাওয়ায় তিনি বিরক্ত। যাক, এ সব ভিন্ন প্রসঙ্গ। বোদল্যারই বিবেচ্য।

বোদল্যার-এর বাস্তব উপস্থিতি তাঁর কবিতায়। সেটাই পাঠকদের কাছে সব চেয়ে বড় সত্য। তা থেকে তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। উপলব্ধি, প্রতিক্রিয়া, দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে। আনন্দের কথা এই যে, বুদ্ধদেব বসু

বোদল্যায়-এর উপস্থিতিকে বাঙালী পাঠকের ইন্দ্রিয়গোচর করলেন এবং বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ-শাখাকে পুষ্ট ক'রে বাঙালী সাহিত্য-অনুসন্ধিৎসুর জানার সীমানা বাড়িয়ে দিলেন। বোদল্যায়-এর এতগুলি কবিতা (১০৮টি) অনুবাদ করতে যে সময় ও পরিশ্রম তাঁকে নিয়োজিত করতে হয়েছে, তা সামান্য নয়। শুধু কবিতার অনুবাদই তিনি করেননি, বোদল্যায়-এর জীবন ও কাল সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ক'রে লিখেছেন এবং বিভিন্ন কবিতার টীকা করেছেন। এই উত্তম অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য।

দুই

কবিতার অনুবাদ দুরূহ কাজ। তার সমস্যা অভ্যন্তরীণ ও বহিরঙ্গ রূপ নিয়ে, যারা পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মূল কবিতার বক্তব্য অবিকৃত রাখতে হবে এবং যথাসম্ভব তার আবহাওয়াও। সেই সঙ্গে তার গঠন এবং ভাষার বৈশিষ্ট্যকেও বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। এই সব বিষয়ে অবহিত থেকে কবিতার ভাষান্তর করলে তবে অনুবাদ সার্থক হ'তে পারে, অর্থাৎ মূলের একটা আস্বাদ পাওয়া যেতে পারে। এ কাজ কবি ছাড়া অন্যের দ্বারা সম্ভব মনে হয় না। কারণ শিল্পগত দক্ষতার প্রশ্ন তো আছেই, তা ছাড়াও আছে হৃদয়গত সহানুভূতির প্রশ্ন। যে কবিতা অনুবাদ করব তার ভিতরে বাস করা দরকার, সাময়িকভাবে তার হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়া দরকার। যে কোনো অনুবাদেই এ প্রশ্ন আসে। আর সমগ্রভাবে কোনো কবিকে অনুবাদ করতে গেলে তো কথাই নেই। এদিক থেকে বুদ্ধদেব বসু বোদল্যায়-অনুবাদে স্বাভাবিকভাবে অধিকারী, বিশেষত যে কবির প্রতি তিনি এমন পরিপূর্ণরূপে শ্রদ্ধাবান।

ভাষার বদল ঘটাতে হয় ব'লে মূলের গঠন অনুবাদের এক দারুণ সমস্যা। এ সমস্যা মোটামুটিভাবে সমাধান করা ছাড়া উপায় নেই। ছন্দ ও মিল যেখানে আছে, যেমন বোদল্যায়ে আছে, সেখানে ছন্দ ও মিল রাখতেই হবে; কিন্তু মূলের ছন্দ ও মিল রাখার কোনো প্রশ্নই নেই, কারণ সে অন্য ভাষা। কেবল ছকটা রাখাই এ ক্ষেত্রে কর্তব্য, যাতে মূলের গঠনের একটা আভাস পাওয়া যায়। মূল ছন্দের একটা চলন যেন নিশ্বাসের আন্দাজেই রাখতে হবে। এবং মিলের ক্রমটা। ছন্দ ও মিল দিয়ে লিখতে গেলে মূলের কিছু শব্দ অন্য ভাষায় প্রতিশব্দ থাকলেও বাদ পড়বে এবং নতুন শব্দ কিছু

বলবে। এ এড়ানো যাবে না। এ অবস্থায় কবিতার চরিত্রের পক্ষে অপরিহার্য কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যাতে বাদ না যায় এবং কবি-চরিত্রের সঙ্গে অসমঞ্জস কোনো ভাষাভঙ্গী না আসে, এই সাবধানতাটুকু প্রয়োজন। ধ্বনির সমস্যাও আছে। কিন্তু এক ভাষার ধ্বনি অন্য ভাষার আর কি ক'রে আনা যাবে? মোটের উপর এই করতে পারি যে, গম্ভীর ধ্বনিকে ভাষান্তরে গম্ভীরই রাখব এবং লঘু ধ্বনিকে লঘু। এ বিষয়ে যথেচ্ছ আচরণ করব না। বলা বাহুল্য, শব্দ, মিল ও ছন্দ মিলিয়েই এই ধ্বনি। কবিতা বর্তমানে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাতে আর এক ধরনের সমস্যাও দেখা দিয়েছে। বাক্যের ব্যাকরণগত অর্থ অনেক সময় স্পষ্ট না হওয়ায় অনুবাদ প্রধানত নির্ভর করে ভাষ্যের উপর। অর্থাৎ অনুবাদক কবিতায় কি ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করছেন তার উপর। কিন্তু বোদল্যার-এর ক্ষেত্রে এ অসুবিধে নেই। কারণ বিশেষ কোনো শব্দের সংস্থাপন, চিত্রকল্প এবং ভাব তাঁর কবিতায় যে রহস্যই সঞ্চার করুক না কেন, বাক্যের গঠন তা থেকে মুক্ত। তাঁর কাব্যে এমন জায়গা খুব কমই আছে, যেখানে ব্যাকরণগতভাবে তাঁর বাক্যের অর্থ করতে ক্লেশ হয়।

ভাষান্তরে অনেক সময়ই কবিতা আর কবিতা থাকে না, কতকগুলো শব্দের সমষ্টিতে দাঁড়ায়। বোঝা যায়, তা নেহাৎ অনুবাদ। বোদল্যার-অনুবাদে বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্ব এই যে, এতগুলি কবিতার তিনি পাঠযোগ্য রূপান্তর ঘটিয়েছেন। অনেক অনুবাদই কবিতার স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে। কিন্তু সেটাই সব নয়, এমন কি আসলও নয়। মূলের বৈশিষ্ট্য কতখানি থাকল, সে প্রশ্ন একান্তভাবে বিবেচ্য। কিছু অনুবাদ বাস্তবিকই ভালো। সেগুলিতে যেন মূল কবিতার স্পর্শ পাওয়া যায়, ধ্বনিতে এবং ভাবে। যেমন, 'পণ্য কবিতা', 'শত্রু', 'সৌন্দর্য', 'সপ্রাণ মশাল', 'আধ্যাত্মিক ঊষা', 'বিতৃষ্ণা', 'আবেশ', 'এখনো ভুলিনি তাকে', 'মহাপ্রাণ সেই দাসী', 'পাতকিনী', 'সিথেরায় যাত্রা', 'শিল্পীদের মৃত্যু', 'গহ্বর' প্রভৃতি কবিতা। অবশ্য অনুবাদ ভালো হলেও কোনো কোনো জায়গায় মন সায় দেয় না, এমন হয়। কোথাও কোথাও পরিবর্তন হ'লে সর্বাংশে সুন্দর হতো মনে হয়। কিন্তু এ মনে-হওয়াটা গুরুতর নয়। কোনো অনুবাদই বোধহয় অন্যের আশা সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারে না। এ গ্রন্থে এমন অনুবাদও আছে যা সমগ্রভাবে আকৃষ্ট না করলেও কোনো কোনো অংশে প্রশংসনীয়।

কিন্তু ব্যর্থ অনুবাদও যথেষ্ট। বোদলেয়ার-এর অনুবাদ সম্পর্কে কতকগুলি বিষয় মনে রাখতে আমরা বাধ্য। যথা, বোদলেয়ার শব্দের যাথার্থ্যকে অসাধারণ মূল্য দিতেন; ছন্দ ও মিলের গুরুত্বও তাঁর কাছে অসামান্য; তাঁর রচনা পরিষ্কার, বাক্যের গঠনে তাঁর বিন্দুমাত্র শিথিলতা নেই এবং প্রায়ই তা গদ্যসুলভ; তাঁর প্রকাশভঙ্গীতে 'কাব্যিকতা' নেই; পাঠকের অনুভূতির কাছে তাঁর কবিতার যে আবেদন তার অন্যতম নির্ভর বিশিষ্ট চিত্রকল্প; এবং এ সবকে অবলম্বন ক'রে তাঁর নিরুচ্ছ্বাস আবেগ তাঁর কবিতায় এক অদ্ভুত তীব্রতা সঞ্চার করে। দুঃখের বিষয়, বর্তমান অনুবাদে অনেক ক্ষেত্রেই এ সব বিষয় বিবেচনা করা হয়নি।

যেমন ধরা যাক, প্রথম কবিতা 'পাঠকের প্রতি'। মূল কবিতা সনাতন ফরাসী ছন্দ 'আলেক্সাঁদ্র্যাঁ'-তে, অর্থাৎ মোট বারোটি স্বরধ্বনির এক একটি ছত্র। এই সনাতন ছন্দ বোদলেয়ার-এর অতি প্রিয়। এ ছন্দকে বাংলায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ছত্রের অক্ষরবৃত্তে রূপান্তরিত করাই বাঞ্ছনীয়। এবং বুদ্ধদেব বসু বহু কবিতায় তাই-ই করেছেন। কিন্তু এ কবিতায় করেননি। হ্রস্ব ছত্রের মাত্রাবৃত্তে মূলের চলনই নেই এবং শব্দের কারদায় এ কবিতা প্রায় মৌলিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। "অঘন্য সব বস্তু আমাদের কাছে আকর্ষণীয়", এই সরল বাক্যকে যদি করা হয় "বীভৎসে বাঁধি রমণীয় নির্বন্ধে", তাহলে কাব্যিক হয় বটে, কিন্তু বোদলেয়ারকে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে, এ কবিতাটি পড়লে মনে হয় যেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তীয় কোনো আধুনিক বাংলা কবিতা পড়ছি। ছন্দ বহু কবিতায় এই রকম পাল্টানো হয়েছে। যদি মূলের কোনো ছন্দকে বাংলায় একটা বিশেষ ছন্দে ঢালি, তাহলে সেই মূল ছন্দ যেখানে যেখানে আছে, সেখানেই সেই বাংলা ছন্দ ব্যবহার করা কর্তব্য। নইলে মূল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় এবং তার মেজাজও ধরা যায় না।

আমার বিশ্বাস, অনুবাদে ব্যর্থতা যা ঘটেছে, তার কারণ প্রকৃত সহানুভূতির অভাব। নইলে মূল ছন্দের গতিকে বাতিল করা হবে কেন, কেনই বা চিত্রকল্প পাল্টে দেওয়া হবে অথবা ঋজু উক্তিকে ভাষার কৃত্রিমতায় দুর্বোধ্য ক'রে তোলা হবে? এ সবের ফলে অনেক কবিতা বোদলেয়ারীয় চারিত্র্য পায়নি। যেমন, Léthé-র রূপান্তর কি মূলের তীব্রতাকে একটুও আভাষিত করে? "শুধু তোর শয়ন-'পরে আমার এ-কান্না ঘুমোয় / খোলা

ঐ খন্দে ডুবে কিছু বা শান্তি জোটে ;" কিংবা "নিয়তির চাকায় বাঁধা নিরুপায় বাধ্য আমি, / নিয়তির শাপেই গাঁথি ইদানীং ফুল মালা ;" (লিখি)—এ রকম প্রকাশভঙ্গী বোদল্যার থেকে সুদূর এবং কথাগুলো মূলের বক্তব্যও যথাযথ বহন করেনি। ইমেজ নষ্ট ক'রে দিলে কবিতার বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্য কতখানি অবশিষ্ট থাকে ? "এই হৃদয়ের ডুবে মরার অতল হ্রদ…/এগিয়ে মাথা ঝাঁপিয়ে পড়ি,/স্বপ্ন মেটে, দীর্ঘশ্বাসের দেনাও চয়।" (কয়েকটি বিষ)—ঈপ্সিতা রমণীর চোখ সম্পর্কে এই ছত্রগুলো প'ড়ে কি আস্বাদ করা যায়, বোদল্যার বলেছেন : Lacs où mon âme tremble et se voit à l'envers…/ Mes songes viennent en foule/Pour se désalterer à ces gouffres amers. [হ্রদ যেখানে আমার আত্মা কাঁপে এবং নিজেকে উল্টো দেখে…ঐ তিক্ত[১] গহ্বরে তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে আমার স্বপ্নেরা ভিড় করে আসে"] ?

অনুবাদ যদি মূলের শব্দ, বাক্যভঙ্গী, এমনকি উক্তিকেও অনুমান করতে না দেয় তাহলে অনুবাদের সার্থকতা কি ? ছন্দের মধ্যে বিভ্রান্তিকর বিভেদ নানা জায়গায় আছে। যদি bistré comme la peau d'un bonze [বৌদ্ধ ভিক্ষুর ত্বকের মতো খয়েরী]-কে করা হয় "বৌদ্ধের মতো স্বপ্ন ভরা" (একটি মুখের প্রতিশ্রুতি) কিংবা…à quoi bon chercher tes beautés langoureuses/Ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton cœur si doux ? [তোমার প্রিয় শরীরে এবং তোমার মধুর হৃদয়ে ছাড়া অন্যত্র তোমার মদালস সৌন্দর্যকে খুঁজে লাভ কি ?]-কে করা হয় "আর কোথা খুঁজে পাই লাস্যময় তোমার রূপেরে / যদি না তোমার প্রাণ সুন্দর তনুতে রয় গাঁথা ?" (বারাঙ্গনা) কিংবা Et qui…préférerait / La douleur à la mort et l'enfer au néant. [যারা মৃত্যুর চেয়ে যন্ত্রণাকে বরণীয় মনে করবে এবং শূন্যতার চেয়ে নরককে।]-কে করা হয় "শূন্যতার যে কোনো অন্যথা খুঁজে সর্বস্বান্ত যারা / হোক তা যাতনা মৃত্যু নরকের অনন্ত পাতাল।" (জুয়ো), তাহলে বিস্মিত না হ'য়ে উপায় কি ? "হে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার"

১। আক্ষরিক অর্থ: তিক্ত। ব্যাখ্যা অনুসারে 'লবণাক্ত' বা অন্য কোনো উপযুক্ত শব্দ দেওয়া যেতে পারে। সমুদ্রের বিশেষণ হিসেবে ফরাসীতে অনেক সময় উক্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

-(স্তোত্র) শুনতে বেশ সুন্দর, কাব্যময়ও বটে ; কিন্তু বোদল্যার ওরকম-ভাবে মোটেই বলেননি, তিনি সোজাসুজি, প্রায় সাধারণভাবেই বলেছেন : "যে আমার হৃদয়কে আলোয় পূর্ণ করে"।

কবিতার অনুবাদে শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তন এবং নানা গ্রহণ ও বর্জন অনিবার্য। কিন্তু এমন পরিবর্তন অনুচিত যার ফলে মূলের চারিত্র্য লুপ্ত হয়। পরিবর্তন সত্ত্বেও যে অনুবাদ বিশ্বস্ত হতে পারে, বুদ্ধদেব বসুই একাধিক জায়গায় তার নিদর্শন রেখেছেন। সব পরিবর্তন সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারলে খুশী হওয়া যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তিনি প্রায়শ যে ধরনের স্বাধীনতা নিয়েছেন তাতে মনে এই সন্দেহ জাগে যে, বাস্তবিক যথেষ্ট মমতা ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনি বোদল্যার-এর কাছে যাননি। অবশ্য গোড়াতেই অনুবাদকের মন্তব্য পড়তে গিয়ে একটা খট্‌কা লাগে। তিনি বলেছেন, "এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে ইংরেজি ভাষায় আমি যতটা অভ্যস্ত ফরাশিতে ঠিক ততটা হলেও, আমার এই অনুবাদগুচ্ছ যা হয়েছে তা থেকে ভিন্ন কিছু হতো না।" আশ্চর্য উক্তি। এই কি শ্রদ্ধার মনোভাব ? যে কবির সমগ্র কাব্য অনুবাদ করছি, তাঁর ভাষা ভালো জানা এবং ভালো না-জানার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে ব'লে মনে না করা ? যাই হোক, আমার কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বুদ্ধদেব বসু ইংরিজীর মতো ফরাসী জানলে অনুবাদ আরও ভালো হতো, ইংরিজী তর্জমাগুলো তিনি আরও ভালো ক'রে যাচাই করতে পারতেন, অন্তত যে ধরনের সব ভাষাগত ভুল তিনি করেছেন তা করতেন না। বিদেশী ভাষার অনুবাদে ভুল হওয়া খুবই সম্ভব, ভালো জানলেও হয়। কিন্তু ভুলের সম্ভাবনাকে আমল না দেওয়াটা খুব আশ্চর্যের। এখানে তাঁর কয়েকটি ভুলের উল্লেখ করছি :

প্রথমেই বোদল্যার-এর কাব্যগ্রন্থের নাম। Fleurs du Mal 'ক্লেদজ কুসুম' হবে কেন ? এক্ষেত্রে অবশ্য ফরাসী ভাষাজ্ঞানের প্রশ্ন ততটা নেই যতটা আছে বিবেচনার প্রশ্ন। ক্লেদে জন্মালেও কুসুম খুব ভালো হ'তে পারে। পঙ্কের নাম তো পঙ্কজ। কিন্তু ফুলগুলো খারাপ এই অর্থেই বোদল্যার নামকরণ করেছিলেন। বিষাক্ত, অসুস্থ, এ সব বিশেষণ তিনি নিজেই প্রয়োগ করেছেন। প্রচ্ছদপট প্রসঙ্গে তাঁর যে বর্ণনা আছে তা থেকেও এ নামের তাৎপর্য বোঝা যায়। অতএব 'ক্লেদজ কুসুম' ঠিক নয়।

La Ge'ante (দানবী) কবিতায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার অতীতের কল্পনায় কবির মনের অভিলাষকে ব্যক্ত করেছে। কিন্তু অনুবাদে তা ঘটনা হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

'তবু অতৃপ্তা'য় শেষ স্তবকটির যে অর্থ পাই, মূলের অর্থ তার বিপরীত। "তোমার শয্যার নরকে আমি প্রসার্পিনা হতে পারি না", এই উক্তি অনুবাদে দাঁড়িয়েছে: "যেহেতু নরক তোর শয্যা আর আমি প্রসার্পিনা।" শয্যায় নরকে প্রসার্পিনা হতে না পারার এই আক্ষেপ থেকেই সমালোচকরা বোদল্যার-প্রণয়িনী জ্যান দ্যুভাল-এর সমকামী প্রবণতা অনুমান ক'রে থাকেন।

ফরাসীতে lubricite'-র অর্থ কামুকতা। তাকে ধরা হয়েছে: পিচ্ছিলতা। ফলে, যে বাক্যাংশের অর্থ "কামুকতার সঙ্গে সরলতা যুক্ত হয়ে", তা অনুবাদে দাঁড়িয়েছে: "সরলে পিচ্ছিলে মেশা" (অলংকার, ৪র্থ স্তবক)। এই কবিতারই ষষ্ঠ স্তবকে la এবং elle শব্দ দুটিকে প্রেয়সীর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু ও দুটি শব্দ "আমার আত্মা"র সর্বনাম। ফরাসীতে âme স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। স্বভাবতই স্তবকটি অনুবাদে অর্থহীন হ'য়ে পড়েছে। Lubrique মানে কামুক। 'এক শব' কবিতায় femme lubrique-এর অনুবাদ পড়ি "আর্দ্র নারী"।

'আলোকস্তম্ভ' কবিতার পঞ্চম স্তবকে পড়ি: "চোর, গুণ্ডা, পাণ্ডুরোগী, মদস্ফীত হৃদয় বিরাট—/এদেরই অন্তর ছেনে করেছেন সৌন্দর্যচয়ন/প্যুজে…"। মূলের শব্দ-সম্পর্ক কিন্তু এ রকম নয়। সেখানে "পাণ্ডুরোগী" এবং "মদস্ফীত হৃদয় বিরাট" প্যুজের বিশেষণাত্মক।

ফরাসীতে n'importe ou` মানে: যে কোনোখানে। সুতরাং Voyage কবিতায় n'e'tant nulle part, peut être n'importe ou`-র অর্থ: "কোথাও নেই ব'লে যে কোনোখানেই থাকতে পারে।" কিন্তু অনুবাদে পাই: "কোথাও তা নেই তাই মনে হয় নেই কোনোখানে।" (ভ্রমণ, ২য় অংশ, ২য় স্তবক)।

Sois Sage, Ô ma Douleur—"হে আমার দুঃখ তুমি প্রাজ্ঞ হও" (আত্মহত্যা), এই অনুবাদের সঙ্গে যুক্ত ক'রে অনুবাদক ভূমিকায় বোদল্যার-এর দুঃখের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য এবং তার দ্বারা প্রজ্ঞালাভের কথা বলেছেন। Sage-এর বাচ্যার্থ অবশ্যই বিজ্ঞ বা প্রাজ্ঞ। কিন্তু ফরাসী মা শিশুকে

ছেলেকে বলেন : Sois sage অর্থাৎ "ছটফট কোরো না, দুরন্তপনা কোরো না, লক্ষ্মী হয়ে থাকো।" বোদল্যার সেই অর্থেই শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। শান্ত হয়ে থাকার কথা পরবর্তী বাক্যাংশে আছেও।

অনুবাদ শেষে যে তিনটি গদ্য-অংশ যোগ করা হয়েছে সেগুলি খুব প্রয়োজনীয়: কবিতার টীকা, কালপঞ্জী এবং বোদল্যার-এর জীবনপঞ্জী। প্রথমটিতে লেখক বিভিন্ন কবিতার অন্তর্গত পৌরাণিক উল্লেখগুলো ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোনো কোনো কবিতার জন্ম-বৃত্তান্ত দিয়েছেন। দ্বিতীয় অংশটিতে বোদল্যার-এর পূর্ববর্তী, সমসাময়িক এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন, যাতে এক বিস্তৃত পটভূমিতে তাঁকে দেখা যায়। তৃতীয় অংশটিতে বোদল্যার-এর জীবনের অতি বিশদ বিবরণ তিনি দিয়েছেন। এই যোজনার ফলে কবির এবং তাঁর সৃষ্টির সম্যক পরিচয় লাভ পাঠকের পক্ষে সহজ হবে। তবে আমার মনে হয়, কবিতার টীকা অংশ বাড়ালে আরও ভালো হতো। অনেক ক্ষেত্রেই কবিতার কেন্দ্রীয় ভাব বা মূল বক্তব্য কি তা পাঠককে জানানোর প্রয়োজন ছিল। সাধারণ বাঙালী পাঠকের কাছে বোদল্যার-কাব্যের বিশদ পরিচয় দেওয়া যখন লেখকের উদ্দেশ্য, তখন কবিতাগুলো অনুধাবনে তাকে আরও সাহায্য করা উচিত। কয়েকটি কবিতার দু-একটি ছত্রের মহিমা সম্বন্ধে অন্যের অভিমত এবং কোনো কোনো কবিতাপ্রসঙ্গে অন্যের কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য অনেক কবিতার বা ছত্রের তাৎপর্য কেন ব্যাখ্যা করা হয়নি বোঝা যায় না। কবিতার টীকা আরও বেশি দিতে গেলে অবশ্য জায়গা আরও বেশি লাগত। কিন্তু সে জায়গা অনায়াসেই করা যেত অনেক অবান্তর জিনিস ছাঁটাই ক'রে। সব অংশ থেকেই। যেমন, টীকার মধ্যে নের্ভাল-এর কবিতার ফরাসী উদ্ধৃতির কী আবশ্যকতা ছিল? (উদ্ধৃত শেষ ছত্রে দুটি ভুল আছে)। কিংবা 'সিথেরায় যাত্রা' বোঝবার জন্যে কি এ কথা জানা দরকার যে, "কবিতাটির রচনাকালে কবির উপদংশের প্রকোপ উগ্র হয়ে উঠেছিল"? জেরলেন সম্পর্কেও এই রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যদের বেলায়ই বা কেন করা হয়নি তা বুঝলাম না। মানসিক ও শারীরিক রোগ-বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বোদল্যার-প্রসঙ্গে উপদংশের ভূমিকা উল্লেখ করেন এবং বোদল্যার-বিরোধীরা এই রোগের কথা তাঁদের পক্ষের একটা যুক্তি হিসেবে দাঁড় করান। কিন্তু সে সব মত লেখকের কাছে গ্রাহ্য হবে ব'লে মনে করি না। কোনো কোনো কবিতা

সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে, অথচ অন্তগুলো সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি অথবা যেটুকু বলা হয়েছে তা অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত। সব তথ্য গুছিয়ে পর পর টীকায় সন্নিবিষ্ট করলে পাঠকের উপকার হতো।

কালপঞ্জী দিয়ে রচনাকে ও রচয়িতাকে একটা পটভূমিতে স্থাপন করার রেওয়াজ ওদেশে প্রচলিত, বিশেষত ফ্রান্সে। বাংলা দেশে সেই ভাবে কোনো বিদেশী লেখককে উপস্থিত করার উদ্যম বোধ হয় এই প্রথম। অভিনন্দনীয় উদ্যম সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে হলো লেখক ধ'রে নিয়েছেন, সাধারণ বাঙালী পাঠকরা (যাঁদের উদ্দেশে এই গ্রন্থ) ইওরোপীয় সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। প্রকৃতপক্ষে আমরা তা নই ব'লে পদে পদে ধাঁধাঁ লাগে ; মনে হয়, এই উল্লেখটার কী সার্থকতা। এবং কোনো কোনো উল্লেখের টীকার প্রয়োজন অনুভব করতে হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ম'ন্তেসকিউর মৃত্যু অথবা ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গইয়ার বধির হওয়া, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বেটোফেনের বধির হতে আরম্ভ করা ও ১৮১৮-তে সম্পূর্ণ বধির হয়ে যাওয়া, অথবা ১৮৭৬-৭৮-এ মনে-র 'গাঁ লাজার' চিত্রাবলী অথবা ১৮৯৪-তে ট্রেনে 'ইয়েলো বুক' পড়তে পড়তে অস্কার ওয়াইল্ডের তা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া অথবা ১৯০৮-এ পিকাসো ও মাতিস-এর সাক্ষাৎ ইত্যাকার উল্লেখে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

বোদল্যার-এর জীবনী অংশটি সব চেয়ে বিস্তৃত। তাঁর জীবন ও কাল সম্বন্ধে কোনো তথ্য দিতে লেখক কার্পণ্য করেননি। এ জন্যে শুধু বোদল্যারকে নয়, এখনকার সমগ্র আবহাওয়াকে পাঠক জানতে পারে। এ অংশ অবশ্য আরও সংহত হতে পারত। বিশেষত মাঝে মাঝে লেখকের যে সব মন্তব্য আছে তা না থাকলেও চলত। বরং না থাকলে পাঠক অবিক্ষিপ্ত মনোযোগে বোদল্যার-এর জীবন অনুসরণ করতে পারত। জায়গাও বাঁচত। আমি বলছি এই রকম সব মন্তব্যের কথা যেমন : "পিতার অর্থ ও মাতার অর্থের অস্তিত্ব সত্ত্বেও দারিদ্র্যের চরমে নেমে বোদলেয়ারকে মরতে হ'লো। কী লাভ হ'লো কার ? কার ভালো করা হ'লো ? যদি বোদলেয়ার দশ বছরে—বা পাঁচ বছরেও—তাঁর পুরো মূলধন উড়িয়ে দিতেন, তাহ'লেও কি এর চেয়ে বেশি কষ্ট পেতে হ'তো তাঁকে ? তাহ'লে, দরিদ্র হ'য়েও, অন্তত নিজের টাকা নিজে ভিক্ষে ক'রে নেবার গ্লানি তাঁকে সইতে হ'তো না। কিংবা হয়তো, কোনো উপায় নেই দেখে,

উপায়হীনতার মধ্যেই বাঁচতে শিখছেন—ভেরলেনের মতো।......মনে হ'তে পারে, যে-কোনো অবস্থার মধ্যে তিনি তাঁর কাজ ক'রে গেছেন, আমরা পেয়েছি এক শুদ্ধ সৌন্দর্য ও পবিত্রতা—এখন এ-সব আলোচনা ক'রে লাভ কী। কিন্তু সত্যি কি কোনো লাভ নেই? যা হয়নি তা আমরা কখনোই ভাবতে পারি না; তাই বাধ্য হ'য়ে, যা হয়েছে তাকেই সম্পূর্ণ ব'লে ধ'রে নেই।" ...ইত্যাদি (২৪০ পৃঃ); অথবা "সত্য সে [জান] শিক্ষিত ছিলো না, বোদলেয়ারের কবিতার মূল্য কিছুই বুঝতো না, কিন্তু তাতে কি কিছু এসে যায়? পৃথিবীতে ক-জন কবির ভাগ্যে এমন স্ত্রী বা প্রণয়িনী জুটেছে, কবিতায় রসজ্ঞ হবার যার ক্ষমতা ছিলো?...যারা শুনবে বা বুঝবে তাদের আশায় ব'সে থাকলে সৃষ্টি টিকতো না।" (২৬২ পৃঃ)। এ সব মন্তব্য গভীরতার জন্যে অপরিহার্য ছিল মনে হয় না।

প্রসঙ্গত বলি, এ গ্রন্থের গদ্যে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি অনুভব করেছি। রচনার অসমতা তার একটা কারণ। তা ছাড়াও অনেক জায়গায় বাক্যগঠন কৃত্রিম এবং শব্দপ্রয়োগ বিসদৃশ, এমন কি কখনো কখনো বক্তব্যবিরোধী মনে হয়েছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করি: "শুধু কবিতাই নয়, চিত্রকলাও তাঁর বাণে বিদ্ধ হয়েছে;...যাঁরা, তাঁর নিঃসঙ্গ ও অবজ্ঞাত যৌবনে, যে-দুই কবিকে ভেদ ক'রে ধীরে ধীরে আপন পথটি দেখতে পান, তাঁরা দান্তে ও বোদলেয়ার।" (৩ পৃঃ)। "ক্লাসিক ও রোমান্টিক ধারণা দুটি পরস্পরের জন্যে তৃষিত..." (৭ পৃঃ)। "বয়েল, তাঁর মহিমা অস্তমিত, পাড়াগাঁয়ে দীনবেশে ও অর্ধাশনে থেকে এই উপন্যাসটি লিখে উঠেছিলেন।" (২৩০ পৃঃ)। "১৮৪৫-এর আর একটি ঘটনা উল্লেখ্য: আসলিনোর সঙ্গে আমাদের কবির বন্ধুতার সূত্রপাত।" (২৪২ পৃঃ)। "তাঁর মনোরম সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠে অনেকক্ষণ কথা বললেন..." (২৭৩ পৃঃ)। সব চেয়ে বিমূঢ় বোধ করেছি নিম্নলিখিত দুটি বাক্যের সামনে: "এক বৎসরের কিছু অধিককাল, বালক বোদলেয়ার তাঁর মাতাকে একান্তভাবে ভোগ করেন।" (২১৯ পৃঃ); এবং "বাল্যে যে অল্পকাল তরুণী ও বিধবা মাতাকে একান্তরূপে ভোগ করেছিলেন, সেই 'বাল্যপ্রণয়ের সবুজ স্বর্গে'র স্মৃতি তাঁকে আমৃত্যু হানা দিয়েছে।" (২৩৮ পৃঃ)। ভালো কথা, বুঝলাম না বুদ্ধদেববাবু 'লক্ষ্য' এবং 'লক্ষ', এই দুই শব্দকেই 'লক্ষ' লেখেন কেন; এবং তাই যদি লেখেন তাহলে 'বন্ধ্য' এবং 'বন্ধ', এই দুই শব্দকে দুই রকম না লিখে 'বন্ধ' লেখেন না কেন।

এই গ্রন্থে নামের যে সব উচ্চারণ দেওয়া হয়েছে তাতে যথেষ্ট ভুল আছে। অবশ্য সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ নামের উচ্চারণ ফরাসীতে অনেক ক্ষেত্রেই গোলমেলে। নিয়মও খাটে না। কয়েকটি সুপরিচিত নামের উচ্চারণ উল্লেখ করছি :

'জর্জ সাঁ' নয়, জর্জ সাঁদ্; 'জেরার্দ দ নেরভাল' নয়, জেরার দ নেরভাল; 'মাদাম দ ভায়েল' নয়, মাদাম দ স্তাল; 'দেনিস দিদেরো' নয়, দনি দিদরো; 'তিয়েৰ্স' নয়, তিয়ের; 'ওয়াত্তো' নয়, ভাত্তো; 'দেগাস' নয়, দগা; 'ভ্যান গ' নয়, ভান গগ বা ভাঁ গগ (ফরাসী ধাঁচে); 'বেলিও' নয়, বেলিওজ্; 'রীমস' নয়, র‍্যাঁস; 'বার্বে দোর্ভী' নয়, বার্বে দরভিলি; 'কমেদি ফ্রাঁসেস' নয়, কমেদি ফ্রাঁসেজ; 'পোল ভালেরি' নয়, পল ভালেরি ('পোল' বললে শোনায় মেয়ের নাম Paule)। 'বের্গসঁ' অবশ্য অনেক ফরাসীই বলেন, কিন্তু নামটার আসল উচ্চারণ বের্গসন্। 'ম্যুসে' বা 'ভিন্ঈ'র আগে 'দ' বসানো হয় না যদি না পুরো নাম লেখা বা বলা হয়।

কবিতা সাজানো সম্পর্কে অনুবাদক লিখেছেন, কবির মূল পরিকল্পনা যে সব সম্পাদক অনাহত রেখেছেন, তিনি তাঁদের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ফরাসী ভাষায় প্রামাণ্য সংস্করণগুলোতে যে ভাবে এখন সাজানো হয়, ঐ বিন্যাস তো সে রকম নয়। এ নিয়ে তর্ক ওঠানো যায়, কিন্তু তা অপ্রয়োজনীয় মনে করি। বিন্যাসের স্থাপত্য সম্পর্কে বোদলেয়ার-এর চিন্তা আপাতত আমাদের কাছে গৌণ। মোটামুটি একটা পরম্পরা থাকলেই হলো। অতএব এ অনুবাদে কবিতার যে ক্রম পাওয়া গেল তাতেই আমাদের খুশী থাকা উচিত।

---

* বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা। বুদ্ধদেব বসু। নাভানা। আট টাকা।

রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের জীবন ও শিল্পে

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের ঊনিশ শতকী নবজাগরণে দুটি প্রবণতা সহজেই চোখে পড়ে: ইওরোপের সঙ্গে অন্ধ তুলনায় জাতীয় দৈন্যের ক্ষতিপূরণের বিড়ম্বিত চেষ্টা এবং হয়তো তারই প্রতিক্রিয়ায় ইতিহাসবিহীন 'সনাতন' ভারতবর্ষের নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস। সে যুগে একদিকে প্রতীচ্য সভ্যতার নজিরে এদেশের সমস্ত কিছুর মূল্যায়ন চলে, অপরদিকে সমগ্র মানব সভ্যতার আদি অন্ত যে হিন্দুসভ্যতা সে কূপমণ্ডুক অহংকার অভিমানে কেউ কেউ বর্তমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

এবংবিধ জিজ্ঞাসাহীন ভাবালুতা আমাদের খণ্ডিত জাগরণেরই অনিবার্য ফল। সেই বিভ্রান্তির জের আজও আমরা টেনে চলেছি। গ্যেটের ব্যক্তিগত জীবনের রোমান্স, অথবা হেলডারলিন, বোদলেয়ার, রিলকে প্রমুখ পাশ্চাত্য কবিদের তীব্রতার বৈপরীত্য কিংবা সাদৃশ্যেই রবীন্দ্রনাথের শিল্প-কর্মের মূল্য নির্ধারণে এদেশের বিশ্বসভ্যতাবিশেষজ্ঞরা অকুণ্ঠিত। ঠিক তেমনিভাবে অপর পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাঁর শিল্পকর্মের ব্যাপারটি অনেকটা ব্রহ্মমুখ ঔপনিষদ বাণীমন্ত্র বিশেষ, তার পেছনে কোনও সভ্যতার প্রসবযন্ত্রণার ইতিহাস নেই। এমন নিশ্চিত সরলীকরণ বোধ হয় আমাদের দেশেই সম্ভব।

দুই

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মকে বুঝতে গেলে ইতালীয় রেনেসাঁসের সমার্থক তুলনাটি বহুল ব্যবহৃত বলেই প্রথমেই তার স্বরূপ বুঝে নেওয়া দরকার। সাধারণভাবেই বলা যায়, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালির সামন্ততান্ত্রিক সমাজবিন্যাসে নবোদ্ভূত বণিকতন্ত্র আঘাত করে, এই ঐতিহাসিক শক্তির সংঘাতের ফলেই রেনেসাঁসের আবির্ভাব। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই তো মধ্যযুগের ভূমিনির্ভর ধর্মাশ্রিত

সমাজবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। নিশ্চল ভূমির পরিবর্তে সচল মুদ্রাই তার সমস্ত জটিলতা নিয়ে সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হয়, মধ্যযুগীয় বিভিন্ন মানবিক সম্পর্কের সরল স্থিতিশীল ছকটা বদলাতে শুরু করে। নিছক প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যবসায়িক স্বার্থের ভিত্তিতেই মধ্যযুগের গিল্ডগুলোর সংগঠন আরম্ভ হয়। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর মার্চেন্ট-প্রিন্সদের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের পূর্বাভাস পাই এ সময়ের ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক স্বার্থবিস্তারের চেষ্টায়। ধনতন্ত্রের এই প্রথম ধ্বজাধারীরা তাঁদের ব্যবসায়িক পত্রের শিরোনামায় লেখেন, "ইন দি নেম অফ গড এ্যাণ্ড প্রফিট।" মাকিয়াভেলির প্রিন্সের উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লক্ষণগুলো স্পষ্ট বা অর্ধস্ফুটভাবে তাঁদের মধ্যে প্রকাশিত হতে থাকে। বণিকতন্ত্রের শিল্পবাণিজ্যঘটিত আত্মপ্রসারের তাগিদেই অনেক ভৌগোলিক এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়।

অবশ্য শুধুমাত্র অর্থনীতির বা রাজনৈতিক পটভূমিগত বিচারেই কোনও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা সম্ভব নয়। ইতিহাস নির্মাণে রাজ্যজয়, রাজনীতি অথবা ধর্ম অপেক্ষা মুদ্রণযন্ত্র, বারুদ, কম্পাস প্রভৃতির আবিষ্কারের ভূমিকাই অধিকতর সক্রিয়, ফ্রান্সিস বেকনের উক্তিটি একদিক থেকেই সত্য। দর্শন-সাহিত্য-শিল্পের স্তরে ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বয় জটিল সম্বন্ধে এই ইতিহাস অপেক্ষাকৃত দুরূহ হয়ে ওঠে। আমরা সাধারণ-ভাবেই জানি, রেনেসাঁসের যুগে নতুন সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চিন্তায় যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, তাতে গ্রীকদর্শন-বিজ্ঞানের মানবমুখিন যুক্তিনির্ভর ঐতিহ্য বিপুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু রেনেসাঁসের চৈতন্যকে তার জটিল সমগ্রতায় বুঝতে গেলে গ্রীক ঐতিহ্যের মতো মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের সঙ্গেও তার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক মনে রাখা দরকার। গ্রীক ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল সমাজজীবনের গভীরেই, সমধর্মী বা বিপরীত নানা চিন্তা-প্রত্যয়ের সম্পর্কে মধ্যযুগে গ্রীক-দর্শন এবং যুক্তি-বিজ্ঞানের চর্চা নিতান্ত কম ছিল না। ইওরোপের সমাজ কোনও যুগেই একেবারে গতিহীন জড় হয়ে পড়ে নি। সেন্ট টমাস একুইনাসের সমন্বয়সাধনের মনন কিংবা সেন্ট অগাস্টিনের প্রজ্ঞা আজও অনেকের বিস্ময়ের বস্তু। একুইনাস ও স্কোলাস্টিকেরা যেমন ছিলেন অ্যারিস্টটলের অনুগামী, তেমনি সেন্ট অগাস্টিন ও অন্যান্য খ্রীষ্টীয় মরমী সন্তদের চিন্তায় নিওপ্লেটোনিজম তথা

প্লেটোর চিন্তায় ঐতিহ্যই চোখে পড়ে। ইতালির নবজাগরণের চিন্তা-নায়কদের প্রত্যয়গঠনে গ্রীক চিন্তাধারার তুলনায় খ্রীষ্টধর্মবিশ্বাসগত চিন্তার প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। পেত্রার্কা, ফিচিনো, এমনকি যাঁকে রেনেসাঁসীয় মানবিকবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্গাতা বলা হয়, সেই পিকো দেলা মিরান্দোলারও চিন্তায়, জ্ঞানের অনুশীলনে মধ্যযুগের চিন্তাধারার ঐতিহ্যকে একটি মূল্যবান অংশরূপেই লক্ষ্য করা যায়: পেত্রার্কা, ফিচিনো, অগাস্টিনের চিন্তায় প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় এবং পিকো অন্তত কিছুটা পরিমাণে তাঁর পরোক্ষ প্রেরণার সূত্রেই প্লেটোর চিন্তার ঐতিহ্যকে পান।

মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এই যোগসূত্রের পটভূমিকায়ই বোধ হয় রেনেসাঁসের মানবিকবাদীদের চিন্তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে যুক্তিবিজ্ঞানের চর্চা শেষ পর্যন্ত ধর্মতত্ত্বের প্রয়োজন ও শাসনে যান্ত্রিক হয়ে পড়ে, তাতে মানবচৈতন্যের বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনাই প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে আসে। অধিকাংশ মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের মতো অভ্রান্ত জ্ঞানে শুধু অ্যারিস্টটলীয় তত্ত্বে আবদ্ধ না থেকে ইতালীয় মানবিকবাদীরা তাঁদের মনের দ্বার উন্মুক্ত রেখেছিলেন, চলিষ্ণু জাগ্রত মননের সঙ্গে সমস্ত ঐতিহ্যের সম্বন্ধপাতে মানবমনের শক্তিকেই অনুভব করেছিলেন নানা ভাবে। মানবমনের মতো বিস্ময়কর মহৎ আর কিছুই নেই, খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের আবেগে অনুপ্রাণিত পেত্রার্কার এই বোধ সেনেকার বচনে পরিপুষ্ট হবার কোনও বাধা থাকে না। অনুসন্ধানের, যুক্তির পথে সত্যান্বেষণে মানবিক প্রজ্ঞার যে ক্ষমতা প্লেটোবাদের ঐতিহ্যের ধারক ফিচিনো উল্লেখ করেন, তাতেও এই মানবমর্যাদাবোধ উদ্ভাসিত। অ্যারিস্টটলপন্থী পিয়েত্রো পম্পোনাৎসিও মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেন তিরতর যুক্তির বিন্যাসে। কিন্তু পিকো দেলা মিরান্দোলার মানবমহিমাবিষয়ক রচনায়ই সর্বপ্রথম মানবিক মূল্যজ্ঞান নতুন তাৎপর্যের গভীরতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পিকো মানবচৈতন্যের স্বাধীন ক্ষমতা এবং অপরিসীম সম্ভাবনাই তুলে ধরেন: নিজের স্বাধীন ইচ্ছায়ই মানুষ নিজেকে গড়তে পারে। সে কোনও সীমায় শৃঙ্খলিত নয়, নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানে। পিকোর এই মানবিক প্রত্যয়েই রেনেসাঁসের চিন্তাধারার মৌলিকতা সব থেকে বেশি স্পষ্ট। অতীতের জগচ্চিত্রে মানুষের স্থান কেন্দ্রীয় হলেও ছিল স্থির, নির্দিষ্ট, এবার সেই ছকের বাইরেই মানুষের স্বকীয় শক্তির উপলব্ধি এবং বিচার। ইতালীয় রেনেসাঁসের

পুরুষার্থ বলতে আমরা নব শিল্পবাণিজ্য-প্রসারসমৃদ্ধ সমাজপটে প্রধানত গ্রীক ঐতিহ্যের ধারানুসরণে জগৎ ও জীবন বিষয়ে জিজ্ঞাসু মানসের এই বিস্তার, আত্মোপলব্ধির উল্লাসময় শক্তিকেই বুঝি।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ইওরোপীয় ঐতিহ্যের ধারা গভীর ও প্রবল। সেই ঐতিহ্যের পটেই তো দান্তে, চসার কিংবা শেক্স্পীয়রের প্রতিভার স্বকীয়তা আমাদের কাছে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে (যাঁদের গভীরতার সঙ্গে অনেক সময়ই রবীন্দ্রনাথকে মিলিয়ে নেবার সাধ আমাদের হয়)। মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের সন্ধিক্ষণের কবি দান্তে কিংবা কাভালকান্তির কবিতায় স্ফটিকসংহত দীপ্তি প্রভেন্স এবং টুস্কানির কাব্যঐতিহ্যেই তো স্বাভাবিক বলে বোধ হয়। কবিদের গভীর রসায়নেই দান্তে লোকভাষার সঙ্গে ধ্রুপদী ঐতিহ্যকে যেভাবে মেলান, তাতেই তাঁর গীতিকবিতা এবং স্বর্গ ও নরকের মহাকাব্যের সুগঠিত বিন্যাসের চারিত্র্যলক্ষণ একদিক থেকে আমাদের কাছে সহজবোধ্য হয়। দান্তে তাঁর গীতিকবিতার বই 'নবজীবন'-এ (ভিটা নুওভা) সঙ্গতকারণেই যেমন নিজের ও সহকর্মীদের নতুন কাব্যপ্রকরণের পরীক্ষায় ভার্জিল, লুকান, হোরেস, ওভিদ প্রভৃতি কবিদের নজির টেনেছেন, তেমনি ল্যাটিন কাব্যের অক্ষরমাত্রিক বিন্যাসের কারুকর্মের পরিবর্তে ইতালীয় দেশজ ভাষার ছন্দঃ-স্পন্দন গ্রহণের পশ্চাতপট হিসেবে প্রভেন্স ও টুস্কানির কাব্যঐতিহ্যকে স্মরণ করেছেন। চসারের কবিপ্রতিভাও তো মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়েছিল। আর শেক্স্পীয়রের কবিদের নৈর্ব্যক্তিকতা আমাদের যতই বিস্মিত করুক, তার পটভূমিটি চোখে না পড়ে পারে না। মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য এবং মাকিয়াভেল্লি কথিত রেনেসাঁসীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের টানাপোড়েনেই তিনি তাঁর নাটকের ট্র্যাজিকদ্বন্দ্বের পুরুষার্থকে রূপ দেন।

ইতালির রেনেসাঁসের মূলে যে পরিবর্তন ছিল, তাতে মেদিচিদের মতো মার্চেন্টপ্রিন্সদের আবির্ভাব ঘটে, শিল্পবাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার হয়। আর আমাদের নাগরিক সমাজে দেখা দিল ইংরেজ সাম্রাজ্যের উচ্ছিষ্টনির্ভর বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, মুন্সেফ—মধ্যবিত্ত চাকুরে। চাকরি সংগ্রহই ছিল এদের 'এন্টারপ্রাইজ', মূলধন ইংরেজ প্রভুর দাক্ষিণ্যে বিশ্বাস। জনজীবনবিচ্ছিন্ন এই মধ্যবিত্তের খণ্ডিত অস্তিত্বে কোথায় ছিল ইতালির রেনেসাঁসের পাদপীঠ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ফ্লোরেন্সের জীবনের বিপুল বিস্তার, প্রচণ্ড শক্তি?

আর এদেশের মধ্যবিত্তের অস্তিত্বচেতনায়ই বা কোন ধ্রুপদী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটল? উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জীবনের গভীরে বিরাট সংহতশক্তিরূপে গ্রীকদর্শনবিজ্ঞানের মতো কোনো ঐতিহ্যকে আমরা খুঁজে পাই? রামমোহনের বেদান্তচর্চায় এবং সতীদাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্রবচন উদ্ধারে, বিধবাবিবাহের সপক্ষে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যায় ইতালির হিউম্যানিস্টদের গ্রীক ঐতিহ্যচর্চার তুলনা খোঁজা বিচারবিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। রামমোহনের বেদান্তচর্চা খ্রীষ্টানধর্মপ্রচারের প্রতিক্রিয়ার অন্যতম ফল: বিকৃত আনুষ্ঠানিকতায় কলুষিত হিন্দুধর্মকে নিরাকার একেশ্বরবাদের ভদ্র পরিচ্ছন্ন রূপ দিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যেই তাঁর বেদান্তচর্চা। রামমোহন তো স্পষ্টভাবেই বলেন, সমাজজীবনের জন্য যুবকদের উপযুক্ত করে তোলার শিক্ষায় বেদান্তের মায়াবাদ অনুপযোগী, সুতরাং পরিত্যাজ্য। বিদ্যাসাগর আরও নির্মোহ। বেদান্ত 'সাংখ্য'কে তিনি খুব কঠিন ভঙ্গীতেই ভ্রান্তদর্শন বলে নির্দেশ করেন; বিধবাবিবাহের আলোচনার উপক্রমণিকায় স্পষ্টই বলেন, বিধবাবিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধারের প্রয়োজন এই কারণে যে দেশাচারপ্রভাবিত এদেশে শাস্ত্রসমর্থন ছাড়া কোনও কিছুকে শুধুমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কৃষ্ণের অবতারত্ব খণ্ডন, গোপীদের সঙ্গে রাসলীলার আধুনিক ব্যাখ্যা, "ভূরি ভূরি প্রমাণের সাহায্যে" বস্ত্রহরণের অসত্যতা প্রতিপাদন, কৃষ্ণের বহুবিবাহের তালিকা-বিচার—কৃষ্ণলীলাসম্পর্কিত এই স্থূল অসার শাস্ত্রবিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণধী প্রতিভার শক্তিরও ক্ষয় হয়, তা পরাধীন মধ্যবিত্তজীবনের পঙ্গুতারই নিদর্শন। আর তিনি যে নীতিতত্ত্ব কৃষ্ণচরিত্রে আরোপ করেন, সেটা ইংল্যাণ্ডের ইউটেলিটারিয়ানদের সুখতত্ত্বের সঙ্গে হিন্দুধর্মের অসার্থক মিশ্রণ মাত্র।

আমাদের সংস্কার-আন্দোলনগুলোতেও ইওরোপের রেফর্মেশনের মূলে যে কৃষকবিদ্রোহ ছিল, তার মতো জন-আন্দোলনের প্রচণ্ডতা ও ব্যাপকতা কতটুকু মেলে। যে কালে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে গিয়েছে, ইওরোপের সেই অগ্রগতির যুগে সতীদাহ প্রথার বিলোপ, বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ রোধ বা বিধবাবিবাহ আন্দোলনে আমাদের যে কিভাবে বিড়ম্বিত হতে হয়, তার উদাহরণ তো প্রচুর। বিদ্যাসাগরের মতো প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষও তো শেষ পর্যন্ত কলকাতার সমাজে তাঁর জীবন ও কর্মের ভিত্তি খুঁজে না পেয়ে

অবসন্ন হন, তীব্র নিষ্ফলতার যন্ত্রণায় মধ্যবিত্তজীবনে আস্থা হারিয়ে ফেলেন, কার্মাটাঁরে অশিক্ষিত সাঁওতালদের মধ্যে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করার স্বপ্ন দেখেন। সামান্য নিরীহ সমাজসংস্কার সম্পর্কেও এদেশের শিক্ষিত সমাজের অন্ধতা কিভাবে প্রকাশ পায়, প্রসঙ্গত তার একটি নমুনা নেওয়া যেতে পারে। শোভাবাজার রাজবাড়িতে একবার ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে বাল্যবিবাহের সমর্থনে এক সভা হয়। প্রধান বক্তা জয়গোবিন্দ সোম, অল্প বয়েসে প্রসব করতে গিয়ে মাতার স্বাস্থ্যহানি হয়, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সে আপত্তির খণ্ডনে বলেন: "যদিও বালিকা মাতার অল্প বয়সে সন্তান প্রসব করিয়া প্রাণ নষ্ট হয় তাহাতে ক্ষতি কি? কুম্ভীরক মাতা যদি কুম্ভীরক প্রসব করিয়া মরিতে পারে, আমাদের রমণীরাই বা কেন সন্তান প্রসব করিয়া অল্প বয়সে ও অকালে প্রাণত্যাগ না করিবেন?" এবংবিধ কুৎসিত উক্তিতে সায় দেবার লোকের অভাব হয় নি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'তে সঙ্গতভাবেই এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়: "অন্যান্য দেশে ও সমাজে শিক্ষিত লোকেরা উন্নতশীল দলের অধিনায়ক হইয়া সকলপ্রকার উন্নতিসাধক অনুষ্ঠানে অগ্রসর হন; এখানে কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানকার শিক্ষিত লোকবৃন্দ রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক; ইহাদের মত যে দেশের রীতি নীতি ভাল হউক বা না হউক, ঋষিরা প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়া তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না: এমন কি; সমালোচনা পর্যন্ত করিতে পারিবে না।"

বাংলাদেশের মধ্যবিত্তমানসের এই পঙ্গুতা তথা জাতীয়জীবনের দুর্গতির উৎস শুধু ঔপনিবেশিক জীবনেই নয়, তার বাইরেও খুঁজতে হয়। ভারতীয় সভ্যতার ক্ষয় ধরছিল বহু শতাব্দী ধরেই: এখানকার সমাজজীবন নিজের মধ্যেই কুণ্ডলী পাকিয়ে নিষ্ক্রিয়তার অটল কিন্তু গতিহীন প্রতিরোধে কোনও মতে আত্মরক্ষা করেছে মাত্র, ওদিকে ভেতরে ভেতরে রক্ত দূষিত হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সম্ভবত কোনও না কোনও পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যশক্তির প্রতিষ্ঠা অনিবার্য ছিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার ভূমিকা তৈরি হয়েছে এই সভ্যতার অধোগতিতে।

একথা সত্য যে প্রতীকের বিশুদ্ধতায়, পরোক্ষবিন্যাসে ভারতীয় সংস্কৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের জগৎ গড়ে তোলার ক্ষমতা অসাধারণ। এখানকার মাটিতেই তো আকাশ এমন অনায়াসভাবে মেশে, এদেশের সাধকের বিমূর্ত

ভাবনায় মানুষ অতি সহজেই সমস্ত আকাশ পৃথিবী এমন কি ইতরপ্রাণীর সঙ্গেও একাত্ম হতে পারে, নির্বিশেষ ও বিশেষ বাধা পড়তে পারে সামঞ্জস্যের সুষম লাবণ্যে। ভারতীয় মননে স্বাভাবিকভাবেই প্রশান্তির অন্বেষণই বড় হয়ে দাঁড়ায়। বিমূর্তনের সহজাত ক্ষমতা এবং তার প্রতি ঝোঁকের ফলে ভারতীয় শিল্প সৌন্দর্য ধ্যানের সমাহিতিতে ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ হয়েছে। অতি তুচ্ছ ধূলিকণা থেকে আকাশ নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্ত কিছুতে এক নিখিল প্রাণের অনুভূতির উভময় আদর্শে আমরা নিশ্চয়ই উদ্বেল হই, ভারতবর্ষ কোনোদিন শক্তির আস্ফালনে সাম্রাজ্যলোলুপতা প্রকাশ করে নি, মৈত্রী ও করুণায় সকলকেই বাঁধতে চেয়েছে; আমরা তাতে সঙ্গতভাবেই গৌরব অনুভব করি।

কিন্তু অন্যপক্ষে যখন এদেশের অবক্ষয়ের ইতিহাস স্মরণ করতে হয়, নিজেদের জীবনের ভেতরে এবং বাইরে তাকাই, তখন চিন্তা এবং আচরণের বৈষম্যে আমাদের জীবন কেন এমনভাবে খণ্ডিত হয়, সে প্রশ্ন কি আঘাত করে না? ভারতবর্ষ বিধর্মী বা অবিশ্বাসীকে আগুনে পুড়িয়ে মারে নি সত্য, কিন্তু নানা মিথ্যাচারের গ্লানিতে; অমানুষিক বিভেদের প্রাচীরে, আচারসর্বস্বতায় তিলে তিলে নিঃশব্দে মনুষ্যত্বের শোচনীয় মৃত্যুর আয়োজন কী কম দুঃসহ? রূপককে আঁকড়ে ধরে বস্তুসংঘাতকে এড়িয়ে সমাজজীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব কত সহজেই উপেক্ষিত হয়েছে, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিবেকে এই বিরোধের যন্ত্রণাটুকু পর্যন্ত অনুভূত হয় নি। সত্যি, শুদ্ধতার বোধ অনেক সময় বাস্তবজীবনের সমস্যার মাঝখানে আত্মপ্রবঞ্চনার উপায়মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে, প্রতীকের সঙ্গে জীবনের যোগ থাকে নি এবং বিদেশী আক্রমণে ও নানা অনাচারে দেশ যখন ছিন্নভিন্ন, তখন এই বিচ্ছেদকেই পরমার্থ ভেবে বাস্তবকে ভোলার চেষ্টা চলেছে। হেগেল তাঁর ইতিহাসের দর্শনে বোধ হয় সঙ্গত কারণেই বলেন, ভারতীয় নারীমূর্তি এমন এক সৌন্দর্যের আধার যাতে বাস্তবের সমস্ত কাঠিন্য রুক্ষতা অসঙ্গতিকে লুপ্ত করে আত্মা এক অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়; কিন্তু মানবিক মর্যাদা এবং স্বাধীনতার আলোকে একটু প্রখর দৃষ্টিতে পরীক্ষা করলেই সৌন্দর্যের ঐ চিন্ময়মূর্তির আড়ালে অনেক বঞ্চনা, মনুষ্যত্বের অপমান ধরা পড়ে। কী কী প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক তথা পুরুষার্থঘটিত কারণে ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, এদেশে সর্বব্যাপ্ত সমাজচৈতন্য

এবং সংগঠন গড়ে উঠতে পারে নি, ঐতিহাসিকেরাই তো আমাদের তা দেখাতে পারেন।

অবশ্য অপরদিকে একটু গভীরে তাকালেই বোঝা যায়, প্রত্যয় এবং বাস্তব জীবনের ব্যবধানের বঞ্চনা, আনুষ্ঠানিকতাসর্বস্ব ধর্মাড়ম্বরের মরুভূমিতে ভারতীয় সভ্যতা যেমন শুষ্ক, গতিহীন হয়ে আসছিল, তেমনি ফল্গুধারার মতো সাধারণ মানুষের জীবনাবেগ তাতে যথাসাধ্য প্রাণরস সিঞ্চিত করেছে। অত্যাচার উৎপীড়নে ব্যাধির ক্ষয়েও এই জীবনের আকাশের মতো নির্মল প্রসন্ন ঔদার্য, ক্ষমা, মৃত্তিকার সহিষ্ণুতা, আত্মোৎসর্গের আড়ম্বরহীন নম্রতা—ভারতীয় মানসের শুভবোধের যা কিছু মহৎ দধীচির অস্থির মতোই শুচিকঠিন রূপে অনুভব করি, মরমী কবিসাধকদের গানে যার আশ্চর্য প্রকাশ মেলে। দধীচির অস্থির মতোই কঠিন, কিন্তু দুর্ভাগ্যত তা দিয়ে এমন বজ্র তৈরি হয় নি যাতে সমস্ত বাধা বিদীর্ণ হয়ে ঐ ফল্গুধারা সমুদ্রসন্ধানী প্রাণপ্রবাহে পরিণত হতে পারে। আমাদের এই ব্রাত্য বাংলাদেশেও তো দেখা যায় পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যশাসিত ধর্মের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ জীবনাবেগনির্ভর, কিছুটা পরিমাণে অনার্যসংস্কৃতিঘেঁষা লোকমানসের ধারা, অনেক দুঃস্থতার গ্লানিতেও যা কখনও শুকিয়ে যায় নি। এই স্রোতেরই পরিচয় মেলে শিবদুর্গার লৌকিক গৃহস্থালীর বর্ণনায়, মঙ্গলকাব্যের জগতে, নানা গাথায় গানে, পট ও অন্যান্য শিল্পে।

এই জীবনের সঙ্গে মধ্যবিত্তের যে দুস্তর মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘটেছিল, ইংরেজি শিক্ষা কিংবা ভারতীয়তার আড়ম্বরের তলায় তার যন্ত্রণা অনেককেই অনুভব করতে হয়েছে এবং সেটাই ছিল আমাদের আত্মসচেতনতার প্রকৃত রূপ। ইওরোপের রেনেসাঁসের সঙ্গে মিথ্যা তুলনায় জের না টেনে তার সীমাবদ্ধতায়ই উনিশশতকী জাগরণের নিজস্ব মূল্য বোঝার চেষ্টা করলেই আমরা লাভবান হতে পারি। যে সংশয়-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আত্মগ্লানির কোন্ডে মধ্যবিত্তের আত্ম-অন্বেষণ শুরু হয়, চমকপ্রদ সাফল্যের পরিবর্তে সততায়ই তার মূল্য অনুধাবনীয়। ইওরোপের সংঘাতে প্রগল্‌ভ, দৃপ্ত উচ্ছ্বাসে নয়, আত্মচেতনার যন্ত্রণায়ই এদেশকে খুঁজেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং তাঁর বিভ্রান্তি সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রও।

সেই যন্ত্রণাজর্জরিত চৈতন্যের সূত্রেই মধুসূদনের কাব্যোন্মাদনা ইওরোপ-মোহের প্রাথমিক লক্ষ্যভ্রষ্টতার পর দেশীয় ঐতিহ্যে তার শেকড় খুঁজে পায়।

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ সংস্কৃতের আড়ম্বর, হোমরীয় রূপক-উপমা এবং মিল্টনীয় ছন্দের সজ্জা যতই থাকুক, তার দেশজ ভাষার চালই আমাদের রক্তে সুর তোলে। মধুসূদনের চেতনায় দেশের সংস্কৃতি গভীর হয়েছিল বলেই তাঁর ইওরোপীয় সাহিত্যের চর্চা অনেকটা পরিমাণে সার্থক হতে পেরেছিল। তাঁর প্রহসন দুটোর ভাষার সজীবতা লোকায়ত জীবনেরই। হুতোম এবং দীনবন্ধুর ব্যঙ্গের নির্মোহ তত্ত্ববোধেও ইওরোপের সংঘাতসম্বিত নবজাগ্রত চৈতন্যের সঙ্গে দেশজ জীবন ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের সেই ধারাই লক্ষণীয়। বিদ্যাসাগরের ইওরোপীয়সুলভ পৌরুষের উৎস এখানেই, দেশের মাটির গভীরে তাঁর অস্তিত্বের ভিত্তি ছিল বলেই ডিরোজিওর শিষ্য ছিন্নমূল ইয়ংবেঙ্গলদের তুলনায় ইওরোপের মুক্ত আকাশের আলোয় তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রবলশক্তিতে বিকশিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে আবার একথাও মনে রাখতে হয়, আমাদের জাগরণের এই সমন্বয়ের ধারা জাতীয়জীবনের বিড়ম্বনায় অসম্পূর্ণ ছিল, না হলে বিদ্যাসাগরকেও এভাবে ব্যর্থতার যন্ত্রণায় জর্জরিত হতে হবে কেন।

তিন

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মপরিবারের কিছুটা পরিমাণে বিচ্ছিন্ন এবং অতিমাত্রায় শালীন মার্জিত-রুচির পরিবেশে সেই ধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কস্থাপনের সুযোগ রবীন্দ্রনাথের হয় নি। তাঁর নিজের কথায়ই জানি, বাল্যকালেই তিনি পিতৃদেবের কাছে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত এবং ঔপনিষদাশ্রিত ধর্ম-সাধনায় লালিত হন।

কিন্তু তাঁর কাব্যে উপনিষদের প্রভাব নির্ণয়ের বা তাঁকে উপনিষদের কবি হিসেবে প্রমাণিত করার চেষ্টা না করে তাঁর সমগ্র শিল্পকর্মের সাক্ষ্য নিলেই দেখা যায়; নিজস্ব কবিস্বভাবের দ্বন্দ্বময় প্রক্রিয়ায়ই তিনি ভারতবর্ষকে খুঁজেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন তো তাঁর সীমার দ্বন্দ্ব এবং নিজের দুর্বার কবিস্বভাবজাত পুরুষার্থবোধে তা অতিক্রম করার মহৎ প্রয়াসেরই ইতিহাস; উপনিষদের মন্ত্রে তা নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত হয়, কিন্তু তাকে উপনিষদের সঙ্গে একাকার করে তুললে আর যাই হোক, তাঁর কবিস্বভাবের চারিত্র্য আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয় না।

কোনো সরলীকরণকে প্রশ্রয় না দিলেই আমাদের চোখে পড়ে জিজ্ঞাসু

মনের তৃপ্তিহীন যন্ত্রণায় রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর জীবনের তাৎপর্যানুসন্ধান। নিজের ব্যক্তিস্বরূপের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনজীবনের অভিশাপজনিত আমাদের অস্তিত্বের মৌল অসঙ্গতি সম্বন্ধে তিনি সচেতন হন; দেশজ ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভাব তাঁকে অস্থির করে তোলে। তিনি নিজের এবং স্বদেশের সীমার বাধাকে জয় করার চেষ্টাই করেন জাগ্রত মননের জিজ্ঞাসায়; মানুষকে খোঁজার ব্যাকুল আগ্রহ থেকেই উৎসারিত শিল্পের নব নব পরীক্ষার কঠিন পরিশ্রমে, অর্থাৎ সংক্ষেপে তাঁর কবিপ্রতিভার চারিত্র্যে। এই শক্তির জবমর প্রক্রিয়ায়ই তিনি আমাদের নবজাগরণের চিন্তা-ভাবনা, অন্বেষাকে এক বিশ্বমানবিক অখণ্ডতার ব্যঞ্জনায় বিস্ময়কর পরিণতি দান করেন।

এই পরিণতি সহজসাধ্য ছিল না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথকে নিজের ভেতরে, পরিবারের এবং বাইরের সমাজেও নানা সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ চিন্তায় এবং আচরণে সমাজের একটি অগ্রণী অংশ ছিল। একবার রবীন্দ্রনাথকে তার 'সম্মানিত সদস্য'রূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব উত্থাপিত হলে এ সমাজের এক বিশিষ্ট নেতা 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত এক পত্রে লেখেন: "তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) হস্ত হইতে আরও অনেক উপন্যাস ও কবিতা বাহির হইয়াছে। সে সকল উপন্যাস ও কবিতার সকলগুলিই সুরুচিসম্মত নহে। তাঁহার কৃত উপন্যাসের কোন কোন খানি শ্লীলতার সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে; তাঁহার কৃত কোন কোন কবিতার সম্বন্ধেও সে কথা বলা যাইতে পারে।...তাঁহার কৃত কোন কোন উপন্যাস ও কবিতা সম্বন্ধে আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিরই যে এই অভিযোগ এমনও নহে; তাহা এদেশের সংবাদপত্রাদিতেও ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার কৃত কোন কোন উপন্যাসে সমাজস্থিতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যে সকল সুরীতি-নীতি সমাজমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, তাহার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার কৃত একখানি উপন্যাসে ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের প্রতিও বিশেষ কটাক্ষ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজকে বিশেষভাবে সংকীর্ণ বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। অথচ যে সব স্থানে তিনি ব্রাহ্মচরিত্র সংকীর্ণ করিয়া আঁকিয়াছেন, সে সব স্থলে তাহার কোনই প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এখন বিবেচ্য এই, যাঁহার হস্ত হইতে রুচিতে হীন, অশ্লীল এবং

সমাজস্থিতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশক উপন্যাস এবং কবিতা বাহির হইয়াছে, তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণ করা উচিত কি না?" এমনিভাবে নানা সংস্কারে তাঁকে ভুল বোঝা হয়েছিল, যেমন সংকীর্ণ জাতীয়তা কিংবা বাঙালিয়ানার মোহে তাঁর বিরুদ্ধে ভুল বোঝার অবিচার করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং চিত্তরঞ্জন দাশ।

অবশ্য আমাদের বিক্ষিপ্ত সমাজের সীমাবদ্ধতার ক্ষতি অনেকটা পূরণ হয়েছিল পদ্মাপ্রকৃতির শুশ্রূষায়, কবি তাঁর মূল্যবোধের বিকাশের সব থেকে অনুকূল ক্ষেত্রটি এখানেই পান। প্রকৃতির প্রতিশোধে যে জীবনাভিজ্ঞতার সূত্রপাত, পদ্মার তীরে প্রকৃতি ও গ্রামজীবনের সংস্পর্শেই তার যথার্থ বিকাশ ঘটে। কলকাতার সদর স্ট্রীটের প্রগল্ভ অগভীর উচ্ছ্বাসে নয়, নির্ঝরের প্রকৃত মুক্তি ঘটেছিল পদ্মার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে।

প্রকৃতি তো এদেশের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং সহজ সম্বন্ধে বাঁধা, তার আত্মীয়তা সম্পূর্ণ অবারিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক ইংরেজ কবির মতো প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে কষ্টার্জিত আবিষ্কার ছিল না। এই প্রকৃতিতে তাঁর জীবনের সমগ্রতার বোধ সঞ্জীবিত হয়েছিল বলেই এ যুগে তাঁর কাছ থেকে আশ্চর্য ছোটগল্প এবং 'সোনার তরী' 'চিত্রা'র পরিণত কবিতাবলী পাই। বাঙলা সাহিত্যকে তিনি যে বিশ্বভাবনার উপযোগী করে তুলেছেন, এ পর্বেই তা আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারি। ছোটগল্পগুলোর বাঙলাদেশের গ্রামজীবনের সুখদুঃখ সমস্তার পটেই জীবনের বিরাট দিগন্ত উদ্ভাসিত। তাঁর প্রকৃতির রূপায়ণেও চেতনার বিস্তার লক্ষ্য করার মতো। বিহারীলাল, অক্ষয়কুমার বড়াল বা দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রকৃতিকে একটু সংকীর্ণ প্রাদেশিক লাগে, যদিচ তার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আমাদের মনকে টানে। এদেশের গার্হস্থ্যজীবনের নানা সম্বন্ধেই প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিয়েছে, কিন্তু তাঁর গল্প এবং কবিতায় আকাশ মাটি জলের চিত্র বিশিষ্টরূপে বাঙলার হয়েও বিশ্বপ্রকৃতির ব্যঞ্জনায় সম্পূর্ণতা পায়।

আমাদের পরাধীন অভিশপ্ত জাতীয় জীবনের বিড়ম্বনায়ই মাঝে মাঝে তাঁর মানসের আকাশ মাটির সংস্পর্শ থেকে যেন একেবারে বিচ্যুত হয়। তাঁর কাব্যের অতি সূক্ষ্ম, মার্জিত, পেলব সৌন্দর্যে মন ভরতে চায় না। অক্ষয়ের জগতের মতোই তাঁর শুদ্ধতাকে দুর্বহ লাগে, থেকে থেকেই

আমাদের অনেকেরই মনে হয়, সমাজজীবনের অভিজ্ঞতাঘটিত সংবেদ্যতায় আসে না বলেই তাঁর শুদ্ধতার প্রত্যয় নিরক্ত, প্রায় অশরীরী। কিন্তু এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়, প্রীর‍্যাফেলাইট কবিদের অহংমত্ত সৌন্দর্যবিলাসের সঙ্গে কীট্‌সের জীবনের সমগ্রতাসন্ধানী সৌন্দর্যধ্যানের পার্থক্যের মতোই তাঁর সৌন্দর্য-অভীপ্সা বিচ্ছিন্নতাবাদী আধুনিক কবিদের অহংসর্বস্ব বৈনাশিক-বুদ্ধিসঞ্জাত নয়, নিখিল সত্য ও মঙ্গলবোধের সমগ্রতায়ই তা সার্থকতা খোঁজে।

আমাদের আবার বিস্ময়ের সঙ্গেই আবিষ্কার করতে হয়, নিজের কবিস্বভাবের স্বপ্নময় প্রেরণায়ই বিরোধ অসঙ্গতিতে পূর্ণ এই বসুন্ধরার মমতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যানের ঐ স্বর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছেন, পূরবীর সুরেই বেঁধেছেন বিশ্বজনের প্রাণস্পন্দিত ধরণীর সীমায়ই অসীম সৌন্দর্যকে। আবার সেই স্বভাবের তাগিদেই তো তাঁর আকাশের অধরার ধ্যান ছড়ায় ছন্দের অনুরণনে দেশজ রীতির ঘনিষ্ঠতায় এই পৃথিবীরই ক্ষণিকা পলাতকার ব্যাকুল সন্ধানে পূর্ণতার সার্থকতা পেতে চায়। উপন্যাসেও এই মহৎ শিল্পী তাঁর তত্ত্ববোধে জীবনের সমগ্রতাই সন্ধান করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যন্ত্রণাজর্জরিত যে আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম উপন্যাসে তাকে ধরার চেষ্টা করেন বৃহত্তর তাৎপর্যে। 'গোরা' এবং 'চতুরঙ্গ'-এ ঊনবিংশ শতাব্দীর জনসমাজবিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের যন্ত্রণার পটে জীবনের সাযুজ্য সন্ধানে গোরা এবং শচীশের দুঃখের সাধনা বৃহত্তর জীবনে ব্যক্তিচৈতন্যের মুক্তির সম্ভাবনায় আমাদের চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটায়।

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার প্রচণ্ড শক্তিতেও অনেক সময় ঔপনিবেশিক জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব হয় না, তাঁর শেষপর্বের গল্প-উপন্যাসে এবং 'বাঁশরী'র মতো নাটকে তার উদাহরণ পাই। 'গোরা' 'চতুরঙ্গ'-র আত্মসচেতনতার মমতার বদলে 'শেষের কবিতা', 'দুইবোন', 'তিন সঙ্গী' প্রভৃতি রচনায় অসুস্থ আধুনিকতার হুজুরের লোভও যে তাঁর শক্তির অপচয় ঘটায়, তা আমাদেরই রুগ্নজীবনের দুর্ভাগ্য। সাধারণ পরীক্ষায়ই এ রচনাগুলোর চলতি ভাষায় বিচ্ছিন্নতার কৃত্রিম নাগরিক চমকের তুলনায় 'গল্পগুচ্ছ' বা 'গোরা'র প্রাণবন্ত সাধুভাষার অখণ্ডতার শ্রী চোখে পড়ে। কবিতার সবোক্ত-বিন্যাসের বিশেষ সুবিধার ব্যাপার ছেড়ে দিয়েই আমরা দেখি: এক হিসেবে ঐতিহ্যবিহীন বাংলাগদ্যে আমাদের খণ্ডিত জীবনের দায়ভাগ ছিল

সব থেকে বেশি, এ বিড়ম্বনা তার আবির্ভাবকাল থেকেই লক্ষণীয়। মুক্তি এবং সম্ভাবনার উৎস ছিল সাধারণ জীবনের ভাষার সঙ্গে 'যোগাযোগ'-এ, অর্থাৎ ঐ জীবনে প্রাণসংগ্রহে। মধুসূদনের প্রহসন এবং দীনবন্ধুর নাটকের ভাষায় তার উদাহরণ যেমন মিলেছে, তেমনি ঐ প্রতিভাধর কবির 'হেক্টরবধ'-এর হাস্যকর দুষ্পাচ্য ভাষায়, দীনবন্ধুর ভদ্র চরিত্রগুলোর আড়ষ্ট নিষ্প্রাণ সংলাপে মধ্যবিত্ত মানসের দ্বিধাও পরিস্ফুট। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অন্যান্য উপন্যাসসুলভ মিথ্যা আড়ম্বর ছেড়ে 'ইন্দিরা'র জীবনের সহজ ধারায় আকৃষ্ট হন বলেই এ রচনায় তাঁর গদ্যের প্রাণময়তার দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়। এবং বঙ্কিম যন্ত্রণা-বোধের মমতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর আত্মসচেতনতার সমস্যা মোটামুটি সমগ্রভাবে রূপায়ণের চেষ্টা করেছিলেন বলেই 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর গদ্য উপন্যাসগুলোর তুলনায় অনেক সজীব, সচল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঐ সীমাবদ্ধতায়ই তাঁর শিল্পীস্বভাবের মহত্ত্ব বোঝা যায়, যার দুর্মর সম্মোহে তিনি কোনওদিন স্থির তৃপ্ত থাকতে পারেন নি। সেজন্যেই তো তাঁর কাব্যসাধনার শেষ পর্বেও দেখি জীবনবোধের সত্তায় তাঁর মানসের বিস্ময়কর প্রাণশক্তি। এ যুগেও সাধ ও সাধ্যের বেদনা ঘুরেফিরেই তাঁর কবিতায় আসে, নিজের অসম্পূর্ণতায় তাঁকে ব্যথিত হতে দেখা যায়:

"মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।"

কিন্তু কবির মানবিকতা নৈরাশ্যের গ্লানিতে অবসন্ন হয় না, সর্ববিধ অসঙ্গতিতেই সমন্বয়ের ভারসাম্য খোঁজে। ক্রূর লোভে, নিষ্ঠুর পীড়নে ক্ষতবিক্ষত আধুনিক সভ্যতার ভবিষ্যৎ-ভাবনা তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে তোলে, সেই সচেতনতায়ই কবির কল্যাণবোধ আরও গভীর হয়ে দেখা দেয়, ভাষার সংহত দীপ্তিতেই তা অনুধাবনীয়। এই মঙ্গলের উপলব্ধির শুভ্রতায় মাঝে মাঝে পল্লীর স্মৃতির উজ্জীবনে দেশজ জীবনের প্রতি আকর্ষণ মমতার স্নিগ্ধ রঙ ছড়ায়, কখনও বা তাতে সভ্যতার দুর্গতিতে তাঁর ক্ষোভ বেদনায়

অগ্নিবর্ষের আভাস জেগে ওঠে। কবির ব্যাধির যন্ত্রণা তো সভ্যতার দুর্গতির বেদনার রূপক হয়ে ওঠে, তার পটেই তো প্রকৃতির নির্মল প্রসন্নতায় তাঁর শান্তির অনুসন্ধান এমন গাঢ়বদ্ধরূপে উদ্ভাসিত হয়:

"প্রত্যূষে দেখিনু আজি নির্মল আলোকে
নিখিলের শান্তি-অভিষেক;
তরুগুলি নতশিরে ধরণীর নমস্কার করিল প্রচার।
যে শান্তি বিশ্বের মর্মে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত
রক্ষা করিয়াছে তারে
যুগ-যুগান্তের যত আঘাতে সংঘাতে।
বিক্ষুব্ধ এ মর্তভূমে
নিত্যের আনায় আবির্ভাব
দিবসের আরম্ভে ও শেষে।"

কবি তাঁর জগৎ ও জীবনের আস্তিক্যবোধে রাত্রির বিচ্ছেদের অন্ধকার থেকে প্রভাতের ঐক্যসঞ্চারী আলোকে, বিরোধ পার হয়ে সঙ্গতির আনন্দে পৌঁছোন:

"খুলে দাও দ্বার;
নীলাকাশ করো অবারিত;
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ;
প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়;
আমি বেঁচে আছি তারি অভিনন্দনের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও;
এ প্রভাত
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক মোর মন
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্প শ্যামল প্রান্তর।
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে,
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে;
তারি পুণ্য-অভিষেকে করি আজ স্নান।
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহাররূপে
দেখি ওই নীলিমার বুকে।"

সত্যতার অবক্ষয়ের অন্ধকারে জগৎ ও জীবনের মর্যাদা রবীন্দ্রনাথের মানবিক চেতনার রসায়নে নতুনভাবে রূপায়িত হয়। এই পৃথিবীর "ধূলি"তেই "সত্যের আনন্দরূপ" অনুভব করে শেষ বিদায়ের জন্ত তিনি প্রস্তুত হন সে "ধূলি"র প্রতিই নম্র প্রণামনিবেদনে। কোনও ক্ষুদ্রবুদ্ধিতেই তাঁর এই ঐকান্তিক শুভবোধের সর্বভূমিকতার মহত্ত্বকে খর্ব করা সম্ভব নয়।

চার

তৃপ্তিহীন যন্ত্রণায়, স্বকীয় মূল্যবোধের বিরামবিহীন জীবনের তাৎপর্য-অন্বেষণে, চৈতন্তের বিপুল বিস্তারে, শিল্পকর্মগত পরিশ্রমে ও বিনয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে সাহিত্যিক চারিত্র্যের ঐতিহ্য নির্মাণ করে গিয়েছেন, দুঃখের বিষয় আমরা এখনও তার মূল্য বোঝার চেষ্টা করি নি। ইওরোপীয় কাব্যের তীব্রতায় তাঁকে পরিমাপ করতে যখন লুব্ধ হই, তখন সমস্ত জটিলতা সত্ত্বেও সেখানকার সচল সুবিন্যস্ত ঐতিহ্যের পাশাপাশি এদেশের জীবনের দ্বিধাসংশয়-বিক্ষিপ্ত, নানা প্রাচীন পরিণতি ও অপরিণতিতে অসম রূপ স্মরণ রাখা উচিত এবং সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভায় চরিত্রশক্তি বোঝার দায়িত্ব স্মরণীয়। আমাদের অসম্পূর্ণ জাগরণের সঙ্গে তাঁকে যান্ত্রিকভাবে সম্পর্কান্বিত করার চেষ্টায়ও বোধহয় এই শক্তির মহত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর যন্ত্রণাময় আত্মসচেতনতা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-স্বরূপের বিশ্বভাবনায়, ব্যথায় অবিরাগে দীর্ঘজীবনব্যাপী দীপ্ত গীতরচনায় এক বিশ্বমানবিক, সম্পূর্ণ নতুন পরিণতি পায়। আমাদের দুঃস্থ, বিকলাঙ্গ জীবনে এবং সীমিত শক্তিতে সে পরিণতির সমগ্র ঐশ্বর্যকে হয়তো আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, এমন কি তাকে কিছুটা পরিমাণে দুরূহও মনে হতে পারে। কিন্তু এখনকার লোভে মোহে আত্মবিক্রয়ের নির্লজ্জ উল্লাস, সজ্ঞান মিথ্যাচার ও সাহিত্যিক বিবেকহীনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নানা দিক থেকে তাঁর শিল্পীস্বভাবের চরিত্রশক্তির মাহাত্ম্য বোঝার চেষ্টায় আমাদের জীবন ও শিল্প-সংস্কৃতির উপকার অনেক।

কয়েকটি কবিতা

বিষ্ণু দে

দুই কর্মীর এক দাদার জন্য তর্ক

অনেক বছর পরে কয়েক সপ্তাহ কাটে গ্রামে গ্রামান্তরে,
ছুটি নয়, প্রচারে সফরে নির্বাচনে।
ভালো লাগে রৌদ্রময় বিস্তীর্ণ আকাশ, নানা পাখিদের ডাক,
থেকে থেকে যাই-যাই পশ্চিমের হাওয়া।

শিমুলের গায়ে আজো রক্ত নেই।
আর রোগা আমড়া ফ্যাকাশে আর সজনের ফুল
কবে ফুটবে ভাবছে আর উত্তরের ডাঙার পলাশে
এখনও ধূসর রোগ।
অবশ্য দক্ষিণের পলাশটা কলমের আমে মউল ধরেছে।
শুধু বর্ণাঢ্যবিলাসে বুগেনভিলিয়াগুলি চার রঙে হেসে ওঠে
আমাদের আস্তানায় বাগানবাড়িতে থামে থামে,
গোলাপের জের এখনো রয়েছে কিছু।
তবে এরই মধ্যে টিলার তলায় সর্বহারা জ্যামিতিতে
পত্রহীন গোলকচাঁপার গান ওঠে অপরাজিতের।
আর ঝোপে ঝাড়ে তারই পিছুপিছু
হাওয়ার হিল্লোলে দোলে রক্ত-শ্বেতকরবী আবার
গ্রাম্য বন্য পর্ণাঢ্যিতে।

বহু ব্যাপ্ত দাদার এলাকা।
জীপে আর পায়দলে এ গ্রামে সে গ্রামে
বক্তৃতায় আর বাড়ি-বাড়ি আলাপে সালাপে ক্লান্ত যে সে কথা মানি।

তাছাড়া মনটাও তার, জানি মাঠে ক্ষেতে আর
—অবশ্য এখন মাঠে ধান নেই, রবিশস্য
এ অঞ্চলে ফলেনি বিশেষ—
গরু মোষ বলদের ছাগলের পাল ছেড়ে দিলে একালে চলে না।
তাই জীপে পায়দলে ঘুরে ঘুরে বলি
প্রতিপক্ষ যে কথা বলে না।

তুমি বলো ব্যাপারটা এলে-বেলে, হয়তো বা তাই,
আমিও তা ভাবি ক্লান্ত যখন ঘুমোতে ক্যাম্পে ফিরি,
এত বড় দেশে যে সাইকেলে হেসে-খেলে
ধান কাটা ধান তোলা খালি হাতে সম্ভব না খালি শীষ চেলে,
দাদাও তা বোঝে না কি ?
তাই গদী ফেলে কাস্তের প্রশংসা করে আলে উঠে,
কারণ সম্প্রতি স্বতন্ত্র নামটাও আর অসম্ভব।

বেশ হাসো, তবে ব্যাপারটা অত সোজা নয়
শুধু কার্যসিদ্ধি নয়, অবশ্য দাদার আছে স্বাভাবিক দ্বিধা, ভয়,
তাছাড়া কাস্তের গৌরব এখনও বিস্তৃতভাবে
এবং গভীরভাবে তোমরাও বোঝনা বা বুঝলেও
শ্রমসাধ্য একঘেয়ে খেটে মাঠো ধৈর্য ধ'রে
প্রমাণ করোনি সর্বত্র সমানভাবে সকলের মনে।
তাই তুমি আমি ঘুরি গ্রামে গ্রামে আবাদে জঙ্গলে
জীপে পায়দলে দাদার পয়সায় সাইকেলের পিঠে ব'সে।

গ্রামে বনে বসন্তের প্রভাব হৃদয়ে স্নায়ুতে গোপনে
কাজ ক'রে চলে, লক্ষ্য করেছ কি তুমি ?
বসন্ত বাউরীর গানে তোমার কেন্দ্রীয় মার্কা মন
অন্তত একটা সপ্তাহ যদি গলে গেঁয়ো কাফী দেশজ ইমনে,
তাহলেই খুশী হব অদ্‌গত পরিশ্রমী সংযুক্ত সদ্ভাবে।
এখনই কোথায় যাবে, চা-টা খাও। খেয়ে তবে যেয়ো।

বরং সে আর তার বোন

মাঝরাতে বাপ ফেরে। কলকাতার রাস্তায় যখন
ক্লান্ত ফাঁকা হাহাকার হঠাৎ হঠাৎ মোটরের চকিত চীৎকারে
দম পায়, তখন বাপটি ফেরে, না শ্মশান না, অন্ত আড্ডা থেকে,
তখন সে বিছানায় জানলার দিক থেকে ফেরে, যেন নিজেকে গোপন
ক'রে দেয়ালের মতো, চুপচাপ-চোখ মেলে কিংবা চোখ ঢেকে
অস্পষ্ট আবেগে ভাবে, ভাবে : কি যে ভাববে এবারে।

মা তখন ঘুমে কিংবা ঘুমের ওষুধে অসাড় বালিশে
ওই ঘরে কি যে ভাবে, আপন শিশুর মনে ভাবে তা ছেলেটি,
মা যে কেন অবিশ্রাম কাজে যায়, কোথা যায়, সে কোন আপিসে
ঘুরে ঘুরে নিজেকে যে খালি করে, সে যখন দুপুরে বাড়িতে
শুয়ে থাকে কথামতো পাশে মা আসে না, না, মা খুব ভালোবাসে,
ইলিশের পেটি
নিজে বেছে তাকে দেয়, নিজে গাদা কাঁটা খায়, বলে :
জিভ চাপিস্ মাড়ীতে
দেখবি ইঁদুর দাঁত ফেরত দেবে না। মা-ই বলে, উত্তরাধিকারী
সেই নাকি, বাবাও চেঁচায়। কলকাতার রাস্তায় যখন অনেক ভিখারী

ঘুমোয় অনেক লোক, মড়া যায় শ্মশানের দিকে হঠাৎ চীৎকারে
তখন সে চুপচাপ ভাবে : কাল ভোরে আর ইস্কুলে যাবেই না সে,
মা তাকে ভালোই বাসে, বাবাও হয়তো তাদের ভালোই বাসে,
সে আর বোন নাকি মা বাবাকে বন্দী রাখে, সেই উত্তরাধিকারে
উত্তর দেবেই না আন্টিডিডিমশিনের, বরং সে আর তার বোন
চলে যাবে, শ্মশানে না, বহুদূরে, নেনার জঙ্গলে, দুজনেই ভালুকশিকারী।
কিংবা মোড়ে, ভোটের মিটিঙে, দুজনের দুহাতেই ছবিআঁকা ফ্ল্যাগ
ভারী ভারী।

পোলিং স্টেশনে

লোকটি অদ্ভুত বটে, (কি জানি! হয়তো অদ্ভুত অজ্ঞেয়া ?)
প্রত্যহ সে চিঠি লেখে, দূরের প্রেয়সী নাকি স্ত্রীকে, গ্রামে,
মাঝে মাঝে উত্তরও সে পায় বৈকি, কখনো দেরিতে কখনো বা পরপর,
চিঠি লেখে যত্ন ক'রে, ধৈর্য ধ'রে, খামে।

আজ প্রায় সকালেই তার দেখা, নির্বাচনী অর্থাৎ পোলিং স্টেশনে,
লাজুক মেদলা ব্যক্তি, বলি : কি ব্যাপার, তুমি যে এখানে ?
এই গণ্ডগোলে আজ পণ্ড ক'রে দিলে তো তোমার রবিবারের ধ্যান ?
প্রায় মুখে না তাকিয়ে গানের গলায় বললে : তার মানে ?

পাঁচটি বছর বাদে একদিন ভোট দিই এইখানে এসে,
আর প্রত্যহ পালন করি নির্বাচন দিন সেই নামে।
তুমিও তো তাই, নয় ?—গলাটা নিচুই, কাছ ঘেঁষে
ব'লেই হঠাৎ দুই চোখ মেলে চায়, রৌদ্র জ্বলে বুঝি হাওয়া খোওয়া
শ্বেত পাথরের থামে।
চুপ করে থাকি, জানি পটলডাঙায় তার মেসে মাঝে মাঝে
চিঠি আসে, আর সেও প্রতিদিন চিঠি লেখে, যত্ন ক'রে, খামে।

প্রশ্নপত্র

তার তুলনা কি চিরচেনা কলকাতা ?

দুস্থ দিনের অসুস্থ রাত্রির
শহরে যেমন চলে যায় মন দূর
আকাশে বাতাসে মাঠের সচ্ছলতায়

ভিড় ঠেলে ঠেলে হাওড়ায় রেল যাত্রীর
দুর্ভোগ স'য়ে, এই শহরে কি যাতা-
য়াতি করে মন, প্রেমিক বা বন্ধুর
জন্যে যেমন করাটাই সঙ্গত ?
নাকি এ তুলনা ভাবছি দুর্বলতায়
জরা যেমনটি ভাবে যৌবনলোভে ?
অথবা যেমন রাজনীতি যদি ভোবে
তখন অনেকে শেয়ারবাজারে ইষ্ট
প্রতিষ্ঠা করে অথবা দেখায় পৃষ্ঠ
বিপ্লবকে বা প্রতিক্রিয়াকে কেউ ?

যতই আত্মজিজ্ঞাসা করে হেয়,
নিশ্চিত জানি ততই আমরা দুজনে
যে মানসলোকে বাস করি, তার শুদ্ধি
আমাদের সব শান্তি কেড়েছে অনুপম
একটি বিরাট শান্তির চির অস্থির
দিনরাত্রির স্বপ্নে। এ শুচি বুদ্ধি
জানি আমাদের ছেড়েছে মুক্তিদের
মানুষের মাঝে যেখানে স্বেচ্ছাবশত
আনন্দ লাল আর নীলাকাশ অক্ষম
হাজার চূড়ায় চূড়ায় লক্ষ ঢেউ।

ভালোই জানে সে, আমাদের গাঢ় কূজনে
বিশ্ব হাজার খুশি হাতে দেয় তাল।
তাই বুঝি তাকে পাশে খুঁজি অস্থির ?
কলকাতা ফের গ'ড়ে দিতে হবে দুজনে ?

কী বাজাও

রাম বসু

বাতাস তাড়িয়ে দিল বৃষ্টি
বাতাস তাড়িয়ে দিল নীলে দগ্ধ তীব্র কনীনিকা
এবং সমস্ত পাতা, ক্লান্ত-লুপ্ত ঘাসের বলক।
গাছ, তুমি দীপ্ত নগ্নতায় দাঁড়িয়ে। ভূষিত করো
আমার জটিল মুখ রেখাচিত্রে ও উপকথায়।

কি বলবে তোমরা আর শূন্যতার দুহিতা বাতাস
সেই মৃত ভালোবাসা? সে সব বিবর্ণ পাপড়ির
সমৃদ্ধ সুগন্ধ পৃথিবীতে এখনও ছড়ানো আছে।
হৃদয়ের ছাঁচে দুঃসাহসী গভীর মোহানাগুলি
স্তোত্রের মতন উচ্চারিত হয় তোমার শিকড়ে।

আমাদের সময় হয়েছে।
ঘৃণা করি যা স্পর্ধা নয় ও আমরা স্থাপন করি
কয়েকটি সংকেত, মুদ্রা; তার ছাপ
এঁটেল মাটিতে আর সমারোহ-ঘোষিত-কপালে।

কেন না তোমার মুখ
শ্বেত পাথরে নির্মিত নগরীর স্বর্গীয় মহিমা
কেন না তোমার দৃষ্টি আচ্ছাদিত দুর্লভ বিহঙ্গ।

আমাদের সময় হয়েছে।
তবে আরণ্যক মাতা
শুরু হোক তোমার আদিম অন্ধকার দিব্য-নৃত্য
আমাকে জড়িয়ে নাও চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে।

অঙ্গে অঙ্গে কী বাজাও হে কঠিন হে আমার প্রেম!

কথোপকথন ঃ চোদ্দশ সালে

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

দেশলাই আছে ?   সিগারেট দিতে আপত্তি নেই কারো।
বহুদিন পরে দেখা হলো আজ, চোদ্দশ বঙ্গাব্দ ;
দুয়ার দস্তুর যে কোনো সুযোগসন্ধানী পেতে পারো
ভোগ্য পণ্য রম্য রমণী।   সত্তা যেহেতু স্তব্ধ

আপাতত আমি বধির সত্য সৎকার সংঘের।
চিন্তা নামক ফুসফুসে বাড়ির সাড়াহীনে চৌকাঠ,
মগজে চারশো বোলতা ছাড়াও ইঁদুর রয়েছে ঢের,
মাঝে মাঝে পাই নিজের বিবেক বিক্রির কণ্ট্রাক্ট।

ব্যক্তিগত কি ?   পবিত্র শুধু নিজেরই কণ্ঠস্বর ?
এক পা বাড়ালে দশ হাজার ফুট খাদ,
মাসিক বেতনে স্বয়ংশাসিত স্বর্গে অধীশ্বর
বাচাল এবং বেচাল বুদ্ধি, বড্ড বেশি অবসাদ !

কেমন সহজ নিমেষেই কামানো বন্ধুর দেওয়া ক্ষুরে।
কামাতে কামাতে হঠাৎ ফিনকি-রক্ত, কিসের শব্দ !
ডান হাত বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা গায় রুধিরের অঙ্কুরে
বনস্পতির আবহ বনায়।   চোদ্দশ বঙ্গাব্দ।

বলেছিল

আন্না আখমাতোভা

সে তো বলেছিল "নেই প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো
পৃথিবীর নারী আমি তার কাছে নই
আপন গহন দেশে বন্দগান যেন
শীতের কঠিনে উষ্ণ আলো সূর্য ওই।

আমার মৃত্যুর দিনে কখনো সে কাতর হবে না
বলে উঠবে না "বাঁচো" তীব্র আর্ত স্বরে উন্মাদের
হঠাৎ বুঝবে বাঁচা অসম্ভব, অসহ্য যাতনা,
গানহারা হৃদয়ের, সূর্য-হীন এই শরীরের"—

আজ?

অনুবাদ: শুভময় ঘোষ ও দীপক মজুমদার

খ্রীষ্টের পাপ

আইজাক বেবেল*

এম্মিনা হোটেলের ঝি। সামনের দিককার সিঁড়ির পাশেই সে থাকত। সেরেগা দাররক্ষীর সহকারী। সে থাকত পেছনের দিককার সিঁড়ির ওপর। তাদের দুজনকার মধ্যে সম্পর্ক ছিল লজ্জার। পাম সানডে-তে এম্মিনা সেরেগাকে উপহার দিয়েছিল একজোড়া যমজ সন্তান।

নদীতে জল বয়ে যায়। আকাশে তারা ঝিকমিক করে। মানুষ কামার্ত হয়। এম্মিনা আবারি পোয়াতি হলো। তার এখন ছ-মাস। মেয়েদের মাস যেন পিছলে পিছলে যায়। এই সময় আদেশ এল সেরেগাকে সৈন্যদলে ভর্তি হতে হবে। কেলেঙ্কারী কাণ্ড!

তাই এম্মিনা গিয়ে বলল: দেখ সারগুনিয়া, তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকার কোনো মানে হয় না। চার বছর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। এই চার বছর—তুমি যেভাবেই ব্যাপারটা নাও না কেন—নিদেন পক্ষে দু-তিনটি প্রাণীকে আমি পৃথিবীর আলো দেখাব। হোটেলের চাকরি করা আর ঘাগরা তুলে ঘুরে বেড়ানো একই কথা। এখানে যে আসে সেই তোমার মালিক—তা সে ইহুদীই হোক আর যেই হোক। তুমি যখন ঘরে ফিরবে তখন আর আমার ভেতরে কিছু থাকবে না। আমি তখন ছোবড়া হয়ে যাব, তোমার যোগ্য থাকব না।

ঠিকই তো, সেরেগা মাথা নাড়ল।

অনেকেই আমাকে চাইছে। যেমন ধরো, ঠিকেদার ট্রিফিমিচ। কিন্তু ও ভদ্রলোক নয়। আর আছে নিকোলোসভিয়াৎস্কি গীর্জার ওয়ার্ডেন ইসাই আভ্রামিচ। রোগা দুবলা বুড়োমানুষ। তা যাই বলো, তোমার অসুরের মতো তাগদ আর আমার পেটে সহ্য হয় না বাপু। তোমাকে বাপু সাঁচ কথাই বলছি—কনফেসনেও কথাটা আমি এইভাবেই বলতাম—আমার আম

* আইজাক বেবেল বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার একজন শক্তিমান লেখক। দীর্ঘকাল পরে তাঁর গল্প-সংকলন সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে—অনুবাদক।

একেবারে খতরা হয়ে গেছে। তিন মাসের মধ্যে আমার বোঝা খালাস হবে, তারপর বাচ্চাটাকে এতিমখানায় দিয়ে ওই বুড়োকেই আমি বিয়ে করব।

এই কথা শুনে সেরেগা কোমর থেকে বেল্ট খুলে বীরের মতো এরিনার পেটের ওপর কষে লাগাল কয়েক ঘা।

এরিনা বলল, দেখো, পেটের ওপর অত জোরে মেরো না। ও তোমারই বোঝা, আর কারুর নয়…

মারের শেষ নেই। মানুষের চোখের জলেরও না। মেয়েমানুষের রক্তেরও না। কিন্তু তার কোনো দাম নেই।

তারপর মেয়েমানুষটি এলো যীশুখ্রীষ্টের কাছে।

ইত্যাদি ইত্যাদি প্রভু যীশু। আমি হোটেল মাত্রিদ ও মুতরের এরিনা। ওই যে খতেরস্কায়া স্ট্রীটের হোটেলটা। হোটেলে কাজ করা মানেই ঘাগরা তুলে ঘুরে বেড়ানো। হোটেলে যে লোকই আসে সেই তোমার প্রভু, জান-মালের মালিক—তা সে ইহুদীই হোক আর যেই হোক। প্রভু, তোমার আর একজন দাস পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। তার নাম সেরেগা। যাজকীয় সহকারী। গত পাম সানডে-তে তাকে একজোড়া যমজ সন্তান উপহার দিয়েছি…

এমনিভাবে সবকথা সে প্রভুকে খুলে বলল।

ধরো, সেরেগাকে যদি সৈন্যদলে ভর্তি হতে না হয় তাহলে কী করবে? ত্রাণকর্তা জিজ্ঞেস করলেন।

তাও কখনও হয়। পুলিস আছে না। চেষ্টা করে দেখুক—ঘাড় মটকে ধরে নিয়ে যাবে।

তা বটে, পুলিস তো আছে। প্রভু মাথা নিচু করলেন। তার কথা আমি ভাবিই নি। তাহলে তো দেখছি কিছুকাল তোমাকে শুদ্ধভাবে থাকতে হয়—না কি?

চার বছর? মেয়েটা ফুকরে উঠল। প্রভু, এমন কথা তুমি বলতে পারলে! আমরা পশু-প্রকৃতিকে অস্বীকার করব? না প্রভু, এ তোমার সেকেলেপনা। তাহলে লোক বাড়বে কী করে। না প্রভু, আমাকে কিছু কাজের উপদেশ দাও।

প্রভুর গাল লাল হয়ে উঠল। মেয়েটির কথা তাঁর আঁতে ঘা দিয়েছে।

কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। নিজের কানে চুমু খাওয়া যায় না। এমন কি ভগবানও তা জানেন।

আমি তোমাকে কী বলব ঈশ্বরের দাসী, মহীয়সী পাতকী এরিনা, প্রভু ঐশ্বরিক মহিমায় বললেন। আমার এই স্বর্গে একটি খুদে দেবদূত আছে। কোনো কাজ-কম্ম নেই তার। তার নাম আলফ্রেড। ইদানিং সে বড়ই অবাধ্য হয়ে উঠেছে। সারাদিন কেবল ঘ্যান ঘ্যান করে: একী করলে প্রভু! মাত্র কুড়ি বছর বয়স আমার। ফুর্তিবাজ মানুষ আমি। আমাকে কেন তুমি দেবদূত করলে!—এই দেবদূত আলফ্রেডকে আমি চার বছরের জন্ম তোমাকে দেবো স্বামী হিসেবে। সেই হবে তোমার প্রার্থনা, তোমার রক্ষক, তোমার সান্ত্বনা। আর বাচ্চা-কাচ্চা। ও নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। মানুষের বাচ্চা তো দূরে থাক, হাঁসের বাচ্চা জন্ম দেবার ক্ষমতাও ওর নেই। ও কেবল খেলতেই জানে—কাজের মুরোদ নেই একফোঁটাও।

আমিও ঠিক তাই চাই। দাসী এরিনা সকৃতজ্ঞ অশ্রুবর্ষণ করল। কাজের মানুষের মুরোদ আমাকে প্রতি তিন বছরে দুবার করে যমের দক্ষিণদুয়োর দেখিয়ে ছাড়ে।

ঈশ্বরের শিশু এরিনা এবার তুমি বিশ্রাম পাবে। তোমার প্রার্থনা গানের মতো লঘু হোক। আমেন।

আর তাই ঠিক হলো। আলফ্রেড এল। ক্ষীণকায়, ভঙ্গুর-শরীর এক যুবা। তার ফ্যাকাশে-নীল ঘাড়ের কাছে দুটি পাখা ফরফর করছে। গোলাপী জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা থেকে। যেন স্বর্গের দুটি পায়রা খেলা করছে। এরিনা তার দুই স্থূল বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। মেয়েমানুষের অন্তরের কোমলতা তার চোখ দিয়ে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ল।

আলফ্রেড, আমার আত্মা, আমার সান্ত্বনা, আমার বর ··

বিদায় নেবার সময় প্রভু এরিনাকে পই পই করে বলে দিলেন, প্রতিরাত্রে শুতে যাবার আগে দেবদূতের পাখা দুটো যেন খুলে রাখা হয়। দরজার মতো কব্জা দিয়ে আঁটা আছে পাখা দুটো। প্রতি রাত্রে পাখা দুটো খুলে পরিষ্কার চাদরে জড়িয়ে রাখতে হবে। পাখা দুটো অতীব ঠুনকো। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে গিয়ে ভেঙে যেতে পারে। কেননা শিশুদের দীর্ঘশ্বাসে তৈরি পাখা দুটো।

শেষবারের মতো ঈশ্বর তাদের মিলনকে আশীর্বাদ করলেন। বিশপের বাদ্যদল উচ্চগ্রামে গুণকীর্তন করল। কোনো আহার্য পরিবেশিত হয় নি। খুঁদকুড়োও নয়। ওটা স্বর্গের রীতিবিরুদ্ধ। তারপর এরিনা আর আলফ্রেড হাত ধরাধরি করে মেঘদের মই বেয়ে নেমে এল। ওরা এল পেট্রিকায়। কেবল সেরা জিনিসই এখানে পাওয়া যায়। এরিনা তার আলফ্রেডের প্রতি সুবিচার করবে। (আর আলফ্রেড, অনুমতি করেন তো বলি—শুধু তার যে মোজা ছিল না তাই নয়—সে ছিল সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অবস্থায়, অর্থাৎ তার মা তাকে যেভাবে জন্ম দিয়েছিল সেই অবস্থায়) এরিনা তাকে কিনে দিল পেটেন্ট লেদারের জুতো, ডোরাকাটা ট্রাউজার, শিকারের জ্যাকেট, বিজলী-নীল গেঞ্জী।

বাকিটা, সে বলল, বাড়িতেই পাওয়া যাবে…

সেই রাতে এরিনা কাজ থেকে ছুটি নিল। মেয়েগুলো এসে হট্টগোল বাধাল। এরিনা কিন্তু একবার এমন কি বাইরেও এল না। দরজার ওপাশ থেকে বলল: মেয়েগেই নিকানভিচ আমি পা ধুচ্ছি। আর গোলমাল না করে তুমি এখন কেটে পড়ো…

আর একটি কথা না বলে সে চলে গেল। দেবদূতের অপার্থিব ক্ষমতার প্রমাণ মিলল।

সন্ধ্যায় যে ভোজের আয়োজন করল এরিনা তা সওদাগরের যোগ্য। মেয়েটার দেমাক কত! আধ পাঁট ভদকা, মদ, দানিয়ুবের হেরিং আর আলু, সামোভার বোঝাই চা। এই পার্থিব খাদ্য ভোজ্যবস্তু গলধঃকরণ করেই আলফ্রেড গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। চোখের পাতা পড়ার মতো দ্রুতে এরিনা কব্জা থেকে পাখা দুটো খুলে নিয়ে মুড়িয়ে রাখল। তারপর কোলে করে তাকে নিয়ে গেল বিছানায়।

উলিজুলি পাপের বিছানায়, পালকের বালিসে শুয়ে আছে তুষারশুভ্র বিস্ময়; ঐশ্বরিক দ্যুতিতে জ্যোতিষ্মান। রুপোলি জ্যোৎস্না আর গোলাপী আলো ঘরের মধ্যে লুকোচুরি খেলতে লাগল। এরিনা কাঁদছে, উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, গান গাইছে, প্রার্থনা করছে। এরিনা যে সুখ তুমি পেলে তার তুলনা নেই, নারীসমাজে তুমি ধন্য।

ভদকার শেষবিন্দু অবধি তারা পান করেছিল। এইবার তার প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। ঘুমে ঢুলে পড়তেই ছ-মাসের পোয়াতি পেট নিয়ে সে

গড়িয়ে এলো আলফ্রেডের ওপর। দেবদূতের সঙ্গে শোওয়া কী তার পোষায়। পাশে শুয়ে কেউ দেওয়ালে থুতু ফেলবে না, নাক ডাকাবে না—তার মতো নোংরা মেয়েমানুষের কী তা সহ্য হয়। না, তার পেটটাকেও তো গরম করতে হবে—সেরেগার কামনায় স্ফীত পেট। ঘুমের মধ্যে দেবদূতকে সে পিষে ফেলল, উল্লাসের ঘোরে একসপ্তাহের শিশুর মতো তাকে পিষে ফেলল, বিশাল দেহের চাপে তাকে চেপটে দিল। দেবদূতের মৃতাত্মা নির্গত হলো। আর চাদরে মোড়া তার পাখা ছুটো আকাশে অশ্রু বর্ষণ করল।

ভোর হলো। গাছগুলি সব মাথা নিচু করে মাটিতে মিশে গেল। দূরে উত্তরে প্রত্যেকটা ঝাউ গাছ পুরোহিতের রূপ পরিগ্রহ করল। প্রত্যেকটা ঝাউ গাছ নিঃশব্দ প্রার্থনায় হাঁটু মুড়ে বসল।

প্রভুর সিংহাসনের সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটি, প্রশস্ত কাঁধ, শক্তিমতী। তার বিশাল আরক্ত বাহুতে ধরা রয়েছে দেবদূতের তরুণ শবদেহ।

এই দেখুন প্রভু…

কিন্তু যীশুর কোমল হৃদয় এ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। ক্রোধে তিনি অভিসম্পাত দিলেন: পৃথিবীতে যেমন হয়, আজ থেকে তোর তেমনি হবে এরিনা…

সে কি কথা প্রভু, মেয়েটি অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল, আমার দেহটা কী আমি ভারী করে গড়েছি, ভদকা কী আমি চোলাই করেছি, মেয়েমানুষের মন, নির্বোধ আর নিঃসঙ্গ—সে কি আমার সৃষ্টি ?

আমি তোর কথা শুনতে চাই না, প্রভু যীশু রাগতভাবে বললেন, তুই আমার দেবদূতকে পিষে মেরেছিস, নোংরা জানোয়ার কোথাকার…

দুর্গন্ধ বাতাসের ঝাপটা দিয়ে এরিনাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো পৃথিবীতে, সোজা খস্তেরস্কায়া স্ট্রীটে, হোটেল মাদ্রিদ ও লুভরে। এইখানেই এখন থেকে তার দিন কাটবে। আর এখানে আকাশই সীমা। সেরেগা সৈন্যদলে ভর্তি হয়েছে। শেষকটা দিন সে মদ খেয়ে হৈ-হল্লোড় করে কাটাচ্ছে। ঠিকেদার ট্রফিমিচ কোলোম্না থেকে ফিরে এসেছে। মোটা সোটা টুকটুকে গাল এরিনার দিকে তাকিয়ে সে বলল, বা, দিব্যি নেয়াপাতি ভুঁড়িটি…ইত্যাদি।

নেয়াপাতি ভুঁড়ির কথাটা বুড়ো আব্রামিচের কানেও গেল। সেও এসে হাজির হলো। দন্তহীন ফ্যাসফেসে গলায় বলল: দেখো, এরপর আর আমি তোমাকে ধর্মত বিয়ে করতে পারি না। তবে, আর পাঁচজনের মতো শুতে পারি তোমার সঙ্গে…

ঠাণ্ডা মাটি-মায়ের কোলে শোবার বয়েস হয়েছে বুড়োর—এ-সব কথা চিন্তার নয়। কিন্তু সেও এসে পালা করে এদিনার অন্তরে থুতু ছেটাবে। সকলেই যেন শেকলের এক একটা আংটা—যাযাবরের যোগালে, ব্যবসায়ী, বিদেশী। প্রত্যেকেই মজা লুটতে চায়।

আমার গল্পের এইখানেই শেষ।

আঁতুরে যাবার আগে—ইতিমধ্যে তিন মাস পার হয়ে গেছে—এদিনা একদিন পেছন দিককার উঠোনে গিয়ে তার বিশাল পেটটা রেশমী আকাশের দিকে তুলে নির্বোধের মতো বলল: দেখ প্রভু কী বিশাল একখানা পেট। শুঁটির মধ্যেকার কড়াইয়ের মতো ওরা এর ওপর ঠুকতে থাকে। কী এর মানে হয় আমি বুঝি না। বুঝতে চাইও না…

এই কথা যখন যীশুর কানে গেল তিনি চোখের জলে এদিনাকে স্নান করিয়ে দিলেন। ত্রাণকর্তা হাঁটুমুড়ে বসলেন ওর সামনে।

আমাকে ক্ষমা করো অরিদুষ্কা, তোমার পাপী ভগবানকে ক্ষমা করো। এ আমি তোমার কী করেছি?

কিন্তু এদিনা মাথা ঝাঁকতে লাগল। কোনো কথা সে শুনবে না।

তোমার ক্ষমা নেই যীশুখ্রীষ্ট, সে বলতে লাগল, ক্ষমা নেই। কিছুতেই ক্ষমা নেই।

অনুবাদ: প্রদ্যোৎ গুহ

শরশয্যা

মিহির সেন

ঐ টেবিলের ওপর জল ঢাকা থাকল। বালিশের তলায় বেড্ সুইচ্‌টা গুঁজে দিয়েছি। ফ্যানের রেগুলেটার আছে, ইচ্ছে মতো বাড়িয়ে কমিয়ে নিও। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাব, না তুমি শোবার সময় দিয়ে শোবে?

অপলক দৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে তাকিয়েছিলেন স্বস্তি। কৃষ্ণার আতিথ্য শেষ হলে একটু হাসলেন—বেশ পাকা গিন্নী হয়েছিস কিন্তু। বেশ আছিস।

কৃষ্ণা গভীর দৃষ্টিতে স্বস্তিদির চোখের দিকে তাকাল। ঈষৎ অস্বস্তি অনুভব করলেন স্বস্তি। কি দেখছে ও। কি খুঁজছে। সকাল থেকেই মাঝে মাঝে এই সন্ধানী দৃষ্টি তুলে ধরছে ও আমার চোখে। আমার কথা, আমার চলাফেরা নিয়ে তো আমি নিজেকে যথেষ্ট স্পষ্ট করেই ওর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। তাকে সরিয়ে নতুন কোনো আড়াল মুখের আদল খুঁজছে কি আমার চোখের দর্পণে। স্বস্তি নিজের হাসিকে আরো দৃপ্ত করল।

আস্তে চোখ নামিয়ে নিল কৃষ্ণা। গভীর তৃপ্তির সুর টেনে বলল, শুধু সুখটাই দেখছ, জ্বালাটা তো বুঝছ না। বেশ আছ তুমি স্বস্তিদি।

মনে মনে হাসলেন স্বস্তি। শুধু আমরা মেয়েরাই নই, কাঠ পুরুষরাও এসব কথার যথার্থ মানে জানে কৃষ্ণা। এ খেদোক্তি নয়, পোষা বেড়ালের মতো যারা সুখকে শিয়রে রেখে রাত কাটায় তারাই এ জ্বালার কথা এমন তরল সুরে বলতে পারে। সত্যি জ্বালাকে আমরা ছেঁড়া শাড়ির মতো সামলে চলি। এ কথা মেয়েরা সকলেই জানে, তবু যুগ যুগ ধরে বলে। মেয়েরা বড় বোকা কৃষ্ণা।

সকালের মিটিং-এর প্রস্তাবগুলো সামনে টেনে নিয়ে কিছুটা নিরাসক্ত সুরে বললেন স্বস্তি, সেতো সকাল থেকেই দেখছি। যা তো এবার, খেয়ে নে গিয়ে। না কি কর্তাকে ফেলে খাস না।

কৃষ্ণা একটু হেসে বেরিয়ে গেল। সেটা ইঙ্গিতটা মেনে নেবার হাসি, না

মিশ্রিত শব্দটা ভোঁতা বলে অনুকম্পায়, ঠিক বোঝা গেল না। এর চেয়ে যদি-ও মুখে উঠে বলত, এখনও অত কনজারভেটিভ হয়ে উঠিনি, তাহলে মনে মনে খুশী হতেন স্বস্তি।

কৃষ্ণা বেরিয়ে গেলে কাগজগুলো ভালো করে গুছিয়ে নিলেন। সকালের ডেলিগেট মিটিংটা অসমাপ্ত আছে। কাল সকালেও জের চলবে। নিজেকে একটু ভালো করে প্রস্তুত করে নেওয়া দরকার। মফঃস্বল সহর হলেও বেশ কিছু শক্ত ও সচেতন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন এবার। এবারের কনফারেন্স দেখে বেশ খুশি হয়েছেন স্বস্তি। ভবিষ্যতে এদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

পাশের ঘরে বোধহয় ঘুমন্ত মেয়েটাকে ঠিক করে শোয়াচ্ছে কৃষ্ণা। চিরকালীন মায়েদের কপট বিরক্তি প্রকাশ করছে নিজের মনে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে কৃষ্ণার। অবশ্য ছেলেপেলের ঝামেলা এখনও খুব সহ্য করতে পারে বলে মনে হয় না। বড় ছেলেটাকে তো দিদিমার কাছেই রেখে দিয়েছে। মেয়েটা আর একটু বড় হলে হয়তো ঠাকুমার কাছে পাঠাবে। দুই দেবাদেবীর নিরিবিলি সংসারে হাত পা ছড়িয়ে দিন কাটাবে তারপর। আধুনিক মেয়েদের ফ্যাসানের ধাক্কা সামলাতে পারে নি কৃষ্ণাও। সেই কৃষ্ণা। দুঃখ বোধ করেন স্বস্তি।

দূর থেকে একটা ট্রেনের আলতো শব্দ আসছে। জানলার দিকে তাকালেন স্বস্তি। সামনে বিরাট কালো কার্পেট অন্ধকার মাঠ। ওপারের স্টেশনটা শীতে জড়োসড়ো জন্তুর মতো একটুকু হয়ে কুঁকড়ে পড়ে আছে। মিটমিট করছে অসহায় দুচারটে আলো। চুপচাপ অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্বস্তি। অনেকদিন পর নিরিবিলি মুহূর্তে এমন অন্তরঙ্গ একটা রাত দেখছেন। ভালো লাগছে কিনা ঠিক বুঝছেন না, তবে মনটা যেন ভারী লাগছে। নির্জন প্রকৃতি মনগুলোকে পুতুল করে ফেলে। নির্জনতাকে তাই আজকাল এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন স্বস্তি। নির্জনতা মনকে স্মৃতিসঞ্চারী করে। স্মৃতিকেও আজকাল ভীষণ ভয় মনে হয় স্বস্তির। কাজের চেয়েও তার। যে কাজ আজ নারী জীবনের পটভূমি, ভিত্তি, সেই কাজের চেয়েও।

কড়া নাড়ছে কে? সুব্রত এল বোধহয়। হ্যাঁ, কৃষ্ণা উঠে গেল। দরজা খুলল। নিচু গলায় দুজনের দুচারটে কি যেন কথা হলো। অন্যমনস্ক হবার

চেষ্টা করলেন স্বস্তি। স্বামী-স্ত্রীর আড়াল-কথা অনিচ্ছাসত্ত্বে কানে এলেও কেমন যেন সংকোচ বোধ হয়। অস্বস্তি বোধ হয়। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবেন স্বস্তি, কি কথা বলে ওরা। রোজ রোজ দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, রোজের দেখা হওয়া লোকের সঙ্গে কি এত কথা বলে মেয়েরা।

সুব্রত এদিকেই আসছে। সোজা এ ঘরে এল। স্বস্তি কাগজপত্রগুলোর ভেতর ডুবে গেলেন।

হাসল সুব্রত, কাজ করছেন বুঝি? আচ্ছা করুন, ডিস্টার্ব করব না। কোনো অসুবিধে-টিধে হচ্ছে না তো?

পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকালেন স্বস্তি। সুব্রতর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। সাধারণ মেয়েদের মতো ছেলেদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে বিব্রত বোধ করেন না স্বস্তি। এই দৃষ্টি নিষ্পলক রেখে ছেলেদের সমালোচনা করতে হয়। কাজ ভাগ করে দিতে হয়। কড়া হুকুম দিয়ে সে কাজ অনেক সময় করিয়েও নিতে হয়। অথবা দোদুল্যমান কর্মীদের সংশয় থেকে সরিয়ে কঠিন মাটিতে এনে দাঁড় করিয়ে দিতে হয় এই দৃষ্টির ঋজুতায়।

বরং সুব্রতই সামান্য বিব্রত হলো যেন। ঘন ঘন দুবার চোখের পাতা ফেলল। খুশি হলেন স্বস্তি। জানেন, কৃষ্ণা লক্ষ্য করছে এ-দৃষ্টি আর সুব্রতকে। একটু হাসলেন স্বস্তি—অসুবিধে বোধ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই সুবিধে করে উঠতে পারছি না। দুই স্বামী স্ত্রী মিলে সুযোগটা থেকে বঞ্চিত করছেন আপনারা।

সুব্রত মুক্তি পেল। হেসে বলল, কি যে বলেন। আচ্ছা, আপনি কাজ করুন।

খাবার-সময় ঘরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল কৃষ্ণা। সুব্রতর বিব্রত মুখটার কথা মনে করে হাসি পেল স্বস্তির। বোধহয় কিছুটা দুর্বল প্রকৃতির। অথবা আমাদের মতো খদ্দর ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কোনো দুর্বলতা আছে। বিজনেসম্যান যখন তখন থাকতেও পারে। শুদ্ধ ব্যবসা আর আর কমলের।

অথচ কৃষ্ণার মতো মেয়ে এই দুর্বল লোকটার টানেই পথ ছেড়ে ঘরমুখো হলো। মেয়েদের মন বড় জটিল এবং দুর্বল। নিজে মেয়ে বলেই এ দুর্বলতার স্বরূপ জানেন স্বস্তি।

আর একটা ট্রেন আসবে বোধহয়। স্মৃতির অন্ধকার তাঁবু থেকে ক্লান্ত

ঘণ্টার শব্দ গড়িয়ে আসছে। ক্লান্ত কিন্তু স্নিগ্ধ। স্নিগ্ধ এবং ছন্দিত। ছেলেবেলায় এই ঘণ্টার ইশারায় সেই গাড়িটা এসে সামনে দাঁড়াত, যে গাড়িতে চড়ে নাম না জানা অনেক দূরের দেশে চলে যাওয়া যায়। যে ট্রেনটা থামতে জানে না, শুধু চলে। যে ট্রেনে ঘুম ঘুম করুণ মুখের নীরব যাত্রীরা মাঠের জোনাক জ্বলা আকাশের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যায়। অথচ কোথায় জানে না।

শেষ ঘণ্টার শব্দে সচেতন হলেন যতি। ছেলেমানুষের মতো এ সব কি ভাবছি। আমার হয়েছে কি। নাঃ, কৃষ্ণার এখানে এসে না উঠলেই ভালো হতো। সবার সঙ্গে ক্যাম্পে থাকলে অনেক কাজ এগিয়ে থাকত। প্রয়োজন হলে দু একটা ঘরোয়া বৈঠকেরও ব্যবস্থা করা যেত।

কৃষ্ণাদের খাওয়া হয়ে গেল বোধহয়। বাসন তোলার শব্দ হচ্ছে। দুদিন হয় ঝিটা নাকি আসছে না। বেশ মুশ্‌কিলে পড়েছে মনে হয় কৃষ্ণা।

আড়াই জনের সংসারের দায়িত্বে আজ বিব্রত, বিমুখ কৃষ্ণা। অথচ এই কৃষ্ণাই হাসিমুখে একদিন গোটা শহরের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ঘুরত। কি অদ্ভুত পরিশ্রমী ছিল মেয়েটা। কঠিন দায়িত্ববোধ। অথচ উচ্ছল। যতিরই সংগ্রহ ছিল কৃষ্ণা। যতির গর্ব। এ জন্ত অবশ্য কৃষ্ণার বাড়ির ঝামেলা কৃষ্ণার চেয়ে ওঁর কম পোহাতে হতো না। বোধহয় সেই লজ্জাতেই যতির ছায়ার মতো হয়ে উঠল কৃষ্ণা। বয়সের অনেকটা ফারাক ছিল বলেই বোধহয় সহকর্মী কৃষ্ণাকে ছোট বোনের মতো স্নেহ করতেন যতি। বিপদে আপদে, দলের সমালোচনার হাত থেকে, সব সময় আড়াল করে চলতেন।

সেই জন্তই বোধহয় আজ মিটিং-এর পর কৃষ্ণা আচমকা উপস্থিত হয়ে এখানে এসে ওঠার আবদার ধরায় সেটা এড়িয়ে যেতে পারেন নি। পুরনো তিক্ত কিছু স্মৃতি মুহূর্তের জন্ত যে বাধা না দিয়েছিল তা নয়। কিন্তু কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত আপত্তি করতে পারেন নি।

কৃষ্ণাকে আচমকা এখানে দেখে প্রথমে অবশ্য অবাক হয়েছিলেন যতি। বোধহয় বছর দশ-বারো বাদে দেখা। অজস্র মুখের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া মুখ।

তুমি এখানে?

মিষ্টি লাজুক হাসি হাসছিল কৃষ্ণা—বিয়ের পর থেকে তো এখানেই আছি।

বড় বড়ে যাওয়া উত্তপ্ত মিটিং থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা নেত্রী স্বস্তি ততক্ষণে আবার নিজের ভেতর ফিরে গিয়েছেন। দেখে চিনেছেন এবং খুশি হয়েছেন, একদা পরিচিতদের এর চেয়ে আর বেশি কি দিতে পারেন উনি। দেবার সময়ই বা কোথায়।

স্বস্তি চশমাটা খুলে মুছতে মুছতে পাশের স্থানীয় ভলেন্টিয়ার মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, এদের একটু বাড়িটা চিনিয়ে দিয়ে যাও তো, কাল সময় পেলে একবার যাবার চেষ্টা করব তোমার ওখানে।

মুহূর্তে ম্লান হয়েছিল কৃষ্ণা। সেই কিছু খোঁজার দৃষ্টিটা তুলে ধরেছিল স্বস্তির চশমা খোলা চোখের দিকে। তারপর আবদারে আবার সেই বহুদিন আগের কৃষ্ণা হয়ে উঠেছিল ও। স্বস্তির হাত টেনে ধরে চপল স্বরে বলেছিল, আজ তুমি যত বড় নেত্রীই হও না কেন, আমাদের কাছে তুমি সেই স্বস্তিদি-ই। আমি কোনো কথা শুনব না, তোমায় যেতেই হবে। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, অবশ্য তোমার যদি কোনো রাজনৈতিক আপত্তি না থাকে।

আর আপত্তি করতে পারেন নি স্বস্তি। কৃষ্ণার চোখ দেখে করুণা বোধ করেছিলেন বলে? কৃষ্ণা পুরনো, প্রায় নিজেরই ভুলে যাওয়া স্বস্তির হাত ধরে টেনেছিল বলে? নাকি ক্লান্ত নেত্রী একটু একক স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থা মনে মনে কামনা করেছিলেন? ঠিক মনে করতে পারছেন না স্বস্তি, তবে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং ক্যাম্প থেকে এখানেই এসে উঠেছিলেন।

অক্ষরগুলো ঝাপসা ঝাপসা লাগছে। মনকে বোঝালেন স্বস্তি, চোখের জন্যই ঠিক পড়তে পারছি না। চোখটা বড় কষ্ট দিচ্ছে কিছুদিন যাবৎ। শুধু চোখটাই বা কেন, গোটা শরীরটাই। শরীরের আর দোষ কি? ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলে। কিন্তু জানে না, দিনগুলো চল্লিশ ঘণ্টার হলে তবু বরং কিছু সময় পাওয়া যায়।

সিগারেটের গন্ধ আসছে। সুব্রত খাওয়া দাওয়া সেরে সিগারেট খাচ্ছে। নিজের কোনো নেশা নেই। নেশার বিরোধী স্বস্তি। তবু মাঝে মাঝে সিগারেটের গন্ধটা ছেলেদের গায়ে মিশে থেকে ওদের আকর্ষণ, না, আকর্ষণ নয়, ব্যক্তিত্ব বাড়ায় মনে হয়। জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল কৃষ্ণা মশারি টানাচ্ছে। হঠাৎ কি হলো যেন স্বস্তির, কৃষ্ণার এ মুহূর্তের চোখ দুটো বড় দেখতে ইচ্ছে হলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চমকালেন। কটা গোপন

শাড়ুগার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। পড়ার সময় পান নি। উঠে গিয়ে সুটকেস থেকে শাড়ীগুলো বের করে আনলেন স্বস্তি।

কি একটা কথার উপর যেন কৃষ্ণা খিলখিল করে হেসে উঠেই হঠাৎ থেমে গেল। নিশ্চয়ই স্বস্তিদির কথা মনে পড়ায়। রাগ নয়, সস্নেহ অস্বস্তি বোধ করেন স্বস্তি। এখনও ওর ছেলেমানুষী গেলো না। দু ছেলেমেয়ের মা হয়েছে কে বলবে।

বাবা, এতদিন হয়ে গেল। অথচ মনে হয় যেন সেদিন। কৃষ্ণা যখন বিয়ের কথা বলল প্রায় চমকে উঠেছিলেন স্বস্তি। অথচ পরে ভেবে পান নি কেন অত বিচলিত হয়েছিলেন। নিজের অবচেতন স্বার্থর জন্যই কি?

ঠিক ভূমিকম্প না হলেও দলের ভেতর তখন ছোট ছোট কিছু কম্পন ঘটে গেছে। অবিশ্বাস্যভাবে কিছু পুরনো মুখ তাতে ছিটকে গিয়েছে পাশ থেকে। মুখের চেহারা বদলেছে কিছু পরীক্ষিত পুরোধাদের। কিছু নবাগত দলকে পেছনের পর্দা হিসেবে ব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজেছে নির্লজ্জের মতো। এসব দেখে ব্যথিত হয়েছেন স্বস্তি। দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন মাঝে মাঝে। পেছনে হেলাফেলা করে ফেলে আসা জীবনের দিকে সভয়ে তাকিয়ে দেখেছেন, সত্যি সোনা এড়িয়ে এসেছেন, না সত্যি সোনার অন্বেষণেই এগোচ্ছেন। অত্যন্ত গোপনে মাঝে মাঝে ক্লান্ত মনে হয়েছে তখন নিজেকে।

কৃষ্ণার নিঃশব্দ সাহচর্য তখন সাহস জুগিয়েছে স্বস্তিকে। নতুন করে চলার শক্তি জুগিয়েছে। বয়সের ফারাক ভুলে কৃষ্ণার বন্ধু হয়ে উঠেছেন নিজের অজান্তেই।

কৃষ্ণাদের ঘরের জানলা-গলা আলোটা তেরছা হয়ে সামনের প্রাচীরের গায়ে লেপ্টে ছিল। হঠাৎ সেই আলোর ফ্রেমে দুটো মুখোমুখি ছায়া ফুটে উঠল। মনে মনে কেন যেন ভয় পেলেন স্বস্তি। মেয়েরা বিয়ে হলেই বড় বেহায়া হয়ে ওঠে। আলগা হয়ে যায়। আলো আড়াল করে দাঁড়ালে তার ছায়া পড়ে এবং সে ছায়ার প্রদর্শনী নিয়ে সোচ্চার প্রাচীর আরো অনেক জানলা থেকে দেখা যেতে পারে, এ কথাটা মনে থাকা উচিত ছিল কৃষ্ণার। স্বস্তি অস্বস্তি অনুভব করলেন। কেমন নতুন একটা অনুভূতি বুকের উপর চেপে বসছে যেন। আলোটা নিভিয়ে দিলেন স্বস্তি।

কৃষ্ণা বিয়ে করে সুখী হয়েছে এতে তো অসুখী হবার কোনো কারণ নেই স্বস্তির। তবু মনে হয় সকাল থেকে নিজের সুখটা বড় বেশি চোখে আঙুল

দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করছে মেয়েটা। মনে মনে হাসেন স্বস্তি। সেই শেষ কথাগুলো মনে রেখেছে বোধহয়। ওদের ঘর-বন্দী মন বলেই বোধহয় সব বন্দী থাকে ওদের মনে। কিন্তু স্বস্তিদের মন গড়িয়ে চলা পাথর, সেখানে শ্যাওলা জমে না।

হ্যাঁ, বাধা দিয়েছিলেন স্বস্তি। প্রথমে আড়ালে ব্যক্তিগত ভাবে, তারপর দলের তরফ থেকে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ওকে ফেরাবার। রীতিমত বিশ্বাসঘাতকতা মনে হয়েছিল সেদিন ব্যাপারটাকে। সাত পুরুষে রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব নেই, অতি সাধারণ এরকম একটি ছেলেকে নির্বাচন করাতে ওর রুচিকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। নিজেরই পরাজয় মনে হয়েছিল কৃষ্ণার এভাবে সরে যাওয়াতে। নিজেকে দুর্বল মনে হয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য ধৈর্য কৃষ্ণার। মুখ বুজে সব সহ্য করেছে। শুধু একবার মুখ ফুটে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না স্বস্তিদি। বেশ কিছুদিন হয় নিজেকে ভীষণ দুর্বল, ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। বিয়ের প্রশ্ন না এলেও হয়তো আমায় সরে যেতে হতো। তুমি ভুল বুঝো না।

ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন স্বস্তি, তোমাকে ভুলই বুঝেছিলাম। একটা ঠুনকো প্রেমের মোহ এড়াতে পারবে না, এতটা হালকা মনে হয় নি তোমাকে কোনোদিন। সুখের স্বর্ণমারীচের পিছে ছুটছ তুমি, তোমাকে এখন বাধা দেওয়া বৃথা।

চোখ নামিয়ে চলে আসার সময় বলেছিল কৃষ্ণা, যুক্তি দিয়ে সব কিছু বোঝানো যায় না স্বস্তিদি, জীবনে এ-দিন কোনোদিন এলে বুঝতে পারতে।

জানে না কৃষ্ণা পাকধরা চুলেই অম্লান নি স্বস্তি। চোখের স্বপ্ন আড়াল করা চশমার পুরু লেন্সের পর্দা শাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই চোখে ওঠেনি। সামনের বিসদৃশ উঁচু দাঁতদুটো এ্যাবসেস্ও করার সময় তুলে ফেলতে হয়েছিল, তাই বাঁধানো। স্বস্তিও জানেন, কেন ও কখন রিমঝিম বর্ষায় মন খারাপ হয়। প্রতীক্ষিত শিল্পীর জন্ত মন সেতারের বাঁধা তার হয়ে বসে থাকে। নিজের তার নিজের কাছে দুর্বহ মনে হয়।

ওরা আলো নিভিয়ে দিল। প্রাচীরের দিকে আর তাকান নি স্বস্তি। তাই জানেন না, জীবনের সব হরিণই স্বর্ণমারীচ নয়, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্ত ছায়া দুটো আরো ঘনিষ্ঠতায় সম্মিলিত একটি ছায়া হয়ে উঠেছিল কিনা।

জানলা দিয়ে বাইরের ঘুম ঘুম আকাশটা দেখা যাচ্ছে। মফঃস্বল শহর বড় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। স্বস্তির মতো যাদের অনিদ্রা রোগ আছে তাদের তাই স্মৃতি ছাড়া অন্য কোনো উপকরণ থাকে না নিজেকে অন্যমনস্ক রাখার। অথচ নিঝুম নিথুর প্রহরের প্রশ্রয় পাওয়া স্মৃতিরা যে কী ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক তা শুধু স্বস্তিরাই জানেন।

শোভনদাও তো বোধহয় কোনো একটা মফঃস্বল শহরেই অধ্যাপনা করছে। বহুদিন পর শোভনদার কথা মনে পড়ায় একটু অবাক হলেন স্বস্তি। অস্বস্তি বোধ করলেন। অথচ কৃষ্ণাটা কী বোকা! জীবনে এ-দিন কোনো-দিন এলে বুঝতে পারতে—কী অবলীলাক্রমে এত বড় একটা কথা অমন তারিফী চালে বলে গেল সেদিন। সে-দিন যদি জীবনে নাই আসবে তাহলে শোভনের মতো ছেলে কেন কলকাতার কলেজ ছেড়ে নিঃশব্দে মফঃস্বল শহরে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে নেবে। বছর দু-তিন আগে কার কাছে যেন শুনেছিলেন স্বস্তি, শোভন এখনও বিয়ে করেনি। জানে স্বস্তি কোনোদিন করবে না। সেখানেই ওর জয়।

কৃষ্ণারা শুয়ে পড়েছে বোধহয়। মাঝের দরজাটা তো খিল দিয়ে শোয়া হলো না। হাওয়ায় খুলে যাবে না তো আবার? ভীষণ লজ্জা পেতে হবে তাহলে। অথচ খিল দিতে যেতেও লজ্জা লাগছে। খিলের শব্দটা একই রাতের দু-ঘরের পূর্ণতা ও শূন্যতার ফারাকটাকে বড় বেশি সশব্দে ঘোষণা করবে হয়তো। বরং ওরা ঘুমাক, তারপর দিয়ে দেওয়া যাবে।

পাশ ফিরে শুলেন স্বস্তি। বিছানাটা হাত বুলিয়ে দেখলেন। দুটো তোষক দিয়েছে। আতিথ্যের কোনো ত্রুটি রাখেনি কৃষ্ণা। বরং যেন বাড়াবাড়িই করছে। না কি আসল সুখকে মানুষ এভাবে ঘোষণা করেই সুখ পায়?

সকাল থেকেই ওর এই সুখ প্রদর্শনীটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন স্বস্তি। কারণে অকারণে বারে বারে পুরনো দিনের কথা তুলেছেন—তোকে যেদিন প্রথম এ্যারেস্ট করল সেদিনের কথা মনে আছে কৃষ্ণা? আমাদের জেল হয়ে গেল, তোদের কোর্ট থেকেই ছেড়ে দিল। অথবা, সেই মেডিক্যাল কলেজের সামনে গুলির দিনটা মনে আছে তোর? বাবাঃ, কি রকম কানের কাছ দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলাম আমরা। এবং এ রকম আরো অনেক প্রসঙ্গ।

বলেছেন আর তীক্ষ্ণসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখেছেন কৃষ্ণাকে। কিন্তু কৃষ্ণা নির্বিকার। নির্মল তৃপ্ত হাসি নিয়ে ও সাধাসাধি করছে, ঐ সন্দেশটা তুমি কিছুতেই ফেলতে পারবে না স্বস্তিদি। ওকি, সব মাংসটুকু ঢেলে নাও। এত কাজের ভেতরও কর্মচারী না পাঠিয়ে ও নিজে বাজারে গিয়ে বেছে নিয়ে এসেছে।

আরো অনেক গল্প করেছে কৃষ্ণা। সুখের গল্প। আর মাঝে মাঝে সেই কি যেন খোঁজা দৃষ্টি মেলে ধরেছে স্বস্তির চোখে। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে আবার কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, তোমরা বেশ আছ স্বস্তিদি।

ওরা এখনও গল্প করছে। গুনগুন একটা সুরের তরঙ্গ ভেসে আসছে শুধু, কথাগুলো শরীরী হয়ে উঠছে না। এত কি কথা বলে ওরা। ওরা কি ক্লান্ত হয় না? ঘুমিয়ে যায় না। বিয়ের আগেও কি মেয়েরা এত কথা বলে।

আস্তে উঠে ফ্যানটা বন্ধ করে দিলেন স্বস্তি। সারারাত ফ্যানের তলে থাকলে গা ভারী হবে। ইদানিং সামান্য বাতের গোলমাল টের পাচ্ছেন।

জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। করুণ ক্লান্ত তারা ছিটানো আকাশ। আর আকাশ মাটির সীমানার সেই স্বস্তির কালো তাঁবু স্টেশনটা।

গুনগুন কথাগুলো এখনও গানের রেশের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। মাঝে মাঝে কথাগুলো থেমে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন কতগুলো টুকরো শব্দে মিশে যাচ্ছে। এবার অস্বস্তির চেয়েও বেশি রাগ হলো স্বস্তির। এমন বেহায়া কেন মেয়েটা। বয়সের প্রাপ্য সম্মানটুকু যদি নাও দিস, অন্তত অবিবাহিত একজন মহিলা এঘরে শুয়ে আছে সেটাও তো স্মরণ রাখা উচিত। নাকি সেদিনের প্রতিশোধ নেবার জন্যই আজ কোমর বেঁধে লেগেছে মেয়েটা। ওর সারাদিনের কি যেন খুঁজে ফেরা কৌতূহলী দৃষ্টিটার মানে এতক্ষণে পরিষ্কার হয় স্বস্তির কাছে।

কেমন একটা বিকৃত শব্দ করে ঘড়িতে একটা বাজল। ওরা থামল। রাত হয়েছে বলে না ক্লান্ত হয়ে, কে জানে। এতক্ষণে যেন মুক্তি পেলেন স্বস্তি। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে নিলেন গায়ে।

জাগ্রত মনও অনেক সময় অন্যমনস্ক ভাবে। যুক্তিবহ সূত্র ধরে এগোয় না চিন্তা, কিন্তু আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়েই থাকে মনকে। ঘড়িতে দুটো বাজলে

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন স্বস্তি, এতক্ষণ অন্যমনস্কে এলোমেলো কি যেন সব ভাবছিলেন। এত শাসনের বাঁধে রাখা মনও আজ মুহূর্তের দুর্বলতার সুযোগে জীবনে কি পাইনি তার হিসেব মিলাতে বসেছিল। মনকে শাসনের শক্তি কি হারিয়ে ফেলেছেন স্বস্তি? না হলে এত সচেতন হয়েও এ হিসেব, এতদিন পর, আবার নতুন করে মিলাতে বসলেন কেন? ক্লান্ত বলে? হ্যাঁ, ক্লান্ত। এতদিনে নিজের মনের দিকে, দেহের দিকে আবার নতুন করে ফিরে তাকালেন স্বস্তি। ক্লান্ত। অবিশ্রান্ত ছুটে চলায় ক্লান্তি নেমেছে মনে। কিন্তু কোথায় ছুটছেন? কোন লক্ষ্যে? নাকি সার্কাসের বাঘের মতো শুধু চক্রাকারে অন্তহীন পরিধি ধরে ছুটে চলেছেন? পেছন থেকে অদৃশ্য হাতের চাবুকের শব্দ ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এমন করে। চাবুকের মতো তীব্র কিন্তু মিষ্টি শব্দ। জয়ধ্বনির মতো, হাততালির মতো শব্দঝঙ্কার।

ওরা আবার কথা শুরু করেছে। অসহ্য। শব্দ করে মাঝের দরজার খিলটা তুলে দেবেন? দিয়ে লজ্জা দেবেন ওদের? যদি ওপারে স্বামীর পাশে শুয়ে অনুকম্পায় হাসে কৃষ্ণা, খিল দিলেই কি এত সহজে দরজা বন্ধ করা যায় স্বস্তিদি! দরজা যদি খুলেই থাকে, তাকে খুলতে দাও। এখনও সময় আছে, বন্ধ করো না।

অবাক হয়ে নিজের মনের দিকে ফিরে তাকালেন স্বস্তি। আমি কি ঈর্ষা করছি? জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে কৃষ্ণার সুখকে ঈর্ষা করছি?

ওদের গুনগুন আলাপ এবার শব্দের শরীর পেল। চেষ্টা করলে যাকে চেনা যায়, ধরা যায় হয়তো। পাশ ফিরে শুলেন স্বস্তি। অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করলেন। বোধহয় নতুন তোশক। বেশ নরম। কিন্তু এত নরম শয্যাকেও আজ যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে হচ্ছে স্বস্তির।

কথার শরীর আরো স্পষ্ট হলো। ক্রুদ্ধ খাটের উপর উঠে বসলেন স্বস্তি। আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। রীতিমতো অপমানকর এটা। দৃপ্ত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন স্বস্তি।

কিন্তু খিলে হাত দিয়েই থমকে থেমে গেলেন। নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার পাশে।

তাবলে এভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেবে?

কৃষ্ণা স্তিমিত কণ্ঠে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল, তোমার তো কোনো ক্ষতি করিনি।

সুব্রতর স্বরে উম্মা—হ্যাঁ, করেছ। আমি যা নই স্বস্তিদির চোখে সেই পরিচয় তুলে ধরে আমাকে বিব্রত করেছ, অপমান করেছ। কেন তোমার বলতে বাধছিল তোমার স্বামী বিজনেসম্যান, কিন্তু সে শুধু ছোট্ট একটা স্টেশনারী দোকানের দোলতে। কেন বলতে পারলে না ছেলেকে ইচ্ছে মতো মানুষ করার সামর্থ্য নেই বলে দিদিমার কাছে রেখেছ। বাধ্য হয়ে তুমি স্কুলে চাকরি নিয়েছ। তোমার দু-দিন অনুপস্থিত বি কোনো দিনই উপস্থিত থাকে না। নিজের অজান্তে নিজেকেও তুমি কতবড় অপমান করেছ জানো ?

সঙ্গে সঙ্গে একথার কোনো জবাব দিল না কৃষ্ণা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমাদের সব কথা তুমি বুঝবে না। পুরুষ মানুষ বলেই বুঝবে না। স্বস্তিদির কাছে আমার পরাজয়কে তুলে ধরে ওঁর অনুকম্পার পাত্রী হতে চাইনা আমি। নতুন করে পরাজয়কে ডেকে আনতে চাই না। খুব বড় মুখ করে স্বস্তিদির নিষেধ ঠেলে একদিন বেরিয়ে এসেছিলাম।

এ-কথার কোনো জবাব দিল না সুব্রত। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ক্লান্ত সুরে বলল, যাক, এবার ঘুমানো যাক। তুমি ভুল করেছ, নতুন করে আবার সেকথা শুনে রাত জাগার কোনো মানে হয় না।

করুণ কণ্ঠে বলল কৃষ্ণা, ভুল বুঝো না। তোমার ক্ষেত্রে কোনো ভুল করিনি, কিন্তু নিজের সুখটা বেশি বড় করে চেয়েই ভুল করেছিলাম। স্বস্তিদিকে দেখে হিংসে হয়।

সামান্য সময়ের ব্যবধানে সুব্রতর ছোট্ট হাসি শোনা গেল। ছোট ছোট কটি কথা। এবং সন্ধির আরো কটা আনুসঙ্গিক শব্দ। অন্ধকারেই কান দুটো লাল হয়ে উঠল স্বস্তির। এবং নিজের উপর ধিক্কার এল। ছি ছি, এত অসহায় মেয়েটাকে হিংসে করছিলাম।

গানের সুরের মতো আবছা স্বর ভেসে এল কৃষ্ণার, আঃ, কি করছ ? বিছানার চাদরটা চুড়িতে বেজে আরো ছিঁড়ে গেল। কাল একটা বিছানার চাদর এনো। এটা না পাল্টালে আর চলছে না।

অনেকদিন পর আবার নতুন করে সেই পুরনো কৃষ্ণার মুখ ভেসে উঠল স্বস্তির চোখের সামনে। যাকে স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন, শাসন করতেন। তৃপ্তির হাসি নিয়ে দরজার কাছ থেকে সরে এলেন স্বস্তি। বোকা মেয়ে ! ঐ একটা বিছানার চাদর বদলালেই কি শরশয্যা পুষ্পশয্যা হয়ে ওঠে। সেজন্য আরো অনেক কিছু পাল্টাতে হয়। ঘর, দেশ, সমাজ।

খুট্ করে আবার আলোটা জ্বালালেন স্বস্তি। কালকের প্রস্তাবগুলোর উপর কিছুটা প্রস্তুত হয়ে নিতে হয়। মফঃস্বল সহর হলেও কিছু শক্ত আর সচেতন প্রতিনিধি এসেছে এবার কনফারেন্সে।

যাত্রার দিনের কথা

অরুণা হালদার

যাত্রার দিনের কথাই লিখছি : ১৯৬২ সালের ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবারের কথা।

অবশেষে সত্যিই এইরোফ্লোট 054 বিমান ছাড়ল। বেলা তখন দেড়টা, ছাড়বার সময় ছিল আটটা। কখন সেই ভোরে উঠেছি। বান্ধবী রেণু চক্রবর্তী ও তাঁর স্বামী শ্রীনিখিল চক্রবর্তী আমাদের আগেই পালাম বিমানবন্দরে রওনা হলেন—রেণুদি যাবেন কলকাতা; তাঁর প্লেন আরও আগেই ছাড়বে। নিখিলবাবু তাঁকে তুলে দিয়ে আমাদের জন্ত অপেক্ষা করছিলেন। নয়া দিল্লীর পথে তখনো শীতের সকাল প্রায় লেপ মুড়ি দিয়ে আছে। আমরা তার মধ্য দিয়েই পালাম পৌছলাম—একটু বিলম্বই হয়েছে। তখন সাড়ে ছটা। তবে শুনলাম—প্লেন ছাড়তে একটু দেরি হবে, কারণ তাশখন্দের আকাশ তখনো অপ্রসন্ন। আমাদের যাত্রাদেশ নটায়। সোভিয়েত দূতাবাসের প্রতিনিধি ও 'মার্কারি ট্র্যাভ্‌লস্‌'-এর শ্রীযুক্ত হরদেও মুন্দ্র মালপত্র সব ওজন করিয়ে আমাকে শুদ্ধ পাঠিয়ে দিলেন প্রতীক্ষাগারে। আমার আগেই সেখানে অপর যাত্রীরা এসে জড়ো হয়েছেন। ঘরে একটি আসনও খালি নেই—বসবার উপায় দেখলাম না। একটু পরেই শুনলাম—নটায় নয়, দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তাশখন্দের আবহাওয়া এখনো বিরূপ। নিখিলবাবু ও শ্রীযুক্ত মুন্দ্র এবার বাড়ি ফিরে গেলেন। সেই প্রতীক্ষাগৃহে আমার জন্ত রইলেন আমার স্বামী। বিমান বন্দরের আর একটি বাঙালী কর্মচারীও মাঝে মাঝে আসছিলেন। প্রিয়ভাষী যুবক। তাঁর কাজ যাত্রীদের দেখে-শুনে প্লেনে তুলে দেওয়া। এখন যারা রইলাম তারা সবাই যাত্রী—কেবল আমার স্বামী ও মঙ্গোলীয় দূতাবাসের দুটি ভদ্রলোক ছাড়া। তাঁরা যাত্রীদের তুলে দিতে এসেছেন। ঘর লোকে ভরতি—যেমন করে হোক একটু বসবার স্থান সংগ্রহ করতে হলো। যাত্রীরা সকলেই শ্বেতাঙ্গ মনে হয়েছিল। কিন্তু কিছু পরেই দেখলাম আরেকটি ভারতসন্তানও যাত্রী

আছেন। দেখেই বুঝলাম—তিনি তামিল হবার সম্ভাবনা। কিন্তু তা অর্ধসত্য। তিনপুরুষ আগে তাঁর পিতামহ ভারত ত্যাগ করে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন। ব্যবসায়ে অর্থসঞ্চয় করে পিতা বাস স্থাপন করেছেন ব্রিটেনে। যুবকটিরও জন্ম সেখানে। এই প্রথম এসেছিলেন ভারতবর্ষে। হ্যাঁ, তাঁর স্বদেশও; কারণ তিনি তামিল ভাষা জানেন। তবে ভারতে এসেছিলেন বিশেষ করে একটি বিদেশীয় চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে। তাঁরা এখানে গান্ধীজীর শেষজীবনের ছবি তৈরি করছেন। ছবি সম্বন্ধে আমার উৎসাহ বিশেষ নেই, তবে যুবকটিকে মন্দ লাগল না—তিনপুরুষ বিদেশে থেকেও যাঁরা মাতৃভাষা ভোলেন না তাঁদের সম্বন্ধে একবার একটু কৌতূহল বোধ করেছি।

অবশ্য কৌতূহল বোধ করবার মতো আরও অনেক বিষয়ই সেখানে ছিল। আমরা বোধহয় বত্রিশজন যাত্রী। অনেকেই যাচ্ছেন মস্কোতে। কেউ কেউ তাশখন্দে নেমে সেখান থেকে যাবেন হয় আলমা আতা, নয় উলান বাতোর—একটি কাজাকাস্তানের প্রধান শহর, অপরটি বহির্মঙ্গোলিয়ার। আসলে খাঁটি মঙ্গোলীয় যাত্রী ছিলেন একজনই। তিনি নয়াদিল্লীর দূতাবাসে কয়েক বছর কাজ করেছেন, এখন দেশে ফিরছেন। প্রিয়দর্শন যুবক, ইংরেজি জানেন। দেখলাম, তিনি আমার স্বামীর পরিচিত। নবেম্বর মাসের রবীন্দ্রমেলায় তিনিই তাঁর দেশের পক্ষ থেকে সেই উৎসবে অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। আমিও তাঁকে তখন দেখেছি দূর থেকে। এখন পরিচয় হলো, আলাপও হলো। কিন্তু আলাপের মন আমার তখন নেই; কৌতূহলও আমার মনে তখন স্তিমিত। দেখছিলাম—তাঁরা সকলেই বাড়ি ফিরছেন। রুশীয়রা অনেকেই ভিলাই বা অন্য কোনো সোভিয়েত-প্রারব্ধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মোপলক্ষে ভারতবর্ষে ছিলেন। এখন দেশে যাচ্ছেন—পরিবার-পরিজন সঙ্গে। কারও কারও সঙ্গে ছেলেপিলেও। সকলেই হাসি-খুশি। উৎসাহ ও আনন্দ তাঁদের চোখে-মুখে। কথায়ও তাঁরা মুখর—যদিও সে ভাষা আমার অজ্ঞাত। তবু সেই আনন্দোচ্ছ্বাস অনুভব করা যায়। আমার মনটা কেবলই নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছিল—আমি যাচ্ছি দেশ ছেড়ে, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে। কথাটা ভুলে থাকতে আমিও চেষ্টা করছিলাম, আমার স্বামীও তা বুঝেই চাইছিলেন সব বিষয়ে আমার কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে। সত্যিই তো, সহযাত্রীদের সাজ-পোশাক, কথা-বার্তা, রূপ-গুণ যা

দেখছি, তা তো নিতান্ত পরিচিত জিনিস নয়। অনেকেরই গায়ে যা শীতবস্ত্র, তা দেখবার মতো—আরও অনেকের সঙ্গে বা আসনের পাশে তা গুছিয়ে রাখা। ভারতবর্ষ থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন কেউ ফার-এর কোট, অনেকেই জুতো, চামড়ার দামী ব্যাগ, স্যুটকেশ—ওদেশের তুলনায় সস্তা। পরিচ্ছদের পারিপাট্য তবু তাদের কম। কেবল দু-টি তরুণীকে মনে হবে তার ব্যতিক্রম—দু-জনাই সচেতন তাঁরা রূপসী। এবং সত্য কথা বলতে গেলে, সে রূপকে আমারও অবজ্ঞা করবার সাধ্য নেই। একজনকে তো বলতে হয় অসামান্যা সুন্দরী, আরজনও তাঁরই প্রায় সমতুল্যা। কেবল বয়সটা বোধহয় বছর পাঁচ বেশি। কিন্তু রূপের বয়স তাঁরও যায় নি, আর তিনিও তা জানেন। এঁরা কোন্ জাতীয়, কোন্ দেশীয়, কোন্ কুলোদ্ভবা তা আমার জানা নেই। রুশ মেয়ে যাদের দেখেছি তাঁদের এতো সৌন্দর্য দেখি নি—সৌন্দর্য বিষয়ে এই সচেতন চর্চাও তাঁদের মধ্যে ততটা নাকি সুলভ নয়। তন্বী, গৌরী, অপূর্ব নাক চোখ, মুখের শ্রী, দেহের যৌবনলাবণ্য—ইহুদী নয়, কিন্তু জর্জীয় বা আর্মেনীয়ও মনে হয় না কেশদামে। সোনালী চুলের রাশি ছড়িয়ে একজনা একটি সোফায় নিমীলিত-নেত্রী। নিদ্রাতুরা কিনা কে জানে? মাঝে মাঝে কিন্তু চোখ খুলছেন, আর পাশের সঙ্গী যুবকটিকে লীলাভরা সপ্রেম দৃষ্টিতে অভিষিক্ত করতে ভুলে যাচ্ছেন না। এ দৃষ্টিতে ধূর্জটি বেসামাল হবার কথা। তাতে কোনো পুরুষজাতীয় মানুষের পুরুষজাতীয় জীববৎ ওই পদতলে লুটিয়ে পড়া ছাড়া পথ থাকে না। দোষ কি যুবকটির—যখন সে মনে হয় স্বামীও—যদি সোফার পার্শ্ববর্তিনীর জন্য আপনার পৌরুষ-মহিমা ভুলেই থাকে? অপরা সুন্দরী মাঝে মাঝে আসন ছেড়ে উঠছেন—সামনের বারান্দায় গিয়ে বিমান ক্ষেত্রের এদিক-সেদিক দেখছেন। তাঁর দয়িতটিও সঙ্গে সঙ্গে উঠছেন, পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন; আবার রূপসীর পেছনেই ফিরে এসে তাঁর পার্শ্বে আসন গ্রহণ করছেন। অশোভনতা কারও আচরণেই ছিল না। কিন্তু কৌতূহল থাকলে এই জীবন-রঙ্গের ক্ষুদ্র দৃশ্যটি কি উপভোগ করা যেত না! সেই কৌতুকেরই যে আমার অভাব—আমার মনের মধ্যে একটা সত্যই স্পষ্ট—ওরা বাড়ি যাচ্ছে, আমি বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি।

ওদিকে এগারোটা বেজে গেল—বাইরে বিমানক্ষেত্রে দু-একটা বিমান এলো, কলকাতার, বোম্বাই-এর বা অমনি কোথাকার। দু-একটি আবার ছেড়েও

গেল। আমাদের প্রতীক্ষাগৃহের প্রতীক্ষাকাল বেড়েই যাচ্ছে। পালাম বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষ জানালেন—এখান থেকেই আমাদের ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিতে হবে। সেই ভোরে এক পেয়ালা করে চা খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি; জানা ছিল আকাশেই আমাকে প্রাতরাশ করতে হবে। এখন এগারোটায় এখানে এ ব্রেকফাস্টের আহ্বানে আগ্রহ বোধ করলাম আমরা দু-জনাই। আমি ও আমার স্বামী। আমার সঙ্গে তিনিও নগদমূল্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে গিয়ে বসলেন। কিন্তু যে খাদ্য পরিবেশন করা হলো আমার পক্ষে তা অস্পৃশ্য, ওঁর পক্ষে তা অনুপাদেয়। এক পেয়ালা কফি ও দু-চামচ দুগ্ধযোগে যে ভুট্টার চিঁড়ে উদরস্থ করব ঠিক করলাম, তাও খাবার টেবিলে যাবপথে দুবার ফুরিয়ে গেল—ভিনদেশী, ভিনভাষী অতিথিদের তাতে আরও বিপদ। দু-এক চামচ শেষ পর্যন্ত যা পেলাম তা খেয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করতে পারা সম্ভব হতো না। কিন্তু ক্ষুধা থাকলেও আমার খাদ্যগ্রহণ করবার মতো আগ্রহ বেশি ছিল না। সেখানে আমার পরিচয় হলো যাঁদের সঙ্গে তাঁরা কেউ দেখলাম কাজাক নারী পুরুষ, দু-একজন উজবেগও। তাঁরা এসেছিলেন ভারতভ্রমণে, আবার একজন ভাঙা-ইংরেজি জানা অধ্যাপক জাতীয় ভদ্রলোক গিয়েছিলেন আরও পূর্বদেশে, কি কাজে। ভ্রমণকারীরা দেখলাম বেশ উৎসাহী, পারলে আলাপ করেন—কিন্তু কার ভাষা কে বুঝবে?

প্রতীক্ষাগৃহের বাইরের বেঞ্চে গিয়ে বসেছিলাম শীতের রৌদ্রে। আর এক বেঞ্চে সেই প্রণয়মুগ্ধ তরুণ-তরুণী দুটি—এক বেঞ্চে দু-জনায় পাশাপাশি, ঘেঁষাঘেঁষি। এমন পরিস্থিতিতেও আর আমার কৌতূহল নেই। বারোটার পনের মিনিট আগে এমনি সময়ে সংবাদ এলো—দেবতা ভাগ্যবানের প্রতি প্রসন্ন। অতএব, আমারও পালাম বন্দরের পালা হলো শেষ। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অন্যেরা তাঁদের জিনিসপত্র নিয়ে প্লেনের দিকে ছুটলেন, সে বোঝা গুছিয়ে আমিও তাঁদের পিছু নিলুম—পেছনে ফেলে আসতে হলো অপেক্ষমান আমার ঘরদুয়ার, একজোড়া চোখ। অনভ্যস্ত শীতের জুতোয়, শীতের বস্ত্রে সাবধানে পা ফেলে যেতে যেতে একবার পেছনে না ফিরে তবু পারি নি—দেখলাম রেলিং-এর ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন আমার স্বামী—মুখে তখনো হাসি ছিল কিনা কে জানে।

একা। আমি ভারতীয় মেয়ে, প্লেনের গহ্বরে প্রবেশ করছি। সেই

স্বদেশীয় অধিকারিকটি আমাকে ছাড়পত্র দেখানো, টিকেট দেখানো প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করছিলেন, বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। আরও দু-জন ভারতীয় এগিয়ে গেলেন দেখলাম; সকলে তাঁদের সসম্মানে এগিয়ে দিলেন। আগে শুনেছিলাম আমাদের মস্কোর রাজদূতও এই প্লেনে মস্কো ফিরছেন। তিনি সদলে প্রতীক্ষাগারে অপেক্ষা করছিলেন। এখন বুঝলাম—এঁরাই বোধহয় তাঁরা—রাজদূত ও তাঁর সঙ্গী। আর একবার দূরের অপেক্ষমান মুখটির দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম। প্লেনের অভ্যন্তরে ঢুকে নির্দেশমতো আসনে গিয়ে বসলাম—দূরের রেলিং-এর ধারের মুখ দেখা যায়। কিন্তু কি হলো, প্লেন ছাড়ে না কেন? নিয়ম জানি না, ছাড়তে এমনই কি দেরি হয়? পার্শ্ববর্তীরা কি বলছেন, তা বোঝা আমার অসাধ্য। বুঝতে চাইছিও না। জানালা দিয়ে সেই প্রতীক্ষাগৃহের আঙিনার রেলিং-এ অবস্থিত মানুষটিকে আমি দেখছি, তিনিও নিশ্চয় দেখছিলেন, আর কিছুক্ষণ পরে কেউ কাউকে দেখতে পাব না—এমনি চিঠির অক্ষরে ছাড়া। অনেকক্ষণ গেল। প্লেন কিন্তু নড়লও না। পরে শুনেছিলাম—পালাম বন্দরে বেলা একটায় কে একজন বিদেশীয় অতিথি আসছেন, তাই বারোটা থেকেই এই বন্দর অন্য বিমানের পক্ষে বন্ধ। সম্ভবত একটায় সেই অতিথি এসেছিলেন, অন্তত দেড়টায় আমাদের বিমান যাত্রাদেশ পেল। তাশখন্দে জলবাড়ে দেরি হলো চার ঘণ্টা, আর দ্বিতীয় অভ্যর্থনার উদ্যোগ পর্বে দেড় ঘণ্টা—সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পরে এ্যারোফ্লোটের 'তু-১০৪' অবশেষে যাত্রা করলে।

জেট প্লেন যাত্রার পূর্বে প্রেতিনীর মতো নাকিস্বরে কান্না জুড়ে দিয়েছে। তা নড়তে চড়তে শুরু করল, তারও পরে তা চলতেও আরম্ভ করল। আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে পোর্টহোলের মধ্য দিয়ে আমার স্বামীকে তখনো দূরে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছিলাম। অত বেলায় মাথায় প্রখর রোদ; শ্রান্ত অভুক্ত অবস্থায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু প্লেন একটু গিয়েই মোড় ঘুরল, তিনিও দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। আরও খানিকটা গিয়ে রৌদ্রভরা বিমানক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে প্লেনখানা বিমানবন্দরের দিকে মুখ ঘোরাল। সেখানে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ সগর্জনে দম নিলে, এবং মিনিট তিন দম নিয়েই রানওয়ে ধরে দিল ছুট। দু-দিকে খোলা-মাঠের খর্বিত গাছপালা ফেলে বুঝলাম মাটি ছেড়ে উঠে গিয়েছি—নিচে তাকাতে না-তাকাতেই প্লেন বিমানবন্দরের বাড়িকে দক্ষিণে অনেক নিচে

রেখে ঝড়ের বেগে উঠে গেল। এক পলকের মধ্যে পালাম এয়ারপোর্টের সকল দৃশুসমেত আমার পরিচিত মুখও অদৃশু হয়ে গেল। নিচে শুধু দিল্লীর উষর ক্ষেত্রের প্রান্তর। অনুভব করলাম তা ছাড়িয়ে আরও উপরে উঠছি—চকিতের মধ্যেই আমার পরিচিত মাটি, পৃথিবী মিলিয়ে গিয়ে থাকবে।

এবার দুই চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল—মানবীয় দুর্বলতা এখন আর কোনো বাধা মানল না। বুঝলাম; শুধু পরিচিত প্রিয়-মুখই নয়, ভারতবর্ষের আলো হাওয়া আকাশও আমার কত প্রিয়। ছোটবেলা থেকে সে-ই তো আমার জ্ঞানের ভূমি, ধ্যানের আকাশ। বাস্তবে কেন, চিন্তায়ও কি আমি তাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছি? ভারতবর্ষ তো শুধু একটা মাটি-জলের বস্তু নয়, সে একটা অনুভূতিও। তার মাটিকে ছাড়তে না-ছাড়তেই সে অনুভূতির প্রতিটি সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে তীব্র বেদনায় অনুরণন উঠল। কিছুক্ষণ পরে,—কতক্ষণ জানি না—একটি স্নেহস্পর্শ অনুভব করলাম স্কন্ধে, আর সহৃদয় কণ্ঠের জিজ্ঞাসা এলো কানে "Why do you cry?" চোখ খুলে দেখলাম বিমান-সেবিকা, এয়ারহোস্টেস্। লজ্জিত হয়ে নিজেকে সংযত করে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। বিদেশিনীর ভাষা আড়ষ্ট, কিন্তু স্পর্শটুকু সহানুভূতিভরা—ভারতের মাটি ছেড়ে অজ্ঞাত পৃথিবীর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। এ পরিচয় সাধন করলেন যিনি তাঁর নামও জানি না, কিন্তু ওই স্পর্শ, ওই স্নিগ্ধ সহৃদয়তাতেই তিনি আমার কাছে এনেছেন নতুন পৃথিবীর পরিচয়।

প্লেন এক-একবার যে অসম্ভব উঁচুতে উঠছে, তা বুঝতে পারছি। মাঝে মাঝে শুধু দেখছি দুই পাশে মেঘ, নিচেও মেঘ—উপরে অনন্ত সূর্য। তীব্র শব্দ প্লেনের অভ্যন্তরে। আমার কান ব্যথা করতে লাগল। মাথা ভারী হয়ে উঠছিল। পূর্বে যে বিমানে চড়েছি সে কলকাতা-গৌহাটিগামী 'ডাকোটা', অনেক তা ছোট—তাতে অসুবিধে বিশেষ বোধ করি নি। জেট-প্লেনের সঙ্গে আমার পচিয় এই প্রথম। প্রেসারাইজড প্লেনের ভেতরটায় আমার কেমন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। শুনেছি সকলের এরূপ হয় না—কিন্তু আমার হলো। কোথায় পৌছেছি জানি না। মাথা হেলিয়ে যা দেখলাম তাতে বুঝলাম হিমালয়ের শৈলমালা। চিরতুষারমৌলি কোন্ নগাধিরাজ আর এমন আপনাকে বিস্তার করে দিতে পারে? কিন্তু এত

দূরে সেই গিরিশৃঙ্গের তুষাররেখা, যে, মনে হলো এই জেট প্লেনের যাত্রীদের চোখে সেই মহিমা হারিয়ে দেখা দিয়েছে পাঠ্যপুস্তকের চুনকাম করা গিরিগোবর্ধন রূপে। মাথায় শাদার ফেনা, না হলে কালো বা রাঙা পাহাড়ের স্তর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে আছে দূর থেকে দূরে। দেখবার মতো জিনিস হিমালয়, আলমোড়ায় আমি তাকে যেরূপে দেখেছি তা যেন অনেক নিকটের। ভাববার মতো জিনিসও হিমালয়—আমাদের চেতনায় শত সাধক-তপস্বীর ধ্যানের আশ্রয়রূপে হিমালয়ের একটা পবিত্র মহান্ রূপ তন্ময় হয়ে আছে। সাধ্য কি হিমালয়কে আমরা একটা পর্বত বলে ভাবি—আল্‌প্‌স বা এ্যাণ্ডিস-এর মতো। সে 'দেবতাত্মা' নগাধিরাজ।

হিমালয় মিলিয়ে গেল—অন্তত চারদিকে মেঘ ঘিরে এসেছে। সেই মেঘের স্তরের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ, অদ্ভুত উজ্জ্বল নীল। যাত্রীরা কেউ পড়ছেন। কেউ পাশের যাত্রীর সঙ্গে গল্প করছেন। আমার পক্ষে দুই-ই অসম্ভব; ভাবনার শক্তিও মনে হচ্ছে শেষ। বর্তমান বাদ দিয়ে আগে পরে চিন্তা করতে পারলাম না। মেঘ যেন আমারই মাথায় চারদিকে ঘনিয়ে আছে।

সামনে খাবার দেওয়া হলো। আহার্য সংরক্ষিত আধারে করে প্লেনে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; এবার হোস্টেস্‌রা তা কতকটা গরম করে, সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করছেন। আসনের সামনে সংলগ্ন করে আঁটা হয়ে গেল খাবার ট্রে—তাই টেব্‌ল। তাতে ছুরি-কাঁটা ছাড়া আছে রুটি, চীজ, বিস্কুট, মটরশুঁটি ও সব্জি। আর পক শুকর-মাংস জড়ানো শশা, আর সব শেষে কিছু ফল। অবশ্য পানীয় আছে লেমন-চা ও মিনারল ওয়াটার। আমার পক্ষে চা রুটি চীজ ও ফলই গ্রাহ্য। মাংস আমি অতি সামান্যই খাই। কিন্তু মাংসের গন্ধ যে এত উৎকট হতে পারে তা আগে কখনো মনে হয় নি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খেতে বসে 'হেম্' চেপ্সে না দেখলেও চোখে দেখেছি—কিন্তু এমন বিরাগ বোধ করি নি। বুঝলাম, মাছমাংস আমার পক্ষে বিদেশে বর্জনীয়। প্লেনেও সামান্যই খেতে পারলাম—খাদ্যে মন নেই বলেই বোধ হয়। প্লেন তখন কোথা দিয়ে যাচ্ছে জানি না—হয়তো আফগানিস্তান-তাজিকস্তান পেরিয়ে, হিন্দুকুশ ছাড়িয়ে যাচ্ছিলাম। প্রখর রৌদ্র-প্রদীপ্ত বালুময়ের পর্বতের স্তরম্বাজি চতুর্দিকে উৎক্ষিপ্ত—তরুলতা-গুল্মের চিহ্নও নেই। অন্তত ক্ষীণ শ্যামলরেখাও চোখে পড়ে না। মেঘচ্ছায়া এখানে সেখানে,

কিংবা মেঘেরই পাহাড়। এমনি অঞ্চল দিয়েই ভারতে আসত শক হুণ দল পাঠান মোগল—কোন্ তাড়নায় আসত তারা? সে সব পথ হয়তো আজও আছে যে পথে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যাতায়াত করতেন—যাঁদের দার্শনিক বিচার আমাকে বিস্মিত করে। কিন্তু এই পৃথিবীর সেই পা-হাঁটা ক্যারাভাঁর পথের মতোই মানুষের মনের পথ, বিচারের রীতিও আজ আকাশের অন্ত দিকে ধাবিত। চার বৎসর পূর্বে আরও নিচু দিয়ে যেতে যেতে প্লেনের যাত্রীদের নাকি অকসিজেনের মুখোশ পরতে হতো। দু চোখ ভরে পৃথিবীর চিরতপস্বিনী রূপ দেখে তাঁরা সম্ভ্রমে বিস্ময়ে বিমূঢ় হতেন। অনেকটাই তা আজ আমার অগোচর রইল। দিনের শ্রান্তিতে, জেট প্লেনের এই যান্ত্রিক পরীক্ষায়, অনভ্যস্ত যন্ত্রনিনাদে আমি অনেকটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। চোখ বুজে আত্মসমর্পণ করলাম ক্লান্তির নিকটে—তন্দ্রা, তুমি আমাকে গ্রহণ করো।

কখন মনে হলো কী একটা অবস্থান্তর ঘটছে। সচকিত হয়ে চোখ খুললাম। বুঝলাম প্লেন নামছে। আস্তে আস্তে মাটি-জলের ছবি-আঁকা পৃথিবীর গালিচা দেখতে পাওয়া গেল নিচে। একটু সরসতাও ফিরে এলো প্রাণে। প্রায় সাড়ে তিনটের পরে প্লেন তাশখন্দ এয়ার পোর্টে ভূমিস্পর্শ করলো। আমরা পৃথিবীর ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর কোলে আশ্রয় পেলাম আবার।

বিস্তীর্ণ বিমানক্ষেত্র তাশখন্দের এয়ারপোর্ট। বিমানের অভ্যন্তর থেকে বেরুতেই বিস্ময় চোখে লাগছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশি লাগল চোখে-মুখে শীতের হাওয়ায় তুষারমাখা প্রথম শীতের সম্ভাষণ। ভারী কোটে দেহ জড়িয়েছিলাম, তবু একটু চমকিত হলাম। ভারতের বাইরে পদার্পণ করলাম, নামলাম সোভিয়েত ভূমিতে। বিমানক্ষেত্র ভেজা কাদায় পিছল, আমার ভারী জুতো-পরা পা সচ্ছন্দে পদক্ষেপ করবে, এমন সাধ্য নেই। সকালে বিষ্টি ছিল, তা দিল্লীতেই শুনেছি। প্রতীক্ষাগৃহ পর্যন্ত যাবার পথের দুপাশে বরফ জমে আছে। গলছে, না গলেছে, বুঝতে পারা গেল না।

এই সোভিয়েত দেশ: অনেকের কাছে স্বর্গের দেশ, অনেকের কাছে পাপের রাজ্য। আমার কাছে কী? পিছল পথের উপর দিয়ে সাবধানে হেঁটে যেতে যেতে মনে হলো পৃথিবীর মাটিতেই তো হাঁটছি, পৃথিবীর আকাশের তলাতেই চলেছি। সব তন্ন হয়তো পৃথিবীর মানুষকেই দেখব। তাকেই দেখেছি আমার স্বদেশে, দেখব এই বিদেশেও। স্বর্গের দেশই হোক, পাপের রাজ্যই হোক, মানুষের দেশই তো হবে।

সহযাত্রী সেই মঙ্গোলীয় যুবাটি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এয়ারপোর্টের প্রতীক্ষাগৃহেই একদিকে কাস্টম্‌স্‌। সেখানে নিয়ে গেলেন, কাগজপত্র পরীক্ষা হবে। তাশখন্দ আমাদের পক্ষে সোভিয়েতের প্রবেশদ্বার। সহযাত্রীই রুশ ভাষায় আমার বক্তব্য অনুবাদ করে দিলেন। এখানকার ভাষা অবশ্য উজবেগী তুর্ক ভাষা—যে ভাষা ছিল বাবরের। এখানকার ফিরঘানা অঞ্চল থেকেই তিনি কাবুল জয় করে দিল্লীতে গিয়ে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। মোগলদের পিতৃভূমি তা হলে এই দেশ, মাতৃভাষাও এই তুর্ক ভাষা, আর শুনেছি মূল 'বাবুরনামা' লেখা হয়েছিল তুর্ক ভাষায়। এখনো তুর্ক-সাহিত্যের তা পরম গৌরব, যেমন উজবেগদের গর্ব 'বাবুর'। এই তুর্ক সাহিত্যের চর্চায় এরা সোভিয়েত আমলে মহোৎসাহী হয়। ইংরেজী অনুবাদে আমি তাদের কবিতাও পড়েছি। দু একটি অনুবাদও করেছিলাম। তবে এখন অন্তত এ গৃহে যাদের তুর্ক বলে মনে হলো, তারা চেহারায় কাশ্মীরী বা পাখ্‌তুনীদের আত্মীয়-কুটুম্ব এবং পাশ্চাত্য জাতিদের থেকে পৃথক। কিন্তু বেশভূষায় অনেকেই পাশ্চাত্যানুবর্তী—আর প্রায় সকলেই রুশ ভাষাও বলতে অভ্যস্ত।

প্রতীক্ষাগৃহে এবার আমাদের রাষ্ট্রদূত মহাশয়কে দেখতে পেলাম। মঙ্গোল সহযাত্রী তাঁকে দিল্লীতেও জানতেন। আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করবার জন্য এগিয়ে গেলাম। মস্কৌ গিয়ে আর সাক্ষাৎ করবার সময় হবে কিনা কে জানে। আমি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে চলেছি। এই কর্মের নিমন্ত্রণ এসেছে আমাদেরই বৈদেশিক বিভাগীয় দপ্তরের মাধ্যমে। রাষ্ট্রদূতই ভারতের বাইরে ভারতবাসীর মুখপাত্র, তাদের অভিভাবক। এর পরে যে-কোনো সমস্যায় আমার স্বদেশীয় রাষ্ট্রদূতই হবেন আমার ভরসাস্থল। নিজেই তাই এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম। মনে ভয় ও সংকোচ না ছিল তা নয়। কিন্তু বিদেশে তাঁর সৌজন্য ও মিষ্ট ব্যবহারে মনে হলো, এই বিশিষ্ট ভদ্র ব্যবহার ও সহৃদয়তা—এ হলো সেই ক্রমচ্যুত বাঙালী সংস্কৃতির মর্মের জিনিস। সম্ভ্রম বোধ করতে হয়, ভারতবাসী হিসাবে আমরাও বোধ করলাম—বাঙালী হিসাবে।

প্রায় এক ঘণ্টা সেই প্রতীক্ষাগৃহে বসে যাত্রীদের দেখছিলাম। আলমা আতার যাত্রীরা এখান থেকেই অন্য প্লেনে যাবেন। আবার প্লেনে ডাক পড়ল। এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট পরে প্লেন আবার ছাড়ল। শীতের বেলা পেরিয়ে যাচ্ছে। এবার মস্কো। দিল্লী থেকে তাশখন্দ ২,২৪২ কিলোমিটার

(১৩৯৩ মাইল), কিন্তু তাশখন্দ থেকে মস্কো আরও দূর, ২২১৮ কিলোমিটার (১৮৬৩ মাইল), চার ঘণ্টা দশ মিনিটের পথ। আমার দেহ ও মন দুই-ই আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল—একটানা প্লেনের আওয়াজ আমার দুঃসহ মনে হয়। বাইরেও অন্ধকার, সন্ধ্যা ও মেঘের যোগাযোগে কিছু দেখবার উপায় নেই। এরই মধ্যে ক্লান্তিতে অবসাদে চোখে ঘুম এসে গিয়েছিল। তা-ই ছিল ভালো। কিন্তু এয়ারহোস্টেস্ এলেন খাবার পরিবেশন করতে। ঘুমের জড়িমা কাটিয়ে ট্রেতে এবার যা দেখলাম তা সম্ভবত গোমাংস। মাংস খাই না বলাতে আমাকে আর একটি প্লেটে তিনি শুধু অন্নও এনে দিলেন। আমাদের মতো খাদ্যাখাদ্য-বিচারীরা তাঁদেরও পরীক্ষায় ফেলেন। কোথায় পাবেন আমাদের উপযোগী খাদ্য? আমায় অবশ্য যা-ই দিলেন কিছুই তখন রুচল না। নেবু-চা, রুটি দু-খণ্ড ও ফল মুখে দিয়ে তাঁদের বিপদ চুকিয়ে দিলাম। ঘুমুবার চেষ্টা করাই আমার পক্ষে নিরাপদ। তা সহজ নয়। প্রায় চোখ লেগে এসেছে—এমন সময় আবার মনে হলো প্লেনের গতিভঙ্গ হয়েছে। অদূর সুদূরের দীপাবলীতে দিগন্তে দেখলাম আলোকের উল্লাস। জেট প্লেন অন্তত আধঘণ্টা আগেই গতিবেগ সংযত করতে করতে অবতরণে উদ্যোগী হয়। চোখের ঘুম পালিয়ে গেল—মস্কো! সুদূর স্টেশনের সংকেত স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। রাত্রির আঁধারে অন্য কিছু দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। প্লেন আবার ভূমি স্পর্শ করে গতিবেগ সম্বরণ করতে করতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে থামল। আঃ মুক্তি! অন্তত সেই শব্দ, সেই শ্বাসরোধী অস্বস্তি তো শেষ হবে। আমার ঘড়িতে তখন সাড়ে ন-টা, মস্কোর ঘড়িতে সাতটা। তাশখন্দে এক ঘণ্টা বিশ্রাম করেছি, ঠিক সাত ঘণ্টা আকাশে কাটিয়ে দিল্লী থেকে আমি মস্কো এসে পৌছলাম সেইদিনই।

অনভ্যস্ত হাতে শীতের কোট প্রভৃতি এঁটে-সেঁটে প্লেন থেকে নামলাম। প্রথমেই দেখা হলো প্লেনের সন্নিকটে আমাদের ভারতীয় দূতাবাসের তৃতীয় সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি এসেছিলেন রাজদূত মহাশয়কে নিয়ে যেতে। কিন্তু পাটনাতে তাঁর স্ত্রী আমাদের সহকর্মিণী ছিলেন; তিনি নিজে সেখানকার ভূতপূর্ব অধ্যাপক হিসাবে আমার পরিচিত। আমার আগমনের তারিখ না জানলেও স্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছেন আমিও শীঘ্রই আসছি। কুশল প্রশ্নাদি হলো। আমার মঙ্গোলীয় সহযাত্রীও এবার বিদায় নিলেন—মঙ্গোলীয় দূতাবাস থেকে তাঁকেও নিয়ে যাবার জন্য কর্মচারী এসেছেন। অপর যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাই এগিয়ে চললাম স্টেশনের

বাড়ির দিকে। শীতের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু বাইরের ঠাণ্ডায় আমার হাত জমে যাচ্ছিল, তাতে আবার মাথা অনাবৃত, তা গরম স্কার্ফ দিয়ে জড়াতে আমার মন সরে নি। পথটুকু দীর্ঘ নয়, কিন্তু একা এই বিদেশে এই বাঙালিনীর পক্ষে অন্তহীন। কে আমাকে নিতে এসেছেন বা মোটেই কেউ এসেছেন কিনা কিছুই জানা নেই। ঘরে প্রবেশ করে হাঁফ ছাড়লাম তবু। একা দাঁড়িয়ে আছি—ঠাণ্ডা কম। আমাদের রাজদূত মহাশয় আমার খোঁজ নিতে ভুললেন না। আশ্বাস দিয়ে জানালেন—কেউ না এসে থাকলে তাঁরাই আমার ব্যবস্থা করবেন। আমি এদেশের মিনিস্ট্রি অব এডুকেশনের নিমন্ত্রিত অতিথি, তাঁকে জানালাম। নিশ্চয়ই সেই শিক্ষাবিভাগের পক্ষ থেকে কেউ আসবেন, আমি প্রায় নিশ্চিত। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারি কি?

ইতিমধ্যে কাঁচের শার্সির বাইরে দুটি পরিচিত হাসিমুখ দেখা গেল। একটি বাঙালী মুখ; আরেকটি মুখশ্রীতে বাঙালী, কিন্তু রঙে বেশভূষায় অবাঙালিনী। শ্রীযুক্ত ননী ভৌমিক আমার বহুপরিচিত। কিন্তু শ্রীমতী এইক্‌গেনিয়া বীকভা তা নন, তিনি আমাদের পরিবারের পরিচিতা। ফটোতে তিনি আমাকে দেখেছেন, আমিও তাঁকে দেখেছি—এর বেশি চাক্ষুষ পরিচয় আমাদের হয় নি। তিনি যখন কলকাতায় এসেছিলেন বাঙলার গবেষণায়, আমি তখন পাটনাতে ছিলাম। আমি যখন সেবার কলকাতা এসেছি, তিনি তখন গিয়েছিলেন পুরী ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে। আমাদের গৃহেও তিনি এসেছিলেন পরে। চোখের দেখা আমাদের হয় নি—কিন্তু পত্রে আলাপ চলেছে, তাঁর সঙ্গে শুধু নয়, তাঁর কিশোরী কন্যাদের সঙ্গেও। আর এইক্‌গেনিয়াকে আমি সেই সূত্রে নাম পর্যন্ত দিয়েছিলাম 'মঞ্জুলা'। আমার স্বামীর পরিচয়ে আমিও তাঁর 'অরুণা বউদি'। এতক্ষণে আমি আশ্বস্ত হলাম। তাঁরাও ভেতরে এসে গেলেন। এইক্‌গেনিয়া সাগ্রহে আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন—রুশ দেশের শীতবস্ত্রের ভারে আলিঙ্গন করতে গিয়ে বোধহয় দু-জনার মধ্যে ফাঁক থেকে গেল এক হাত। হাতই স্পর্শ করতে পারল হাতকে। এই প্রথম তাঁর কণ্ঠস্বর কানে গেল। 'অরুণা বউদি' পত্রের এই সম্বোধনটা স্নেহ কোমল একটা নতুন সত্তা লাভ করল। ওর মুখে বাঙলা কথা আড়ষ্ট নয়, আর বেশ আত্মীয়তা-মাখানো।

আট ঘণ্টা পরে মনটা প্রথম নিশ্চিন্ত হয়েছে। অচিরেই সোভিয়েত দেশীয় শিক্ষা-মন্ত্রী দপ্তরের দু-জন ভদ্রলোকও এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা একজন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী ভাসেন্‌কফ্‌, অপরজন শিক্ষাবিভাগীয়

রাজপুরুষ শ্রীযুক্ত তীমৃথিয়েৰ। অভিবাদনাদির শেষে তাঁরাই আমাকে কাগজপত্র পূরণ করতে সাহায্য করলেন, আমার 'ব্যাগাজ' (মালপত্র) খালাস করবার জন্ত এগিয়ে গেলেন—ঈশ্বরের ইচ্ছায় তা সামান্ত নয়। ব্যবহার্য জিনিস ব্যতীতও ছিল প্রয়োজনীয় বইপত্র—লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগকর্তারা মালের ব্যয় বহন করছেন। দেখা গেল সবই ঠিক এসেছে। এবার আমাদের রাজদূত মহাশয়কে নমস্কার করে বিদায় নিয়ে এলাম। আমার জিনিসপত্র সরকারী শিক্ষা বিভাগের স্থির করা গাড়িতে ওঠানো হয়ে গিয়েছে। আমিও বন্ধুদের সঙ্গে উঠে বসলাম। রাত্রির অন্ধকারেও দেখলাম দুপাশে গাছের গুঁড়ি বরফে সাদা হয়ে আছে—এই রুশদেশের প্রিয় গাছ বার্চ। রাস্তার দুধারেও বরফের স্তূপ—বোধহয় কলে ঘেঁটিয়ে জড়ো করা। আশ্চর্য হয়ে মস্কো মহানগরীর এই নূতন বিচিত্র পথ দেখতে দেখতে দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করছি। কী জিনিস দেখলাম ও কী জিনিস দেখলাম না, তা বলতে পারি না। বুঝলাম শহরের ভেতরে এসেছি, বড় বড় রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে নামলাম এক বড় হোটেলে। এই উক্রেইনা হোটেল। বহিঃপ্রাঙ্গণ থেকে প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে শীত-বাত্যারোধী ভবল-দুয়ার অতিক্রম করে প্রবেশ করলাম তার বহিঃকক্ষে বা ভেস্টিবুল-এ। মনে পড়ল গত ১৯৫৮ সালে যখন শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার স্বামী এদেশে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্ কংগ্রেসে যোগদানের জন্ত আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছিলেন, তখন তাঁরা দু-জনাই এই হোটেলে উঠেছিলেন—পরেও তাঁরা এখানে আবার ছিলেন ১৯৬০এ। সেই ১৯৫৮—এর কথা 'পরিচয়'-এর একটি রসনিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, উক্রেইনা হোটেলের বহিঃকক্ষসম্বন্ধে—বিরাট পৃথিবীর বিচিত্র মানুষের যাওয়া-আসায় তা যেন এখন পৃথিবীর 'মহামানবের সাগরতীর।'

হোটেলের খাতায় নামধাম যা লেখবার তা রুশ রাজপুরুষরা শেষ করলেন। বন্ধুরা আমাকে আমার কক্ষে নিয়ে গেলেন। সাতশো সাতচল্লিশ নং কক্ষ, অর্থাৎ সাত তালার সাতচল্লিশ নং কক্ষ। 'ডিনার' পথেই সমাপ্ত হয়েছে—যা-ই আমি খাই না কেন। খাদ্য আর চাই না, আমার সর্বাধিক প্রয়োজন তখন বিশ্রাম। কক্ষের প্রতিটি কোণ থেকে যেন সেই আহ্বানই শুনছিলাম। বন্ধুরা সকল ব্যবস্থা করে দিয়ে বিদায় নিলেন। শয্যায় নিজেকে সমর্পণ করলাম। কিন্তু ঘুম আসে না। শীতের দীর্ঘরাত্রি এই নিদ্রাহীন চক্ষে দীর্ঘতর হয়ে উঠল। জানালায় ডবল কাঁচ

বদ্ধ, পর্দায় তা অবগুণ্ঠিত। তার মধ্য দিয়েও মস্কো-মহানগরী আমার চোখে পড়তে লাগল। আমি তার অতিথি। মাত্র কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে দেশকালের কোন্ সীমানা পার হয়ে এলাম! সেই সনাতন ভারতবর্ষ থেকে একেবারে এই একালের মস্কোতে। আর এ কি শুধু দেশ থেকে দেশান্তরে যাত্রা! কত বিচিত্র এই মানুষের জীবন—নিজের দিকে চেয়েও যে তার বিস্ময়কে বুঝে উঠতে পারি না। আমি—যে আচারে নিয়মে প্রকৃতিতে বাঙলা দেশের 'কুনো' মেয়ে, ভারতবর্ষের পথে পর্যন্ত বেরিয়ে যে স্বস্তি পায় না—জীবনের এ কি বিচিত্র গতি, তাকেই এনে পৌঁছে দিয়েছে পাহাড় ডিঙিয়ে, মরুভূমি পার করে, এই কোলাহলমুখর প্রচণ্ড যুগের কর্মচঞ্চল কেন্দ্রস্থলী মস্কোতে—সর্বজাতির পদধ্বনির পদাবলীতে মুখরিত মস্কোর এই বত্রিশ তালা উক্রেইনা হোটেলে—নমস্কার, নমস্কার এই জীবনকে—পৃথিবীর সঙ্গে সে আমার পরিচয় সার্থক করে তুলছে। কিন্তু আরও কতবার নমস্কার করব মানুষের মনকে? মানুষের মন যে বিচিত্রতর সে কথা তো কত পড়েছি, শুনেছি, দেখেছিও। কিন্তু বিচিত্রতম এই সত্য—জীবন মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ-বিভেদ রাখতে দেয় না। মস্কো চিনি না—কিন্তু কই, অপরিচিত নয় তো তার মানুষরা। আমার হয়তো মস্কোর শীতের উপযোগী পর্যাপ্ত পরিধান নেই, এই আশঙ্কায় বীকতা আমার জন্য এয়ারস্টেশনে বহন করে এনেছে এক গরম কোট। তার স্নেহ, ভালোবাসা ও সহৃদয়তার তো আর কথা দিয়ে পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। এই তো মস্কোর মেয়ে—যারা নাকি স্বচ্ছন্দগতি, আর আমি বাঙালী মেয়ে—যাদের পা নাকি সঙ্কোচে-দ্বিধায় সদা জড়িত। দুইই তো সত্য। দেশ-কাল-পাত্রের এই ব্যবধানেও তবু তো মানুষের মনের বুদ্ধিতে, মানুষের অন্তরের অনুভূতিতে আমাদের সমধর্মিতাই স্পষ্ট।

কিন্তু মানুষের মন সত্যই বিচিত্র। মস্কো, এই উক্রেইনা হোটেল, সব ছাড়িয়ে আমার মন চলে গেল আমার স্বদেশে—গৃহে—পরিবারে। এই নিঃসীম বিচিত্র রাত্রি জুড়ে—সীমাহীন দেশকালের সমস্ত ব্যবধান অতিক্রম করে, আমার চোখে স্থির হয়ে থাকল আমার মায়ের ব্যথিত করুণ চোখ। মনে জেগে রইল—বিদায় বেলায় আমার স্বামীর প্রসন্ন বিষণ্ণ হাসি—এতক্ষণে পৃথিবী বাঙ্ময় হয়ে উঠল আমার প্রাণে।

বা তা য় ন

সেই ভদ্রমহিলার নাম পার্ল বাক

পার্ল বাক নাম্নী সেই প্রভুতকীর্তি মহিলাটি ভারতে এসেছেন সম্প্রতি। উদ্দেশ্য, তিব্বতী পলাতকদের নিয়ে নতুন একখানা উপন্যাস লিখবেন। লিখিয়ে তিনি, না-লিখে নাকি আর থাকতে পারছেন না। তাই উত্তর-সপ্ততির এই প্রবীণতাকে উপেক্ষা করে সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন ভারতবর্ষে, যেখানে রাজা, যোগী আর বিষধর সর্পের সঙ্গেই এসে পরম আশ্রয় লাভ করেছেন তিব্বত থেকে পলাতক লামা দলাই; খচ্চরের ক্যারাভান বোঝাই করে ভাল ভাল সোনা, মাণিক্য, হীরে-জহরত নিয়ে আসতে অবশ্য যাঁর কোনোই বেগ পেতে হয় নি। শ্রীমতী পার্ল বাক হঠাৎ এমন তিব্বত-দরদী হয়ে উঠলেন কেন এবং কবে থেকে তাঁর এই অনুরাগের প্রসার, এ প্রশ্ন আপনাদের মনে হতে পারে। এর উত্তর খুঁজতে হলে যেতে হবে এই মহিলার খ্যাতির উৎস সন্ধানে। তিনি দীর্ঘকাল চীনে বাস করেছেন। চীনাজীবন নিয়ে বড়ো বড়ো বই লিখে দুনিয়া-জোড়া অনেক হাততালি আর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। 'গুড-আর্থ' উপন্যাসের জন্য নোবেল একাডেমীর শিরোপাও জুটেছে এই ভদ্রমহিলার। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে এই মহিলার বইগুলি পড়লেই দেখা যাবে তাঁর লেখার চীন আর আসল চীনের চেহারার আসমান-জমিন ফারাক। 'ড্রাগনের বীজ' লিখেছেন তিনি এবং এই বীজ কমিউনিজম-বিরোধিতার। তাই চীনের নবজন্ম হবার পর এই চীনগতপ্রাণা মহিলা আর চীনে থাকতে পারলেন না। চলে এলেন তাঁর আসল জায়গায় আমেরিকায়। প্রায় চল্লিশ বছর চীনের জলমাটিতে বাস করে, চীনা জনগণের আতিথেয়তার পুরোপুরি সুযোগ নিয়ে এখন তিনি আবিষ্কার করেছেন যে চীনারা নাকি খুবই আত্মাভিমানী, প্রাক্তন ওয়ার-লর্ডদেরই উত্তরাধিকারী চীনের বর্তমান লোকায়ত্ত সরকারের নেতৃবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে আধুনিক মননের পরিচয় নেই। তার ফলেই দলাই-এর ধর্মান্ধ পুরোহিততন্ত্রকে লাসার পোতালা প্রাসাদ ছেড়ে ভারতের নৈনিতালে এসে লোটা-কমণ্ডলু নিয়ে ভগবান

অর্ধাঙ্গের উপাসনায় দিন কাটাতে হচ্ছে। পার্ল বাকের কণ্ঠস্বরকে কেউ যদি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং এফ. বি. আই-এর হ্যাণ্ড-আউট বলে মনে করেন তাহলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। এবং তিনি পলাতক তিব্বতীদের নিয়ে যে নতুন উপন্যাস লিখবেন তার জন্ম এতদূর কষ্ট করে না এসে আমেরিকায় তাঁর বাড়িতে বসেই লিখতে পারতেন। কারণ, এই উপন্যাসের আসল প্রেরণার উৎস ওয়াশিংটনের সেই বহুখ্যাত ভবন, যার নাম 'হোয়াইট হাউস'। চীনের প্রতি তাঁর দরদের আরেকটি নমুনা তিনি দেখিয়েছেন মার্কিন সরকারের কাছে চীনে খাদ্য বিক্রি করার আবেদন জানিয়ে। চীন নাকি আমেরিকার কাছ থেকে খাদ্যশস্য কিনতে চেয়েছে—নগদ মূল্যে উদ্বৃত্ত খাদ্য। এমন কি স্বাভাবিক মার্কিন ধর্ম অনুযায়ীও এই খাদ্য দেওয়া হবে না। কারণ, চীন কমিউনিস্ট। পার্ল বাক বলেছেন, এই খাদ্য চীনকে দেওয়া হোক দুটি শর্তে। এক, চীন এই খাদ্য অন্য কোনো দেশকে দিতে পারবে না। দুই, চীনের মানুষকে জানাতে হবে এই খাদ্য এসেছে আমেরিকা থেকে। চীনের মানুষ নিশ্চয়ই পার্ল বাকের ওকালতির ওপর ভরসা করে বসে নেই। যেমন থাকে নি কিউবার জনগণ। তবুও, ভারতে আসার আগে এই বিবৃতিটা খুবই জুৎসই হয়েছে, প্রোপাগাণ্ডার দিক থেকে।

হেমিংওয়ের চারটি সম্ভাব্য উপন্যাস

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর বিশ্বসাহিত্যের একটি প্রাণোচ্ছল চরিত্রের অবসান হলো। হেমিংওয়ের বিরোধীরাও হয়তো এই উক্তির সঙ্গে একমত হবেন। হেমিংওয়ে বিপ্লবী ছিলেন না। কিন্তু বৃহৎ, উদ্দাম ও বিশালতায় উদ্দীপ্ত জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। রচনার উপকরণে, তার ব্যঞ্জনায়, বিন্যাসে হেমিংওয়ের কাহিনীর প্রবলতর আকর্ষণ ছিল সম্ভবত এইটিই। হেমিংওয়ে, অনেকের সন্দেহ, স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন। ১৯৬১-র ২রা জুলাই ইডাহোতে নিজের বাড়িতে নিজেরই বন্দুকের উৎক্ষিপ্ত গুলিতে সাহিত্যক্ষেত্রে মাটাডোর, বহুবার মৃত্যু-ফেরত হেমিংওয়েকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। সম্প্রতি হেমিংওয়ের পত্নী তাঁর লিখন-টেবলের কাগজপত্র ঘেঁটে চারটি সম্ভাব্য উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছেন। তার মধ্যে একটি পাণ্ডুলিপি সেই বিখ্যাত সিম্বলিক গল্প 'ওল্ড ম্যান এ্যাণ্ড দি সী'-র সহযাত্রী হবার যোগ্য। অপরটির পশ্চাৎপট ইওরোপের সেই মোহময়ী

নগরী পারী। ইওরোপের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রেখাচিত্র তৃতীয় পাণ্ডুলিপিতে এবং চতুর্থটি আফ্রিকায় জাগরণকে কেন্দ্র করে লেখা। আফ্রিকার প্রতি হেমিংওয়ের রোম্যান্টিক আকর্ষণ ছিল। যখন তখন তিনি ছুটে যেতেন সেই কালো মানুষের দেশে, যাদের হৃদয় হীরকের মতো উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়। হেমিংওয়ের এই সম্ভাব্য উপন্যাসগুলির জন্য পৃথিবীর মানুষের উৎসুক আগ্রহ থাকবে। অন্তত, আফ্রিকাকে তিনি কী চোখে দেখেছেন, আমাদের কৌতূহল তার জন্য।

গ্রীক বীর মানোলিস গ্লেজোস

গ্রীসের মানুষের কাছে একটি প্রিয় নাম, উজ্জ্বল বীরত্বের প্রতীক মানোলিস গ্লেজোস। অকুতোভয় সাংবাদিক, পার্টিজান নেতা, গেরিলাযুদ্ধের নায়ক মানোলিস। 'আভগি' নামে এথেন্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি। মানোলিসই সেই অনন্যসাধারণ দেশপ্রেমিক বীর সাংবাদিক, নাৎসীকবলিত গ্রীসের ভয়ঙ্কর দুর্দিনে ১৯৪১ সালে এথেন্সের ইতিহাস প্রসিদ্ধ এ্যাক্রোপোলিস ভবনের চূড়ায় ওড়ানো নাৎসী স্বস্তিকা পতাকা যিনি নামিয়ে মুক্ত গ্রীসের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়িয়েছিলেন। হিটলারের দল ইতিহাসের ঋণ শোধ করে চলে গেছে। কিন্তু গ্রীসে তাদেরই অনুচররা বীর মানোলিসকে আবার কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। তারা মানোলিসের কলমকে ভয় পায়। আজ দীর্ঘ সাড়ে চার বছর মানোলিস গ্লেজোস গ্রীসের কারমানালিস সরকারের হাতে বন্দী। এথেন্স থেকে দূরে গ্রীসের সমুদ্রে একটি দ্বীপে এই প্রবল শক্তিমান দেশপ্রেমিক সাংবাদিক ও লেখককে বন্দী করে রাখা হয়েছে। বন্দী অবস্থাতেই মানোলিস গ্লেজোস আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংস্থা কর্তৃক শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকতার পুরস্কারে সম্মানিত ও নন্দিত হয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত মানোলিসের মুক্তি লাভ ঘটেনি। গ্রীস সরকার তাঁকে কয়েকবার প্রাণদণ্ড দেবার ষড়যন্ত্র করে বিশ্বজনমতের ভয়ে পিছিয়ে গেছেন। কিন্তু কারান্তরালে অসুস্থ এই বিপ্লবী যোদ্ধাকে বাঁচাবার জন্য পৃথিবীর গণতন্ত্রকামী মানুষ কী করবে সেটাই আজ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। মানোলিসের মুক্তির দাবি, শান্তিকামী মানুষের একান্ত কাম্য। গ্রীসের গৌরব মানোলিস দীর্ঘজীবী হোন।

পুশকিনের ১২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

আলেকজাণ্ডার পুশকিন এক আশ্চর্য কবি। পুশকিনের মৃত্যুর পর একজন রুশ সমালোচক বলেছিলেন: "পুশকিন আমাদের সব।" আমরা একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই এভাবে চিন্তা করতে শিখেছি। রাশিয়ার মানুষের কাছে পুশকিন, বাংলার রবীন্দ্রনাথের মতো। শেক্স্‌পীয়র, মাইকেল এঞ্জেলো কিংবা বীঠোভেনকে পশ্চিম ইওরোপ যে আসন দিয়েছে, সে আসনে পুশকিনও তাঁদের সঙ্গে বসবার যোগ্য। পুশকিন রাশিয়ার আত্মার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার সার্গেইভিচ পুশকিনের জন্ম ৬ই জুন, ১৭৯৯ সালে। মস্কো শহরে। পিতার দিক থেকে তিনি এক অভিজাত অথচ উড়ন-চণ্ডী বংশের উত্তরাধিকারী। তাঁর সমসাময়িকরা পুশকিনকে বলতেন 'রাশিয়ার বায়রন'। রুশভাষার শ্রেষ্ঠতম রচনার গৌরব এই কবির। কবিতায়, নাটকে, গল্পে সর্বত্রই এক পরমাশ্চর্য দীপ্তি ছড়ালেন তিনি। জীবনে বায়রনের মতোই তিনি ছিলেন উদ্দাম, উচ্ছল। মৃত্যুও তাঁর এক আশ্চর্য কাহিনী। ১৮৩৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি ডি আন্থিস নামে একজন ব্যারনের সঙ্গে ডুয়েল লড়ে সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। দুদিন পর সে আঘাতেই পুশকিনের মৃত্যু হয়। এ-বছর রাশিয়া ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুশকিনের ১২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। পুশকিনের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর কবিতার পংক্তিই বারবার মনে হয়েছে :

> "My spring is past, my summer over,
> And dead the fires of other days.
> Oh, Eros, God of youth ! Your servant
> Was loyal—that you will avow.
> Could I be born again this moment,
> Ah, with what zest I'd serve you now !"

পুশকিনের বিখ্যাত কাব্যোপন্যাস 'ইউজিন ওনিগিনে'র সমাপ্তিতে তিনি বলেছিলেন :

> "Blessed is he who leaves the glory
> Of life's gay feast ere time is up."

পুশকিন জীবনের উচ্ছলিত পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করেই গিয়েছেন।

নতুন ইওরোপীয় ভাষা

এসপেরেন্টো নয়, নতুন আরেকটি ভাষার জন্ত আবেদন জানিয়েছেন বৃটেনের একজন লেবর এম. পি. আর্থার উডবারণ। ইওরোপীয় খোলা বাজারের ফলে যে বাজারী হট্টগোল শুরু হয়েছে তাতে একটি সামঞ্জস্ত আনবার জন্ত এমন একটি ভাষা দরকার হয়ে পড়েছে যা ইওরোপের সবাই মোটামুটি বুঝতে পারবে। এর জন্ত তিনি প্রস্তাব করেছেন একটি ইওরোপীয় ভাষার একাডেমী স্থাপনের। নতুন শব্দ প্রত্যেক ভাষা থেকে বিশুদ্ধ বানানে ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে গ্রহণ করা হবে। গ্লাসগোতে একটি নতুন 'ভাষা ল্যাবোরেটরি'ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বার্মিংহামের একটি মোটর কারখানা ইওরোপীয় ভাষার ব্যুৎপত্তির জন্ত শ্রমিকদের পুরস্কার দেবার কথাও ঘোষণা করেছে। এতে শ্রমিকরা প্রচুর সাড়া দিয়েছেন। ইওরোপেও আজ শুধু ইংরেজির রাজত্ব নেই। এদেশে ইংরেজির জন্ত যাঁরা আক্ষেপ করছেন তাঁরা এ খবরটি থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে কোনো একটি ভাষাই আজ আর স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবি করতে পারে না। ইওরোপের এই নতুন ভাষার মূল ভিত্তি হবে রোমান্ (লাটিন ভাষাগোষ্ঠী) ও জর্মন ভাষার মিশ্রণ।

অরুণ দেব

রবীন্দ্রনাথের গান

রবীন্দ্রনাথের গানে কথা ও সুরের 'অর্ধনারীশ্বর রূপ'—এ-কথায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগীরা প্রায় সকলেই একমত। বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণে এ-কথাও অনেকটা প্রমাণিত যে তাঁর গানে বৈচিত্র্য অসামান্য—কি সুরের কি ভাবের দিক থেকে। কিন্তু কোনো বৈচিত্র্যেরই সবিশেষ তাৎপর্য থাকে না যদি না তা কোনো নিগূঢ় ঐক্যে অন্বিত হয়। একটু কান পাতলেই বোধহয় শোনা যায় যে রবীন্দ্রনাথের গানে আছে নতুন একটা মেজাজ, নতুন এক সমন্বয়, যাকে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কণ্ঠস্বর। কিন্তু সেটা কী, তাকে কথায় বা গানের পারিভাষিকে সংজ্ঞা দেওয়া যায় কিনা, বিশেষজ্ঞদের কাছে সেটাই আমার প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সূত্রেই আমার দু-একটি কথা নিবেদন করতে চাই।

সঙ্গীত রচনার প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের হাতের কাছে ছিল ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের, বিশেষত ধ্রুপদের, সুবিশাল ঐতিহ্যমণ্ডিত আদর্শ। ঠাকুর-পরিবারের সাঙ্গীতিক পরিবেশে এই আদর্শ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু দেশের অন্তত্রও দেশী রাগরাগিণীর যোগসূত্র কোনোকালে ছিন্ন হয় নি। কবিতার ক্ষেত্রে হয়তো ব্যাপারটা অন্যরকম। কারণ বিদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘটেছে প্রধানত ইংরেজি ভাষার দৌত্যে। ভাষার মারফৎ আমরা পেলুম ইংরেজি কাব্যসাহিত্য। তার ফল আর যাই হোক, আত্মপ্রকাশের দেশজ সাহিত্যিক রীতি বা ক্ল্যাসিক মেজাজের সঙ্গে যে ইংরেজি শিক্ষিতদের বিচ্ছেদ ঘটল, এটা খুব স্পষ্ট। অথচ তাঁরাই হলেন দেশের নেতৃস্থানীয়। এদিকে বিদেশী মেজাজ বা আঙ্গিককে এ-দেশীয় পরিবেশে আয়ত্ত করা সহজ হয় নি। তাই রবীন্দ্রপ্রতিভার অসামান্য প্রাণময়তা সত্ত্বেও তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যপ্রয়াস অনেকখানি অস্পষ্ট ও দ্বিধাগ্রস্ত। এবং এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তৎকালীন সমালোচকদের দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আমার কাছে খুব আকস্মিক মনে হয় না। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভাষার দৌত্য কার্যকর নয় বলেই এবং ইওরোপীয় সঙ্গীতের ইডিয়ম আমাদের কাছে একান্তই দুরধিগম্য বলে, পুরনো দেশী সঙ্গীতের রীতিপদ্ধতি

এদেশের ইন্দবন্দীয়দের মধ্যেও নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বজায় থাকতে পেরেছে। বিদেশী সঙ্গীতের যা কিছু চর্চা তা বিচ্ছিন্ন পরীক্ষার স্তরেই নিবদ্ধ, তার সাফল্য কোনোদিন উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় নি, হয়তো দেবেও না।

গীতিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের যাত্রারম্ভ প্রধানত এদেশে ধ্রুপদী সঙ্গীতের উত্তরসাধকরূপে। সঙ্গীত-সাধনার উত্তর পর্বেও এর গুরুত্ব তাঁর কাছে অসামান্য। ধ্রুপদ গানে তিনি পেলেন "একদিকে তার বিপুলতা, গভীরতা আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা।" ধ্রুপদের সুবিপুল মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাঁর অনুভব এত সহজ ছিল বলেই কেবল আঙ্গিকগত সুসঙ্গতির বোধই নয়, বিষয় ও কলাকৌশলের অভিন্নতা এবং বিষয়গত সুসঙ্গতির বিষয়েও তাঁর প্রতীতি এত দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। সেই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের প্রথম পদক্ষেপেই এমন আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা সঙ্গীত ছাড়া অন্যত্র আর বোধহয় দেখা যায় না এবং ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্যের সাঙ্গীকরণেই এটি সম্ভব হয়েছিল। তাই আঙ্গিকের সঙ্গতি ও ঐক্যকে তিনি সহজেই মেলাতে পারলেন তাঁর গেয় বিষয়বস্তুতে, তাঁর তৎকালীন বিশ্বভাবনায়। অনুভব করলেন যে "আমাদের সঙ্গীত একের গান, একলার গান—কিন্তু তাহা কোণের এক নহে, তাহা বিশ্বব্যাপী এক।"

গানেই যে তাঁর বিশ্বপরিচয় একথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন। তাঁর গানের কথাতেই পাই, বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন বিমোহিত, গানে গানেই তাদের বন্ধনমুক্তি। বিশ্বকবির চিত্তমাঝে যেখানে ভুবনবীণা নিত্য বেজে চলেছে সেখানে আমাদের জীবন সুরের ধারায় লুটিয়ে পড়ুক। গানের ভিতর দিয়ে যখন কবি ভুবনকে দেখেন তখনই তাকে চেনেন, জানেন। সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে পথ চলতে চলতে কবি যে তুলনাহীনাকে দেখেছেন সেই চিরচেনাকে তিনি চিনতে পারেন গানে, ভরসা রাখেন যে চকিতে ক্ষণে ক্ষণে তাকে ফিরে পাবেন ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে। শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী তাঁর একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে 'গানের গান'গুলির উল্লেখ করেছেন (কচিত উল্লেখের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানসম্বন্ধীয় গানগুলিকে ঐ নামই দিতেন) তাতে দেখি, "যিনি গান শুনছেন, গান শোনাবার তাগিদ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন কবিকে, তিনি স্বয়ং সুরস্রষ্টা। সমস্ত রূপলোকই তাঁর সঙ্গীত, তিনি বেঁধে দিয়েছেন ধ্রুবপদ, সেই বিশ্বতানে জীবনকে মেলাতে হবে।" তখন "পৃথিবীর কবির কণ্ঠে আসলো উত্তর।" গীতময় এই প্রত্যুত্তরে

"মর্ত্য কবির বিশিষ্ট অধিকার।" তখন বিশ্বভুবন-পারাবারে রাগরাগিণীর জাল ফেলে সুরে সুরে সুর মেলাতেই তাঁর বেলা যায় সাঁঝবেলায়। এই বিশ্ব-জোড়া গীতময় ঐক্যোপলব্ধির পেছনে হয়তো ব্রাহ্মসাধনা, মহর্ষিদেব ও উপনিষদের প্রভাব ক্রিয়াশীল, তবু ধ্রুপদী গানের মর্মগত সংহতির আদর্শও যে তাঁকে ঐদিকেই টেনেছে, একথা অনুমান করা খুবই সঙ্গত। আর প্রথম যুগের ধ্রুপদভাঙা ও ধ্রুপদাঙ্গ গানেই যে তাঁর তৎকালীন উপলব্ধির সার্থকতা, অসামান্যতা—একথাও সম্ভবত স্বীকার্য। তাছাড়া 'গানের গানে' সঙ্গীতের রূপক যেভাবে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে তাতেও দেখি ঐ একই কথার প্রমাণ। বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানে ক্ল্যাসিক্যাল আঙ্গিকের যে সঙ্গতি লক্ষণীয় তা ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল চিন্তার ঐক্য ও সংহতির সঙ্গেই নিবিড়রূপে একাত্ম।

বিশেষজ্ঞেরা দেখিয়েছেন যে "গঠন বৈচিত্র্যের বিবেচনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনটি সুস্পষ্ট স্তর বা যুগ প্রবহমান।"[১] প্রথম যুগ ১৯০০ সাল পর্যন্ত, দ্বিতীয় ১৯২০ পর্যন্ত এবং অবশিষ্ট তৃতীয়। এই যুগবিভাগকে খুব কড়াকড়ি ভাবে বিচার করা অনুচিত, তবু টেকনিকের বিবর্তন বুঝতে এটা খুবই উপযোগী। এক একটি যুগ বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত। যথা—

প্রথম যুগে [ক] বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতশিল্পীদের সংস্পর্শে বিশিষ্ট হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য সুর অবলম্বনে সৃষ্ট গান; এবং
[খ] সুর-বিন্যাসের আদর্শের প্রাধান্য।

দ্বিতীয় যুগে [ক] হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কাঠামোটি বজায় রেখে বাহুল্যের বর্জন;
[খ] কাব্য-প্রভাবিত সুরে নিজস্ব রচনা;
[গ] লোকসঙ্গীতের সুরের ব্যাপক ব্যবহার; এবং
[ঘ] নতুন তালের সৃষ্টি।

তৃতীয় যুগে [ক] অন্যান্য সঙ্গীতপদ্ধতির প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত সহজ সুরে দিয়ে তালে প্রকৃত বৈশিষ্ট্যময় রবীন্দ্রসঙ্গীত;
[খ] কথা ও সুরের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম; এবং
[গ] সঙ্গীত ও নৃত্যের সমন্বয়।

১। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা' দ্রষ্টব্য।

হয়তো দেখা যাবে যে এক এক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যেই পরবর্তী যুগের সম্ভাবনার বীজ নিহিত এবং বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এক যুগ অপর যুগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তবু, আঙ্গিকের বিকাশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভাবনাও যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একথার সম্যক ব্যাখ্যা এই যুগবিভাগে অনুপস্থিত। প্রথম যুগের আঙ্গিকগত সঙ্গতিই তাঁর ঐক্যময় বিশ্ববোধের প্রধান উৎস এবং সেই বোধের জীবননিষ্ঠ সততাই তাঁর সাঙ্গীতিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিশে নতুন গান ও মেজাজ রচনায় সক্রিয়। টেকনিকের স্বাভাবিক বিকাশেই জীবনের উপলব্ধি, আবার সেই উপলব্ধি থেকেই টেকনিকের নব নব রূপান্তর ও সমন্বয়—এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটি অন্যান্য মহৎ শিল্পীদের মতো রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট। এখানেও দেখি "ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা"র অনুরূপ প্রক্রিয়া এবং যদিও রবীন্দ্রনাথের মানসসরোবরে আকাশের ছবিই প্রতিফলিত তবু তার উৎস ব্যাপ্ত জীবনেরই সাধারণ্যে।

এই ব্যাপ্ত সাধারণ জীবনের পরিচয় ঘটল কবিজীবনের শিলাইদহ পর্বে। এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-গল্পে-গানে নব জন্মলাভ। শিলাইদহের প্রভাব যে তাঁর জীবনে কত সুদূরপ্রসারী তা রবীন্দ্রজীবনীর আলোচনা মাত্রেই সুস্পষ্ট। এই প্রভাবকে অস্বীকার করলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দ্বিতীয় যুগে উত্তরণের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। এ কেবল আঙ্গিক-ঘটিত পরিবর্তন নয়, সমগ্র জীবন ও জীবনদর্শনের মোড় ফেরা। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে শিলাইদহের প্রভাবের দুটি বিরোধী ধারা বর্তমান। একদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্যময় উদার ব্যাপ্তি যা কলকাতার শহরে পরিবেশে খণ্ডিত ও বিকৃত, অন্যদিকে গ্রাম্য প্রাকৃত জীবনের পুঞ্জীভূত গ্লানি ও বঞ্চনা। 'ছিন্নপত্রাবলী'র পর পর দুটি চিঠিতে (১৫২ ও ১৫৩ নম্বর) দেখি, একদিকে "রামকেলি প্রভৃতি সকাল বেলাকার যে-সমস্ত সুর কলকাতায় নিতান্ত অভ্যস্ত এবং প্রাণহীন বোধ হয়, এখানে তার একটু অভাসমাত্র দিলেই······একটা অপূর্ব সত্য এবং নবীন সৌন্দর্য দেখা দেয়, এই রাগিণীকে সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত পৃথিবীর গান বলে মনে হতে থাকে" এবং "নিতান্ত সাদাসিধা ভৈরবী রাগিণীতে" কবি তখন আবৃত্তি করেন "ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।" আর অন্যদিকে ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন গ্রামের মধ্যে বর্ষার "জল প্রবেশ করে সমস্ত পাতা লতা জঞ্জাল পচতে থাকে, গোয়ালঘর এবং

মানবগৃহের আবর্জনা সমস্ত চারদিকে ভাসতে থাকে,......উলংগ পেট-মোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলো যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে" এবং তখন গ্রামগুলির ঐ "অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার" দেখে "এতো কষ্ট এতো অনারাম মানুষের কী করে সয়" ভেবে পান না কবি। এই অভিজ্ঞতার পর চৈতন্যের নতুন লোকে উত্তরণে আর বিলম্ব থাকে না। সঙ্গীতে নতুন সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণ দেখা দেয়। সৃষ্টি হয় "এক কীর্তনের ধরণের ভৈরবী"—পূর্ব সাধনার সঙ্গে যার যোগ বিচ্ছিন্ন নয় তবু বিশ্বের সঙ্গে তাঁর একটা নতুন "স্বরসম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়।"[২] ওদিকে শতাব্দীর শেষ সূর্য রক্তমেঘ মাঝে অস্ত গেল। পারিবারিক বিচ্ছেদের বেদনার সঙ্গে বিশ্বের বেদনা যুক্ত হয়। বিশ্বসুরের স্রষ্টা যেখানে বিশ্বসাথে যোগে বিহার করছেন সেইখানেই নিজের সঙ্গে তাঁর যোগ আবিষ্কৃত হতে থাকে। এই বিশ প্রথম যুগের গীতময় ঐক্যের বিশ্ব নয়, অনেকটাই প্রাকৃত বিশ্ব, যেখানে ছন্দ বারবার ভেঙে গিয়ে প্রাণে দ্বন্দ্ব জাগায়, অন্তরের তানে আর বাইরের তানে মিল হয় না, ভবনে ভুবনে আধাআধি হয়ে থাকে। বৈচিত্র্যের নতুন উপলব্ধিতে সুরে কথায় আসে নানান বিন্যাস, লোকায়ত জীবন ও সুরের প্রতি জাগে নতুন ঔৎসুক্য, বিশ্ববোধের নতুন ভাঙাগড়ার সঙ্গে আসে গানের ক্ল্যাসিক্যাল কাঠামোয় নতুন ভাঙন ও সমন্বয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল প্রাণময় উত্তেজনায় কবি মরা-গাঙে বানের প্রথম প্রবলোচ্ছ্বাসে "জয় মা" বলে তরী ভাসানোর প্রেরণা পান। আসে বাঙলার মাটি ও জল আর বাঙলার নতুন গান। "নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জল, স্থল, আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন।" জীবন ও প্রকৃতির এই সংলগ্নতার বোধ থেকেই এই যুগে সুরু হয় রবীন্দ্রনাথের অসামান্য ঋতু সঙ্গীতগুলি। এবং যতই দিন যায় ততই বিভিন্ন ঋতুর গানে আনে প্রথাসিদ্ধ রাগরাগিণীর পরিবর্তে নতুন রাগ বা রাগের মিশ্রণ, সুরবিন্যাসের নতুন ব্যঞ্জনা। শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে এই যুগের "প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে" গানটিতে ভীমপলশ্রী ও মূলতানের মিশ্রণে এক উদাস গাম্ভীর্য মিশ্রিত আর্ত আকুতি পরিস্ফুট। "আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়" গানে সোহিনী ও হিন্দোলের মিশ্রণ; "তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে"

গানটির কেদারা সুরের মধ্যে দ্বিতীয় পদে বাউল সুরের উদাস করুণ বিহ্বলতা ; "এবেলা ডাক পড়েছে কোনখানে" গানটির বাউল সুরের হঠাৎ ইমনে পরিবর্তন ; "মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে" এই ইমন সুরের গানে মাবের চরণে কীর্তনের সুরে ছন্দে বিরহ ব্যথার স্বচ্ছন্দ লীলা, ইত্যাদি। সব কিছুতেই নতুন চেতনার প্রতিফলন। এরপর 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য'-একটি একটি পুরনো তার খুলে সেতারখানি নতুন বেঁধে তোলার পালা। অজানার জয় ঘোষণায় দুয়ারটুকু পার হওয়ার সংশয় যায় ঘুচে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের চাবি ভেঙে কবিকে একাকিত্ব থেকে মুক্তি দেবার আকুতিও জেগে ওঠে মনে। নতুন তালের প্রবর্তনেও বোধহয় সেই জীবন ও তাল-লয় পরিবর্তনেরই পদচিহ্ন। কারণ এটাকে নিছক নতুন কিছুর এক্সপেরিমেন্ট ভাবা কষ্টকর, জীবন ও শিল্পের অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদেই তার আবির্ভাব।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, এই দ্বিতীয় স্তরেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের পুরনো ঐক্যোপলব্ধি ভেঙে নতুন বিশিষ্ট রাবীন্দ্রিক মেজাজের সূচনা। যার পূর্ণতর পরিণতি সঙ্গীত জীবনের তৃতীয় পর্বে। দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় পর্বে উত্তরণের কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা অবশ্য নেই। তবু মোটের উপর চিনতে অসুবিধা হয় না। এ যুগে স্বদেশে ও বহির্বিশ্বে নানা সংকট তীব্র হয়ে উঠছে। জাতির মানস প্রায়শই লক্ষ্যভ্রষ্ট। একদিকে জাতীয় আন্দোলনে নানা বিভ্রান্তি, শাঠ্য ও শোষণের সঙ্গে অশেষবিধ বোঝাপড়া, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থে সাধারণের স্বার্থকে বলি দেওয়া, পারস্পরিক দলাদলি, হিংসাদ্বেষ, ভেদবুদ্ধি ও অবিশ্বাস ; অন্যদিকে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যিক লোলুপতার আত্মপ্রকাশে বিশ্বের ভারসাম্যে অস্থিরত্ব ; ঔপনিবেশিক বাজারের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে রেষারেষি ও সংঘর্ষ। এই খণ্ডিত দীর্ণ অস্তিত্বের দারুণ যন্ত্রণায় কবিচিত্তের অসাধারণ প্রশান্তিও বারবার বিচলিত হয়ে উঠেছে, এক পরম মানবিক বেদনায় তাঁর মন হয়েছে উন্মথিত। পরম আগ্রহে প্রকৃতির অন্তর্লীন ঐক্যকে ধরতে গিয়েও বারবার ব্যাহত হচ্ছিলেন তিনি—শিল্পগত ক্ল্যাসিক সংহতির বোধ বারবার খানখান হয়ে যাচ্ছিল। তাই অন্যত্র যে বেদনাকে প্রকাশ করা যায় না তাকেই তিনি রূপ দিতে চাইলেন তাঁর অজস্র অনুপম গানে। এই আশ্চর্য মানবিক বেদনাই এ যুগের গানের বিশিষ্ট মেজাজ এবং গানের কথায় ও আঙ্গিকে তারই সহজ প্রকাশ। এখন আর ক্ল্যাসিক কাঠামোর সংহত গাম্ভীর্য নয়, সে গাম্ভীর্য রক্ষা করা অসম্ভব, এখন কেবল প্রকৃতির মৌল ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিরহী

বেদনা। এই বিরহ বেদনা একান্তই আধুনিক, তাই প্রায়শ দেখা যায় প্রাচীন রাগরাগিণী তার পরিপূর্ণ প্রকাশের অনুপযোগী। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমপরিণতি "হিন্দুস্থানি সুর ভুলতে ভুলতে"। এখনও অবশ্য ঐ আদর্শ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রইল অনেক গানেই, যেহেতু তার প্রভাব সম্পূর্ণ কাটানো যায় না—সে চেষ্টাও অবাস্তর, তবু ঐ সুমহৎ বেদনা প্রকাশের স্বাধীনতায় ওগুলি কেবল উপকরণ হয়েই রইল, পুরো কাঠামোটি রইল না, যেহেতু "ওর আশ্রয় ছাড়তে না পারলে ঘর-জামাই-এর দশা হয়, স্ত্রীকে পেয়েও স্বত্বাধিকারে জোর পৌঁছয় না।" তিনি স্পষ্টই বুঝলেন যে "সকল আর্টেই প্রকাশের উপকরণমাত্রই একদিকে উপায় আর অন্যদিকে বিঘ্ন। এই সব বিঘ্নকে বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে কখনো তার সঙ্গে লড়াই কখনো বা আপোস করতে করতে আর্ট বিশেষভাবে শক্তি, নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য লাভ করে।" সুরের জাতিগত সাধারণতার পরিবর্তে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশের স্বাধীনতাই যখন লক্ষ্য তখন হিন্দুস্থানী রাগের ঠাটগুলিকে ভাঙতেই হলো। শিল্পগত এই অনিবার্যতাতেই কবির নিঃসঙ্গ বেদনার স্বাধীন প্রকাশ। আবার এই খণ্ডিত জীবনের বেদনাদীর্ণ চেতনাতেই ক্রমবিকাশের ধারায় নতুন শিল্পগত সমন্বয়ের আবির্ভাব। এ সমন্বয় যেমন সহজ তেমনি করুণ—সহজের জন্য কঠিন সাধনার চরম ফলশ্রুতি।

বলা বাহুল্য, এখনো রবীন্দ্রপ্রতিভার বহিরঙ্গে অনেক আনন্দ, অনেক কৌতুকের হীরক দীপ্তি, অনেক হাসির ছটা। কিন্তু ভিতরে তার চোখের জল—দুঃখের পারাবারে চোখের জলের জোয়ার। অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে। অন্য সব ঋতুর গান অপেক্ষা বর্ষার গানের সংখ্যাধিক্যও বোধহয় এই কারণেই যে বর্ষা বিরহ, প্রত্যাশা ও ব্যাকুলতারই প্রতীক, আর "তার ভিতরকার নিত্য নতুন অনাদি অনন্ত বিরহবেদনা"ই মুক্তি পায় মল্লার রাগাশ্রিত গানে। তাই ১৯২১ সাল থেকে যে 'বর্ষামঙ্গল'-গীতানুষ্ঠানের সূচনা তার অনুবর্তন চলে বছরের পর বছর—১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। সেই বর্ষার গানে ব্যথা যেন কূল মানে না, বাধা মানে না, হৃদয় ঘুম জানে না, জাগা জানে না। বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে যূথীবনের বেদনা ভেসে আসে। সোনার আলো শ্যামলে মিলায়, শ্বেত উত্তরী কালো হয়ে ওঠে। এমনকি বসন্তের গানেও নতুন বেদনা, কবির হৃদয়দোলায় যে দুলছে সে কেবল সুখের রাশিকেই দুলিয়ে দেয় না, "দুলিয়ে দিল জনম-ভরা ব্যথা অতলা।" এমন

আঁধারের চেতনাও কবির আগে কখনো আসে নি, সঙ্গে সঙ্গে আঁধার পার হওয়ার প্রার্থনা। [যথা : "তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি", "জলে নি আলো অন্ধকারে", "আর রেখো না আঁধারে আমায়", "নিবিড় অমা তিমির হতে", "সখি, আঁধারে একেলা ঘরে", "বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে", "সঘন গহন রাত্রি", "আলোকের পথে প্রভু", ইত্যাদি।

যখন সুখের গ্লানি অসহ হয়ে ওঠে, স্বপ্নের ভারে বোঝা ওঠে জমে, চিরজীবন শূন্য খোঁজা নিরর্থক মনে হয়, তখন রাতের পারের লুকানো আলোকেই দেখতে চান কবি। পরিণত বয়সের রূপদক্ষ কবি গানের এই বেদনার সঙ্গে মেশাতে চাইলেন নৃত্যের ছন্দ, কেবল স্বতন্ত্র কয়েকটি গানের সঙ্গে স্বতন্ত্র কয়েকটি নাচ নয়, গান ও নাচের সম্মিলিত বৈচিত্র্যের নতুন নৃত্যনাট্য। বিশেষ করে শেষ দু-টি নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা' (১৯৩৮)-তে প্রেমের বেদনা ও সংঘাত, প্রচণ্ড টান ও অচরিতার্থতা আমাদের বিহ্বল করে তোলে এবং দীর্ঘ দগ্ধ পথ অতিক্রম করে তবেই পাই ক্ষমার কারুণ্য বা ক্ষমা করতে না পারার ক্ষমা প্রার্থনা। এই প্রশান্তির সাফল্যই স্মরণ করিয়ে দেয় আধুনিক অস্তিত্বের অশান্ত যন্ত্রণাকে। আসন্ন সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ কবি যেন তাঁর সমস্ত প্রত্যাশা ও করুণাকে সংহতরূপে তুলে ধরেছেন এই দুই নৃত্যনাট্যে।

সুরের দিক থেকেও বোধহয় ঐ একই কথা। বেদনার প্রত্যক্ষ কারণটি গানের সুরে অনুপস্থিত; কিন্তু বেদনাটি ধ্রুব এবং সেটা ঠিক জেগে আছেই। বিশেষজ্ঞেরা দেখিয়েছেন যে এককালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে শতাধিক রাগ-রাগিণী ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পরিণত বয়সে সেটা কমতে কমতে পঁচিশ ত্রিশে দাঁড়িয়েছে। একে আকস্মিক মনে করার হেতু নেই; সঙ্গে সঙ্গে এটা বার্ধক্যজনিত অক্ষমতারও প্রমাণ নয়। এর পিছনে আছে জীবনব্যাপী সাধনা ও বিশ্বাসের ভাঙাগড়ার ক্রমপরিণতির ইতিহাস। শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত রাগরাগিণী ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি প্রধানত : ভৈরবী, বেহাগ, কেদার, পূরবী, মল্লার, কানাড়া ইত্যাদি। এগুলি মূলত বেদনারই সুর।

["ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা;" "কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথ বিস্মৃতি;" "পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন;" "মেঘমল্লার যেন অভ্রংলিহগোত্রীর কোন্ আদি নির্ঝরের কলকল্লোল" ইত্যাদি।]

প্রথম জীবনের ভালোলাগার সামগ্রী পরিণত বয়সের ভাবানুষঙ্গে আরো গভীর ও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রয়োগপদ্ধতিও হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র। এখন তাঁর গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রভাব থাকে কেবল দুটি দিক থেকে : এক, নানান গানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রাগরাগিণীর বিচ্ছিন্ন অংশ বা রূপ; আর দুই, ধ্রুপদী শিক্ষার চরম ফল—আত্মদমন, যা "দুর্বল রসমুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ" করে। নানা রাগরাগিণীর বিচ্ছিন্ন অংশের সমন্বয়-সাধন রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি অত্যাশ্চর্য দিক এবং তাতেই সম্ভবত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মেজাজের স্বকীয়তা। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "ওস্তাদমহল সামান্য একটু-আধটু স্বরের পরিবর্তন করে কতো নাম তৈরি করেন এবং নতুন রাগিণী রচনার গৌরবে গর্বিত হন। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সেভাবে বিচার করে যদি ব্যাকরণগত নিয়মে বাঁধা যায় তা হলে অন্তত কুড়ি পঁচিশটি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের রাগিণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু একাজ সুরকার কবির করণীয় ছিল না, একাজ গায়কদের।" যে কোনো কারণেই হোক, একাজ আজও হয় নি। যদি হতো তাহলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মেজাজের অনেক বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়ত।

একদা জীবনের মধ্যাহ্নে জীবন শুকিয়ে যাওয়ার তীব্র যন্ত্রণায় কবি করুণাধারার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এ অভিজ্ঞতা আরো ঘটেছে—তা আরো তীব্র, আরো অকরুণ। কিন্তু করুণাধারা নেমে আসে নি—তার কোনো সন্ধানই তিনি পান নি দেশ বা জাতির জীবনযাত্রায়, সহিংস বা অহিংস আন্দোলনে, অথবা মহৎ কোনো জীবনাদর্শে। গীতসুধা-রসই সেই করুণাধারা। তাই অজস্র গানে গানে ঐ লুপ্ত মাধুরীর সন্ধান। একদা কবির কাছে গানই ছিল পৃথিবীর ও নিজের মাঝখানের সেতু, পরে তাঁকেই গাইতে হলো :

> "তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
> কতো আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।"

মর্মান্তিক এই বিরহের পরেই "মানব-অভ্যুদয়ে"র পদধ্বনি শুনতে পাওয়া সার্থক হয়, কুহেলিকা বিদীর্ণ করে সূর্যসন্নিভ নতুনের প্রকাশ মনে হয় আসন্ন।

অময়কুমার চক্রবর্তী

জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী

নাম দেওয়া হয়েছে 'জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী'। উদ্যোক্তা ললিত কলা আকাদমি। কিন্তু ১৯৫৪ সাল থেকে প্রতি বছরেই আকাদমি-আয়োজিত এই 'জাতীয়' প্রদর্শনী দেখে মোটের ওপর যে-ধারণা দর্শক সাধারণের হচ্ছে, তা একটি খুব সরল প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট: এই সব ছবির মধ্যে জাতীয়ত্বটুকু কোথায়? গুটিকয়েক বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, অধিকাংশ ছবিই মডার্ন পশ্চিমী চিত্রকলার উৎকেন্দ্রিক ফর্ম-সর্বস্বতার অত্যন্ত খেলো অনুকরণ। এই অনুকরণের মনোভাব কোথাও এসেছে মার্কিন-ফরাসী ট্যুরিস্টদের পকেটের দিকে লক্ষ্য রাখার ব্যবসায়িক বক্রদৃষ্টি থেকে; কোথাও বা সেটা এসেছে শুধুই ফ্যাশানদুরস্ত হবার মনোভাব থেকে। যাঁরা এই দুই শ্রেণীর কোনোটিতে পড়েন না, এমন শিল্পী যে নেই তা নয়; কিন্তু এই প্রদর্শনীতে তাঁদের অধিকাংশই উপস্থিত শুধু শিল্পভাষার বৈয়াকরণিক হিসেবে। তাঁদের রচনার পেছনে এমন কোনো ভাব ও আবেগের আন্তরিকতা নেই যার স্পর্শে রচনাটি সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে।

স্থানীয় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্-এর ভবনে সম্প্রতি ললিত কলা আকাদমির উদ্যোগে দশ দিন ধরে যে জাতীয় চিত্র-ভাস্কর্যের বাৎসরিক প্রদর্শনী হয়ে গেল, তাতে যদি সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলার প্রধান প্রবণতাগুলিকে উপস্থিত করা হয়ে থাকে, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে মোটের ওপর ভারতীয় চিত্রকলার বর্তমান অবস্থাটা বিশেষ আশাজনক নয়। মোটের ওপর ইওরোপীয় চিত্রকলার হরেক মডার্নিস্ট ধারার অন্তঃসারশূন্য অনুকরণই চলেছে দেশ জুড়ে—খুব অবিমৃশ্য-দৃষ্টি দর্শকেরও এরকম একটা ধারণা হতে বাধ্য।

আমাদের দেশের এইসব আধুনিক শিল্পীরা কি তাঁদের নিজস্ব জাতীয় শিল্পভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না? এবং তা পাচ্ছেন না বলেই কি এঁরা পশ্চিম-ইওরোপীয় কলাকৈবল্যে এতখানি অভিভূত? অথবা, তাঁদের রচনা শুধুই হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর্টের পেট্রন্দের রুচি অনুযায়ী—বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নিচে না হয়ে, তারই একটি হালফিল রকমফের—ড্রয়িংরুমের নিয়ন আলোর নিচে নাচওয়ালীর অঙ্গভঙ্গী মাত্র? তা নইলে, যাঁরা শক্তিমান শিল্পী এবং

এক সময়ে সত্যিকার শিল্পসৃষ্টিই করেছেন, তাঁরাও এই ফ্যাশানের স্রোতে গা ভাসাচ্ছেন কেন ?

প্রতিবারের মতো এবারেও এই প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবি (চিত্রের সংখ্যা ১৩৬ ; ভাস্কর্য ৩৩টি ; গ্র্যাফিক্স্ ২৩টি ; মোট ১৯২টি দ্রষ্টব্য) দেখে এ সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ মাত্র করবে না যে পৃথিবীর যে কোনো-দেশেই এসব ছবি রচিত হতে পারত। এসব ছবির রচয়িতার ভারতীয় হবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। চিত্রকলার ভাষা সর্বজনীন হলেও, তার কি কোনো জাতীয় চরিত্র নেই ? চারুকলা যদি তার জাতীয় ও আঞ্চলিক ট্র্যাডিশনের মূল উৎস থেকে রস আহরণ না করে, তাহলে তা কখনোই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে পারে না। এই প্রদর্শনী তাই, গুটিকতক ব্যতিক্রম বাদ দিলে, নিতান্তই বিজাতীয়।

আসলে, আমাদের আর্টের ক্ষেত্রে এই-যে আপন-সত্তাহীন কস্মোপোলিট্যানিজম্-এর উৎকট রক-'ন্-রোল চলেছে, একে উৎসাহিত করার পেছনে ললিত কলা আকাদমির কর্তাব্যক্তিদের অবদান বড়ো কম নয়। অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল সম্বন্ধে, স্মৃতিভ্রষ্ট ভারতশিল্পকে নূতন এক মূল্যবোধের ভিত্তিতে যাঁরা স্বপ্রতিষ্ঠ করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে, আমাদের চিত্রকলার নিজস্ব ঐতিহ্যের নবমূল্যায়নের ও নবরূপায়ণের বিষয়ে এই আকাদমির জেনারেল কাউন্সিলের গদিতে আসীন ব্যক্তিদের অনেকেরই অপরিসীম এক উন্নাসিক অবজ্ঞার কথা সুবিদিত। এ ছাড়া আছে আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্ব, প্রাদেশিক সংকীর্ণতা, স্বজনতোষণের মনোভাব—যে কথা 'স্টেট্স্ম্যান'-এর মতো মডার্নিস্টদের পৃষ্ঠপোষক সংবাদপত্রও ইদানিং একটু-আধটু না বলে পারছেন না। এবারকার এই প্রদর্শনীর কথাই ধরা যাক : 'আমন্ত্রিত শিল্পী'দের রচনার মধ্যে আছে প্রবীণ ঠাকুর সিং-এর ('তাজমহলের সামনে রবীন্দ্রনাথ') আর রাওয়ালের ('আর চাঁদ') অত্যন্ত স্থূল হাতের আঁকা খোকামীভরা কল্পনা-প্রসূত ছবি ; কিন্তু নন্দলাল বা দেবীপ্রসাদের ছবি তো নেই-ই, এমন কি যামিনী রায়ও অনুপস্থিত। গোপাল ঘোষের ছবি শুনলাম নির্বাচক কমিটি অমনোনীত করেছেন—ধরে নিতে রাজি আছি যে ছবিটা হয়তো তেমন উৎরোয়নি। কিন্তু সতীশ গুজরালের অত্যন্ত বাজে ছবি-বাদ-দিয়ে মিডিয়ম নিয়ে পরীক্ষামূলক স্টাপ্টকে ('প্রিজনার') অথবা কুলকার্নির আড়ষ্ট ও হাস্যময় রঙ চালনাকে ('সাইলেন্ট কনভারসেশন') অমনোনীত করার দুঃসাহস তাঁদের কোথায় ? আর্টের দেউড়ির দারপালরা যাঁদের প্রণামীতে

তুষ্ট, সরকারী-আধাসরকারী প্রসাদ বিতরণের বহুমুখী উৎসও তাঁদের জন্তে অবারিত।

অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্ আর্ট বলে কথিত কতকগুলি নিতান্ত নির্বোধ রচনাকে শুধু যে আদর করে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে তাই নয়, পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। হিম্মৎ শা-র 'মাই প্রে জিরো' (ক্যানভাসজোড়া হলুদ রঙের ছোপের ওপরে কয়েকটি বৃত্ত ও প্রায়-বৃত্ত), মানসারামের 'মিড্‌নাইট অ্যাফেয়ার' (হালকা সবুজ রঙের ওপরে কয়েকটি এলোমেলো কালো রেখা) কিংবা বালকৃষ্ণ প্যাটেলের 'ইল্যুমিড্‌ ডার্ক্‌নেস্' (ক্যানভাসের ওপরে শুধু বিদ্‌ঘুটে এক চাপড়া কালো আর ঘন নীল রঙ) ইত্যাদি ছবি বিশুদ্ধ ইয়ার্কি ছাড়া আর কিছু নয়। প্রচারের ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে যে সব শিল্পীকে 'নামজাদা' করে তোলা হয়েছে, সেই সব 'আমন্ত্রিত শিল্পী'দের অধিকাংশেরই অত্যন্ত বাজে কতকগুলি তৃতীয় শ্রেণীর কাজকে উপস্থিত করা হয়েছে। হুসেন, চাওড়া, বাওয়েন প্রভৃতি যথারীতি ব্যক্তিগত-প্রতীকবহুল এমন সব অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্ বা আধা-অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্ ছবি দিয়েছেন যা রঙ-রেখা-কম্পোজিশন ও কল্পনা সব দিক থেকেই ফিকে আর ভোঁতা। আরও অনেকের স্থূল অনুকৃতির মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত হনুকৃত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন ম্যসো থেকে পল ক্লী, ব্রাক্‌ থেকে স্ট্যান্‌লি স্পেন্‌সর—এমন কি, স্যালভ্যাডর ডালি থেকে লুইগ্‌নেয়ার্ড্‌ পর্যন্ত অনেকেই!

ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখযোগ্য বেন্দ্রে, পানিকর, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিবাসালু প্রভৃতি কয়েকজন শিল্পীর রচনা। বিশেষত পানিকরের রচনাটিতে ('ম্যান অন দি ক্রস') এবারে এক নতুন পদক্ষেপের লক্ষণ দেখে আমরা আনন্দিত। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ রচনায় উজ্জ্বল রঙের বিরোধ এবং পরিপূরক রঙ বর্জন এবারে আরও আকর্ষণীয় হয়েছে, বস্তুরূপের সংযত বিমূর্তনটুকু এসেছে রচনাটির সামগ্রিক দেশগত পরিবেশের সঙ্গে সুসমন্বিত হয়ে। পানিকরের এই রচনা রামকিঙ্করের রচনার স্মারক—যাঁর একটি সাম্প্রতিক কাজ ('কৃষ্ণজন্ম') এই প্রদর্শনীতে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। শ্রীনিবাসালুর 'মা ও ছেলে' পরম্পরাগত ভারতীয় লিনিয়ারিজম্-এর একটি সার্থক আধুনিক প্রয়োগ। জ্যোতি ভাট-এর স্টেন্‌ড্ গ্লাস ধরনে উজ্জ্বল রঙে আঁকা 'লেডি উইথ এ বার্ড' প্যাটার্ন্‌-প্রধান একটি পরীক্ষা হিসেবে মনোগ্রাহী। কাইকো মোতির জল-রঙে জাপানী ঢঙের ছোপের কাজ 'দুটি প্যাঁচা' সুন্দর—

গগনেন্দ্রনাথের কাক-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। হেব্বারের রচনাটিতে ('এ গড ইন ইয়েলো') তাঁর লোকশিল্পানুপ্রাণিত শিল্পীমনের এবং স্বকীয় ও কিছুটা স্টাইলাইজ্‌ড্‌ রীতির পরিচয় অক্ষুণ্ণ আছে। জৈন-পুঁথিচিত্রণের ও উড়িষ্যার পটচিত্রের রূপরীতিকে কাজে লাগিয়ে তিনটি উপভোগ্য ছবি উপস্থিত করেছেন গৌতম ভাগেলা। তাঁর সুচারু ও সুনির্দিষ্ট রেখার ছন্দ খাঁটি রেশম লিনিয়রিজম্‌-এর সমস্ত গুণগুলিকে আত্মস্থ করেছে এবং সেই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন গভীরতায় ক্রমপ্রসারী রঙ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সমগ্র চিত্রপরিকল্পনায় বেশ একটা গতি সঞ্চারে সক্ষম হয়েছেন। এইরকম পরাম্পরাগত রূপরীতির আধুনিকীকৃত সার্থক প্রয়োগের আরেকটি উদাহরণ ভগবান কাপুরের 'রুটিন'।

ভাস্কর্য বিভাগে প্রবীণ ভাস্করদের কয়েকটি পুরোনো আর পূর্বপ্রদর্শিত কাজ দেখতে পাওয়া গেল। কয়েকটি কাজ যথারীতি জ্যাকব ভবসন আর হেনরি মুরের প্রায় হুবহু নকল। ধনপালের পুরস্কারপ্রাপ্ত 'ক্রাইস্ট অ্যাণ্ড দি ক্রস' রচনাটিতে মডেলিং সুন্দর একটি সমাহৃত রূপ পেয়েছে—যদিও পরিকল্পনার দিক থেকে এটি একটু বেশি পরিমাণে স্থাপত্যধর্মী।

গ্র্যাফিক্‌স্‌ বিভাগটিকে সাধারণ ভাবে ভালো বলা যায়। এই বিভাগে কৃষ্ণ রেড্ডির 'হোয়র্ল্‌পুল' ও 'ওয়টর লিলিজ' রচনা দুটি কারুদক্ষতা ও রূপকল্পনার সমন্বয়ে মস্তবড়ো আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। এই বর্ণশোভাময় এচিং-এনগ্রেভিং দুটিতে ক্যামিও আর ইন্‌ট্যাগ্লিও-র নানান্‌ প্রয়োগ-পদ্ধতির অত্যন্ত কল্পনাময় সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শিল্পী অপূর্ব কারুকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্র মজুমদার

তিনটি বিদেশী ছবি

সম্প্রতি কলকাতায় তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ বিদেশী ছবি প্রদর্শিত হয়েছে যা হচ্ছে। আমেরিকার 'এ্যাপার্টমেন্ট', মেক্সিকোর 'মাকারিও' ও সোভিয়েত রাশিয়ার 'ব্যালাড অফ এ সোলজার'।

প্রথম দুটি ছবি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল। তখন দুটি ছবিরই সব টিকিট শেষ হয়ে গিয়েছিল। অথচ পরে পুনর্মুক্তির সময় দুটিই নীরবে উপেক্ষিত হয়েছে। প্রশ্ন জাগে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবকে কলকাতার জনসাধারণের উৎসাহ কি তবে নেহাতই সাময়িক?

'এ্যাপার্টমেন্ট' বিলি ওয়াইল্ডার পরিচালিত। আমেরিকার এই বিশেষ পরিচালকটি বুদ্ধিদীপ্ত পরিচ্ছন্ন ছবি করেন। তবুও কখনোই তাঁর ছবি ক্লাসিক পর্যায়ে ওঠে না। 'লস্ট উইক এণ্ড' ও 'স্পিরিট অফ সেণ্ট লুই'-এর পরিচালক এবার আমেরিকার বড়সাহেবী জগতের যৌন ব্যভিচারকে বিদ্রূপ করে তুলেছেন এই ছবিটি। এক কেরানী তার ঘরটি রাতের জন্য ধার দিয়ে বড় সাহেবদের সুনজরে আসে ও ক্রমশ পদোন্নতি করে। সারা রাত পার্কে বসে সর্দি লাগা ও পরদিনে গোটাপাঁচেক রুমাল নিয়ে অসংখ্য লোকের সঙ্গে পরের কয়েকদিনের ঘর ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করার দৃশ্যটি সত্যিই সুন্দর। মোটামুটি পরিচালক সাহস ও সহজ-গতির সঙ্গে ছবি তুলেছেন। নায়কের চরিত্রে জ্যাক লেমন একটু অতি-অভিনয় করেছেন। নায়িকা শার্লি ম্যাকলেইন মন্দ নয়। হলিউডের ভালো পরিচালকের কাছেও এর চেয়ে বেশি আশা করা যায় না।

'মাকারিও' আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ চারটি ছবির মধ্যে একটি এ বিষয়ে কারও দ্বিধা থাকা উচিত নয়। ইস্ট জার্মানীর 'প্রফেসর মামলক' (কনরাড উল্ফ—মস্কো: গোল্ড মেডাল), ফরাসীদেশের Le Passage du Rhin (আন্দ্রে কায়াৎ—ভেনিস: গ্র্যাণ্ড প্রাইজ) ও পশ্চিম জার্মানীর Die Brucke (বার্নাড ভিকি)-র সমকক্ষ এই ছবিটি মেক্সিকোর গরীব কাঠুরে মাকারিওর গল্প।

না খেতে পাওয়া এ ছবির সমস্যা, মৃত্যু ও ক্ষুধা নিয়ে এক সত্যনিষ্ঠ রূপকথা এর কাহিনী। এক কাঠুরে মেক্সিকোর মৃত্যু-পরবের দিন স্থির

করে সে খাওয়া ছেড়ে দেবে, যতদিন না একটা পুরো টার্কি সে একা খেতে পায়। কারণ হিসেবে সে জানায়, সে কোনোদিন কিছু পায়নি বা চায়নি আর তাছাড়া তার ছেলেমেয়েদের পেট ভরাতেই তো তার সব শেষ হয়ে যায়। নিজে সে প্রায় অনাহারেই থাকে। তারপর শয়তান, ভগবান ও মৃত্যু তার চুরি করা টার্কির ভাগ চায়। শুরু হয় রূপকথা। মৃত্যু তাকে রোগ সারানোর ক্ষমতা দিয়ে যায়। আর, পরে এক গুহায় নিয়ে যায়—যেখানে অজস্র প্রদীপে মানুষের জীবন। নিজের প্রদীপ তুলে নিয়ে কাঠুরে মাকারিও যখন পালাচ্ছে, সে সময় মৃত্যু তাকে বারবার ফিরে ডাকে। এই ডাকই আস্তে আস্তে মাকারিওর স্ত্রীর ডাক হয়ে যায়। আমরা শুনি মৃত মাকারিওর স্বপ্নময় দেহের পাশে স্ত্রীর শপথ: "আমার ছেলেদের আমি তোমার মতো ভালো করে তুলব। তবে তারা হবে আরো সবল, শক্ত।" রবার্টো গাভাল্ডন্ ছবিটির পরিচালক। মাকারিও চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করেছেন Ignacio Lopez Jarso।

কানে ৬১তে 'লা দোলচে ভিতা'র একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল 'ব্যালাড অফ এ সোলজার'। মিখাইল রম্-এর শিষ্য গ্রিগরী চুখ্‌রাই ('ফরটি ফার্স্ট'-এর পরিচালক)-এর দ্বিতীয় ছবিটি তাঁর কাছে আমাদের অসীম প্রত্যাশা সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারে নি। ছবিটির নায়ক সোভিয়েত সাহিত্যের আদর্শ নায়কদের একজন। ডস্টয়েভস্কির 'ইডিয়ট' বা টলস্টয়ের নিকিতার সমকক্ষ এই বালকটি সত্যিই সোভিয়েত সভ্যতার প্রতীক হতে পারত। পরিচালকের কবিত্বময় হওয়ার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হওয়ায় এটা সম্ভব হয়নি। অথচ এ ধরনের কাহিনীর কবিত্বময় না হলে চলে না। পরিচালক প্রায় দভ্‌চেন্‌কোর অনুকরণে ব্রতী হয়েছেন মনে হয়। প্রথম দৃশ্যে ট্যাঙ্কের বিভীষিকা অবশ্য চমৎকারভাবে পরিস্ফুট। চুখ্‌রাই-এর শেষ ছবি 'ক্লিয়ার স্কাই'। মস্কো ফেস্টিভালে প্রথম পুরস্কার পাওয়া এই ছবিটি তাঁর দ্বিতীয় ছবির মতো নয় আশা করি। অবশ্য বক্তব্যে স্তালিনের সমালোচনা প্রাধান্য পাওয়ায় 'ক্লিয়ার স্কাই' অন্য কারণে বিতর্কের সৃষ্টি করবে।

বিধু দে

পরিকল্পনা ও বিদ্যুৎ

ভোল্টিক সেল আবিষ্কারের ১৬৩ বছর পরে ভারতে বৈদ্যুতিক যুগের সূচনা। গত শতাব্দীর শেষ বছরে কলকাতাতেই সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হলো। কিন্তু উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন সমস্ত অন্ধকার দূর হয় না, শক্তির প্রয়োজন মেটাতে তেমনি আমরা আধুনিক উপকরণের উপর তেমন নির্ভর করতে পারি নি। এই শতাব্দীর প্রথম কয়টি দশকে বিদ্যুৎশক্তির বিস্তার খুবই স্তিমিত। বর্তমানে এক লোহা ও ইস্পাত শিল্পের মাত্র ছ'টি কারখানাতেই যে পরিমাণ বিদ্যুতের ব্যবহার, ১৯২৫ সালে সারা দেশের চাহিদা মিলেও তার বেশি ছিল না। ভারতে বিদ্যুতের যুগ অনেক দ্বিধা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে সূচিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঘটনার টানাপোড়েনে বিদ্যুতের প্রয়োজন অভাবনীয়ভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু এই বিস্তার জাতীয় অর্থনীতির পরিপোষক হয় নি। সামরিক উন্মাদনার ঊর্ধ্বে কোনো বৃহৎ পরিকল্পনার স্তরে তার প্রতিষ্ঠা ছিল না। বিদ্যুতের প্রসার তাই ব্যাহত হলো। যুদ্ধের পরবর্তী ক্ষণে পৃথিবীব্যাপী দারুণ মন্দায় বড়ো বড়ো অনেক শিল্প মূলহীন বনস্পতির মতোই ক্ষয় পেতে থাকে। বিদ্যুতের উৎপাদন হারও তখন কমে যায়। ১৯৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীন, মোট উৎপাদনীক্ষমতা মাত্র ১৩'৬ লক্ষ কিলোওয়াট। হিসাবটা অবশ্য ১৯২৫ সালের চারগুণ। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সাধারণত প্রতি আট থেকে দশ বছরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। সে হিসাবে আমাদের এই অনগ্রসর দেশটিও বিস্তারের হার বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু এহ বাহ্য। এভাবে হিসাব সঠিক দেখায় বটে কিন্তু পাকা হয় না। হিসাবের ফাঁকটা আমরা যেন ফাঁকি না দিই। আসল কথা, ১৯২৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের প্রসার ঘটেছে ৩'৩ থেকে ১৩'৬, বাইশ বছরে মাত্র দশ লক্ষ কিলোওয়াট। স্পষ্টতই, বিদ্যুতের যুগে বাস করেও আমরা তার অপরিমেয় শক্তি কাজে লাগাতে পারি নি।

বিদ্যুৎ বর্তমান শিল্পজগতের মূলকেন্দ্রে গিয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। পরমাণুর পরে তা শক্তির সর্বাধুনিকরূপ, শান্তির কাজে নিয়োজিত হলে পারমাণবিক শক্তিও বিদ্যুৎরূপেই প্রধানত বিলসিত হবে। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও তা সারা পৃথিবীর শক্তির চাহিদা মেটাতে একমাত্র হিসাবে দেখা দেয় নি,—গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে যেমন বিশেষ কোনো থামের যতই গুরুত্ব থাক না একটিতেই সমস্ত প্রয়োজন মেটে না। শক্তির ভিন্নতর রূপে উত্তাপ শিল্প ও যান্ত্রিকতার মধ্যে অন্যতম প্রধান হয়ে কাজ করছে। বিভিন্ন জাতের কয়লা তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে এই তাপশক্তি সংগৃহীত। বিদ্যুৎশক্তির একটি প্রধানভাগও উত্তাপ থেকেই আবর্তিত হয়ে থাকে। তাপ পৃথিবীর আদি শক্তি। স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষ তা আয়ত্তে আনতে শিখেছে। কিন্তু তখনো খনিজ জ্বালানীর আবিষ্কার হয় নি। বনজাত কাঠ এবং জীবজন্তুর পরিত্যক্ত জিনিস পুড়িয়েই মানুষ শক্তির প্রয়োজন মেটাতো। কিন্তু বিংশশতাব্দীর এই মধ্যভাগে এসেও দেখি সে-সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক উপায় বর্জিত হয় নি। ১৯৫১ সালে কাঠ এবং ঘুঁটে সারা পৃথিবীর মোট চাহিদার শতকরা ১৭ ভাগই পূরণ করেছে। আফ্রিকা দক্ষিণপূর্ব ও মধ্যপশ্চিম এশিয়ার অনগ্রসরতাই পরিসংখ্যানকে এত উঁচু আসনে বসিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতের দিকটাও কম নয়। ১৮৯৮ সালে দেশে যখন বিদ্যুতের প্রসার ঘটে নি, মোট প্রয়োজনের প্রায় ৯৫ ভাগই আসত কাঠ ও ঘুঁটে পুড়িয়ে; ঘুঁটেই প্রধান ভাগ—৯০ শতাংশ। কয়লার অংশ বাকি পাঁচ ভাগ মাত্র। বিদ্যুতের যুগ সূচনার পঞ্চাশ বছর পরে অবস্থার নিশ্চয়ই পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৪৭ সালের হিসাবে কয়লার ব্যবহার অনেক বেড়েছে—শতকরা একুশ ভাগ, কিন্তু কাঠ বা ঘুঁটে পুড়ছে ৭৮ ভাগের কম নয়। এ সময় দেশের মোট প্রয়োজনের শতকরা দেড় ভাগ মাত্র বিজলী শক্তি। জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই নিদারুণ অসঙ্গতি ও বিরোধ সহজেই লক্ষণীয়।

কিন্তু আসল অবস্থা যেন আরো খারাপ,—চলতি কথায় শাঁখের করাতের মতো। আর একটি বিষয়ের বিবেচনায় তা স্পষ্ট হবে। ঘুঁটের কার্যকারিতা মাত্র পাঁচ শতমিক (দশমিকের অনুসরণে শতমিক বলতে শতাংশ বোঝাতে চাইছি, পাঁচ শতমিক শতকরা পাঁচ ভাগ), কাঠের আরো কম। তার মানে, কাঠ বা ঘুঁটের আগুন অনর্থক ছাই ও ধূম সৃষ্টি করে

বেশির ভাগই অকাজে ছড়িয়ে পড়ে,—পর্বতের মূষিক প্রসবের সঙ্গেই এর তুলনা। ১৯৪৭ সালে আলানীর কাছে এক ঘুঁটেই পুড়েছিল আনুমানিক পঁচিশ কোটি টন। বিদ্যুতের প্রসারের ফলে এই পৌরাণিক উৎসটি যদি গোবর হিসাবে ক্ষেতে প্রয়োগ করা যেত, সারের প্রাচুর্যে দেশের শস্যোৎপাদন নিশ্চয়ই যেত বেড়ে। একদিকের অসামঞ্জস্য এভাবে আর একদিকে পিছুটান দিচ্ছে।

পরাধীন অবস্থায় স্বভাবতই পরিকল্পিত অর্থনীতি সম্ভব ছিল না। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই এদিকে দেশনায়কদের দৃষ্টি পড়ল। পাঁচ বছরের পর্যায়ে জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের কথা উঠল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনার কাজ শুরু হয় ১৯৫১ সালে। ইতিমধ্যে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন দশ লক্ষ কিলোওয়াট বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিকল্পনার লক্ষ্য ৩৮ লক্ষতে নির্দিষ্ট হলো। কিন্তু কার্যকালে এই উদ্দেশ্য পূরণ হয় নি। ১৯৫৬ সালে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩৪.২ লক্ষ কিলোওয়াট। ঘাটতির পরিমাণ সামান্য হলো না। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও প্রাথমিক সংকল্প খাটো করে সাজাতে হয়েছে। মূল লক্ষ্য ৭০ লক্ষ কিলোওয়াট, কিন্তু বিদেশী মুদ্রা ও যন্ত্রপাতির অভাব দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত ১২ লক্ষ কিলোওয়াট কম নির্ধারিত হলো। ১৯৬০ সালে ভারতে বিদ্যুৎপরিমাণ ৫৮ লক্ষ কিলোওয়াট। তৃতীয় পরিকল্পনায় লক্ষ্য ১১৮-তে নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু কি পরিমাণ যে কার্যকর হবে এখন থেকেই নিশ্চিত নয়। আসল কথা বিদ্যুৎশক্তির বিকাশে আমরা যেন যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে পারি নি। গঠনমূলক পর্যায়ে অজস্র প্রকারের অসুবিধা থাকে, কিন্তু বিদ্যুতের অভাব তার পরিমাণ বাড়িয়েই তোলে। রাষ্ট্র ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিদ্যুতের গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ করা তাই বিবেচনার কাজ হবে না। পৃথিবীর প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশ এ বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে। আমেরিকা বৃটেন ফ্রান্স নরওয়ে ইত্যাদি দেশের শিল্পোন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায় লক্ষ্য করলে এ সত্যই বেরিয়ে আসে। ১৯১৯ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আয়ত্তের পর রুশ চিন্তানায়ক লেনিন নূতন মতবাদের সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তি বিকাশের প্রতিও সমান গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। Communism is Soviet Power plus Electrification of the whole country—তাঁর এই উক্তি বিখ্যাত ছিল। সোভিয়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা সে অনুসারে বিন্যস্ত হলো। যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ার পক্ষে এ

সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকর করা কম আয়াসসাধ্য ছিল না। কিন্তু লেনিনের দূরদৃষ্টি আজ আর কেউ প্রশংসা না করে পারেন না।

আমাদের পরিকল্পনার রচয়িতারাও শিল্পোন্নয়নের এই ইতিহাস যথেষ্ট বিস্তার ও বিবেচনার সঙ্গে লক্ষ্য করে থাকবেন। কিন্তু পরিকল্পনার চেয়ে সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলার জন্যই প্রধানত বিদ্যুতের বিস্তার প্রয়োজনের তুলনায় তেমন অগ্রসর হতে পারে নি। বৈদ্যুতিক উৎপাদন-যন্ত্র বসাতে সাধারণত বছর চার সময় নেয়। কিন্তু আমাদের দেশে পরিকল্পনার পর্যায় থেকে পুরোপুরি গড়ে তোলা আট বছরের কমে হয় না। এ জন্য যে বাড়তি ব্যয় স্বীকার করতে হয় তা বলা বাহুল্য। বর্তমানে কোনো উন্নয়নমূলক কাজের প্রাথমিক অনুসন্ধান ও পরিকল্পনা করেন রাষ্ট্রীয় সরকার। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পরে তার পুনর্বিবেচনা হয়। কাজটির গ্রহণযোগ্যতা, আনুমানিক ব্যয়, অগ্রাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের হাতে। পরিকল্পনার পূর্ণচিত্র এভাবে রচিত হয়ে থাকে। মূল উদ্দেশ্যের ত্রুটি নেই, কিন্তু পরিকল্পনার স্তরেই এখন অনেক সময় অতিবাহিত হচ্ছে। তা ছাড়া চূড়ান্ত বিবেচনার পরও মুদ্রা ঘাটতির ডামাডোল পেরিয়ে বিদেশী যন্ত্রের আমদানিতেও কম সময়ক্ষেপ হয় না। সমস্ত পরিকল্পনার কাঠামোই তাই ঝাঁকানি খাচ্ছে। বিদ্যুতের উৎপাদন যেখানে শিল্পের প্রয়োজনের তুলনায় অগ্রসর থাকার কথা ছিল কার্যত তা-ই পেছিয়ে পড়েছে। তৃতীয় যোজনাকালে আমাদের যে বিদ্যুতের প্রয়োজন, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেই তা তৈরি থাকা উচিত ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হতে না হতেই নূতন চাহিদা আবার দেখা দেবে। জাতীয় শিল্পোন্নয়ন এভাবে উল্টোমুখী ঘোড়ার মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

পরিসংখ্যান-নির্ভর গণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করে ভবিষ্যতের চাহিদা সহজেই নিরূপণ করা যায়। সেই অনুসারে মোটামুটি কার্যসূচী স্থির হয়েছে, পরিকল্পনার সুষমতা যথাকালেই সম্পন্ন হবে। যা হিসাব হয়েছে, পঁচিশ বছর পরে ভারতে বিদ্যুতের পরিমাণ পাঁচ কোটি কিলোওয়াট-এর সীমা অতিক্রম করবে। এর ফলে কয়লার উপর যে চাপ পড়বে তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমানে মোট উৎপন্ন বিদ্যুতের শতকরা প্রায় ষাট ভাগই কয়লাজাত উত্তাপ থেকে সংগৃহীত হচ্ছে। সর্বাধুনিক সমীক্ষার ভিত্তিতে

দেশের মোট কয়লার সঞ্চয় ৬০০০ কোটি টন। বর্তমানের চাহিদা অনুসারে তা আগামী প্রায় দেড় শ বছরের চাহিদা মেটাতে সমর্থ। কিন্তু বিদ্যুতের ব্যবহার প্রতিদিনই বাড়ছে। স্বাধীনতার পরবর্তী মাত্র চোদ্দ বছরে এই বৃদ্ধি চার গুণেরও কিছু বেশি। এ সত্ত্বেও বর্তমানে বিদ্যুতের জনপড়তা হিসাব আমেরিকার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কালক্রমে অবস্থার যখন উন্নতি হবে কয়লার ব্যবহারও সেই সঙ্গে বেড়ে যাবে। আমেরিকার বর্তমান হারে খনিজ সম্পদ ফুরোতে পনেরো বছরের বেশি লাগবে না। নূতন আরো খনির আবিষ্কার সম্ভব হলে কালের সীমা বড় জোর আরো নয় বছর দশেক বাড়লো। মোট পঁচিশ বছর। এমন নিদারুণ সমস্যা অবশ্য আমাদের আপাতত নেই—কয়লা আমরা অনেক "বাঁচাচ্ছি", কিন্তু সমস্যা প্রকট হতে আর কত দিন। আলানীর সঞ্চয় ক্রমবৃদ্ধিহারে ক্ষয় পাচ্ছে। ভবিষ্যতের বিদ্যুৎ প্রয়োজনে কয়লার উপর বেশি নির্ভর করা তাই সুযুক্তির পরিচয় হবে না।

রাশিয়া বা আমেরিকায় গ্যাস ও তেল পোড়ানো উত্তাপ থেকেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু ভারত এ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়। তেল পরিবহনের কাজেই প্রধানত ব্যয়িত হবে। এদিকে ওদিকে যে দু-চারটি গ্যাসের উৎস রয়েছে তার মধ্যে আসামের নাহারকাটিয়ায় সম্প্রতি ৫০ হাজার কিলোওয়াট আয়তনের এক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বসানো হচ্ছে। কিন্তু একটি কি দুটি নক্ষত্র রাত্রির কতটা আঁধার দূর করতে পারে। বিদ্যুতের প্রয়োজনে তেল বা গ্যাসের অবদান মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকেই ভারতে জলবিদ্যুৎ শক্তির বিকাশ। জলের আবর্ত থেকে এখানে বিদ্যুৎ মথিত হয়ে ওঠে। ১৯০২ সালে মহীশূর রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে মোট উৎপাদনের শতকরা ৩৮ ভাগই জলশক্তি থেকে সংগৃহীত। ভারতে জলবিদ্যুৎ সম্ভাবনা চার কোটি কিলোওয়াট। কিন্তু বন্দর পত্তনের মতো জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনেও প্রকৃতির আনুকূল্য ছাড়া যথেষ্ট ব্যয়সংক্ষেপ হয় না। ভারতের অনেক নদীতেই পর্যাপ্ত জল সম্বৎসরকাল প্রবাহিত না হওয়ায় বাঁধ ও জলাধার তৈরি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনেক সময় আবার জলবিদ্যুতের সম্ভাব্য উৎস শিল্পাঞ্চল থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এ সব ক্ষেত্রে কয়েক শ কিলোমিটার

তার টেনে আনার বাড়তি খরচ আছে। তবে এ জাতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক ব্যয়ই প্রধান কথা, চলতি ব্যয় সামান্য মাত্র—মোটামুটিভাবে কয়লার পাঁচ ভাগের এক ভাগ। ১৯৬১ সালে জলবিদ্যুতের পরিমাণ ২১ লক্ষ কিলোওয়াট, তৃতীয় যোজনার শেষে তা দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে। ইতিমধ্যেই দেশের সুবিধাজনক উৎস অনেকগুলি কাজে লাগানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসাব, আগামী পঁচিশ বছরে মোট সম্ভাবনার অর্ধেকের বেশি অংশ কার্যকর করা ব্যয়সঙ্গত হবে না। বিদ্যুতের সম্ভাব্য প্রয়োজন জলশক্তির উপর নির্ভর করে তাই বেশি দিন স্থির থাকতে পারে না।

সমস্যা এখনি ঘনিয়ে আসে নি বটে, কিন্তু শক্তির নূতন উৎস সন্ধানে আমাদের এখনই তৎপর হতে হয়। পরমাণুর যুগে পরমাণু অবশ্য রয়েছে, তার রহস্যময় গর্ভে যে অসীম শক্তির সঞ্চয় তাকে উত্তাপের আকারে বাইরে টেনে বিদ্যুৎ হিসাবে নিয়োজিত করা। পরমাণুর বিভাজন প্রক্রিয়ার মধ্যে তা সফলও হয়েছে। এটম থেকে ইলেকট্রিসিটি সামান্য কথা নয়, অনেক জটিল তত্ত্ব ও কারিগরি কৌশলের মধ্যে পরমাণুজাত বিদ্যুৎ সফল হয়েছে। এজন্য প্রধান উপাদান য়ুরেনিয়াম বা থোরিয়াম। ভারতে দুটিরই প্রচুর সঞ্চয়। য়ুরেনিয়াম-এর পরিমাণ ১৫ হাজার টন, থোরিয়াম ১৫০-১৮০ হাজার। সমৃদ্ধ আকরিকগুলিই শুধু আমরা হিসাবে ধরেছি। নূতন অনুসন্ধানের ফলে এই পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্তমান পর্যায়ের কারিগরি কৌশলে এক টন য়ুরেনিয়াম দশ হাজার টন পর্যন্ত কয়লার কাজ করতে পারে। কালক্রমে এই ক্ষমতা আরো প্রসারিত হবে—এক টন থেকে লক্ষ গুণ কয়লার কাজ আদায় করা তখন বোধ হয় অসম্ভব হবে না। শক্তির যে অসামান্য উৎসটি আমরা পেলাম তা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির মতো ভারতও তার শক্তিসমস্যার সমাধান পরমাণুর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে।

এই পরমাণুকে কাজে লাগানো সহজ কথা নয়। প্রথমেই, জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো বেশ সবল থাকা চাই। পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রাথমিক যে ব্যয়ভার, কয়লার তুলনায় তা কয়েকগুণ। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে আরো অনেক বাড়তি খরচের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পরমাণুর ক্ষেত্রে এমন অনেকগুলি জিনিসের প্রয়োজন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাদের ব্যবহার নেই। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পূর্বে বিশেষ কারখানায় এ সমস্ত উপকরণ আগেভাগেই তৈরি থাকা চাই। এত বিরাট প্রস্তুতি অনগ্রসর দেশগুলির পক্ষে সম্ভব

হয় না। তা ছাড়া, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক সমস্যা যে পরিমাণে জটিল, নিপুণতাও সে, অনুসারে নির্খুত হওয়া চাই। সে সঙ্গে জীবদেহে পরমাণুর বিষক্রিয়ার কথাও ভুললে চলবে না। এ সব সত্ত্বেও পরমাণুকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে বৃটেন তাদের মোট উৎপন্ন বিদ্যুতের আধাআধি পরমাণু থেকেই সংগ্রহ করে নিচ্ছে। আমাদের অবশ্য এত বড়ো পরিকল্পনা নেই, আপাতত তার প্রয়োজনও নেই। তবে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে হয় বই কি। তৃতীয় যোজনাকালে পরমাণুবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে। বোম্বের ১০০ কিলোমিটার দূরে তারাপুর, ১৯৬৫ সালের মধ্যে সেখানে দুটি উৎপাদন কেন্দ্র বসানো হবে। মোট তিন লক্ষ কিলোওয়াট। সে সঙ্গে ভারতও যথার্থই পরমাণুর যুগে এসে উপনীত হবে।

এভাবে আমাদের শক্তি-প্রয়োজন প্রধানভাবে যখন ঘুঁটে পুড়িয়ে নিষ্পন্ন হয়, পরমাণুকেও আমরা জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে এলাম। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের মতো নূতন এক অসামঞ্জস্যের যেন সৃষ্টি হলো। কিন্তু পরিকল্পনার মধ্যে সমস্ত বিন্যাসের অবসর রয়েছে। পরমাণুর বিদ্যুৎ কয়লাজাত বিদ্যুতের মতো পরিবর্তনশীল চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট নয়, শক্তির যে অংশটা সর্বদাই প্রয়োজন হচ্ছে তার জন্যই তা কার্যকর। নূতন বিদ্যুতের এই খণ্ডিত উপযোগিতা আছে। সে সঙ্গে উৎপাদনের আয়তনও বিরাট হওয়া চাই, নচেত ব্যয়বাহুল্য এসে পড়ে। বিস্তৃত চাহিদার সৃষ্টি না হলে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানো সুলভ হয় না। তার মানে, বড়ো বড়ো অনেক কলকারখানা থাকা চাই যেখানে দিনরাত সমানে কাজ চলছে। গার্হস্থ্য প্রয়োজন পরিবর্তনশীল, পরিমাণেও সামান্য মাত্র (মোট প্রয়োজনের শতকরা ১১ ভাগ)। পরমাণুর শক্তিকে ঠিকঠাক ব্যবহার করতে হলে তাই বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলগুলির মধ্যে বৈদ্যুতিক পরিচলন ব্যবস্থা (Transmission) চালু রাখা চাই। প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে রয়েছে পরমাণু (বা কয়লা) জাত বিদ্যুৎ। পরিবর্তনশীল প্রয়োজনে জলবিদ্যুৎ বা ইঞ্জিন চালিত শক্তি কাজে লাগানো হবে। কিন্তু এই নিপুণ বিন্যাস ব্যাপক পরিকল্পনার ফল। ভারতের মতো বিরাট দেশে তা কার্যকর করা সহজ কথা নয়। য়ুরোপীয় সোভিয়েত রাশিয়া সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে এই যোগসূত্র বিস্তার করেছে। ফলে দেশের দূরতম কেন্দ্রেও যদি কখনো উৎপাদন ব্যাহত হয় স্থানীয় চাহিদা মেটাতে অসুবিধা হবে না, অন্য স্থানের উদ্বৃত্ত অংশ সহজেই ব্যবহার করা

চলবে। পরিকল্পনা কমিশনের নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও আমাদের বৈদ্যুতিক উন্নয়নগুলি আঞ্চলিক সীমানার গণ্ডিকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। দামোদর উপত্যকায় কর্মযোজনা এর ব্যতিক্রম মাত্র। মোট উৎপাদন বিহার ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হচ্ছে। মহানদী পরিকল্পনায় হিরাকুদের বিদ্যুৎও ক্রমে এ সঙ্গে মিলিত হবে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে এভাবে একটি বিদ্যুতের সংযোগকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। ১৯৬১ সালের প্রারম্ভে শিল্পাঞ্চলিক কলকাতায় যে অভাবনীয় বিদ্যুৎঘাটতি দেখা দেয় রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ না থাকলে তা আরো দারুণভাবে অনুভূত হতো। সম্প্রতি ভারতের পশ্চিমে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে বৈদ্যুতিক পরিচলন ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। শিল্পাঞ্চলের জন্য শক্তির প্রয়োজন যেখানে বরাবরই রয়েছে, বর্তমানে তা অনেক আয়তনে পরমাণু বিদ্যুৎ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত হয়ে রইল।

পরমাণু শক্তির উন্নয়নের ব্যাপারে ব্যয় বাহুল্যের দিকটা অবশ্যই এক বিরাট সমস্যা। দেশের এই গঠনমূলক পর্যায়ে জাতীয় অর্থনীতির উপর তা সবিশেষ চাপ দেয়, কিন্তু কোনো কারিগরি কৌশল আয়ত্ত করতে হলে এই ব্যয়ভার গ্রহণ না করে উপায় নেই। অভিজ্ঞতা ও বিশেষত্ব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। কয়লার খনি থেকে দূরবর্তী ভারতের পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে উৎপাদনের ব্যয় এখনই অপেক্ষাকৃত কম। অভিজ্ঞতা ও বিশেষত্ব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশ স্বাভাবিক সীমায় চলে আসবে। কিন্তু ব্যয়ভারের থেকে যে কথা বেশি তাৎপর্যপূর্ণ: আমরা শক্তির একটি নূতন উৎস আয়ত্ত করতে যাচ্ছি। পনেরো কি বিশ বছরের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রধান ভাগ পরমাণু থেকেই সংগ্রহ করে নিতে হবে। কয়লার দিন প্রায় ফুরল। প্রাথমিক ব্যয়ভার তাই স্বীকার করে নিতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনা সে অনুসারে উপযুক্ত কাঠামো তৈরি করে নিচ্ছে।

অশোককুমার দত্ত

কবিতার কথা

টেনিসনের ইউলিসিস কোন্ মায়ামন্ত্রে টি. এস. এলিয়টের হাতে গেরন্‌শিয়ন্ হয়ে উঠল লরেন্স্ ডারেল-এর কাছে এইটেই প্রশ্ন। তাঁর বিশ্বাস, "সত্যিকারের মহৎ কবি উক্তির দামেই আধুনিক, বলার ঢঙে নয়।" তাছাড়া "যে প্রিজম্-কে আমরা কৃষ্টি বলে থাকি, সাহিত্য তারই এক মুখ।" টেনিসন্ ও এলিয়টের পার্থক্য আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে নয়, অন্তর্লীন মূল্যবোধের বিরাট বিবর্তনে। ভূতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও অভিব্যক্তিবাদে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ ও ফ্রয়েড-এর স্বপ্নতত্ত্বের আবির্ভাবে সেই পরিবর্তন চিন্তারাজ্যে বিপ্লব হয়ে দাঁড়ায়। সেই বিপ্লবের গর্ভেই আধুনিক ইংরেজি কবিতার জন্ম। এ কবিতার দুর্বোধ্যতা, অসংলগ্নতা ও আপাত-বিশৃঙ্খলা আইনস্টাইন-নির্দেশিত দেশ-কাল-সন্ততির কাব্যরূপ। এ কবিতার প্রতীক ও রূপকল্পের ব্যঞ্জনার পশ্চাতে মনস্তাত্ত্বিককুলের সর্বদা উপস্থিতি। কাল ও ব্যক্তিমন, এই দুই বিন্দু থেকেই আধুনিক কবিকুলের নিত্য যাত্রা। আসলে তাই বিশ্বলোক দর্শনের পরিবর্তনেই কবিতার রূপান্তর। এ ব্যাখ্যায় আধুনিক কবিতার প্রায় যাবতীয় চরিত্রগত গুণের দায়-দায়িত্ব ফ্রয়েড-আইনস্টাইনের উপর অর্শায়। ফলত, অতি সরলীকরণের দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। ডারেল সে সম্পর্কে সচেতন, বারে বারে কৈফিয়ৎ শোনানোয় তাঁর বিরাম নেই।

কাল নিরবধি, কাল অবিভাজ্য, কাল স্রোতোবহা—এই নতুন চেতনা এলিয়ট-এর 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' কিংবা পাউণ্ড-এর ক্যান্টো-পর্যায়ের অন্যতম উৎস। এই নব কালচেতনার কৃপায় চসার-এর মধুবর্ষী বর্ণপ্রসবা সেই আদি এপ্রিল অবচেতনের স্মৃতিভার থেকে উঠে এসে এলিয়ট-এর নিষ্ঠুরতম এপ্রিলের অর্থময় চিত্র রচনা করে। প্রতি মুহূর্তে অনাদি অনন্ত সর্বকাল—কাল অভিন্ন

Key to Modern Poetry, Lawrence Durrel. Rupa & Co., Calcutta. Rs. 5/-

(আকস্মিক অর্থে)—এই আইনস্টাইনীয় তত্ত্ব স্মরণ করেই এলিয়ট লিখতে পারেন:

"বর্তমান কাল আর গতকাল উভয়ে বুঝি বা
বর্তমান ভাবীকালে
আর ভাবীকাল ভাব্য অতীত জঠরে।
যদি সর্বকাল থাকে চিরকালই বর্তমান
অমোচ্য সে সর্বকাল শূন্য আশাহীন।" [বিষ্ণু দে-র অনুবাদ]

টাইরেসিয়াস্, প্রুফ্রক্ প্রমুখ অসংখ্য নিউরটিক, ভাঙা-মানুষ হয়ত ফ্রয়েড-এরই কারখানায় গড়া। তবু বারবার স্মরণীয়, এ শতকের প্রথম বিশ বছরের ইতিহাস—সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা, লয়েড জর্জের সুচতুর ভাঁওতার চাল সত্ত্বেও উত্তাল বিক্ষোভ, শ্রমিক ধর্মঘট, উপনিবেশে বিদ্রোহ, শেষে বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের প্রাক্কালেই সংকটের ইতিহাসে যুদ্ধের সংকেত স্পষ্ট। মহাযুদ্ধের পরে সংকট রয়েই গেল। যুদ্ধের ময়দানেই তরুণ কবি উইলফ্রিড ওয়েন-এর মৃত্যু যেন কোনো আর্কিটাইপাল কবির মৃত্যু বলে মনে হলো। সংকটের কালের মানুষ শেষে যখন অসহায় অসহনীয়তায় গিয়ে পৌঁছল, তখন সামনে এক পথ—মৃত্যুকে জানো, নির্বাণ খোঁজো। অনেক তো দেখা হলো, একটা জীবনের মধ্যেই অসংখ্য মৃত্যুকে দেখা গেল, সামনে শুধু বার্ধক্য, সে দায় কেমন করে সইব? "কিউমি-তে সিবিল্-কে দেখলাম, বোতলের মধ্যে ঝুলে রয়েছে। বাচ্চারা জিজ্ঞেস করল: সিবিল, তুমি কি চাও? সে বলল, আমি মরতে চাই।" শুধু বুড়ো গেরন্‌শিয়ন্, কিংবা "হারি আপ্ প্লীজ ইট্‌স টাইম্"—কিংবা:

"বুড়ো মানুষ তো নেহাৎই ঠুনকো,
ভাঙা কঞ্চির মাথায় ছেঁড়া কোট, যদি না
আত্মাটা হাতে হাতে তালি দিয়ে গান গেয়ে ওঠে"...[য়েট্‌স থেকে]।

ধ্বংসস্তূপের চেতনা, বার্ধক্য ও মৃত্যুর চেতনা—এই চেতনার সাক্ষাতেই কবিতার ভাষা ভেঙে গেল, সাবেকী ছন্দ ভাঙল—সাবেক কালটাই যখন ভেঙে গেছে, তখন ওদের বেঁধে রেখে লাভ নেই। সাহিত্যের অতীত ইতিহাসে তখন আত্মীয় স্বরূপ ডান ও হপকিনস, দু-জনেই নিউরসিস-এর কবি, মর্ত্যচেতনা ও লোকোত্তরের দুর্বিষহ টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত। দ্বিতীয় দশকের কবিদের কাছে ডান বলতে অমিত রায়ের ডান নয়, 'হোলী সনেটস' -এর ডান। লিউইস ক্যারল-এর ভাষা নিয়ে ভাঙাচোরার উত্তরাধিকার নতুন কবিদের পরীক্ষায় সমৃদ্ধতর হলো। মিল্টন, ল্যাম, আর্নল্ড-এর হাতে মুক্তছন্দ পরীক্ষার

বদ্ধ ছিল; পরীক্ষা এবার প্রতিষ্ঠিত রীতি হলো। পুরনো ঐতিহ্যের ভাঙা টুকরো দিয়ে ধ্বংসের বিরুদ্ধে বাঁধ বাঁধবার প্রয়াসেই সমালোচক ও কবি এলিয়টের সাধনা শুরু হলো। এলিয়টের কবিতায় তাই অহরহ নতুন পুরনোর তুলনা—ফীনীশীয় নাবিক, বণিক, মিষ্টার সিদ্‌স্তেরো, হাকাপাওর্য়া, তোম্লিন-স্যুউইনিদের সঙ্গে পুরনো সাহিত্যের চরিত্র ও এলোমেলো ছন্দের স্মৃতি। ঐতিহাসিক কারণেই যে যুগান্ত-চেতনার জন্ম হয়েছিল; আইনস্টাইন, ফ্রয়েড, বার্গস্ঁ প্রমুখের তত্ত্বের কোনো কোনো দিক সেই চেতনায় অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম চার অধ্যায় জুড়ে আইনস্টাইন, ফ্রয়েড ও গ্রোড্ডেক-এর তত্ত্ব আলোচনা করে ১৮৯০-এর যুগ থেকে কবিতার ইতিহাস শুরু; এ শতকের তৃতীয় দশকের শেষেই সেই ইতিহাসের শেষ। এলিয়ট সাহেবের বিধান মানলে ['অন্ পোয়েট্রি অ্যাণ্ড পোয়েটস' প্রবন্ধ সঙ্কলনে 'য়েটস' (১৯৪০) প্রবন্ধে] প্রতি বিশ বছর অন্তর কবিতায় যুগ বদলায়। তাই ১৮৯০ থেকে ১৯৩৯-এর কবিতাকে 'আধুনিক' বলা চলে কিনা, সে প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই উঠবে। তবু, এযুগে বসে ওযুগের কবিতার আলোচনার মূল্য আছে। আশা করেছিলাম, পঞ্চাশের দশকে ইংরেজ সমালোচকদের কাব্যবিচারে যে দিকপরিবর্তন ঘটে গেছে, ডায়েল-এর আলোচনায় তার সাক্ষ্য মিলবে। সে আশা পূর্ণ হয় নি। ১৯৪৮ এ লেখা এই বই; ১৯৬১ সালের নতুন সংস্করণে একে কালোপযোগী করার কোনো চেষ্টা হয় নি।

"ডি. এ্যাচ. লরেন্‌স্ মাঝে মাঝে উৎরে যান···মাঝে মাঝে মহত্ত্বের মুহূর্তের আস্বাদও পেয়ে যান; তবু বড় অক্ষম লেখক।" কথাটা যাঁর, ভর্জিনিয়া উল্‌ফ-এর ডায়েরিতে তাঁর নাম টম (অর্থাৎ, টমাস স্টার্নস্ এলিয়ট)। এলিয়ট জানতেন না যে, তাঁরই জীবৎকালে বৃদ্ধবয়সে শুনতে হবে, "কবি হিসেবে লরেন্‌স্ এলিয়টের চেয়ে অনেক বড় প্রতিভা" (কলকাতায় কবি-সমালোচক ডি. জে. এন্‌রাইট-এর ভাষণ, স্টেটস্‌ম্যান্-এ উদ্ধৃত)। নতুন কাব্যবিচারে, য়েটস্ ও লরেন্‌স্ কবি হিসেবে এলিয়ট ও তাঁর উত্তরসূরীদের অনেক ওপরে স্থান করে নিয়েছেন। এটা কোনো সাময়িক ভালো লাগা না-লাগার খেলা নয়। বিগত দশকের কাব্যবিচারে এ মতের তাত্ত্বিক সমর্থন আছে। এর তাত্ত্বিক সমর্থন এলিয়টের প্রবন্ধেও আছে, আর ১৯৩৮-এ প্রকাশিত ম্যাক্‌নীস-এর প্রবন্ধেও ('এসেজ অ্যাণ্ড স্টাডীজ' প্রবন্ধবার্ষিকীর পাতায়)।

দর্পণ আলোকশিখা হয়ে উঠুক, দর্শন হোক—তবেই কবিতার মহত্ব। কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রগাঢ় উপলব্ধি হোক। দার্শনিক কিংবা রাজনৈতিক কোনো তত্ব, স্বরচিত কোনো সুনির্দিষ্ট জীবনবেদ হোক—এমনি কোনো গভীর প্রত্যয়ের সহায়তা ছাড়া কোনো একা কবির সার্থকতায় পৌঁছবার শক্তি নেই। অভিজ্ঞতাকে প্রত্যয়ের ভূমিতে রোপণ না করলে, কোনো জীবনবেদের সঙ্গে যুক্ত না করলে, কবিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মরা 'ফর্ম', গতানুগতিকতা, ও স্টক্ রেস্‌পন্‌স্‌-এর চোরাবালিতে। আয়র্ল্যাণ্ডের লোককথা, আয়র্ল্যাণ্ডের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আয়র্ল্যাণ্ডের মনের আশ্চর্য মেজাজের উপর য়েটস্‌ তাঁর 'গায়ার্স্‌'-এর ইতিহাসদর্শন স্থাপন করেছিলেন। অলিভার গ্যাগার্টির রোমহর্ষক জীবনের সঙ্গে য়েটস্‌-এর যোগ ছিল—সে জীবনের কাব্যময়তা য়েটস্‌ স্বাভাবিকভাবেই লাভ করেছিলেন—"এমন এক দেশ যেখানে জনজীবন সরল অথচ উত্তেজনার তারে বাঁধা, সেই দেশের জনজীবনের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত থেকেছি বলেই আমরা এইরকম হয়ে উঠেছি।" য়েটস্‌-এর চিত্রকল্প আইরিশ সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বিরাট মহাদেশ থেকে তার অঙ্গরণন তুলে নেয়, য়েটসীয় ইতিহাসদর্শনের অর্থের যোগে আরো অর্থময় হয়ে ওঠে।

জেসি চেম্বার্সের ('সান্‌স্‌ অ্যাণ্ড লাভার্স'-এর মিরিয়াম) সঙ্গে সেই অদ্ভুত অসার্থক প্রণয়ের জালাময় অভিজ্ঞতা এবং উত্তরজীবনে তারই ছায়ায় রচিত নতুন যৌনজীবনদর্শন (যার সার্থকতম প্রকাশ 'লেডি চ্যাটার্লি'-র পূর্ণাঙ্গ শেষ ভাষ্যে এবং সেই কবিতাস্বরূপ ছোট গল্প 'শেষ হাসি'তে) লরেন্‌স্‌-এর কবিতার প্রত্যয়-ভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই যৌনজীবনদর্শনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এট্রুরিয়া ও মেক্সিকোর জীবনধারার বাণী। মানুষের মধ্যে যা কিছু প্রকৃতিজ, তার পূর্ণ অবারিত প্রকাশ আদিম সমাজের আন্তর চেতনা—সেই চেতনা লরেন্‌স্‌-এর কবিতার প্রাণস্বরূপ :

> "পাপ ? কোথায় পাপ ?
> পাপ তো একমাত্র জানি, জীবনকে অস্বীকার করা।
> একদা রোম এট্রুরিয়াকে অস্বীকার ক'রেছিল,
> আর আজও যন্ত্ররাজ আমেরিকা মণ্টেজুমাকে।" (লরেন্‌স্‌ থেকে)

ইওরোপীয় কাব্যলোকের ক্ষেত্রেও লর্কা-র নতুন প্রতিষ্ঠাও এই একই কারণ প্রসূত। আন্দালুজিয়া-র লোকসংস্কৃতির ভিত্তিভূমি তাঁর কবিতার

অভলান্ত ব্যঞ্জনার উৎস। ইগনাসিও সান্তো বিলাপের সেই পুনরুক্ত 'বিকেল পাঁচটায়' মধ্যযুগের রোম্যান্‌স্‌ ও বালাদের স্মৃতির অনুষঙ্গেই এমন তীব্র বেদনায় ভারাবনত হয়।

"বিকেল পাঁচটায় তার শয্যা চার চাকার উপর কফিন।
বিকেল পাঁচটায় হাড়ে আর বাঁশীতে তার কানে সুর বাজায়।
বিকেল পাঁচটায় তার কপালে খেপা ষাঁড় গর্জন করে।
বিকেল পাঁচটায় ঘরটা বেদনার আগুনে চ'মকে ওঠে।
বিকেল পাঁচটায় দূর থেকে গ্যাংগ্রীন হানা দিয়ে আসে।
বিকেল পাঁচটায় সবুজ সংধায় লিলি-ট্রাম্পেট ডেকে ওঠে।
বিকেল পাঁচটায় আঘাতের ক্ষতগুলো সূর্যের মত পোড়ে।
বিকেল পাঁচটায় জনতা জানলা ভাঙে।
বিকেল পাঁচটায়।
উঃ, সেই ভয়ঙ্কর বিকেল পাঁচটায়।
সবকটা ঘড়িতেই তখন পাঁচটা।
তখন বিকেল পাঁচটার ছায়া।" [লর্‌কা থেকে]

নিজের দেশের মানুষের সমগ্র জীবনধারার প্রাণময় চেতনাকে জীবনবেদে রূপান্তরিত করে য়েটস্‌ ও লর্‌কা কাব্যের আকাশে মুক্তি পেয়েছেন। এট্রুস্কিয়া ও মেক্সিকোর আদিম জনজীবনের ধারায় লরেন্‌স্‌ তাঁর জীবনচিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এলিয়ট ও তাঁর উত্তরসূরীরা ওখানেই হার মেনে গেছেন। পুরনো সাহিত্যই হোক, আর ফ্রয়েড-মার্কসের সেই অপরূপ রাসায়নিক মিশ্রণই হোক, সেই বন্ধ্যা ভূমিতে আগাছারই চাষ চলে, মাঝে মাঝে বড় জোড় ক্ষীণজীবী বনস্পতি। অ্যাংলো-ক্যাথলিসিজম্‌-এর ছায়ায় এলিয়ট অপেক্ষাকৃত সফল কবিতা লিখেছেন। কিন্তু ফেবার অ্যাণ্ড ফেবারের ধুরন্ধর ডিরেক্টরের বিশ্বাসের জোর কতখানি, সে প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? নিতান্তই বুদ্ধি দিয়ে কোনো এক ধর্মকে গ্রহণ করে তাকে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলে, সে ধর্ম ক্ষয়রোগের শিকার হয়। আর তাই কি 'ফোর কোয়ার্টেটস্‌'-এর সার্থকতার পরই এলিয়টের কাব্যলীলা স্তব্ধ হয়ে গেল? ১৯৫৪-এর 'কাল্টিভেশন অফ ক্রিস্‌মাস্‌ ট্রীজ' তো নিতান্তই প্রতিধ্বনি, ততোধিক কিছু নয়। অডেন্‌-এর শিষ্যপ্রতিম লরেন্‌স্‌ ডারেল যাই বলুন না কেন, অডেন্‌ ও স্পেণ্ডারের ইদানীন্তন পর্বের কবিতায় স্থায়িত্বের আশ্বাস দেখি না। নতুন কাব্যসংগ্রহে পুরনো কবিতার মতবাদ ও বক্তব্য বদলাতে গিয়ে অডেন্‌ যে ভাষান্তর সৃষ্টি করেছেন, তাতে পুরনো কবিতার কাব্যমূল্য বিপর্যস্ত হয়েছে, কবিতার রূপ

বারে বারে ভেঙে গেছে। 'গ্রাম রাত্রি' (১৯৩৩) কবিতায় নতুন সমাজবাদী সংস্কৃতির গুণকীর্তন শেষ করে অডেন্ লিখেছিলেন:

"এর জন্তে যদি নিজের একাকীত্বকে হারাবার ভয়ও থাকে,
তবু এর যেন কৈফিয়ৎ না লাগে।"

অন্তার্থঃ, নতুন সমাজবাদী সংস্কৃতিতে আমাদের একাকীত্ব ভেঙে গেলে তাকে মঙ্গল বলেই মানব। নতুন ভাষ্যে সমাজবাদী সংস্কৃতির প্রশংসাসূচক এবং পলায়নী মনোবৃত্তির নিন্দাস্বরূপ স্তবকগুলি বর্জন করে অডেন্ লিখেছেন:

"এই যে কত সুখ, ভয় পাই হারাবো ব'লে,
এই যে একাকীত্ব, এদের যেন কৈফিয়ৎ না লাগে।"

অর্থাৎ, পুরনো সংস্কৃতির সুখরাশি ও একাকীত্বের পলায়নী বৃত্তি, অডেন আজ উভয়কেই মঙ্গল বলে মানেন। মতবাদ বদলে গেছে বলে পুরনো কবিতার বিকৃতি ঘটানোর এই 'রাস্কেলি', এ বোধহয়, এ-কালেই সম্ভব।

এ-হেন কালে আধুনিক ইংরেজি কবিতার ইতিহাস ও কাব্য সমুদ্রে অবগাহন করে সুখ আছে। আর সুকবি ও উপন্যাসকার লরেন্স্ ডারেল সহায় হলে তো কথাই নেই! ইংরেজি কাব্যের বিচারের বিধি ইংরেজ কবিকুলই কালে কালে বেঁধে দিয়েছেন। এ-যুগেও তার ব্যতিক্রম নেই। সিডনী, ড্রাইডেন, পোপ, ওয়র্ড্স্ওয়র্থ, কোল্‌রিজ, শেলী, কীট্স্ আর্নল্ড, হপকিন্স্-(পত্রগুচ্ছে)-এর ধারা য়েটস, এলিয়ট, স্পেণ্ডার, ডে লিউইস, ম্যাক্‌নীস, রয় ক্যুলার ও লরেন্স ডারেল-এর কীর্তির মধ্যে অব্যাহত। এঁরা কেউই সন-তারিখের গতানুগতিক সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন নি। স্বকীয় কোনো দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করে তারই আলোকে এঁরা স্বকালের কবিতার মূল্যবিচার করেছেন। আর সেই কারণেই পছন্দ-অপছন্দ শত্রু-মিত্রের প্রশ্ন এঁদের দৃষ্টিকে ব্যাহত করে নি। গুরুত্বের তারতম্যবিচারে জনপ্রিয় খ্যাতিমানদের নাম সময়ে সময়ে বাদ দিতেও এঁদের দ্বিধা নেই। সৎসাহস, উদার নির্মোহ, গভীর দৃষ্টির সমপ্রয়োগে কোনো বাঙালী কবি আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস রচনায় হাত দেবেন কি? ইংরেজ কবিদের অনেকেই তো প্রয়াসে মান রেখে গেলেন।

পরিশেষে, একটি কথা। প্রকাশন সৌকর্যে রূপার তো সুনাম আছে। তবু এবার এত মুদ্রণপ্রমাদ কেন? অন্তত পঞ্চাশটি ছাপার ভুল চোখে পড়েছে।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তক পরিচয়

ফাউস্ত, প্রথম ভাগ। যোহান ভোল্‌ফ্‌গাঙ্‌ গ্যেতে। মূল জার্মান থেকে কানাইলাল গাঙ্গুলী কর্তৃক অনূদিত। জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স। ছয় টাকা।

ফাউস্ত জার্মানি কাব্য সাহিত্যের কৌস্তভমণি, বিশ্বকাব্যসাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন। ইহার রচয়িতার জীবনালেখ্য, ভাবিতে আনন্দ লাগে ইতিপূর্বেই বাঙালীর চিন্তাজগতে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের সুদীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে। বাংলাদেশের বাহিরে না গিয়া ও জার্মান ভাষার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবেও ওদুদ সাহেব গ্যেটে-অনুরক্তির যে আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। সেই সঙ্গে একথাও না মানিয়া উপায় নাই যে গ্যেটের কবিপ্রতিভার সম্যক রসাস্বাদনের জন্য জার্মান ভাষার সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় অপরিহার্য। কোন অনুবাদই তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না।

তবে কি বলিতে হইবে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় কাব্যের অনুবাদ একান্ত ব্যর্থ প্রচেষ্টা? মোটেই না। বরং বলা যায়, কোন এক ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা সেই ভাষায় কাব্যসৃষ্টি দিয়া যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনই প্রমাণিত হইতে পারে অন্য ভাষার কাব্যসৃষ্টিকে আপন করিয়া লইবার প্রয়াসের মধ্য দিয়া। বস্তুতঃ, ইহারা জাতির কাব্যপিপাসা মিটাইবার বিভিন্ন পন্থা মাত্র। যে জাতির আপন সাহিত্য যত উন্নত, অন্য ভাষার কাব্য-সাহিত্যকে স্বীকরণের সামর্থ্য তার তত বেশি। এই স্বীকরণের উদ্দেশ্য নয়, অন্য ভাষার কাব্যসম্পদকে মূল ভাষায় জানিবার আগ্রহকে অনাবশ্যক করিয়া তোলা, স্বীয় শক্তির প্রয়োগে অন্য ভাষার কাব্যসম্পদের সমীপবর্তী হওয়াই যথেষ্ট প্রয়াস-যোগ্য আদর্শ।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের গৌরবে বাঙালী মাত্রেই আত্মতৃপ্ত। কিন্তু বাংলা ভাষায় অন্য ভাষা হইতে কাব্যানুবাদে যথেষ্ট তৃপ্তি পাইবার সঙ্গত কারণ আমাদের আছে কি? ভারতের অন্যান্য ভাষা হইতে বাংলা অনুবাদের আগ্রহ আমাদের নাই এই অহংকৃত বিশ্বাসে, যে তাহাতে এমন কিছু নাই

যাহা বাঙালীর পক্ষে অনুবাদের যোগ্য। সংস্কৃত কাব্যের নিয়মিত বিধিবদ্ধ অনুবাদের প্রয়োজন আমরা দেখি না, যেহেতু আমরা ধরিয়া লই সংস্কৃত কাব্যের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় বাঙালী লেখক ও পাঠকদের আছে। এ বিশ্বাসও কতখানি যাক্তসহ, বলা কঠিন। বাংলা ভাষার বাহিরে অন্য যে কোন ভাষার সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের জন্য আমরা একান্তভাবে নির্ভরশীল ইংরেজি ভাষার ওপর। প্রাচীন গ্রীক-লাতিনই হোক বা আধুনিক জার্মান রুশই হোক, ইংরেজিতে অনুবাদ না থাকিলে আমরা অন্ধ ও মূক, আমরা চোখে দেখিতে পাই না, আমাদের মুখে কথা ফোটে না। ইংরেজি-কাব্যের বিশ্ব-গৌরবের কথা আমরা জানি। কিন্তু, তাহার বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন-বোধ আমাদের নাই। যে বাঙালী ইংরেজি জানে না, সে কি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত ? আর অন্যভাষা হইতে অনুবাদ যদি ইংরেজিতেই পাওয়া যায়, তবে অন্যান্য ভাষা শিখিবার কষ্ট স্বীকারের অনুপ্রেরণা আসিবে কোথা হইতে।

বাঙালী বুদ্ধিজীবীর এই মানসিক পরিস্থিতিতে শ্রীকানাইলাল গাঙ্গুলীর বর্তমান প্রয়াসকে অভিনন্দন মনে জাগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ফাউস্ত-এর অনুবাদ করিতে গিয়া তিনি ইংরেজি অনুবাদের মোহে আবিষ্ট হন নাই। 'ভূমিকা'-য় তিনি লিখিতেছেন :

"জীবনের বিভিন্ন সময়ে জার্মেনীতে বাস করে জার্মান জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের উপর "ফাউস্তে"-র যে কী প্রভাব তা প্রত্যক্ষ করেছি। "ফাউস্ত" জার্মান জাতির শুধু গর্বের বস্তু নয়, প্রাণের বস্তু। এর অর্থ ও রস বিভিন্ন শ্রেণীর লোক কি ভাবে গ্রহণ করে তারও অনুভূতি আমার অনেকটা হয়েছে। আর একাধিকবার জার্মেনীর শ্রেষ্ঠ নট ও নটী কর্তৃক অভিনীত ফাউস্ত প্রথম ভাগের অপূর্ব অভিনয় রঙ্গমঞ্চে দেখে কেবলই ইচ্ছা হত এই অপূর্ব সাহিত্য আমার মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করে বাঙালীর হাতে তুলে দেই, তাই এ চেষ্টা।"

বহু বৎসরের সাভিনিবেশ পরিশ্রমের পর কানাইবাবু প্রকাশ করিয়াছেন এই অনুবাদ-গ্রন্থ। "আমি সব চেয়ে বেশী চেষ্টা করেছি মূল জার্মান ফাউস্তের প্রত্যেকটি অংশের অবিকল ভাব সরল ও রসযুক্ত করে প্রকাশ করতে, অবশ্য খাঁটি বাংলা পদ্ধতিতে। তবে সেই চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক স্থলে অধিক কথার ব্যবহার করতে হয়েছে, অনেক স্থলে আবার অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু ভাব অবিকৃত রেখেছি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হল উচ্চশ্রেণীর বিদেশী সাহিত্য বাঙ্গালায় অনুবাদ করার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।"

এইভাবে ফাউস্ত-অনুবাদের যে দুরূহ সাধনায় কানাইবাবু প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে সিদ্ধির জন্য কেবল জার্মান ভাষাতে দক্ষতা যথেষ্ট নয়, আপন মাতৃভাষার মাধ্যমেও তাঁহার একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে ফাউস্ত প্রথম ভাগের কয়েকটি ছিন্নাংশের ছন্দানুবাদ আছে শেলীর করা। তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে 'স্বর্গে প্রোলোগ' যাহাতে তিনজন প্রধান দেবদূত ঈশ্বরের স্তুতি গাইতেছেন। শেলী এই অংশের একটি লাইন-অনুযায়ী গদ্যানুবাদ করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশিত করিয়াছিলেন: "Such is a literal translation of this astonishing chorus; it is impossible to represent in another language the melody of the versification; even the volatile strength and delicacy of the ideas escape in the crucible of translation, and the reader is surprised to find a *caput mortuum.* এই "মৃতদেহে" প্রাণ সঞ্চারের জন্য শেলী ইহাকে ছন্দোবদ্ধ রূপও দিয়াছিলেন। অনেক আলোচকের মতে, অনুবাদে মূলের যতখানি সমীপবর্তী হওয়া সম্ভব, শেলীর অনুবাদে তাহা হইয়াছিল। এবং পরম পরিতাপের বিষয় যে এই অনুবাদ সম্পূর্ণ না করিয়াই শেলীর জীবনাবসান হয়। বাংলাদেশে জার্মান ভাষায় কানাইবাবুর মতো পণ্ডিত পাঠকের সংখ্যা অতি বিরল। তাই শেলীর অনুবাদের একটি স্তবক এখানে ইংরেজিতে দেওয়া যাইতেছে।

Raphael: "The sun makes music as of old
Amid the rival spheres of Heaven,
On its predestined circle rolled
With thunder speed: the Angels even
Draw strength from glazing on its glance,
Though none its meaning fathom may,—
The world's unwithered countenance
Is bright as at Creation's day."

শেলীর অনুবাদে মূলের ছন্দ-ঝঙ্কার ও ভাবঘনত্ব যতটা প্রকাশ পাইয়াছে কানাইবাবু তাঁহার বাংলা অনুবাদে তাহার কতটা বজায় রাখিতে পারিয়াছেন তাহা দেখা যাক।

রাফাএল : "তারার সভায় আগেরি মতন,
গানের ছন্দে গাহিছে তপন
আর সমাপিছে অশনির বেগে
বিহিত আপন বিশ্বভ্রমণ।
দেখি এ দৃশ্য দেবদূতগণ
হয় বলীয়ান,
না বুঝেও এর নিগূঢ় কারণ
অতি মহীয়ান।
চিন্তায় পার তোমার সৃজন,
যা ছিল আদিতে রয়েছে তেমন
অতি গরীয়ান।"

সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এই অনুবাদে গদ্যের বদলে ছন্দ ব্যবহার করিয়াও কানাইবাবু, শেলীর ভাষায়, মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন কি? তাহা ছাড়া, মূলে আছে, যাহা শেলীর অনুবাদেও আছে, যে রাফাএল, গাব্রিএল ও মিখাইল, ইহাদের প্রত্যেকের উক্তি একই পর্যায়ের মিল-প্রবন্ধে গুবকবদ্ধ। কিন্তু কানাইবাবুর অনুবাদে তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই।

ফাউস্ত-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সম্পূর্ণ অনুবাদের বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা ইংরেজি ভাষায় যে কয়েকজন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বেয়ার্ড টেলর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। অনুবাদক হিসাবে তাঁহার দাবি এই যে ইংরেজি কাব্য সাহিত্যের ভাষা ও ছন্দ এতই সঙ্গতিপন্ন যে ফাউস্ত-এর মতো কঠিন কাব্যকেও ভাবে ভাষায় ছন্দে অবিকলভাবে ও আক্ষরিকভাবে প্রতিবিম্বিত করা মোটেই অসম্ভব নয়। ইহার জন্য প্রয়োজন—অনমনীয় প্রয়াস, যতক্ষণ না লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ফাউস্ত-এর পঞ্চদশ দৃশ্য—যে দৃশ্য গ্যোতে পাঠকদের নিকট একবার পড়ার পরই থাকিয়া যায় অবিস্মরণীয়। এই দৃশ্যে আর কিছুই নাই—আছে মাত্র একটি গান, গাহিতেছেন মার্গারেত একাকিনী, চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে, ফাউস্ত-এর বিচ্ছেদে বিহ্বল অবস্থায়।

"My peace is gone
My heart is sore;

I never shall find it,
Ah, nevermore !

Save I have him near,
The grave is here ;
The world is gall
And bitterness all.

My poor weak head
Is racked and crazed ;
My thought is lost,
My senses mazed,

My peace is gone,
My heart is sore ;
I never shall find it
Ah, nevermore.

To see him, him only,
At the pane I sit ;
To meet him, him only,
The house I quit.

His lofty gait,
His noble size,
The smile of his mouth,
The power of his eyes,

And the magic flow
Of his talk, the bliss
In the clasp of his hand,
And ah ! the kiss !

My peace is gone,
My heart is sore,
I never shall find it
Ah, nevermore !

My bosom yearns
For him alone ;
Ah, dared I clasp him
And hold, and own,

And kiss his mouth,
To heart's desire,
And on his kisses
At last expire !"

কানাইবাবুর অনুবাদ :

"শান্তি আমার বিদায় নিল,
হৃদয় হোল ভার,
শান্তি আমার ফিরবে না তো
ফিরবে না তো আর।

যেথায় সে নাই সবই সেথা
কবর মনে হয়,
সর্বজগৎ সেথায় যেন
তিক্ত হয়ে রয়।"

(পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন, এই স্তবকের মিল-গ্রহন, যাহা বেয়ার্ড টেলর বজায় রাখিয়াছেন, তাহা বাংলা অনুবাদে লঙ্ঘিত হইয়াছে)

"বেদনকাতর আমার মন
পাগল হল প্রায়,
উদাস মনের ভাবনাগুলি
টুকরো হয়ে যায়।

শান্তি আমার বিদায় নিল,
হৃদয় হল ভার ;
শান্তি আমার ফিরবে না তো,
ফিরবে না তো আর।
বাইরে তাকাই জানলা দিয়ে
দেখব তাকে তাই
তাহার মিলন পাবার তরে
ঘরকে ছেড়ে যাই।
তাহার চলন কী যে শোভন,
সুঠাম দেহ তার,
মুখের মধুর মৃদুল হাসি
মোহন দিঠি আর,
সুধার মতন কথার যাদু
কতই যা না খেলে
পুলক হাতের পরশ পেলে
হরষ চুমা খেলে !
শান্তি আমার বিদায় নিল,
হৃদয় হল ভার
শান্তি আমার ফিরবে না তো
ফিরবে না তো আর !
হৃদয় আমার তাহারে চায়
তাহার পানে ধায়
হায় রে তাকে পেতাম যদি
ধরতে এ হিয়ায়,
পারতেম দিতে তাকেই চুমা
যেমন হৃদি চায়,
ডুবিয়ে দিতাম চুমাতে তার
জীবন চেতনায়।"

অকপটে স্বীকার করিতেছি কানাইবাবুর অনুবাদ পড়িয়া বহুকাল পরে মূল জার্মানে এই কবিতাটি পড়িবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। পরে তাহাকে

নূতন করিয়া অনুবাদের লোভকে সংবরণ করা হইয়া উঠিল অদম্য। এই অনবদ্য কবিতাটির একাধিক অনুবাদে দোষ নাই, এই ভরসায় আমার অনুবাদটিও এখানে তুলিয়া দিতেছি। আশা করি, পাঠকেরা অপরাধ লইবেন না।

শান্তি আমায় ছেড়ে গেছে,
মন হয়েছে ভার,
ফিরে সেটি পাবো না ত
পাবো না ত আর।

নাই যেথা পাই তারি খবর
আমার কাছে তা যে কবর
সারা জগৎ তার বিহনে
তিক্ত-কষায় আমার মনে।

আমার পোড়া মাথা যেন
ফেটে হয় চৌচির,
আমার পোড়া বুকটা যেন
রয় না কভু স্থির।

শান্তি আমায় ছেড়ে গেছে
মন হয়েছে ভার
ফিরে সেটি পাবো না ত
পাবো না ত আর।

শুধু তারেই দেখার তরে
থাকি জানালায়,
তারি কাছে যাবার তরে
পথে পা বাড়াই।

তার দৃপ্ত চলার ভঙ্গী
বীরের মতো কায়া,
ঠোঁটের মিষ্ট হাসিটি তার
চোখের মোহন মায়া।

যাদুভরা স্রোতের মতো
তারি মুখের বচন,
শিহর-ভরা হাতের চাপন,
আঃ, তার চুম্বন।

শান্তি আমার ছেড়ে গেছে
মন হয়েছে ভার
ফিরে সেটি পাবো না ত
পাবো না ত আর।

আমার বুক যে ছুটে চলে
কেবল তারি টানে,
যদি তাকে ধরতে পেতাম,
টানতে আমার পানে,

মুখেতে তার চুমো খেতে
যত আমার সাধ,
জ্ঞান হারাতাম তারি চুমায়
পেতে পেতে স্বাদ।

কানাইবাবুর এই অনুবাদ সমগ্রভাবে মূল জার্মানের সহিত মিলাইয়া পড়িবার যোগ্যতা আমার নাই, অবসরেরও অভাব। দক্ষতর ব্যক্তিদের এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া অবশ্যকর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। কারণ, আমি একান্ত মনে বিশ্বাস করি, যাহা ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায়:

"ফাউস্ত-এর প্রথম খণ্ডের এই বাংলা অনুবাদের প্রকাশন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে, তথা জার্মানি ও ভারতের সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ইতিহাসে, একটি স্মরণীয় ঘটনা রূপে পরিগণিত হইবে।"

নীরেন্দ্রনাথ রায়

Tagore and Man. Tagore Centenary Peace Festival, All India Committee, Calcutta. Rs. 2'50.

In Homage To Tagore. T C P F, A. I Committee, Calcutta. Rs. 3'50

শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার, বুঝবার ও মূল্যায়িত করবার চেষ্টা হয়েছে; হয়তো আরো বেশি হওয়া উচিত ছিল, হয়তো বা এই প্রচেষ্টার অনেকখানি আমাদের পৌত্তলিক ও গুরুবাদী ঐতিহ্য অনুসারী। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ও জন্মশতবার্ষিকীর মধ্যে ব্যবধান মাত্র দুই দশকের। মহাপ্রতিভাধর শিল্পী বা মনীষীর তিরোধানের পর কিছুকাল উচ্ছ্বাসময় শ্রদ্ধাঞ্জলিদানোৎসাহ অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্র তিরোধানের পরবর্তী দুটি দশক তাই শ্রদ্ধাঞ্জলির "বিশেষণে সবিশেষ"। শেক্স্পীয়রের মৃত্যুর পর প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ ছিল প্রথম মুদ্রিত শেক্স্পীয়রের সম্পূর্ণ রচনাবলী (প্রথম ফোলিও)। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ শেক্স্পীয়র অপেক্ষা দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর সব কটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে, যদিও রবীন্দ্র-রচনাবলী সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে। বেন জনসন শেক্স্পীয়রের প্রথম ফোলিওর প্রারম্ভে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে বলেছিলেন, "শেক্স্পীয়র কোনো বিশেষ যুগের নন, তিনি সর্বকালের।" রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তি উৎসব কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে রবীন্দ্র-রচনার অংশবিশেষের অনুবাদ এবং সেই অনুবাদসংগ্রহের সহগ ও পরিপূরক হিসাবে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি' নামক গ্রন্থটির পরিবেশন অত্যন্ত কালোপযোগী হয়েছে। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' গ্রন্থটির মধ্যে যে কথাটি বিশেষ-ভাবে উচ্চারিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ দেশবিশেষের নন, তিনি সর্বদেশের। বেন জনসনের উক্তি যেমন শ্রদ্ধাঞ্জলির বিনয়ে মণ্ডিত হলেও অর্থবহ, রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে নানাদেশের খ্যাতনামা শিল্পী ও মনীষীর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি তেমনি অনুষ্ঠান-সম্মত হয়েও অর্থগূঢ়।

একালের আঠারো জন বিজ্ঞানী, লেখক, শিল্পী ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের যে সর্বদেশীয়তা ও সর্বজনীনতার কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন, তাঁর যে আন্তর্দেশিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সংবেদনশীল মানবতাবোধের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে তার সহস্র সহস্র উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে কপিরাইটের বিধিনিষেধের জন্য এই গ্রন্থের

উদ্যোক্তারা আপাতত ক্ষীণকায় অনুবাদসংগ্রহেই নিজেদের উদ্যোগ সীমিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন। তবু এই সংগ্রহের মধ্যেই আমরা রবীন্দ্রনাথের সেই অদ্ভুতবোজ্জ্বল, সাহসবিস্তৃত বিরাট মনোভূমির পরিচয় পাই যার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে ইচ্ছা করে "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির।" রবীন্দ্রমানসের সেই মহাদেশোপম আয়তক্ষেত্র সত্যই বহুজাতির বহু শ্রেষ্ঠ ভাবধারার বিচিত্র সঙ্গম।

'মানুষ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি মূলত আন্তর্জাতিক পাঠকদের জন্য সঙ্কলিত। কিন্তু ভারতীয়দের কাছেও এই গ্রন্থের এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। রবীন্দ্র-দর্পণে যেমন জাতিকে দেখা যায়, তেমনি জাতির দর্পণেও রবীন্দ্রনাথকে দেখা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা নিজেদের অস্তিত্ব আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করে গর্ব অনুভব করি, কিন্তু যখন আমাদের সঙ্কীর্ণ চতুঃসীমার মধ্যে রবীন্দ্র-নাথকে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর হই তখন অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমরা অবিচারও করে বসি। আমাদের একদেশদর্শিতা নানা ভ্রান্তির উৎস হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ দেশী না বিদেশী, খাঁটি না ভেজাল এসব তর্কের মীমাংসাও শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে আমরা নিজেরাই কতখানি দেশী বা বিদেশী, খাঁটি বা ভেজাল তার উপর। চিরকালের কথা জানি না, কিন্তু এখনও বহুকাল রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় থাকবেন এবং সেই কারণে রবীন্দ্র-মনস্কতারও প্রয়োজন থাকবে। ইংরেজ জাতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় যেমন শেক্স্পীয়রে, ভারতবর্ষেরও শ্রেষ্ঠ পরিচয় তেমনি রবীন্দ্রনাথে। আমাদের গর্ব এই যে সেই রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উদার মানবিকতা ও শান্তিকামী আন্তর্জাতিকতারও প্রবক্তা। রবীন্দ্রতর্পণ আমাদের সংস্কৃতিকৃত্যের এক আবশ্যিক অঙ্গ; আর রবীন্দ্রোচ্ছ্বাস আমাদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত। কিন্তু এই উচ্ছ্বাস বিগত দুই দশকে 'মহাকবি' 'ঋষি', 'বিশ্বকবি' ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত কয়েকটি সুগম অথচ অস্পষ্ট বিশেষণের মধ্যেই অর্গলিত থেকেছে। কখনও বা এই পরম নিশ্চিন্তির বিপরীত প্রান্তে চমকপ্রদ রবীন্দ্র-দূষণ প্রয়োগে আমরা বাহবা কুড়াতে প্রয়াসী হয়েছি। ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর হয়তো নানা পরিবর্তন ঘটবে, ঘটা অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সে পরিবর্তন আমাদেরই নানা পালাবদলের সূচক হবে, কোনো পণ্ডিতম্মন্যতা বা মূঢ় আত্মম্ভরিতা থেকে উৎসারিত হবে না। ভাবীকালের সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করতে পারবেন না, নূতনভাবে ব্যাখ্যা করবেন মাত্র।

মূলকালসম্মত সেই রবীন্দ্রনাথকেও রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই প্রমাণিত করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে আমরা যে আত্মপরিচয় লাভ করি এবং করব তার মূল্য সহজে হ্রাস পাবার নয়। অনেক সময় ঘর থেকে দেখা এবং বাইরে থেকে দেখা এই দুটিকে একত্র না মেলালে দেখাটা খণ্ডিত থেকে যায়। সেইজন্য বিদেশীর চোখের রবীন্দ্রনাথকে দেখারও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' গ্রন্থটি ঘর থেকে দেখা রবীন্দ্রনাথকে বাইরে থেকে দেখা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার পক্ষে খুবই সহায়ক হবে। 'রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়টে', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আমরা', 'চিত্রশিল্পীর দর্শন', 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সুলিখিত এবং মননশীলতায় ভাস্বর। মানুষের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস, শান্তি ও মৈত্রীতে অবিচলিত আস্থা রবীন্দ্রচরিত্রের অপরূপ বৈশিষ্ট্য। বিদেশী লেখক ও মনীষীবৃন্দ মূলত এই বৈশিষ্ট্যকেই তাঁদের শ্রদ্ধানিবেদনের মধ্যে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পরিচয় অবশ্যই আরও ব্যাপক, কিন্তু বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ এখনও স্বল্প ও দুর্লভ বলে রবীন্দ্রনাথের নানা দিক বিশ্বের কাছে অনেকখানি অপরিজ্ঞাত। শতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তি উৎসব কমিটির এই অনুবাদ-প্রচেষ্টা এই কারণে বিশেষ প্রশংসার্হ।

সরোজ আচার্য

সুন্দরবন। শিবশঙ্কর মিত্র। কথাশিল্প। সাড়ে তিন টাকা।

শিবশঙ্কর মিত্রের প্রথম বইটির নাম ছিল 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার', এবারে শুধু 'সুন্দরবন'। এই বইয়ে সুন্দরবনের অতি সাধারণ ও অতি দুর্ধর্ষ জনকুড়ি মানুষকে নয়টি গল্পের মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়েছে। এই মানুষগুলো যতক্ষণ তাদের জীবিকানির্বাহের পরিবৃত্তে, ততক্ষণ শোষণে ও বঞ্চনায় এবং দরিদ্রতম উপকরণের সাহায্যে জীবনধারণের দুরূহতম প্রচেষ্টায় তাঁরা বাংলাদেশের গ্রাম-জীবনেরই অঙ্গীভূত। কিন্তু যেহেতু মানুষগুলো সুন্দরবনের, অতএব জীবিকার তাগিদেই তাদের সুন্দরবনের গহনে যাতায়াত। এই সূত্রেই সুন্দরবনের বাঘের সঙ্গেও তাদের পরিচয়। আর বাঘ ও মানুষের সাক্ষাৎকার কোনো ক্ষেত্রেই সৌজন্যমূলক হবার নয়। সেক্ষেত্রে হয় বাঘকে কিংবা

মানুষকে প্রাণ দিতেই হয়। 'সুন্দরবন' এই প্রাণ-হননেরই গল্প। কিন্তু শুধু যদি তাই হতো তাহলে মামুলী শিকার-কাহিনীর বেশি মর্যাদা এই বইয়ের প্রাপ্য ছিল না। সুন্দরবনের জীবন ও সুন্দরবনের ভূ-দৃশ্য আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে প্রত্যেকটি গল্পে সন্নিবেশিত। এবং লেখকের পক্ষে সবচেয়ে কৃতিত্বের কথা এই যে এই জীবন ও ভূ-দৃশ্যের বর্ণনায় এই নয়টি গল্পে কোথাও পুনরুক্তি ঘটেনি। এই কারণেই নয়টি পৃথক গল্প যেন একটি উপন্যাসেরই নয়টি অধ্যায় হয়ে উঠেছে। আর সুন্দরবনের সবচেয়ে হিংস্র ও সবচেয়ে সুন্দর যে জীব, সেই বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার-ই যেন এই উপন্যাসের নায়ক। ছোট-বড় সকলেরই এই বইটি ভালো লাগবে। সুন্দরবনের এমন নিবিড় ও অন্তরঙ্গ ছবি বাংলাসাহিত্যে অতুলনীয়। আর এমন রুদ্ধশ্বাস গল্পের আস্বাদ পাওয়াটাও বিরল এক অভিজ্ঞতা।

তবে এই বইয়ের অধিকাংশ গল্পেই একটি কি দুটি মৃত্যুর ঘটনা এসেছে। এতগুলো মৃত্যু ঠিক যেন সহ্য করা যায় না। 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার'-এ কিন্তু এই বুকচাপা বিষণ্ণতা ছিল না। বিশেষ করে কিশোর পাঠকদের এতগুলো মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের এমন মর্মভেদী কান্না ও দীর্ঘশ্বাসের সামনে উপস্থিত করা সঙ্গত কিনা লেখক ভেবে দেখবেন।

অমল দাশগুপ্ত

পা ঠ ক গো ষ্ঠী

পরিচয় সম্পাদক সমীপেষু,

গত ফাল্গুন ১৩৬৮ সংখ্যায় শ্রীগোপাল হালদার কয়েকটি উক্তি করেছেন তারই সম্পর্কে এই চিঠি। অনুগ্রহপূর্বক চিঠিটি আপনাদের আগামী সংখ্যায় ছাপালে বাধিত হবো।

১। শ্রীগোপাল হালদার বলেছেন,—'শম্ভু মিত্র রাজনীতি ছাড়া কিছুই করেন না, একথা তিনি এবং সকলেই স্বীকার করবেন।'

যে-কেউ আমার বিশ বছরের ইতিহাস জানেন তাঁদের পক্ষে এ ভুল অস্বাভাবিক। আমি আমার কিশোর বয়স থেকেই থিয়েটার ভালোবেসেছি, এবং যা কিছু করেছি সব থিয়েটারের জন্যই করেছি।

২। আমি কোনও নির্বাচনী প্রচারকার্যে করতে যাই নি। আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম একটি সাংস্কৃতিক সভায় যাওয়ার জন্য। এর বেশী কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না, কারণ—

৩। যদি আমি যেতামই কোনও নির্বাচনী সভায়, এবং যদি কোনও ব্যক্তিবিশেষকে আমার ভালো বলেই মনে হোত, তাতে কী হোত? গোপালদার পক্ষে গেলেই কি আমি মহৎ শিল্পী হতাম? আর না গেলেই কি আমার সংস্কৃতি বিকৃত? মহৎ শিল্পী হবার পথ তো তাহলে বড়ো সোজাই হোত! এবং গোপালদা যদি ভবিষ্যতে কোনওদিন মন্ত্রী হন তাহলে তখন তাঁকে সমর্থন করায় মন্ত্রীনীতি হবে না তো? ভারতের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক লোকের মৌলিক অধিকার আছে যে-কোনও প্রার্থীকে সমর্থন করার। সেইটাই ডিমোক্র্যাসীর অধিকার। এবং সেইজন্য যদি আমি যেতামই কোনও নির্বাচনী সভায় তাহলেও কোনও দৈনিক বা মাসিক পত্রিকার পক্ষে অশালীন হবার কোনও যুক্তি ঘটে না।

৪। গোপালদা ঠিক লিখেছেন, আমি কুড়ি বছর থেকে খালি দেখেই দেখছি।

(ক) প্রথম দেখা গোপালদাদের গণনাট্যসংঘ। যেখানে কাজ করতে পারলাম না। খালি আমি নয়, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যও।

(খ) দ্বিতীয় দেখা, বহুরূপী সংগঠন থেকে 'পথিক' ক'রে, 'চার অধ্যায়'

ক'রে, 'দশচক্র' ক'রে গোপালদার দলভুক্ত প্রগতিবাদীদের কাছে প্রত্যেকবার প্রভূত গালাগালি খেয়েছি।

(গ) তৃতীয় কেস, আমাদের 'রক্তকরবী' অভিনয় নিয়ে যখন সমাজের একটা অংশে অত্যন্ত উত্তেজনা, এবং আমাদের অভিনয় বন্ধ ক'রে দেবার জন্য যখন অনেক চেষ্টা চলেছে তখন গোপালদার দলীয় দৈনিক কাগজ একটি কথাও আমাদের পক্ষে বলে নি। অথচ অত্যন্ত সম্প্রতি আমার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদপূর্ণ চিঠি ছাপাতে পেরেছে যে আমি নাকি 'বিসর্জন' অভিনয়ে আমার নিজের লেখা সংযোজনা করেছি। আনন্দবাজারেরও আগে স্বাধীনতা কাগজ এই শুভকর্মের সূচনা করে।

(ঘ) এবং চতুর্থ ও সবচেয়ে বড়ো কেস হচ্ছেন গোপালদা নিজে। তাঁর নিজের কাগজে—পরিচয়ে—এরই আগের সংখ্যায় আমাদের সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি করা হয়েছিল[১] সেটার তিনি কিছু করতে পারলেন না, পারলেন কেবল রাস্তার রকের ছেলেদের মতো দায়িত্বহীন টিপ্পনি কাটতে?

অথচ কেন? আমি যদি বাজে লোকই হই তাহ'লে আর আমাকে এতো খোঁচাখুঁচি কেন? কুড়ি বছর তো অনেক বছর, এবার শীগগিরই তো শেষ

১। "আমাদের" বলতে শ্রীশম্ভু মিত্র কি বুঝিয়েছেন জানি না। তবে আগের সংখ্যায় 'বহুরূপী' সম্পর্কে কোনো মন্তব্যই প্রকাশিত হয় নি। এমনকি তার আগের সংখ্যায়ও নয়। অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ 'সংস্কৃতি-সংবাদ' বিভাগে 'নাট্যপ্রসঙ্গ' শিরোনামায় যে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে প্রসঙ্গত লেখক 'বহুরূপী', শ্রীশম্ভু মিত্র ও শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের নাম উল্লেখ করে যে মন্তব্য করেন, পাঠকদের সুবিধার্থে সেই অংশটুকু আমরা পুনর্মুদ্রিত করছি। এ মন্তব্যই সম্ভবত ওঁদের সম্পর্কে, কিন্তু তা 'বিদ্বেষপ্রসূত' কিনা পাঠকরা সে বিচার করবেন। প্রসঙ্গত জানানো দরকার বর্তমান চিঠিতে উল্লেখ ছাড়া সেই আলোচনার প্রতিবাদে অন্য কোনো পত্র বা আলোচনা আমরা এ-যাবৎ পাই নি।

"শুধু নাট্যপরিবেশন নয়, দর্শকদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন তথা দর্শক রুচি গড়ে তোলার পেছনে লিটল থিয়েটার গ্রুপের এ জাতীয় প্রয়াস অকুণ্ঠ অভিনন্দনযোগ্য। নবনাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে ক্রমশই তাঁরা এক গৌরবময় ভূমিকার অধিকারী হচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর কথা মনে পড়ে। এই দলটির কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। বাংলা দেশের গণনাট্য আন্দোলন ও সাম্প্রতিক নবনাট্য আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে এঁদের ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত ভূমিকাও স্মরণ করি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে 'বহুরূপী' জীবিত থেকেও যেন নেই। শম্ভু মিত্র মহাশয় তিনবর্ষী চলচ্চিত্র নির্মাণ করে, তৃপ্তি মিত্র পেশাদারী নাটকে অভিনয় করে এবং 'বহুরূপী'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু গুণী ব্যক্তি একে একে দল ছেড়ে হয়তো এই নাট্যপ্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বল করে ফেলেছেন। কচিৎ দু-একটি অভিনয়, তাও পুরনো নাটকের অভিনয় মারফৎ মাঝে মাঝে নিউ এম্পায়ার হলে 'বহুরূপী' নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ছোট-বড় বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁদের আদর্শ ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিপুল আবেগে যখন দেশে এক নবনাট্য আন্দোলনে ক্রমঅগ্রসরমান, তখন 'বহুরূপী'র প্রয়াসও সেই আন্দোলনের

হবে, আর কেন? আর যদি আমার মধ্যে কোনও পদার্থ থেকে থাকে তাহলে একটু জিজ্ঞাসা করা যেত, একটু আলোচনা ক'রে নেওয়া যেত, এবং এতদিন ধ'রে নির্বিচারে আমার সম্পর্কে যতো অশ্রদ্ধেয় উক্তি করা হয়েছে সেগুলোকে রোধ করাও যেত। তা না ক'রে এতো সহজে মানুষকে বিচার করা হয় কেন? অতি সরলীকৃত দরমূল্য দিয়ে মানুষকে বিচার করবার ঔদ্ধত্য থাকে অল্পবয়সীদের। গোপালদার বয়স কি তার চেয়ে বেশী হয় নি?

আরও আশ্চর্য রকম হাস্যকর মনে হয় যখন এইসব দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথের নাম গদগদকণ্ঠে উচ্চারণ করা হয়। কারণ মাত্র কয়েক বৎসর আগে পরিচয়ে বা অন্যত্র রবীন্দ্রনাথের নামে কী বলা হয়েছে আর কী হয় নি। আজ হাওয়া পাল্টেছে। কিন্তু তাই ব'লে আমার মতো সামান্য ব্যক্তিকে গালি দিতে গিয়ে অতো বড়ো নামটাকে টেনে আনবার কী দরকার? আমার ত্রুটির তো শেষ নেই, আমাকে এমনিই গালি দেওয়া যায়।

অনেক মোহ ভেঙে যাওয়ার দাম দিয়ে তবেই জীবনে জানকে পেতে হয়। আমারও চারপাশে সেই রকম অজস্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভগ্নমূর্তি। তার মধ্যে গোপালদার মূর্তিও এমন ক'রে ভেঙে পড়বে এটা কেন যেন আশা করি নি। ইতি—

২৭।৩।৬২ শম্ভু মিত্র

পুনশ্চঃ—আশা করি, চিঠিটা সম্পূর্ণ ছাপিয়ে গালাগালি দেবেন।

[শ্রীশম্ভু মিত্রের উপলব্ধির সম্পূর্ণ পরিচয় যাতে পাঠকবর্গ পেতে পারেন তার জন্ত এই পত্র আমরা যথাযথ প্রকাশ করলাম। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন—সম্পাদক।]

সঙ্গে যুক্ত হবে, আমরা সেই আশা রাখি। কারণ প্রথমাবধি যত সীমাবদ্ধতাই থাক, 'বহুরূপী' ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা যদি-এই আন্দোলনের সহযাত্রী হন তাহলে এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে অনেক শক্তিশালী হবে।

খুবই আনন্দের বিষয় যে দীর্ঘদিন বাদে আবার এই সম্প্রদায় সম্প্রতি একটি নতুন নাটক, 'বিসর্জন', মঞ্চস্থ করেছেন। 'পরিচয়' 'বহুরূপী'র পুরনো বন্ধু। তাই 'বহুরূপী'র প্রতিটি উদ্যোগ আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করি। 'বিসর্জন' দেখার সুযোগ আমরা এখনও অর্জন করি নি। তাই সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা সম্ভব হল না। আমরা ভরসা রাখি 'মুক্তধারা'র মতো এই নাটকটি 'কাঞ্চনরঙ্গ'র বন্যায় তলিয়ে যাবে না। বরং 'বিসর্জন' 'বহুরূপী'র জীবনে নতুন প্রতিষ্ঠা এনে দেবে। বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা রূপে এঁরা সর্বতোমুখী প্রচেষ্টায় নবনাট্য আন্দোলনকে, নিজেদেরও অগ্রসর করতে তৎপর হবেন।"

মাঘ সংখ্যা 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে 'কাঞ্চনরঙ্গ' গ্রন্থটির যে আলোচনা ছিল—শ্রীশম্ভু মিত্র নিশ্চয়ই সেটি সম্পর্কে ইঙ্গিত করেন নি। —সম্পাদক

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

সুনয়নী দেবীর জীবনাবসান হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির কন্যা সুনয়নী দেবী আবাল্য এক বিশেষ রুচি ও বৈদগ্ধ্যের পরিমণ্ডলে দিন কাটিয়েছেন। তাঁর চিত্রশিল্পের প্রেরণা তৎকালীন বঙ্গদেশ, ঠাকুরপরিবার এবং আপন চিত্ত-স্বভাবে নিহিত। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের সাহচর্য সত্ত্বেও সুনয়নী দেবীর অঙ্কন-শৈলীর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যে ইতিহাসেরই এক অভিপ্রায় প্রকাশিত। শিল্প-সমালোচকদের চোখেও সেই স্বাতন্ত্র্য ধরা না পড়ে পারে নি। সুনয়নী দেবী অনেকটাই 'স্বভাব শিল্পী' ছিলেন। তদুপরি পূজা-পার্বণ-ব্রতকথার সহজাত আকর্ষণ ও অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পকর্মে লোকচিত্রের মোটিফ এনেছে। শিল্পগত ভাবৎ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই একটি কারণে তিনি নমস্যা।

স্বক্ষেত্রে স্বনামধন্য ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। জাগতিক নানা বিষয় ও ঘটনায় কৌতূহল এবং এক উদার-মানবিক-বিজ্ঞান-দৃষ্টি তাঁর ব্যক্তিত্বে অনন্যতা এনেছিল। বিজ্ঞানের গবেষণায় সামাজিক ও মানবিক প্রয়োগে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন, রাজনীতিক মতামতে ছিলেন নির্ভীক প্রগতিবাদী। পার্কসার্কাস ময়দানে রবীন্দ্রমেলায় আলোচনাচক্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা লক্ষ মানুষের স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে। আকস্মিক এই বিয়োগ সংবাদে তাই আমাদের বিস্ময় ও বেদনার অন্ত নেই। তাঁর কাছে এখনো দেশের অনেক কিছু প্রত্যাশা ছিল।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহোদয় সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থ রচনার জন্ত ১৯৬১ সালের আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেছেন।

ডক্টর দাশগুপ্ত বাংলাদেশের এক অগ্রগণ্য পণ্ডিত ও গবেষকরূপে বহুপূর্বেই খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর 'অবস্কিওর রীলিজিয়স কাল্ট এ্যাণ্ড ব্যাক-

গ্রাউণ্ড অব বেঙ্গলী লিটারেচার' গ্রন্থ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এক অতি উল্লেখযোগ্য অবদান। তাছাড়া সাহিত্য ও সমালোচনা বিষয়ে তাঁর বহুবিধ গ্রন্থ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিরলস শ্রম ও মননশীলতার সাক্ষ্য। দৃষ্টিভঙ্গী বা বক্তব্য বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে মতৈক্য না হলেও ডক্টর দাশগুপ্তের রচনা সর্বদাই আমাদের তথা দেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, মনোযোগ আকর্ষণ করে। দেখা যাচ্ছে সাহিত্য পুরস্কারও যোগ্য লোকে পায়, হয়তো এক-আধ সময়ে।

এক মধুর ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব দাশগুপ্ত মহাশয়কে নিছক এ্যাকাডেমিশিয়ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। ভাববাদী দর্শনের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও ডক্টর দাশগুপ্তের বিশেষ মানসিকতা তাঁর সর্ববিধ গবেষণাকর্মে এক ধরনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিয়েছে। এই উভয়বিধ গুণ তথা সরস অনুসন্ধিৎসা তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত।

এরই প্রেরণায় মুখ্যত গবেষক ও প্রাবন্ধিক হওয়া সত্ত্বেও দাশগুপ্ত মহাশয় সৃজনধর্মী মৌলিক রচনা সৃষ্টিতেও অগ্রসর হয়েছেন। শিশুসাহিত্যেও তাঁর অবদান আছে।

সর্বোপরি অধ্যাপক হিসেবে তাঁর সাফল্যের প্রমাণ দেশের অনেকানেক গুণীজনের বিবিধ সার্থকতায় প্রতিফলিত। আমরা আশা করব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপযুক্ত পাঠ্যক্রম নির্ধারণ; যোগ্য শিক্ষণ ব্যবস্থা; শিক্ষার মাধ্যম ও সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির কর্মক্ষেত্রে বাংলাভাষার মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি তাঁর অধ্যাপকজীবনকালেই ঘটবে। এবং সেই দিনকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে দেশবাসীর সঙ্গে সর্বদাই তিনি একাত্ম থাকবেন। কারণ যে প্রেরণা ও মমতায় তাঁর সাহিত্যিক এবং অধ্যাপক জীবন—তারই পরিণাম এই একান্ত আত্মীয়তা।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' ১৯৬১ সালের শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে। এই অসামান্য চলচ্চিত্রটি কিছু-কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায়ের এক কীর্তি বিশেষ। ভারতবর্ষের ফীচার ফিল্মের ইতিহাসে 'পথের পাঁচালী' যে বিস্ময় নিয়ে এসেছিল, এতদ্দেশীয় ডক্যুমেণ্টারী ফিল্মের ক্ষেত্রেও 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রায় অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছে। চিত্রনাট্য-পরিচালনা-সুরসৃষ্টি ও প্রয়োগ তথা সর্বক্ষেত্রে সত্যজিতের অপরিসীম কল্পনা, কুশলতা, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখেছি। ইংরেজি

সংস্করণে পরিচালকের স্বকণ্ঠে ধারাবিবরণী শোনার সুযোগও এক অভিজ্ঞতা। পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পীর জীবনভিত্তিক তথ্যচিত্র দেখার সুযোগ সত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধা নেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছবির ব্যবহার এবং আবহসঙ্গীতরূপে আদিম রণবাদ্যের মৃদু প্রক্ষেপণ যে পরিবেশ সৃষ্টি করে, শিল্পীর মর্মলোকের যে পরিচয় দেয়—তার তুলনা নেই। বইটিতে এই ধরনের অসামান্য অংশ যত্রতত্র আছে।

'ভগিনী নিবেদিতা' পূর্ণ দৈর্ঘ্যের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে।

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'তিনকন্যা'র অন্যতম 'সমাপ্তি' আঞ্চলিক পুরস্কার পেয়েছে। 'তিনকন্যা'র তিনটি কাহিনীচিত্রের মধ্যে নিঃসন্দেহে 'সমাপ্তি'ই দর্শনযোগ্য। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিনেতা জীবনের সাফল্য লাভ করেছেন এইখানে। অপর্ণা দাশগুপ্তের অভিনয়ও স্মরণীয়, যদিচ 'পথের পাঁচালী'র দুর্গার আদলটি ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। অবশ্য সেটি দোষেরই হোক, গুণেরই হোক—সে দায়িত্ব স্বয়ং পরিচালকের। কারণ 'সমাপ্তি'র অনেক অংশেই 'পথের পাঁচালী'র অবিস্মরণীয় স্মৃতি বারে বারে জেগে উঠেছে। 'তিনকন্যা' দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছে সত্যজিৎ দর্শকের কাছে পৌঁছবার জন্য এক নতুন ভাষা খুঁজছেন—যা আপাতদৃষ্টিতে সরল, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই ভাষা তো তাঁর অনায়ত্ত নয়! 'পথের পাঁচালী'র পরিচালক 'তিন কন্যা'য় কেন দ্বিধাগ্রস্ত ও 'পথসন্ধানী', এ-ও এক রহস্য। জনপ্রিয় রুচির কাছে তাঁর তুল্য ব্যক্তিত্ব ক্ষণেকের তরেও নতি স্বীকার করবেন—এ-কথা ভাবার দুঃসাহস নেই, অথচ 'সমাপ্তি'র মতো সুন্দর একটি ছবির শেষ এ-রকম একটি দরজা বন্ধ করা স্থূল দৃশ্যে কেন সমাপ্ত হলো—তারও অন্য কোনো কারণ খুঁজে পাই নি। সত্যজিৎ আমাদের গৌরব, আমাদের আত্মীয়। দেশবাসী ও শিল্প-অনুরাগী হিসেবে তাঁর কাছে আমাদের অপরিসীম প্রত্যাশা। পরবর্তী ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'অভিযান' সম্পর্কে তাই আমাদের অদম্য আগ্রহ। আশা করব নতুন বিষয় ও পরিবেশে তিনি এক নবতর সার্থকতার উদাহরণ বহন করে আনবেন।

সর্বভারতীয় সার্টিফিকেট অব মেরিট পেয়েছে আরও দুটি বাংলা ছবি—

'পুনশ্চ' ও 'সপ্তপদী'। বাংলাদেশে নব্য চলচ্চিত্রের আন্দোলনে মৃণাল সেন একটি অগ্রগণ্য নাম। প্রথমাবধি অন্যতম তাত্ত্বিক ও সংগঠকরূপে তিনি এই প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত—যে-প্রয়াস একশ্রেণীর দর্শক ও পরিচালক মহলে 'পথের পাঁচালী'র পটভূমি সৃষ্টি করেছিল। তারপর পরিচালক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব। 'নীল আকাশের নীচে' তাঁকে জনপ্রিয়তা দিয়েছিল, 'পুনশ্চ' দিল সম্মান। মৃণাল সেনকে তাই আমাদের অভিনন্দন। সত্যজিৎ রায় ও তিনি 'পরিচয়'-এর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। তাই তাঁদের সম্মানে আমরাও গর্বিত।

পরন্তু, 'সপ্তপদী' সর্বাধিক জনপ্রিয় সাহিত্যিক তারাশঙ্কর রচিত সর্বাধিক জনপ্রিয় অভিনেতা উত্তমকুমার প্রযোজিত, সর্বাধিক জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন অভিনীত একটি সর্বাধিক জনপ্রিয় চলচ্চিত্র যা সর্বাধিক সম্মান রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ না করায় আমরা সর্বাধিক পরিমাণেই 'বিমূঢ়'।

শ্রেষ্ঠ শিশুচলচ্চিত্রের পুরস্কার প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক পেয়েছে 'হট্টগোল বিজয়'। একটি রূপকথা অবলম্বনে কুড়ি মিনিটের এই রঙীন পাপেট ছবিটি বাংলা ও হিন্দি ভাষায় তোলা হয়েছে। হিন্দি সংস্করণটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে।

বুলু দাশগুপ্ত ও রঘুনাথ গোস্বামী এই শিশুচিত্রের যুগ্ম পরিচালক। বুলু দাশগুপ্ত একজন সুদক্ষ আলোকচিত্রী। রঘুনাথ গোস্বামী তরুণ ও প্রতিষ্ঠিত কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। ইতিপূর্বে পুতুলনাচের প্রদর্শন ও এতৎবিষয়ে বিভিন্ন প্রয়াসের জন্য রঘুনাথ গোস্বামী দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশের শিশুচলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গেও তিনি যুক্ত।

আমাদের দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও দর্শনের উভয়বিধ ক্ষেত্রে একদা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, শিশু-চলচ্চিত্রের উৎসবও সেই একই দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছেন। এঁদের এই তাৎপর্যময় উদ্যোগকে আমরা অভিনন্দন জানাই। গত শিশুচলচ্চিত্র উৎসবে গণতান্ত্রিক জার্মানীর বেশ কয়েকটি হ্রস্ব ও পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পাপেট চিত্র দেখানো হয়েছে। পীপলস সীনে সোসাইটি যদিও তাঁদের ঘোষিত বিশেষ কর্মপ্রয়াসের প্রায় কিছুই কাজে পরিণত করতে পারেন নি, তথাপি মাস দুই আগে অনুষ্ঠিত তাঁদের শেষ প্রদর্শনীতে পূর্ব জার্মানীর একটি রঙীন পূর্ণ দৈর্ঘ্যের পাপেট চিত্র দেখিয়ে তাঁরাও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আজকাল বাংলাদেশে

অনেকগুলি অপেশাদার তরুণ চলচ্চিত্র-ইউনিটের নাম শোনা যাচ্ছে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কাজেও তাঁরা হাত দিয়েছেন। এঁরা এবং ফিল্ম সোসাইটিগুলি শিশুচলচ্চিত্র উৎসব সমিতির সঙ্গে একযোগে যদি শিশুচিত্র বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হন তাহলে দেশবাসী কৃতজ্ঞ হবেন।

এই প্রসঙ্গে 'বীরসা এ্যাণ্ড দি ম্যাজিক ডল' নামে সেই অসামান্য ছবিটির কথা মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। অবশ্য দ্বিতীয় ছবিটি কোনো কোনো অংশে লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং সামগ্রিকভাবে ভারসাম্যহীন, তবু পরিচালকের অসীম কল্পনাশক্তি ও পরিচালননৈপুণ্যের সাক্ষ্যবহ। তারপর 'মানিক'। অবশ্য চলচ্চিত্র পরিচালনায় শম্ভু মিত্র বরাবরই নিতান্ত মাঝারি বা অসার্থক। সুতরাং এ প্রসঙ্গে 'মানিক'-এর মতো অভাবনীয়রূপে ব্যর্থ ছবির উল্লেখ না করাই বোধহয় সঙ্গত।

রেনেসাঁস ফিল্ম নামে একটি নতুন ইউনিট 'ঢেউ-এর পরে ঢেউ' তুলেছেন। এটি অচিরে মুক্তিলাভ করবে। যুগ্ম পরিচালক ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল ও যতীশ গুহঠাকুরতা। সান্যাল মহাশয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রশিল্পী ও গুণীজন। 'বীরসা এ্যাণ্ড দি ম্যাজিক ডল' ইউনিটের কেউ কেউও নাকি রেনেসাঁস ফিল্ম-এর বর্তমান প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত। সুর দিয়েছেন রবিশঙ্কর। সম্পূর্ণ নতুন কয়েকটি শিশু অভিনেতা-অভিনেত্রী এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। এই চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে দেশবাসীর মতো আমরাও আগ্রহী।

শিশু-কিশোর উপযোগী চলচ্চিত্রের এই সামগ্রিক পটভূমিতেই মনে প্রশ্ন জাগে 'পথের পাঁচালী'র দেশে 'হোয়াইট স্ট্যালিয়ন'-এর মতো চিত্র কবে উঠবে ?- কবে পাপেট ফিল্ম নির্মাণে আমরা পরিমাণ ও গুণগত দিকে বিদেশের সঙ্গে এক মাটিতে দাঁড়াতে পারব ? সেই দিনও যে সমাগত তার লক্ষণ মেলে 'হট্টগোল বিজয়'-এর মতো নবীন ও সৎ উদ্যোগে। তাই তার সাফল্যকে আমরা বারবার অভিনন্দন জানাই। বলাই বাহুল্য বুদু দাশগুপ্ত ও রঘুনাথ গোস্বামীর পরবর্তী প্রয়াস সম্পর্কে আরো অনেকের মতো আমরাও এখন থেকে কৌতূহলী থাকব।

স্বাধীনতার পক্ষে

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা সিকেরাস আজও স্পেনের কারাগৃহে অবরুদ্ধ।

হোসে ওরজ্কো, দিয়েগো রিভেরা এবং ডেভিড আলফেরো সিকেরাস—বিশ্ববন্দিত এই তিন মেক্সিকান শিল্পী মেক্সিকোর আধুনিক শিল্পধারা সম্পর্কে বহিঃপৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এঁদের মধ্যে সিকেরাস তাঁর চারিত্র্য ও ব্যক্তিক ভূমিকার কারণে আজ প্রায় ইতিহাস

তিনশো বছরের পরাধীনতা ও দেড়শো বছরের স্বাধীনতা-সংগ্রাম মেক্সিকোর জাতীয় চরিত্রে এক অপরিসীম বৈশিষ্ট্য এনেছে। ভীলা, জুয়ারেজ এই মুক্তি আন্দোলনের নায়ক, যাঁরা আজ প্রায় কিম্বদন্তীতে পরিণত। এঁদেরই সঙ্গে উচ্চারিত হয় সিকেরাসের নাম। ইওরোপ তাঁর সম্পর্কে বলে "মেক্সিকান ক্যারেকটার"। এইভাবে তাদের শ্রদ্ধা জানায়।

ওরজকো ও দিয়েগো রিভেরার মতো সিকেরাস প্যারিস শহরে চিত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর মেক্সিকোর মহান্ ইতিহাস ও মহৎ জনসাধারণের আবেগকে ছবিতে পরিস্ফুট করার জন্য শুরু হয় তাঁর এক অভিনব ভূমিকা। ১৯২০-র দশকেই চিত্র-ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের বিবিধ শিল্পীকে একত্র করে তিনি একটি 'সিণ্ডিকেট' প্রতিষ্ঠিত করেন। দিয়েগো রিভেরা তার সভ্য হন। ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে চিত্রশিল্পকে মুক্তিদান ও জনমানসের সঙ্গে তার রুচিসম্পন্ন সংযোগসাধন তখন সিকেরাসের লক্ষ্য। পেইন্টিং ও আর্কিটেকচারের মৌলিকশিল্পগুণকে পার্বতী পরমেশ্বরের মতো মেলানোই তাঁর সাধনা। নিজের শিল্পকর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "After repudiating the anti-realistic art of Paris, the intellectual metropolis of that time, we took as the basis of our painting *the figurative object style* which is undoubtedly the foundation of all realistic painting. In the final analysis this led to the growth of national consciousness, *since there is no art of universal significance without national art.*"…(ইটালিকস লেখকের)।

"জনগণের জন্য শিল্প" মেক্সিকোর শিল্পজগতে এই রণধ্বনির অন্যতম প্রবক্তা সিকেরাসকে এই কারণেই ফ্রেস্কো পেইন্টিং-এর দিকে সবিশেষ ঝুঁকতে হলো। এবং "জনগণের জন্য শিল্প" এই ধ্বনি তাঁর কাছে নিছক ফাঁকা কথা ছিল না। শিল্প ও জনগণ—উভয়ের প্রতিই অসীম শ্রদ্ধাবান সিকেরাস তাই তথাকথিত বিশুদ্ধ শিল্পীর অপরিসীম উচকপালেপণা আর তথাকথিত গণবাদী শিল্পীর অপরিসীম শিল্পভাবনাহীনতাকে পরিহার করলেন। ফ্রেস্কো পেইন্টিংয়ের জন্য তাঁকে নব রীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হলো। সিকেরাসের

অনেক চিত্রের প্রতিলিপি দেখে তাই তো আমাদের নানা কারণে প্রখ্যাত স্প্যানিশ শিল্পী গোইয়ার কথা মনে পড়ে। ইতিহাস ও সমকালীন বাস্তবতার প্রতি আনুগত্য আর শিল্পের জটিল গভীর পথে সত্যান্বেষণ—এই তো মহৎ শিল্পীর চারিত্র্য।

শিল্প ও শিল্পীর সমস্তার সমাধান খুঁজতে খুঁজতে সিকেয়রসকে অচিরকালেই দেশের ও জীবনের বিবিধ সমস্তা আক্রমণ করল। বীরের মতো সিকেয়রস সেই ভয়াল অন্ধকারের সামনে দাঁড়ালেন। আর তারই ফলে তাঁলা, দ্যুরারেজের মতো তিনিও এক কিংবদন্তীর নায়ক। তারই ফলে এই আটষট্টি বছরের বৃদ্ধ আজও কারাকক্ষে বন্দী। তারই ফলে নেরুদার কবিতা, পিকাসোর চিত্র বিশ্বজনকে আহ্বান করে—শিল্পী আজ বন্দী, মানবতা আজ লাঞ্ছিত, যারা 'কমিটেড'—এই সংকট মুহূর্তে তারা আপন দায়িত্ব পালন করুক।

আকাদেমির আমন্ত্রণে সিকেয়রস ভারতবর্ষে এসেছিলেন, কলকাতায়ও। ভারত সরকারের কি কিছু করণীয় নেই? সতীশ গুজরাল সিকেয়রসের ছাত্র, তাঁর ও সহশিল্পীদের কি কিছু করণীয় নেই? আমরা, বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা সহজেই শিল্প ও শিল্পীর স্বাধীনতার দাবিতে চিঠি লিখি, বিবৃতি দিই—আমাদেরও কি কিছু করার নেই?

অচিরে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন ও পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব শুরু হবে। সম্মেলন ও উৎসবের সমারোহের মধ্যে একবারও কি আমাদের মনে পড়বে না এক বৃদ্ধ, অক্লান্ত মুক্তি যোদ্ধা, অবিস্মরণীয় শিল্পী কারাকক্ষে লাঞ্ছিত হচ্ছেন? বাঙলা দেশের প্রতিটি সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকা কি একযোগে জাতিসংঘকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে বাধ্য করতে পারেন না? অন্তত যে নৈতিক চাপ এতে সৃষ্টি হবে, দূর দেশে তা-ই হয়তো মুরুব্বীসহ মেক্সিকোর সরকারকে ভীত, অসহায় করতে পারে। সিকেয়রসের কাছেও তা হবে প্রেরণা।

এক অঙ্গে এত রূপ

খেলাধূলা ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতির অঙ্গ হলেও শরীরচর্চা আর কলা-চর্চাকে খানিকটা পৃথক রূপে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। সে কারণে সংস্কৃতি-সংবাদ বিভাগে খেলাধূলা বিষয়ে কলম ধরার সাহস ইতিপূর্বে হয় নি। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে অনায়াসে যা সাজে, আমাকে যে তা মানায় না—এ বিষয়ে মনে কোনো দিনই সংশয় ছিল না।

এমতাবস্থায় আমাদের মতো সাধারণ স্তরের সংস্কৃতিবাদীদের অন্তর দিতে বঙ্গদেশে এক সব্যসাচীর আবির্ভাব, প্রায় সেই বিখ্যাত রোমাঞ্চ সিরিজের মোহন-নায়কের মতোই। ক্রীড়ার সঙ্গে কলা মিলিয়ে তিনি আমাকেও এ বিষয়ে কলম ধরতে সাহসী করেছেন। আর অধিকারীভেদের প্রশ্ন নেই।

প্রদেশ কংগ্রেসপাল রাজনীতিতে পোক্ত, এ-কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সংস্কৃতিও যে তাঁর আসে তার প্রমাণ মিলল সেদিন, গঙ্গাটিকুরি সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যেদিন তাঁকে ভাষণ দান করতে দেখা গেল। তারপরও যেটুকু সন্দেহ ছিল, তা ঘোচালেন সেই প্রায় বটতলার সাহিত্যের তুল্য জনপ্রিয় দৈনিকটি। নির্বাচনের সময় প্রার্থীপরিচিতিতে জানা গেল প্রদেশপাল এক অদ্বিতীয় সাংবাদিক ও সফল সাহিত্যিকও বটেন। "সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক" এবং ছাপার হরফকে বিশ্বাস করার কুসংস্কার আমারও আছে। সুতরাং আর দ্বিধা রইল না।

তারপর দেখা গেল প্রদেশপাল শুধু অদ্বিতীয় রাজনীতিক আর অসামান্য সংবাদ-সাহিত্য-শিল্পীই নন, তিনি যাদু বিদ্যারও কলির অবতার। এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার বিধানচন্দ্র বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও ম্যাজিকে বিশ্বাসী। তাঁর এই বিশ্বাস প্রবল হয়েছে বিহার কংগ্রেসে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশপালের ভানুমতীর খেল দেখে, যার সমাপ্তিতে বাচ্চালোগ ঠিকই তালি বাজিয়েছে। টোটেম ও ট্যাবুর প্রকোপ কেন পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ এক রাজনীতিক মহলে প্রবল, এতদিনে তা বোঝা গেল।

কিন্তু আরও আছে। দুর্ধর্ষ সেবা-দলের অধিপতি দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রদেশপাল এইবার আই. এফ. এ.-র সভাপতি নির্বাচিত হয়ে এতদিনে বৃত্ত সুসম্পূর্ণ করলেন।

মাভৈঃ। আর সংস্কৃতিতে ও ক্রীড়ায় ও রাজনীতিতে ভেদ রইল না। প্রদেশপালের বাঁশরী লীলায় গঙ্গা-যমুনা এক হয়ে গেল। দেশবন্ধুর আসনে কংগ্রেসে, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের আসনে সাংবাদিকতায় ও গোষ্ঠপালের সঙ্গে ক্রীড়াজগতে অধিষ্ঠিত এই যে প্রদেশপাল; এক অঙ্গে এত যাঁর রূপ; হিটলারের মতো বজ্রকঠোর সেই সেবাদল অধিপতি সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণ দিন, গোয়েবল্‌স্-এর মতো প্রচারকুশলী সেই সাংবাদিক চূড়ামণি ক্রীড়াঙ্গনে সভাপতিত্ব করুন, মুসোলিনির মতো দৈব-প্রেরিত পুরুষ রূপে ট্যাবু ও টোটেমে দেশের রাজনৈতিক আকাশ ম্যাজিকে ভরিয়ে দিন।

আমরা হাততালি দিচ্ছি, হাততালি দেব, দিতেই থাকব।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়

বৈশাখ মাসে বর্ধিত কলেবরে নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে

বিশেষভাবে পরিকল্পিত ও সুমুদ্রিত

সম্ভাব্য লেখকসূচী

॥ প্রবন্ধ ॥

সত্যেন বসু। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র। বিষ্ণু দে। সরোজ আচার্য। পুলিনবিহারী সেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সুনীল সেন। নেপাল মজুমদার। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। অশোক রুদ্র। জীবেন্দ্র সিংহরায়। গোপাল হালদার ও আরও অনেকে ॥

॥ কবিতা ॥

অরুণ মিত্র। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। মণীন্দ্র রায়। গোলাম কুদ্দুস। চিত্ত ঘোষ। সিদ্ধেশ্বর সেন। মৃগাঙ্ক রায়। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল। সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। শিবশম্ভু পাল। তুষার চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে ॥

॥ কাব্যনাট্য ॥

রাম বসু

॥ গল্প ॥

সমরেশ বসু। অমল দাশগুপ্ত। সত্য গুপ্ত। দেবেশ রায়। রমেন গঙ্গোপাধ্যায়। চার্লি চ্যাপলিন ও আরও অনেকে ॥

॥ উপন্যাস ॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ রিপোর্তাজ ॥

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ সরস ও ব্যঙ্গ রচনা ॥

হিরণকুমার সান্যাল। সোমনাথ লাহিড়ী

॥ চলচ্চিত্র ॥

'এ্যাসেজ এ্যাণ্ড ডায়ামণ্ড্‌স্' বিষয়ে আলোচনা
মৃণাল সেন

- সত্যজিৎ রায় অঙ্কিত অভিনব প্রচ্ছদ
- খ্যাতনামা শিল্পীদের চিত্রকর্মের প্রতিলিপি

সূচীপত্র

নববর্ষ সংখ্যা

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়

চিত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্কেচ : গোপাল ঘোষ

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

"ইতিহাসের ধিক্কার বহুকালের সুপ্তি মগ্ন এশিয়া মহাদেশের বক্ষেও দিয়েছে আঘাত"; "তামসিকতার বন্দীশালায় শৃঙ্খলে দিয়েছে ঝংকার।" এমন কি তার অনুরণন শুরু হয় নি বাংলা দেশের বন্দীশালার অভ্যন্তরে। সেদিনের সেই অতিথিরও কানে সাত বৎসর ধরে বন্দীশালায় সেই ঝংকার বেজেছে। সেও এসেছিল কবির সৃজন যজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে, দুই চক্ষে নিয়ে এই অস্পষ্ট অনুভূতি—পৌরুষের প্রতিষ্ঠা চাই জন সমূহের জীবনে, দেশ জুড়ে চাই "প্রাণ-উদ্বোধনের যজ্ঞ"—জনশক্তির উদ্বোধন।

কবি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি করবে?" অনুভূতি ছিল অস্পষ্ট, উত্তর দেবার মতো সাহসও ছিল না। দুঃসাহসের পথে চলতে সাহসের অভাব হয় না। কিন্তু সৃজনের পথ কেবল দুঃসাহসের পথ নয়—সৃজনের পথ শান্ত সুদীর্ঘ নিভৃত তপস্যার পথও। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও বাংলা দেশের দুঃসাহসী চিত্ত সে পথের ইঙ্গিত পেয়েছিল কবির নিকটেই:

"শিক্ষিত সমাজ গণসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্বত্র প্রসারিত হইতে পারিবে।" (অভিভাষণ)।

আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ না হলে গণ-সমাজেরও সেই পৌরুষ-অর্জনের পথ নেই। কবির নিকট সেদিন বলবার সাহস হয়নি, চাই দেশ জুড়ে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার সুযোগ। তাই যে পারি যেখানে পারি এক-একটা গ্রাম অঞ্চলের বা শ্রমিক এলেকায় ভার নিয়েই আমরা বসে যাব। কারণ সহায়-সম্বলহীনদের পক্ষে তা হতো হাস্যকর স্পর্ধা। সসংকোচে বলতে হলো,—"জনসমাজের সঙ্গে এক হয়েই কিছু করতে হবে, এইটাই আমরা অনুভব করেছি।" স্নেহ আশীর্বাদ লাভ করেছিল সেই অধ্যাতের অনুভূতি।

চব্বিশ বৎসর পরে কবির সেদিনের শুভাশীর্বাদ স্মরণ করবার একমাত্র সার্থকতা এই যে, কেন এবং কি পরিমাণে সেই সৃজন-মহাযজ্ঞের প্রেরণা সার্থক বা খর্বিত, হয়তো শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের অনুবর্তীদের এবং লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কৃতি আন্দোলনের কর্মীদের সেই অভিজ্ঞতা আজকের এই কর্মযোগের উদ্যোক্তাদের নিকট নিবেদন করা নিরর্থক নয়। রাষ্ট্রিক কর্মের উত্তেজনায় ও মত্ততায় নিশ্চয়ই কিছু না কিছু আত্মবিস্মৃতি আমাদের ঘটেছে; লক্ষ্য অপেক্ষা উপলক্ষ সময়ে সময়ে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেশবাসীর প্রতি আত্মীয়তার অভাব ঘটেনি, এইটে স্বীকার্য। সফলতার

পরিমাণ বুঝে দেখতে চাই, কী পরিমাণে সত্যই এই কর্মযোগের সংকল্প কার্যকর হয়েছে। রাজনৈতিক মত্ততায় স্বদেশী সমাজের উপদেশ ও পাবনা সম্মেলনের আহ্বান কবির দেশবাসী গ্রহণ করে নি—এরূপ ধারণা অবশ্য সাধারণত প্রচলিত। কিন্তু জনসমাজের মধ্যে যদি কর্মপ্রচেষ্টা প্রসারিত না হয়ে থাকে তাহলে দেশ থেকে ইংরেজের শাসন শক্তি বিদায় নিল কেন? জগদ্ব্যাপী মানুষের শৃঙ্খল মোচনের তপস্যা তার একটা প্রধান কারণ, তা সত্য। কিন্তু ভারতবর্ষের তপস্যা মিথ্যা ছিল না, তা-ও সত্য। দেশের মানুষের মন থেকে বৃটিশ শাসনের সুবিস্তৃত মোহ ও সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা দূর হলো কোন মুক্তিমন্ত্রে? সেই অখোদয় যোগের দিনে কবি যার সূচনা দেখেছিলেন, তা দিনের পর দিন প্রসারিত হয়েছিল। দেশের দুর্ভাগ্যে—প্লাবনে দুর্ভিক্ষে; ও উৎসবে পার্বণে, তীর্থে মেলায়, সেবার মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে নিশ্চয়ই কিছু পরিমাণে আপনার করেছে কর্মীরা, রাজশক্তির অপরিমেয় ক্ষমতাকেও সে পরিমাণে করেছে দেশবাসীর চক্ষে নিষ্প্রয়োজন। সহস্র সহস্র গ্রামে কবি-নির্দেশিত 'স্বদেশী সংসদ' ও শত শত 'সম্মিলনী'—যে নামেই হোক—শহর ও গ্রামের জীবনযাত্রাকে সংযুক্ত করেছে, দেশবাসীকে পরস্পরের নিকটে এনেছে। অন্তত বাঙলাদেশে, আমরা জানি, গ্রামে ও শহরে কত সেবাসমিতি, কত ব্যায়ামাগার, কত পল্লীপাঠশালা, পাঠাগার ও নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা করে নামহীন কত মানুষ দেশকে সুস্থ করতে, সচেতন করতে চেয়েছে। মেলাতে প্রদর্শনীতে, পূজায় উৎসবে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নে প্রচার, স্বদেশী গান, কথা, আলোচনায়, বক্তৃতায়, চিত্রে, চার্টে, মূর্তি-রচনায় দেশবাসীর চিত্তকে তারা কত ভাবে স্পর্শ করতে এগিয়ে গিয়েছে। গ্রামের মধ্যে এখানে ওখানে নৈতিক ও সামাজিক আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মীরা আশ্রম স্থাপন করে গ্রামের ভার কিছু-না-কিছু গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি এই বহুমুখী প্রয়াসের সঙ্গে এরূপে চলেছে পল্লী সংগঠনের ব্রত। জেনে হোক না জেনে হোক, স্বদেশী সমাজের আদর্শ দেশের মানুষ এরূপে কিছুটা পালন করেছে বলেই দেশের মানুষও এই কর্মীদেরকে আপনার বলে গ্রহণ করেছে, তাদের পিছনে আপনারাও দাঁড়িয়েছে। আর, তার ফলেই বহুবিস্তৃত পরশাসন একদিন অবাস্তব হয়ে পড়ল। দেশের কর্মীদের এই সাফল্যটুকু স্বীকার্য।

তারপরেই কিন্তু পরিষ্কার করে স্বীকার করতে হবে আমরা, স্বদেশী কর্মীরা,

'স্বদেশী সমাজ'-এর স্বজনমূলক দিকটিকে মূল কর্তব্যরূপে গ্রহণ করতে পারি নি। পারি নি জনগণকে আত্মশক্তিতে আস্থাশীল এবং সকল দিকে উত্তোগী করে তুলতে। তারা পিছনে দাঁড়াতে শিখেছে। আপনার পায়ে দাঁড়াতে পারল না। পারলে, সেই স্বদেশী সমাজই যদি গড়ে উঠত—তা হলে ভারতবর্ষ বিভক্ত হতে পারত না, বাঙালী সমাজ বিখণ্ডিত করা যেত না। আর, আজ যখন স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছি, তখনও স্বাধীন ভারতের রূপ নিশ্চয়ই সকলের সামনে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। অন্তত দেশজোড়া এই নিরক্ষরতা যখন কিছুমাত্র লঘু হয় নি, তখনি শিক্ষার নামে এমন ইমারতী বিলাসে আমরা মাতছি কি করে? আজ যখন Community development রাষ্ট্রেরও সংকল্প, অর্থানুকূল্যও তাতে দুর্লভ নয়, তখন কেন গ্রামবাসী পারে না আপন স্বজন শক্তিকে উজ্জীবিত করতে, কেন আমলাতান্ত্রিক 'দপ্তর' ও 'দস্তর'-এর চক্র ছাড়িয়ে তা পৌঁছয় না গ্রামের প্রাণক্ষেত্রে? সামবায়িক কৃষি ও শিল্পগঠনের সংকল্প কেন শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে আছে? স্বাধীন সমাজ গঠনের কর্তব্যবোধ ও কর্তৃত্ববোধ কেন গ্রামবাসী ও শহরবাসী জনসাধারণের মধ্যে প্রকট হতে পারল না? কোথায় সেই "সাহসবিস্তৃত বক্ষপট"? কোথায় গেল এই স্বাধীনতার যুগে সেদিনের কর্মীরা যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের ভ্রূকুটি ও প্রলোভনে ছিল অটল? আজ কর্মে ও উত্তোগে তাঁদের সেই আত্মনির্ভরতা কোথায়? রাষ্ট্র-স্বাধীনতা যদিবা আমাদের লাভ হয়ে থাকে, সামাজিক চেতনার বিস্তৃত ও সুদৃঢ় বিকাশে তা হয় নি। সর্বাঙ্গীণ আত্মশক্তির গঠনে তা আয়ত্ত হয় নি—সাধারণ মানুষ আপন হিতে, আপন স্বার্থে সচেতন ও উত্তোগী হয়ে ওঠে নি। এই স্বদেশী সমাজের তাই তো প্রাণশক্তিও অপরিস্ফুট। অথচ একথা মিথ্যা নয়—আমরা দেশের কর্মীরা দেশবাসীকে সেবা করতে চেয়েছি। এমন কি, আত্মশক্তির সাধনাও আমরা আমাদের লক্ষ্য করেছিলাম—জনসাধারণকে পৌরুষে প্রতিষ্ঠিত করার আদর্শ মিথ্যা ছিল না। গ্রামেও আমরা পল্লীগঠনের ভার নিয়েছিলাম, শহরেও আমরা শুধুই উত্তেজনায় মেতে থাকি নি। শত সত্ত্বেও এখনো এই কর্মীরা কেউ কেউ গ্রামের কর্মেই আত্মনিয়োগ করে আছেন, এমন কি, একালের 'কল্যাণ-রাষ্ট্র'-র মুখাপেক্ষীও হতে চান না, একথা বলাই যথেষ্ট। অন্তরায় তবে কোথায়? স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের পক্ষে চাই আরও কী?

সৃজনের অন্তরায় : অন্তর্বৈষম্য

"যে-পার যেখানে পার"—এই ছিল কবির শর্ত। আজ অবশ্য বলা যায়, যিনি গ্রামের কাজের ভার নিয়ে বসেন সম্ভবত তাঁর পক্ষে জীবিকোপায় তত দুর্লভ নয়। নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সূত্রে গ্রামে এখন দাঁড়াবার মতো স্থান অনেক সময় পাওয়া যায়। একদিন কিন্তু অনিশ্চয়তার ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েই চাষ-বাস, শিক্ষকতা, চিকিৎসা প্রভৃতি একটা নামমাত্র কিছু সম্বল করেই এদেশের কর্মীকে গ্রামের ভার নিতে চেষ্টা করতে হতো। দুঃসাহসী ছাড়া কেউ তা পারে না। এই দুঃসাহসের প্রয়োজন এখনও শেষ হয়ে যায় নি।

জন-সমাজের মধ্যে আত্মশক্তির উদ্বোধন-চেষ্টা করতে গেলেই দেখা যায় কিছু-না-কিছু লোকের স্বার্থেও তাতে আঘাত পড়ে—সমাজ এমন ভাবেই গঠিত। একদলের অত্যন্ত দুর্দশায় অপর দলের পুষ্টি। মহাজনই হোন, তথাকথিত কৃষিজীবী জমিদার বা জোতদারই হোন, বা হোন স্বাধীন বৃত্তিজীবী উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক—সমাজের অন্তর্বৈষম্যের উপরই তাঁদের প্রতিষ্ঠা। এ সত্যটাও কবি পূর্বেই শুনিয়েছেন :

"সভ্যতা বিনাশের কারণ সন্ধান করলে একটি মাত্র কারণ পাওয়া যায়, সে হচ্ছে মানব সম্বন্ধের বিকৃতি ও ব্যাঘাত। যারা ক্ষমতাশালী ও যারা অক্ষম তাদের মধ্যেকার ব্যবধান প্রশস্ত হয়ে যেখানে সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছে। সেখানে প্রভুর দলে, দাসের দলে—ভোগীর দলে, অভুক্তের দলে—সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করে সমাজ দেহে প্রাণপ্রবাহের সঞ্চরণকে অবরুদ্ধ করেছে, তাতে এক দিকের অতিতুষ্টি এবং অন্য দিকের অতি শীর্ণতার রোগ সৃষ্টি হয়েছে।" (পল্লী সেবা ১৩৩৮ বাং)।

আমাদের সমাজে এই রোগটি আরও জটিল। কারণ, এই বৈষম্য আমাদের সনাতন সামাজিক বিন্যাসের অঙ্গ এবং সকল ধর্মভাবনার সঙ্গে জড়িত। ভারতবর্ষের শ্রমভেদের প্রয়োজন আমরা মিটিয়েছিলাম বর্ণভেদ ও জাতিভেদ পাকা করে। জন্মসূত্রে কাউকে প্রভুর জাতিতে তুলে দিয়েছি কাউকে দাসের জাতিতে বেঁধে রেখেছি। এবং সেই সমাজ-বিন্যাস সম্বন্ধে আরও নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি তারই পরিপোষক মানসিক চেতনা ধারণাকে 'ধর্ম' করে তুলে। কারণ, জন্ম থেকেই এদেশের সমাজে যে কেউ দাস কেউ প্রভু, কেউ শূদ্র কেউ ব্রাহ্মণ, তার কারণ—আমাদের প্রত্যেকের জন্ম জন্মান্তরের 'কর্মফল'। মানুষ যে মানুষ হিসাবেই সমান মর্যাদার অধিকারী, একথা আমাদের সমাজে মোটেই

গ্রাহ্য হতে পারে না। 'অধিকারী ভেদ'ই সনাতন, 'মানুষের অধিকার' নয়। কাজেই এ সমাজে ভদ্রলোক ভদ্রলোক, ছোটলোক ছোটলোক। এরূপ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অন্য সমাজে যদি বা সম্ভব, আমাদের সমাজে তা আরও দুরূহ। কারণ, তা অধর্ম ; তাতে এ জন্ম তো গিয়েছেই, ভাবী জন্মও যাবে।

এরূপ সমাজে শিক্ষা দীক্ষার প্রথম ও মূল কথাটাই তো মানুষকে মানুষ বলে আত্মমর্যাদা দান, মানুষ হিসাবেই আত্মবিশ্বাসে ও আত্মশক্তিতে আস্থা দান—Rights of Man-এর প্রথম চেতনা-সঞ্চার। নিশ্চয়ই তার অর্থ সনাতন সমাজের বিপর্যয়। প্রচলিত শাস্ত্রের বাধা ও প্রচলিত স্বার্থের বাধা একই সূত্রে বাঁধা। দুয়েরই উদ্দেশ্য সমাজের 'স্টেটাস্ কুয়ো' বজায় রাখা, হয়তো বা 'স্টেটাস কুয়ো অ্যান্টিপলাম'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 'মানুষের সাধনা' করলে সমাজ-কর্মীকে ক্ষমতাশালীদের নিকট বাধা পেতে হবে। সমাজের এই অন্তর্বৈষম্য আরও শোচনীয় এই কারণে যে, অনেক দিনের আর্থিক সামাজিক ব্যবস্থায় যাঁরা ক্ষমতাবান তাঁরাই শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ পান ; এমন কি শিষ্টাচার, রুচিনীতির আদর্শে তাঁরাই গ্রামের শীর্ষ স্থানীয়। হয়তো গ্রাম-সংগঠনেরও তাঁরা পক্ষপাতী ; কিন্তু দুই পা অগ্রসর হতে না হতে দেখা যায় তাঁরা প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ালেন। শিক্ষা দীক্ষার যে নিয়মে মানুষের আত্মসম্মানবোধ জাগা অনিবার্য, যে মানবতার আদর্শ দুর্দশা ও অপমানকে বিধিনিয়ম বলে না মেনে পৌরুষের বলে অতিক্রম্য বলে শিক্ষা দেয়—তাকে বাধা দান করাই হয়ে ওঠে সুবিধা ভোগীদের (Privileged section) নিয়ম। 'মানুষের সাধনা' এই পরিবেশে হয়ে ওঠে এই আভ্যন্তরীণ বিরোধের সাধনা—বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।

গ্রাম্যতার বিভ্রান্তি

নিশ্চয়ই এ সাধনার পাথেয় বহুজনের আত্মীয়তাবোধ ; তার সিদ্ধির পথ—জনশিক্ষা। রায়তের অধিকারের কথা বিচার করেও রবীন্দ্রনাথ একদিন মনে করতেন শিক্ষা বিনা জমির অধিকার পেলেও কৃষক সে অধিকার রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু এ-শিক্ষা শুধু পুঁথি পড়ার ক্ষমতা নয় ; এ হচ্ছে 'অধিকার'-বোধের শিক্ষায় অধিকার-অর্জনের শিক্ষা, অধিকার-রক্ষায় শিক্ষা। তার বহুমুখী উপায়ের হিসাব নিতে গিয়ে দেখি—বাইরের জগৎ আমাদের

শহরের জীবনের উপর এসে পড়াতে যেমন আমরা একদিন জেনেছি— এ জীবন মিথ্যা নয়, তেমনি গ্রামের নিকটে এই বৃহৎ জগৎকে পৌঁছে দিলে গ্রামের এই বোধ জাগা অনিবার্য—মানুষ কোন অমৃতের অধিকারী। বাইরের বৃহৎ জগৎ আসে বই পত্র, সংবাদপত্র মারফৎ; আসে অত্যন্ত বাস্তব আধুনিক যানবাহন যোগাযোগে। কিন্তু একেই আমাদের গ্রাম অন্ধকারে পরিবৃত, তার ওপর বাইরের পৃথিবীর এ-স্পর্শ সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত নয়। অজ্ঞতার অবরোধ সৃষ্টি করাই হয়ে ওঠে আমাদের অনেক অকপট গ্রামকর্মীর ও গ্রাম-সংগঠনের সাধনা। গ্রামকে সংগঠন করার অর্থ তাঁরা মনে করেন বাইরের পৃথিবীকে ঠেকিয়ে রাখা। গ্রাম তাঁদের শান্ত করে না, গ্রাম্যতা তাঁদের কবলিত করে—ভারতীয় নামে, সমাজ-জীবনের নামেও তাঁদের পেয়ে বসে গ্রাম্যতার বিভ্রান্তি। এই কঠিন সত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথই আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন :

"আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক তখন কখনো ইচ্ছা করি না যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেই রকমের সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম যা গ্রাম সীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত— বর্তমান যুগের যা প্রকৃতি তার সঙ্গে কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ।··· গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণ তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবিক প্রকৃতির কোনো দিক খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।···আমাদের দেশের গ্রামগুলিও শহরের উচ্ছিষ্ট ও উদ্বৃত্তভোগী না হয়ে মনুষ্যত্বের পূর্ণ সম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক, এই কামনা করি।" (রাশিয়ার চিঠির উপসংহার)।

সভ্যতার সামঞ্জস্য

কথাটা বোঝা দরকার—রবীন্দ্রনাথ অতিকায় শহর ও অতিকায় কলকারখানার বিরোধী ছিলেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস সেরূপ শহর ও কারখানা বিশ্বপ্রকৃতিকে বিনাশ করে, মানব প্রকৃতিকে বিকৃত করে। শহর মাত্রই তাঁর নিকট পরিত্যাজ্য ছিল না, যন্ত্রপাতির প্রয়োগে শিল্পোৎপাদন তাঁর নিকট অগ্রাহ্য ছিল না। এইখানে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সুবিদিত। বরং এই কথাটাই ছিল তাঁর ধারণা "কলি যুগ কলের যুগ"। যুগের এই প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে জীবনযাপন অসম্ভব। যে যুগ যানবাহনে, কর্মের শত বন্ধনে দূর দূরান্তের মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় অনিবার্য করেছে, পরস্পরের

ভৌতিক ও মানসিক যোগাযোগ করে তুলেছে স্বাভাবিক, সে যুগে বিচ্ছিন্ন পল্লীসমাজ স্থায় বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। থাকলে মানুষেরই আত্মপরিচয় তাতে খর্বিত হয়, মানুষেরই আত্মপ্রকাশ তাতে অবরুদ্ধ হয়—মানুষ থাকে আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত।

অথচ একথা সত্য—প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত-সভ্যতার আর্থিকভিত্তি বা 'ইউনিট' ছিল এরূপ বিচ্ছিন্ন, অনেকাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজ (village community)। হয়তো এরূপ গঠনের জোরেই সে সভ্যতা রাজা-রাজ্যের পতনেও ধ্বংস হতো না—সহস্র সহস্র বিচ্ছিন্ন পল্লীতে সচলই থেকে গিয়েছিল। শক হূন কেন, পাঠান-মোগল যে-ই আসুক ; পল্লীসমাজ রক্ষা করেছে তার শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি-সভ্যতা, সৃষ্টি করেছে শিল্প-সাহিত্য। ভারত জীবনের এই সত্য কবি রবীন্দ্রনাথের ধ্যাননেত্রেও জাগরূক ছিল। আর তাঁর মতো রঙে রেখায় কল্পনোজ্জ্বল করে এ চিত্রকে আর কেউ আমাদের নিকট সত্য করে তুলতেও পারে নি। এক অর্থে স্বদেশী সমাজও তো সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজের আদর্শেই পরিকল্পিত। কিন্তু অন্যদিকে তখনও কবি সচেতন—অতীতের অনুবৃত্তি অসম্ভব—সেই বিচ্ছিন্ন পল্লীজীবনে প্রত্যাবর্তন অবাঞ্ছিত।

"বর্তমান কালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতে হইবে।" (স্বদেশী সমাজ)।

পরবর্তী কালে কবির এই বোধ আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ যুগের প্রকৃতিই হলো সহযোগিতা—মানুষে-মানুষে যোগাযোগের নিয়মে তা ক্রম-বিকশিত। সেই যুগ-প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করে আপন আপন গ্রামসীমায় গণ্ডিবদ্ধ থাকা অসম্ভব। সেরূপ বিচ্ছিন্নতায় 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা' লাভ হয় না—জন্মে কূপমণ্ডুকতা—ঘটে মনের অপমৃত্যু। সিভিলিজেশন ভারতের বাইরে বিশেষ করে 'সিভিস' বা পৌরজনের উদ্ভাবনা ; কিন্তু জনপদের পক্ষেও সিভিলিজেশনের দান—বাস্তববিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৌতূহল, জিজ্ঞাসা ও চিত্তবৃত্তির অভাবনীয় ক্রমবিকাশ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সভ্যতার এরূপ অস্বীকৃতির চেষ্টারই নাম 'গ্রাম্যতা'। রবীন্দ্রনাথ যার কিছুমাত্র প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাশিয়া দেখার অনেক আগেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এ বিষয়ে পরিচ্ছন্ন ছিল। শ্রীনিকেতন-পরিকল্পনায়ও তা দেখা যায়।

পল্লী-সংগঠনচিন্তায় কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুতর বলে মনে করবার কারণ এই—ঠিক এই শ্রীনিকেতন-প্রতিষ্ঠার কালেই 'গ্রামে ফেরা'র ('Back to Village') নামে 'অতীতে ফেরা'র ('Back to Vedas') ঝোঁক আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তাকেও পেয়ে বসেছিল। সত্যের আহ্বান, যুগ-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যের ভাবনা তখন প্রায় অবহেলিত হতে চলেছিল গ্রাম-সংগঠন ও স্বদেশী সমাজ রচনার নামে। অথচ এক নিমেষের জন্যও কবির দৃষ্টিভঙ্গি এ বিভ্রান্তিতে ম্লান হয় নি। তাঁর কর্মাদর্শ ছিল সামঞ্জস্যের আদর্শ—শুধু অতীতে, তপোবনে বা আশ্রমে ফেরা নয়,—গ্রহণ করা তপোবনের 'বোধির তপস্যা', আশ্রমের 'মানবীয় আত্মীয়তা বোধ'। ভারতীয়তার নামেও পল্লীজীবনের বিচ্ছিন্নতা ও সীমাবদ্ধতা নয়; তার অনাড়ম্বর আত্মনির্ভরতার সঙ্গে আধুনিক যুগের সহযোগিতা-ধর্মের সামঞ্জস্য।

এই মূল কবিদৃষ্টিতে প্রবুদ্ধ ও পরিচালিত হলেই আজ পল্লী-সংগঠন সম্ভব। এবং শুধু শিক্ষায় দীক্ষায় নয়, পল্লীজীবনের যাতে স্বচ্ছন্দ প্রকাশ, সেই পল্লী সংস্কৃতি ও পল্লীর আনন্দানুষ্ঠানের উজ্জীবনও এই কবিদৃষ্টি ও তাঁর সামঞ্জস্য-বুদ্ধিকে বর্জন করে সম্ভব নয়। সামঞ্জস্যের নীতিই পল্লী-সংগঠনের মূল নীতি। পল্লীর সংস্কৃতি-সৃষ্টির ব্যাপারেও তা অনুভব করতে হয়।

আনন্দ সৃষ্টির পথ

প্রাণলীলা শুধু প্রাণযাত্রাতেই নিঃশেষ হয় না, চায় প্রকাশ। সে প্রকাশ উৎসবে আনন্দে, রসের উপভোগে ও রসের সৃষ্টিতে, প্রাণের সহিত প্রাণের আদানে প্রদানে। পল্লী-জীবনের নিরানন্দতা আজ কঠিন সত্য। প্রাণের উপবাস যেন দেশজোড়া। একদিন যে তা ছিল না এই গতানুগতিক পল্লীপার্বণ উৎসবের মধ্যে এখনো আমরা তার চিহ্ন পাই। বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত লেগেই ছিল আমাদের 'ঋতু উৎসব'—ঋতুরঙ্গভূমিতে সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারার সঙ্গে চিরদিনের আত্মীয়তা তাতে অনুভূত হতো। জন্ম, বিবাহ, মাতৃত্ব, অন্নারম্ভ, বিদ্যারম্ভ, হয়তো বা ভাইফোঁটা—এরূপ অজস্র সামাজিক উৎসব ছিল বৎসরে—সংসারের বিচিত্র সম্পর্কের রসাস্বাদন করতে করতে তাতে সরল জীবন হতো সরস। আর 'ধর্মোৎসব' তো, পূজা-ঈদ-মহরম

কেন, সকলের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। সেই সঙ্গে তেমনি অবিচ্ছিন্ন সেই জীবন, সেই উৎসবাদির সঙ্গে তখনকার পল্লীর শিল্পাবদান। কিন্তু সে সমাজ আজ যেমন মৃত, সঙ্গে সঙ্গে সেই শিল্পেরও এখন মরণদশা। হাতের কাজে, তাঁতের কাজে, মাটির কাজে—কিছুতেই তাই মন ওঠে না আর পল্লীর মানুষেরই। কারুশিল্পের মতোই পল্লীর স্বাভাবিক রসসৃষ্টির ধারাগুলিও এরূপ শুষ্কপ্রায়। যাত্রা, কবিগান, কথকতা, পাঁচালী, কীর্তন, রামায়ণ গান, ঝুমুর, কিম্বা জারি, সারি, গাজন এমন কি আউল-বাউল-দরবেশী গান—অথবা গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া—কিম্বা সেই লাঠিখেলা, বাইচখেলা প্রভৃতি নানা গ্রাম-শিল্প ও আনন্দের আয়োজন আজ আর গ্রামের জীবনে তেমন জীবন্ত নয়। তাই গ্রামের আনন্দের পিপাসাও তাতে মেটে না। এসব পল্লী-আয়োজন অপেক্ষা বরং আধুনিক কালের আনন্দ-আয়োজনে পল্লীবাসীরও আকর্ষণ বেশি। আধুনিক জীবনযাত্রার যেটুকু হাওয়া পল্লী-জীবনে লেগেছে তাতেও আধুনিকতাতে পল্লীবাসীর রুচি গড়ে উঠছে। বাইরের জগৎ নিয়ে এসেছে প্রাণের উদ্দাম প্রবাহ। নতুন কালের খেলাধূলায় তাই আজ গ্রামবাসীরও ঝোঁক। নাটক ও নৃত্যের নামে সে পাগল। গানের নামে সে কাজকর্ম ভুলে যায়। এমন কি সর্বাপেক্ষা সুলভ যে আনন্দের উৎস, যা সর্বাপেক্ষা নিন্দিত, যাকে যুগশিল্প না বলার কোনো যুক্তি নেই—সেই সিনেমাতেই কি গ্রামের মানুষের পিপাসা কিছুমাত্র কম? অধোমুখ নিরানন্দ গ্রাম্যজীবনের দিকে তাকিয়ে কে বলবে ফিল্ম বা রেডিও সেখানে অবাঞ্ছিত? কিন্তু কে না মানবে—সিনেমা রেডিওতে যুগের বিকৃতি যত বিস্তৃত হচ্ছে, যুগের শ্রী-সম্পদ ও শালীনতা তত আশ্রয় পাচ্ছে না। তাই তাতে গ্রামবাসীর মধ্যে রুচির উৎকর্ষ অপেক্ষা রুচির বিকৃতিও ব্যাপক হবারই কথা।

এইখানেই আবার ওঠে সেই সামঞ্জস্যের কথা। সামঞ্জস্যের আদর্শ মনে রাখলে বুঝি—রুচিবিকৃতি বেশি মারাত্মক, না, নিরানন্দতা বেশি মারাত্মক, এ প্রশ্নটাই ভ্রান্তিপ্রসূত। কারণ, নিরানন্দতার থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় তো রুচিবিকার নয়। একটা সামঞ্জস্যের পথ রবীন্দ্রনাথই আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক রুচিকে আনন্দের ও শালীনতার সঙ্গে তিনি সমান্বিত করেছেন—নৃত্যে, নাট্যে, গানে, সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে, জীবনযাত্রার শত আয়োজনের ক্ষেত্রে। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লোক-

সংস্কৃতির ঐতিহ্যকেও তিনি রূপান্তরিত করেছেন। আর, সবচেয়ে প্রাণকে দিয়েছেন স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। একবার কি আমরা বুঝে দেখি সেই দানের স্বরূপ? রবীন্দ্রসৃষ্টির ধারায় আমাদের একালের উৎসবে সভাসমিতিতে এসেছে গানের স্পর্শ, সভামণ্ডপে আলপনার শ্রী। নৃত্য এসেছে নবজাতক রূপে—ছন্দতোলা সমাজজীবনে। নাটক এসেছে সঙ্গীতের বাহন হয়ে—রঙ্গমঞ্চে তার অসংকোচ আসন। ছড়া, গান, রূপকথা, ব্রতকথা—সবই তার দৃষ্টিতে আদরণীয়। কিন্তু কই, পুরনো কবিগান, কথকতা, পাঁচালী, এমন কি পল্লীগীতির ঐতিহ্যকে তো তিনি আঁকড়ে থাকেন নি, আধুনিকতার উৎকট মত্ততায়ও তিনি আপনাকে ভাসিয়ে দেন নি।

একথা ঠিক, এ সামঞ্জস্য সম্ভব হয়েছে কবির সৃজনশক্তির ইন্দ্রজালে—অসামান্য প্রতিভায় অসামান্য সাধনায়। ঋতুতে ঋতুতে সঙ্গীতে নাটকে, শেষে নৃত্যনাট্যে কবি যে আনন্দ-অনুষ্ঠানের উদ্ভাবনা করেছিলেন এমন প্রতিভা আর কোথায় যে তেমন শিল্পসামঞ্জস্য সাধিত করবেন? এমন সূর্য কোথায় যাঁর আকর্ষণে গায়ক, গীতকার, অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী, চিত্রকর প্রভৃতির সমাবেশ সম্ভব হবে? এমন বৈষয়িক শক্তিই বা কার কাছে যার ব্যবস্থাপনায় এরূপ আয়োজন অন্যত্র হতে পারে? এসব নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু কথাটা এই যে, পথ যিনি নির্দেশ করেছেন, তিনি 'ফরমূলা' তৈয়ারি করতে চান নি—নব নব সম্ভাবনা এই যুগে নিত্য উদ্ভাসিত হয়। সেই যুগপ্রকৃতির সঙ্গে চাই দেশের শিল্প উদ্ভাবনার নিত্য নব নব সামঞ্জস্য।

এই দুঃসাধ্য সাধনা গ্রামের যেখানে উদযাপন করা সম্ভব নয়, সেখানে কি অবসাদের অভিশাপই অচল হয়ে থাকবে? প্রতিভা দুর্লভ বলে কি প্রাণের প্রকাশও নিষ্প্রয়োজন? আনন্দ-অনুষ্ঠানে কি পল্লীর মানুষের প্রতিদিনকার পিপাসা পূর্ণ করতে নেই? তাদের মনে যে সৃজনের অনুভূতি আছে তা কি থাকবে ছাই-চাপা? কথাটা এই, অন্তত পল্লীর শিল্পচেতনাকে পরিতৃপ্ত করা ও পল্লীর মানুষের স্বাভাবিক সৃষ্টিপ্রবণতাকে পরিপুষ্ট করাও প্রয়োজন।

স্বীকার করা উচিত—কলেগড়া আনন্দানুষ্ঠানের যারা স্রষ্টা তাদের সঙ্গে ভোক্তাদের আদান-প্রদানের অবকাশ নেই। সেখানে রসভোগের আনন্দ নিষ্ক্রিয় আনন্দ—রেডিওতে নাট্যাভিনয়ের মতো। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয়ে শিল্পীর সঙ্গে দর্শকের ও শ্রোতার জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তা

গড়ে উঠলেই শিল্পকলা পূর্ণশ্রী লাভ করে। সেখানে তোকাদের আনন্দ হচ্ছে সক্রিয় রসভোগের আনন্দ। এরূপ সম্পর্কের মধ্যেই পল্লীর শিল্পকলা ও আনন্দ-অনুষ্ঠানের অনেকটা উপযোগিতা। পল্লীর সংস্কৃতি সক্রিয় আনন্দের যোগাযোগকে যত সত্য করে তোলে তা অন্য কিছুতে হয় না। যাত্রা, কবিগান, কথকতা, পাঁচালী প্রভৃতি পল্লীগ্রামে কি আর মানুষের সত্যিকারের দাবি মেটাতে পারে না? 'ব্যালে' যাদের প্রায় জাতীয় সম্পদ, তারাও তো পুতুলনাচের নব নব ধারা উদ্ভাবিত করছে। আমাদের পুতুলনাচই কি কেবল লুপ্ত হবে? এদেশের নরনারীর সহজাত সৃষ্টিক্ষমতা কি গীতে-গানে-বাঁশিতে-বাজনায়, আলপনায়, সূচীকর্মে, মূর্তিশিল্পে—পূজায় পার্বণে, শত উৎসবে, শত উপলক্ষে মানুষের সেই আনন্দ অনুভূতিকে সজীব করতে পারে না? বাউল, ভাটিয়ালী, পল্লীগীতি—সেই পল্লীর জীবন্ত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও—শহরের আবর্জনায় 'আর্ট' বলে গ্রাহ্য হচ্ছে। গণ-নাট্য আন্দোলনের কর্মীরা দেখেন—বাঙালীর মর্মকোষে এখনো তার অনুভূতি সঞ্চিত আছে। তাহলে বাঁকুড়ার ঘোড়া, পটুয়াদের শিল্প, গ্রাম্য-মেয়ের নক্সাকরা কাঁথা, লক্ষ্মীর সরা ঐ 'আর্টবাবুদের' মুখ চেয়েই কেবল গড়তে হবে কেন?

একটা কারণ বোঝা যায়—যেখানে তার জন্ম ও জীবন স্বাভাবিক, সেই গ্রামের মাটি থেকে তার শিকড় ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। জীবনের সঙ্গে তা আর জড়িয়ে নেই। তবু তো গ্রাম থাকবেই, কৃষিপ্রধান দেশে তারই সংখ্যা হবে প্রধান। তাহলে সেই গ্রামজীবনের মধ্যে বাড়ির আঙিনায় দুটি সযত্ন ফুলগাছে—একটি গাঁদার সারে, বেল-যূথী-শেফালি দিয়ে—জীবনযাত্রায় সৌন্দর্যচর্চার একটু অবকাশ রচনা করতে বাধা কি? এসব কোনো প্রকাশই তো তুচ্ছ নয়, শুধু অতি সহজায়ত্ত বলেই তার মূল্য আমরা দিই না। আর অতি মুমূর্ষু বলেই আমরা উদ্যম হারিয়েছি—অন্যদিকে উৎসবকে করে তুলেছি বিত্তের বাহুল্যে উৎকট। এমন কথা কেউ বলবে না যে, আমাদের পল্লীজীবন নূতন যুগের আঘাতেও পরিবর্তিত হবে না, গ্রাম্যসংস্কৃতিও থাকবে অপরিবর্তিত, আনন্দ-অনুষ্ঠানেরও পুনরাবৃত্তিই যথেষ্ট। জীবনযাত্রার রূপান্তর অনিবার্য, আর জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমাজসংস্কৃতি সবই রূপান্তরিত হবে—যা বর্জিত হবার মতো তাকে শত চেষ্টায়ও টিকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু কথা এই—যা টিঁকে থাকবার মতো তাকে চেষ্টায়

অভাবে, অবহেলায়, এখন থেকে বর্জন করা অত্যাচার ছাড়া কিছু নয়। একদিন মরতে হবে বলে আজকেই মৃত্যুকে আশ্রয় করলে তা হয় আত্মহত্যা।

নিঃসন্দেহ আজ জীবনযাত্রা দ্রুত ধারায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এ যুগের কারুবিদ্যা পৃথিবীতে যে বিপ্লব ঘটাচ্ছে তা চোখের সামনে ঘটছে বলেই তার স্বরূপ আমরা বুঝে দেখছি না। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারি— আজ পল্লীজীবনে আনন্দরচনা মোটেই দুঃসাধ্য কাজ নয়। পুরাতন পল্লীর পরিবেশে যে উৎসব ও লোকশিল্পের প্রকাশ ঘটে, তারই পার্শ্বে নতুন উদ্যোগের নব রচনাও সুসম্ভব। রেডিও আজ দূর দূরান্তরের পল্লীরও বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দেয়। কেন তেমন সুদূর পল্লীর কোনো একটি সাধারণ ব্যবহৃত গৃহে বেতার-ব্যবস্থা সুসম্ভব হবে না? স্কুল, ডাকঘর, পাঠাগার কিংবা নাটমন্দির—যা-ই থাক যে গ্রামে—সেখানেই তো বিশ্বদূতের এই সভা বসতে পারে। পূর্বেকার যাত্রা ও কবি-গানের মতো একালের 'মুক্ত-অঙ্গন' নাট্যদল নিজেদের আসর বেঁধে নাটক দেখাচ্ছেন গ্রামে—দূরবাহী শব্দযন্ত্রকে মাইক) বাহন করে তাদের কথা ও গান পৌঁছনো যায় সহস্র সহস্র নরনারীর কানে ও মনে। ঘূর্ণ্যমান সরকারী বা বেসরকারী প্রোজেক্টার যন্ত্রের সাহায্যে চিত্তাকর্ষক প্রামাণিক চিত্র ও শিল্পোত্তীর্ণ চলচ্চিত্র পরিবেশনও এক-একটি গ্রামে সপ্তাহে এক-আধদিন অসম্ভব নয়। পল্লীতে স্কুল, গ্রন্থাগার, ডাকঘর, তারঘর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বিদ্যুৎশক্তি প্রতিষ্ঠার মতোই রেডিও ও চলচ্চিত্রের প্রবর্তন অদূরেই অবশ্যম্ভাবী। ততক্ষণ পরিচিত প্রণালীতে গান, বাজনা, অভিনয় প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠান ও সৃজনকর্ম যেমন চলছে চলুক। সেই সঙ্গে আধুনিক কারুবিজ্ঞানপুষ্ট আনন্দ-অনুষ্ঠানে পল্লীর বিচ্ছিন্নতা ও নিরানন্দতা ভাঙাও আরম্ভ হোক। কবি দেখেছিলেন মস্কোর থিয়েটারে সিনেমায় গ্রাম্য রুশ কৃষকের রসবোধ বর্ধিত হয়েছে। তা হলে আমাদের পল্লীশিল্পী কি উন্নততর শিল্পপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আপন শিল্পকে সচল প্রাণবান করতে পারেন না? চলচ্চিত্র ও বেতার প্রভৃতির অপপ্রয়োগ সত্ত্বেও নির্ভয়ে স্বীকার করি—জনসাধারণের তা মহৎ ভরসা। তা যুগের শিল্পপদ্ধতি।

প্রধান যে দু-একটি কারণে পল্লীজীবনে শূন্যতা দেখা দিয়েছে আমি তা নিবেদন করলাম—কবিদৃষ্টির সহায়ে তার যে সমাধান সম্ভাব্য মনে হয় তা-ও

আমাদের বিচার ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী জ্ঞাপন করলাম। জ্ঞানের অবকাশের অভাবে এবং রসভোগের ও রসসৃষ্টির অভাবে যে অবসাদ পল্লীজীবনে ব্যাপক হয়ে আছে তাতে পল্লীজীবনের বিকৃতি ঘটা অনিবার্য। কল-কারখানা ও শহরের কৃত্রিম উত্তেজনাই মনুষ্যত্বের বিকৃতি ঘটায় না। পল্লীর নিরবচ্ছিন্ন নিরানন্দতাও মানুষের বিকৃতি ঘটায়, একথা আমরা কে অস্বীকার করতে পারি?

শহরধর্মী গ্রাম ও গ্রামধর্মী শহর

আশ্চর্য নয় যে, মানুষ শহরমুখো হয়ে ওঠে, শুধু বিকৃতির বশে নয়, প্রাণের তাগিদেও। অন্য দেশে হয়তো তা ঘটে শহরের কৃত্রিম বিভ্রমের (glamour) জন্য। আমাদের দেশে তার মূল কারণ আর্থিক—শহরে জীবিকালাভের আশা। পল্লীজীবনের আর্থিক পুনর্গঠনও তাই পল্লীসংগঠনের মূল কথা। উন্নত কৃষিপ্রণালী, উন্নত পল্লীশিল্প, মিশ্র শ্রমিক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রের ব্যবহার, পল্লীশিল্পে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োগ, বিজলীশক্তি প্রসার, সমাজের নূতন বিন্যাস, সামবায়িক ধনোৎপাদন ও ধনভোগ—যে সব আর্থিক উপযোগের কথা রবীন্দ্রনাথ পল্লী-গঠনে উল্লেখ করেছেন—লেনিনের ভাষা বদলিয়ে কবির 'স্বদেশী সমাজ'-এর এই উপাদানকে বলা যায় "এডুকেশন এ্যাণ্ড কো-অপারেটিবস।" যাঁরা এই প্রাণ-যজ্ঞের আলোচনায় অধিকারী তাঁরা পূর্বেই আলোচনা করেছেন। এসব যে আমাদের স্বাধীন ভারতের 'স্বদেশী সমাজ'-এর প্রয়োজনীয় বনিয়াদ, এ কথা ধরে নিয়েই আমি কিছু কিছু সংস্কৃতিকর্মীরও অভিজ্ঞতার শিক্ষা আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করলাম—কবিরই কথা "পল্লীর প্রাণকে প্রকাশিত করো—পল্লীসমাজ বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর জীবনযাত্রার সহযোগী হোক, কবিজীবনের সাহিত্যের পথ ও কর্মের পথের মতো পল্লীজীবনের সংস্কৃতি রচনার পথও জীবনরচনার পথও একসঙ্গে চলুক—জ্ঞানে কর্মে আনন্দে যেন পল্লীবাসী সকল রকমেই শহরবাসীর সহযোগী হয়ে উঠতে পারে"—'স্বদেশী সমাজ'-এর এরূপ বিকাশই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল।

এই কথাটাও বোঝা উচিত—গ্রামের সঙ্গে শহরের যে বৈপরীত্য এতদিন সভ্যতার পক্ষে অনিবার্য ছিল, আজ সভ্যতাই তা ঘুচিয়ে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তার সূচনা দেখে এসেছিলেন তখনকার রাশিয়ায়। বিজ্ঞানের নব নব দানে

এদেশেও তার শুভসূচনা তো একেবারে অসম্ভব নয়। শহর এখন হতে পারে 'গার্ডেন সিটি' 'উদ্যান নগর', গ্রাম হতে পারে 'টাউনশিপ' উপনগর বা পৌরপ্রসাধনে সুন্দর গ্রাম—এক-একটি শ্রীনিকেতন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক উপযোগের সঙ্গে আনন্দের ও উৎসবের উপযোগগুলির মিলন হলে পল্লীলক্ষ্মী আর পুরলক্ষ্মীর তুলনায় শ্রীহীনা থাকবার কথা নয়। এই শ্রীনিকেতনে স্বদেশী সমাজের সেই সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতিও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। চাই শুধু "সাহসবিস্তৃত বক্ষপট" যাতে সমস্ত দেশের মতও বলতে আর মানতে পারি—"নাল্পে সুখমস্তি"। শ্রীনিকেতনে উচ্চারিত কবির সেই কামনাই জাতির প্রতিজ্ঞা হোক: "আমাদের গ্রামগুলি......মনুষ্যত্বের পূর্ণসম্মান ও সম্পদ ভোগ করুক।"

শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসবের তৃতীয় অধিবেশনে 'রবীন্দ্রনাথ, পল্লীসংস্কৃতি ও আনন্দানুষ্ঠান' বিষয়ক আলোচনায় (৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬২) পঠিত—লেখক।

টয়েন্‌বির 'পুনর্বিচার'

সুশোভন সরকার

১৯১৪ সালে অক্সফোর্ডের এক তরুণ শিক্ষাব্রতীর মনে সহসা এই চিন্তার উদয় হয় যে গ্রীক ঐতিহাসিক থিউকিডিডিস-এর চোখে সে-যুগে তখনকার সভ্যতার যে-সঙ্কট ধরা পড়েছিল, আজকের দিনে আমাদের সভ্যতার ভাগ্যেও সেই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। আর্নল্ড টয়েন্‌বির তখন মনে হলো যে তাহলে মানুষের ইতিহাসে বিভিন্ন সভ্যতাগুলি তুলনীয়, মানব-অভিজ্ঞতায় তারা যেন 'সমসাময়িক', তাদের উদয়-বিস্তার-সঙ্কট-পতনের একটা মোটামুটি ছক কাটা বোধহয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। ১৯২১ সালের মধ্যে তুলনীয় সভ্যতাগুলির একটা ছবি টয়েন্‌বির কাছে স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস দাঁড়ায় যে ইতিহাসচর্চার সার্থকতম ক্ষেত্র হলো দেশ বা জাতি নয়, নানা দেশ সম্বলিত এক একটি সভ্যতার রূপরেখা নির্ধারণ। ১৯৩৪ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত তিন পর্যায়ে তাঁর দশখণ্ড 'ইতিহাসের আলোচনা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে; একাদশ খণ্ড 'মানচিত্রাবলী ও ঐতিহাসিক স্থাননির্দেশ' নামে প্রকাশ পায় ১৯৫৯-এ; আর গতবৎসর আলোচনা সম্পূর্ণ হলো 'পুনর্বিচার' নামক দ্বাদশ খণ্ডটিতে। এতদিনকার বিরাট পরিকল্পনার সফল পরিসমাপ্তি ইতিহাসরচনার ইতিহাসে প্রায় তুলনাহীন বলা চলে।

পেশাদারী ঐতিহাসিক মহলে আর্নল্ড টয়েন্‌বি বিশেষ সমাদর পান নি বললে অন্যায় হবে না। এমন ব্যাপকভাবে ইতিহাসকে দেখবার চেষ্টা ইতিহাস-লেখকদের কাছে অমার্জনীয় মনে হয়েছে; আজকাল পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাপারের গভীর অনুশীলনই প্রচলিত রেওয়াজ, সঙ্কীর্ণ বিষয়ে গবেষণা ছাড়া আর কোনও প্রয়াস আজ অগ্রাহ্য। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাস-পত্রিকাসমূহে তাই বহুদিন পর্যন্ত টয়েন্‌বির ভাগ্যে জুটেছিল হয় উপেক্ষা, নয়তো বা নিন্দা ও বিদ্রূপ। সম্প্রতি কিছুটা হাওয়া বদল অনুভব করা

বায়, যদিও সে-হাওয়া এদেশে পৌঁছুতে নিশ্চয় যথারীতি দেরি হবে। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক পাওয়িক্-এর মতে—স্বচ্ছন্দ-মনে না হলেও সাধারণ সূত্রের সন্ধান ইতিহাস-লেখকদেরও কর্তব্য।

দুই

একবার যা লেখা হলো সেটাই চিরন্তন মনে করা লেখকমাত্রের স্বাভাবিক অভিমান বলা চলে। টয়েন্‌বির 'পুনর্বিচার' এর মহৎ ব্যতিক্রম। 'ইতিহাসের আলোচনা' গ্রন্থের প্রায় দুইশত সমালোচনাকে এখানে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, সমালোচকেরা অবশ্য নানা দেশাগত। পরীক্ষার ফলে টয়েন্‌বি তাঁর অতীতের মতামত কিছু পরিমাণে সংশোধন করেছেন, যেখানে পারেন নি সেখানে বিরোধী যুক্তিখণ্ডনের চেষ্টাও করা হয়েছে। এ ধরনের পুনর্বিচারের উত্তমটাও ইতিহাস-সাহিত্যে দুর্লভ।

সরলভাবে টয়েন্‌বি বলছেন যে তাঁর লেখায় সত্য সত্যই অনেক গলদ আছে। অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক সাদৃশ্যকে তিনি অযথা বড় করে দেখেছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি কোনও কোনও অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের অভাব রয়েছে, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিক জীবনের আওতার বাইরে মানুষের অনেক কিছু ব্যাপারের প্রতি তিনি খানিকটা নিরাসক্ত থেকেছেন, ইতিহাসে বলপ্রয়োগ অথবা পার্থিব জীবনযাত্রার প্রভাবের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্যও দৃষ্টিকটু। তাঁর উদ্ভাবিত বিপরীত অথচ পরিপূরক অনেক সংজ্ঞা (যেমন challenge and response-এর সুবিদিত সূত্রটি) অন্যায় প্রাধান্য পেয়েছে; কিছু কিছু ছক (যেমন withdrawal and return) সত্যই ব্যাপক বলে মেনে নেওয়া শক্ত। প্রাক্-সভ্যতার সমাজগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দেওয়াটা নিতান্ত অন্যায় হয়েছে। ভারতীয়, চৈনিক, সিরীয় অথবা মধ্য-আমেরিকার সভ্যতাগুলির রূপরেখার ক্ষেত্রে অনেকখানি অদলবদল প্রয়োজন, পুরাতত্ত্বের নূতন আবিষ্কার, কিম্বা বিশ্লেষণী বিচারের ফলে সংশোধন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। হেলেনীয় সভ্যতা থেকে উত্থান-পতনের যে-সূত্র টয়েন্‌বি অন্য সভ্যতায় প্রয়োগের প্রয়াস পেয়েছিলেন, তার ফাঁকটাও এতদিনে তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত। গলদ শুধরে নিতে বিচলিত হলে চলে না, জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেটাই হলো স্বাভাবিক। পাহাড়ে চড়তে গেলে ধাপে ধাপে দিগন্তরেখা বিস্তৃততর হতে বাধ্য।

সংশোধনের প্রয়োজন মেনে নিলেও টয়েন্‌বির বৃহৎ পরিকল্পনা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে যায় না। বিশেষজ্ঞের চোখে তাঁর 'আলোচনা'র মধ্যে ফ্যাক্টের ভুলচুক অনেক ধরা পড়েছে, কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির প্রকোপে ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বতমালার মতন তাঁর রচনা এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলা নিতান্ত অন্যায় নয়। সভ্যতার বিচার ইতিহাসের একটা প্রধান বিষয়বস্তু মেনে নেওয়া যেতে পারে। সভ্যতার বিশ্লেষণে একটা 'মডেল' বা মাপকাঠির ব্যবহার-ও কাজে লাগে। টয়েন্‌বি প্রথমত হেলেনিক ইতিহাসের ধারাকে অন্য সভ্যতা বোঝার ব্যাপারে চাবি হিসাবে প্রয়োগ করেছিলেন, এখন তার সঙ্গে যোগ করলেন চীনে ইতিহাস-চর্চার একটা সূত্র অর্থাৎ ইতিহাসে বিক্ষোভ ও শান্তি, দুর্দিন ও সুদিনের পর্যায়ক্রম, যে-সূত্র দেখা যায় ইবনে খালদুনের চিন্তার মধ্যেও। টয়েন্‌বির তালিকায় বড় সভ্যতার সংখ্যা এখন তেইশ থেকে নেমে তেরোতে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় সিরীয় ও হেলেনিক সভ্যতার সংমিশ্রণে তিনি এক উর্বর ক্ষেত্রের কল্পনা করেছেন, প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষ যেখানে সারের মতন নূতন শস্য উৎপাদনের সহায় হয়েছে। অতীতের সকল সভ্যতার প্রধান গলদ যুদ্ধবৃত্তি এবং সামাজিক অত্যাচার, একথা টয়েন্‌বি স্বীকার করছেন। প্রতি সভ্যতায় সার্বভৌম সাম্রাজ্যের মধ্যে একটা শোষণের প্রবৃত্তি, আর্থিক পীড়ন ও শাসনযন্ত্রের নিষ্পেষণের ফলে তার অবক্ষয় দেখতে তিনি প্রস্তুত।

টয়েন্‌বি-বাদ, তার বিশেষ সিদ্ধান্ত ও বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির অনেক কিছু আমার কাছে স্বীকার্য নয়। কিন্তু ইতিহাসের ব্যাপক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁর প্রচেষ্টা এবং তার সম্ভাব্যতায় প্রতি মৌলিক বিশ্বাস অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে করতে আমার দ্বিধা নেই। পণ্ডিতমহলে তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধা আমার মতে একটা প্রচলিত অন্ধসংস্কার মাত্র। ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর তিনটি প্রধান মাহাত্ম্য চোখে পড়ে—ব্যাপক মানবিক দৃষ্টির প্রসার, অতীতকে আয়ত্তে আনার চেষ্টায় 'প্যাটার্ন' বা ছকের সাহসী অনুসন্ধান করে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার যাথার্থ্য পরীক্ষা এবং প্রচুর তথ্যের সহযোগে ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল সৃষ্টি। গুণগুলি অসামান্য বলে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। ফলে 'ইতিহাস আলোচনা' গ্রন্থটির ইতিহাস-রচনার রাজ্যে দীপশিখার মতন উজ্জ্বল হয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

দিক

ব্যাপক মানবিক দৃষ্টির নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে এ-গ্রন্থের পাতায় পাতায়। পশ্চিম জগৎ, পাশ্চাত্ত্য দেশের গণ্ডি থেকে ইতিহাস এখানে মুক্তি পেয়েছে; প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে ইওরোপীয় প্রভুত্ব, ইওরোপের দম্ভ, পশ্চিমী অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ইওরোপীয় আত্মরতি, নর্ডিক প্রাধান্য, অথবা ইংরাজসুলভ আত্মসন্তুষ্টির ভাব এখানে অনুপস্থিত। মানবিকতা প্রকাশ পেয়েছে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায়; খ্রীষ্টান ঐতিহ্য ও সংস্কার বর্জিত হয়েছে বলা চলে, অগ্রাহ্য হয়েছে ভগবানের বিশেষ দয়ার পাত্র বিশিষ্ট জাতি অথবা প্রেরিত মহাপুরুষের ধারণা। স্বীকার করা হয়েছে যে বিজ্ঞানের বোড়ো হাওয়ায় আজ উড়িয়ে নিয়ে গেছে প্রচলিত ধর্মের সংস্কারের বোঝা। মানবিকতার প্রভাব দেখা যাচ্ছে জাতিগত স্বার্থের বর্জনের প্রচেষ্টার মধ্যে, বিশ্ব-ঐক্যের আদর্শে, আজকের দিনের উপযোগী সহাবস্থানের নীতির ভিতর। হেলেনীয় মানবিকতার পূজারী টয়েন্‌বির চোখে ইতিহাসকে নিছক রাষ্ট্রিক ঘটনার মধ্যে আবদ্ধ রাখাটা স্বাভাবিক মনে হয় নি। মানবিক দৃষ্টির প্রভাবেই তাঁর কাছে ধরা পড়েছে আধুনিক ঐতিহাসিকদের দুর্বলতা, বিশেষজ্ঞসুলভ সঙ্কীর্ণতা, পূর্বগামীদের বিস্মৃত হওয়ার ঝোঁক।

ছোট গণ্ডির মধ্যে গবেষণা অবশ্য ইতিহাস-চর্চায় অপরিহার্য। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকাটা কি বাঞ্ছনীয়? নানা স্তরে ইতিহাসের আলোচনা কি সার্থক নয়? ইতিহাস-রচনায় নানা মহল থাকাটাই সঙ্গত। আজকের দিনে ঐতিহাসিকদের প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সামান্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান। কিন্তু সেই পরিধি ছাড়িয়ে ব্যাপক ক্ষেত্রে ইতিহাসের ধারার সমগ্র রূপ নির্ণয়ের চেষ্টাও অসঙ্গত হবে কেন? বিশেষজ্ঞদেরও মনে রাখা উচিত দার্শনিক দেকার্ট-এর সেই প্রসিদ্ধ উক্তি যে অতীতের কোনো অংশই নিখুঁতভাবে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়, কেননা সব সময়ই অনেক কিছু তথ্যকে বাদ দেওয়া ছাড়া গতি নেই। ইতিহাসে ব্যাপক দৃষ্টি এক হিসাবে বাস্তবকে বিকৃত করে দেখা বটে, কিন্তু সঙ্কীর্ণভাবে বিশেষজ্ঞের দেখবার ভঙ্গিটাও তো আর এক ধরনের বিকৃতি মাত্র। ব্যাপকভাবে দেখার একটা সার্থকতাও আছে, দূর থেকে অথবা উপর থেকে যেমন একটা প্রবাহকে দেখলে তার সাধারণ রূপটুকু চোখে ধরা পড়ে। বিজ্ঞানের মতন ইতিহাসের বেলাতেও একটা সমগ্র দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

আইন্‌স্টাইনের মতে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নিবদ্ধ মনের কাছ থেকে মহৎ আবিষ্কার প্রত্যাশা করা চলে না। আর আধুনিক ঐতিহাসিকদের গুরু র‍্যাঙ্কে স্বয়ং বলতেন যে প্রসারিত দৃষ্টি না থাকলে গবেষণা পর্যন্ত নিষ্প্রাণ হয়ে পড়তে বাধ্য।

কোনও কোনও সমালোচক টয়েন্‌বির ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিকে 'বামপন্থী-বিচ্যুতি' বলে বিদ্রূপ করেছেন। অথচ ইতিহাসের সুমহান ঐতিহ্যে তাঁর পূর্বসূরীদের অভাব দেখি না। গ্রীসের হেরোডোটাস, থিউকিডিডিস, পলিবিয়াস থেকে আধুনিক যুগের গিবন, র‍্যাঙ্কে, মায়ার পর্যন্ত মহারথীদেরও কি উপেক্ষা করতে হবে? এঁদের উপেক্ষা করতে গেলে ইতিহাস-সাহিত্যের কতটুকুই বা বাকি থাকে?

চার

প্যাটার্নের অনুসন্ধানও কি ইতিহাসের অন্তরঙ্গ অঙ্গ নয়? বাস্তবকে ধরবার চেষ্টা মাত্রই এক হিসাবে অবাস্তব বটে, কিন্তু ছোট বড় যে-কোনও আলোচনাতেই তো সে-দোষ বিদ্যমান। অথচ ইতিহাস তো কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনার কারবার হতে পারে না, যার মধ্যে কোনও যোগসূত্র দেখার চেষ্টা চলবে না, যেখানে একটার পর একটা নিরর্থক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে? আমরা যাকে 'ঘটনা' বলি, তাও তো আমাদের দেখার উপর নির্ভর করে, আর সে-দেখাই কি বাস্তবপূর্ণ সত্য? অগণিত ঘটনা বা ফ্যাক্ট সম্বন্ধে কোনও কিছু বলতে বা লিখতে যাওয়া মাত্র আমাদের বাছাই করে নিতে হয়, সেই বাছাই আবার নির্ভর করবে আমাদের মনের ধারণার উপর। এমন কি ফ্যাক্ট সংগ্রহ করতে গেলেও সংগ্রাহকের মনের প্রত্যাশা ও আগ্রহকে বাদ দেওয়া অসম্ভব। ইতিহাসে দৃষ্টিভঙ্গিকে যাঁরা উপহাস করেন তাঁরা ভুলে যান যে ব্যাপক অথবা সঙ্কীর্ণ যে-কোনও ধরনের ইতিহাস-রচনায় দেখার ভঙ্গি একটা থাকবেই—অবশ্য কোনও কোনও সময় লেখক সে-সম্বন্ধে সজাগ থাকেন না। তথ্যের উপর তথ্য চাপিয়ে গেলেই ইতিহাস রূপগ্রহণ করে না, তার জন্য চাই তথ্য নির্বাচন, তাকে সাজানো, যোগসূত্র সন্ধান, ছোট বড় সিদ্ধান্ত। দৃষ্টিভঙ্গি ও থিওরির সার্থকতা এই যে তার অনুষঙ্গে সুপরিচিত ফ্যাক্টও নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যেমন হয়েছিল কোপার্নিকাস অথবা ডারুইনের পরিকল্পনার প্রভাবে।

ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে মেনে নেওয়াই ভালো। পুনরাবৃত্তি আছে বলেই ধারা অথবা প্যাটার্নের সন্ধান চলতে পারে, সেই সন্ধানের ফলেই কেবল ছোট বড় ইতিহাস-রচনা সম্ভব হয়ে ওঠে। অনেক ঐতিহাসিক বলতে ভালোবাসেন যে ঘটনামাত্রই হলো আকস্মিক ও পরিপূর্ণভাবে নূতন কিছু, অন্য কোনও ঘটনার সঙ্গে তার তুলনা চলে না। এ কথা সত্য হলে ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগ লোপ পেতে বাধ্য, কোনও কিছুই তাহলে বোধগম্য হতে পারে না, বুদ্ধিবিচার তাহলে নিরর্থক প্রতিপন্ন হয়। আসলে স্বয়ংসম্পূর্ণ একক ঘটনা কি বিজ্ঞানের রাজ্যে, কি মানুষের জীবনে বা ইতিহাসে সুলভ নয়। মহৎ ব্যক্তি ইতিহাস সৃষ্টি করলেন যখন বলা হয় তখন আমরা ভুলে যাই যে মহত্তম লোককেও সৃষ্টি করে তাঁর যুগ, তাঁর সাফল্যের পিছনে থাকে অতীতের সাধনা ও বর্তমানের যথাযোগ্য পরিবেশ।

১৯৫৪ সালে আমেরিকায় যে ইতিহাসবিদ্যা-কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছিল তাতে দেখতে পাই এই সিদ্ধান্ত যে ইতিহাস-চর্চা করতে গেলেই কিছুটা প্রাথমিক সূত্র বা প্রকল্প ছাড়া এগনো যায় না, বাস্তব তথ্য দিয়ে সেই প্রকল্প পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে চলতে হয়—ঠিক যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। থিওরি-বিশেষকে সমালোচনা করা সম্ভব, কিন্তু পদ্ধতিটা অপরিহার্য। যে-প্রাথমিক ধারণাগুলি ইতিহাসের আলোচনায় হাতিয়ারের কাজ করে, বিজ্ঞানে নূতন থিওরির মতন অনেক সময় তার উৎপত্তি উজ্জ্বল কল্পনার রাজ্যে। প্রথমে সমস্ত তথ্যসংগ্রহ, পরে থিওরি, জ্ঞানের জয়যাত্রা ঠিক এভাবে আসে না। ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি সেইজন্য এত মূল্যবান। যুগের ধ্যানধারণা ঐতিহাসিক মাত্রকেই প্রভাবান্বিত করে, সেইজন্যই যুগে যুগে ইতিহাস লেখার ধাঁচও বদলে যায়। ইতিহাস-লেখক সমকালীন নানা চিন্তাস্রোতের উপরে উঠে গিয়ে নিরপেক্ষ বিচারক হয়ে বসেন এই ধারণা শুধু নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা। নিজস্ব ঝোঁক ও প্রাথমিক ধারণা সম্বন্ধে সজাগ থাকাটাই হলো যুক্তিসঙ্গত।

ইতিহাসে ব্যাপক ব্যাখ্যা ঠিক সম্পূর্ণ 'প্রমাণিত' হতে পারে না। কিন্তু তার কাজই হলো খসড়া চিত্র আঁকা, সর্বাংশে নিখুঁত ফোটোগ্রাফি নয়। ছবিতে যেমন কিছুটা বিকৃতি থাকবেই, অথচ তার মধ্য দিয়েই অন্তর্নিহিত সত্যের আভাস পাওয়া যায়, এখানেও তাই। ঐতিহাসিক অন্তর্দর্শী চিত্রকরের

মতন। টয়েন্‌বির ঐতিহাসিক প্যাটার্নের সন্ধান তাই পণ্ডশ্রম নয়, তাঁর পদ্ধতিকে উপহাস করে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

ব্যাপক ব্যাখ্যার ছক আঁকার প্রয়াসকে ঐতিহাসিক ফিশার একদা বিদ্রূপ করেছিলেন এই বলে যে ইতিহাস হলো একটা আকস্মিক ঘটনার পর আর একটা আকস্মিক ঘটনার আবির্ভাব মাত্র, সুতরাং কোনও সাধারণ সিদ্ধান্ত বা ছক এখানে অচল। সেই ফিশার-ই আবার নিজের লেখা ইতিহাসে কিছু বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত, প্যাটার্ন ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন—কারণ তাঁর দার্শনিক বিশ্বাস সত্য হলে কোনও ইতিহাস রচনাই চলতে পারে না। ব্যবহারিক কাজে এক পদ্ধতি, দর্শনের বেলায় অন্য বুলি—এর দৃষ্টান্ত তো বৈজ্ঞানিক মহলে সুবিদিত। বাটারফিল্ড ঠিকই বলেছেন যে ঐতিহাসিক যখন নিজের বিশ্বাস-ধারণা সম্বন্ধে সতর্ক না থেকে মনে করেন যে তিনি এসব কিছুর ঊর্ধ্বে বিরাজ করছেন তখন তাঁর অন্ধতার পরিমাণ হয় অসীম।

পাঁচ

টয়েন্‌বির সংগৃহীত তথ্যের সম্ভারও বিপুল। পরবর্তী কোনও বড় ঐতিহাসিক হয়তো সে-তথ্যের আরও বেশি সদ্ব্যবহার করবেন, কিন্তু আপাতত এ-কাজের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা পাঠকের পক্ষে শোভন হবে। মূল ‘আলোচনা’র টুকরা টুকরা খণ্ড-আলোচনাগুলি নিঃসন্দেহে উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছে—শেষ বইখানিতে যেমন রোম, ইস্‌লাম, সিরিয়া অথবা য়িহুদি ইতিহাসের পর্যালোচনা নানা চিন্তার উদ্রেক করবেই। এই ধরনের লেখায় টয়েন্‌বি দেখিয়েছেন তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান—শুধু বিশাল চিত্র-অঙ্কনে নয়, খুঁটিনাটি কাজের কারুকার্যেও তাঁর দখল অসামান্য। মনে রাখা উচিত যে ‘ইতিহাসের আলোচনা’র লেখকের ছোট পরিধিতে সীমাবদ্ধ পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐতিহাসিক লেখার সংখ্যাও শতাধিক। অর্থাৎ ইতিহাসের বিভিন্ন মহলে তাঁর সমান পারদর্শিতা আছে।

অবশ্য ‘ইতিহাসের আলোচনা’ শেষপর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান ও চিন্তার প্রতিফলন মাত্র, ইতিহাস সম্বন্ধে শেষকথা নয়। এর মালমশলা আরও বিস্তার করে ভবিষ্যতে সফলতর পরিকল্পনা খুবই সম্ভব। ইতিহাস-রচনা সাময়িক কীর্তি বটে, কারণ জ্ঞানের পরিধি ও দেখবার ধরন বদলে চলে।

কিন্তু যে-লেখা চিন্তার খোরাক জোগায় সে নিশ্চয় দীর্ঘায়ু। সে-সম্মান টয়েন্‌বির প্রাপ্য বলেই আমি নিঃসংকোচে দাবি জানাই। আর আজকের দিনে ইতিহাস লেখা হয় এমন নিরস নিষ্প্রাণ রীতিতে যে টয়েন্‌বির সুপাঠ্য, সুচিন্তিত, সুগভীর, সুসমৃদ্ধ রচনা কম লাভ নয়। ঐতিহাসিক সাহিত্যের মহান ঐতিহ্য টয়েন্‌বি আর একবার আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

দুই

টয়েন্‌বি-বাদী হওয়া অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ সিদ্ধান্ত আমার কাছে অগ্রাহ্য মনে হয়। দুটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া যাক— তাঁর ধর্মীয় ঝোঁক এবং ইতিহাসে গতির রূপকল্পনা।

বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মনের মধ্যে অবশ্য দুস্তর পার্থক্য আছে, কিন্তু টয়েন্‌বি যাকে অপার্থিব দৃষ্টি, যুক্তির পরপারে উত্তরণ (trans-rationalism) বলেছেন, ইহজাগতিক ব্যাপারের ব্যাখ্যায় তার আমদানি কি সত্যই অনিবার্য? যুক্তিতর্কে সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা হয়তো বা সম্ভব নয়, যদিও বিজ্ঞানের নজিরে বলা যায় যে তেমন ব্যাখ্যার বিস্তার আজকের দিনে একটা সহজ সত্য। যার ব্যাখ্যা আজ নাগালের বাইরে, তাকে ভবিষ্যতের আশায় একপাশে সরিয়ে রাখলেই চলে; তাকে বোঝার জন্য বুদ্ধির অগম অজ্ঞেয় কোনও রহস্যকে টেনে আনার প্রয়োজন কোথায়? বিজ্ঞানে যতখানি জানা যায় তার বাইরেও কিছু জানার আকাঙ্ক্ষাটা স্বাভাবিক; কিন্তু অধীর হয়ে সে-আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য এমন কল্পনার আশ্রয় নেব কেন যার প্রকৃতিই হলো তর্কাতীত? বাস্তব-পূর্ণ-সত্য হয়তো মানুষের জ্ঞানের অগম্য, কিন্তু আংশিক সত্য তো আমাদের আয়ত্তে এবং তার পরিমাণ দিনে দিনে বেড়ে চলে। সেক্ষেত্রে পিছনের দরজা দিয়ে যুক্তির পরপারে ধ্রুব বিশ্বাসের রাজ্যে লাফ দেওয়ার সার্থকতা কতটুকু? অর্থবিদ্যা, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব অথবা পুরাতত্ত্ব যদি যুক্তিনির্ভর হাতিয়ার মাত্র সম্বল করে এগোতে পারে, তবে ইতিহাসের বেলায় কেন অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টির জন্য এত আগ্রহ?

প্রাথমিক ধারণা নিয়ে ইতিহাস আলোচনার যাত্রা শুরু হয় সত্য, কিন্তু বাস্তব ঘটনার কষ্টিপাথরে তাকে পদে পদে যাচাই করে নিতে হয়। যুক্তির

পরপারে উত্তরণে বিশ্বাস থাকলে এই যাচাই করাটা ব্যাহত হতে বাধ্য। 'উচুদরের ধর্ম' (খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি) সম্বন্ধে টয়েন্‌বির অগাধ আস্থা তাই ইতিহাস-নির্ভর হতে পারে নি। অতীন্দ্রিয় কোনও রহস্যের অস্তিত্ব এবং তার সঙ্গে সংযোগের সন্ধান—উঁচুস্তরের ধর্মের এই লক্ষণ তো উঁচু নিচু সকল ধর্মেরই সাধারণ প্রকৃতি। বিস্তৃতির পার্থক্যটাও দুই ধরনের ধর্মের ভেদরেখা টানতে পারে না। প্রভাবের দিক থেকে সকল ধর্মেরই কম বেশি কার্যকারিতা চোখে পড়ে, কিন্তু প্রভাব থেকে সত্যতা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং উচ্চতর ধর্মের আবির্ভাব হলো ইতিহাসের প্রধানতম ঘটনা, এমন কথা নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বাইরে কিছু নয়, যাচাই করে তাকে প্রমাণ করা যায় না। তথাকথিত শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলির শ্রেষ্ঠত্বও অনেকখানি অনৈতিহাসিক, তাদের ঐতিহাসিক রূপটা ভালো-মন্দের সংমিশ্রণের বিচিত্র কাহিনী, মানুষের অপরাপর কীর্তির তুলনায় তারা কিছু ভিন্ন গোত্রের উত্তম নয়। টয়েন্‌বি পর্যন্ত মহত্তর ধর্মের অতীত প্রকাশ থেকে ভবিষ্যতের কল্পনার দিকেই ঝুঁকেছেন, কিন্তু এদের তিনি যে-রূপ দিতে চেয়েছেন বিশ্বাসী ভক্তরা তা কখনোই মেনে নেবে না। মহত্তর সকল ধর্মই নাকি সারসত্যের আংশিক প্রকাশ, কিন্তু ইতিহাসে তাদের পরস্পরবিরোধিতাই তো বেশি প্রকট। সর্বধর্মসমন্বয় অলীক কল্পনা, প্রত্যেক ধর্মই একটা ঐতিহাসিক সত্তা, কাজেই জোড়াতাড়া দিয়ে জামা-সেলাই-এর মতন নূতন ধর্ম বানানোও সম্ভব নয়। ধর্মকে মানুষের প্রধান উত্তম বলাটা অবাস্তব, অগণিত মানুষের পার্থিব জীবনসংগ্রাম কোনোক্রমেই তার থেকে কম কিছু বলা চলে না। ধর্মের মৌলিক অর্থ তো সমাজকে যা ধারণ করে রাখে, সেই ধারকশক্তির অবশ্যই একটা প্রয়োজন আছে। কিন্তু ভবিষ্যতের মানব-জগৎকে ধরে রাখবে মানবিকতা ও সামাজিক সুবিচার, একথাই বা অগ্রাহ্য করব কিসের জোরে?

সাত

ইতিহাসের সাধারণ গতি সম্বন্ধে টয়েন্‌বির ধারণাও স্পষ্ট বা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। মানুষের আচরণের স্বাধীনতায় তাঁর মজ্জাগত বিশ্বাস—সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব থেকেই এর উৎপত্তি। অথচ সে-স্বাধীনতারও সীমানা নির্দিষ্ট হয় পরিবেশ দিয়ে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। মানুষের ব্যবহার যথেচ্ছ,

তার বাধ্যবাধকতা নেই, কোনও challenge-এর response কি হবে তার কোনও কিছু নিশ্চয়তা নেই, এ-সব কথার অর্থই হলো ইতিহাসে কার্য-কারণ নির্ণয়ের পরিহার। আবার সভ্যতাসমূহ 'সমসাময়িক', এ-তত্ত্বের পরিণতি হলো ইতিহাসকে পাশাপাশি স্বতন্ত্র নানা স্রোতের সমষ্টি হিসাবে কল্পনা করা। সকল সভ্যতার মধ্যে একই জাতীয় ছকের অনুসন্ধান আবার ইতিহাসের গতিকে পর্যবসিত করে চক্রাবৃত্তির ধারণাতে। টয়েন্‌বির এমন সব বিশ্বাস অযৌক্তিক মনে করার যথেষ্ট হেতু রয়েছে।

ইতিহাসের গতি সরলরেখায় চলে না, কিন্তু আঁকাবাঁকাভাবে এগিয়ে চলা সম্ভব। অগ্রগতিকে কম্বুরেখা (spinal) রূপে কল্পনা তাই সঙ্গত বলেই মনে হয়। টয়েন্‌বি প্রগতিতে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে টুকরো টুকরো অগ্রগতি তিনি মেনে নিয়েছেন। এই সব নানা ধরনের অগ্রগতি যদি সকলেই তুল্যমূল্য না হয়, তবে তাদের সংমিশ্রণে এক সমাজ থেকে অন্য সমাজ উন্নততর হওয়াটা সম্পূর্ণ সম্ভব। ইতিহাসে প্রগতিও তাহলে অবিশ্বাস্য কিছু নয়। বস্তুত টয়েন্‌বি যখন বলেন যে সভ্যতার এতদিনকার ইতিহাস উচ্চ ধর্মের অগ্রযাত্রার প্রস্তুতি মাত্র, তখন প্রকারান্তরে তিনি ঐতিহাসিক প্রগতির আশ্রয় নিচ্ছেন না কি ?

স্বকীয় দর্শনে আবদ্ধ থেকে টয়েন্‌বি বুঝতে চান নি যে ইতিহাসে স্তরভেদ আছে, মানুষ উন্নতির সোপান বেয়ে চলতে পারে। গর্ডন চাইল্ডের অনুসরণে তিনি প্রাক্-সভ্যতার যুগে আর্থিক অগ্রগতিটুকু এখন মেনে নিয়েছেন, সভ্যতার আগমনে তিনি সে-বিশ্লেষণ অযথা বর্জন করলেন। চাইল্ড তাই ঠিকই বলেছিলেন যে বিভিন্ন সভ্যতার প্রসার ও অবক্ষয়ে টয়েন্‌বি আর্থিক বিচারের দিকে নজর দেন নি। আধুনিক জগতে বিজ্ঞান ও ধনবাদের প্রভাব তাই তিনি দেখতে চান নি, সমাজতন্ত্রও তাঁর কাছে নূতন উন্নততর সমাজের আভাস এনে দেয় নি।

মার্কসের সঙ্গে টয়েন্‌বির সাদৃশ্য অনেকে লক্ষ্য করেছেন। সাদৃশ্য হলো ব্যাপক মানবিক দৃষ্টিতে, ইতিহাসের প্যাটার্ন বা ছন্দ অনুসন্ধানে, ইতিহাসের অর্থ সম্বন্ধে কৌতূহল আবাহনে। পার্থক্য অবশ্য সুদূরপ্রসারী। সে-পার্থক্য প্রধানত ধর্মের উপর সীমাহীন গুরুত্ব আরোপে, অর্থাৎ মুক্তির পরপারে উত্তরণের প্রয়াসে, এবং ইতিহাসের গতি সম্বন্ধে অনৈতিহাসিক বিশ্বাসের মধ্যে। টয়েন্‌বির লেখা সেদিক দিয়ে মূলত খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস ও ভাববাদ সঞ্জাত মার্কসকে উত্তর দেবার চেষ্টাবিশেষ। এখানে তাঁর সাফল্য একেবারেই তর্কাতীত নয়।

A Study of History, Vol. XII: Reconsiderations. Arnold Toynbee. Oxford University Press, 1961.

আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ

অশোক রুদ্র

প্রবন্ধটির প্রথমভাগ শেষ করেছিলাম এই বলে যে আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতিটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্ম ছোটা, এইটুকু মাত্র বলে থেমে গেলে বক্তব্যটা অত্যন্ত একপেশে হয়ে যায়। দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে এই প্রগতির অন্ত একটা পাশও ধরা পড়বে। এবার সেই অন্ত পাশটার দিকে আমাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে পাঠানো যাক। তাতে সবচেয়ে বড় যে সত্যটা ধরা পড়ে তা এই যে জাতীয় আয় প্রভৃতি সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে মাপলে প্রগতিটা যত সামান্তই হোক না কেন, ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে এমন কিছু কিছু গুণগত পরিবর্তন এসেছে এবং আসছে যা একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়। এই গুণগত পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কথা যা তা এই যে একটি বিশেষ অর্থে ভারতীয় অর্থনীতি সত্যিই স্বাবলম্বী হতে যাচ্ছে। আমরা এর আগে মন্তব্য করেছি, সাড়ে তিনহাজার কোটি টাকার ঋণ ১৮০০০ কোটি টাকার ঋণে পরিণত হয় যে উন্নয়নের পদ্ধতিতে তার মারফৎ অর্থনীতি স্বাবলম্বী হতে যাচ্ছে বলাটা খানিকটা মস্করার মতো শোনায় নাকি? আমাদের আগেকার এই উক্তি এবং এখনকার উক্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা বাস্তবেরই এক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের দুইটি অঙ্গ। একটি হলো পুঁজির অনাভাব। অপরটি উৎপাদনের মালমশলা ও কৌশলের অনাভাব। আমরা যে পরমুখাপেক্ষী তার এক কারণ আমাদের যথেষ্ট পুঁজি নেই; দ্বিতীয় কারণ, যথেষ্ট পুঁজি থাকলেও তা ব্যবহার করে সবকিছু উৎপাদন করার যোগ্যতা আমাদের নেই। আমাদের যে বিদেশী সাহায্য নিতে হয় তার সংখ্যাতাত্ত্বিক মাপ একটি হলেও তার গুণগত প্রকৃতি দুইটি। একটি হলো এই যে তা পুঁজি; অপরটি এমন যন্ত্রপাতি, এমন মালমশলা, এমন কারিগরি বিদ্যা যা আমাদের দেশে যথেষ্ট সুলভ নয় বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই অলভ্য। ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা করতে যে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হচ্ছে তার একটা

কারণ এই যে এই ধরনের শিল্পে যে ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তা আমরা নিজেরা উৎপাদন করতে পারি না। যা নিজেরা উৎপাদন করতে পারি না অথচ যা আমাদের প্রয়োজন তাকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু আমদানির তুল্যমূল্য রপ্তানি করার যোগ্যতাও আমাদের নেই। আমরা যা উৎপাদন করি তা অধিকতর মূল্যে বা অধিকতর পরিমাণে ক্রয় করার আগ্রহ আমাদের আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের নেই। অতএব আমাদের আমদানি করতে হয় এমন অনেক কিছু রপ্তানির মারফৎ যার মূল্য আমরা দিতে পারি না। তাই নিতে হয় বৈদেশিক সাহায্য। কিন্তু শুধু এই কারণেই বৈদেশিক সাহায্য নিতে হয় মনে করাটা মারাত্মক ভুল। আমদানির সমপরিমাণ রপ্তানি যদি করতে পারতামও তো শুধু সেই কারণেই আমাদের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন মিটে যেত না। কিন্তু এই মারাত্মক ভুলটাই ভারতবর্ষের পরিকল্পনাকারেরা করে বসেন যখন তাঁরা আর দশ পনেরো বৎসরের মধ্যে স্বাবলম্বনের স্বপ্ন দেখেন। তাঁদের ভুলের ভিত্তিটা এই যে আর পনেরো বৎসরের মধ্যে ভারীশিল্পের পত্তন এতদূর এগিয়ে যাবে যে এমন মালমশলা বা কারিগরি বিদ্যা খুব কমই থাকবে যা কিনা দেশের ভিতরেই উৎপাদিত হতে পারবে না। সেক্ষেত্রে আমদানির উপর নির্ভরতা কমে যাবে এবং আমদানি রপ্তানির ভারসাম্যের অভাবের দরুণ যে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন তা-ও অন্তর্হিত হবে। কিন্তু পুঁজির অভাবজনিত যে প্রয়োজন তা সমপরিমাণেই বিদ্যমান থাকবে। এই পুঁজির অভাবের আঁকটাই আমরা আগের অধ্যায়ে পরিবেশন করেছিলাম। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনাকারেরা যেমন পুঁজির দিকটায় না তাকিয়ে একপেশে হয়েছেন, তেমন আমরাও শুধু পুঁজির দিকে তাকালে একপেশে হব। অর্থাৎ, পুঁজির দরুণ পরমুখাপেক্ষিতা কমবে না একথা সত্য হলেও মালমশলা যন্ত্রপাতি এবং কারিগরি বিদ্যার দরুণ পরমুখাপেক্ষিতা যে প্রায় লোপ পাবে তা অর্থনীতিতে একটা বিশাল গুণগত পরিবর্তন সূচিত করবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কীর্তি তা হলো লোহা ও ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণের গোড়াপত্তন। এই লোহা ও ইস্পাত শিল্পের ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় যন্ত্রনির্মাণ শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে। সোভিয়েত-সাহায্যে রাঁচি এলাকায় যে যন্ত্রনির্মাণের কারখানা স্থাপিত হচ্ছে তা প্রতি বছর একটি করে ১ মিলিয়ন টনের ইস্পাত

কারখানার সমুদয় যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতে পারবে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের বিকাশ যে কতদূর এগিয়ে যাবে তার খানিকটা আন্দাজ নিচের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যেহেতু অতিকায় এবং তার বৃদ্ধির হারও যেহেতু অত্যধিক, সেইহেতু মাথাপিছু কি জোটে না জোটে বা কি হচ্ছে না হচ্ছে তার হিসেব করলে অনেক জিনিসই অত্যন্ত নগণ্য ঠেকে। কিন্তু জীবনমানের গণনায় মাথাপিছু হিসেবই যথাযোগ্য হলেও অর্থনীতির গুণগত প্রগতির হিসেবে তা সবসময়ে শ্রেষ্ঠ মাপ নয়। এবং অন্যান্য বহু ক্ষুদ্রতর আয়তনের উন্নত অর্থনীতির দেশের সঙ্গে তুলনা করলে গুণগত দিক থেকে ভারতের অর্থনীতির শক্তি ও সামর্থ্য যে ১৯৭৫ সালে একেবারে তুচ্ছ হবে না তা মানতেই হয়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

	১৯৬০-৬১	১৯৭৫-৭৬
ইস্পাত	২½ মিলিয়ন টন	১৮ মিলিয়ন টন
লোহা	০'৯ মিলিয়ন টন	৪ মিলিয়ন টন
এ্যালুমিনিয়ম	১৮,০০০ টন	২৫০,০০০ টন
তামা	৯,০০০ টন	৩৫,০০০ টন
কয়লা	৬০ মিলিয়ন টন	২০০ মিলিয়ন টন
বিদ্যুৎ	৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট	২৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট
সিমেণ্ট	৯ মিলিয়ন টন	৩০ মিলিয়ন টন
রাসায়নিক সার	২০০,০০০ টন	২'৫ মিলিয়ন টন
বস্ত্র (কার্পাস)	৭৫০০ কোটি গজ	১২০০ কোটি গজ

দ্বিতীয় যে গুণগত পরিবর্তন প্রণিধানযোগ্য তা হলো কৃষির অর্থনৈতিক কাঠামোতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অদলবদল। কংগ্রেসী ভূমিসংস্কার ভূমিসমস্যার মূলে হাত দেয় নি। কংগ্রেসরাজ ভূমিসংস্কারের ক্ষেত্রে জনসাধারণকে বঞ্চনা করেছে—এ সবই ঠিক। কিন্তু কংগ্রেসী ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনীশক্তিগুলির কোনোই বিকাশ হয় নি বা হবে না; একথা বলাটা বড় রকমের ভুল হবে। গত দশ বৎসরের কৃষির ইতিহাসে নজর করে দেখলে দুইটি বিপরীত ধারা লক্ষ্য করা যায়। এক হলো শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্য; অপরটি হলো পুঁজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অসাফল্য।

শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষি মোটের উপর সফল হয়েছে এ কথাটায় অনেক পাঠকই জোর আপত্তি করবেন। একথা ঠিক এখনও বিদেশ থেকে শস্য আমদানি করতে হচ্ছে; একথা ঠিক গত দশ বছরে বার বার খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি জনসাধারণের খাসরোধকর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এও সত্যি যে এমন বছরও গেছে যখন চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন হয়েছে, মূল্য হ্রাসও ঘটেছে। উৎপাদনবৃদ্ধি যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়তো হয় নি। কিন্তু উৎপাদনবৃদ্ধি একেবারে কিছু হয় নি তা-ও ঠিক না। ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা এমনই একটা পর্যায়ে রয়েছে যে উৎপাদনীশক্তিগুলির কোনো সম্প্রসারণই তার মধ্যে আর সম্ভব নয়—এ-জাতীয় একটা প্রস্তাব প্রায়ই বামপন্থীমহলে শোনা যায়, কিন্তু তার তথ্যভিত্তি কি আছে তা গভীর অনুধাবন সাপেক্ষ। কংগ্রেসরাজ যে ধরনের ভূমিসংস্কার করেছে তার দ্বারা এমন একটি শ্রেণী কৃষির ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে যা সম্পূর্ণই পরভৃত্তিকাজাতীয় নয়, যার মধ্যে বুর্জোয়া অন্ত্রপ্রনর (entrepreneur)-এর লক্ষণ খানিক আছে। কম্যুনিটি ডেভলপমেণ্ট প্রভৃতি নানা সাদা হাতির মারফৎ অপচয় প্রচুর হয়ে থাকলেও কৃষির উপকারও একেবারে কিছু হয় নি তা ঠিক নয়। সেচের জল অনেক অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু অনেকাংশে তা ব্যবহৃতও হচ্ছে; কাজের সুবিধা যত দেওয়া হচ্ছে কৃষিব্যবস্থার প্রতিকূলতার দরুণ কৃষকেরা তার সবটা ব্যবহার করে উঠতে পারছে না—ঠিক, কিন্তু এই সরকারী খাতের অনেক টাকাই যে এইভাবে কৃষিতে পুঁজি নিয়োগের কাজে লেগেছে তা-ও ঠিক। রাসায়নিক সার যে-পরিমাণ সরবরাহ হয়েছে তার চতুর্গুণ পরিমাণ চাহিদা কৃষকদের কাছ থেকে এসেছে। এতটা সেচের জল, এতটা কর্জ, এতটা রাসায়নিক সার যে জমিতে অনুপ্রবেশ করেছে তা ফল না দিয়ে যেতেই পারে না। আর তা জমিতে অনুপ্রবেশ করেছে এই কংগ্রেসীরাজের নয়া জমনার কাঠামোতেই। এখানে প্রশ্ন ওঠে, গত দশ বছরে যেটুকু বিকাশ দেখা গেছে তা কি স্থায়ী হবে, নাকি সে বিকাশ কিছুদিনের মধ্যেই অবরুদ্ধ হয়ে যাবে? ভারতবর্ষের কৃষিতে যেটুকু বিকাশ দেখা যাচ্ছে তা অত্যন্ত ক্ষীণপ্রাণ, আশু-ভবিষ্যতে তা বিপুল আকার ধারণ করবে এমন কোনো সম্ভাবনাই নেই, কিন্তু তা যে সম্পূর্ণই অবরুদ্ধ হয়ে যাবে তা-ও বলা যায় না। মনে হয় এখনকার মতো শীর্ণ ধারায় প্রগতিই আরও বিশ পঁচিশ বছর অন্তত চলবে।

তার পরের কথা বলা যায় না। কিন্তু যা গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে এই প্রগতির হার এত ক্ষীণ হবে না যে অর্থনৈতিক প্রগতির হারকেও তার দরুন কমতে হবে। প্রবন্ধটির আগের অধ্যায়ে অর্থনীতির সামগ্রিক প্রগতির হার কতটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার আলোচনা করেছি। এই বিশেষ হারটি—যা অবশ্যই অতি সামান্য—অর্জিত হওয়ার জন্য কৃষির প্রগতি-হারের যে প্রয়োজন, তা কৃষি অর্জন করতে সমর্থ হবে বলে আমার মনে হয়।

বাস্তবিকপক্ষে সামগ্রিক অর্থনীতির প্রগতির হার যে এত কম তার জন্য কৃষির উৎপাদনের প্রগতির হার খুব বেশি দায়ী নয়। এ কথাটাতেও অনেকে চমকে উঠবেন, কারণ কৃষির পিছুটানই সমগ্র অর্থনীতির প্রগতিকে ব্যাহত করে—একি মার্কসীয় অর্থনীতির একটি অন্যতম প্রধান সূত্র নয়? ঠিক বটে, কিন্তু আমাদের সাম্প্রতিক অর্থনীতির অবস্থাটা এরকমই যে এ কথা বলা যায় না যে কৃষিতে উৎপাদন যদি আরও বেশি হতো তাহলেই অর্থনীতির প্রগতির হারকে বাড়ানো যেত। অন্যভাবে ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, কৃষির উৎপাদনের যে বর্তমান হার তার সঙ্গে তাল রেখেই অর্থনীতি আরও অনেক বেশি হারে প্রসারিত হতে পারত, যদি অন্য বাধা না থাকত। কারণ কৃষির মূল যা পণ্য, অর্থাৎ খাদ্যশস্য, তার সত্যি কোনো ঘাটতি দেশে এখন আর নেই, বেশ অনেক বছরই নেই। তা সত্ত্বেও যে প্রায়ই টানাটানি হয়, মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, তার প্রধান কারণ কালোবাজারি কারবার তো বটেই, তাছাড়া অন্য একটি কারণ এই যে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল তারা খাদ্যশস্য খায় সাধারণের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে। মাথাপিছু প্রয়োজন হিসেবে গণনা করলে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন যতটা হওয়া দরকার তার চেয়ে কম তো নয় বরং খানিক বেশিই উৎপাদন হচ্ছে। অর্থনীতির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্যের বদলে অন্য জিনিস খাওয়ার বা ব্যবহার করার অভ্যাস ধীরে-ধীরে ছড়াবে। সুতরাং খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজন শুধুমাত্র জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারে, অর্থনীতির প্রগতির হার যাই-ই হোক না কেন!

কিন্তু কৃষির পিছুটান যে অর্থনীতির প্রগতির সামগ্রিক হারকে নিচে ধরে রাখছে না তা বলা হচ্ছে না। কৃষির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেই শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাফল্য এবং পুঁজির উৎপাদনের ক্ষেত্রে অসাফল্যের কথা বলা হয়েছিল। যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজির অভাবই আমাদের অর্থনৈতিক

প্রগতির মন্থরতার মূল কারণ। আর এই পুঁজির অভাবের অন্যতম মূল কারণই আমাদের কৃষির অর্থনৈতিক কাঠামো। বর্তমান শাসকশ্রেণীর ভূমিসংস্কারের পরেও এই মূল সমস্যাটির কোনো সুরাহা হয় নি। কৃষির অর্থনৈতিক কাঠামো এমনই যে কৃষিতে অর্জিত আয়ের খুব কম অংশই পুঁজিনিয়োগের খাতে যায়। কৃষিতে উৎপাদন বেড়েছে আমরা দেখেছি, কিন্তু তার জন্ত যা পুঁজি নিয়োগ করতে হয়েছে তার বেশির ভাগই এসেছে কৃষির বাইরে থেকে। কৃষি যদি স্বাবলম্বী হতে পারত, কৃষির জন্ত যদি সরকারী খাতে বিপুল পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করতে না হতো তো সেই পুঁজি দিয়ে শিল্পের উন্নয়নকে আরও অনেক গতিশীল করে তোলা যেত। কৃষির অসাফল্য এইখানেই।

অর্থনীতির তৃতীয় যে গুণগত পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনসেবামূলক রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বিপুল সম্প্রসারণ। আরও অনেক হতে পারত ঠিক, তবু যা হয়েছে, হচ্ছে এবং দশ-পনেরো বৎসরের মধ্যে হবে তা যে সমাজে একটা গুরুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তন এনে দিচ্ছে তা অস্বীকার করার প্রশ্নই ওঠে না। ১৯৫১ সালে প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার বয়সী ছেলেমেয়েদের মাত্র ৪৩% স্কুলে যেত, ১৯৬১ সালে সে হার ৬১%-তে পৌঁছেচে, ১৯৭৫ সালে তা ৯৫%-এ পরিণত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। মাধ্যমিক স্কুলের হার ১৯৫১-তে ছিল ১২.৩%, ১৯৬১ সালে তা ২২.৮%-এ পৌঁছেচে এবং ১৯৭৫ সালে তা ৭৫%-এ পৌঁছতে পারে। হাই স্কুলের হার এখন মাত্র ১১%, তাকে ৩৩%-এ তোলার চেষ্টা হবে। স্কুল শিক্ষার খাতে সরকারী ব্যয় ১৯৫১ সালে হয়েছিল ৭১.৫ কোটি টাকা, ১৯৬১ সালে হয়েছে ১৮৫ কোটি টাকা, ১৯৭৫ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ ১০০০ কোটির কাছাকাছি যাবে বলে অনুমিত হয়। এ হলো চলতি খাতের হিসেব, পুঁজির খাতের খরচ তো এর উপর আছেই। কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্রের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল ১৪০,০০০; ১৯৬১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩২৫,০০০-এ। ১৯৭৫ সালে তা ১৩০০,০০০-এ পৌঁছতে পারে। ১৯৫১ সালে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষা-গ্রহণ করে ২৭০০০ ছাত্র; ১৯৬১ সালের সংখ্যা হলো ১০৪,০০০। ১৯৭৫ সালে দেশে ৬০০,০০০-এর বেশি এঞ্জিনিয়ার শিক্ষালাভ করবে। উচ্চ শিক্ষার চলতি খাতে সরকারী ব্যয় ১৯৫১ সালে ছিল ১৯ কোটি টাকা, ১৯৬১ সালে তা হয়েছে ৫৪ কোটি টাকা এবং ১৯৭৫ সালে তা ১৭৪ কোটিতে পৌঁছবার সম্ভাবনা রাখে। ১৯৫১ সালে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল ৬১,৫০০ নার্সের সংখ্যা

১৬৩,০০০; হাসপাতালে রোগীর বেড ছিল ১১৭,০০০। ১৯৬১ সালে ডাক্তারের সংখ্যা ৮০,০০০-এ; নার্সের সংখ্যা ৩৩০,০০০-এ এবং বেডের সংখ্যা ২০০,০০০-এ দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৫ সালে অনুমান করা যায় ডাক্তারের সংখ্যা হবে ২০০,০০০ মতো। নার্সের সংখ্যা হবে দশ লক্ষ এবং হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ৬০০,০০০। আর সংখ্যার রাশি বাড়িয়ে কাজ নেই। এর আগের অধ্যায়ে যখন আমরা চাল-ডাল-তেল-নুন-লকড়ির মাথা পিছু সংখ্যা পেশ করেছিলাম তখন জীবনমানের উন্নতি যতটা কম হবে বলে মনে হয়েছিল সেটা তাহলে খানিকটা একদেশদর্শিতার দরুণ হয়েছিল। জীবনমান তো শুধু তেল-নুন-লকড়ির হিসাব নয়। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষালাভের সুযোগ কতটা মিলছে তা-ও জীবনমান বিচারের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কষ্টিপাথর এবং এই কষ্টিপাথরের বিচারে যে উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে তা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বিশেষ করে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তো একটা রীতিমত বিপ্লবই ঘটে গেছে, যদিও তার জন্ত কোনো কৃতিত্বই কংগ্রেসীরাজ দাবি করতে পারেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অবিশ্বাস্ত বেগে অগ্রসর হয়েছে। পেনিসিলিন্, সাল্‌ফা প্রমুখ ওষুধের কল্যাণে পাশ্চাত্ত্য জগতে অকালমৃত্যু সম্বরই অতীতের স্মৃতিতে পরিণত হতে চলেছে (যদিও রাজরোগ ও কর্কটরোগের কোনো যথার্থ প্রতিকার এখনও পাওয়া যায় নি) এবং তার প্রভাব আমাদের দেশেও গভীরভাবে পড়েছে। এ-প্রভাব শুধু ধনী মহলেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। সরকারী হাসপাতাল ও ডাক্তারের মারফৎ দরিদ্রতম পর্যন্ত না হোক অন্তত পক্ষে নিম্নমধ্যবিত্ত পর্যন্ত পৌঁছেচে। ম্যালেরিয়া আজ বিদূরিত, কলেরা সহজেই নিরময়, টাইফয়েডের রোগী সাত-দশদিনে ভাত খাচ্ছে। শিশুমৃত্যু ও প্রসূতি-মৃত্যুর হার নেমেছে। এই মরণজয়ী বিজ্ঞানের প্রগতির জন্ত কৃতিত্ব কার তা এখানে আলোচ্য নয়। যা প্রণিধানযোগ্য তা এই যে বিজ্ঞানের এই প্রগতি গত দশ বছরে সাধারণ ভারতবাসীর জীবনমানকে একটি বিশেষ দিকে অনেকখানি উন্নত করে দিয়েছে এবং এই বিশেষ উন্নতির হার সামনের পনের বিশ বছরে বাড়বে বই কমবে না।

চতুর্থ ও শেষ গুরুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তন হলো মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি। মধ্যবিত্ত পাঠক মাত্রেই কথাটি পড়ে প্রবল আপত্তি বোধ করবেন, কিন্তু অভ্যস্ত ধারণাকে ভেদ করে সত্যের অনুসন্ধান করলে

একথা ধরা পড়বেই যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেটুকু ঘটছে তাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত কিছু প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে। প্রবণতাটি উত্তরোত্তরই বাড়বে। একথা বলা হচ্ছে না যে অন্য সব শ্রেণীর তুলনায় মধ্যবিত্তের সচ্ছলতা বেড়েছে। শ্রমিকজনতা, কৃষিজনতার মধ্যেও কিছু সাচ্ছল্য দেখা দিয়েছে বৈকি। তাছাড়া ধনিক সম্প্রদায় যে দইয়ের নেপোর অংশটি মেরে দিয়েছে তাতো বটেই। শ্রমিক জনতার, কৃষি জনতার এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশ নিশ্চয় আছে যাদের অবস্থার কোনো উন্নতি তো হয়ইনি বরং অবনতিই হয়েছে, তবে মোটের উপর হিসেব করলে সাচ্ছল্য সবকটি শ্রেণীকেই স্পর্শ করেছে মানতে হয়। মধ্যবিত্তের সাচ্ছল্য বৃদ্ধির কয়েকটি দিক একটু আলোচনা করা যাক। প্রথমত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বের প্রকোপ অনেক কমে গেছে। ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে সরকারী চাকুরি বহু পরিমাণে বেড়েছে। ১৯৫০ সালে সরকারী চলতি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭২৫ কোটি টাকা; ১৯৬১ সালে তা ১৮২০ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৫ সালে তা ৬০০০ কোটিতে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এ হলো শুধুমাত্র শাসন-ব্যবস্থার এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের খরচের হিসেব অর্থাৎ সরকারী পুঁজি নিয়োগের খরচের হিসেবের বাইরে। সরকারী চাকুরি সৃষ্টির মালটিপ্লায়ার (বা গুণকারক) এক্ষেত্রে বেসরকারী চাকুরি কত সৃষ্টি হয়েছে তার অবশ্য হিসেব নেই, কিন্তু যা হয়েছে তা-ও নগণ্য নয়। গত দশ বছরে প্রচুর স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে, এখনও বাড়ছে। দশ বছর আগে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে ছেলেদের বসে থাকতে হতো, চট্ করে সকলের চাকুরি জুটত না। এখন সে সমস্যা অনেকাংশে অন্তর্হিত হয়েছে, এখন সমস্যা দেখা দিচ্ছে বিপরীত প্রকৃতির—পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষ শিল্পী মিলছে না। ডাক্তার, নার্স, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি যে সব বিশেষজ্ঞতার জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাদের দীর্ঘকালীন হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে আগামী পনেরো বছরে এদের অকুলান উত্তরোত্তর বাড়বে। চাকুরির বাইরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিবিধ পেশার বাজারেও চাকুরির সঙ্গে তাল রেখে কারবার ফাঁপছে এবং এ-কারবার অনেকাংশেই ক্ষুদ্র কারবার, এর মুনাফার ভাগী অনেকাংশেই সাধারণ চাকুরেদেরই সমস্তরের সাধারণ মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্ত সাচ্ছল্যের আরেকটা গুণগত গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে সংস্কৃতির উন্নয়নের নামে যে

ধরণের সরকারী সাহায্য ও আনুকূল্য বিতরণ করা হচ্ছে, তার মধ্যে। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের বেতন অনেক বেড়েছে, গবেষণার নামে প্রচুর টাকা পয়সার ছড়াছড়ি করা হচ্ছে। সরকারী তরফ থেকে লেখকদের এবং সঙ্গীত-বাদ্য ও নৃত্য শিল্পীদের উৎসাহ বর্ধনার্থে নানান পুরস্কার, পারিতোষিক ও সম্মান বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছে। এ সবের জন্য লেখক বা শিল্পীদের জীবনমান অনেকটা বেড়ে গেছে তা বলছি না, কিন্তু আপাতত তো জীবনমানের খোঁজ করছি না। জীবনমান যে কতটা বেড়েছে এবং কতটা বাড়বার সম্ভাবনা রাখে তার হিসেব আগেই করা গেছে। এখানে শুধু মধ্যবিত্তের মধ্যে এমন এক জাতীয় আপেক্ষিক সাচ্ছল্যের কথা আলোচনা করছি যা মধ্যবিত্তের মানসে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এই বিশেষ দিকটি থেকে বিচার করলে সরকারী আনুকূল্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তার কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের মধ্যে যে ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে এবং উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণ দেখা দেবে তা একেবারেই উপেক্ষনীয় নয়। ১৯৭৫ সালের দিগন্তের দিকে তাকালে দেখব এই প্রবণতার ক্রমবিকাশে মধ্যবিত্ত এমন এক চেহারা গ্রহণ করেছে যা প্রাক্‌যুদ্ধকালের মধ্যবিত্তের থেকে তাকে অনেকখানি আলাদা করে দেয়। ১৯০০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যবিত্তের মধ্যে একটিই ধারা লক্ষিত হয়েছিল, তা হলো তার আর্থিক ক্রমাবনতি। তার জীবনমান হচ্ছিল উত্তরোত্তর খারাপ, পাশ করা ছেলেরা "হা চাকরি, হা চাকরি" করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, শিক্ষা-গবেষণা-সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের নির্মম অর্থকষ্টের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে যেতে হয়েছিল, সামান্য সরকারী আনুকূল্যও তাদের জোটেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই মধ্যবিত্ত কি সংগ্রামী ভূমিকা নিয়েছিল তা সুবিদিত। একটি বিশেষ ধরনের আপেক্ষিক সচ্ছলতা এই মধ্যবিত্তের মানসে যদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন এনে দেয়, তা সমস্ত সমাজ ও অর্থনীতির পক্ষেই একটি গুণগত পরিবর্তন সূচিত করবে মনে করলে কি ভুল করা হবে?

এবার আমাদের বক্তব্যের দুটো পাশকে একত্র করে একটি সমন্বিত বক্তব্য পেশ করতে সমর্থ হব। আমাদের সামনে যে অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা হতাশাজনক ত্রিবিধ কারণে। এক কারণ এই যে আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক তুলনায় যেটুকু প্রগতি আমাদের হবে তার পরিমাণ অতি সামান্য। দ্বিতীয় কারণ এই যে আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক

মানে যাই হোক, সাধারণ এক জনমানসে এই প্রগতি মোটেই অকিঞ্চিৎকর দেখাবে না। তৃতীয় কারণ এই যে ঐতিহাসিক বিচারে নগণ্য কিন্তু জনমানসের সাধারণ বুদ্ধির বিচারে অ-নগণ্য এই প্রগতির হারটা আরও বিশ পঁচিশ বছর অনায়াসেই বজায় থাকবে বলে মনে হয়।

কার্ল মার্কস সামাজিক বিপ্লবকে উৎপাদক শক্তি, উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ বিস্ফোরণ হিসেবে দেখেছিলেন। বিস্ফোরণটা অবশ্য রোমার বিস্ফোরণের মতো নির্জীব পদার্থের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মাত্র নয়, তাতে সচেতন মানুষ অংশগ্রহণ করে। তাতে মার্কস-এর ছকের কোনো অসুবিধে হয় না, কারণ সচেতন ও শ্রেণীবদ্ধ মানুষ উৎপাদক শক্তিগুলির অন্যতম। শ্রেণীবদ্ধ ও সচেতন শ্রমিকসমাজ কিভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতা অর্জন করবে বোঝাতে গিয়ে মার্কস pauperisation-এর থিয়োরির পত্তন করেছিলেন। মার্কস ধারণা করেছিলেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এ-পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক জনসাধারণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে উঠবে এবং শেষ পর্যন্ত নিষ্পেষণ যখন অসহ্য হয়ে উঠবে তখন শ্রেণীবদ্ধ শ্রমিকজনতা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দরুণ এই নিষ্পেষণ তাকে ভাঙতে উদ্যত হবে। এইভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উৎপাদক শক্তিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ধনিক ও শ্রমিকদের সংঘর্ষের রূপ নেবে।

কিন্তু মার্কস-এর pauperisation-এর ভবিষ্যদ্দর্শন সত্য প্রমাণিত হয়নি (যদিও, বলাই বাহুল্য তাতে মার্কসবাদ বিজ্ঞান হিসেবে বাতিল হয়ে যায় না)। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অন্তত বিশ শতকের গোড়া থেকে এই প্রবণতা বিদূরিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে আলাদা আলাদা না করে দেখে যদি সমগ্র ধনতান্ত্রিক দুনিয়াকে একসঙ্গে দেখা যায় তাহলে অবশ্য এই সেদিন পর্যন্ত pauperisation-এর থিয়োরি সত্য প্রমাণিত হয়ে এসেছে। কারণ, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আওতার বাইরে গোটা যে ঔপনিবেশিক জগৎ তাতে জনসাধারণের জীবনমান ক্রমশই অবনত হয়েছে এবং তাদের শোষণের অংশভুক্ত হয়েই উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীও তাদের জীবনমান উন্নত করতে পেরেছে। কিন্তু গত দশ বৎসরের ইতিহাসে দেখছি, ভারতবর্ষের মতো দেশেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই গতির মোড় ফিরিয়ে দেওয়া গেছে। যত স্বল্প হারেই হোক, শ্রমিক সাধারণের জীবনমান অবনত না হয়ে উন্নতই হয়েছে এবং এই স্বল্পহারের প্রগতি আরও বিশ পঁচিশ বছর চালিয়ে নেওয়ার

মতো কিছু গুণগত পরিবর্তন অর্থনীতিতে এসে গেছে। প্রশ্নটা এখানে উঠছে pauperisation-এর দরুণ জনসাধারণের যে বিপ্লবী চেতনার উন্মেষের আশা মার্কস করেছিলেন, pauperisation-এর অনুপস্থিতিতে তা কি-উপায়ে সাধিত হবে? প্রশ্নটিকে মার্কসীয় আলোচনায় প্রায় সময়েই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ফ্রান্স বা ইতালির মতো দেশে pauperisation যে সত্যিই আজও মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি, তা প্রমাণের করুণা-উদ্রেককর চেষ্টা এখনও প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের পক্ষে বিতর্কটা এতদিন নিতান্তই সুদূর ছিল, কিন্তু এখন আমাদেরও এ-প্রশ্নের সরাসরি সম্মুখীন হতে হবে।

আমি শুধু এইটুকু বলে শেষ করব যে আন্তর্জাতিক এবং ঐতিহাসিক তুলনায় আমাদের প্রগতির হারটা যে নিতান্তই তুচ্ছ, একথাটা যত বড় সত্যই হোক, তা বিপ্লবের সম্ভাবনা বিচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে কয়েক শতাব্দীর ক্রমাগত অর্থনৈতিক অবনতির পর আজ দশ বৎসর কংগ্রেসী নয়া জমানার আওতায় ভারতীয় অর্থনীতি আবার গতিশীল হয়ে উঠেছে এবং সে-গতি শুধু কতিপয় বৃহৎ ধনতান্ত্রিকেরই ধনবৃদ্ধি করে নি, তা শ্রমিকজনসাধারণ ও কৃষিজীবীদের মধ্যেও সামান্য হারে হলেও জীবনমানের উন্নতি ঘটাচ্ছে এবং মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে শুধু জীবনমানের উন্নতিই ঘটাচ্ছে না, তার মানসে পরিবর্তন ঘটাতে পারার মতো নানাবিধ সুযোগ সুবিধারও সৃষ্টি করছে।

এই প্রবন্ধটি বিতর্কমূলক। আমরা এ-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আহ্বান করছি—সম্পাদক।

পাহাড়ের ডাক

রাম বসু

[বাড়িটা পাহাড়ের ঠিক ধারেই। কান পাতলে শোনা যায় অবিরাম ঝর্ণার শব্দ আর মাদলের আওয়াজ। চারপাশে বাগান। পর্দা উঠলে দেখা যাবে স্টেজের মাঝখানে শমীক দাঁড়িয়ে প্রৌঢ় আদিবাসী সর্দারের সঙ্গে কথা বলছে। শমীকের বয়স তিরিশের কাছাকাছি]

শমীক : তারপর তোমরা ওখানে ওই গাছের তলায়

সর্দার : ওই গাছের নিচেই কবর দিলাম

শমীক : তোমরা সবাই মিলে পাথরের চাঙড়গুলোকে
থরে থরে সাজিয়ে রাখলে
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বর্ষার সন্ধ্যায়

সর্দার : কী বৃষ্টি সেদিন! এতো বৃষ্টি কখনো দেখি নি
ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো
মেঘে মেঘে কুমির-আকাশ। হাওয়া রাগন্ত নেকড়ে।

শমীক : আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, খুব স্পষ্ট ; চোখের সামনে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাঁকে।
বিদ্যুতের সাপগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে চোখে মুখে
কুঁদে তোলা পাথুরে মুখটা দৃঢ়, শপথে অটল
পাহাড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর মাথা অনেক উঁচুতে
পায়ের নিচেই মৃত,...মৃত ও শায়িত...

সর্দার : শিকারের মতো, রক্তমাখা, থ্যাতলানো, হিম, কাঠ...
সাহেবের পাকা হাত, ওস্তাদ শিকারী
একবারও নড়ে নি একটুও।
যেন কিছুই হয় নি—এমন সহজ স্বরে তিনি
বলেছিলেন আমাকে :
এখানে পলাশ গাছ পুঁতে দিবি মাঝী
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে।

শমীক : পঞ্চাশ বছর পরে আমি
সাহেবের প্র-পৌত্র আমি, জিজ্ঞাসা করছি
মালী তুমি কিছু জানো কেন, কেন…
কিছু কি শুনেছো ? কোন ঘটনা অথবা…

সর্দার : একটা গুলির শব্দ ছাড়া
কিছুই শুনি নি।

শমীক : এবং চিৎকার ?
চিৎকার শোনো নি তুমি ?
বাঘিনীর গর্জনের মতো
কখনো শোনো নি ? আমি কিন্তু ঠিক শুনতে পাই, ঠিক।

সর্দার : চিৎকার এখনো কানে বাজে ঘুরে ঘুরে আসে।

[বাগানে মায়া। জানলা দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে। মায়া শমীকের স্ত্রী। বাগান থেকেই মায়া শমীককে ডাকছে]

মায়ার কণ্ঠ : কি করছ কি ভেতরে ?
বাইরে এসো না।
বিজ্ঞানী-মশাই, শুনছেন, আমি
রৌদ্রে মাতাল হয়েছি।

শমীক : সর্দার, কিছুই জানো না, না ?
কিছুই শোনো নি তুমি ? তা কি হয়। বলো
আজ বলতে কি দোষ ?
অনেক পুরানো কথা।

সর্দার : সে কথা বলতে নেই

শমীক : তবে কিছু জানো…বলো…কোনো দোষ নেই।

সর্দার : পাহাড়ের দেবতা ডাকত।

শমীক : পাহাড়ের দেবতা ডাকত ?

সর্দার : ডাকে। দেবতার যাকে ইচ্ছা তাকে ডাকে।
…দিতে হয়।…তাকে দিতে হয়
দেবতার থানে।
ওকে ডেকেছিল।

শমীক : আমার ঠাকমাকে ? ডেকেছিল ? আমার ঠাকমাকে ?

সর্দার : পাহাড়ের দেবতা ডেকেছিল।
সাহেব দেয় নি। দেবতার ধন দেবতা নিজেই
একদিন রাত্রে এসে নিজে নিয়ে গেল।
সাহেবের বিশ্বাস হয় নি,
ভেবেছিল নষ্ট হয়ে গেছে।
তাই পরদিন ভোরে বর্শার ধারেই…

শমীক : একটা গুলির শব্দ।

মায়ার কণ্ঠ : এটা কি পলাশ গাছ? কি অদ্ভুত! ভাখো
তুই নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে
স্পন্দিত বীজের মতো। ভাখো
আমি মুকুলিত হব।

সর্দার : অনেক পুরানো কথা। সকলে জানত
সাহেবের সঙ্গে জঙ্গলে শিকারে গিয়ে…

শমীক : এ কথা আর কে জানে

সর্দার : তারা আজ কেউ নেই

শমীক : শুধু তুমি ছাড়া

সর্দার : শুধু আমি ছাড়া

মায়ার কণ্ঠ : বাইরে, বাইরে এসো।
ভাখো, আলোয় আলোয়
পৃথিবী রহস্য হয়ে গেছে।

শমীক : তুমি কেন আছ?

[প্রশ্নটা বুঝতে পারল না সর্দার। তাকাল]

তুমি আজো কেন বেঁচে আছ?

সর্দার : আমারও সময় হলো

শমীক : আমি যেন ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয় তোমার…

সর্দার : আমি যাই।

মায়ার কণ্ঠ : সুরচির কোলাহলে আমি হারিয়ে গেলাম।

শমীক : আমার নির্দোষ দিগন্তকে এইভাবে
রক্তে কলুষিত করে তোমার বাঁচার
অধিকার নেই।

মায়াত্মক দুঃস্বপ্ন বিছিয়ে
তুমি ভয় দেখাবে আমাকে ?
তুমি দিতে চাও নিপুণ হত্যার
উত্তরাধিকার ?
মিথ্যা, মিথ্যা, তুমি আদিম মিথ্যার কণ্ঠ।
আমি অস্বীকার করি।
কি প্রমাণ আছে ? এই রূপকথা
কে বিশ্বাস করবে ? কে বলবে
খুনীর বংশের আমি, এই আমি ডক্টর শমীক রায় ?
একটা গুলিতে আমিও তোমাকে
স্তব্ধ করে দিতে পারি,
কিন্তু তা দেবো না, যাও।

[সর্দার চলে গেল। তার হাতে তীর-ধনুক ও মৃতপাখি। স্টেজ অন্ধকার। শমীক একা দাঁড়িয়ে। বাগানে মায়ার কণ্ঠ]

মায়ার কণ্ঠ : আমি কত হাল্কা হয়ে গেছি রোদ্দুরে হাওয়ায়
বাইরে, এখানে এসো মেঘের তলায়।

[শমীক নিরুত্তর। অল্প পরে মায়া এলো। ওদের দুজনকে ঘিরে আলোর ছোট্ট স্বতন্ত্র বৃত্ত]

মায়া : কি হয়েছে তোমার বলতো ?
দু-দিন পাথর হয়ে আছ।
কথা নেই, হাসি নেই, কি ব্যাপার বিজ্ঞানী-মশাই ?

[শমীক নিরুত্তর। বিরক্তি]

বিশেষ সংবাদদাতা, খুঁটি, আজ তেসরা এপ্রিল
ডক্টর শমীক রয়, নাম করা বিজ্ঞানী এবং
অল্পাধিক কবি, পিতামহের আবাস দেখতে এসে
মনোকষ্টে অত্যন্ত কাতর। চিকিৎসকের মতে তাঁর
এই স্থান ত্যাগ করা অবশ্য বিধেয়। অতএব
হে পতি দেবতা দাসী কলকাতার জন্যেই প্রস্তুত।

[শমীক নিরুত্তর। বিরক্তি]

কিন্তু আমার কী ভালো লাগছে যে। মনে হচ্ছে আমি
ওই ঝর্ণার মতন প্রবাহিত হয়ে গেছি দূরে

সমস্ত আকাশ আলো মেঘ পাখির ডানায় বোনা
সত্তার উজ্জ্বল অংশ এতকাল যা ছিল দুর্জ্ঞেয়
অবারিত হয়ে গেছে আজ, স্বচ্ছতার দীপ্তি লাগে
ভালোবাসার ওপর, এই দেহ মর্মরিত হলো
আমি যেন বলতে পারি : আনন্দিত, আমি আনন্দিত।
স্বামী মহাশয়,
বিষণ্ণ আনন কেন হেরি আপনার ?

[মায়া শমীকের হাত ধরে টানতে গেল। শমীক পিছিয়ে এলো। ওরা দু-জন দুটি আলোর কক্ষ বৃত্তে]

কথা বলবে না, এই তো ? বয়ে গেছে। আমি
কথা বলে যাব, আমি কথা হয়ে গেছি।
কোন ভোরে উঠে গেছি বর্ণার কিনারে ; মগ্ন পূব
পশ্চিম বিভোর। আমি তার মাঝখানে
স্তব্ধতার বীজ ; আমি স্থির, ঘন-কালো,
এই মাত্র ফেটে পড়ব যেন। সমস্ত স্তব্ধতা
গান হয়ে যাবে।
চারপাশে রামধনুর বলয়, মৃত্যুর উপরে
উর্বরতা। শিকড়, বল্কল, পাতা, সমস্ত জটিল
উপাদান একটা নিমেষে যেন মন্ত্র হয়ে যাবে।
আমি যে এমন ভাবে ভাবতে পারি জানি নি কখনও।

[বিরতি। শমীক নিরুত্তর]

আজকে বাগান অকস্মাৎ চোখের সামনে
ফুল হয়ে গেল। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। আমি
আগে কখনও দেখিনি। ফুলের জন্মের লগ্ন আগে
কখনও দেখি নি। ওই যে পাথর ঢিপি হয়ে আছে
ওর পাশে পলাশ গাছটা অকস্মাৎ জলে উঠল
কোমল আগুনে, মনে হলো আমার ভিতর থেকে
সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, আমার সত্তার অংশ।

[শমীক জানলা বন্ধ করে দিল]

ও কী করছ? খুলে দাও, খুলে দাও,
রোদ্দুরে পৃথিবী ভাসছে, চলো ওই পলাশের নিচে
তুমি বসে পড়াশুনা করবে আমি প্যাটার্ন তুলব।

শমীক : আমার বন্দুক কোথায় রেখেছ মায়া?

মায়া : কি ব্যাপার? এমন সকালে শিকারের তৃষ্ণা কেন?
ওই বুড়োটা নিশ্চয়ই তোমার মাথায়…।
জল ডুমুরের কানে ঝর্ণা অস্ফুট কথা বলে
আমাদের কথাগুলো অমন হয় না তো!

শমীক : আমার বন্দুক কোথায় রেখেছ মায়া?

মায়া : এই ঘরে। এনে দেব? এখুনি আনছি
কিন্তু মনে থাকে যেন আজকে শিকার চলবে না।

[মায়া পাশের ঘরে গেল। সেই ঘর থেকে বলছে]

মায়া : শুনতে পাচ্ছ তুমি?

শমীক : কি?

মায়া : অজস্র পাখির ডাক।

শমীক : কোথায়?

মায়া : আমাদের বাগানের ধারে।

শমীক : না।

মায়া : সাবধান লাইত কার্তুজ।

[মায়া বন্দুক ও কার্তুজ হাতে দিল]

কি চমৎকার বেদী ওই গাছের তলায়
কি নরম মসৃণ গভীর শ্যাওলা দিয়ে মোড়া
আমি আজ রাত্রে ওইখানে শুয়ে থাকব
আমার ভিতর থেকে চাঁদ উঠে আকাশে দাঁড়াবে।

শমীক : মায়া

মায়া : কি? এমন করছ কেন? কি হয়েছে? বলো।

শমীক : কিছু না তো! এমনি। কিছু না। মায়া, অন্য কথা বলো
খুব ভালো লাগছে তোমার? মায়া…

মায়া : আপসোস হয়…

শমীক : কেন?

মায়া : আগে অতিরিক্ত, অবাঞ্ছিত, মনে হতো।
বিরক্তি ক্লান্তিতে ডুবে থাকতাম।
এখানে আসার পর মনে হচ্ছে
এই গাছ-গাছালি ও পাখি-পাখালির মতো
আমিও এদের একজন।
আমিও এদের অংশ এদের আত্মীয়।
আমি আবিষ্কৃত হয়ে গেছি যেন।

শমীক : ও কথা ভেব না মায়া। ওই সব
কাঁচা রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাস আমার…
আমার অসহ্য লাগে।

[মায়া আহত। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। চা নিয়ে বেয়ারা এলো। মায়া চুপ করে চা তৈরি করছে]

আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।
আজকেই প্রবন্ধটা শেষ করে দেবো।

মায়া : কোনটা? টাইম অ্যাণ্ড স্পেস?

শমীক : নো স্পেস। সবটা সময়। সময় শুধু…স্পাইর‍্যাল…
ঘুরে ঘুরে আসে এক তীব্র শান্ত উজ্জ্বল বিন্দুতে।

[মায়া চা করছে। একটা প্রজাপতি ঘুরছে ওদের মাথার ওপর। শমীক প্রজাপতিটাকে ধরতে চেষ্টা করছে]

মায়া : এই বোকা…পালা…মারা পড়বি…যা, যা…পালা, পালা প্রজাপতি আমি গাছ নই; বোকা। হ্যাঁ, ওদিকে যা। তোমার চান্স আছে ধরো না, ধরো না। পালা। বেঁচে গেলি। ফলিত বিজ্ঞানী, তোর কোনো দাম নেই ওর কাছে। ধরো না, ধরো না, পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও, ছাড়ো, ছাড়বে না? আমিও ঠিক উঠে যাব।

শমীক : ঢাকনিটা দাও

মায়া : কেন?

শমীক : দাও।

[শমীক ঢাকনি দিয়ে প্রজাপতিকে চাপা দিল। মায়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল]

মায়া : রাত্রে তুমি অঘোরে ঘুমিয়ে। ঘুম আসে নি আমার।
আমি ওই পাহাড়ের দিকে চেয়ে ছিলাম। আমার

চোখ দুটো আটকে গিয়েছিল। শেষ রাতে ঘুম এলো
আর পাহাড় ডাকল।

শমীক : মায়া…মায়া

মায়া : কি ? কি ?…সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন ! পাহাড় ডাকল !
চারপাশে পাথরের পবিত্র স্তব্ধতা, জঙ্গলের গন্ধ।
আর এক প্রাচীন গানের কলি…একটানা সুর
শেষ রাতে মাটি আর অরণ্যের বন্দনা বিনত
আমি চলছি তো চলছিই। অজ্ঞাত শক্তির টানে আনন্দিত।
জলন্ত মশাল গাছ, বর্শায় মাদল, দলবদ্ধ
ছায়া আমার পিছনে। মৃতদের কণ্ঠে পাখি, আলো।
পৃথিবীর রক্ত ফুল প্রেম ও প্রতিভা ছড়িয়ে রয়েছে।
শেষকালে একজন কয়োটিকে বর্শা বিদ্ধ করে
বলে উঠল : থামতে হলো। সহসা লুটিয়ে পড়লাম।
তুমি ও বন্দুক নিয়ে কি করছ ? রাখো তো। ভয় লাগে।
আজ আমি রক্তপাত সইতে পারব না। না। রাখো।

শমীক : আজকে কলকাতা যাব।

মায়া : আজকে যাব না।
আজকেও দেখব যদি
পাহাড় আবার ডাকে।

শমীক : আজকেই যাবে।

মায়া : এত রূঢ় স্বরে কথা বলছ কেন
কি হয়েছে তোমার বল তো ?

শমীক : তুমি আজ যাবে।

মায়া : অদ্ভুত !

শমীক : তোমার মুখটা ঠিক ঠাকমার মতো, অবিকল।

মায়া : তাই বুঝি ? তুমি তাঁকে কখনো দেখেছো নাকি ?

শমীক : মনে হচ্ছে তোমার গলার স্বর ঠাকমার মতো।
আজকেই যাব। এখানে থাকব না। কক্ষনো না।

মায়া : আজ থাক। না। না। কাল যাব। আজকে পাহাড় ডাকবে।

[বিদ্যুৎ ভদ্র]

শমীক : শুনতে পাচ্ছ ?

মায়া : কি ?

শমীক : ব্যর্থ পাখার ঝাপট।

মায়া : বাইরে আসার জন্ত।
প্রজাপতি আলো সোহাগিনী।

শমীক : এতক্ষণে মরিয়া হয়েছে।

মায়া : ছেড়ে দাও

শমীক : আর্তনাদ করছে এখন।

মায়া : ছেড়ে দাও

শমীক : আমার আনন্দ লাগছে। পেশিতে পেশিতে জোর পাচ্ছি।

মায়া : ওকে বাঁচতে দাও।

শমীক : একটু গরম জল দাও। দেবে না ? নিজেই নেব।

মায়া : কি হয়েছে তোমার আজকে ?

শমীক : আমার রক্তের মন্ত্র আমি আজ শুনতে পেয়েছি।
মৃত, দক্ষ প্রজাপতি, তুমি মৃত, মৃত, মৃত, মৃত।

মায়া : তুমি কি নিষ্ঠুর।

শমীক : আমার রক্তের মন্ত্র আমি আজ শুনতে পেয়েছি।

মায়া : আমার আনন্দ তুমি এইভাবে হত্যা করবে নাকি ?

শমীক : আমি জোর পাচ্ছি।
নৃশংসতা, অকারণ নৃশংসতা। রক্তের ভিতরে
কী আশ্চর্য গুঞ্জন উঠেছে।

মায়া : তুমি কি করে পারলে ?

শমীক : আশাহীন আনন্দের জোরে
অর্থহীন উদ্দীপ্ত ভাবনায়।

মায়া : তুমি কি নিষ্ঠুর।

শমীক : নিষ্ঠুরতা জীবনের পরতে পরতে।

মায়া : এত নৃশংসতা তুমি কি করে লুকিয়ে রাখো ?
কোন ভদ্রতার জটিল মুখোশে ?
আমাকেও একদিন তুমি···

শমীক : মায়া।

মায়া : আমার আশ্চর্য নয় তুমি কলুষিত করে দিলে
আমার সূর্যের গলা টিপে তুমি অন্ধকার দিলে
তুমি যে কোনো সময় খুনী হতে পারো, কি জঘন্য।

শমীক : দিগন্ত ক্রমশ স্পষ্ট।
আমি খুনী হতে পারি…। হাসি পায়। প্রাণ নিতে পারি
যেহেতু আমরা প্রাণ দিতে পারি। মৃত্যু কিছু নয়।

মায়া : ঘরটাকে গুহা বলে মনে হয়

শমীক : মায়া

মায়া : কথা বলতেও ঘৃণা করে।

শমীক : ঘৃণা ?

মায়া : ঘৃণা…এই মুহূর্তেই আমি ঘৃণা করলাম তোমাকে

শমীক : মায়া

মায়া : না

[মায়া বাগানে চলে গেল। বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়াল শমীক]

শমীক : মায়া সরে যাও…সরো।

মায়ার কণ্ঠ : আমার জগতটাকে রক্তে রক্তে নোংরা করে দিলে
তোমাদের প্রতিভা ঘৃণায় এই গ্রহ নিভে যাবে বুঝি
পৃথিবী ভিখারী বুড়ি অন্তিম দিনের প্রতীক্ষায়
তোমাকে এমন ভাবে আমি দেখতে কখনও চাই নি।

শমীক : মায়া।

[হাত থেকে বন্দুক খসে পড়েছে। স্টেজ অন্ধকার। বিরতি। কিছু সময় পার হয়ে গেছে। টেবিলে মাথা রেখে শমীক ঘুমিয়ে পড়েছে। তার এক হাত ছোট দূরবীনের ওপর, অন্য হাত বন্দুকের ওপর। শমীক স্বপ্ন দেখছে। ছায়া পড়ছে। দরজায় শব্দ]

শমীক : কে ?

ছায়া : দরজা খোলো।

শমীক : না।

ছায়া : তবে কাছে এসো

শমীক : কেন ?

ছায়া : তোমাকে দেখি নি। দেখি…
কচিদের মুখের দুধের গন্ধ বড় ভালো লাগে।
শমীক : আমি খুব বড় হয়ে গেছি
ছায়া : তাই বুঝি ? তাই অকারণ।
শমীক : কে তুমি ? কে ?
ছায়া : তোমাদের আরম্ভ হয় নি।
শমীক : দেখছ না, পৃথিবী রহস্য নয়। অঙ্কের নিয়ম
এখন সমস্ত গ্রহ আমাদের মুঠোর ভিতর।
ছায়া : তবু কত অনিশ্চিত। স্থির হতে গিয়ে
ভীষণ অস্থির। প্রেম চেয়ে
ঘৃণার পূজারী।
শমীক : তোমার গলার স্বর অমন গম্ভীর লাগে কেন ?
ছায়া : নদী শস্য কুয়াশায় পূর্ণ হয়ে গেছি।
শমীক : আমি ভীষণ অপূর্ণ।
তোমার গলার স্বর বড় পরিচিত।
ছায়া : আমাদের এক উৎস, কিন্তু ভিন্ন শাখা।
শমীক : মানে ?
ছায়া : একটি জীবন, প্রবহমানতা ; শুধু পৃথক আধার।
শমীক : কে, তুমি কে ?
ছায়া : ধুলো, ধুলোর স্ফুলকি।
শমীক : যুক্তিহীন কথা। শব্দের বিভ্রান্তি, ভুল।
আগুনের স্ফুলকি হয়। তোমার মুখটা ঠিক মায়ার মতন।
মনে হলো তুমি বুঝি মায়া।
ছায়া : আমাকে আসতে দাও আজকে বিয়ের দিন।
শমীক : তবে তুমি সেই
ছায়া : আমি সেই।
শমীক : তোমার মুখটা ঠিক মায়ার মতন।
কি করে তোমার মুখ মায়ার মতন হলো ? কেন ?
হতে পারে। হতে পারে। বিস্ময়ের কিছু নেই এতে।
ছায়া : তুমি ওকে গুলি করতে গেলে ?

শমীক : পাহাড়ের ডাক শুনে আমার…আমার…

ছায়া : আমার মতন চলে গিয়েছিল। তাই ?

শমীক : তুমি কেন গিয়েছিলে ?

ছায়া : সত্যিই পাহাড় ডাকত। দূর গ্রহ আলো ফেলে ফেলে
নিয়ে যেত, তরঙ্গের বিতঙ্ক তাবায় মন্ত্রমুগ্ধ,
সঙ্গীতের শয্যা পাতা পাথরে পাথরে, মনে হতো
শরীর সংকেতবহ, বাত্তিময়, তাই মূল্যবান
দৃশ্য অদৃশ্যের আমি সেতুপথ। তা ছাড়া তুচ্ছই।
কতদিন নিজেকে বিছিয়ে দিয়ে পাহাড়ের নিচে
পৃথিবীর অন্ধকার উর্বরতা হয়ে গেছি আমি
পরিপূর্ণ দিঘির মতন টলমল করেছি জ্যোৎস্নায়।

শমীক : কেন আমি এমন অপূর্ণ ?
মায়া মাঝে মাঝে বর্ণা হয়ে যায়
প্রতিবেশে যথাযথ, একাত্মক, অনিবার্য, সুর
আমি তা পারি না
ও-ডাকে যখন আমি সাড়া দিতে চাই
কিন্তু সব উচ্চারণ আর্তনাদ হয়ে ওঠে যেন,
আমি গুলি করি নি মায়াকে
আমি তার আনন্দকে নিহত করেছি
আমি খুনী, খুনী, খুনী।

ছায়া : কি তোমার হাতে ?

শমীক : দূরবীন, রাইফেল।

ছায়া : পায়ের তলায় ?

শমীক : পৃথিবী, অস্থির গ্রহ।

ছায়া : তুমি নিজে ?

শমীক : বিবর্ণ, পীড়িত।

ছায়া : আর মায়া।

শমীক : আনন্দিত। আমি তার আনন্দকে নিহত করেছি
আমাদের মাঝখানে রক্তের নদীর ব্যবধান।

[ছায়া হাসছে। বর্ণা ও মাদলের স্বর স্পষ্টতর]

আমার এ ঘর গুহা হয়ে গেছে

[ছায়া হাসছে]

অসহ্য, অসহ্য, হাসি। তুমি এত ক্রূর হতে পারো ?
আমি গুলি করতেও অক্ষম।

[ছায়া হাসছে]

আর ছিন্ন করো না আমাকে
আমি এক অনির্দেশ্য হাহাকার
ঐক্যে গাঁথা কখন হব না ?
দুটি বিরুদ্ধ জগত কখনও মিলবে না ?

[ছায়া হাসছে]

অন্তর বাহির হোক
বাহির অন্তর।

ছায়া : আসীনো দূরং ব্রজতি
শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং
মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি।

[ছায়া মিলিয়ে গেল]

শমীক : মায়া, মায়া, কেউ নেই ?
আমার ডাকের সাড়া দিতে
কেউ নেই আমি কি নির্জন পড়ো বাড়ি !

[শমীক উঠে দাঁড়াল আর পর্দা নেমে এলো। মাদল ও ঝর্ণার শব্দ বিপুল ভাবে ধ্বনিত হচ্ছে।

প্রত্যক্ষ

সমরেশ বসু

আমার সেই সহৃদয় বন্ধুটি তাঁর রোজনামচা আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আরো বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ এই জন্যে যে, বন্ধুবর তাঁর রোজনামচা থেকে, যে-কোনো অংশ, আমার নিজের ভাষায় লিখে প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, নাম ধাম পরিচয় গোপন রাখার শর্ত ছিলই। আমি সে শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

আর এই অনুমতি দেবার সাহস যাঁর আছে, তাঁর সম্পর্কে দু-একটি কথা আমাকে আগেই বলে নিতে হবে। যদিও তিনি, যাঁকে বলা যায় 'এলিটস্ অব দি সোসাইটি'; তবু সেই জাতের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে পড়েন না, যাঁরা সত্যি-মিথ্যের ধার ধারেন না। প্রথানুযায়ী পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয়, তিনি সদ্বংশজাত, অভিজাত, সম্ভ্রান্ত, অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে, ইত্যাদি। সে সবের বিস্তৃত বর্ণনা আমি দিতে চাইনে। আমি বিশেষভাবে এইটুকু বলতে চাই, তিনি বিদ্বান। প্রকৃত গুণীজন বলতে আমরা যা বুঝি, তিনি তাই। তিনি তাঁর আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত, শ্রদ্ধাবান। মিথ্যা কথা কখনো বলেন না। এ যুগে কথাটা অবিশ্বাস্য শোনালেও, স্বীকার করতেই হবে, কখনো কোনো পাপ করেন নি। মিত্র-বন্ধুদের অন্যায় আঘাত করেন নি। এবং সব বিষয়ে অতিরিক্ত সচেতনতার দরুনই বোধহয় বন্ধুটিকে খুব নিরীহ আর কোমল বলে মনে হয়। অবিশ্যি তাই, কিন্তু এত কথা জানবারও কোনো দরকার হয়তো নেই।

তবে রোজনামচাটা পড়তে দেবার আগে তিনি বলেছিলেন, "ঘটনা বাদ দিয়ে, আমার উক্তিগুলোকে বরাবরের বিশ্বাস বলে ধরে নিও না। যেমন ধরো, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দশ বছর আগে আমি যে কথা রোজনামচায় লিখেছি, আজকে আর সে রকম চিন্তা করি নে। ও সবই সাময়িক। আর তোমাকে যে প্রকাশ করবার অনুমতি দিচ্ছি, তা এই ভেবে যে, আমার বিশ্বাস, কোনো

কোনো ঘটনায়, দশজনকে জানাবার মতো একটা অর্থময় বিষয়বস্তু আছে। অবিশ্যি আমার চোখ দিয়ে দেখলে।"

যোজনামচাটা আমার হাতে নেই। তাই আমার স্মৃতি থেকেই, অনেক দিন আগের এক সন্ধ্যারাত্রের একটি ঘটনা আমি প্রায় হুবহু তুলে দিচ্ছি।

"২৩শে ফেব্রুয়ারি, সন্ধ্যাবেলা,…সাল॥…রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা॥

"বাড়িতে আজ একটা ছোটখাটো উৎসব চলছে। এর আগের বছরও, এ সময়েই, ঠিক এরকম উৎসবই হয়েছিল। আমার এম. এ. পাশের খবর বেরিয়েছিল। আজ আমার বোনের বেরিয়েছে। আমি ইংরেজিতে, ও বাংলায়। উৎসব বলতে, বোনের দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবী, কাছাকাছি আত্মীয়-স্বজন, সবাই মিলে একটা পারিবারিক সংবর্ধনা বলা যায়। বাড়ির দোরগোড়ায় ওজন খানেক গাড়ি পার্ক করে রয়েছে। রেডিওগ্রামে রেকর্ডের পর রেকর্ড বেজে চলেছে। আর আমি ছাদে এসে দাঁড়িয়ে আছি। উৎসবে আমি যোগ দিতে পারছি নে। যোগ দেবার মতো মানসিক অবস্থা আমার নয়। আজ আমার বুকের মধ্যে একটা আশ্চর্য থরথরানি। একটি বিশেষ উত্তেজনায়, আনন্দে এবং বিচিত্র ভয়ের শিহরণে থর থর করে কাঁপছে বুকের মধ্যে। যদিও আমি শান্ত থাকবার চেষ্টা করছি, তবু বুঝতে পারছি, নিজেকে আমি ঠিক স্বাভাবিক রাখতে পারছি নে। কারণ, আজ আমার সেইদিন… সেই চির ইপ্সিত মুহূর্ত এসেছে। আর একটু পরেই আমি…। না, এ ভাবে অস্থির হয়ে ওঠা আমার উচিত হচ্ছে না বুঝতে পারছি। এ সময়েই আমার সব থেকে বেশি শান্ত, স্বাভাবিক অথচ প্রতি রন্ধ্রে তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারা উচিত। তা হচ্ছে না বলেই, বারে বারে আমাকে ছাদে পালিয়ে আসতে হচ্ছে।

"সত্যি কথা বলতে কি, বছর দুয়েক আগে লীনাকে প্রথম যেদিন আমি আদর করেছিলাম, যার দেহ সৌষ্ঠব ভেনাস-এর মতোই মনে হয় আমার… আর সেই রক্তাধর…আয়ত কালো চোখ…যাকগে, যা বলছিলাম, সেই প্রথম দিন আমার এই রকমই একটা অনুভূতি হয়েছিল। অথচ কত তফাৎ। সেটার মধ্যে ছিল একটা সংকীর্ণ আত্মসুখের উন্মাদনা, দুটি প্রাণের গাঁজিয়ে ওঠা রসের পাত্রে মদ-গন্ধ। আর এটা…আজকের এই উত্তেজনা, আনন্দ, ভয়ের মধ্যে আছে একটা মহত্ব, এক মহান কর্তব্যের জীবন-তুচ্ছ-করা আহ্বান,

যেখানে পুড়তে মরতে, সব কিছুতেই একটা ব্যাকুল শিহরণ আমি অনুভব করছি। যা আমার জীবনে আর সব কিছুই তুচ্ছ করে দিয়েছে। এই যে পড়াশুনো, পরীক্ষা পাশ আর তার আনন্দ, এ সবই খুব অর্থহীন মূল্যহীন বলে মনে হয় আমার। এ সবের আর কোনো দাম নেই আমার কাছে। যেখানে মাটি নেই, সেখানে দাঁড়াবার যেমন কোনো প্রশ্ন নেই, সেই রকম। আসল কাজই বাকি, কী হবে আমার লেখাপড়া পাণ্ডিত্যে, আর ব্যক্তি জীবনের সার্থকতায়।

"হাত তুলে ঘড়িটা চোখের সামনে নিয়ে দেখলাম। সোয়া সাতটা। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদেই বাড়ি থেকে বেরোবার কথা আছে আমার। তারপর ট্রামে চেপে, মধ্য কলকাতার সেই নির্দিষ্ট বড় বিল্ডিংটার সামনে, পশ্চিমের ফুটপাতে, গাছের পাশে লাইটপোস্টের তলায় আমাকে উপস্থিত হতে হবে। সেখানে আমার জন্যে একজন অপেক্ষা করবে। কিংবা আমাকেও দু-চার মিনিট অপেক্ষা করতে হতে পারে। যে-আসবে, সে আমার চেনা নাও হতে পারে, কিন্তু আমি তার চেনা। সে নিজেই আমার কাছে এসে দাঁড়াবে, আমাকে অনুসরণ করতে বলবে, আর তারপরেই আমি···

"নাঃ, এ পঁয়তাল্লিশ মিনিট যেন অক্ষয়। এর শেষ নেই। আর একটু আগেই টের পেয়েছি, লীনা এসেছে। ও আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। মা ওকে খুব পছন্দ করেন, ভালোবাসেন এবং একটা চাপা ইচ্ছেও বোধহয় আছে যে, পুত্রবধূ করেন। লীনারা রুচিসম্পন্ন বড়লোক, আজকাল যাদের আমি "তথাকথিত বড়মানুষ" বলে থাকি। লীনাদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের বাড়িরও যোগাযোগ আছে। লীনা এখন নিশ্চয়ই মায়ের সঙ্গে আমার বিষয়েই আলোচনা করছে। মা হয়তো কাঁদছেন আমার কথা বলতে বলতে। আমি ভয় পাচ্ছি, লীনাকে মা হয়তো ছাদে পাঠিয়ে দেবেন। কেন না, মা-ই একমাত্র আমাকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করেন। তিনিই একমাত্র জানেন, আমি ছাদে আছি। আর লীনা হয়তো করুণ মুখ করে আমার কাছে আসবে। তার চোখে থাকবে বিস্ময় এবং বিষণ্ণতা। যেন ভিন্ন জগতের কোনো মানুষের ট্র্যাজেডি ওর চোখে ভেসে ওঠে। হয়তো বসবে পাশে, হাত ধরবে, বলবে, "একটা গান করব অশোক।" যেন আমি মৃত্যু শয্যায় পড়ে আছি, তাই আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া। আর, আমি প্রত্যাখান করতে পারব না। এবং আমি যা-ই বলি না কেন, একথা মানতে হবে,

লীনার গলায় একটা দুরন্ত জাদু আছে। সে হয়তো গাইবে, "যে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে" কিংবা, "রূপে তোমায় ভোলাব না।"

"সেই আশ্চর্য সুর, ভাষা এবং লীনার কণ্ঠস্বর, সব মিলিয়ে গণ্ডূষে গণ্ডূষে তীব্র মদের মতো আমাকে একেবারে নেশাচ্ছন্ন করে ফেলে। আমি কথা বলতে পারি না, কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। একটা স্বপ্নের মধ্যে যেন আমি তলিয়ে যেতে থাকি। এই সব গানকে আমি 'রবিঠাকুর-ব্র্যাণ্ড মদ' নাম দিয়েছি। এ সব আমার জন্যে নয়, আমাদের জন্যে নয়, আমরা যারা অন্য এক জগতের স্বপ্ন দেখছি। যুধাজিৎ-এর চিঠির ভাষা আমার মনে পড়ছে। যে-চিঠি এখন আমার পকেটেই রয়েছে। আমাকে লেখা চিঠি।... "কলকাতার উপকণ্ঠের শ্রমিকদের গুপ্ত সভায় সেদিন আপনি যে-সব কথা বলেছেন, তা সত্যি উদ্দীপনাময়, দুঃসাহসিক এবং গভীর চিন্তাপ্রসূত। আমি বুঝতে পারছি, ছাত্র নেতৃত্ব থেকে, শ্রমিক আন্দোলনেই আপনার যোগ্যতা অনেক বেশি। আর বিপ্লব সৃষ্টি করতে, জনসাধারণের এই অংশই সব থেকে আগুয়ান। বিপ্লবী সংস্থা থেকে আমাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার। তাই আপনাকে আমি আমন্ত্রণ করছি...।...নির্দিষ্ট জায়গায় একজন শ্রমিক আপনার জন্যে অপেক্ষা করবেন...।"

"যুধাজিৎ আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন। গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার নেতা, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাঁর বাস। যাঁর নামে পুলিশের পরোয়ানা ও পুরস্কার ঘোষিত। যাঁকে চোখে দেখতে পাওয়া, সান্নিধ্য এবং আলোচনা করতে পাওয়া এক পরম সৌভাগ্য। আমাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু আঃ! এখনো পনের মিনিট বাকি।...বাতাস নেই একটুও। এখনো একটু শীত রয়েছে। কলকাতার এ-দক্ষিণাঞ্চলেও ধোঁয়া জমাট। সব অস্পষ্ট, আবছা। আশেপাশের বাড়িগুলোর অবয়ব ভুতুড়ে হয়ে উঠেছে। যা দু-একটা নিষ্পত্র গাছ দেখা যায়, সেগুলোকে কুৎসিত কুটিল অজস্র নগ্ন-শাখা-জানোয়ারের মতো দেখাচ্ছে। নিচে একটা দ্রুত তালের বাজনা বাজছে রেকর্ডে।

"আমাকে নিচে নেমে পেছনের দরজা দিয়ে চুপিচুপি যেতে হবে। যাতে কেউ দেখতে না পায়। কৈফিয়ৎ তো নানারকম আছেই। তা ছাড়া, দাদারা, বোনেরা, বাবা, মা, কেউ-ই শ্রমিক আন্দোলন, বিপ্লবী সংস্থাকে ভালো চোখে দেখে না। কারণ অবিশ্যি তাদের অজ্ঞতা। এসব বিষয়

সম্পর্কে সম্যক বোধই তাদের নেই। আমাদের পরিবারকে রুচিবান অভিজাত বলা হয়। কিন্তু জানে না, তাদের সমগ্র জীবনটাই ফাঁকি ও মেকি। আমাকে নিয়ে সকলে ভয় পায়, অবাক হয়। যেন আমি দেবকুলে অসুর এই পরিবারে। যেন আমি কোনো নিষিদ্ধ অপরাধীদের দলে মিশেছি।

"ট্রাম থেকে নেমে আমি হাঁটতে লাগলাম। এ রাস্তাটার দু-পাশে বড় বড় হোটেল আর বার। ফুটপাথের ধারে ধারে সারিবদ্ধ গাড়ি। বাড়িগুলোর ভেতর থেকে মাঝে মাঝে গান এবং বাজনার শব্দ ভেসে আসছে। আর মেয়ে-পুরুষেরা পশুর মতো আনন্দমুখর, হাতে হাত কিংবা আলিঙ্গনাবদ্ধ। এরা এদের ভবিষ্যৎ জানে না।

"এর পরে আর একটা রাস্তায় ঢোকবার আগে, একটা বিশেষ অনুভূতি দিয়ে আমি অনুভব করতে চাইলাম, কেউ আমাকে অনুসরণ করছে কি না। সামনে পেছনে, আশে পাশে, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে আমি সবাইকে দেখলাম, কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে কি না। আমাকে যথেষ্ট ভালো পোষাকে আসতে বলা হয়েছে এবং আমি তাই এসেছি।···আমি অগ্রসর হতে লাগলাম এবং ক্রমেই সেই বড় বিল্ডিং আমার নিকটবর্তী হলো। আমার বুকের মধ্যে অসম্ভব দ্রুত তালে, জোরে জোরে শব্দ হতে লাগল। পশ্চিমের ফুটপাতেই আমি চলেছি। ওই দেখা যায় সেই গাছ আর গাছের সামনে লাইটপোস্ট। আমার দৃষ্টি পর্যন্ত ঝাপসা হয়ে গেল যেন। পদক্ষেপ এলোমেলো। কেউ কি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে?

"না, কেউ নেই। লাইটপোস্টটা একলাই দাঁড়িয়ে আছে। আমার চোখে সেই চিঠির লেখা ভেসে উঠল, "একজন শ্রমিক আপনার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আপনাকে সে চেনে, আপনি একটু লক্ষ্য করলেই তাকে চিনতে পারেন, যদিও শহরতলীর শ্রমিক প্রতিনিধিদের গুপ্ত সভায় ভিড়ে আপনি তাঁকে দেখেছেন।"

"কিন্তু আমার দাঁড়ানো উচিত কি না, বুঝতে পারছি না। দাঁড়ানোটাই বরং সন্দেহজনক। আচ্ছা, আমি যদি পায়চারি করি, এবং মাঝে মাঝে পোস্টের পাশে দাঁড়াই, কেমন হয়? আমি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তুলে, তাই করলাম। দু-বার পায়চারি করে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই হঠাৎ একটি মুখের

ওপর আমার দৃষ্টি আটকে গেল। আমি থমকে গেলাম। উল্টো দিকের ফুটপাতের ওপরে, ও-মুখ আমার দিকেই ফেরানো। দৃষ্টি আমার দিকেই নিবদ্ধ। কোঁচকানো চোখের সেই দৃষ্টিতেও একটা তীব্র অনুসন্ধিৎসা। আর যেন একটা জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে, "আমাকেই খুঁজছেন নাকি?" অবিশ্যি ভঙ্গিটা যেন কী রকম লাগছে। আমি তাড়াতাড়ি তার আপাদমস্তক দেখলাম। একটা খাটো প্যান্ট এবং ঢলঢলে ছেঁড়া কোট তার গায়ে। উসকো খুসকো চুল। দুঃস্থ দরিদ্র শ্রমিকের মতোই। পরমুহূর্তেই সে নিঃশব্দে হেসে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো, এ মুখ যেন আমার চেনা। আমার মন বলল, এই-ই সে।

"ভাবতে না ভাবতেই, আমাকে প্রায় নিঃসন্দেহ করে, রাস্তা পার হয়ে সে আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কোটরাবদ্ধ চোখ যেন তার জ্বলছে। কিন্তু মুখে হাসি। সঙ্কোচ, সংশয় এবং জিজ্ঞাসু হাসি। যেন, যদি সে ঠিক লোক চিনতে ব্যর্থ হয়, সেই মুহূর্তেই আমাকে এড়িয়ে যেতে পারে। সে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি আর কিছুতেই নিজেকে চেপে রাখতে পারলাম না। আমার সামনে একজন শ্রমিক আর সে বিপ্লবী সংস্থার সভ্য। আমি বলে ফেললাম, "আপ…আপ হয়কো…।"

"সে মাথা নেড়ে বলল, "জী। জী হাঁ, আইয়ে মেরা সাথ।"

"বলেই সে পেছন ফিরে চলতে লাগল। আমি নির্দ্বিধায় তাকে অনুসরণ করলাম। আমি দেখলাম, তার কালো পুরনো ঢলঢলে কোটের পেছনে ছেঁড়া। খাটো প্যান্ট-এর নিচে তার ধূলিকালো ধ্যাবড়া পা। যদিও মুখ দেখতে পাচ্ছি না, তবু সেই চোয়াল উঁচনো রুক্ষতা, আর জ্বলজ্বলে চোখ আমার সামনে ভেসে উঠল। একজন শ্রমিক। আমার বন্ধু। আমার মনটা আবেগে, ব্যথায় এবং এক ধরণের গর্বে ভরে উঠল। আর গর্কির লেখা শ্রমিক চরিত্রদের কথা আমার মনে পড়ল। ঠিক যেন সেই রকমই, বিশ্বের সর্বত্রই এরা এক।

"আমি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে, তার পাশে পাশে চললাম। হিন্দীতেই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন?"

"সে বলল, "তা হ্যাঁ, আপনার মুখ তো চেনাই। এর আগে দেখেছি।"

"আমি বললাম, "আমারও তাই মনে হলো, আপনাকে আমি দেখেছি।

আপনার নাম বলতে কি কোনো বাধা আছে? মানে, কী নামে আপনাকে ডাকব?"

" "রুস্তম। রুস্তম আমার নাম সাব।"

"সাব? একজন শ্রমিক বন্ধু আমাকে সাব বলছে? আমার এই কেতাদুরস্ত সাহেবী পোষাকের জন্যে নাকি? ছি ছি! কিন্তু আমার কি কিছু বলা উচিত? বোধহয় না। হয় তো, বন্ধু রুস্তমকে সে রকম নির্দেশই দেওয়া আছে। কেন না, দেখছি, সে বেশ স্বাভাবিকভাবেই চুপচাপ চলেছে। মাঝে মাঝে আশে পাশে লক্ষ্য করছে তীক্ষ্ণ চোখে। একটা বিশেষ গাম্ভীর্যও আমি লক্ষ্য করছি তার।

"আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি অনেকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন?"

"রুস্তম বলল, "তা বহুক্ষণ। তবে বোঝেন তো, বে-আইনী ব্যাপার, আর পুলিশ যদি দেখতে পায়—"

" "নিশ্চয় নিশ্চয়।"

"রুস্তম একটা খুব খারাপ খিস্তি করে বলল, "মেলাই টিকটিকি ছড়িয়ে আছে।"

"খিস্তিটা শুনে আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। কিন্তু সেটা আমার অভ্যাসেরই দোষ। শ্রমিকরা এ-রকম বলেই থাকে। তাদের মুখেই মানায়। আর সত্যি, প্রায় নির্দোষ বলেই মনে হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "সেই জায়গাটা কত দূর? মানে, আমরা যেখানে যাচ্ছি।"

"রুস্তম বলল, "কাছেই, খুব বেশি দূরে নয়।"

"যতদূর মনে পড়ছে, বাড়িটার নম্বর বোধহয় উনিশ, না?"

"রুস্তম মাথা নেড়ে বলল, "হাঁ, উনিশ নম্বরে আছে, তবে আমরা একুশ নম্বরে যাব।"

" "কেন? একুশ নম্বরেই বুঝি...?"

" "সে আপনি গেলেই বুঝতে পারবেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। ওসব আমাকে বলতে হবে না, ঠিক জায়গাতেই আপনাকে নিয়ে যাব।"

"আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "নিশ্চয়! আমি জানি, আপনি ঠিক জায়গাতেই নিয়ে যাবেন।"

"আমি তাকালাম রুস্তমের দিকে। মনে হলো, সে সারাদিন খায় নি। তার

পিঠটা যেন কুঁজো হয়ে গিয়েছে। তবু কর্তব্যে কি অবিচল। যেন একটা কঠিন শপথ তার গালের ভাঁজে, চোখের দৃষ্টিতে। তবু কি রকম মায়া হলো আমার। কষ্ট হলো। আমি আবার না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, "এ পথে মানে এই কাজে আপনি কতদিন নেমেছেন?"

"রুস্তম বলল, "অনেকদিন। প্রায় দশ বছর।"

" "তার আগে?"

"রুস্তম আবার ভয়ঙ্কর একটা খারাপ কথা বলল। কিন্তু আমার অনভ্যস্ত কানকে আমি মন দিয়ে শাসন করলাম। খারাপ কথাটা বলে সে জানাল, "ওই শালা চামড়ার কলে কিছুদিন কাজ করেছিলাম। তারপরে কিছুদিন ঘোড়ার গাড়ি চালিয়েছিলাম। তা—"

"আবার একটা খুব খারাপ কথা বলল সে। বলবেই! আমি তো তাকে এখুনি শুধরে দিতে পারব না। বলল, "দিনকাল তো দেখছেন। শালার ঘোড়াটা গেল মরে। দানাপানি পেত না তো। আর যারা গাড়ি চাপে, বানচোতেরা ভাড়া কিছুতেই বেশি দিতে চায় না।...তবু, ইব্রাহিম চাচার একটা বাড়তি গাড়ি কিছুদিন চালিয়েছিলাম, তা—"

"আমার কানে তীরের মতো এসে আর একটা খারাপ কথা বিঁধল। "পরের গাড়ি চালিয়ে মজুরি পোষাত না। তারপরে...অবিশ্যি, এ লাইনে আমার ঝোঁক ছিল। তারপরে পুরাপুরি চলে এলাম।"

"আমি বললাম, "ঠিক করেছেন।"

"সত্যি, রুস্তমের মতো একজন চেতনাসম্পন্ন শ্রমিকের পক্ষে এই ঠিক পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কথা শেষ হবার মুহূর্তেই রুস্তমের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। আমি একটু চমকে উঠলাম। রুস্তম আমার আপাদমস্তক দেখল। মনে হলো, তার চোখে যেন একটা অস্পষ্ট বিদ্রূপের ছায়া। এবং বিস্মিত অনুসন্ধিৎসাও রয়েছে। কেন? আমার এই পোষাকের জন্যে কি? আমি যে একজন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাড়ির ছেলে, এটা বুঝেই কি সে আমার সঙ্গে ঠিক একাত্ম হতে পারছে না? অবিশ্যি, তাতে আমি তাকে দোষ দিতে পারব না। আমার মন এবং হৃদয়ের সঙ্গে তার সম্যক পরিচয় এখনো হয় নি।

"আমি আবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার বাড়িতে কে কে আছে?"

" "ও:। সে শালা এক গুষ্টি, আর বলবেন না। আমার বিবি, পাঁচটা বাচ্ছা, আর বুড়ি মা-টা শালা কিছুতেই মরছে না।"

"রুস্তম হেসে ফেলল। কঠিন আর করুণ সেই হাসি। বুঝলাম, বড় দুঃখে সে এমনি করে বলছে। আমার কাছে সে এখন অসঙ্কোচে নিজেকে প্রকাশ করছে। আবার বলে উঠল, "ওরাও সব ঘোড়াটার মতো বিনা দানাপানিতে মরে যাবে।"

"আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "ভাববেন না। সুদিন আসছে, যেদিন আর এভাবে—"

"আমার কথা শেষ হবার আগেই রুস্তম খিস্তি করে উঠল। আর দপদপিয়ে উঠল আমার কান। বুঝলাম, আমার এই শ্রমিক বন্ধুটির মধ্যে হতাশার গ্লানি কিছু রয়ে গিয়েছে। এবং আমি বিশ্বাস করি, সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। পারিবারিক জীবনের পরিবেশকে মানুষ সব সময়ে কাটিয়ে উঠতে পারে না। সে বলল, "কবে যে সে ভালো দিন আসবে...।"

"হাতটা উল্টে দিয়ে, একটা সরু গলিতে রুস্তম ঢুকে পড়ল, আর দাঁতে দাঁত পিষে যেন আমাকে ডাকল, "আইয়ে।"

"গলির মধ্যে ঢুকে যেন আমার দম বন্ধ হয়ে এলো। একটা বিশেষ অস্বস্তি বোধ করতেও লাগলাম। গলির মধ্যে গ্যাস-এর মৃদু আলো। কিন্তু মানুষের ভিড়ে, তাদের বড় বড় কিম্ভুত ছায়ায় অন্ধকার জমে রয়েছে। ভিড়ের মধ্যে নানান ধরনের, নানান বয়েসের লোক। আমার মনে হলো, তাদের কেউ কেউ মাতাল। মদের গন্ধ পাচ্ছি। আর খাটো খাটো ফ্রক পরা মেয়ে, যাদের শরীরগুলো অস্বাভাবিক রকমের উঁচু নিচু, খোঁচা খোঁচা। এরকম কয়েকজন আশে পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঘুরছে। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে, সিগারেট খাচ্ছে। পুরুষের কোমর ধরে দাঁড়িয়ে হাসছে। সব ব্যাপারটা কি রকম অশ্লীল মনে হলো এবং জীবনে কখনো এসব না দেখলেও, আন্দাজে আমার একটা ধারণা হলো, পাড়াটা ভালো নয়। যদিও সবাই প্রায় অদ্ভুত এক-ধরণের ইংরেজিতে কথা বলছে, তবু বুঝলাম, এটা খারাপ জায়গা।

"আমি রুস্তমকে না বলে পারলাম না, "এ রাস্তাটা ভালো নয়।"

"রুস্তম রীতিমতো অনুকম্পার সুরে বলে উঠল, "সে জন্যে ভাববেন না। এটা একেবারে রদ্দি পাড়া, ভিকমাংগাদের পাড়া বলতে পারেন। এ গলিটা

পেরিয়েই আমরা ভালো রাস্তায় পড়ব। সেখানে অনেক বড় বড় দোকান, আর সবাই খুব শরিফ।"

"তবু এই নরক গলিটা যতক্ষণ শেষ না হলো, ততক্ষণ আমি প্রায় নিশ্বাস ফেলতে পারলাম না। কথা বলতে পারলাম না। কিন্তু—আঃ—। নতুন বড় রাস্তাটাও আমার তেমন ভালো মনে হলো না। সেই রাস্তায় ঢোকা মাত্র, কয়েকটা মাতালের মিলিত গলায়, বিদেশী ভাষায় খারাপ গান শুনতে পেলাম। এবং এখানেও জানালায় অলিন্দে আমি প্রায় সেই ধরণের মেয়েদেরই দেখতে পেলাম। যাদের চুল সোনালী এবং লাল রং করানো। ফ্যান্সি ড্রেসে যারা সেজেছে। আমি রুস্তমের দিকে তাকালাম।

"রুস্তম হাসল। ভরসা দেবার মতো হাসি। বলল, "ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাব। আমি যতক্ষণ আছি, কিছু ভাববেন না।"

"তা জানি। ভয় আমি মোটেই পাই নি। বরং বিস্মিত চমকে আমি ভাবলাম, আণ্ডার গ্রাউণ্ডের উপযুক্ত জায়গাই বটে। রীতিমতো রোমান্টিক। কে ভাববে, যুধাজিতের মতো শ্রমিক নেতা এখানে লুকিয়ে রয়েছে।

"খোলা গেটের ভিতর দিয়ে একটা বাড়িতে ঢোকবার আগে, রুস্তম আমাকে অনুসরণ করতে ইশারা করল। আমি ঢুকলাম তার পেছনে পেছনে। একটা ছোটখাটো হল ঘরে এসে পৌঁছুলাম। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হলো আমাকে। এ কি! এ কোথায় নিয়ে এলো। হল ঘরে দেখছি, তিন চারটি মেয়ে ইতস্তত চেয়ারে বসে রয়েছে। দুজনের হাতে মদের গেলাস। এও তো সে-ই। কী আশ্চর্য! এখানে কি যুধাজিৎ থাকতে পারেন, এই এদের সঙ্গে, একই বাড়িতে!

"আমাকে থামতে দেখেই রুস্তম চাপা গলায় বলল, 'দাঁড়ালেন কেন, আসুন? এরা আছে থাকুক, আমরা দোতলায় যাব।"

"মনে হলো রুস্তমের চোখে মুখেও এখন উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। আমি তাকে অবিশ্বাস করতে পারলাম না, বরং আরো বিস্মিত হলাম। ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে ভাবলাম, যুধাজিৎকে কী ভয়াবহ পরিবেশেই না থাকতে হয়। ইস্! কিন্তু উপায়ই বা কী?

"হল ঘরের এক পাশ দিয়েই দোতলার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে আমি রুস্তমকে অনুসরণ করলাম। দোতলায় উঠে, বারান্দার এক পাশে,

একটা পর্দা-ঢাকা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রুস্তম দরজায় টোকা মারল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই, পর্দা সরিয়ে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না, এত খারাপ পোষাক সে পরে আছে। নগ্নতাও এর থেকে ভালো। সব থেকে খারাপ, সংক্ষিপ্ত জামাটির একটা হাতা একেবারে খোলা। আর তাতে—যাচ্ছেতাই। কী হচ্ছে ব্যাপারটা। মেয়েটি সোজা আমার দিকে তাকাল। চোখ কুঁচকে নিরীক্ষণ করল একটু। আর আমি শুনলাম, রুস্তম বলছে, "বহুৎ বড়া সাব আদমি হায় মেমসাব, দেখ লাও। বহুৎ খানদানি…।"

"বলে সে আমাকে চোখ টিপল। আর মেয়েটি তার তর্জনী তুলে ইশারায় আমাকে ডেকে বলল, "হালো!"

"এ কি! এই রং মাখা ঠোঁট, সোনালী চুল, ভালুগার শরীর মেয়েটা—মানে কী বলতে চায়? আমি রুস্তমকে বললাম, "যুধাজিৎ কোথায় আছেন?"

"রুস্তম মুখটা বিকৃত করে বলল, "কে?"

" "যুধাজিৎ?"

" "সেটা আবার কে? ওসব জুধাচিৎ-ফিৎ জানি না। এর থেকে আচ্ছা মেমসাব আর মিলবে না।"

"আমার বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল। তবু আমি রাগ সামলাতে পারলাম না। বললাম, "এখানে তোমাকে কে নিয়ে আসতে বলেছে। আমি—"

"রুস্তম খেঁকিয়ে উঠল, "তবে আর কোন্ যেহেন্তে নিয়ে যাব আপনাকে? এর থেকে ভালো আমি কিছু জানি না।"

"আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। ঘাম ঝরতে লাগল আমার। মনে হলো, আমার পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। বললাম, "এসব আমি কিছুই চাই না। আমি তো এখানে আসতে চাই নি।"

"মেয়েটা ঠোঁট উল্টে দিল। আর রুস্তম বলে উঠল, "তবে কি ইয়ার্কি হচ্ছিল আমার সঙ্গে এতক্ষণ! আরে শালা, কী রকম লোক! তখন থেকে বক্ বক্ করে চলেছে, হেনরে তেনরে, নিকুচি করেছে।"

"ভয়ঙ্কর খারাপ কথা আবার বলল রুস্তম। অর্থাৎ এই লোকটা, যাকে আমি ভেবেছি…। এখন দেখছি, সে একটা ইয়ে, মানে পিম্প। দালাল। মনে হলো, আমি পড়ে যাব। মেয়েটা এবার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে খিল্‌খিল্ করে

হেসে উঠল। আর আমি তৎক্ষণাৎ সিঁড়ির দিকে ফিরে, তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম।

"কিন্তু রুস্তম চিৎকার করে উঠল, "কেয়া বাৎ? ভাগছ কোথায় চাঁদ? চাও বা না চাও, আমার পাওনাটা দিয়ে যাও।"

"আমি ততক্ষণ সিঁড়ির মাঝখানে। তার কথার জবাব না দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি নেমে, হল ঘরটা পেরিয়ে গেলাম। যেন স্বয়ং যমের হাত থেকে নিষ্কৃতির জন্যে, প্রায় ছুটতে লাগলাম। কোনোদিকে তাকিয়ে দেখলাম না। আমার পেছনে পেছনে চিৎকার ভেসে এলো, "এ বেঃ শালা, কোথায় ভাগছ! আমার মেহনতের দাম দিয়ে যাও আগে।"

"বলতে বলতে লোকটা আমার সামনে এসে, পথরোধ করে দাঁড়াল। সেই মুখ, সেই চোখ, কিন্তু কী বীভৎস দেখাচ্ছে। আর এখানো আমার মনে হচ্ছে, লোকটাকে শ্রমিকদের মতোই তো দেখতে। শহরতলীর সেই সব শ্রমিকদের মতোই…আশ্চর্য! শ্রমিকদের কি আলাদা করে চেনা যায় না। অধম! আমি একটা মূর্খ!

"আরো দু-একজন এসে কাছাকাছি দাঁড়াল। রুস্তম বলল, "নিকালো, আমার পয়সা বার করো।"

"ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে কথাটা বলল রুস্তম। আমি পকেটে হাত দিলাম। কারণ তা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। যত তাড়াতাড়ি এ-নরক থেকে চলে যাওয়া যায়। রুস্তম আবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, "মুটানি করে আবার বাজে কথা বলা হচ্ছিল, কি করে তোমার চলে, এ লাইনে আসবার আগে কি করতে…।"

"কিন্তু পকেটে আমার মাত্র একটি টাকাই ছিল। আমি সেটাই বার করে দিলাম। সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে রুস্তম বলল, "ব্যস্? আরো ছাড়ো।"

"আমি অসহায় ভাবে বললাম, "আর নেই আমার কাছে।"

"আমার পোষাকের দিকে তাকিয়ে, বীভৎস বিদ্রূপে হেসে রুস্তম বলল, "ফোকটকা বাবু। থু-র তেরি ।"

"সে সরে গেল। আশে পাশের লোককটাও হাসতে হাসতে চলে গেল। আমার শরীরটা যেন ভেঙে পড়ল। আমি টলতে টলতে ফিরে চললাম। আর অসহ্য রাগে, ঘৃণায় ও ধিক্কারে আমার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। আবার শুনতে পেলাম, লোকটা এখনো চেঁচাচ্ছে, "শালা ফোকটিয়া…আবার বিবি-বাচ্চার খবর করছিল।"

"আর ওর জলন্ত চোখ দুটো আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। শিকারী পশুর মতো সেই চোখ। কিন্তু…আঃ! আমার হাতা দিয়ে চোখ মুছলাম আমি…"

রোজনামচার এই ঘটনাটির বিষয়ে আমি কোনো উক্তি করতে চাই নে।

নিরস্ত্রীকরণ কেন ?

দেবেশ রায়

যদি এমন একটা অন্ধকার জায়গায় আরো অন্ধকার কামরাটার মধ্যে ঘণ্টা আড়াই থেকে চার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, যেখানে কামরা থেকে নামলেই চারপাশে অজস্র, সরল, পরস্পর সংলগ্ন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন রেল লাইন, মাথার ওপর অজস্র তার, স্তম্ভিত অন্ধকারের মতো স্তম্ভ, মাঝে মধ্যে সেই স্তম্ভিত অন্ধকারের মাথায় মৃত নক্ষত্রের নীল বা লাল আলো, রেল লাইনের পাশে মাটিতে পড়ে থাকা লাল বা নীল আলো, যেন, অন্ধকার, বা নক্ষত্র, বা মেঘের আকারে সর্বদাই যে সৌরজগত আমাদের পরিপ্রেক্ষিত সেখানে চরম বিপর্যয়ের ফলে কিছু নক্ষত্র, কিঞ্চিৎ-পরিমাণ সূর্য ও কিয়দাংশিক সূর্য ঐ থামগুলোর মাথায়, রেল লাইনের পাশে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। অথচ ফার্লং খানেক দূরে রেলস্টেশনের ব্রিজ, প্লাটফর্ম, এমন কি তার ওপর লোকজনকেও, কেবলমাত্র প্রখর আলোর নিচে কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও, দেখা যায়, রেলস্টেশনের চত্বরঘেরা রাস্তায় রিক্সা, মোটর ইত্যাদির আসা যাওয়া প্রভৃতি বোঝা যায়, এমনকি মাঝে মধ্যে কোনো কোনো মোটরের হেড্‌লাইটের আলো গিয়ার-চেঞ্জের গর্জনের সঙ্গে মিশে এই কামরা পর্যন্ত আসে ও সেই মোটর-রিক্সা-স্ট্যাণ্ডের চ্যাঁচামেচি গোলমাল দূরত্বে পরিশ্রুত হয়ে খুব দামী গাড়ির হর্ণের মতো কানে এসে পৌঁছয়, তবে, এই অন্ধকারে নির্বাসনের বর্তমানের সঙ্গে, মাইল চল্লিশ দূরের মফঃস্বল স্টেশনে লোকাল গাড়ির সঙ্গে কলকাতায় যাবার জন্য জুড়ে দেয়া এই একটা থ্রু-কোচের দরজায় জীবন যুদ্ধের মতো ঠেলাঠেলির অতীত ও আরো কতক্ষণ অপেক্ষা করার পর ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে বন্যার মতো বেগে এই কামরাটাকে অন্ধকার থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ট্রেনের আবির্ভাবের ভবিষ্যৎ—সব কিছুর যোগে নিজেদের বৃহত্তর কোনো শক্তির কবলিত আত্মস্বাতন্ত্র্যহীন বলে মনে হয়। এই অধীনতাবোধ এই ট্রেনের যাত্রীদের কুল-লক্ষণ।

সেই অন্ধকারের মধ্যে নির্বাসিত নিরালোক কামরার গভীরতর অন্ধকারের ভেতর দুই নারীর মধ্যে এ-রকম সংলাপ চলছিল।

"ওখানকার লোকজনও ছাড়তে চায় না, বলে চাকরি ছেড়ে দিন, আমাদের এখানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করুন, নিজের ডিসপেন্সারি করুন, যে, লোকজনের ভিড় লেগেই আছে, শেষে দিন পেছুতে পেছুতে এইবার যেতেই হলো"—ভদ্রমহিলার গলার স্বর মাঝারি-দামের জর্দা খাওয়া হাফ্-খানদানী। বোঝা যায় না বেশি কথা বলায় অন্ত খনেদিয়ানা নষ্ট হয়েছে, নাকি পুরো খনেদিয়ানা তৈরিই হয় নি।

"সে তো সত্যি। এক জায়গায় থাকলেই লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়, মায়া পড়ে যায়"—দ্বিতীয় ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর নিষ্প্রভ, কিন্তু নিবে যায় নি, খুব বুঝে শুনে খরচ করা, মিতব্যয়ী।

একই বেঞ্চের জানলার দিকটা নিয়েছেন দ্বিতীয়া। তিনি পা ছড়িয়ে বেশি জায়গা নেয়ায়—তাঁর সঙ্গে বছর দশেকের একটি ছেলে আছে, বোধহয় তাকে শোয়াবার সঙ্কল্প—প্রথমার বেশি জায়গা জোটে নি। অথচ তাঁর নতুন শাড়ি-পরা মেয়েটির সতীত্ব সংরক্ষিত করার জন্য একটি নিরাপদ জায়গা তাঁর প্রয়োজন।

অন্ধকারের মধ্যে অন্য খুপরিটায় একটি বাচ্চা তারস্বরে কাঁদছে।

দরজার হাতল ধরে দূরদৃশ্যদর্শনরত কোনো অন্যমনস্ক যুবক চেঁচিয়ে এমন একটা গান গাইছে যার সুরে রামপ্রসাদী গানের বক্তব্য কিন্তু কথায় শারীরিক সান্নিধ্যের আতুরতা, ফলে দ্রুত, ধ্বস্তাত্মক।

দুই নারীর সংলাপ। প্রথমা—"উনি আবার গেলেন কিছু খাবার-দাবার কিনে আনতে, আমার আবার রাস্তার খাবার পেটে সয় না—।" দ্বিতীয়া—"তাহলে বাড়ি থেকে বানিয়ে আনলেই পারতেন। আমি তো সঙ্গে এনেছি। এ-শ্রীমানের আবার আমার ধাত। ট্রেনের খাবার খেলেই পেটের গোলমাল। আর-এক ছেলের আবার উল্টো। তিনি হোটেলে খেতে গেছেন।" প্রথমা—"আর বলবেন না দিদি, দোকানে খেয়ে খেয়ে শরীর নষ্ট করবে, তারপর ধকল সামলাতে হবে আমাদের। তুই বোস্ না খুকু এদিকে।" প্রথমা পা একটুও সরালেন না—"থাক্ না একটু জানলায় দাঁড়িয়ে। চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকতে থাকতে এর পর তো হাতে পায়ে খিল ধরে যাবে।"

বাচ্চাটার কান্না ঘিরে একটি পুরুষ ও একটি রমণীতে এই প্রকার কথোপকথন চলছিল :

পুরুষ—"দাও না একটু বুকের দুধ—"

রমণী—"দিচ্ছি না নাকি ? দেখছো তো মুখেই নেয় না—"

পুরুষ—"কী বিপদ ! সারারাত এভাবে কাঁদলে—"

রমণী—"না না এখুনি ঘুমিয়ে পড়বে। সোনা সোনা ওই দেখো আলো—ভু-উ-স—হো-ই যা—ঝিক-ঝিক-ঝিক।"

অতঃপর কান্না ও কান্না থামানো ক্রমাগত উচ্চ গ্রামে উঠতে উঠতে এমন একটা স্তরে উঠল যখন পুরুষ "দাও দেখি আমার কাছে" বলে, নিয়ে, সেই গান গাওয়া যুবকের পাশ দিয়ে হাতল ধরে ঝুলে লাল নীল আলোয় ও জটিল রেলপথে বিশৃঙ্খল অন্ধকারে নেমে গেল। রমণী অন্ধকারের জানলায় নিজেকে উৎকণ্ঠ করে সেই প্রান্তরে ভ্রাম্যমান কান্নার পিছু পিছু দৃষ্টি ঘোরাতে লাগল।

দুই নারীর সংলাপ। দ্বিতীয়া—"প্রথম পোয়াতি, বোধহয় বাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়ি থেকে যাচ্ছে।"

এতৎসহ কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞের হাসি। প্রথমা—"শিখবে শিখবে, আমরাও কি আর একদিনে শিখেছি ?"

দ্বিতীয়া—"আপনার বাটের কটি ?"

প্রথমা—"এই তো মেয়ে। আর এক ছেলে কলকাতায় ডাক্তারি পড়ে—"

দ্বিতীয়া—"বাপের পেশা ?"

প্রথমা—"হ্যাঁ, অন্তত রিট্যায়ার করবার সময় ওঁর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা দিয়ে একটা ওষুধের দোকান করে দেয়া যাবে। আর কিছু না হোক, অন্তত ওষুধ বেচে তো খেতে পারবে।"

দ্বিতীয়া—"তা কেন বলছেন ? ও দেখবেন আপনাদের চাইতে বেশি কামাবে—"

গায়ক-যুবা হঠাৎ একলাফে কামরা থেকে নেমে পায়চারি করতে লাগল। অত জোরে লাফের পর অতটুকু পায়চারি মোটেই ওকে মানায় না। বাচ্চার কান্নাটা হঠাৎ হাউইয়ের মতো উঁচুতে উঠতেই রমণী দরজায় গিয়ে "এই" বলে চেঁচাতেই পুরুষ তার হাতে বাচ্চাকে তুলে দিতেই বাচ্চা মায়ের বুকে মুখ গোঁজে। রমণী নিজের আসনে এসে বসে। পুরুষ মাটি থেকে জানলার দিকে উগ্র হয়ে বলে—"স্টেশনে খোঁজ করব নাকি—দুধটুধ যদি—"

রমণী—"যাও, বক্‌বক্ কোরো না।"

দ্বিতীয়ার খোকা বলল—"মা, রন্থু দা কোথায়"

"খেতে গেছে।"

"আমাকে নিয়ে গেল না কেন?"

"তোমার খাবার তো এখানেই আছে।"

"ওর খাবারও তো আছে—"

"চুপ করো, ঐ দেখো পাহাড়ের আলো দেখা যাচ্ছে—"

প্রথমা—"এটিই বুঝি কোলের?"

দ্বিতীয়া—"হ্যাঁ। পাঁচ ছেলে চার মেয়ে—"

প্রথমা মনে মনে ভাবলেন এতবার গর্ভবতী ভদ্রমহিলার পাশে তার খুকীকে বসতে দেয়া উচিত কি না?

প্রথমা—"ভদ্রলোক কী করেন?"

দ্বিতীয়া—"ছেলেরা দাঁড়িয়ে গেছে, এখন কিছু করেন না।"

প্রথমা—"বড় ছেলে কি করে?"

দ্বিতীয়া—"বিলেতি কোম্পানির, ওষুধের—কীরে খোকা?"

খোকা ঘাড় ঘুরিয়ে "রিপ্রেসেনটেটিভ" বলে আবার ঘাড় ফিরিয়ে নিল।

প্রথমা—"কোন কোম্পানির?"

খোকা এবার মায়ের আদেশের অপেক্ষা না করেই ঘাড় ফিরিয়ে নামটা বলল। ডাক্তারের স্ত্রী বুঝে উঠতে পারলেন না যে রিপ্রেসেনটেটিভের মায়ের সঙ্গে বেশি কথা বলা তাঁর উচিত কি না। তাই তিনি অন্য ছেলেদের পরিচয় জানতে চাইলেন। দ্বিতীয়া জানালেন—"মেজছেলে বাড়িতে থেকে এক স্কুলে চাকরি করে। ন-ছেলে কলকাতায় খবরের কাগজ অফিসে চাকরি করে। তার কাছে সেজছেলে এম-এ পড়ে। সেজছেলের সঙ্গে যাচ্ছি।"

"ছেলেমেয়ের বিয়ে দেন নি?"

"হ্যাঁ, বড়ছেলে আর বড় দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছি—"

"তাহলে তো দিদি আপনি ঝাড়া হাত-পা—"

এরপর একসঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলো ঘটল: সূর্য উঠলে মৃত্যু রোধ হবে এ রকম বর-পাওয়া কোনো পৌরাণিক বীরের মতো সবগুলো লোকের একমুখী দৃষ্টি, সূর্যের প্রথমতম রশ্মির মতো মৃদু আলো, বাংলাদেশের যাত্রায় যে-রকম বেগ ও প্রচণ্ডতার সঙ্গে বিবেকের পরিবর্তন দেখানো হয়, সেই রকম

ক্রুত প্রচণ্ড বেগে সব কিছু কাঁপিয়ে ও আলোকিত করে ট্রেনের আগমন আর সঙ্গে সঙ্গে এই কামরার অন্যান্য যে-সব যাত্রী এতক্ষণ প্রবাদবাক্যের বহ্নিমুখ-মুমুক্ষু পতঙ্গের মতো এতক্ষণ প্লাটফর্মের আলোর বৃত্তে ঘুরঘুর করছিল, তারা সূর্যোদয়ে নীড়-ছাড়া পাখিদের মতো সমবেতভাবে আলোকিত হয়ে এই কামরার দিকে ছুটে এলো। যে নিজের নাস্তিকতা ও ভগবদ্ বিরোধিতাকে এত কম আঘাতে আস্তিক ও ঈশ্বরমুখী করে তোলে, যাত্রাগানের সেই অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য ক্ষণে ক্ষণে হৃৎ-পরিবর্তনকারী চরিত্র এই ট্রেন আর এই সমবেত চরিত্রের তুলনা হলো কেন? এই আত্মপরিবর্তনে সে কি পুনরায় নাস্তিকতায় প্রস্থানের পথ রেখে দিয়েছে!

ট্রেনের ইঞ্জিন এসে এই কামরাটাকে নিয়ে যাবে। সবাই তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এম-এ পড়া সেজ ছেলে সিগারেট খাচ্ছিল। হু-হু করে ট্রেনটা ছুটে চলেছে। মরা একটা জ্যোৎস্না আছে আকাশে। ফলে পরিবেশ বিচিত্র জটিল অবাস্তব রূপ নিয়েছে। ট্রেনের জানলা দিয়ে গলে আলো বাইরে পড়েছে। খরস্রোতা নদীর মতো সে আলো ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে।

প্রথম খুপরিতে সব জায়গা-টায়গার ব্যবস্থা করে সেজছেলে এখানে এসেছে। ট্রাঙ্কের ওপর বেডিং দিয়ে চাদর বিছিয়ে সকন্যা প্রথমার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। হাঁটু পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে এক মাড়োয়ারি ভদ্রমহিলা ও পাশে সদানিদ্রিত তার রক্ষকের পাশে ডাক্তারবাবু বোধহয় এতক্ষণে কাত হয়ে পড়েছেন। কোত্থেকে পোর্টফোলিও ব্যাগওয়ালা এক ভদ্রলোক এসে দলের সঙ্গে মিলে গেছেন। তিনি এক বাঙ্কে, সেজছেলে এক বাঙ্কে।

সবাই মিলে বেশ শুয়ে যাওয়া যাচ্ছে। ডাক্তারবাবুর মেয়ের জন্য একটু লোভ আছে সেজছেলের মনে। সে বাঙ্কে চলে গেল।

সেই শিশুকেন্দ্রিক পুরুষ রমণীতে সংলাপ। পুরুষ—"নাও এখন দুধটা খাইয়ে দাও।"

রমণী—"এখনি?"

পুরুষ—"আবার কি, রাত্রি দশটা বেজে গেছে—"

রমণী—"ঐ ব্যাগ থেকে স্পিরিট ল্যাম্পটা বের করো—"

পুরুষ—"কই ? এতো গেলাস—"

রমণী—"ঐ তো ওর নিচে আর-ই—তোমার বাটিটা"

পুরুষ—"আমার বাটি ?"

বৌটি হেসে ফেলল। বরটি স্পিরিট ল্যাম্প, বাটি ও দুধের বোতল বের করতে করতে বলল—"যাক্। তুমি তাহলে এখনো ঠাট্টা তামাসা বোঝো—"। কোলের বাচ্চার কপালে হাত বুলিয়ে বৌটি বলল—"কেন ?" স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালতে জ্বালতে ভদ্রলোক—"গত চারদিন তো দেখি নি, তাই—"। বৌটি চোখ নিচু করে বাচ্চার ভুরুতে আঙুল দিয়ে "আহা-হা।" স্পিরিট ল্যাম্পের ওপর বাটি চাপিয়ে দুধ ঢালতে ঢালতে ভদ্রলোক "তুমি আড়াই মাসের এক বাচ্চা নিয়ে আমার দিকে যে ভাবে গত চারদিন তাকিয়েছ তাতে তো মনে হচ্ছিল আমি তোমার ভাসুর ঠাকুর বা মেসোমশাই।" "কী যে বলো না, তোমার মাথার ঠিক নেই।" "যাক্, কপালে আরো কী লেখা আছে কে জানে ? এখন বাচ্চার দুধ গরম করতো হচ্ছে—এরপর হয়তো—।" "তা করতে হবে না, নাকি ? আমার কি একার দায় ?" বলে বৌটি বাটি থেকে এক ঝিনুক দুধ তুলে বাচ্চার মুখে দিতেই তারস্বরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল বাচ্চা, ভদ্রলোক বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"হলো তো, দুধ খাওয়ানোটাও শেখ নি ?" "খ্যাচ খ্যাচ করো না তো, চুপ করে বসে থাকো—"। "হ্যা। সারাদিন এক ঝিনুক দুধ পড়ল না পেটে, আমি তো চুপ করেই থাকব—"। "তাহলে তুমি-ই খাওয়াও।"

বাঙ্কের ওপর ও সামনের বেঞ্চিতে সেই শীতরসিক যুবক তার আরো তিন বন্ধুসহ শুয়ে। এই প্রচণ্ড কান্না ও ঝগড়ায় তাদের একজন—"ঘুমের বারোটা বেজে গেছে—"

পাশের খুপরির দ্বিতীয়া, অর্থাৎ খোকা ও সেজছেলের মা উঠলেন—এখন আর জায়গা যাবার ভয় নেই—"রুমু, তোর ঠাণ্ডা লাগছে না তো ?" (সেজছেলে "না") বলে উঠলেন ভদ্রমহিলা, এ-খুপরিতে এসে নতুন পিতাকে বললেন—"উঠুন।" "অ্যা" বলে ভদ্রলোক উঠলেন। খোকার মা তাঁর জায়গায় বসতে বসতে বৌটিকে শুধোলেন "প্রথম বাচ্চা।" বৌটি "হ্যা" বলে দুইবার মাথা ঝাঁকাল। বৌটির কোল থেকে বাচ্চাকে কোলে নিলেন খোকার মা। বাচ্চা আরো কেঁদে উঠল। বৌটি আবার নেবার জন্য হাত বাড়াতেই খোকার মা বললেন "আরে রাখো।" তারপর বাটি থেকে এক

ঝিনুক দুধ নিয়ে কান্নার জন্য হাঁ করা বাচ্চার গলায় ঢেলে দিলেন। হঠাৎ কান্না থেমে গেল, ঢোকৎ করে একটা শব্দ। তারপর আবার প্রচণ্ডতর কান্না। আবার এক ঝিনুক। ঢোকৎ। বাচ্চার বাবা চেঁচিয়ে উঠল—"বিষম লাগবে।" খোকার মা বললেন—"ওদিকে যাও তো হে, আমি ন ছেলেমেয়ের মা। শোনো মা, ঝিনুকের মধ্যে এ রকম এক আঙুল ডুবিয়ে খাওয়াবে।" ভদ্রলোক হঠাৎ বৌটির ওপর রেগে গিয়ে বললেন—"বাতাস দাও না—দেখছ না ঘেমে গেছে।" পেছন থেকে এক পাখা বের করে বৌটি হাওয়া দিতে সুরু করল। ততক্ষণে দুধও শেষ। বাচ্চাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে দিতে খোকার মা জিজ্ঞাসা করলেন "বাড়িতে নিশ্চয়ই মা আছেন।" বৌটি হাসল। "আর শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ি?" মেয়েটি আবার হাসল। "ব্যস, ঐ বুড়ির কোলে ফেলে দেবে—সব ঠিক হয়ে যাবে।" দ্বিতীয়া নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। বাচ্চা শাড়ির কোন ভাঁজে অদৃশ্য। বাচ্চার বাবা একটা সিগারেট ধরিয়ে বাচ্চার মায়ের পাশে বসতে বসতে বলল—"তুমি একটি অপদার্থ।"

"হ্যাঁ, বলা খুব সোজা মশাই। তোমার হলে বুঝতে—"

"এ কী আমার না নাকি?"

"এই, কী যে বলো, খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু, বাঃ আমি তাই বলেছি নাকি, কোনো মানে হয় না—যাঃ।"

এই সংলাপের কিছু অংশ নিঃসন্দেহে চার যুবকের কানে গেছে। তাদের একজন—"মদন, কটা বাজেরে?"

"এই ধর, সাড়ে দশ, পনে এগারো—"

"এখুনি সুরু—" বলে একজন খুব কুঁকিয়ে পাশ ফিরল।

"মদন"

"এঁ্যা"

"তোর নামটা এত খারাপ কেন রে?"

"পছন্দ না হয় বদলে নে। লাইনে দাঁড়িয়েছি, তোদের পছন্দটা তো আগে দেখতে হবে—"

"এই, সিগারেট দে" একজন উঠে বসে "শালা পরীক্ষায় যে কী হয়—"

"কি আবার হবে। আমেরিকার স্পুটনিক। দশ বার আছাড় খেয়ে এগারোবারে পাশ করবি—"

"ও-সব কথা ছাড়ো চাঁদ, তৈরি তো করেছে—সে দশবারেই হোক, এগারো বারেই হোক।"

আর একটি গলায়—"রাত্রি বারোটার কাছাকাছি। রাজনীতি নিষেধ।"

"মাইরি, যুদ্ধ যুদ্ধ এ চ্যাচানি আর ভালো লাগে না। কী দরকার বাবা আমাদের পরীক্ষা দেয়া, পাশ করা, চাকরি খোঁজায়—কোনদিন ফটাস করে বোমা ফাটাবে, ব্যস, ভবলীলা সাঙ্গ—"

সিগারেটটা জানলা দিয়ে গলিয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে "তার চাইতে মেয়েছেলেফেলে দিয়ে দে, দুদিন ফূর্তি-ফার্তি করে টেঁসে যাই—"

"নো ম্যান্ড্‌ প্লিজ।"

"আরে আমার মানিক রে। রাত্রিবেলা ট্রেনে যাচ্ছি, একা একা, খিস্তি করব না। তোমার গোঁফজোড়া নিয়ে আমি কী করব বলতে পারো।"

"শালা তোর গোঁফটা কাট মাইরি, তোকে শেষে মিনিষ্টার বানিয়ে দেবে।"

"মাইরি আর ভালো লাগে না, কলকাতা যাচ্ছি, ধর, এই ট্রেনটা অ্যাকসিডেন্ট হলো।"

"অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট।"

"হ্যা, যখন সমস্ত নিয়মকানুন মেনে সব দিকে নজর রেখে, সব কিছু ঠিক করে, ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও কিছু হয় তখন বলা যায় অ্যাকসিডেন্ট। তো এদের শালা ইঞ্জিন বানাবে, চাকা লাগাবে না—ওটাকে অ্যাকসিডেন্ট বলে না, বুঝলি? আচ্ছা ওটা না হয় অ্যাকসিডেন্ট, ধর ডাকাত উঠল—উঠে তোর কাছে তোর প্রাণটা ছাড়া কিছু পেল না, ঐটা নিয়ে চলে গেল—"

"আরে বাবা মরার জন্ত অত ডাকাত-ফাকাতের দরকার কী, রটিয়ে দিলেই হয় যে অসুখে মারা গেছে—"

খুকীর মা আপাদমস্তক চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছেন খুকীকে। বাঙ্কের ওপর এম-এ পড়া সেজছেলে খুকীর মুখ দেখতে পারছে না। মেয়েটাও মুখটা বের করছে না। ওঃ। কী দোষ ছিল রাতের ট্রেনের একটি মাত্র মেয়ের একটু চঞ্চলা হতে?

গাড়িটা স্টেশনে থামার জন্ত বাঁশি বাজাতে ও বেগ কমাতে শুরু করতেই সেজছেলের বিপরীত বাঙ্কে পোর্টফোলিও ব্যাগসহ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—"দরজার ছিটকিনি আটকে দিয়েছেন?"

সেজছেলে ইতিমধ্যেই বিরক্ত। সে পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল—"গাড়িটা তো আর আমি রিজার্ভ করি নি।"

বাঙ্ক থেকে নামতে নামতে পোর্টফোলিও বললেন—"মাসে দু-বার আমাকে এই লাইনে যাতায়াত করতে হয়। এই স্টেশন থেকে চোর ওঠা সুরু হয়—"

ডাক্তারবাবু বেঞ্চের ওপর উঠে বসেছেন—"অ্যা? চোর?"

বেঞ্চের নিচে জুতো-জোড়া খুঁজতে খুঁজতে পোর্টফোলিও বললেন—"জি-আর-পি-তে গিয়ে খবর নিন, রোজ রাত্রিতে এ ট্রেনে পাঁচ-সাতটা চুরি হবেই—"

ডাক্তারবাবু একবার নিজের সব মালপত্রের দিকে তাকালেন। পাশের খুপরিতে গিয়ে পোর্টফোলিও জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনারা সব কলকাতা তো?" বর উত্তর দিল—"হ্যাঁ", যুবকদের একজন উত্তর দিল—"হুঁ"। অতঃপর দরজার ছিটকিনি আটকে দিয়ে "যতই ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি করুক, স্টেশন ছাড়া কিছুতেই দরজা খুলবেন না" বলে ভদ্রলোক নিজের জায়গাতে ফিরতেই ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, এ-রাস্তায় কী খুব চুরি হয়?"

"প্রতি রাতে পাঁচ-সাতটা।"

"কি চুরি হয়?"

"পারলে ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস, বেডিঙ—মানুষ অব্দি। আর না পারলে গলার হার, কানের দুল—এইসব—"

শুনে খুকীর মা উঠে বসায়, খুকীর মুখ থেকে চাদরটা সরে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এমন হাঁ করে চুরির গল্প শুনছে খুকী যে, সেজছেলে সযত্নে বাঁধা বেণীর ফ্রেমে আঁটা একটা অতি কচি মুখ দেখল। পোর্টফোলিও এই সব গল্প বলছিল—"আরে মশাই, ভাবা যায়, এই তো সেদিন রাঁচি এক্সপ্রেসে—দেখেছেন তো কাগজে? ভাবা যায়, যে, যাতে, ডেড্‌বডি ধরা না পড়ে সেজন্য হাত-পা-মাথা কেটে কেটে ছড়াতে ছড়াতে গেছে। তারপর ঐ যে, চারটি কলেজের মেয়ে কোত্থেকে ফিরছিল, ব্যস। তারপর দুন্ এক্সপ্রেসে নাকি এক বাচ্চাকে, তার মায়ের কোল থেকে, চলন্ত গাড়িতে, নিয়ে, নেমে গেছে, আর তারপর টাকা ডিম্যাণ্ড করে চিঠি দিয়েছে—"

বৌটি বাচ্চাকে তার বুকে জড়িয়ে বলল—"যত সব বাজে কথা।" বরটি

বলল—"হ্যাঁ, ফার্স্টক্লাস ছেড়ে তোমার এই থার্ডক্লাসে আসতে যাবে কে?" বৌটি বলল—"ফার্স্টক্লাসের চাইতে থার্ডক্লাসে ঢোকা অনেক সহজ, দরজাটা খুলো না বাবা—"

বাঙ্কের ওপর থেকে এক যুবক গলা চড়িয়ে বলল—"কেন, মনে নেই আপনাদের সেই বিরাট কেস?" ডাক্তারবাবুর গলা শোনা গেল—"কি? কি?" আর এক যুবক চাপা গলায় বলল—"কী হচ্ছে? এই?" "দাঁড়া না, মজা করি," বলে গল্প বলা যুবক পাশের খুপরির দিকে মুখটা বাড়িয়ে বলল—"সেই যে, খুন করে ট্রাঙ্কে ভরে অংশন স্টেশনে নেমে গিয়ে পরের দিন আর এক ট্রেনে ওটা বুক করে দিয়ে বাবু অন্য ট্রেনে উঠে বসলেন—" ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর গলা শোনা গেল "অ্যাঁ"। যুবকটি আরো উৎসাহের সঙ্গে বলা সুরু করল—"আর সেই যে—।" আর একটি যুবকের কণ্ঠ এই যুবককে থামিয়ে দিল—"এই, চুপ কর তো, এ ট্রেনে ও-সব কিছু হয় না, আপনারা ঘুমোন, দরজাটা না খুললেই হলো।" প্রথম যুবকের আক্ষেপ—"ওঃ, শালা সাধুপুরুষ এসেছেন? দিতাম একটু ভয় খাইয়ে।"

রাতটাকে দু-ভাগে চিরে যেন অন্ধবেগে ট্রেনটা ধেয়ে চলেছে। কামরায় বসে ট্রেনের গর্জন, দুলুনি, আর মাঝে মাঝে কাঁপা বাঁশি শুনে মনে হয়—দুটো লোহার লাইনের ওপর বাষ্পচালিত ইঞ্জিন নয়, যার কর্তৃত্ব অন্ধ নিয়তির হাতে তেমনি কোনো যন্ত্রের ওপর নিজেদের এই জীবন-রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এই ইঞ্জিন অন্ধকার থেকে এই কামরাটাকে উদ্ধার করে এনেছিল। তখন এই ইঞ্জিনকেই মনে হয়েছিল জীবন-বিধাতা। বস্তুত এই কামরাটায় মাত্র কিছুক্ষণ আগে কোনো এক বিশেষ জীবন যে মধুর তার অনস্বীকার্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। আবার এই মাত্র সেই বিশেষ জীবনে মৃত্যুও যে ধ্রুব এবং তার আক্রমণের স্থান কাল ভেদ নেই—তারও স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। অর্থাৎ, জীবনটা যেন বড়লোকের বাড়ির নানারঙা জানলা, কোনটা ঠিক রঙ তা বোঝা যায় না। অর্থাৎ যাত্রাগানের সেই দায়িত্বহীন চরিত্রটি এবার ট্রেনের সঙ্গে এই নবজাত শিশু থেকে প্রায় পঞ্চাশোর্ধ্ব ডাক্তারের জীবনেরও তুলনা হয়ে যায়—আস্তিকতা-নাস্তিকতা, জীবন-মৃত্যু ইত্যাদিতে যে প্রতিনিয়তই নিজেকে বিশ্বাসী করছে।

তার প্রাণভোমরা নিহত হয়েছে টের পেয়ে মরবার অন্ত রাক্ষসের ছোটায়

মতো বা শেলাহত লক্ষ্মণকে বাঁচাবার জন্ত গন্ধমাদন নিয়ে পৌরাণিক বীরের ছোটার মতো—ট্রেনটা ছুটছে। এই কামরার ভেতরে তখন সনাতন জীবনের এমন একটা ছবি যা দেখে ইতিহাসকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, মনে হয়, জীবন একটি প্রাচীন ভাস্কর্য, সহস্রাব্দের দ্বারা যার স্থায়ী সৌন্দর্য পরীক্ষিত। ছবিটা এই প্রকার: বাচ্চাকে বুকে নিয়ে সেই নতুন বউটি বরের কোলে মাথা রেখে, হাঁটু মুড়ে ঘুমিয়ে আছে; বরের একটি হাত বউয়ের খোঁপার ওপর; কামরার আলো কমে যাওয়ায়, নাকি রাত্রি গভীর হওয়ায় খুকীর মুখটা ধীরে ধীরে ভরে উঠছে, সেজছেলে তাকিয়ে আছে যেন একটি কুঁড়ির ফুল হওয়া দেখছে; সেজছেলের মা খোকাকে সবখানি জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিজে সামান্ত একটু জায়গায় কুঁকড়ে আছেন।

ইতিহাসের প্রভাবমুক্ত এই আদি ও অকৃত্রিম সনাতন জীবন কামরায় নিয়ে খামোখা ট্রেনটা পথের মাঝখানে একবার থেমে, খানিকক্ষণ বাঁশি বাজিয়ে আবার চলা স্থরু করল। আর তার কিছুক্ষণ পরই দরজায় সেই অমোঘ শব্দ, যে শব্দে শতাব্দীর নাম, বৎসরের নাম, আর গ্রহের নামটা মনে করিয়ে দেয়।

প্রথমে খুব আস্তে আস্তে দু-বার, আর যেন প্রায় আদেশের মতো "দরজাটা খুলুন।" কথাটা সবাই শুনেছিল, কেউ সাড়া দিল না। বার কয়েক ঐ কণ্ঠস্বর শান্ত নির্দেশের মতো থেকে "দরজাটা খুলুন" বলে চেঁচিয়ে উঠল। ট্রেন তার ক্ষণবিরতির ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তখন আবার বেগ নিচ্ছে। ডাক্তারবাবু উঠে বসলেন। সেই একই কণ্ঠস্বরে "দরজাটা খুলুন" শুনে ডাক্তারবাবু দাঁড়ালেন। এবং পরের পর "দরজাটা খুলুন" শুনেই পোর্টফোলিও ভদ্রলোককে ধাক্কা দিলেন। "চুপচাপ শুয়ে থাকুন, দরজা খুলবেন না" বলে ভদ্রলোক পাশ ফিরলেন। ডাক্তারবাবু বসে পড়লেন। "দরজাটা খুলুন।" সেজছেলে চেঁচিয়ে উঠল—"আরে মশাই, দরজাটা খুলে দিন না।" ডাক্তারবাবু কাতর কণ্ঠে বললেন—"দরজা খোলাটা কি ঠিক হবে, মানে স্টেশন আসার আগে?" "করুন গে যা ইচ্ছে"—সেজছেলে পাশ ফিরল। "এই স্বভাব, দরজাটা খুলে দে তো"—চার যুবকের এক যুবক বলল। "দরজাটা খুলুন না"—এবার বড় করুণ শোনাল গলাটা। ট্রেন তখন পূর্ণবেগে চলছে। বাইরে একটি লোক ঝুলছে—এই কথাটি বোধহয় সবাইকেই খানিকটা অস্থির করল। এক যুবক ডাক্তারকে বলল, কেন না ডাক্তার তখন এই খুপরিতে এসে দাঁড়িয়েছেন, "যান না দরজাটা খুলে দিন।" "দেব?" ডাক্তার

এগুলেন। আর এক যুবক—"হ্যাঁ দিন, মানে ছিটকিনিটা দরজার আড়াল থেকে খুলবেন—মানে দরজাটা খুললে আপনি যাতে তার আড়ালে পড়েন।" "মানে ?" ডাক্তারবাবুর প্রশ্ন শুনে যুবকটি হেসে উঠল। "না না এমনি বলছিলাম, যান খুলে দিন।" ডাক্তারবাবু দরজার কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, তারপর ছিটকিনিটায় হাত দিতেই দরজায় প্রথম লাথিটা পড়ল—"দরজাটা খুলুন, খুলুন—" আর সঙ্গে সঙ্গে সেই লাথি আর চিৎকারকে যেন ডুবিয়ে দিতে ট্রেন বাঁশি বাজিয়ে গম গম করে একটি ক্যালভার্ট পেরিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু পিছিয়ে এলেন আর এই কামরার মানুষগুলো একসঙ্গে জেগে উঠল। চিত্রবৎ।

দরজায় সেই করাঘাতে পদাঘাতে পূর্ববর্তী সনাতন জীবনের বিপর্যয় এ-রকম: বৌটির খোঁপা ভেঙে কাঁধের ওপর, চারজন যুবকই মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে, সেজছেলে আর পোর্টফোলিও পরপর, ঘুমন্ত খোককে আঁকড়ে সেজছেলের মা বসে, খুকীকে রেখে ডাক্তার-গিন্নি স্বামীকে উদ্ধারের জন্ত এগিয়ে, খুকী যেন সেই মুহূর্তেই বয়ঃসন্ধি পেরল।

শতাব্দীর নাম, খ্রীষ্টাব্দের নাম আর এই গ্রহের নামের প্রশ্নটা চাকায় চাকায় গম্‌গম্‌ করে বেজে চারপাশে ছুটে যাচ্ছে।

"বাঁচান, বাঁচান, দরজাটা খুলুন, খু-লু-ন"—দরজায় লাথির শব্দ, তার সঙ্গে টিনের জানলায় ঘুষি। ছিটকিনিটা থরথর করে কেঁপে উঠল। সেই চার যুবকের একজন গম্ভীরভাবে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ছিটকিনিতে হাত দিল। আর সেই নতুন-পিতা তার কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কী করছেন ?"

"দেখতেই পাচ্ছেন"—যুবকটি ছিটকিনি তুলতে গেল।

"দরজা খুলুন" দরজায় লাথি পড়তেই ছিটকিনিটা কেঁপে উঠল।

"দরজা খুলবেন না"—বলে সেই নতুন-পিতা যুবকটির হাত ছিটকিনি থেকে এক হ্যাঁচকায় সরিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বাকি তিন যুবকের একজন তখন এগিয়ে এসেছে। "মানে ?"

"মানে দরজা খুলতে দেব না—"

"মানে—ঐ মারা লোকটা যাবে—"

"মারা যাবে কেন ? নেক্সট স্টেশনে খুলব—"

"ততক্ষণ ঐ লোকটা হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলবে ?"

পেছন থেকে পোর্টফোলিও চিৎকার করে উঠল—"কিসের লোক মশাই? মাঠের মাঝখানে ট্রেন থামল, আর তারপরই "দরজা খুলুন", কোত্থেকে আসবে লোকটা? খবরদার, দরজা খুলবেন না—"

"হ্যাঁ, দরজাটা না খোলাই বোধহয় ভালো হবে—" ডাক্তারবাবু বললেন।

"দরজাটা খুলুন, মারা গেলাম, খুলুন"—লাথি ও ঘুষি এবারও পড়ল, কিন্তু নতুন পিতা দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে ছিটকিনিটার ঝন্‌ঝন্‌ করে কোনো শব্দ হলো না।

অকস্মাৎ ওপাশের সেই হাঁটু পর্যন্ত ঘোমটা দেয়া সেই ভদ্রমহিলা চিৎকার করে কেঁদে উঠতেই, সেই কান্নার শব্দে চমকে জেগে খোকা কাঁদতে সুরু করে দিল, খোকাকে বুকে জড়িয়ে ঠাকুর ঠাকুর করে খোকার মা বসে পড়লেন, "মা" বলে খুকী তার মাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল, আর বাচ্চা বুকে পাগলের মতো প্রথম খুপরির নতুন-মা ছিটকে এসে পড়ল দ্বিতীয় খুপরিতে।

দরজায় মাথা কোটার শব্দ "খুলুন খুলুন—দরজাটা খুলুন।"

"আপনারা কি মানুষটাকে মেরে ফেলবেন নাকি?" একটি যুবক এগিয়ে এলো, নতুন-বাবাকে এক হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে দিল। আর ফলে ট্রেনের দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে টুকুর টুকুর করে ছিটকিনিটা দুলল—আর পোর্টফোলিও পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন "খবরদার, দরজা খুলবেন না—"

পোর্টফোলিও আর নতুন-বাবা পাশাপাশি দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। যুবকটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল—"আপনারা কি লোকটাকে খুন করতে চান?"

"আপনারা কি এতগুলো লোককে খুন করতে চান"—পোর্টফোলিও চেঁচিয়ে উঠলেন, "রাস্তার মাঝখানে থামা গাড়িতে লোক উঠবে কোত্থেকে মশাই?"

"আপনাদের মতো লোকের তো আর অভাব নাই, এতক্ষণ হয়তো অন্য কামরায় ঝুলছিল—"

"দরজাটা খুলুন—দরজাটা খুলুন—বাঁচান"—ট্রেনটাকে যেন ভূতে পেয়েছে—এত প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। একটা সঙ্কীর্ণ দরজার এ-পাশে ও-পাশে জীবন, মৃত্যু, হত্যা, জন্ম—সব মিলেমিশে একাকার। দরজাটা স্বচ্ছন্দে প্রশ্নচিহ্নের আকার নিতে পারত।

"আমরা দরজা খুলব—" একজন যুবক নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে এলো।

আর ওদিককার পাঁচটি নারী একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—"না—আঁ।" আঁ-টা শেষে কান্নায় ভেঙে ট্রেনের শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

"দরজা খুলতে দেব না"—শ্লেষ্মা-জড়িত কণ্ঠে ডাক্তারবাবুর এই কথা সমস্ত ঘটনাকে যেন চরম মুহূর্তের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

যুবকটি পোর্টফোলিও ও নতুন-বাবার সম্মুখে এসে বলল—"সরুন।"

"না—"

সেজছেলে এতক্ষণ কোনো কথা বলে নি। তার মা ও ভাইয়ের কথা মনে রেখে শুধু ভেবেছে—যদি মা ও ভাই না থাকত তবে তো আমি নিশ্চিত যুবকদের দিকে যোগ দিতাম। মা আর ভাই আছে বলে আমি ওদের বিপক্ষতা করি কি করে? এইবার সে বলল—"ঐ জানলাটা খুলে আগে দেখে নিন না, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।"

"না না না, জানলা খুলবেন না—" বলে দরজার কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে সেজছেলেকে টেনে নিয়ে কানে কানে কী বললেন পোর্টফোলিও। সেজছেলে বিস্ফারিত চোখে চার যুবকের দিকে তাকাল। সেই একই কথা পোর্টফোলিও নতুন-বাবাকে কানে কানে বললেন। নতুন-বাবা হঠাৎ ভুরু কুঁচকে দরজা-খোলার পরের বিপদকে সামনে দেখল এমন করে তাকাল। "কি" বলে ডাক্তারবাবু কানটা এগিয়ে দিলেন, তারপর শুনে "এঁ্যা" বলে দেয়ালে হেলান দিয়ে প্রায় মূর্ছা গেলেন।

চার যুবকের এক যুবক চিৎকার করে উঠল—"এই চলে আয়—"

আর একজন—"না, যাব না, একটি লোক মারা যাচ্ছে, আর—"

আগের জন—"চলে আয়, দেখছিস না, ওঁরা আমাদের ডাকাতদলের লোক বলে সন্দেহ করছেন—"। বাইরে প্রবল কান্নার মতো গলায় "দরজাটা খুলুন"—, সটাৎ শব্দ করে ট্রেনটা বোধহয় একটা পোড়ো গুমটি পেরিয়ে গেল। সেই যুবক বলল—"এরপর কিছু হলে—"

সেই চার যুবক মানুষের প্রেতাত্মা হয়ে পেছনে হাঁটা শুরু করল, তারপর খুপরির মুখটাতে এসেই ঘুরে তাড়াতাড়ি আড়ালে চলে গেল; এই আলোতেও ওরা পরস্পরকে দেখতে চাইছিল না। যদি ওরা দরজা খোলে, আর যদি বাইরের লোকটা চোর ডাকাত কিছু হয়, যা হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা আছে, না হওয়ার সম্ভাবনা ততোধিক, তবে ওদের হাজতবাস করতে হতে পারে—আত্মরক্ষার এই প্রত্যক্ষ প্রশ্নে হয়তো বা ওরা বাইরের ঐ হয়তো

দুর্বল আশ্রয়প্রার্থীকে হত্যা করল। হত্যা না করেও বিপদ, আর আত্মরক্ষা না করেও গ্লানি। অথচ নিয়মিত ব্যবধানে দরজায় আঘাত পড়ছে। আর সোঁ সোঁ শব্দে শতাব্দীর নাম, খ্রীষ্টাব্দের নাম, আর গ্রহের নাম জিজ্ঞাসা করতে করতে ট্রেনটা ছুটছে।

ডাক্তারবাবু, পোর্টফোলিও, নতুন-বাবা, সেন্সপুত্র—দরজা ছেড়ে দাঁড়িয়েছেন, আর ছিটকিনিটা টুক্‌ টুক্‌ করে দুলছে। সবাই মাঝেমধ্যে ওটার দিকে তাকাচ্ছেন, যেন ওটা একটা জীবিত অস্তিত্ব।

আর এই চারজনও নিজেদের ভেতর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছে আত্মরক্ষা করার মৌলিক অধিকার খাটাতে গিয়ে, মৃত্যুকে হটাবার মৌলিক মানবিক অধিকারকে কি দরজার বাইরে ফেলে দেয়া হলো। পোর্টফোলিও অবিশ্যি একবার ছিটকিনিটায় হাত দিলেন, তারপর হেসে এই তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদের সঙ্গে ফ্যামিলি আছে, আমি তো একা, একবার খুলে দেখলে—" কিন্তু কেউ কোনো সাড়া না দেওয়ায় তিনি ঐ দরজাটার ওপরই খানিকটা এলিয়ে পড়লেন—প্রতিরোধের জন্য নয়, নিজেকে সেই জীবন বা মৃত্যুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ করবার জন্য। নাকি তিনি ঐ চার যুবককে যে সন্দেহ করেছেন, তাঁকেও আর সবাই ঐ সন্দেহ করবে, যদি তিনি দরজা খোলেন!

এই সঙ্কীর্ণ কাঠের দরজায় কে আঘাত করছে? হত্যা না মৃত্যু? এই চার যুবক কোন দলের? মারবার না বাঁচাবার? এই চার মানুষ কী চায়? মারতে না বাঁচতে? জীবন কি এই কামরায় নারী আর শিশুতে কাঁদছে, নাকি বাইরে হাণ্ডেল ধরে ঝুলছে। এটা কী বাঁচা না মারা? ট্রেন এই বাষ্পচালিত মহান্‌ যন্ত্র, কামরার ভেতরের লোকগুলোকে বাঁচাচ্ছে নাকি বাইরের লোকটাকে মারছে? সঙ্গমরত দুই সাপের মতো বিচিত্র জটিল বন্ধনীতে আশ্লিষ্ট এই দুই প্রশ্নের আলাদা দেহ চেনা যায় না।

বাইরে ট্রেন প্রবল শব্দে হু হু গর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড বাঁশি বাজিয়ে বাঁক নিচ্ছে। আগুনের ফুলকি ছুঁড়ছে আকাশে।

পরের স্টেশনে দরজা খুলে কাউকে পাওয়া গেল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকারে থেকে যারা শেষে একটা বড় গাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে পথে বেরিয়েছিল, তারা আত্মরক্ষার আরাম ও স্বস্তি এবং হত্যাকারীর বিষাদ ও গ্লানিতে আর-এক মানুষ হয়ে তাদের গন্তব্যে পৌঁছেছিল। কিন্তু মানুষগুলিই বদলে যাওয়ায় গন্তব্যও আর স্থির থাকে নি।

শতকের নাম, দশকের নাম ও গ্রহের নাম দিয়ে যে বর্ষফল প্রকাশিত হবে, নিঃসন্দেহে, তাতে, মানুষের এই বদলে যাওয়া ও গন্তব্যে না পৌঁছনোর খবর থাকবে। ফলে অপরিবর্তিত সনাতন মানুষের গন্তব্যে পৌঁছনোর সংবাদও নিশ্চয়ই একদিন পাওয়া যাবে।

তারা পাঁচজন

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

অবশেষে নিত্যানন্দই এক গলা জল খেয়ে ঢাউস হয়ে কূলে উঠল। এতক্ষণ ও এমনভাবে ঝাঁপাঝাঁপি করে তোলপাড় করেছে যেন নৌকো তোলার সব দায়িত্বটাই ওর। আর যারা আছে তারা সব থাকতে হয় তাই থাকা। অবশ্য তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নৌকোর কোনো হদিশই পাওয়া যাচ্ছিল না। কেবল মাটি তোলাই সার হচ্ছিল। এমন সময় নিত্যানন্দই কাণ্ডটা বাধিয়ে তুলল।

বেণী একবার বলেছিল বটে, "আর একটুন পুব দিক ঘেঁসে এগিয়ে গেলে হয় না। আমার মনে হয় পুব দিকেই সরে গেছে নৌকাটা।"

পুবে যাওয়ায় আশ্চর্য্যি নেই। ঝড়ের সময় জলের টান পুব মুখোই ছিল। তা, ঐ টুকুন তো নৌকো, চাই কি ডুবতে ডুবতে দু-চার-শ হাত পুবেও চলে যেতে পারে। সবাই যখন সাঁতার কেটে পুব দিকে এগোতে যাবে এমন সময় নিত্যানন্দ বলল, "দাঁড়াও দেখি, কেমন যেন একটা পায়ে লাগল, আর একটুন ডুবে দেখি!" বলেই গাবুৎ করে আর একখানা ডিগবাজী খেয়ে ও জলের তলায় ডুবতে লাগল। ডুবতে ডুবতে গোঁত্তা খেয়ে বাঁয়ে ঘুরতেই হট করে বুকের পাঁজরায় এমন একখান খিঁচটান খেলো যাতে ওর ব্রহ্মতালু বেরয় বেরয়।

কেমন যেন 'লবাই কান্ত' হয়ে গেল ও। গব গব করে বেশ কয়েক ঢোক কাদাগোলা গিলে ফেলল। চট করে মুখ বন্ধ করল বটে, তবে বুঝতে পারল নাকের ফুটো দিয়ে গল গল করে জল ঢুকছে। ঝিমঝিম করে কেমন যেন মাথাটা জলে যাচ্ছে গো, অথচ কিছুই তখন আর করবার নেই। ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগল নিত্যানন্দ। তলাতে তলাতে আর যাই হোক মাটি পাবে ভেবেছিল, পেল না। থ হয়ে তাকিয়ে দেখল, মস্ত কালো মতো একটা সুরঙ্গ দেখা যাচ্ছে। সুরঙ্গের মুখে শামুককুচি, মনসা-কাঁটা আর মাকড়শার জাল জড়িয়ে আছে। ভিতরটা বড় অন্ধকার। তাই থেকে গোলানো গোলানো

অদ্ভুত মতো সাদা রঙের একটা শব্দ বেরুচ্ছে। শব্দ শুনে কেমন যেন থিতিয়ে পড়ল ও। এখনি ওর পালিয়ে আসা দরকার। পালিয়ে আসবার জন্ত ভাসতে চেষ্টা করল নিত্যানন্দ। ভাসতে ভাসতে এক সময় ও শুশুকের মতো ভুস করে পিঠ উজিয়ে উপরে উঠল। মাথাটা তখনও গদার মতো ভারী। জলের তলায় কেউ যেন ঠেসে ধরেছে। শক্ত মতো কিছু একটা পেলে খিমচে ধরা যেত। নিত্যানন্দ দু-হাত দিয়ে জল খিমচতে লাগল। পা-দুটো শোলার মতো হালকা। ও দুটোকেই উপরে তুলে ছড়ফড় করে আছড়াতে লাগল। ফলে ঝটকায় ঝটকায় জল লাফিয়ে ওর চতুর্দিকে বৃষ্টির মতো পড়তে শুরু করল।

নিত্যানন্দের কাণ্ড দেখে হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছে বাকি চারজন। বেণী বলল, "দুর শালা, যত সব দুধ খেকোদের নিয়ে কারবার!" বিভু বলল, "হারামজাদা একটা গাবর।" মতি আর কলকি ওকে ঠেসে ধরে জলের উপর জাগিয়ে তুলল। তারপর জলের ভাঁজে ঘাই মেরে মেরে ওরা ওকে পাড়ের দিকে নিয়ে চলল।

পাড়ে অনেক দূর অবধি থিতোন কাদা। ভস ভস করে হাঁটু ডুবে যায়। কচলানো কচলানো গন্ধ। তারই ভিতর লেপটে লুপটে টেনে নিয়ে ওরা নিত্যানন্দকে পাড়ে তুলল।

অবস্থা দেখে মুখ শুকিয়েই যাওয়ার কথা। "বেটা কেমন নেতিয়ে পড়েছে রে। এই বিভু, পেটে ঠাস দে, জল বার কর!" জল বার কর। বলল কলকি।

বিভু ওর কোমরের দু-পাশে দু-হাঁটু চালিয়ে দিয়ে যেন ঘোড়ায় বসার মতো তাক করে বসে চাপ কষাতে লাগল। ভক ভক করে খানিকটা বমির মতো লোত বেরুল মুখ দিয়ে। কাজ হচ্ছে দেখে পেছন থেকে পা দুটো উঁচু করে তুলে ধরল কলকি।

বেণী বলল, "কপালে আমাদের অনেক রকম-দুঃখু আছে বুঝতে পারছি। কি কুক্ষণেই যে একসঙ্গে পাঁচ মূর্তি রওনা হয়েছিলাম।"

মতি বলল, "তোরা ওকে সুস্থ কর, আমি গ্রাম থেকে একটু দুধ জোগাড় করে আনি। এক চুমুক গরম দুধ খাইয়ে দিলেই দেখবি চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"

খিস্তি করে বিভু বলল, "আস্ত একটা গাই ধরে আন, বসিয়ে রেখে চোষানো যাবে।" বলতে বলতে আবার ওর চাউস পেটে চাপ কষাতে লাগল। হড়হড়

করে স্রোত গড়াচ্ছে নাক দিয়ে। মতির কেমন গা ঘিনঘিন করে কেঁপে উঠল, "আমি এক্ষুনি চট করে আসি রে"—বলেই ও গ্রামমুখো হাঁটতে শুরু করল।

কিন্তু নিত্যানন্দ তখন বুঝে উঠতে পারছিল না ও জলের নিচেই পড়ে আছে, না ডাঙায় উঠে এসেছে। কারণ সাদা রঙের সেই গা গোলানো শব্দটা তখনো ওর কানে লেগে আছে। শব্দটা ওর কান থেকে মুছে না গেলে কিছুতেই ও সুরঙ্গটার কথা ভুলতে পারবে না আর। সুরঙ্গের মুখে শামুক ঝিনুক মনসাগাছ আর মাকড়শার জাল। ভিতরটা বড় অন্ধকার। অথচ অন্ধকারটা পেরুলেই যেন এমন কিছু একটা দেখা যাবে যা ও কোনোদিন দেখে নি। একটু যদি কষ্ট করে ভেতরে ঢোকা যায় তা হলেই—তা হলেই যেন এমন একটা ব্যাপার হয় যা ওর ধ্যান-ধারণার বাইরে পড়ে আছে এখন।

বিভু যেন ময়দা ডলছে এমন ভাবে ওর মাজা রগড়াচ্ছে। কলকি ওর পা দুটোকে শূন্যে তুলে এমন ভাবে বাঁকাচ্ছে যেন গদা ঘোরাচ্ছে। বেন্দী বলল, "বাওবা ও বেঁচে আছে তোরা দুজনেই মেরে ফেলবি দেখছি।"

বিভু বলল, "মরলে একটা পাপ যায়।"

"তা বটে। তুই মরলে পুণ্যি যেত।" বেন্দীর চোখদুটো কুঁচকে ছোট হয়ে এলো।

কলকি বলল, "রোস না বাপু, মরতে দিচ্ছি কেমন দেখ না। এই, সরে যা তো বিভু, মাথার উপর বাঁই বাঁই করে এক পাক ঘুরিয়ে ওর পেটের জল বার করে আনি।" তা, চোটপাট করে বলল বটে, তবে এক পাশে বসে পড়ে কাদার উপর পা ছড়িয়ে নদীর দিকে তাকাল।

মতি তখন হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের পাশটায় চলে এসেছে। ভরা দুপুর। লোকজন বড় একটা নজরে পড়ল না। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে শেষটায় একটা তাঁড়িখানার সামনে এসে দাঁড়াল। মাতাল মাতাল গন্ধে ভুরভুর করছে চারদিকটায়। মাছি ঘুরছে, পিঁপড়ে হাঁটছে। এককোণে কচু ঝোপের মধ্যে বসে লেড়ি কুত্তায় কি যেন একটা ছাল চিবোচ্ছে। কিন্তু, লোকজন সব গেল কোথায়! মতি তখন গলা কেসে ডাকল, "ও কর্তা, কেউ আছ গো।"

একজন হাড়গিলে লোক বেরিয়ে এলো, "কি চাই ?"

"একটু দুধ হবে ? বড্ড 'প্রেয়জন'।"

হাড়গিলে লোকটা মদ টেনে বুঁদ হয়ে আছে বুঝতে পারল মতি। তবু জ্ঞান কেমন টনটনে। শুধাল, "মশায়ের নিবাস ?"

নিবাস বলল মতি। নৌকার কথা বলল। নিত্যানন্দের অবস্থা জানাল।

হাড়গিলে লোকটা শুনল কি শুনল না বুঝতে পারল না মতি। কারণ ও তখন মতিকে পিঁড়ি পেতে বসতে দিয়ে নিজেও সামনে এসে বসল। তারপর মাতালরা যেমন যেমন কাণ্ড করে তেমন তেমন কাণ্ড করতে লাগল। বলল, "আমায় এখন এই শুঁড়িখানার মালিক হিসেবে দেখছেন, দশ বছর আগে আমি এক জাহাজে চাকরি করতাম।"

লোকটা বড বাজে বকে বুঝতে পারল মতি। কবে ও কোন জাহাজে চাকরি করেছে এসব শোনবার সময়-নেই ওর। দুধটুকু পেলেই ও বাঁচে। তবু ভব্যতার ভয়ে হাড়গিলের কথায় ও ঢোক গিলে সায় দিয়ে যেতে লাগল।

"তা, মশাইয়ের মুখে রা নেই কেন ? একগাল হেসে লোকটা রসিকতার সঙ্গে প্রশ্ন করল। বলুন এবার কতখানি দেব আপনাকে ? একবার খেলে আর একবার আসবেন।"

মতি বলল, "সে সব অন্য সময় এসে খাওয়া যাবে, এখন একটু দুধ না হলে—"

"এই ভাখো ! হাড়গিলে লোকটা আশ্বাস দিল, দুধ ও জোগাড় করে দেবেই, তবে অতিথ মানুষ একটুখানি 'বৌনি' করে যেতে হয়।"

মতি বলল, "বউনি কি গো, পয়সা কড়ি যে কিচ্ছু আনি নি।"

"সে সব আপনি অন্য সময় দিয়ে যাবেন। অতিথ মানুষ, একটুখানি খেতে হয়, নইলে অমঙ্গল হয় গেরস্থের।"

মতি এক ঢোক খেল।

লোকটা বলল, "দশ গাঁয়ের লোক আমার কাছেই ছুটে আসে।"

মতি আর এক ঢোক খেল।

লোকটা বলল, "বিকেলে এলে বিনিপয়সাতেই আমি চাট দেই।"

মতি আর এক ঢোক খেতে খেতে পা দুটো টেনে নিয়ে জুত করে বসল।

সুরঙ্গের মুখে শামুক-ঝিনুক মনসা-কাঁটা আর মাকড়শার জাল দেখতে পাচ্ছিল নিত্যানন্দ। যেন, অনেককাল আগে ঐ গুহার মধ্যে এমন একটা কিছু ঘটে গেছে যা কিছুতেই ও স্মরণে আনতে পারছে না। অথচ ঘটনাটা যেন কিছু-দিন আগেও ওর জানা ছিল। মাছের মতো জলের মধ্যে এদিক ওদিক সাঁতরে বেড়াতে লাগল নিত্যানন্দ। ঘুরে ফিরে আবার সেই সুরঙ্গের মুখে। অথচ এমন ধাঁধা অন্ধকার যে ঢুকতে কিছুতেই সাহস হচ্ছে না। ঢুকলেই যেন সাদা রঙের শব্দটা ওকে এমন ভাবে চেপে ধরবে যে ও দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। মাথাটা এমন লোহার মতো ভারী, নিত্যানন্দ কি ভাবে যে পালিয়ে আসবে ভেবেই উঠতে পারল না। ফলে ভারী মাথায় সাঁতার কেটে কেটে এপাশ ওপাশ করতে লাগল।

মুখ দিয়ে পিচল পিচল অনেকখানি জল বেরিয়ে গেলে বিভু একটু উঠে এসে ওর এলানো মাথাটা তুলে ধরল। নাকের কাছে আঙুল এনে একটুক্ষণ ধরে রেখে বুঝতে পারল নিত্যানন্দর নাকের মধ্যে কেমন একটা ঘসর ঘসর শব্দ হচ্ছে। বোধহয় এখনো কিছু জল রয়েছে। এখনো তাই শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। ঝুঁকে পড়ে বিভু ওর নাকের ফুটোয় ফুঁ দিয়ে বাতাস ঢোকাতে লাগল।

কলকি বলল, "শালার রোদের তাতে ছাল বাকল সব জলে যাচ্ছে গো। একটু আবডালে ছাওয়ায় বসতে পারলে হতো।"

বেণী বলল, "রোসো, আমি একটা মস্ত মতো ঝাপড়ানো ডাল ভেঙে আনি।"

বিভু বলল, "যাবি যা তবে এক চাপ থুতু ফেলে যা, শুকুবার আগেই কিন্তু আসতে হবে।"

বেণী বলল, "আমি তো আর মতি নই যে দুধ আনতে গিয়ে গায়েব হব।"

কলকি বলল, "দুধ ফুধ সব বাজে কথা। আসলে ওটা মজা মারতে গাঁয়ে ঢুকেছে।"

বেণী বলল, "আমি তো আর গাঁয়ে যাচ্ছি না যে মজা মারব। ঐ দূরের জঙ্গলটা থেকে একটা ডাল ভেঙে নিয়েই ফিরে আসব।"

নিত্যানন্দের অবস্থা মোটামুটি ভালোর দিকে লক্ষ্য করায় বিভু ওর কোমরে জড়ানো কাপড়টাকে মেলে ধরল হাওয়ায়।

কলকি বলল, "যা তবে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন।"

বেণী জঙ্গলটার দিকে এগোতে লাগল।

হোগলা আর কাশবনের মধ্যে দিয়ে সরু একটা পায়ে-হাঁটা পথ। জেড়ে-পুড়ে একাকার হয়ে পড়ে আছে। খানিক দূরে এগোতেই রাস্তাটা দু-মুখো হয়ে দু-দিকে গেছে। একটা পথ গ্রাম বরাবর লক্ষ্য করল বেণী। আর একটা পথ জঙ্গলের দিকে। এদিক ওদিক দুটো একটা বাবলা গাছ। একটা তেঁতুল গাছও দেখা গেল বটে, তবে কার গাছ কে জানে। বেণী জঙ্গলের দিকেই এগোতে লাগল।

ভেজা কাপড় গায় শুকিয়ে খটখটি মেরে গেছে। মাজার কাছটায় খানিকটা এখনো ভিজে। মাজার কষি আলগা করে দিতে দিতে সামনের দিকে তাকিয়ে খানিকটা কৌতুক বোধ করল ও। জনা দুই লোক দেখা যাচ্ছে। আর ছোট্ট মতো একটা হোগলার ছাউনী। কি সব যেন হিসেবে পত্তর করছে ওরা। এগোতে লাগল বেণী।

একজন একটু রোগা মতো, আর একজন বেশ মানানসই। রোগামতো মাটিতে কি যেন আঁকিবুকি করছিল। বেণী এসে দাঁড়াতেই ওর দিকে তাকাল। অপর লোকটি না তাকিয়েই একটা জল ভর্তি ঘটির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলল, "আলগা করে খেয়ে নাও।"

বেণী বুঝল পথের ধারে এটা একটা জলছত্র। যারা জল দান করে তারা সব পুণ্যবান।

বেণীর জল তেষ্টা না পেলেও কয়েক ঢোক জল খেল। তারপর কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য একটুখানি হাসল।

মানান সই লোকটি প্রশ্ন করল, "কোত্থেকে আসা হচ্ছে?"

বেণী ওদের সব ঘটনাই খুলে বলল।

রোগা মতো লোকটি বলল, "নৌকো ডুবির কথাই কি যেন শুনেছিলাম কাল। ওঠানো হয়েছে 'নিশ্চয়'।"

"নাহ্ কে আর ওঠাবেন। মাঝখান থেকে আমাদের নিত্যানন্দটাই একটা চোট খেয়েছে।" বেণী মাটির আঁকিবুকির দিকে তাকিয়ে কৌতুক বোধ করছিল। শুধাল, "আপনি বুঝি হাত-টাত দেখছিলেন এতক্ষণ।"

রোগা মতো লোকটি বিনয়ে চোখ ছোট ছোট করে হাসল। "না না, মানে এই ইয়ে আর কি।"

বেণী বলল, "আমিই বুঝি ভণ্ডুল দিলাম?"

"না না, তক্তুল আর কি, বসুন না।"

বেণী উৎসাহ পেয়ে বসে পড়ল।

সুরঙ্গের মুখে শামুক-কুচি মনসা-কাঁটা আর মাকড়শার জাল দেখা যাচ্ছে। ভিতরটা বড় অন্ধকার। ঠাস বুনুনি অন্ধকার। তারই মধ্যে থেকে গা গোলানো শব্দ আসছে। সাদা রঙের ঝিঁঝিট কাটা শব্দ। শব্দটা ওর কানের পর্দায় লেগে আছে। গুহার মধ্যে ঢুকতে না পারলে রক্ষে নেই, ওর এমন ধারা মনে হচ্ছে। ঢুকলে পরেও রক্ষে নেই, শব্দটা ওকে চেপে ধরবে। আচ্ছা জ্বেআলেই পড়ল নিত্যানন্দ। যা থাকে কপালে, ঢুকবার জন্য গোঁত্তা খেতেই মাকড়শার জাল গায় লাগবে ভয়ে পিছিয়ে এলো। মাকড়শার জাল না কাটা তার গো। গায়ে লাগলেই গুটিয়ে এসে বেঁধে ফেলবে। অথচ কোনো ক্রমে একবার যদি ঢোকা যেত, হয়তো এমন কিছু দেখতে পেত নিত্যানন্দ যা ও জন্মাবধি দেখে নি। গুহার ওপাশে এমন কিছু লুকিয়ে আছে যা ও কোনোদিনই জানল না। নিত্যানন্দ মাছের মতো ঘুরতে লাগল।

বিভু বলল, "দেখলি তো, মতি আর বেণীর কাণ্ড দেখলি! এই গেল তো সেই গেল।"

কলকি বলল, "আমি আগেই জানতাম। মন ওদের অন্য জায়গায়।"

"তাই বলে নৌকাটা যে ডুবে রইল ক্ষতিটা এতে কার শুনি?"

"যে ভাববে তারই ক্ষতি।"

"তাই বুঝি একটা কথা হলো।" বিভু নিত্যানন্দের দিকে তাকাল। নিত্যানন্দ চোখ বুজেই পড়ে আছে। শ্বাস টানছে মুখ দিয়ে। গলার পাশে লোল শুকিয়ে চড়চড় করছে।

নদীর দিকে তাকাল। জলের নিচে কোথায় কি লুকিয়ে আছে কিচ্ছুটি এখন বুঝবার জো নেই। ওপরটা বড় শান্ত বলে মনে হলো বিভুর। অথচ গতকাল তুফানে পড়ে কেমন একটা পাগলামো যেন মাথায় চেপেছিল।

কলকি হঠাৎ মাজার কাছে একটা খোঁচা মেরে বিভুকে ডাকল, "এই, এই বিভু, ঐ ভাখ!"

বিভু ঘুরে, খানিকটা কাম্নি মেরে দেখল একটা বউ-গোছের মেয়েলোক একা একা চলেছে।

কলকি বলল, "দাঁড়া একটুখানি ডেকে শুধিয়ে নেই।"

বিভু বলল, "শেষটায় 'কিডন' মারধর-খাবি।"

"বাহ্ বাবা, এর মধ্যে আবার মারধরের কি দেখলি।" কলকি উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল, "ও দিদি শুনবেন।"

মেয়ে লোকটা থমকে দাঁড়াল। তারপর মাথার কাপড়টা সরিয়ে একগাল হাসতে চেষ্টা করল। এমন একটা অঙ্গভঙ্গি করে হোগলা জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে এগোতে লাগল যেন অনেক কালের চেনা ওদের।

বিভু ফিসফিস করে বলল, "আমার কিন্তু ভালো মনে হচ্ছে নারে।"

কলকি বলল, "ভূত তো আর নয়, মানুষই, দেখা যাক না কি বলে।"

"উহ্ কি রোদ্দুর গো!" বলতে বলতে মেয়েমানুষটা এগিয়ে এলো। ঘোমটাটাকে কাঁধের উপর পুরোপুরি টেনে নামিয়ে শুধাল, "ও মা এ আবার কে গো, ব্যামো বুঝি?"

কলকি বলল, "ডুবে গিয়েছিল।"

"তাই বুঝি!" খিল খিল করে হেসে উঠল ও। "বুড়োধাড়ী আবার ডুবেছে কি কথা গো, সাঁতার আসে না বুঝি!"

"আসে, তবে—" সমস্ত কথা খুলে বলল বিভু।

কলকি বলল, "আপনারা তো এদিককারই লোক—"

"অমন আপনি আপনি করো না দেখি।" অনেকটা ধমকের সুরেই আবদার দেখিয়ে বলল মেয়ে মানুষটা।

কলকি বিভুর দিকে তাকাল। বিভু কেমন শক্ত হয়ে বসে আছে। কলকি বলল, "একটা হালকা মতো গেরাফি জোগাড় করে দিতে পারো। তাহলে আর অনর্থক ডুবিয়ে ডুবিয়ে হয়রান হতে হয় না।"

"এ আর এমন বড় কথা কি গো! তবে আমার সঙ্গে এলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

কলকি আবার বিভুর দিকে তাকাল। যেন বিভুকে ও সুযোগ দিচ্ছে। দেখ, যেতে পারিস কিন্তু! গেরাফি ছাড়া, ইচ্ছে থাকলে অন্য কিছুও জোগাড় করে আনতে পারিস।

বিভু বলল, "তা হলে তুমিই একবার যাও না ওর সঙ্গে। তবে কত দূর যেতে হবে শুনি।"

"কতদূর আবার। এই হাটখোলা অবদি। আজ হাটবার।"

"সেতো ক্রোশটেক গো!" কলকি বলল। হাটখোলায় মুড়ি গুড় চিবিয়ে গত রাত কাটিয়ে এসেছে ওরা। হাটখোলার কথা মনে আসায় খানিকটা যেন তাপ পেল কলকি। বলল, "তা হলে তুই বোস। আমিই যাই।"

মেয়েমানুষটার কপালের ওপর কালো টিপ চকচক করে জ্বলছে যেন। বিভু ওর চোখের দিকে তাকাতেই সাহস পেল না।

খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল কলকি। মেয়েমানুষটা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কলকি বলল, "টিনের বাক্স থেকে দুটো টাকা বার করে দেতো!"

"দু-টাকা!" চোখ বড় বড় করে তাকাল বিভু।

"দে না। আট দশ আনা তো গেরাকির জন্যই লাগবে। আর বাকিটাও কাজে লেগে যেতে পারে।"

"মানে!"

"ধেৎ তোর!" চাপা ধমকানির সুরে কলকি বলল। "মেয়েমানুষটাকে দেখেও চিনতে পারছিস না। দে দে, বার কর! ঘুরে এসে সব বুঝিয়ে দেব।"

সুরঙ্গের মুখে শামুক-ঝিনুক মনসা-কাঁটা আর মাকড়শার জাল। ভিতরটা বড় অন্ধকার। ঢুকতে গেলেই তীরের মতো কাঁটা লাগবে। পা হাত পা ছিঁড়ে পড়বে। এত শত বুঝতে পেরেও নিত্যানন্দ তাক খুঁজতে লাগল। ঢুকতেই হবে। ঢুকতেই হবে। শব্দটা ওকে চেপে ধরবে! ধরুক না, তবুও ও সুরঙ্গটুকু পেরিয়ে যাবে। রহস্যটা জানতেই হবে। জানতেই হবে। সোঁ সোঁ করে জল কেটে এগোতে লাগল নিত্যানন্দ।

বিভু তখন ঘোলাটে চোখে চারপাশে একবার তাকাল। মতি কলকি বেদীর উপর মনে মনে রাগ জমতে লাগল ওর। তাও দেখ সবার। দায় বলে কি কিছু নেই গো! একসঙ্গে তবে বেরিয়েছি কেন!

খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঢিলে পায়ে পায়চারি করল বিভু। বহুদূর পর্যন্ত হোগলা কাশের মাঠ দেখা যাচ্ছে। নদীর ওপারেও মাঠ। রোদ পড়ে নদীর

জল আয়না খেলছে। বিভু নিত্যানন্দের দিকে তাকাল। নিত্যানন্দ নাকে মুখে শ্বাস টানছে। কিন্তু, রোদের তাতে দরদর করে ঘাম ছুটছে বুক বেয়ে। আহা গো। বড্ড বেচারা কষ্ট পাচ্ছে। এ সময় বেণীটা যদি ফিরে আসত, একটুক্ষণ ও ছাওয়ায় থাকতে পারত। সব শালার উড়নচণ্ডী।

উদ্দেশ্যহীন রাস্তা ধরে এগোতে লাগল বিভু। কোথায় যেন বাউল গান স্থরু হয়েছে। চমকে উঠে ক্ষীণ গলার দু-একটা বোল শুনল বিভু। এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে ভালো করে আঁচ করবার চেষ্টা করল।

এই রোদেও বাউল গাইবার সখ হয়! বিভু অবাক হয়ে জঙ্গলের দিকে হাঁটতে লাগল। খানিকদূর এগিয়ে এসেই একটা হোগলার চালা দেখতে পেল। চালার নিচে জনাকয়েক লোক বসে। গানটা তবে ওখানেই গাইছে কেউ।

বিভু এগোতে এগোতে বুঝতে পারল, জলছত্র ওটা। এক ঘটি জল চেয়ে চকচক করে গিলে খেল। তারপর বলল, "বাবাঃ যা রোদ্দুর।"

বাউল গানের শ্রোতাটি গায়ে পড়েই কথা বলল ওর সঙ্গে, "মশাই বুঝি নদীর পাড় থেকে আসছেন।"

বিভু বলল, "হুঁ, আপনি জানলেন কি করে।"

"আপনাদের বেণীও এসেছিল কি না! ও একটা তাবিজ আনতে গেছে।"

"তাবিজ!" অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বিভু।

"হ্যাঁ হ্যাঁ তাবিজ! মাদুলি যাকে বলে।"

বিভুর কাছে সব ব্যাপারটাই গোলাটে হয়ে উঠল। বাউল গাইছে যে, সে হাটের খদ্দের। হাটে যাবে। গলাখানা বড় খাসা। জুত করে উঠে বসল বিভু! কয়েক কলি শুনেই যাওয়া যাক। বেণীটা কোথায় মরতে গেছে কে জানে! বেণীর কথা শুনতেও আর ইচ্ছে হলো না।

স্থড়ঙ্গের ভিতর ঝাই মেরে ঢুকে পড়ল নিত্যানন্দ। চতুর্দিকে আঁধার-গোলা থিকথিক করছে। চতুর্দিকে শব্দ ছুটছে ঝড়ের মতো। মনসা-কাঁটা হাতে বুকে মাথায় পায়ে ফুটে বসছে। দরদর করে রক্ত এলো। রক্তের ভিতর ডুবিয়ে ডুবিয়ে এগিয়ে চলল নিত্যানন্দ। মুখে কেমন নোনতা স্বাদ। চোখ দুটো ছিঁড়ে খুঁড়ে এখনি যেন বেরিয়ে আসবে।

একবার ভাবল পিছিয়ে আসে, আবার ভাবল এগিয়ে যায়। এগিয়ে

গেল নিত্যানন্দ। সোঁ সোঁ করে গুহার ভিতর ছুটে চলল। ছুটতে ছুটতে দেহটা যখন অবশ, সব চেতনা যখন একেবারে সূঁচের ডগায় উঠে এসেছে তখন ও বুঝতে পারল কেমন যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে গুহাটা। কেমন যেন হালকা হয়ে ভেসে উঠছে দেহটা। চারদিকে এখন তীরের মতো আলো ছুটেছে। আলো আলো, এত আলো চামড়া চুঁইয়ে বুকে লাগছে।

অবশেষে চোখ মেলেই চাইল নিত্যানন্দ। ভীষণ আলোয় চোখের পাতা ঝলসে যাচ্ছে। আলোর ধাঁধা চোখের পাতায় কাটিয়ে নিতে নিতে বুঝতে পারল ডাঙার উপরই ও শুয়ে আছে। কিন্তু আশে পাশে কেউ নেই। বিভু মতি কলকি বেণী কেউ নেই। গেল কোথায়!

ঝিনঝিন করে মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে।

শক্ত ভাবে দু-হাত দিয়ে মাটি চেপে ধরল নিত্যানন্দ। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, মতি বেণী বিভু কলকি ওরাও বুঝি এক একটা সুরঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ পাঁচজনে আবার এক না হলে নৌকোখানার কি হবে!

নিত্যানন্দ আবার কেমন তলিয়ে যেতে লাগল অন্ধকারে। অথচ যাতে না যায় এবার তারই চেষ্টা করতে হাত ছড়িয়ে মাটি ধরল।

ছন্দ

চার্লস চ্যাপলিন

কেবলমাত্র ভোরের আলো এই ছোট্ট স্প্যানিশ জেলের প্রাঙ্গণের নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিল—ভোর, মৃত্যুর বার্তাবাহী—তরুণ লয়্যালিস্ট তখন দাঁড়িয়ে আছে বধ্যভূমিতে, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে। প্রাথমিক কাজকর্ম শেষ। অফিসারদের ছোট্ট দলটি এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুদণ্ড দেখবার জন্ত। এই মুহূর্তেই সমস্ত দৃশ্যটিকে এক করুণ স্তব্ধতায় ছেয়ে দিলো।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা আশা করেছিল স্টাফ-অফিসার মৃত্যুদণ্ড স্থগিতের আদেশ পাঠাবেন। দণ্ডিত মানুষটি তাদের আদর্শের বিরোধী, কিন্তু স্পেনে সে ছিল জনপ্রিয়। একজন চমৎকার ব্যঙ্গরসিক ছিল সে, তার লেখা সহকর্মীদের মনকে অনেকখানি আনন্দে উৎফুল্ল করত। ফায়ারিং স্কোয়াডের অফিসার-ইন-কম্যাণ্ড তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। গৃহযুদ্ধের আগে ওরা ছিল বন্ধু। মাদ্রিদ য়ুনিভার্সিটি থেকে ওরা দুজন এক সঙ্গেই ডিপ্লোমা পেয়েছিল। ওরা একসঙ্গেই রাজতন্ত্র ও গীর্জার ক্ষমতা উচ্ছেদের জন্ত সংগ্রাম করেছে। একই সঙ্গে তারা মদ খেয়েছে, কাফেতে রাত কাটিয়েছে বিভিন্ন টেবলে, হেসেছে, পরিহাস বিনিময় করেছে এবং সারাটা সন্ধ্যা ভরে দিয়েছে নানারকম অধ্যাত্ম কূট-তর্কে। অনেক সময় তারা বিভিন্ন ধরণের সরকার সম্পর্কে ঝগড়াও করেছে। তাদের মতবিরোধও ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই সারা স্পেনে ডেকে আনল অশান্তি ও বিক্ষোভ। তারাই এখন তার বন্ধুকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে কী লাভ? যুক্তি বিচারেরই বা কী দরকার? গৃহযুদ্ধ সুরু হবার পর যুক্তির আর কী প্রয়োজন আছে? নিস্তব্ধ জেল প্রাঙ্গণে অফিসারের মনে এ সমস্ত প্রশ্ন অতি দ্রুত ভীড় করে এলো। না। অতীতকে অবশ্যই ঘেঁটিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। একমাত্র ভবিষ্যতই এখন বিচার্য। ভবিষ্যৎ? এমন একটি পৃথিবী যেখানে অনেক পুরনো বন্ধুকে আর দেখা যাবে না।

যুদ্ধ শুরু হবার পর এই একটি বিশেষ সকাল যখন তারা প্রথম আবার মিলল। কোনো কথা বলল না তারা। জেলের প্রাঙ্গণে ঢোকবার সময়ে তারা শুধু মৃদু হাসি বিনিময় করেছিল। এই করুণ সকাল জেলের দেওয়ালে রক্তিম আর রুপোলী আলো ছড়িয়ে দিল। সর্বত্রই একটা স্তব্ধতা, এমন প্রশান্তি যার ছন্দের সঙ্গে এই জেল প্রাঙ্গণের ছন্দ একসূত্রে গেঁথে গেছে, এমন নিঃশব্দ ধুকধুকনির ছন্দ যা বুকের স্পন্দনের মতো। এই নৈঃশব্দের মধ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডের অফিসার-কমান্ডিং-এর কণ্ঠে জেলের প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হলো : "অ্যাটেনশন!"

এই আদেশ শুনে ছ-জন সাবর্ডিনেট বন্দুক চেপে ধরল, তাদের শরীর কঠোর হয়ে গেল। তাদের এই একই তালে চলার পর খানিকটা চুপচাপ। দ্বিতীয় আদেশ এসময়েই আসার কথা।

কিন্তু এই বিরতির সময়ে একটা কিছু ঘটল, যা ছন্দপতন ঘটাল। দণ্ডিত মানুষটি কাশল, গলাটা পরিষ্কার করে নিল। এই বাধা সমস্ত ঘটনার পারম্পর্যকে অদল-বদল করে দিল।

অফিসারটি ফিরে তাকালেন বন্দীর দিকে। সে কথা বলবে বলে প্রতীক্ষা করছিলেন তিনি। কিন্তু কোনো কথা সে বলল না। আবার নিজের সৈনিকদের দিকে ফিরে তিনি দ্বিতীয় আদেশ দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু হঠাৎ তার মনে কী একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো, স্মৃতিলোপ হয়ে তার মস্তিষ্ককে শূন্য করে দিল।

তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সৈনিকদের সামনে। কী ঘটছিল? জেলপ্রাঙ্গণের এই দৃশ্য তাঁর কাছে কিছুই মনে হলো না। তিনি আর কিছুই দেখলেন না, বাস্তবদৃষ্টিতে শুধু একটি মানুষ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, সামনে ছয়জন মানুষ এবং পাশে দাঁড়ানো এই লোকগুলোকে কী বোকা দেখাচ্ছিল, যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ির মতো। কেউ নড়ছে না। কোনো কিছুরই কোনো মানে নেই। একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে। এ সমস্তই একটা স্বপ্ন। অফিসারটিকে এর থেকে পালাতে হবে।

অস্পষ্টভাবে ক্রমশ তাঁর স্মৃতিশক্তি ফিরে এলো। কতক্ষণ ধরে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে? কী হয়েছে? ওহো! তিনি তো একটা অর্ডার দিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অর্ডারটি কী?

"অ্যাটেনশন!" বলবার পর "শোল্ডার আর্মস্" তারপর "প্রেজেন্ট!" এবং

সবার শেষে "ফায়ার!" তাঁর অবচেতনে এ সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা ছিল। কিন্তু যে কথাগুলো উচ্চারণ করতে হবে সেগুলোকে মনে হতে লাগল অনেক দূরের, অস্পষ্ট এবং তাঁর মনের বাইরেকার।

এই বিব্রত অবস্থায় তিনি অসংলগ্নভাবে কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করলেন যার কোনো মানে ছিল না। কিন্তু তিনি দেখে আশ্বস্ত হলেন যে তাঁর সৈনিকরা কাঁধে বন্দুক তুলেছে। তাদের নড়াচড়ার ছন্দ তাঁর মস্তিষ্কের ছন্দ আবার জাগিয়ে তুলল। আবার, তিনি হাঁক দিলেন। সৈনিকরা বন্দুক বাগিয়ে ধরল।

কিন্তু এরপরে যেটুকু বিরতি সে সময়ে জেলপ্রাঙ্গণে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। অফিসারটি তখনই জানতে পারলেন, মৃত্যুদণ্ড স্থগিতের আদেশ। তৎক্ষণাৎ তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

"স্টপ্!" তিনি প্রাণপণশক্তিতে ফায়ারিং স্কোয়াডকে চিৎকার করে বললেন।

ছয়টি মানুষ বন্দুক বাগিয়ে তৈরি ছিল। ছয়টি মানুষকে একটি ছন্দে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ছয়টি মানুষ, চিৎকার শুনল "স্টপ্!" চালাল গুলী।

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে লেখা　　　　　　　　অনুবাদ : কৃষ্ণ ধর

স্কেচ — গোপাল ঘোষ

দুটি কবিতা
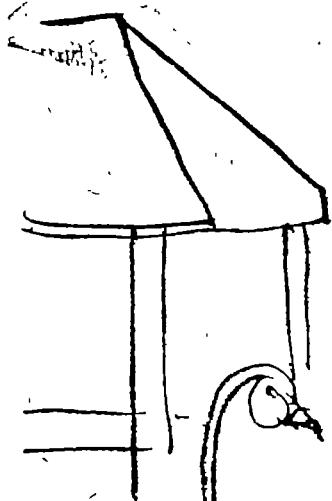
বিষ্ণু দে

জল কন্যা নয়, তবু অনন্ত অগাধ
অতলান্ত সমুদ্রেই আমি করি বাস।
বর্ষা শুধু বর্ষে বর্ষে আমারই সম্বল,
অন্যদের আছে বারো মাস।

না, তা নয়, দায়ী নয় কোনো অপরাধ,
আমার বা আর কারো দোষ।
তাকে জানি—এই সত্য একান্ত সরল।
আশ্চর্য যা, তা হলো যে নেই আফশোষ।

কোনো যুক্তি নেই। তবে যুক্তিতে কে বাঁচে!
যুক্তির সেই তো মহাত্রুটি।
সেকেলে ভাগ্যের মতো যুক্তিরও ভ্রূকুটি।
যুক্তির প্রসাদ কেবা পুঁথি ঘেঁটে যাচে!

হয়তো বা যুক্তি নেই, শক্তি খুবই কাঁচা,
ইওরোপীয় নয় সত্য, হয়তো জান্তব—
তবু বাঁচে! বস্তিতে বা ফুটপাথেই অজাত কী বাঁচা!
এক হিসাবে মনে হয় এরা সব বিশ্বের পাণ্ডব।

ঝাঁপিটা কাল খোলা হবে

অরুণ মিত্র

ঝাঁপিটা কাল খোলা হবে, চলো এখন শহর দেখিগে। ধুলো, লাল নীল কাচের টুকরো, ভাঙা পেতল, মাটি—ও সবের চেয়ে কম আশ্চর্য নয় এই দিনের বেলার শহর। ও গুলো ঢাকা থাক, আমরা পথে ঘাটে ঘুরে আসি। কে জানে এমন কিছু হয়তো পেয়ে যাব যা কস্মিনকালেও পাইনি।

এই কথার পর ঘুণ-ধরা হড়কোটা নামিয়ে আমরা বেরোই।

বাস্তবিক তাক লাগাবার মতো শহর। সত্যিকার মায়াপুরী। এক এক জায়গায় রোদ জ'মে জ'মে যেন স্ফটিক হয়েছে। তা দিয়ে কতগুলো গৌরবের স্তম্ভ তোলা যেতে পারে ভাবি। অনেক চীৎকারের এক বিশাল প্রপাতের সামনে গিয়ে পড়ি। সেখানে আমরা কোনো কথা বললে তা আর আমাদের থাকে না, কিছুতেই থাকে না। শহরের মাঝখানে দেখি রাবণের চিতার মতো আগুনে আকাশ টকটকে। আমাদের সব উত্তাপ বুঝি ঐ কেন্দ্রে জমা থাকে। অথচ এক কোণে, অনুমান করি, কোনো গাছ মৌমাছির ঝাঁক নিয়ে নত্র হ'য়ে আছে। তাকে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু কাছাকাছি অনবরত মর্ম গুঞ্জন। এবং মনে হয় সূর্যের ভিতরে মধু জমছে।

কতক্ষণ ধ'রে কত অলিগলি রাস্তা পার হ'য়ে হঠাৎ বিরাট মোড়। সেখান থেকে শুধু আমাদের বাড়ির পথটাই চিহ্ন দেওয়া। আর সব দিক অপার সমুদ্রের মতো।

খালি হাতে ফেরার সময় আবছা হাওয়ায় ঘেরা ঘুম-জড়ানো একটা কচি গলা আমার কানের কাছে বলে, ব'লেই চলে: "কাল যখন ঝাঁপি খোলা হবে, দেখো না কি মজা হয়···কাল যখন ঝাঁপি···"

বিপরীত ছবি

মণীন্দ্র রায়

সবাই সোহম্ হবে এই স্বপ্নে বসে শবাসনে।
ব্যাকুল নিষেধ যত, স্বেদ, ক্লেদ, সমস্ত বিকার
কেউ কেউ পার হয়; কারো কারো জীবনমন্থনে
দেখা দেয় নীল জ্যোৎস্না, পূর্ণতায় স্নিগ্ধ পূর্ণিমায়।
তারাই সার্থক, মুক্ত; তাদেরই উদার বরাভয়
আনে কামনার শস্য; জন্ম-জন্ম যুগলে-যুগলে
রুক্ষতায় এ সংসারে রোধ করে যত ভূমিক্ষয়
সে শুধু তাদেরই টানে উদ্বেলিত জোয়ারের জলে।

আমারও সাধনা তাই; কিন্তু আমি বুকের ভিতরে
কোনো পূর্ণিমার আলো পাইনি প্রবল আবির্ভাবে।
তবু এই না-থাকাও সর্বব্যাপী তৃষ্ণার শিখরে
ভীষণ মন্ত্রের মতো অমাবস্যা হ'য়ে আজ কাঁপে।
কান পাতো সে আঁধারে; দেখ সেই বিপরীত ছবি:
শূন্যেরও কোটাল-বানে ভেসে যায় জীবনজাহ্নবী।

সময়চিত্র

চিত্ত ঘোষ

যে সব বন্ধুর সাথে প্রতিদিন দেখা হতো আগে
এখন তাদের ছায়া দূরবর্তী বাস্তুঘরে যাওয়ার রাস্তায়।
চোখের পাতার রঙে, মুখের মণ্ডলে অঙ্কিত জটিল দাগ :
"যেখানে ছিলাম আগে, যে রাস্তায়, যে বাড়িতে ঘরে
এখন সেখানে নেই"!
"এখন যেখানে আছি, যে রাস্তায়, যে বাড়িতে ঘরে
ধাবিত, আহত, নিত্য…"
অন্ধকারে প্রবল গম্ভীর শব্দ অতিকায় গাছ থেকে পড়ে
ছড়ায় রোদন প্রতিধ্বনি।
নদীর অতল স্রোতে নৌকোর নিভৃত শব্দ শুনি
"অদৃশ্য পাথারে যাই
ভেসে যাই নীলরেখা দূরত্বের দিকে—"
চায়ের টেবিলে এক চুম্বক ধাতুর টান :
দুদিকে দুজনে বসে, চারদিকে চারজনে,
অসংখ্য বিকেল, গল্প, ক্লিষ্ট মুখ
আহত উজ্জ্বল রাত্রি, আলোড়ন, অন্ধকার স্থির।
কখনো ভীষণ বিদ্ধ কঠিন পাথরে।
সেখানে যাওয়ার দিকে উচ্চ চূড়া পিচ্ছিল পাহাড়
অথবা এখানে ভবিতব্য অমোঘ সংলাপ।
প্রয়াসে কী প্রতীকাঙ্ক্ষ, বোধবৃত্তি ব্যবহারে
আদিম উত্তম ইচ্ছা নিয়োজিত করা।
মূলকেন্দ্রে শরবিদ্ধ পাখি
আমাদের সারা গায়ে তার রক্ত, তার অশ্রু তারি শুভ্র শীতল পালক।

চৈত্রের চাতক বলেছিল

সিদ্ধেশ্বর সেন

১

চৈত্রের চাতক বলেছিল, "স্ফটিক জল"
স্ফটিক
জল

জিহ্বা, আল্-
জিহ্বা গিয়ে ঠেকে
ব্রহ্মাণ্ডতালুতে
শুকনো ও খট্‌খটে, শুকনো ও
খট্‌খটে

অমাবস্যার এক অকালদ্বিপ্রহর মাথায়
অলক্তপ্রপঞ্চ নিয়ে যায়, হেঁটে

বৃদ্ধ, হে যুবার সাজ, কতবার বিভিন্ন
সংকেতে
কিম্বা ও কে, রূপান্তরে সনাতন
ও নবীন

চৈত্রের তিমির বেলাবিপুলমধ্যাহ্ন, কাল-
বৈশাখে, মুকুর-
সর্বনাশে
কাঁটায় গাজনেগাছে, সংক্রান্তির
চড়ক-সঙীন ॥

২

চৈত্রের চাতক চেয়েছিল, স্ফটিক
জল

আমারই চরাচর ভোবে এক ফোঁটা তৃষ্ণার আকর
আকাশ, সে খচিত-স্ফটিক ?

৩

স্মৃতি, ও-বাজায় তার কালান্তর শিঙা
চৈত্রের ধূসর শব হয়
হাওয়া এসে মুছে নেয় সমস্ত গরিমা

চৈত্রের ধূসরশবে, ধেনু
ফেরে, সূর্য
নাবে, পাটে

আমাদের প্রেমঈর্ষাবিরূপতা, ভয়াবহ—
পরিণতি চায়

আমি এক পৃথিবীর অকথিত মাঠে

আমার কপাল থেকে ক্ষতআচম্বিত রেখাগুলি ধায়, শূন্যে
ঘটেপটে

পরিত্যক্ত আল, করোটি ও হাড়

অস্তিম, অস্তিম-বৃত্ত উৎ-
ক্ষিপ্ত, ও আবৃত
ধূলায়

বক্ষের বাও, মনসী
উড়ন্ত সে বাক্‌, উড়ন্ত, উড়ন্ত
প্রান্তরে বক্ষের :
জ্ঞান আত্মনি
ওড়ে আঁধার, মৌন-বিলাপ
আবোজন
রাশিরাশি কল্প ও নিমেষ পুঞ্জব্যোপে, ওড়ে
নক্ষত্রস্ফটিকে, হাহাকার ॥

জন্ম-মৃত্যু, এই প্রজনন

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

মুখে বমনের গন্ধ, সারাদেহে কলঙ্কের দাগ—
কী করে দাঁড়াব তার কাছে?
আমার এ ঘৃণ্য পশুটাকে
আমি যত ঘৃণা করি, তত ঘৃণা মানুষে করে না;
সমগ্র অস্তিত্ব তার ভূতগ্রস্ত বিকারের ঘোরে
ইতর সুখের এক গোপন বিবর ছাড়া আর কিছু জানে নি, জানে না।

এই দিয়ে ছোঁয়া যায় ধ্রুবতারকার দীপ্তি—প্রেম?
অনুভব করা যায় কুমারীর মনের আহ্লাদ
হৃদয় ছাপিয়ে ওঠে স্বর্গীয় যে-স্বাদে?
যত স্বপ্ন-সাধ
কঠিন শায়ক-বেঁধা তীর্থগামী বলাকার মতো
চক্রবালে পাক খেয়ে মুখ গুঁজে মাটিতে লুটায়।
চোখে তার টলোমলো পদ্ম জাগে মানস-হ্রদের
যূথভ্রষ্ট বেদনায় নীল;
রক্তাক্ত ব্যাদিত মুখে আমি বন্য কুকুরের মতো
ছেঁড়া পালকের ভাঁজে কোমল মাংসের স্বাদে মজে
স্বর্গের দোরের কাছে বেত্রাহত, আর্ত চেয়ে আছি!
আমি আর সেই পাখি
দুজনেরই দীর্ণ বুকে নষ্ট-নীড় স্মৃতি।

ভোরের আশ্চর্য লগ্নে কখন যে ফোটে পারিজাত—
ফুল-পাখি-পতঙ্গেরা সারিবদ্ধ, প্রথম অগ্নির
বন্দনায় নতজানু; অন্য এক জন্মের প্রস্তুতি
প্রত্যহের পুরানো এ পৃথিবীকে করে গর্ভবতী

ঘোমটায় ধনুকে-টানা পিঠ তার নতুন মায়ের
লজ্জায় কখন কাঁপে।—তার দূর স্মৃতি।
বৈশাখের পুণ্য ফুল, সহোদরা অমল নীলিমা,
মাঠের সবুজে ক্ষত-বিক্ষত এ হৃদয় বিছিয়ে
বারবার বলি তাই, "শুদ্ধ করো, শুদ্ধ করে নাও"—
আতঙ্ক-লগ্নের সেই পবিত্র অগ্নির
স্পর্শ দাও আমার কপালে;
দাও সেই পাখা দাও, স্বর্ণবর্ণ বিহঙ্গ-যমজ,
হে উড্ডীন, হে আকাশচারী।

আমার প্রার্থনা যত নিরুত্তর দেওয়ালে দেওয়ালে
প্রতিহত হয়ে ফেরে; নিজেকে নিজেরি ছায়া যেন
হাত ধরে নিয়ে যায় সন্ধ্যার বীভৎস গলিপথে
মাদক-উল্লাসে যেন নরকের সব কটি দ্বার
সেখানে কে দেয় খুলে; নগ্ন-দেহে হুমড়ি খায় মাংসলুব্ধ একদল পশু,
হয়তো মানুষ ছিল গত জন্মে—আজ তার ছায়া।
স্খলিত গলায় তীব্র হেঁকে উঠি—"আমাকে ফেরাও,
নরক কী বীভৎসতর এ পঙ্কিল শহরের চেয়ে?"
হেসেছে এ প্রশ্ন শুনে ছায়ামূর্তি প্রেত অনুচর।

আবর্ত-কুটিল ক্লিষ্ট ভোগবতী পাতালের নদী,
তোমার গভীরে আমি মজ্জমান হয়ে যেতে যেতে
প্রাণপণে হাত তুলে শুদ্ধ সেই প্রথম অগ্নিকে
জন্ম-শোধ একবার স্পর্শ করে যাব।

মারীচ

মৃগাঙ্ক রায়

আমার প্রত্যয়ে প্রবেশ ক'রো না।
বৃষ্টি, বৃষপাল মেঘ, মরুভূমির রাবণ
রৌদ্র, মেঘ, ঘুরে ঘুরে
ফের ঘুরবে—বহু শব্দ, শব্দহীনতা
স্নেহ, তুষারের দৃঢ় অন্ধকার।
আমি আমার বাইরে থাকব
তুমি আসবে অনুমানে।

অথবা তুমি অযোধ্যা নগরে যাও
কিংবা ইন্দ্রপ্রস্থে সুস্থির সমাবৃত নাগরিক।
যাও যার প্রতীতির অলীক শুভ্রতা রাজহংস
নির্লিপ্ত নদীতে, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পুরুষ কোনো
বেছে নাও—যার ঘরে অহংকারের উদ্ধত ভ্রূ
মানবে নিশ্চিত, যার বাহুর স্পর্ধার নিচে
উলঙ্গ-সুন্দরী ভয়ংকর বিস্ফারিত।

আমার প্রত্যয়ে প্রবেশ ক'রো না।
আমি শরীরে রাক্ষস রেখে মারীচের মতো
মায়াবী হরিণ।

পাঠক-প্রতিমের প্রতি

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

মধ্যাহ্ন অলস কৌচে, জানালায় জটিল রোদ্দুর :
ভুলিয়ে অনলকাণ্ড, ঢেউ বিনা কোথা সমুদ্দুর !
অবশিষ্ট পুরোডাশে শেষাহুতি, প্রস্তুত ঋত্বিক।
লাঞ্ছনা সহে না আর, বিজ্ঞজন পাড়ে শত ধিক্ !

নগরে উজ্জ্বল কৃপা : অধ্যাপক, কবি ও বণিক ;
সুউচ্চ কল্পনা গড়ে নীলাকাশে, দস্তে নীল মেঘ।
সহস্র উন্মুক্ত মুষ্টি, রাশি রাশি করুণা ; অধিক
চাহিনা পাঠক ! ক্ষমা মাগি, ও-প্রজ্ঞায় অনাবেগ !

সম্ভ্রম প্রমাদদুষ্ট, কামদুষ্ট রমণী যেমতি
আপন ইচ্ছায় সাজে যেমন সাজায় অপরাহ্ণ :
মন্দে দাহ কিন্তু প্রিয়, তাড়াবিতে অসন্তোষই সতী।
ইচ্ছা হয় ঘর বাঁধি, গন্ধে পাই যথার্থ নবান্ন।

জানি শেষে ক্ষমা নেই, নেই সেই আলোক উদ্ধার !
ক্রটিপূর্ণ সব শ্লোক, মেনে নেয় বিনম্র মুদ্রক।
সর্ব রহে নিরুদ্বিগ্ন, অন্তহিক শূন্য, অনাহার।
যাহোক তবুও বাঁচে রক্তেমেদে, সজল শূদ্রক !

বক্তব্যে অক্ষমস্তুতি, পাশাপাশি কে আছে, নিঃসীম !
সব কথা নিরর্থক, হালো নাকি পাঠক-প্রতিম !

অগ্নিপটে, দ্বৈপায়ন

তরুণ সান্যাল

না, দেখিনি আয়ুরেখা করতলে কভু, তবু আমি
বহুদিন বাঁচতে চাই, শরীরী, বিনীত, অহংকারী,
স্বগৃহের ইন্দ্রপ্রস্থে হতে চাই প্রিয় গৃহস্বামী—
পাশাপাশি বৃদ্ধা হোক আমার সন্তানসহ, নারী।
চিন্তার মধ্যাহ্নে আছি এবম্বিধ, নির্জন গোলুই,
কেবল জলের শব্দ ছলাৎছল বক্ষমূলে রক্তে,
ক্বচিৎ প্রপাতে যেন সদা শিব তুঙ্গ বৃক্ষে ছুঁই—
(কুঁড়ির যৌবন, তুমি ছিলে কবে, কাকে মনে ক'রে।)

বিকেলে ট্রামের জানলা ঠেলে নামা চোখের দর্পণে
কিছু মগ্ন মুখ যায়, সমাহিত, আকাঙ্ক্ষা কাহার
দোমড়ায় বিদ্যুতে নীলে রক্তিম তামায়, কে তর্পণে
আপন আয়ুর কেন্দ্রে কৃশানু ও ভানুর আহার
হয়ে যায় ব'লে একা অগ্নিঘেরে আয়ুর বহরে
ক্ষত মজ্জমান হয়, শৈলীহীন, পায়ে কে বকুল
ছুঁড়ে দিলে চৌমাথায়, হে অতনু, কোন ধূলা ঝড়ে
নগ্ন প্রহেলিকা হয় কৈশোরের চাঁপা, বেলফুল?

কখনও দেখিনি আমি আয়ুরেখা নগ্ন করতলে,
অধুনা বায়ুর সাক্ষ্য হাতের চাতালে মাখে ধোঁয়া—
বাংলা দেশ, হে জননী, ধুয়ে সোনা জলের অতলে
অক্ষিপট, ঘুমে রও, কদাচিৎ স্ফুরিত জড়োয়া
রক্তিম তরঙ্গে ফুটে যায়, ভেসে যায় গৃহস্থালি—
আর দ্বৈপায়ন হ্রদে রই নিকেতনে স্বইচ্ছায়
ত্রস্ত দেখি, বিসর্জনে চলে তব প্রতিমার চালি
অনতিপ্রেত হে মুখ কার অশ্রু উল্কামুখী যায়!

চতুর্দিকে অগ্নিযজ্ঞ, যজ্ঞগৃহ শীতলে, সন্ন্যাসে
মূষলগর্ভিনী স্বপ্ন শুয়ে আছে সমিধসকাশে ॥

একাকী যাব না পথে

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কেউ স্পষ্ট কাছে থাকে। কেউ ম্লান হৃদয়ের দ্বারে
শব্দহীন ফিরে যায়। অস্তাচল গ্রীবার শাসনে
ভালোবাসা নত দেহ। সন্ধ্যার কর্তব্য পালনে
প্রান্তরে পুষ্পের শোভা প্রাত্যহিক আলোর উদ্ধারে।

ঊর্ধ্বে দ্যাখো আলোহীন বয়ে যাচ্ছে বিগত আকাশ।
কয়েকটি প্রাচীন চিত্র পৃথিবীর ব্যবহৃত পথে
বার বার মৃত হয়। বহু মুখ মিলন বৈরথে
তৃপ্তিহীন। চ্যুত রৌদ্রে প্রতিবিম্ব কার প্রতিভার ?

প্রভাত আপাত রম্য। ক্ষমাহীন দুঃখ চতুর্দিক।
পতঙ্গ ভীষণ ব্যর্থ অঙ্গে নিতে অগ্নিশিখা দাহ
ভুলতে পারিনা ম্লান উচ্চারিত মুখের প্রবাহ।
জটিল জানলা খুললে সমস্তই মুখের প্রতীক।

একাকী যাব না পথে। বহুজন পরিবৃত সুখ।
কণ্টকে বিক্ষত দেহ প্রতিবিম্বে মুগ্ধতা দেখুক ॥

অংশু অস্তাচল মূলে

রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

তাকে আমি কখনো দেখিনি ; তার চৈত্রবনে জ্যোৎস্নাগুলি আজ
ফুটে আছে ; কিংবা কোনো দুপুরে হাওয়ায় দুলে শালবীথি···বৃদ্ধ একেশিয়া
তাহার বাড়ির বাইরে ডেকে আনে মাদলের মদির আওয়াজ।
এখন গিয়াছে ঘুমে···আরো ঘুমে মধ্যরাতে, দুখজাগানিয়া।

অরণ্যচক্রে দিন যায়, ঝরে ফুল···ঝরে গ্রীষ্মে প্রদোষবেলায়
চোখের উপরে দেখি ঋতুগুলি ভেসে যায়, ঋতুগুলি বছরে-বছরে—
এসেছিলে তবু আলো নাই জানি, পলাতকা ছায়ার খেলায় ;
শীতের মর্মরে যায়—বাঙলার হেমন্তের পাতাগুলি, পাতার মর্মরে।

সকলে মিলিত আছি আমরা এই জীবিকাজীবনে নইদশকের দাহে
কিংবা শতবর্ষে···স্মৃতিফলকের পাশে শুনি কলকাতার আত্মঘাতী গান,
জাগরণে দীর্ঘ শোক লেগে আছে বিরক্ত ট্রাফিকে, পায়ে-পায়ে ,
বন্ধুদের চোখে নয়, বিস্ফারিত নগরীর শাণিত শ্মশান।

এখনো অদূর, ঊর্ধ্বে উড়িছে মরাল এক নীলিমায়···সৌর অবগাহে
বুকের ভিতরে যার চিহ্নগুলি—আমাদের উৎসবের অতল আহ্বান।

ছায়াচ্ছন্ন পশ্চাতের পানে

শিবশম্ভু পাল

ওরা যে বধির করে গর্জমান দুঃস্বপ্ন অকূল,
সম্মুখে কেবল দেখি আবছায়া দিবসরজনী ;
এ পথে নিয়ত চলি, ইচ্ছা কি অনিচ্ছা কিছু বুঝি না জানি না।

পিছনে দুহাত তুলে কে ডাকছে ? দিগন্তরেখাটি।
সে যে আত্মহারা ছিল রক্তের রণনে সে যে কতযুগ আগে,
সে যে বড় মায়াময় নায়িকার অরূপ ভ্রূলেখা...

জানে না কুয়াশা কত অনিশ্চয় অনিবার্য কত,
অদৃষ্টের মতো টানে পতনে কাঁটায় অবলোপে
অথবা বাতাসহীন সোনার নরককুণ্ডে আমিও জানি না।

গোধূলির স্বর্ণে কিম্বা বাদলের প্রথম কদম
ফুলের সলজ্জ দলে যে তারা ফোটালে তুমি, হে দিগন্তরেখা,
তার শব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে, আমি

চলে যাই, যেতে হয়, দূরে, সামনে আবছায়া দিবসরজনী
পিছনে তুমিও ক্রমে বিস্মরণ, স্তব্ধ, মৌন, আর
শ্রুতিরে আঘাত করে গর্জমান দুঃস্বপ্ন অকূল।

এবং এখনো চোখ চলে যায় ছায়াচ্ছন্ন পশ্চাতের পানে।

বিপিনচন্দ্র পাল ঃ ভারতচিন্তায় ভক্তিমার্গ ও যুক্তিমার্গ

সরোজ আচার্য

বিপিনচন্দ্র পালের জীবন ও চিন্তাধারার মধ্যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মিশ্র বা স্ববিরোধী রূপটিই পরিস্ফুট। জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টি হবার মাত্র কয়েক বৎসর আগে যেমন তাঁর কর্মজীবন শুরু তেমনি এই নবজাগ্রত জাতির আত্মসম্বিৎসার মতোই বিচিত্র ও ব্যাপক ছিল তাঁর বহুমুখী অভিনিবেশ। নব্যভারতের জাতীয় উন্মেষ অবশ্য পুরোপুরি অতীতের পুনরুজ্জীবন বা পুনরাবিষ্কৃতি নয়, তা হওয়া সম্ভবও ছিল না। তবু ভারতের রেনেসাঁসের মধ্যে প্রথম থেকেই যে যুক্তিবাদ ও পুনরুজ্জীবনবাদের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ বা সহ-অবস্থান ঘটেছিল তা স্বীকার্য। এই কারণেই প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া, বিদ্রোহ ও রক্ষণশীলতার প্রতিযোগী এবং পরস্পরবিরোধী প্রবণতার জোয়ার ভাটায় নবোত্থিত ভারতীয় মানস দ্বন্দ্বমুখর। বিপিনচন্দ্র পালের জীবন ও চিন্তাধারার মধ্যে আমরা যে জটিলতা, এমন কি স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করি সেও এই কারণেই।

তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময়জীবনে বিপিনচন্দ্র ছিলেন এক অন্তহীন আত্মজিজ্ঞাসু, তাঁর এই আত্মজিজ্ঞাসা ছিল নানা সুরে বাঁধা নানা পরস্পরবিরোধী স্তরে বিস্তৃত। কিন্তু সেজন্য তাঁকে কপট বা নিষ্ঠাহীন বলে অভিযুক্ত করা চলে না। তাঁর আরও অনেক সহযোগীর মতো বিপিনচন্দ্রের মধ্যেও হয়তো কিছুটা দ্বন্দ্বপ্রিয়তা বা একগুঁয়েমী ছিল, কিন্তু তাঁর মধ্যে স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদের লেশমাত্র ছিল না। বিকাশোন্মুখ জাতীয় চেতনার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্যেই স্ববিরোধী অস্তিত্ব ছিল। অতএব স্বভাবতই বিপিনচন্দ্রের সত্তর বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনের অতৃপ্ত ও অন্তহীন বুদ্ধিগ্রাহী জিজ্ঞাসা তাঁকে পর্যায়ক্রমে চরম ও নরমপন্থী, বিপ্লবী ও নিয়মতন্ত্রী, যুক্তিবাদী ও পুনরুজ্জীবনবাদী হিসাবে উপস্থিত করেছে।

প্রবল জ্ঞানস্পৃহা এবং অদম্য আত্মপ্রকাশের আবেগ নিয়ে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই বিপিনচন্দ্র দীর্ঘ বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন। তাঁর

জীবন ছিল দীর্ঘ এবং একই সঙ্গে নানা স্তরে বিস্তৃত। সহজাত আবেগ প্রবণতা ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির অধিকারী হওয়ায় তাঁকে বারংবার পরস্পর বিরোধী পন্থা পরিক্রমণ করতে হয়েছে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে আলাময়ী বিতর্কে। সবাইকে যেমন চমক লাগিয়ে দিয়েছেন, তেমনি বিভ্রান্তও করেছেন। শেষপর্যন্ত তিনি যে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন আমাদের মনে তা হচ্ছে নানা বৈপরীত্য সত্ত্বেও একটি সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের; তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারা আধুনিক ভারতের ইতিহাসে নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই মানুষটির বহুমুখী প্রতিভা বহুবৎসর পার হয়ে সেই বিগত যুগের আবেগ ও বহুধা কর্মোদ্যমের সাক্ষ্য আমাদের কাছে বহন করে আনে।

এই শতকের সূচনায় বিপিনচন্দ্র যখন তিলক ও লজপৎ রায়ের পাশে নিজের আসন করে নিলেন তখন 'লাল-বাল-পাল' এই ত্রয়ীই হলেন রাজনৈতিক চরমপন্থার উজ্জ্বল প্রতীক। এরই আহ্বানে তখন অগণিত শিক্ষিত নরনারী হয়ে উঠেছিল উদ্বেলিত। এক মহান বাঙালী, এক মহান পাঞ্জাবী ও এক মহান মারাঠী এই ত্রয়ীর মিলনে গড়ে উঠেছিল ভাবগত ও বাস্তব জাতীয় ঐক্যসূত্র।

তাঁর অগ্নিস্রাবী বাগ্মিতার জন্য বিপিনচন্দ্র সহজেই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রবক্তা হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। তিনি বাগ্মী ছিলেন কিন্তু তাঁর বাগ্মিতা বাগাড়ম্বরসর্বস্ব ছিল না। ১৯০৭-৮ সালে তিনিই সর্বপ্রথম স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার বাস্তব তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। সূচিত হলো আবেদন নিবেদনের ও ঠিকাদারী রাজনীতির উপসংহার। তাছাড়া পরবর্তী কালের বিপ্লবী তেজস্বী জাতীয় নেতাদের বহু আগেই বিপিনচন্দ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের স্থলে বাদামী বা দেশী আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি জানিয়েছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজী আবির্ভূত হবার অনেক আগে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সেই সর্বপ্রথম এই বুদ্ধিজীবী বিপ্লবী সাহসের সঙ্গে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবার কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন, "যে কোন শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াক না কেন, আমাদের ইচ্ছার কাছে তাকে নত হতে বাধ্য করাতে হবে।" বলা যায় বিপিনচন্দ্রের এই উক্তিই 'ভারত ছাড়ো' সূত্রের প্রথম ইশতাহার। তা সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে একটি বিরাট পরিহাস লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে গণ-আন্দোলন শুরু

হবার বহু বৎসর পূর্বেই বিপিনচন্দ্র গণ-সমর্থনের কথা বলেছিলেন এবং বিবেকের এক প্রশ্নে কারাবরণ করে অহিংস প্রতিরোধের প্রথম চমৎকার নির্ভীক দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছিলেন। আবার গান্ধীজীর নির্দেশে যখন সেই গণ-আন্দোলন ও অহিংস প্রতিরোধের আদর্শই ব্যাপকভাবে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলো, যেন বিপিনচন্দ্র পিছু হটলেন এবং হয়ে উঠলেন এই আন্দোলনের বিরোধী ও সমালোচক।

সংগ্রামের অবসান হয়েছে, বিতর্কের ধূলি সব থিতিয়ে গেছে, এখন হয়তো বোঝা সহজ হবে কেন, অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করবার গান্ধীবাদী কৌশলের অনমনীয় বিরোধিতায় বিপিনচন্দ্র হয়তো অতিরিক্ত গোঁড়ামির পরিচয় দিয়েছিলেন; কিন্তু অসহযোগ কর্মপন্থা নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল সেজন্য তাঁর দেশপ্রেম বা ব্যক্তিগত সততা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। নীতির জন্য নির্যাতন তিনি বীরত্বের সঙ্গেই সহ্য করেছেন। আর সেই নীতির জন্যই ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে যে ধারণা যুক্তিসিদ্ধ বলে তাঁর নিজের কাছে মনে হয়নি তার বিরোধিতা করতে তিনি একটুও পশ্চাৎপদ হননি।

বিশ সালের গণ-আন্দোলনের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের এই যে বিচ্ছেদ তাকে আপোস বা নীতি-বিসর্জন বলে চিহ্নিত করা হলে বিষয়টাকে খুবই ভাসা-ভাসা ভাবে দেখা হবে। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক কী তা সঠিক ভাবে বুঝতে হলে বিপিনচন্দ্রের সংগ্রামী প্রগতিবাদের মূল উৎস অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তিলকের মতো বিপিনচন্দ্রেরও রাজনীতিই ছিল দ্বিতীয় প্রেম; দুজনেই ছিলেন বুদ্ধিজীবী; পরাধীন ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতি উভয়কেই অন্যক্ষেত্র থেকে অনিবার্য ভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে এনে মিলিয়েছিল, এবং উভয়ের কাছেই রাজনীতি ছিল জাতীয় পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত ভাব-আন্দোলনেরই একটি অঙ্গ।

তিলকের চিন্তাধারা ছিল প্রধানত ঐতিহ্যবাদী এবং ঐতিহ্যবাদী হিসাবেই তিনি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র প্রথম যৌবনে সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, এবং ঐ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন রাজনীতিতে। সামাজিক ও ধর্মীয় বিদ্রোহ থেকে রাজনৈতিক চরম পন্থায় পৌঁছতে তাঁকে বিশেষ কোনো প্রয়াস করতে হয় নি। কারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রচারিত

মুক্তির আদর্শ ইতিমধ্যেই জাতীয় রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বিপিনচন্দ্র ছিলেন প্রধানত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, সমাজসংস্কারক। কিন্তু বাংলাদেশে তখনকার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অনিবার্য স্রোত তাঁকে সক্রিয় রাজনীতির একেবারে পুরোভাগে এনে ফেলেছিল। তা সত্ত্বেও, তাঁর কর্মজীবনের পরবর্তী ধাপগুলি অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, চিন্তানায়ক বিপিনচন্দ্র কর্মবীর বিপিনচন্দ্রের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে তবুও উন্মাদনা সৃষ্টি করতো তার কারণ আদর্শকে দুর্নিবার আবেগে মণ্ডিত করবার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল; এবং এই কারণেই স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গের যুগে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা ভারতবর্ষের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত এতটা কার্যকরী হয়েছিল।

কিন্তু তাঁর মন ছিল নিরাসক্ত নৈতিক আদর্শবাদীর মন—তদুপরি কাব্য ও আবেগপ্রবণ বাঙালীর মন। সুতরাং গণরাজনীতির বোধ ও নীরস কর্মপন্থার কাছে আত্মসমর্পণ তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না।

সক্রিয় রাজনীতি থেকে পশ্চাদপসরণ তাই তাঁর পক্ষে ভবিতব্য ছিল। তাঁর কর্মজীবনের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যে পরস্পর বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল তা সম্ভবত তাঁর ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম বোধ থেকেই সঞ্জাত। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রী, ছিলেন নির্যাতিত ও অধঃপতিতদের দুঃখে কাতর মানবতাবাদী (তার প্রমাণ পাই চা-বাগানের শ্রমিকদের পক্ষে তাঁর লড়াই দেখে); কিন্তু জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পণের পপ্যুলিষ্ট স্লোগানে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না বলেই মনে হয়। তিনি ছিলেন, যাকে বলা যায় মধ্য ভিক্টোরিয়া যুগের চরমপন্থী বুদ্ধিজীবী আর সেই কারণে গণ-রাজনীতির মূল দাবির চেয়ে ন্যায় বিচারের বিমূর্ত ধারণা দ্বারাই তিনি বেশি চালিত হতেন।

তাই বলে আজকালকার যে সব নেতা জনসাধারণের নামে শপথগ্রহণ করে থাকেন তাঁদের অনেকের মতো সচেতন অন্ধ শ্রেণীবিদ্বেষ বিপিনচন্দ্রের মধ্যে একটুও ছিল না। তাঁর সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের আদর্শগত প্রেরণা এসেছিল সামাজিক ও ধর্মীয় মুক্তি আন্দোলন থেকে; এর সঙ্গে কিছুটা এসে মিশেছিল তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধজাত আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অদম্য মনোভাবই তাঁকে শেষপর্যন্ত যুক্তিবাদ ও বিদ্রোহের

সার্বভৌম প্রবক্তা ও একক ঘাঁটি হিসাবে বাঁচিয়ে রেখেছিল। নতুবা রাজনীতিতে বা অন্ত যে কোনো ক্ষেত্রে হোক না কেন তাঁর চরম পন্থা কখনোই ভীষণভাবে জ্যাকোবিন বা বলশেভিক ছিল না। বরং উদারনৈতিক মূল্যবোধের প্রতি এক ধরনের কোমল মনোভাবের পরিচয়ই তাঁর মধ্যে পাওয়া যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে আধুনিকতা ও পুনরুজ্জীবনবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মান্ধতা এই দুটি পরিপূরক ও আপাত-বিরোধী ধারাই বিপিনচন্দ্রের কর্মজীবনের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। আবার ভারতীয় জাতীয় মানসের অন্যতম স্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতা হিসাবে বিপিনচন্দ্রের জীবন ও চিন্তাধারার সাম্প্রতিক তাৎপর্য রয়েছে কারণ এর মধ্যেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বর্তমান অভীষ্টসিদ্ধি ও প্রাক্তনপ্রয়াস উভয়েরই সীমাবদ্ধতা ও সাফল্য, দুর্বলতা ও শক্তির সূত্রগুলি নিহিত।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা প্রসঙ্গে

রবীন্দ্র মজুমদার

আমাদের আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা যেমন বিশিষ্ট, তেমনি অনন্য। সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলায় একটা সম্পূর্ণ নতুন রূপ-কল্পনার সূত্রপাত ঘটল রবীন্দ্রনাথের হাতে। কবির আঁকা এইসব ছবি কল্পনা আর রূপরীতির দিক থেকে এতই অভিনব আর অভূতপূর্ব যে এদেশের সাধারণ দর্শকরা তো বটেই, চিত্রকলারসিক সমঝদার ব্যক্তিরা পর্যন্ত গোড়ার দিকে একে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চান নি। তাঁরা এটাকে কবির শেষ জীবনের একটা খেয়াল আর শুধুই একটা নতুনতর সৃষ্টির খেলা বলে ধরে নিয়েছিলেন। আর, সাধারণ মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে যে একটা যুক্তিহীন বিরূপতা অন্তত সেই সময়ে দেখা যেত, তার মূলে অবশ্যই ছিল চিত্রকলা সম্পর্কে আমাদের শিক্ষাহীনতা। চিরাচরিতের বাইরে যে কোনো পদক্ষেপকে আমরা সন্দেহ করে বসি, অভিনবকে অদ্ভুত বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি যে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবনযোগ্য, সে কথা আমাদের দেশের চিত্রকলারসিকরা সম্ভবত উপলব্ধি করেন ১৯৩০ সালে যখন ইওরোপে—প্রধানত প্যারিসে—কবির চিত্রপ্রদর্শনী হবার পর সেখানে রীতিমতো একটা সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, নিজের আঁকা ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পসৃষ্টির এবং ছবি-আঁকাকালীন মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে যেসব ছোট প্রবন্ধ বা চিঠি লিখেছেন, আমাদের দেশের সাধারণ চিত্রদর্শকের মনের সংস্কার দূর করতে তা বিশেষ সাহায্য করে নি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ওইসব রচনার মধ্যে যতটা কাব্য আছে, ততটা যুক্তি নেই। নিজের ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তা বেশ কিছুটা অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্‌ ধরনের। রবীন্দ্রনাথের ওইসব চিঠিপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, গোড়ার দিকে তিনি ছবি আঁকা সুরু করেছিলেন সত্যিই হালকা মনে, অবসর যাপনের কালে অন্য কোনো কাজে নিজেকে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে। পরে ক্রমশই তিনি ছবি আঁকার ব্যাপারে অনন্যমনা হয়ে উঠতে থাকেন,

লেখা বা গান রচনার মতোই ছবি আঁকাটাও হয়ে ওঠে তাঁর সৃজনভূমির একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। কিন্তু তবু, চিত্র রচনা করতে গিয়ে কবি যে নতুন শিল্পভাষা ব্যবহার করেছেন, সেই নতুন ভাষাকে ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব তিনি নেন নি।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির এই নতুন ভাষাটি কি?

চিরাচরিত পদ্ধতিতে আঁকা ছবিতে দর্শক-সাধারণ সচরাচর একটা 'কাহিনী'র সন্ধান পান। অর্থাৎ, ছবির বিষয়বস্তুতে একটি 'গল্পবস্তু'—স্টোরি এলিমেন্ট—থাকা চাই। এই বাঁধা রীতি বা কন্‌ভেন্‌শনের বাইরে তখনকার তথাকথিত নব্য-ভারতীয় চিত্রকলার প্রবর্তকরা যেতে চান নি। এবং আমাদের চিত্রকলারসিক ও চিত্রদর্শক-সাধারণ তখন ছিলেন এঁদেরই রচনার সঙ্গে পরিচিত, এঁদেরই রচনারীতিতে ও ভাবকল্পনায় অভ্যস্ত।

চিরাচরিত পদ্ধতিতে আঁকা ছবির যাঁরা রচয়িতা, তাঁরা সহজে দর্শকের কাছে পৌঁছনোর জন্তে প্রধানত নির্ভর করেছেন ছবির বক্তব্যবস্তুর ওপরেই। তাঁদের ছবিতে চিত্রগত মূল্য বা পিক্‌টোরিয়ল ভ্যালু গৌণ, কাহিনীগত ভাবাবেগ—লিটর‍্যারি সেন্টিমেন্ট—মুখ্য। এই যে কথকতাপ্রধান ন্যারেটিভ ছবি দেখতে আমাদের সাধারণ দর্শকরা অভ্যস্ত, এইসব ছবিতে দেখি বস্তুরূপের কোথাও বা স্টাইলাইজ্‌ড্‌ বা প্রথানুসারী প্রতিচিত্রণ, কোথাও বা হুবহু বস্তুতঃ অনুকৃতি-চিত্রণ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবি এ ধরনের ছবির থেকে একেবারেই আলাদা। যদি বলি, চিত্রকে তার কাহিনীর অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার চিত্রগত মূল্যেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথই অগ্রগণ্য, তাহলে বোধহয় খুব বাড়িয়ে বলা হবে না। এর জন্তে রবীন্দ্রনাথ ছবির নিজস্ব সত্তাগুলির ওপরে—অর্থাৎ রঙ রেখা বিন্যাস (কম্পোজিশন), রূপলক্ষণা (অ্যাপিয়্যারন্স্‌) ইত্যাদির ওপরেই—প্রধানত জোর দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অবশ্য গগনেন্দ্রনাথ তাঁর জ্যামিতিক ছাঁদে গড়া এক ধরনের ছবিতে চিত্রিত বস্তুর ধর্মগত ব্যঞ্জনার ওপরে প্রাধান্য আরোপ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর সেই ছবিগুলি কাহিনীর অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—বিশেষত রূপকথার কল্পলোক গগনেন্দ্রনাথের ওই ছবিগুলিকে একান্তভাবে আশ্রয় করেছে। রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা হয় নি। 'সে' গল্পগ্রন্থে কিংবা 'খাপছাড়া' ছড়ার বইয়ে নিজের গদ্য-কাব্য রচনার চিত্ররূপ বা ইলস্‌ট্রেশন হিসেবে তিনি যেসব

ছবি এঁকেছেন, এমন কি সেগুলিও শুধু ছবি হিসেবেই—অর্থাৎ তাদের কাহিনীর সংশ্রববর্জিত হয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবেই—দ্রষ্টব্য হিসেবে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। "শুধু ছবি" হিসেবেই সেগুলি তাৎপর্যপূর্ণ।

আমাদের দেশে চিত্রকলার ক্ষেত্রে 'মডার্নিজ্‌ম্'-এর সূত্রপাত ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—একথা বললে বোধহয় খুব ভুল হবে না—যে-মডার্নিজ্‌ম্-এর মূল কথাটি হলো: যে-কোনো বস্তুকেই ছবির অঙ্গীভূত করা যায়, তার কোনো কাহিনীগত বক্তব্য থাকুক আর না থাকুক, যদি শিল্পীর চোখে সেই বস্তুর বিশেষ গড়নটির আর রূপলক্ষণটির, ফর্মের আর অ্যাপিয়্যার‍্যান্সের, কোনো বিশেষ তাৎপর্য ধরা পড়ে। ছবিতে কথকতাধর্মী রীতিনির্ভরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে আধুনিক ইওরোপীয় চিত্রকলায় এই 'মডার্নিজ্‌ম্' এসেছিল অনেক আগেই। রবীন্দ্রনাথ যে এটাকে আমাদের চিত্রকলায় খুব একটা সচেতনভাবে এনেছিলেন, তা নয়। কিন্তু তিনিই যে এটাকে আমাদের চিত্রকলায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন, সে কথাটা মনে রাখা দরকার। চিত্রকলার বাঁধা সড়কে অভ্যস্ত আমাদের মন তাই গোড়ার দিকে কবির ছবিকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনি।

কবির এই চিত্রসাধনার যে একটি দীর্ঘকালীন ক্রমবিকাশ আছে, সে কথা সকলেই জানেন। স্বরচিত কবিতার পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি করার সময়ে বহু আগে থেকেই কবি সেটাকে একটা চিত্রগত ছন্দরূপ দিয়ে আসছিলেন। এই রেখার ছন্দ এসেছিল হাতে-লেখা রচনার বর্জিত অংশের অসংলগ্নতাকে যুক্ত করে পাণ্ডুলিপির অশোভনতাকে একটা সুদৃশ্য রূপ দেবার প্রয়াস থেকে। ক্রমে ক্রমে সেই রেখাছন্দ একটা স্পষ্ট গড়ন পেতে থাকল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই গড়নের মধ্যে ক্রমান্বয়ে এলো একটা রূপলক্ষণ। শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে আবির্ভাব ঘটল বস্তুসাদৃশ্যের। এই বস্তুসাদৃশ্যই কবির ছবিকে চিত্রগুণে সম্পূর্ণ করে তুলেছে। রেখানির্ভর বিমূর্ত অলঙ্করণ থেকে বস্তুসদৃশগুণ-সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ ছবি—কবির চিত্ররচনার এই ধারাবাহিক পরিণতিটুকু মনোযোগের সঙ্গে অনুধাবনযোগ্য।

কবির আঁকা প্রায় সমস্ত ছবিরই প্রধান অবলম্বন হলো রেখার বিন্যাসে। এই রেখানির্ভরতা বা লিনিয়রিজ্‌ম্ হলো ভারতীয় চিত্রকলার এক মস্তবড় ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে এই খাঁটি ভারতীয় পরম্পরাগত লিনিয়র গুণটি সঞ্চারিত হয়েছে তার একটি প্রধান চারিত্র-বৈশিষ্ট্য হিসেবে। রেখার

পত্তিকে অনুসরণ করেই কবির চিত্রকলা অঙ্কুরিত, বিকশিত ও রূপরঙে পরিণত। কবির আঁকা শেষ পর্যায়ের বর্ণাঢ্য ছবিগুলিও দৈবাৎ রেখার বুনুনি বা টেক্সচার থেকে মুক্ত। রঙীন ছবি থেকেও এই রেখার বুনুনি যদি সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে তার রূপের বাঁধন ও রঙের কাজ, আশ্রয় অভাবে কতটা অবশিষ্ট থাকবে বলা কঠিন। এই লিনিয়র টেক্সচার বা রেখার বুনুনি হলো রবীন্দ্রনাথের ছবির একটি বিশিষ্ট শিল্পগুণ। প্রায় প্রত্যেকটি ছবিতে এই সযত্ন ও নিপুণ টেক্সচার সৃষ্টির মূলে আছে তাঁর সেই গোড়ার দিকের পাণ্ডুলিপি সংশোধনকালীন রেখার অলঙ্করণ সৃষ্টির প্রয়াস। শেষ দিকে কবি যখন বিশেষ করে বর্ণ ব্যবহারের দিকেই ঝুঁকেছিলেন, তখনও তুলি দিয়ে বা আঙুলে ঘষে বর্ণলেপন ছাড়াও, কলমে টানা রেখা দিয়ে যেসব দৃশ্যচিত্র ও মানুষের ফিগার এঁকেছেন, তাতে রেখাপাতের অসাধারণ চারুতা ও নিপুণতা লক্ষ্যণীয়।

রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে: জীবজন্তু-পশুপাখির ছবি; নারীপুরুষের মুখ ও বিভিন্ন ভঙ্গিতে ধরা তাদের ফিগার; আর, দৃশ্যচিত্র। ফর্মগত যে বিশেষ বিশেষ গুণগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে তার নিজস্ব বিশিষ্টতা দেয়, এই তিন শ্রেণীর ছবিতেই সে ফর্মগত বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তিকে একটা রেখানির্ভর ছন্দে বিধৃত করেছেন কবি। এই রেখা স্বতঃস্ফূর্ত, পরিমিত ও সাবলীল। এবং সেই জন্যেই চিত্রিত বিষয়টি এক কল্পনাময় ব্যঞ্জনা অর্জন করেছে। এই ব্যঞ্জনা কোথাও আদিম এক প্রাণ-জগতের রহস্যজালে অমূর্ত, কোথাও বা স্বপ্নে দেখা কোনো দৃশ্যের স্মারক, কোথাও বা রীতিমতো বাস্তবানুগ ও স্পর্শগ্রাহ্য—যদিও ফর্মপ্রধান।

এবং এই শেষোক্ত শ্রেণীর ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন প্রচুর সংখ্যায়। কবির আঁকা জীবজন্তু-পশুপাখিগুলি যেন কল্পনার জগতে দেখা বা স্বপ্নের জগতে জন্মে থাকা নানা রকম আকৃতি দিয়ে গড়া। ঠিক আমাদের চোখে-দেখা পরিচিত প্রাণী তারা যেন নয়, অথচ একেবারে আকারসাদৃশ্যহীনও নয়, বস্তুবিচ্ছিন্ন অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌শনও নয়। কবির কল্পনায় তারা কিছুটা অতিকৃতি পেয়েছে, অনেক জায়গায় অপ্রাকৃত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিমূর্ত হয়নি। অন্য দিকে, কবির আঁকা নরনারীর মুখগুলিতে রূপ পেয়েছে নানা রকম ব্যক্তি-চরিত্র—যে-সব চরিত্রের প্রত্যেকটি অন্যগুলির থেকে আলাদা। কবির আঁকা এইসব মানুষের মুখ রীতিমতো বাস্তবানুগত। চরিত্রকে স্পষ্ট করে তোলার

অঙ্গে দেহসংস্থানগত বিন্যাসকে বিষমানুপাতিক বা ডিস্টর্ট্ করা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সাদৃশ্য রক্ষাই সেখানে প্রধান কথা।

জীবজন্তুর জগতের ওই ফ্যান্টাসী আর অতিকল্পনা এবং মুখাবয়ব ও পোর্ট্রেটগুলির এই বাস্তবানুগত্য—এই দুইয়ের মাঝখানে রাখা যায় দৃশ্য-চিত্রগুলিকে। এগুলি একই সঙ্গে রীতিমতো বাস্তবানুগ ও স্পর্শগ্রাহ্য, অথচ আদিম এক প্রাণজগতের রহস্যজালে ঘেরা, স্বপ্নে দেখা কোন্ এক চলমান দৃশ্যের স্মারক। এইসব ল্যাণ্ডস্কেপের অধিকাংশেই সুন্দর এক ধরনের আলোর খেলা আর রঙের তাম্বরতার মধ্যে দিয়ে সঞ্চারিত করা হয়েছে কল্পনাময় একটি ত্রিমাত্রিক গুণ। রবীন্দ্রনাথের এইসব দৃশ্যচিত্রে সাধারণভাবে এমন একটা ঘনমান বা ভল্যুম এসেছে যা আমাদের চিত্রকলায় একটা নতুন জিনিস। এগুলিতে স্থানগত পরিপ্রেক্ষিত আনার বৈশিষ্ট্যটুকুও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়: এসব ছবিতে কবি যে উজ্জ্বল আর তাম্বর রঙ ব্যবহার করেছেন, তা হয়ে উঠেছে পরিপ্রেক্ষিতের বিভিন্ন স্তরের ও ব্যাপ্তির আধার। রঙের এই বিশিষ্ট ও মৌলিক প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই তিনি তাঁর ছবিতে সৃষ্টি করেছেন ত্রিমাত্রিকতা। বহু দৃশ্যচিত্রেই রঙের মধ্যে দিয়ে আলোর বিস্তারকে অপূর্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। অন্ধকার সম্মুখদৃশ্যের পিছনে উচ্ছ্বসিত এক আলোর প্রভা একদিকে যেমন এক কল্পনাময় দ্যুতির সঞ্চার করেছে, অন্যদিকে তেমনি এক দেশগত মাত্রার ধারণাকে দর্শকের মনে স্পষ্ট করে তুলেছে। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষ্যণীয় যে এইসব ছবিতে কম্পোজিশনের গুণগত মূল্য ততটা নেই, যতটা আছে ফর্ম্যাল বিন্যাস।

কবির আঁকা তিন শ্রেণীর ছবিরই প্রধান আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য হলো রেখানির্ভর ছন্দবিন্যাস। বস্তুর ফর্মগত বৈশিষ্ট্যকে—অথবা সেই বৈশিষ্ট্যের অতিকৃতিকে—প্রধানত রৈখিক ছন্দেই বিন্যস্ত করেছেন কবি। তাই, একথা বললে হয়তো খুব একটা অত্যুক্তি হবে না যে ভারতীয় চিত্রকলায় সুচিরকালের ঐতিহ্য-অনুসারী লিনিয়রিজম্ রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম সার্থক আধুনিকতায় পর্যায়ে উত্তীর্ণ হলো।

কাব্যনাটক প্রসঙ্গে

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সারা ইওরোপে বাস্তবধর্মী নাটকের বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব নাট্যকলার ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। হারমান হেটনারের 'ডাশ মডার্ন ড্রামা' ১৮৫১ সালে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে ইওরোপের প্রধান ও প্রচলিত নাট্যরূপ ছিল স্ক্রাইবের রোমান্টিক ইনট্রিগ্ নাটক। হেটনার তাঁর পুস্তকে নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্লেষণে ফ্রান্সিসকে সারসে (Francisque Sarcay)-র রোমান্টিক নাটকের পথাবলম্বনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। ইবসেন এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং 'পিলার্স অব্ সোসাইটি' থেকে 'হেডা গেবলার' প্রমুখ নাটকের মাধ্যমে আধুনিক বাস্তবধর্মী নাটকের প্রবর্তন করেন। কিন্তু একথা সত্য যে বাস্তবধর্মী নাটক রোমান্টিক নাটক থেকেই প্রসূত। চরিত্রসৃষ্টি ও পরিবেশরচনার প্রথাগত ব্যবহার থেকে বাস্তবধর্মী নাটক মুক্ত নয়। সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় স্তরভেদের পরিবর্তনই বাস্তবধর্মী নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। শব্দের সুসমঞ্জস শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিকল্পনায়ই নাটকের বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল; কারণ অভিনেতার বাচনিক প্রকাশক্ষমতায়ই নাটকের সার্থকতা নিরূপিত হয়। রোমান্টিক নাটক শব্দবাহুল্য ও বাগাড়ম্বর অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত (অবিশ্যি এই অলঙ্কৃত শব্দবিন্যাস অনেক সময় দূরত্বের ব্যঞ্জনা বহন করে), কিন্তু বাস্তবধর্মী নাটকে সৃষ্ট চরিত্রের ভাষা সহজ কথোপকথনের ভাষা। যদিও নাট্যকার সাধারণ পরিচিত ভাষাকে বিশেষ অভিজ্ঞতা পরিবেশনের জন্য একটা সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত রূপ দেন, তবুও এই ভাষায় বিভিন্ন চরিত্রের বিশিষ্ট ভাষায় মোহ (illusion) সৃষ্ট হয়। এইজন্য ইবসেন 'পীয়র গীন্ট' ও 'ব্রাণ্ড'-এর কাব্যময় ভাষা থেকে পরবর্তীকালে গদ্যরীতিতে প্রয়াণ করেন। এই ক্ষেত্রে ইবসেনের উক্তির উদ্ধৃতি হয়তো অপ্রাসঙ্গিক নয়: "My desire was to depict human beings and therefore I would not make them speak

the language of the gods." শ তাঁর নাটক 'এডমিরাল বাসকারভিল পদ্যে রচনা করেন, কারণ তাঁর গদ্যে লেখার সময় ছিল না। এই প্রসঙ্গে এলিয়ট মন্তব্য করেন: শ-এর পক্ষে উত্তম পদ্যরচনা সম্ভব, কিন্তু উত্তম গদ্যরচনা সুসাধ্য নয়। এলিয়ট কাব্যনাটকের সমর্থনে বলেন: "The tendency, at any rate, of prose drama is to emphasise the ephemeral and superficial ; if we want to get at the permanent and universal, we tend to express ourselves in verse." এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জন'-এর মতো নাটক রচনা করেন কবিতায়, কিন্তু 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'র মতো তত্ত্বপ্রধান নাটক এবং 'রথের রশি'র মতো সমস্যাপ্রধান নাটকে গদ্যের মাধ্যম গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত গদ্য নয়, শিল্পচাতুর্যে উন্নত ভাষা; তত্রাচ ইবসেন ও চেকভের মতো রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন যে সমসাময়িক জীবনের রূপায়ণ গদ্যেই সম্ভব। সমসাময়িক জীবনের উপযোগী ছন্দপ্রকরণের আবিষ্কারই আধুনিক কাব্যনাটকের সমস্যা। প্রতীক ও সাংকেতিকতার মাধ্যমে আধুনিক জীবন ও জগতের সমস্যাকে রবীন্দ্রনাথ গভীর তাৎপর্যে অন্বিত করেছেন। সমসাময়িক সমস্যা রূপায়ণের মধ্যেই তিনি গভীর নিত্যসত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন, ফলে তাঁর নাটক শাশ্বত মানবিক মূল্যে মণ্ডিত। তাঁর নাটকের উপযুক্ত পরিবেশে গানের ব্যবহার অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ও গভীর অর্থে প্রতিভাত। অবিশ্যি ভারতবর্ষের কবি তাঁর নাটকের শিল্পমাধ্যমের স্বকীয়তায় জীবনের সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা করেছেন স্বতন্ত্র নিরিখেই তার মূল্যায়ণ সম্ভব, ইওরোপীয় নাটকের সঙ্গে তাঁর রচনা তুলনীয় নয়, আর এই আলোচনা আপাতত প্রতীচ্যের নাটকেই সীমাবদ্ধ।

আধুনিক কাব্যনাটক বাস্তবধর্মী নাট্য আন্দোলনের পরিপন্থী নয়। সমসাময়িক জীবনের কাহিনী সাধারণ কাব্যময় ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাষায় রূপায়িত করাই কাব্যনাটকের উদ্দেশ্য। তবে শুধু পদ্যে লিখিত নাটকই কাব্যনাটকের অভিধা লাভ করে না, জীবনের কাব্যিক রূপায়ণের (Poetic interpretation) প্রয়াসই কাব্যনাটকের অভীষ্ট। কবিতা নিছক ভাষার মাধ্যম নয়, চরিত্র ও পরিবেশরচনার অবিচ্ছিন্ন উপাদান। আধুনিক কাব্যনাটকের সমস্যা প্রাকৃতবাদকে পরিহার নয়, বাস্তবধর্মিতার নব-পরিগ্রহণে জীবনের রূপায়ণ।

আজকের নাটক অবশ্যই গ্রীকনাটক বা এলিজাবেথীয় নাটকের চর্বিতচর্বণ হতে পারে না, তা আধুনিক সমাজ ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িকতার নতুন প্রতিফলন। পদ্যকেও তাই সমসাময়িক ভাষা ও পরিবেশানুগ করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

আধুনিক যুগের রুচি ও মানসিক অবস্থায় আধুনিক নাটকে গদ্যের ব্যবহার উপযোগী। এই পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যনাটকের উদ্ভব নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। সমরসেট মম্ তাঁর 'Summing Up' গ্রন্থে মন্তব্য করেন: বস্তুতান্ত্রিকতার দাবিতে পদ্যের বর্জন আধুনিক নাটকের চরম ভ্রান্তি। এ্যাবারক্রম্বি আবার আরও চড়া সুরে বলেন, গদ্যনাটক আধুনিক জড়বাদের এক বিশেষ রূপ, কবিতা তো জীবনসত্যের নির্যাসকেই ব্যক্ত করে। গদ্যনাটক অন্তর্নিহিত সত্যের উদ্ঘাটনের পরিবর্তে জীবনের ঘটনাকে প্রকাশ করে মাত্র। ভাবের গভীরতা, অনুভূতির তীব্রতা ও চিন্তার সূক্ষ্মতা প্রকাশে পদ্যের ব্যবহারই নাটকের পক্ষে উপযোগী। নাটকে সূক্ষ্মব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য নাটকে প্রাকৃতবাদের উদ্গাতা—ইবসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ ও চেখভ প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বস্তুতান্ত্রিক নাট্যকারেরাও জীবন অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতাকে প্রতীকময়তার সাহায্যে রূপায়িত করেন। ইবসেন ও চেখভের নাটক তাই গভীর জীবনবোধে উজ্জীবিত। 'হেডা গেবলার'-এ পিস্তলের প্রতীক ও 'সী গাল'-এ পাখির প্রতীক নাটকে গভীর অর্থময়তা দান করে।

কাব্যনাটক বলতে আমরা কী বুঝি স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে সে প্রশ্ন উঠতে পারে। এলিয়টের মতে কাব্যনাটক পদ্যে লিখিত নাটক নয়; বিশেষ ধরনের নাটক যা প্রাকৃতধর্মী অপেক্ষা বস্তুতান্ত্রিক, কারণ কাব্যনাটকে কবিতা প্রকৃতির অঙ্গসজ্জা নয়, তা বস্তুর গভীরেই দর্শকের চৈতন্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। এলিয়ট আরও বলেন: "Poetry is the natural and complete medium for drama; that the prose play is a kind of abstraction capable of giving you only a part of what the theatre can give." এলিয়ট গদ্যনাটকের পরিসমাপ্তি কামনা করেন নি, তিনি ইবসেন ও চেখভের গুণগ্রাহী ভক্ত; গদ্যনাটক ও পদ্যনাটকের যুগপৎ বিকাশই এলিয়টের কাম্য। সেক্স্পীয়রের নাটকে নাটকীয় মুহূর্ত রচনায় ও নাটকীয় গতি নির্দেশে কবিতার ভূমিকা আশ্চর্য প্রাণময়। তাঁর কবিতার অপূর্ব ছন্দ—নাটকে গতি ও উত্তেজনার সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়। আধুনিককালে

অনেক কাব্যনাটকে কবিতা ও নাটকের বিচ্ছেদের বিরক্তিকর প্রকাশ দেখা যায়। এই সমস্ত রচনায় কোরাসের বিবেচনাহীন প্রয়োগ ও দীর্ঘকবিতার ব্যবহারে নাটকের গতি প্রতিহত। আধুনিককালে কাব্যনাটক রচনার প্রচেষ্টা শুধুমাত্র নাটক পদ্যেলেখার প্রচেষ্টার মধ্যেই সীমিত। ছন্দ, মিল, মাস্ক ও কোরাসের ব্যবহার নাটকের মানবিক রসকে ক্ষুণ্ণ করেছে; অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে কবিতা নাট্যধর্মী হয় না, নাটকের অলঙ্করণ হয় মাত্র। সেক্স্পীয়রের নাটক শুধু কবিতায় লিখিত নয়, চরিত্র ও পরিস্থিতির কাব্যিক কল্পনা নাটকীয় ছন্দে বিকশিত। কবিতা তখনই নাট্যিক হয় যখন তা চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনীর গতিময়তাকে সাবলীলতায় প্রাণবন্ত করে। সেক্স্পীয়রের নাটকের বাগাড়ম্বর কখনই কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে জনসনের 'কাটিলাইন' (catiline) নাটকের সেনেট স্পীচ এবং 'জুলিয়স সীজার'-এর বাজার দৃশ্য উল্লেখযোগ। এ্যান্টনী ও ব্রুটাস-এর বক্তৃতার মধ্যে দুই চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা অতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত। আবার রোমের জনসাধারণের দুর্বলচিত্ততা ও অস্থিরতা প্রদর্শনে সেক্স্পীয়র নাটকের মূলবিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করেছেন, এবং নাটকের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। সমস্ত দৃশ্যই নাটকের সমগ্রতার সঙ্গে অখণ্ডভাবে জড়িত।

এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আধুনিক কাব্যনাটকের সমস্যা হলো: এই শিল্পমাধ্যম সমসাময়িক জীবনের সমস্ত সমস্যা ও যন্ত্রণাকে প্রতিফলিত করতে পারে কিনা। এ্যাবারক্রম্বি আমাদের সামনে এই প্রশ্নই উপস্থাপিত করেছেন। এলিয়ট এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে কাব্যনাটক বিষয়বস্তু আহরণ করবে দূরবর্তী ঐতিহাসিক কাল বা দেশের ও জাতির পুরাণ থেকে। কাব্যনাটকে দূরবর্তীকালের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার প্রয়োজন, তবেই চরিত্রের কবিতায় কবিতা-সংলাপে স্বাভাবিকতা পরিস্ফুট হবে। ঐতিহাসিক কালের পটভূমিকায় বিধৃত নাটকে পাদপ্রদীপের আলো, শব্দ ও পোশাক কবিতার ব্যবহারকে স্বাভাবিক, সুসমঞ্জস ও বিশ্বাসযোগ্য করে। এলিয়টের এই উক্তি কাব্যনাটকের দুর্বলতারই অভিজ্ঞান। এলিয়টের অতি-আধুনিক দু-একটি কাব্যনাটক ছাড়া এমন কোনো দৃষ্টান্তই নেই যেখানে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান লক্ষণীয়। 'দি এ্যাসেন্ট অফ এফ সিক্স' (The Ascent of F 6) নাটকে সমসাময়িক জীবনকে সুদূর ও প্রত্যক্ষ

বাস্তব—এ দুই কোটি থেকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু একটি অপরটির দ্বারা এমনভাবে আক্রান্ত যে তাতে নাটকের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তার মূল রস দর্শকচিত্তে সঞ্চারিত করা সম্ভব হয় নি। এলিয়ট তাই বলেছেন যে কাব্যনাটককে তার স্থান নিতে হলে গদ্যনাটকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। কবিতাকে সাধারণ মানুষের জগতে আনতে হবে, সাধারণ মানুষকে কবিতার আদর্শ-জগতে উন্নীত করলে চলবে না। এলিয়ট আরও বলেছেন: নাটকীয় ছন্দ দর্শকের চিত্তকে এমনভাবে আকৃষ্ট করবে যে দর্শক সাধারণ নাটকের ভাষামাধ্যম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত থাকবে। একদিক থেকে সব শিল্পই কৃত্রিম, কারণ জীবনের সারবস্তুকে গ্রহণ করে আঙ্গিক পারিপাট্য ও ছন্দোবদ্ধ ঘটনা পারম্পর্যে জীবনের সুসঙ্গত রূপদানই শিল্পের লক্ষ্য। এলিয়ট নাটকে গদ্য থেকে পদ্যে পরিবর্তন সমর্থন করেন না, কারণ এই পরিবর্তনে নাটকের মাধ্যম সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার অবকাশ দর্শকের থাকে। কিন্তু আমরা সেক্সপীয়রের নাটকে গদ্য ও পদ্যের সহজ মিশ্রণের অপূর্ব ফল লক্ষ্য করেছি। 'ম্যাকবেথ'-পোর্টার দৃশ্যে গদ্যের ব্যবহার দর্শকের উপভোগে কোনো বাধা সৃষ্টি করে না, বরঞ্চ এই পরিবর্তন স্বাভাবিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। কাব্যনাটকের ভাষার আসল সমস্যা হলো বিশেষ ছন্দগ্রন্থনের আবিষ্কার যা নাটকের সব মুহূর্ত ও সব পরিস্থিতির পক্ষেই উপযুক্ত। এলিয়ট মনে করেন যে যদি নাটকে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা ছন্দে প্রকাশযোগ্য নয়—তাহলে সেটা নাটকে পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। সেক্সপীয়রের নাটকে এমন ছন্দময় ভাষা আছে যা সুন্দর কবিতা নয়, যার নাট্যপ্রয়োজন শুধু চরিত্র ও পরিবেশ প্রকাশেই। এলিয়ট ছন্দের অচেতন প্রতিক্রিয়ার ওপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেক্সপীয়রের নাটকে অনেক সময়েই আমরা কাব্যময় ভাষা সম্বন্ধে সচেতন থাকি না, জীবনের নাটকায়িত মুহূর্তই আমাদের আকৃষ্ট করে রাখে। কিন্তু অনেক নাটকীয় মুহূর্তই কাব্য ও নাটকের সুষ্ঠু সমন্বয়ের আবেদন বহন করে। হ্যামলেটের কণ্ঠে "to be or not to be" স্বগতোক্তি একাধারে তার আত্মার মর্মন্তুদ হাহাকার প্রকাশ এবং চরিত্রবিকাশের সঙ্গেই নাটকের গতিকে ত্বরান্বিত করে, অন্যদিকে ভাষার অনবদ্য কাব্যমহিমায় নাটকীয় মুহূর্ত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়। এইখানেই নাটক কবিতার অপূর্ব মেলবন্ধন। নাটকের ছন্দ কবিতার ছন্দ অপেক্ষা অনেক বেশি সুষ্ঠু ও প্রকাশযোগ্য হওয়া

প্রয়োজন। নাট্যকার বিভিন্ন চরিত্রের মেজাজ ও বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী ছন্দের ব্যবহার করেন। অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি, গতি ও মৌখিক প্রকাশ ছন্দে নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক কাব্যনাট্যকারেরা ছন্দকে সহজ স্বাভাবিক-ভাবে ব্যবহার করতে পারেন না বলেই তাঁদের নাটক কবিতা হয়, কবিতা নাটক হয় না।

আধুনিককালে ইওরোপে এবং বিশেষত ইংলণ্ডে প্রাকৃতবাদপ্রণোদিত গদ্যনাটকের বিপক্ষে একটা চাপা প্রতিক্রিয়া সন্দেহাতীতরূপেই লক্ষণীয়। আজকের দিনে এটা পরিষ্কার' যে ইবসেনীয় নাটকের গভীরতা ও সূক্ষ্মতা পরিহার করে বাস্তবধর্মী নাটক তার স্থূল নাটকীয় রীতিকে গ্রহণ করেছিল। জগতের সঙ্গে মানুষের রহস্যময় সম্বন্ধ, চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ সম্বন্ধে কাব্যময় জিজ্ঞাসা, এক শব্দেই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভাস—যা ইবসেনের নাটককে চিরস্থায়ী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে তা শ এবং তাঁর অনুবর্তীগণ উপলব্ধি করতে পারেন নি। যদিও শ এবং ম্যানচেস্টার স্কুলের নাট্যকারগণ নাটককে মানসিক আলস্য থেকে মুক্ত এবং ভাবপ্রবণ চটুলতা থেকে বুদ্ধিদীপ্ত জাগ্রত চেতনায় উন্নীত করেছেন, তবুও একথা সত্য যে এই নাটক মানবিক চেতনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমিত। ব্যক্তি এবং সামাজিক পরিবেশের যান্ত্রিক সম্বন্ধই তাঁদের সমস্ত নাটকে বর্ণিত। এই বাস্তবধর্মী নাট্যরীতি ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে সীমিত করেছে এবং আধুনিক নাটক তাই সাহিত্যের সীমাহীন মহত্ব থেকে বঞ্চিত। ইবসেন ও চেখভ গদ্যের মাধ্যমেও অনেক ভাবগম্ভীর মুহূর্তকে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এই দুইজন নাট্যকারের নাটকে বহু স্থানের প্রকাশ যে গদ্যের দ্বারা সীমিত ও প্রতিহত, তা অবশ্য-স্বীকার্য।

আধুনিককালে ইংলণ্ডে কাব্যনাটকের প্রচেষ্টা শুরু হয় ইয়েটস্-এর উৎসাহে ও উদ্দীপনায়। ডাবলিনের এ্যাবে থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির মূলে ইয়েটসের অবদান অনস্বীকার্য। ইয়েটস্ তাঁর নাটকপ্রচেষ্টার প্রারম্ভে একধরনের রোমান্টিক নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন, গীতিকবিতার প্রাচুর্যের সঙ্গে প্রতীকতাযুক্ত এবং আয়রলণ্ডের লোকসংস্কৃতিতে উজ্জীবিত স্বকীয় পরিমণ্ডলে যা বিধৃত। ইয়েটস্ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই কথা বলেছেন: আমাদের এমন নাটক লিখতে হবে যা নাট্যশালাকে মানসিক উত্তেজনা ও উল্লাসের কেন্দ্র করবে—যেখানে মন মুক্ত হবে, যেমন গ্রীসদেশে ও ইংলণ্ডে

ঘটেছিল। উপন্যাসের বর্ণনাপদ্ধতি নাটককে প্রভাবিত করার ফলে মূল ব্যক্তিত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, সমস্যা ও বক্তব্যের প্রাধান্য নাটকের প্রাণশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যশালার সম্পূর্ণ সংস্কার-সাধনে নাটকের সাহিত্যিক মূল্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়েটস্ নাট্যআন্দোলন গঠন করেন। তিনি বলেছেন: "I think the theatre must be reformed in its plays, its speaking, its acting and its scenery··· there is nothing good about it at present." ঊনবিংশ শতাব্দীর নাটকের সাফল্যের মূলে ছিল দক্ষ অভিনেতার অভিনয় ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতার ওপর নাট্যকাররা নির্ভরশীল ছিলেন। সেক্স্পীয়রীয় নাটকের পুনরুজ্জীবন এবং কেম্বল্স্, ম্যাকরিডী থেকে আরম্ভ করে চার্লস্ কীন, আরভিং এবং বিংশ শতাব্দীতে বীরবম্ ট্রীর অভিনয়ক্ষমতা ইংলণ্ডের নাট্যশালায় উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত। দৃশ্যপটসজ্জা ও অভিনয়দক্ষতাই এযুগের নাটকের বৈশিষ্ট্য, নাটকের কথা বা শব্দ—অর্থাৎ সাহিত্যিক মূল্য ছিল উপেক্ষিত।

একথা অবিসংবাদিতভাবেই সত্য যে আধুনিককালে ইংলণ্ডে যে নাট্যআন্দোলন বর্তমান তার দুই নিয়ামক হলেন ইয়েটস্ এবং শ। শ বাস্তবধর্মী গদ্যনাটককে তার স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন: চরিত্রের সংঘাত বা ভাবের দ্বন্দ্ব নয়, দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত প্রদর্শনেই অতি চমৎকারভাবে প্রচারকে শিল্পে উন্নীত করেছেন। কাব্যনাট্যের পুনরভ্যুত্থানে ইয়েটসের ভূমিকার মূল্য তাঁর স্বকীয় ছন্দোবৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠায়, যে ছন্দোবৈশিষ্ট্য সেক্স্পীয়রের অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্য-নাট্যকারদের সঙ্গে ইয়েটসের পার্থক্য এইখানেই। ইয়েটসের নাটকের মঞ্চ-সাফল্য অবিশ্যি খুবই সীমিত, তাঁর নাটক প্রতীকী ছায়ার অস্পষ্ট কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। শেষপর্যায়ের নাটকে ইয়েটস্ প্রাচ্যের নাট্যশালার দৃশ্যপট ও অভিনয়ের উপাদান গ্রহণ করেন। তিনি মুখোসব্যবহার ও জাপানী ন' নাটকের সঙ্গে শব্দের সামঞ্জস্য সৃষ্টি করায় প্রয়াসী ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডের ষ্টিফেন ফিলিপসের কয়েকটি কাব্যনাটক এবং এলরয় ফ্লেকারের 'হাসান' নাটক মঞ্চসাফল্যের গৌরব অর্জন করে। কিন্তু এই সাফল্যের পশ্চাতে ছিল দুইজন নাট্যকারেরই ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক নাটকের প্রতি আনুগত্য। ফিলিপসের

নাটকের ছন্দ সুসমঞ্জস ও স্থূল; মারস্টন ও লিটনের গভীর ও আড়ম্বরপূর্ণ ছন্দের পর ফিলিপসের সংহত ও সুসঙ্গত ছন্দপ্রকরণ শ্রোতার মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। 'হাসান' নাটকটির সাফল্যের মূলে ছিল প্রয়োগনৈপুণ্য। এই নাটকের প্রয়োগে প্রাচ্যের নাট্যপ্রযোজনার চিত্রকল্পের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধের পরবর্তীকালে 'চু-চিন চাউ'-এর অসাধারণ সাফল্য এই নাটকের প্রযোজনার পথ নির্দেশ করে। বিংশশতাব্দীর প্রথমপাদে অনেকেই কাব্যনাটক রচনায় ব্রতী হন—কিন্তু এই দুইজন নাট্যকার ব্যতীত অন্য কেউই সাধারণ মঞ্চে সার্থকতা লাভ করেন নি। ইয়েটসের কাব্যনাটকের নাটকীয় আবেদন সীমিত—নাট্যিক ক্রিয়াশীলতার অভাব এবং চরিত্রের ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যের নিপ্রভতা তাঁর নাটকের পরিমণ্ডলকে অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন করেছে। তাঁর সৃষ্ট 'ডিয়েরড্রে' (Deirdre), 'নাসি' (Naisi), 'ডেকটোরা' (Dectora) এবং 'ফরগাল' (Forgal) মানবচরিত্র নয়, স্বপ্ন-প্রতীক। চিত্রকল্প, গীত, স্বপ্ন ও পুরাণের টানাপোড়েনে তাঁর নাটক সৃষ্ট। 'অল্-হকস্-ওয়েল' নাটকের ভূমিকায় তিনি বলেছেন: লণ্ডনের সাধারণ মঞ্চে অভিনয়কালে দর্শকের ঔদাসীন্য তাঁকে পীড়া দিয়েছে। এ্যাবে থিয়েটারেও তাঁর নাটকের জন্য উপযুক্ত দর্শক তিনি পান নি। নাটকের সার্থকতা জনপ্রিয়তার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। মঞ্চে উপযোগী দর্শকসাধারণের গ্রহণযোগ্য নাটকই সার্থক নাটক। নাটকের সাহিত্যিক মূল্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, কিন্তু একথাও সত্য যে শুধু সাহিত্যিক মূল্যসমৃদ্ধ নাটকের প্রয়োজনীয়তা অল্প। সার্থক নাট্যসাহিত্য নিত্যসত্য ও সমসাময়িক আবেদনের সমন্বয় সাধনে যত্নশীল। সেক্স্পীয়রের শ্রেষ্ঠত্বের উৎস এই অপূর্ব সেতুবন্ধনে।

লেসলি এ্যাবারক্রম্বে তাঁর 'ডেবরা' (Deborah) নাটকে সমসাময়িক বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের ভাষায় কবিতায় রচনা করেন। তাঁর এই আদর্শ ভবিষ্যৎ কাব্যনাটকে প্রভাব বিস্তার করেছে, যদিচ তা সর্বস্বীকৃত নয়। লেসলি এ্যাবারক্রম্বে ও গর্ডন বটমলির নাটকে আধুনিক কাব্যনাটকের উপযোগী পদ্যরীতির প্রবর্তন লক্ষণীয়। এলিজাবেথীয় নাটকের ব্ল্যাঙ্কভার্সের অন্ধ ও অক্ষম অনুকরণের পর সাধারণ কথ্যভাষাশ্রিত পদ্যরীতির প্রবর্তন আধুনিক কাব্যনাটকের ইতিহাসে এক বিশেষ ভূমিকা রচনা করে। এ্যাবারক্রম্বের নাটকে কবিতা বাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইয়েটসের মতো

তিনি পরীয়ান্যোর গায়ক নন—আধুনিক জীবনের ভাব ও অনুভূতিকে সমসাময়িক ছন্দপ্রকাশে অভিব্যক্ত করেছেন। 'ভেবরা' নাটকে বিভীষিকাময় প্লেগের বর্ণনায় তিনি যে প্রকাশক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে এলিজাবেথীয় কাব্যরীতি থেকে পার্থক্য সূচিত করে। আমেরিকায় আরকিবল্ড ম্যাকলিস তাঁর 'প্যানিক' নাটকে এবং ম্যাক্সওয়েল এণ্ডারসন তাঁর 'উইন্টারসেট' নাটকে কাব্যনাটক চর্চায় নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেন। এই সমস্ত নাট্যকারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডে টি. এস. এলিয়ট, অডেন ও ক্রীস্টফার ফ্রাইয়ের কাব্যনাটক রচনায় প্রয়াস গভীরতর প্রেরণায় সঞ্জীবিত।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি কাথিড্রাল'-এর অভূতপূর্ব মঞ্চসাফল্যে কাব্যনাটকের সমস্যা ও সম্ভাবনা নূতনভাবে প্রতিভাত হয়। মার্কারী থিয়েটারে মার্টিন ব্রাউনের নেতৃত্বে কাব্যনাটকের মঞ্চপ্রয়াস নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ১৯৩৯ সালে এলিয়টের 'ফ্যামিলী রিইউনিয়ন', নিকলসনের 'দি ওল্ড ম্যান অফ দি মাউন্টেনস্', রনাল্ড ডানকানের 'ওয়ে টু দি টুম্', ক্রীস্টফার ফ্রাইয়ের 'ফিনিক্স্ টু ফ্রিকয়েন্ট', পেটার এট্সের 'দি এ্যাসাসিন' প্রভৃতি নাটক কাব্যনাটকের ইতিহাসে প্রভূত সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। এলিয়ট তাঁর প্রথম নাটক থেকে শেষ নাটক ('এল্ডার স্টেট্স্ম্যান') অবধি নতুন নতুন পরীক্ষায় রত। 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল'-এর সাফল্যের মূলে আছে গল্পের অতিনাটকীয় কাঠামো। বেকেটের আত্মাহুতি ইংলণ্ডের প্রতিটি লোকের কাছে আকর্ষণীয়। তাছাড়া এই নাটকে চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের ইঙ্গিতও অনেককে আকৃষ্ট করে। এই নাটকে চিন্তার জটিলতা ও গভীরতা সহজ ও স্বচ্ছ ভাষায় অভিব্যক্ত। ছন্দগ্রহনের বৈচিত্র্যের জন্য নাটকের গতি সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। নাট্যকার দুই স্থানে গদ্য ব্যবহার করেছেন, বেকেটের খ্রীষ্টমাস্ সারমন প্রচারে, আর চারজন নাইটের দর্শকের কাছে তাদের কৈফিয়ৎ পেশ করার সময়ে। মিলযুক্ত দুই চরণ, মধ্যযুগীয় দৃঢ়তা-সমন্বিত মুক্তছন্দ কবিতার প্রয়োগ, স্বরসঙ্গতি ও অনুপ্রাসযুক্ত দীর্ঘ ছন্দের ব্যবহার ও ছন্দের পুনরাবৃত্তি কাব্যনাটকের প্রয়াসকে অনেকটা পরিমাণে সার্থকতামণ্ডিত করেছে। নাটকের মূলরস সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক হলেও বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে গৃহীত এবং সমসাময়িক তাৎপর্যে বিন্যস্ত। এইখানেই এই নাটকের আংশিক সার্থকতা। ইবসেন, চেখভ,

রিণ্ডবার্গ, শ, সিন ওকেসী প্রভৃতি গদ্যনাট্যকারেরা সমসাময়িককালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা তাঁদের নাটকে প্রতিফলিত করে আধুনিক জীবনের ট্রাজেডি ও কমেডিকে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এলিয়টের মতে কাব্যনাটকের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে গভীরতর, কাব্যনাটক জীবনযন্ত্রণার অন্তর্গূঢ় সত্যকে উদ্ঘাটিত করতে সমর্থ। তাই তিনি 'ফ্যামিলী রিইউনিয়ন' নাটকে সমসাময়িক বিষয়বস্তু ও ভাষা ব্যবহারে প্রয়াসী হয়েছেন। এই নাটকে পারিবারিক হার্দ্যকথোপকথনের সঙ্গে কবিতার সূক্ষ্ম সুরের অন্বয় এক অপূর্ব ছন্দ ও সুষমায় প্রতিষ্ঠিত। কবিতায় আধুনিক কথ্যভাষারীতির ব্যবহারের সুন্দর দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করছি :

Ivy— Really, Harry ! How can you be so callous ?
I always thought you were so fond of John.

Violet— And if you don't care what happens to John
You might show some consideration to your mother.

Amy— I do not know very much :
And as I get older, I am coming to think
How little I have ever known.

এরই সঙ্গে আধুনিক যুগচেতনা প্রকাশোপযোগী কবিতার নূতন ছন্দের প্রবর্তন প্রণিধানযোগ্য :

"We like to appear in the newspapers
So long as we are in the right column.
We know about the railway accident
We know about the sudden thrombosis
And the slowly hardening artery......"

নতুন নাট্যিক ভাষার এই ছন্দের ব্যবহার কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে সার্থক প্রয়াস। ছন্দোবদ্ধ স্বরসংঘাতযুক্ত এবং অক্ষর নিয়ন্ত্রিত পংক্তির ব্যবহার ছন্দের নমনীয়তা ও বৈচিত্র্যের সহায়ক।

আমেরিকান সমালোচক ডেনিস্ ডনোগুই বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রমাণ করেছেন যে এলিয়ট তাঁর এই শিল্পমাধ্যমের প্রচেষ্টায় সার্থক হয়েছেন 'দি কনফিডেনসিয়াল ক্লার্ক' নাটকে। 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' এবং 'ফ্যামিলী

'রিইউনিয়ন' নাটকে শব্দ ও ছন্দ অনেকাংশে নাটকাতিরিক্ত। কবিতার অনেক চরণই স্বাধীন কাব্যসত্তায় সমুজ্জ্বল। এলিয়টের মতে এই ধরণের কবিতা কাব্যনাটকের নাট্যিক ক্রিয়াশীলতা ও চরিত্রবিকাশের পরিপন্থী। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল'-এর ছন্দপদ্ধতি নেতিবাচক। এই নাটকে ছন্দের সমস্যা তিনি সমাধান করতে পারেন নি। 'ফ্যামিলী রিইউনিয়ন'-এ তিনি যে ছন্দ-পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা সমসাময়িক কথ্যরীতির সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে বিচিত্র দৈর্ঘ্য ও বিভিন্ন সিলেব্যলযুক্ত পংক্তি—একটা মধ্যস্থ যতি ও তিনটি স্বরাঘাত সমন্বিত। যতি এবং স্বরাঘাত পংক্তির যে কোনো স্থানেই ব্যবহৃত হতে পারে, স্বরাঘাত সিলেব্যল স্থায়ী বিচ্ছিন্ন। এই নাটকে কোরাসের ব্যবহার অনেক স্বল্প। কিন্তু ফ্যামিলীর চারজন চরিত্রের ব্যক্তিভূমিকা এবং কোরাসের অংশ হিসেবে ভূমিকার প্রয়োগ মোটেই সুসংগত নয়। ছন্দপদ্ধতির গুরুত্বও চরিত্র ও কাহিনীকে ম্লান করেছে। নাটকীয় ঔচিত্য ও প্রয়োজনীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করে এলিয়ট নিছক ছন্দের জন্যই ছন্দোবিহারের প্রলোভনকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা যায়।

"O sun, that was once so worm, O light that was taken
For granted
When I was young and strong, and sun and light unsought
For
And the light unfeared and the day expected
And clocks could be trusted, tomorrow assured
And time would not stop in the dark."

এ্যামির clock প্রীতি তার চরিত্রের অংশ; কিন্তু শেষ মুহূর্তে এ্যামির চিৎকার তাৎপর্যহীন:

"Agatha! Mary! Come
The clock has stopped in the dark."

'দি কনফিডেনসিয়াল ক্লার্ক' নাটকে এলিয়ট ছন্দপ্রয়োগের সামঞ্জস্য ও ঐক্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। কোনোস্থানেই কবিতা ও নাটকের বিচ্ছেদ হয় নি বা কাব্যিক স্বাতন্ত্র্য নাটকীয় মুহূর্তের দুর্বলতা সূচিত করে নি। হাস্য-রসোদ্দীপক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল এই উপভোগ্য কমেডি দর্শকের চিত্তকে

প্রথম থেকেই উদ্দীপিত করে রাখে। এই নাটকের গভীর তাৎপর্য স্থূল হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন। কল্‌বির পিতৃত্ব দাবি করেছে স্যার ক্লড; মাতৃত্ব দাবি করেছে স্যার ক্লডের স্ত্রী এলিজাবেথ। মিসেস্ গুজার্ড-এর কাছে কল্‌বি শৈশব থেকে পালিত; যদিচ মিসেস্ গুজার্ড কলবির পিতা বা মাতার সংবাদ জানেন না। এই নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে কাহিনী আবর্তিত। সকাহী ও কলবির চরিত্রের মাধ্যমে এলিয়ট একটি ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন। হেনরি হিউস মন্তব্য করেছেন: "এই নাটকে আমরা এই ইঙ্গিত পাই যে নৈতিক ও প্রতিভাধর মানুষই জীবনে ঐক্য লাভ করে, অবশিষ্ট মানুষ দুই জগতের অধিবাসী এবং দুই জগতই তাদের কাছে কৃত্রিম। নাটকীয় বিস্ময় ও অনিশ্চয়তা নাটকের গতিকে কোথাও মন্থর করে নি; দর্শক উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলের সঙ্গে ঘটনা প্রবাহকে অনুসরণ করে।

'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' ও 'ফ্যামিলী রিইউনিয়ন' নাটকের দুর্বলতাকে এলিয়ট বহুলাংশে বিদূরিত করেছেন 'ককটেল পার্টি' নাটকে। প্রথমত তিনি গ্রীক গল্পের সঙ্গে সমসাময়িক পরিবেশের সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি উপরোক্ত দুই নাটকে। অধিকন্তু এই নাটকে নায়কের পরিণতি নাটকীয় পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে পরিগণিত নয়। নাটকের শেষে দর্শকের প্রতিক্রিয়া দ্বিধাবিভক্ত—পুত্রের আধ্যাত্মিক মুক্তি এবং মাতার ট্র্যাজেডীতে মন সমানভাবেই আকৃষ্ট হয়। নাটকের ক্ষেত্রে এটা যে বিশেষ দুর্বলতা সন্দেহ নেই। 'ককটেল পার্টি' নাটকে সর্বপ্রথম এলিয়ট কোনো কোরাস ও অতিপ্রাকৃত চরিত্রের ব্যবহার করেন নি। 'ককটেল পার্টি' ও 'দি কন্‌ফিডেন্সিয়েল ক্লার্ক' নাটকে তিনি কাব্যরীতিকে সাধারণ ভাষার সঙ্গে সমন্বিত করেন। নাটকাতিরিক্ত কবিতাকে সব সময়েই তিনি পরিহার করেছেন এবং ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে দর্শকের কৌতূহল এবং বিস্ময় সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়েছেন। নাটকের প্রয়োজনানুগ কবিতাকে তিনি কতখানি নমনীয় করতে সমর্থ হয়েছেন তা আমরা 'দি কন্‌ফিডেন্সিয়েল ক্লার্ক' নাটকের দুই স্থানের পদ্যরীতি উদ্ধার করলেই উপলব্ধি করতে পারি:

Kaghan— I've just given her lunch. The problem with locusta
　　Is how to keep her fed between meals.

Locusta—B, You are a beast. I've a small appetite
But the point is that I'am penniless.

এরই পাশে নৈরাশ্যক্লিষ্ট স্রষ্টার গভীর ভাব প্রকাশের কাব্যময় ভাষা লক্ষণীয় :

Sir Claude : To be among such things,
If it is an escape, is escape into living
Escape from a sordid world into a pure one.
Sculpture and painting—I have some good things
But they haven't this...remoteness I have
Always longed for.
I want a world where the form is the reality
Of which the substantial is only a shadow.

কবিতার এই সহজবশ্যতা—যা নাটকের গতি নিয়ন্ত্রণ ও চরিত্রবিকাশের পক্ষে অপরিহার্য, তা এলিয়ট পূর্ববর্তী নাটকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হন নি।

নাটকের প্রয়োজন সাধনে উপযুক্ত ও শোভন শব্দরীতি ব্যবহার কাব্য-নাট্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এই জন্যই নাটকীয় কৌশল, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও কমেডির চমক থাকা সত্ত্বেও ক্রীষ্টোফার ফ্রাই কাব্যনাটকের নতুন সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন নি। তাঁর কোনো কোনো নাটক মঞ্চ-সাফল্যের গৌরব অর্জন করেছে, কিন্তু কাব্যনাটকের মূল সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিতে তার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করতে পারে নি। ক্রীষ্টোফার ফ্রাইয়ের নাটকে শ এবং ওসকার ওয়াইল্ডের কমেডির চমক বর্তমান। তিনি তাঁর নাটকে শ, চেখভ এবং পিরানদেল্লোর প্রবর্তিত ধারাকেই অনুসরণ করেছেন। তাঁর নাটকগুলিতে বিষয়বস্তু অপেক্ষা বিশেষ মানসিক মেজাজই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'দি লেডীজ নট ফর বার্নিং' নাটকে টমাস মেনডীপ 'ডেভিড্‌স ডিসাইপেল'-এর নায়কেরই অনুবর্তী। ক্রীষ্টোফার ফ্রাই সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে তিনি কাব্যনাটকের মাধ্যমে দর্শকদের আনন্দ বিতরণে সমর্থ হয়েছেন। 'এ ফিনিক্স টু ফ্রিকয়েন্ট' একটি দীর্ঘ অঙ্কে সমাপ্ত এবং মিলহীন ছন্দে ও অপূর্ব চিত্রকল্পে রচিত। বিষয়বস্তু পেট্রোনিয়স গল্প থেকে সংগৃহীত এবং কমেডির চমকে উজ্জ্বল। এক রোমান লেডী স্বামীর সমাধির পাশে শায়িত। অন্যদিকে একজন সৈনিক ছয়টি মৃতদেহ পাহারায়

রত। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দুইজনের মধ্যে আসক্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখনই একটি মৃতদেহ অপহৃত হলো। অপরাধ ক্ষালনের জন্ত সৈনিক এবং সেই স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহটি অপহৃত মৃতদেহের পরিবর্তে রক্ষা করার সংকল্প গ্রহণ করল। নাটকের সমাপ্তি সূচিত হলো সৈনিকের স্বাস্থ্যপানের মধ্য দিয়ে। ফ্রাইয়ের এই নাটকটি মঞ্চসাফল্যের গৌরব লাভ করেছে, কারণ মঞ্চকৌশল সম্বন্ধে ফ্রাই সম্পূর্ণরূপে অবহিত। তাঁর কল্পিত পরিস্থিতি ও সংলাপ দর্শকদের মনকে উত্তেজিত ও আকৃষ্ট করে। 'ভেনাস অবজারভ্ড্' নাটকে চরিত্রগুলির উপস্থাপনা শেক্স্পীয়রের বেনেডীক্ ও বিয়েট্রিস্ চরিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির অভিনবত্ব, পরিস্থিতির নতুনত্ব এবং কবোক্তির চমক সত্বেও কাব্যনাট্যের মূল সমস্যা সমাধানে ফ্রাইয়ের প্রচেষ্টা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। তাঁর নাটকে কবিতা চরিত্র ও পরিস্থিতিকে বহন করে মাত্র, রূপায়িত করে না। কবিতা আভরণ মাত্র, রূপকল্প নয়। এই দৃষ্টান্ত দিলেই এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হবে। 'ভেনাস অবজারভ্ড্' নাটকে হিল্ডা তাঁর স্বামী সম্বন্ধে বলেছেন :—

"—Once he had worn away the sheen
Of his quite becoming boyhood, which mode me fancy him
There was nothing to be seen in Roderic
For mile after mile after mile, except
A few sheepilke thoughts nibbling through the pages
Of a shiny weekly, any number of dead pheasants."

.........etc.

এই পংক্তিগুলিতে ফ্রাইয়ের বর্ণনাস্থযমা প্রশংসনীয়—দর্শকমনে মুগ্ধতা সঞ্চারে পারদর্শী। কিন্তু হিল্ডার চরিত্রস্থজনে এই পংক্তিগুলির দান খুবই সামান্য। স্বামীর হীন চরিত্র সম্বন্ধে হিল্ডার ধারণা এই পংক্তিগুলির মাধ্যমে ধরা পড়ে না। সুপরিকল্পিত কাব্যভঙ্গি এখানে স্বাধীন-বক্তার অনুভূতির সঙ্গে উপযুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত নয়। অর্থাৎ, কবিতা এখানে আনুষ্ঠানিক, নাট্যিক নয়।

এলিয়টের কাব্যনাট্য প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গ্রুপ থিয়েটারে অনুষ্ঠিত অডেনের 'ডান্স অফ ডেথ', এবং 'দি ডগ বিনিথ দি স্কিন' কাব্যনাট্য উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সভ্যতার মৃত্যু ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে

প্রথমোক্ত নাটকটির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি নৈরাশ্যের কালোছায়ায় আচ্ছন্ন—বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ ও যুক্তির চমক নাটকটিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। শেষোক্ত নাটকটি প্রাণোচ্ছল প্রহসন। মার্কসীয় জীবনবাদ অডেনের এই দুই নাটকে অনুসৃত। কিন্তু মার্কসীয় দর্শনে নিস্পৃহ দর্শকদের মনও অডেনের নাটকের বিদ্রূপ ও যুক্তির দীপ্তিতে আকৃষ্ট হয়। 'দি এসেন্ট অফ এফ সিক্স' নাটকটিতে অডেন বিশেষ কলাকৌশলের পরিচয় দিলেও নাটকটি সার্থকতালাভে বঞ্চিত। রাজনীতি ও মনস্তত্ত্বের মিলন দর্শকদের মনে বিহ্বলতার সৃষ্টি করে মাত্র। শেষ অঙ্ক রূপক, মনস্তত্ত্ব এবং দুরূহ কলা-কৌশলে ভারাক্রান্ত। এই প্রসঙ্গে স্পেণ্ডারের 'দি ট্রায়াল অফ্ জাজ্' কাব্যনাটকটি উল্লেখযোগ্য। এই নাটকে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীর মধ্যে বিবাদ এবং এই বিবাদের ফলে কিরূপে 'নিরপেক্ষ ন্যায়নীতি' বিচলিত হয় তা দেখানো হয়েছে। এই নাটকে নাটকীয় শক্তি ও কৌশলের পরিচয় থাকলেও চরিত্রগুলির প্রাণহীনতা নাটকটিকে নিষ্প্রভ করেছে। রাজনৈতিক মতবাদের চাপে নাটকের মানবিক সত্য ক্ষুণ্ণ।

সমসাময়িক সমস্যা ও জীবনযন্ত্রণা সমকালীন কাব্যভঙ্গির মাধ্যমে রূপায়িত করার আধুনিক কাব্যনাটকোচিত সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে এই কথাই প্রমাণিত যে আধুনিক কাব্যনাটক এখনও অনিশ্চয়তা ও সংশয়ে বিড়ম্বিত। সেক্স্পীয়রের অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যনাটক নাট্যকলার ইতিহাসে কোনো বিশেষ ভূমিকা সৃষ্টি করতে পারে নি। আধুনিক মধ্যবিত্ত জীবনের যন্ত্রণা ও সমস্যা উপন্যাসেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট, যেমন রেনেসাস্ মূল্যবোধ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সার্থক প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল নাটকে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে উপন্যাসই প্রধান জনপ্রিয় শিল্পরূপ হিসেবে পরিগণিত। আজকের নাটক তাই উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। আধুনিক নাটকের সমস্যা হলো মধ্যবিত্তজীবনের সংগ্রাম ও যন্ত্রণাকে প্রকাশ করে সমসাময়িক মূল্যবোধের ইঙ্গিত প্রদান। বাস্তবধর্মী নাটকে মধ্যবিত্তজীবনের ট্রাজেডি ও কমেডি উপন্যাসের সরসতা ও স্বচ্ছন্দতালাভে সমর্থ। প্রায় সমস্ত আধুনিক কাব্যনাটকই ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে। ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়বস্তুর প্রতি কাব্যনাট্যকারদের অনীহা কাব্যনাটকের দীনতারই দ্যোতক। এ্যানি রিড্লার-এর 'দি শ্যাডোয়ী ফ্যাক্টরী'

(The Shadowy Factory) নাটকে আধুনিক সভ্যতায় লালিত মানুষ কিরূপে বিজ্ঞান বা যন্ত্রের দ্বারা বঞ্চিত তা দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই নাটকের শেষেও আধ্যাত্মিক সুরটি পরিস্ফুট। নাট্যকারের মতে মানুষের মুক্তি সাধিত হবে খ্রীষ্টীয় কারুণ্যে! এবংবিধ সরলীকরণ শিল্পমাধ্যমের বাস্তব জীবনঘটিত সমস্যা সমাধানের পক্ষে অনুকূল নয়।

এবং কয়েকটি নাটকের মঞ্চসাফল্যও কাব্যনাটক শিল্পের সার্থকতার পরিচয় নয়। কোনো বিশেষ শিল্প প্রয়াসের সার্থকতা নির্ভর করে তার ঐতিহাসিক ভূমিকায়। ইবসেন, চেখভ, স্ট্রীণ্ডবার্গ যে নাট্যকলার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, কাব্যনাটক সেই ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে স্বকীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। এই ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সমালোচনা-সাহিত্য ও মঞ্চের সহযোগিতা। শ, উইলিয়ম আর্চার ও জি, টি, গ্রীন প্রমুখ বাস্তববাদীদের সমালোচনা ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠা ইংলণ্ডে প্রকৃতিবাদী নাটকের প্রচারে প্রভূত সহায়তা করে। গ্রূপ থিয়েটারের পর একমাত্র মার্কারী থিয়েটারের আনুকূল্যে এলিয়ট, ফ্রাই ও রোনাল্ড ডানকানের নাটক মঞ্চস্থ হয়।

তৃতীয়ত, ভাষা দিয়েই কেবল কবিতা হয় না। ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও কবিতার প্রতিভাস সৃষ্টি করতে পারে এমন সংস্থানকৌশলের প্রয়োজন। ইয়েট্স্ ও এলিয়ট তাই কাব্যনাটকের উপাদান খুঁজেছেন পুরাণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। গ্রীক পুরাণ ও খ্রীষ্টীয় অনুষ্ঠানের নবরূপায়ণের চেষ্টা এলিয়টের কাব্যনাটকে প্রতীয়মান। এলিয়টের কাব্যনাটকগুলির ধারাবাহিক আলোচনায় একথাই পরিস্ফুট যে একালে কোনো পুরাণের উজ্জীবন কষ্টসাধ্য। আধুনিক মানুষ ও আধুনিক মঞ্চকলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরাণের নবসৃষ্টি দুরূহ। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় জীবন পুরাণসৃষ্টিতে অসমর্থ বলেই আধুনিক সাহিত্যে শাশ্বতমূল্যে অন্বিত ট্রাজেডি রচনা প্রায় অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে আমরা স্পেনের বিখ্যাত নাট্যকার লরকার কাব্যনাট্যের উল্লেখ করতে পারি। লরকার 'ডন পেরলিম্পলিন' নাটকটির মধ্যে পৌরাণিক গুণ অতি স্বাভাবিকভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। গদ্যাংশকে স্পষ্ট পুরাণকথা না বললেও লরকা তাঁর কবিদৃষ্টির সাহায্যে এর পৌরাণিক গুণকে উদ্ভাসিত করেছেন এবং এর চরিত্রগুলি ঐতিহ্যনির্ভর আচার অনুষ্ঠানের

মাধ্যমে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'দি হাউস অব বেরনার্ডা আলবা' সমকালীন স্পেনদেশের জীবনযাত্রার একটি শক্তিশালী রূপায়ণ। লরকার নাটকের বৈশিষ্ট্য তাঁর স্বদেশীয় সংস্কৃতির উপাদানের মধ্যেই নিহিত। এই প্রসঙ্গেই নতুন ভাবে স্মরণীয় যে আধুনিক ছিন্নমূল জীবনে ঐতিহ্যনির্ভর সংস্কৃতির উপর নির্ভর করা কোনো শিল্পীর পক্ষেই কষ্টকর। আধুনিক কাব্যনাটকের মূল সমস্যা তো শেষ বিচারে এখানেই লক্ষ্য করা যায়। দ্বন্দ্ব সংঘাত জর্জরিত বাস্তব জীবনোৎসারিত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত না হলে শুধুমাত্র কোনও পুরাণ, বর্ণাঢ্য সংস্কৃতিতে নাটক ও কবিতাকে দ্বৈতাদ্বৈত সমগ্রতায় বাঁধা যায় না, এমন কি কোনও আপাতনিরাপদ প্রচণ্ড আস্তিক্য-বোধের সংহতিতেও নয়, এলিয়ট বা ফ্রাইয়ের কুশলী মকসফল অথচ কোনও প্রাণময় ঐতিহ্য নির্মাণে ব্যর্থ কাব্যনাটকই বোধহয় তার উদাহরণ।

ভ্রম সংশোধন

মুদ্রণ প্রমাদ বশে চৈত্র সংখ্যায় 'বোদল্যার এবং বোদল্যার-কাব্যের অনুবাদ' প্রবন্ধে (৮৮৬ পৃঃ দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ) জর্জ সাঁদ স্থলে জর্জ সাদ্ ও কমেদি ফ্রাঁসেজ স্থলে কমেদি ফ্রাসেজ ছাপা হয়েছে।

চৈত্র সংখ্যার 'সংস্কৃতি-সংবাদ'-এর লেখক জানিয়েছেন তাঁর অনবধানতা-বশত 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' চলচ্চিত্রের সুরস্রষ্টা হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের স্থলে সত্যজিৎ রায়ের নাম প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি জানিয়েছেন 'মানিক' চলচ্চিত্রের পরিচালক হিসেবে বিজলীবরণ সেনের নামই বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, শ্রীশম্ভু মিত্রের নয়। এক্ষেত্রেও অনবধানতাবশত ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে জানিয়েছেন 'চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থা'র এই চিত্রে শ্রীশম্ভু মিত্রকে নিছক অভিনেতা হিসেবে দেখা তাঁর পক্ষে সব সময় সম্ভব হয় নি বলেই এমন ভুল ঘটে গেছে। কিন্তু সে যাই হোক, তথ্য হিসেবে এটি ভুল।

শ্রীশম্ভু মিত্রও একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন 'মানিক' চলচ্চিত্রের পরিচালক তিনি নন।

সম্পাদক

"উপলব্ধি" ও সত্য

'পরিচয়'-এর ফাল্গুন সংখ্যায় 'সংস্কৃতি-সংবাদ' প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার মহাশয় লিখিত 'ক্যাম্বুয়েলটি' অংশ আমার নজরে পড়ে, কিন্তু এই সূত্রে আমার মতো অক্ষমেরও দু-চার কথা বলার প্রয়োজন হবে তা চৈত্র সংখ্যায় শম্ভুবাবুর চিঠি পড়ার আগে উপলব্ধি করি নি। প্রয়োজন একেবারেই হতো না, যদি না শম্ভুবাবু কথাপ্রসঙ্গে আমার স্বর্গগত পিতা ৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করেতন।

তিনি বলেছেন আমার পিতা নাকি শম্ভুবাবুরই মতো গণনাট্য সঙ্ঘে "কাজ করতে পারেন নি", অর্থাৎ তা থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। কথাটা শুধু ভুল নয়, সর্বৈব মিথ্যা। কোনও সংগঠনে "কাজ করতে হলে" নিয়মিত ও ধারাবাহিক নানা খুঁটিনাটিসহ তার কর্মসূচী অনুসরণের প্রয়োজন, যার ফলে কেউ 'কর্মী' হয়ে ওঠেন। সেই অর্থে আমার পিতা কোনও দিনই গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, যেমন বহুরূপীর সঙ্গেও ছিলেন না। কিন্তু যদি সমর্থনের প্রশ্ন আসে—সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে, মাঝে মধ্যে নাটকে অংশগ্রহণ করে, সর্বব্যাপারে উপদেশ পরামর্শ দিয়ে যদি প্রশ্ন আসে সহায়তার—তাহলে আমার পিতার অন্তর উন্মুক্ত ছিল গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতি। শুধু গণনাট্য সঙ্ঘ কেন, যে কোনও 'প্রগতিধর্মী' সংস্থা—সে নাটুকে সংস্থাই হোক, বা ভিন্ন কিছুরই হোক—আমার পিতা আমৃত্যু ছিলেন তারই পক্ষে।

এর বড় কারণ আমার পিতা পেশাদারী নট হলেও, অল্প বয়েসেই দেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং পরিণত কালে সমাজজীবন সম্বন্ধে বিশিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। এই মতবাদ ও দর্শনে বিশ্বাসই তাঁকে গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে একাত্ম করেছিল। মৃত্যুদিন পর্যন্ত তিনি সেই মতবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। তাই গণনাট্য সঙ্ঘের ব্যর্থতায় তিনি ব্যথিত হতেন, আর তার সাফল্যে অকৃত্রিম উৎসাহ বোধ করতেন। বহুরূপী সম্পর্কে তাঁর আকর্ষণের কারণও এই একই আশা, একই আকাঙ্ক্ষা, নতুন কিছু করার একই প্রেরণা। শম্ভুবাবু

সম্বন্ধে পুত্রস্নেহ মাকে মধ্যে ওঁকে বহুরূপীর দুর্বলতা সম্বন্ধে অন্ধ করেছিল মাত্র। বহুরূপীর সভাপতিত্ব, নাটকে অংশ গ্রহণ ও কর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যে তিনি ভালোবাসতেন—তার কারণ শুধুই "নাটক করা" নয়; সমাজজীবন বিবর্তনে নট-নাট্যকার-মঞ্চশিল্পীদের করণীয় আছে, প্রগতির বাহক হিসেবে নাটকের আছে ঐতিহাসিক ভূমিকা ও কর্তব্য—এই বিশ্বাস। বহুরূপী সেই প্রয়াসে দৃঢ়সঙ্কল্প—এমন আশাও তিনি করতেন। গণনাট্য সঙ্ঘ, বহুরূপী, লিটল থিয়েটার ও নাট্য আন্দোলনের এমনি ধারা অনেক প্রয়াসকেই তাই তিনি আশীর্বাদ করতেন। তাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করতেন। মতানৈক্যের অবকাশ তিনি অস্বীকার করতেন না, কিন্তু মতাদর্শের বিচ্যুতি তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর জীবনে এর বহু প্রমাণ তিনি রেখেছেন। আজকের দিনে কংগ্রেসী নির্বাচনে অংশগ্রহণ তাঁর কাছে হতো আদর্শচ্যুতি, কবীরের নির্বাচনী সভায় হুমায়ুনী কবিতা পরিবেশন হতো নেহাতই ব্যবসা। কলিযুগে ঋষিদের দূরদৃষ্টিও কত ক্ষীণ! 'বহুরূপী' নামকরণের সময় 'মহর্ষি'ও এই রূপের কল্পনা করতে পারেন নি!

আমার পিতা পরলোকে বিশ্বাসী ছিলেন না। মৃত্যুর পরও অতৃপ্ত আত্মার বিচরণ তিনি হাস্যকর মনে করতেন। তাঁর অনেক বিশ্বাসই জীবনে ভেঙে চুরমার হয়েছে। কিন্তু আজ শুধু কামনা করি তাঁর এই বিশ্বাস যেন সত্য থাকে। নচেৎ সেই মহান-আত্মার আক্ষেপ-কল্পনা মর্মস্পর্শী!

নবনারায়ণ ভট্টাচার্য

ঋষিঋণ

কবি যে ঋষি, তাও আমাদের শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্রের অনেক কথা অপেক্ষা এ কথাটি অধিক সত্য। এই ঋষিঋণ অপরিশোধ্য। রবীন্দ্রনাথের নিকট আমাদের যে ঋণ তাকে নিঃসন্দেহে বলতে পারি ঋষিঋণ—তা স্বীকারের মধ্য দিয়েই আমরা তার ফলভাগী হই। এই ঋষিঋণ আমরা যতই সচেতন মনে গ্রহণ করি ততই তা ঋণ থেকে আমাদের অর্জনে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। এইজন্যই রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসব পালনের ওপরে আমরা বৎসরাধিক কাল থেকে এত গুরুত্ব দিয়ে এসেছি—অনুপার্জিত উত্তরাধিকার সৃজনশীল নব নব সম্পদের উৎস হোক। সেই শতবর্ষপূর্তির উৎসবকাল এবার শেষ হলো। একবার এই বর্ষকালের উদ্যোগ-আয়োজন, সমগ্রভাবে এই ঋষিঋণোপলব্ধির প্রয়াসকে বুঝে দেখা দরকার। তার মধ্য দিয়ে হয়তো আমাদের আজকের জীবনের ও চেতনার একটা পরিচয়ও লাভ করা যায়।

উৎসব-ইতিহাস

বলাই বাহুল্য, দেশের ও বিদেশের বিচিত্র আয়োজনের সংবাদ রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। জানি না, বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের পক্ষেও তা সম্ভব হয়েছে কিনা। হয়তো অধিকাংশ আয়োজনের সংবাদ তাঁদের নিকট পৌঁছে থাকবে; এবং তার একটা হিসাব প্রণয়নের মতো সংগঠনও তাঁদের পক্ষে অসাধ্য নয়। অন্তত তা তাঁদেরই প্রথম কর্তব্য। সেই সঙ্গে আমরা আশা করব শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্র-তথ্যের ভাণ্ডারী ও কাণ্ডারীরা (যাঁরা এতদিন একক ভাবেই আপন ব্রত উদ্‌যাপন করে এসেছেন এবং আজ দেশও সে কারণে যাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে কুণ্ঠিত নয়) নিজেদেরই প্রেরণায় যথাসম্ভব এই শতবার্ষিক উৎসবের একটা তথ্যপঞ্জী সংগ্রহ ও সঙ্কলিত করে যাবেন।

এই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত অজস্র পত্র-পত্রিকা, বিজ্ঞপ্তি, অনুষ্ঠানলিপি বা কর্মসূচী হয়তো কোনো স্মারণিক ভাণ্ডারে রক্ষিত হবে না, কিন্তু নিশ্চয়ই তার মধ্যে অনেক বস্তুই সংরক্ষণীয়; অনেক বিশেষ সঙ্কলন, বিশেষ প্রকাশন, গ্রন্থ, শিল্পপরিচয়, ফটোগ্রাফ, গানের রেকর্ড, অভিনয়ের টেপ-রেকর্ডিং (যেখানে তা গৃহীত হয়েছে) ইত্যাদি। বাঙলাদেশের প্রধান দৈনিকপত্রগুলি নিজ নিজ পাতা থেকে এই বর্ষব্যাপী উৎসবসমূহের একটি সার-সঙ্কলন প্রকাশ করে নিজেদের কবিপূজার অর্ঘ্যটিকে স্থায়ী করে রাখতে পারেন। এ কি অসম্ভব প্রত্যাশা ?

সমসাময়িক সাংস্কৃতিক চেতনার ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এরূপ প্রমাণ আরএক শতবর্ষপূর্তির দিনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস্য ও আলোচ্য হবে।

কাজটি অবশ্য সুসাধ্য নয়। প্রথমত, পৃথিবীব্যাপী এমন কবিপূজার আয়োজন ইতিপূর্বে বেশি হয় নি—হওয়া সম্ভবও ছিল না। মানুষ এমন করে মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছে এ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও বৈষয়িক-রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ফলে। আর, এই মানবিকী চেতনার উদার সাক্ষ্য এ যুগের যেসব মনীষী বহন করেছেন, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মনীষায় অসামান্য এবং কবি হিসাবে অদ্বিতীয়।

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এখনো সর্বত্র সুস্থির হয় নি, সর্ব ক্ষেত্রে অকুণ্ঠিতও নয় তাঁর স্বীকৃতি, তাও আমরা জানি। কিন্তু তাঁর এই খ্যাতি পৃথিবীতে ব্যাপক ও সুদৃঢ়: এক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিংশ শতকের একজন প্রধান কবি; এবং দুই, মানুষের ইতিহাসে মানবিকবোধের তিনি একজন প্রধান পুরোধা। 'লণ্ডন টাইমস্'-এর ইংরেজ পত্রকারের পক্ষে রবীন্দ্র-উৎসবের উৎসাহ একটা বক্রোক্তির বিষয়। ব্রিটিশ বেতারের (বি. বি. সি) বৈদেশিকী সংস্কৃতি-পরিচায়কদের নিকট তা আধঘণ্টার অধিক কালক্ষয়ের অনুপযোগী। মার্কিন 'লাইফ' বা 'নিউইয়র্ক টাইমস্' প্রভৃতি পত্র রবীন্দ্রনাথের নামে অজ্ঞের বিদ্রূপবুদ্ধির অবকাশ রচনা করেই পরিতৃপ্ত। তাদের এমন সদৃষ্টান্তের অনুপ্রেরণায় এদেশেরও মানুষ কেউ-কেউ নিজেদের যথেষ্ট 'স্মার্ট' এবং বোদ্ধা বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হবেন, তা হতেই পারে না। কিন্তু যা পরিষ্কার তা এই—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নীরব থাকা তাদেরও পক্ষে সম্ভব হয় নি যারা রবীন্দ্রনাথকে বিস্মৃত হতে চায়। রবীন্দ্রনাথ যাদের কাছে মানবতাবোধের জন্য অস্বস্তিকর, কবিকৃতির জন্য অপরাহত। মানুষের

কবি, মানুষের বন্ধু রূপে রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর মানুষ গ্রহণ করেছে—এই শতবার্ষিকপূর্তি উৎসবে আমরা তার সাক্ষ্য দেখেছি।

বৈদেশিক আয়োজন

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ বর্ষের উৎসব দেশেদেশে যে বিচিত্র আয়োজনে পালিত হয়েছে, তার সম্পূর্ণ হিসাব আমরা দিতে অক্ষম। অনেক তথ্য এদেশে পৌঁছয় নি। কোনো কোনো সংবাদ পৌঁছুলেও তার অর্থ আমরা উপলব্ধি করবার অবকাশ পাই নি। এরূপ সামান্য দু-একটির কথা উল্লেখ করছি: সোভিয়েত দেশের বহু ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্যানুবাদ, রবীন্দ্র-আলোচনা ও বহুবিচিত্র উৎসব আয়োজনের কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু আমরা কি কেউ বুঝে দেখেছি—মস্কোয় এ উৎসবের উদ্বোধন হয়েছিল তার সেই 'হল্ অব্ কলাম্‌স্‌'-এ—যেখানে সোবিয়েতজীবনের মহত্তম উৎসবই মাত্র অনুষ্ঠিত হয়? এ ব্যাপারের তাৎপর্য আমাদের জানাবে কে—যখন এ উৎসবে আমাদের কোনো প্রতিনিধি প্রেরণও আমরা প্রয়োজন মনে করি নি। চীনের রবীন্দ্র-উৎসবে অবশ্য প্রতিনিধি প্রেরণ কর্তৃপক্ষের অনভিপ্রেত ছিল। কিন্তু এ কথা উল্লেখের অযোগ্য নয় যে, এ উপলক্ষে চীনাভাষায় ১০ খণ্ডে রবীন্দ্রসাহিত্যানুবাদ যথাসময়ে প্রকাশ করা চীনের রবীন্দ্রানুরাগীদের পক্ষে একটি স্মরণীয় কীর্তি। অথচ বাঙলাদেশে বা ভারতবর্ষে এই কথাটিও কি প্রকাশ অনভিপ্রেত? এরূপ আচরণ রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করতেন কিনা তা বলবার অধিকারী হয়তো আমরা নই, মন্ত্রীরাই কেহ; কিন্তু আমরা যতটুকু বুঝি এ-সংবাদ প্রকাশিত হলে ভারতের সীমান্ত-স্বার্থ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতো না। পূর্ব-ইওরোপের কোনো কোনো দেশ রবীন্দ্র-উৎসব কিরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেছে, আর কী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পালন করেছে, তা আমাদের সামান্যভাবে জানবার সুযোগ হয়েছে শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবীর সাক্ষ্যে। যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় তারা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন মানবতার মহাপথিকরূপে—'গোরা'র শেষ পরিচ্ছেদ বা 'দুরাশা'র মতো দীর্ঘ গল্পের অনুবাদ আবৃত্তি করতে তাঁরা তাই অক্লান্ত। পশ্চিম-ইওরোপের উৎসব-বিবরণ এ দেশের সংবাদপত্রে কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই এই ভারতীয় সাংবাদিকরাই ছিলেন সেসব উৎসবের উদ্যোক্তা; আর তাঁদের সহায়ক ছিলেন তেম্ সিবিল থর্নডাইক

প্রমুখ বয়োবৃদ্ধ রবীন্দ্রসুহৃদ শিল্পী ও মনস্বীরা। মার্কিন দেশেও রবীন্দ্র-উৎসব পালনের সকল তথ্য আমরা পাই নি—বহু গোষ্ঠীই তাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মনীষির হুমায়ুন কবীরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'টুয়ার্ডস্ ইউনিভার্সাল ম্যান' (Towards Universal Man) বা শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্কলিত 'এ টাগোর রীডার' (A Tagore Reader) নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসুদের কতকাংশে তৃপ্ত করেছে। নিউ ইয়র্কে মিঃ লেভেন্থাল হ্যারলড আয়োজিত 'কিং অব দি ডার্ক চেম্বার'-এর (রাজা) অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল শুনেছি। আরবমণ্ডলে ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে উৎসবের সংবাদ কোথাও সংগৃহীত হয় নি—অনেক দেশেই রবীন্দ্রনাথ এখনো স্মরণীয় অতিথি, নিশ্চয়ই স্মৃতি-উৎসবও হয়ে থাকবে।

ভারতীয় আয়োজন

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের এ উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত গ্রন্থাদি কিম্বা গীত, গান বা অভিনয়াদির কথা আমরা বিবৃত হতে চাই না। সেসব বিবরণ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল এখনো বহুপরিমাণে অতৃপ্ত। কিন্তু ভারতবর্ষের বহু রাজ্যে যে অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়েছে, আমরা তারও তথ্য প্রায়ই জানি না। নিঃ ভাঃ বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের বোম্বাই উৎসব ও গত পৌষ মাসের কলিকাতা (জোড়াসাঁকোর) অনুষ্ঠান দুটির কথা, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের কথা (উদ্বোধন আলোচনা-সভা) মোটামুটি জানা গিয়েছে। পাটনা প্রভৃতি কোনো কোনো স্থানে যেরূপ সমারোহে উৎসব পালিত হয়েছে, তার সমস্ত তথ্য তবু আমরা জানি না। আর উৎসব তো শুধু একবারে পালিত হয় নি—যথারীতি সভা ছাড়াও গীতে-গানে, নৃত্যে-অভিনয়ে, চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রায় প্রত্যেকটি বৃহৎ ভারতীয় শহরই রবীন্দ্র-উৎসব পালন করেছে। কোনো কোনো আয়োজন শ্রদ্ধায়, ঐকান্তিকতায়, শিল্প-বোধের শ্রীতে, আলোচনার উচ্চমানে সত্যই স্মরণীয়। কিন্তু বিশ্বভারতীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বাঙলা সাহিত্যসম্মেলন ও শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবার সম্মেলনে আমরা উপস্থিত থেকে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেছি। আলোচনা-সভা ও সঙ্গীতসম্মেলনও সুনির্বাহিত হয়ে থাকবে। বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শ ও রবীন্দ্রশিক্ষাপদ্ধতি কিরূপে অব্যাহত রাখবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। অন্তত মাতৃভাষায় স্থলে ইংরেজির মাধ্যম যখন এখনি

অনুসৃত হচ্ছে, তখন আশস্ত বোধ করবার কারণ দেখি না। কিন্তু শতবর্ষপূর্তি উৎসবের অনুষ্ঠান কয়টি সেখানে সযত্নে পালিত হয়েছে, এটি নিশ্চয়ই আনন্দের কথা ; কর্মীরা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

বিশ্বভারতী ও কেন্দ্রীয় (আধা-সরকারী) উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠান-সমূহের অনেকগুলিই সুনির্বাহিত হয়েছে বলে শুনেছি—সকল দিকে শ্রী ও শ্রদ্ধার পরিচয় অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলতে পারলে আরও সুখী হতাম। তা হয় নি, কারণ দেশ-বিদেশের আহূত বক্তারা সকলে সমান শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নন, অধিকারীও নন। নয়াদিল্লীর আলোচনা-মণ্ডলীতে অল্‌ডাস্ হাক্‌স্‌লীর বক্তব্য সত্যই প্রণিধানযোগ্য ছিল। দেশীয়দের কোনো কোনো বক্তৃতা যদিও প্রায়শ নূতনত্ব বর্জিত, তথাপি উপাদেয় হয়েছিল। বিদেশীয় একজন সাহিত্যাভিমানী রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'কাম-প্রস্তাব' লাভেই নাকি যা কিছু তৃপ্তি পেয়েছেন (শুনেছি, তিনি নিজে স্বদেশীয় প্রাচীন কামাখ্যানের ইংরেজি অনুবাদক রূপেই সাহিত্যিক), ভারতীয় একজন সাহিত্যিক এই বক্তব্য ঘোষণাতেই উৎসাহী ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক তরুণ বাঙলা সাহিত্যিকদের সাহিত্যক্ষেত্রে স্বাগত জানাতে ছিলেন কৃপণ। নিশ্চয়ই অতিথিদের নিজ বক্তব্য নিবেদন করবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অতিথিরা যখন মনোনীত ও আমন্ত্রিত, তখন সংশয় জাগে দিল্লীর এই আমন্ত্রণাধ্যক্ষরা অন্তত দু-এক ক্ষেত্রে বিজ্ঞতার পরিচয় দেন নি। তথাপি প্রশংসনীয় বেতারের উৎসবপালনের প্রয়াস, নৃত্যনাট্যকলা আকাদেমির আয়োজন আর সর্বব্যাপী নানা প্রকাশন।

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ

সরকারী আয়োজিত ব্যবস্থার মধ্যে যদি কোনো একটি জিনিষ আমাদের সর্বান্তঃকরণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করে থাকে তবে তা শ্রীসত্যজিৎ রায় প্রণীত চলচ্চিত্র 'রবীন্দ্রনাথ'। বিরাট ও বহুমুখী জীবনের সকল তথ্য ও সকল তত্ত্ব সমভাবে উল্লেখিত হতে পারে না, এজন্য এ সৃষ্টিতে কে কী পান নি তা খোঁজা আমাদের মতে নিরর্থক। আমাদের বিবেচনায় এ সৃষ্টি অনবদ্য। কারণ, প্রথমত, রবীন্দ্র-জীবনের মূল সত্যকে সত্যজিৎ রায় সৃষ্টির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আয়ত্ত করেছেন এবং তার চরম রসের পরম রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন ; দ্বিতীয়ত, এ সমস্তই করেছেন শুধুমাত্র পূর্ব-উপকরণকে

স্রষ্টার শক্তি দিয়ে আয়ত্ত করে, নির্বাচিত করে, সৃষ্টির পদ্ধতিতে অখণ্ড রসরূপে পরিণতি দান করে; তৃতীয়ত, এই বিশেষ শিল্প-মাধ্যমের শক্তিতে রবীন্দ্র-পরিচয় সার্বজনীন হতে পারল, এবং সার্বকালীনও হতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়, তবু বলা প্রয়োজন—'তিন কন্যা'র সত্যজিৎ রবীন্দ্রনাথের গল্পাবলম্বনে নিজের নতুন সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। স্বভাবতই তাতে তিনি স্বাধীনতাও অবলম্বন করেছেন। আমাদের বিবেচনায়, স্রষ্টার এ স্বাধীনতা গ্রাহ্য এবং রবীন্দ্রগল্পের বা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সে স্বাধীনতা স্বীকার্য যদি তা নতুন সৃষ্টির আশ্রয় হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায়ের 'তিনকন্যা' সে গৌরব লাভ করেছে। তথাপি কন্যাকয়টি রবীন্দ্রনাথের মানসকন্যা না থাকায় সকলে এ সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হন না। 'তিনকন্যা' বাংলা চলচ্চিত্রে একটি নতুন পথের দুয়ার খুলে দিয়েছে—তা চলচ্চিত্রের ছোটগল্প-রচনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে নিজের যোজনায় যারা পুরো একটা ছবিতে রূপায়িত করে কাবুলিওয়ালা প্রভৃতি গল্পের সমস্ত গাঢ়তাকে বিনষ্ট করছে তাদেরকে নিরস্ত করবার কি কোনো উপায় নেই? আজ তো বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান—ঐশ্বর্যে আড়ম্বরে তার বিকার ঘটতে দেখি আছে কিনা জানি না। কিন্তু কোন্ নীতিতে, যুক্তিতে, অধিকারে—রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বত্বরক্ষকরা এভাবে সে সাহিত্যকে চলচ্চিত্রে বিকৃত করে অর্থাগম করেন? এর কি কোনো প্রতিবিধান নেই? রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস, নাটক চলচ্চিত্রে রূপায়িত হবে কি হবে না, তা প্রশ্ন নয়—অর্থবলে তার বিকৃতিসাধন করা যাবে কিনা তাই প্রশ্ন। এ তো অবিমিশ্র স্বীকৃতি নয়—তা দিয়ে শৌণ্ডিকাচরণ—তাই এ শতবার্ষিকী বৎসরে এ প্রসঙ্গে কথাটা আমরা উত্থাপন করলাম। শ্রদ্ধার ব্যবসাও সহ্য হয়, কিন্তু শ্রদ্ধার ব্যভিচার অনুমোদিত হলে তা নিশ্চয়ই অসহনীয়।

পশ্চিম-বাঙলায় আয়োজন

কেন্দ্রীয় শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজনের পরেই আলোচ্য পশ্চিম বাঙলায় রাজ্য আয়োজন—বিশেষ পশ্চিম-বাঙলায় সরকার-চালিত আয়োজন ও অনুষ্ঠানসমূহের কথা। এ সবের পরিকল্পনাকালেই আমরা শৈথিল্যের ও সঙ্কীর্ণতার আভাস দেখেছিলাম—যেমন, সমস্ত উৎসবকে মুষ্টিমেয় মালিক ও কর্মচারীদের কবলিত করে রাখা; লোকসমাজের স্পর্শ বাঁচিয়ে আমলাতন্ত্রী

নেতৃত্বে উৎসব পালন করা; এমন কি, উৎসব-সমিতির সদস্যমণ্ডলীকেও (সভাপতি ও তাঁর মুষ্টিমেয় অনুগত সদস্য ব্যতীত) পরামর্শ, কর্মোদ্যম ও সর্ববিধ আয়োজন থেকে বঞ্চিত রাখা। এ পদ্ধতি শেষপর্যন্তও অব্যাহত ছিল। এরূপ সীমিত ও সঙ্কীর্ণ পরিকল্পনা ও পরিচালনা সত্ত্বেও সে উৎসব যতখানি সার্থক হতে পারে ততখানি সার্থক হয়েছে। তার কারণ বাঙলা দেশের মানুষের কবির প্রতি শ্রদ্ধা, তাদের প্রাণশক্তি ও উৎসাহ সীমাবদ্ধ থাকতে চায় নি। পঁচিশে বৈশাখের পূর্ব থেকেই জাতীয় উৎসবের পরিবেশ বাঙলা দেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে—এমন পরিবেশ কোনো দিন কেউ চেষ্টা দ্বারা গড়ে তুলতে পারে না, কোনো স্বৈরতন্ত্রও সর্বাংশে তাকে দমিত করতে পারে না। এ হচ্ছে লোকজীবনের আত্মপ্রকাশ। সে প্রকাশকে যত্নদ্বারা, শ্রদ্ধার সহিত, সঙ্কল্পের সহায়ে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টির যোগে সংগঠিত করলে জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়। বর্তমান বঙ্গে এ সংগঠনশক্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রনেতাদেরই করায়ত্ত। আর তারা এক্ষেত্রে ছিলেন হয় অক্ষম নয় উদাসীন। ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত মেলায়, রবীন্দ্রভারতীর প্রতিষ্ঠা উৎসবে বা জাতীয় গ্রন্থাগারের সভাতেও অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি গোপন থাকে নি। সে সবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ লক্ষ্য রাখবার মতো স্থান কোথায় যে, রবীন্দ্রনাথের রাজ্যে একবারও কবির আকাঙ্ক্ষিত সকল গ্রামে জলকষ্ট নিবারণের বা জনশিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ তাঁর রাজ্যসরকার গ্রহণ করলে না? রাজ্যের সমবায়-বিভাগ বিন্দুমাত্র দায়িত্ববোধ করলে না সমবায়-পদ্ধতিকে প্রসারিত করতে, সমবায়ের সাধক রবীন্দ্রনাথকে একবারও এ সময়ে স্মরণ করতে? সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজ্যপ্রয়াস এখনো সার্থকতার অধিকারী হতে পারে যে ক্ষেত্রে তা হচ্ছে—প্রথমত রবীন্দ্রভারতীর আয়োজনে, রবীন্দ্রস্মরণীর সংগঠনে। কোনো কোনো বেসরকারী আয়োজনকেও তাঁরা সাহায্য করেছেন। জেলায় বহু শতবার্ষিকী সঙ্কল্প এখনো অসম্পূর্ণ। সেখানেও এই কর্তৃপক্ষ আরও সহায়তা দান করতে পারেন।

শত শত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মনপ্রাণ দিয়ে এই কবি-পূজায় উৎসব পালন করেছে। আমরা পূর্বেই বলেছি, তাঁদের অনুষ্ঠানাদির তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কারণ, সমগ্রভাবে দেখলে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্বলতা, অসঙ্গতি—সমস্ত তুচ্ছ আর সমস্ত ছাপিয়ে গিয়ে এ উপলক্ষে

জাতির যে প্রকাশ আমরা দেখেছি তাতে বারে বারে মনে হয়েছে—"অল্ ইজ নট্ লস্ট।" এ আশা কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে পাওয়া যেতে পারত না—পাওয়া গিয়েছে নামহীন-খ্যাতিহীন বাঙালী নরনারীর স্বতঃউৎসারিত প্রাণানন্দে, অকপট শ্রদ্ধা নিবেদনে, অনায়াস আত্মনিয়ন্ত্রণে। 'রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তি উৎসব'-এর আয়োজিত রবীন্দ্রমেলায় আমরা বারে বারে অনুভব করেছি—বাঙালী নরনারী রবীন্দ্র-উৎসব পালন কামনা করে; কী তাঁদের প্রাণের সম্পদ, বুদ্ধিগ্রাহ্য আলোচনায় আগ্রহ। আর, সর্বাধিক বিস্ময়—কী স্বচ্ছন্দ তাঁদের শৃঙ্খলাজ্ঞান, সহজাত তাঁদের সংযম, আন্তরিক তাঁদের মানবমূল্যবোধ। 'পরিচয়'-এর কর্তৃপক্ষ সে উৎসবের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত; সেই উৎসব-প্রসঙ্গ থেকে আমরা তাই বিরত থাকছি। কিন্তু শতবার্ষিকী উপলক্ষে পল্লীমঙ্গলের কর্মীদের আমতার পাড়াগাঁয়ে দেখেছি নীরবে রবীন্দ্রাদর্শে পল্লীসেবার চেষ্টা। তমলুকের সন্নিকটে কৃষকসম্মেলনে দেখেছি রাতজেগে নরনারীর রবীন্দ্রনাথের কথা শুনবার আগ্রহ। বাঙলাদেশের শিল্পাঞ্চলের বহু ক্ষেত্রে দেখেছি কারখানার শ্রমিকদের কবির কথা শুনবার অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা। যা দেখেছি তাতে বারে বারে মনে হয়েছে বাঙালীর সব এখনো শেষ হয় নি। কিন্তু যা শেষ হয় নি তা বাঁচিয়ে রাখবার মতো সুবুদ্ধি কোথায়, সঙ্কল্প কোথায়, আয়োজন কোথায় ?

বিশিষ্ট প্রকাশন : ইংরেজি

এ বৎসরের বহু অনুষ্ঠানই এখন সমাপ্ত হয়েছে, তা এখন বিস্মৃতির পথে। একমাত্র যা কোনোরূপে মুদ্রিত বা চিত্রে বা রেকর্ডে বিধৃত, তাই কবিপূজার কতকটা সাক্ষ্য বহন করবে। সে সব স্মারক গ্রন্থ ও বিবরণীর বা রেকর্ডের বা ফটোগ্রাফসমূহের বিবরণ কেউ প্রকাশ করলেও জনসাধারণ একটু আত্মাবলোকনের ও আত্মপরীক্ষার সুযোগ লাভ করবে। আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের সম্মুখস্থ কয়েকখানি গ্রন্থ ও সঙ্কলনের দিকে আমরা সেই উদ্দেশ্যে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছি। তা শতাংশের একাংশ মাত্র, বিচিত্রের আভাস স্বরূপ।

রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের যে আয়োজন এ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে হয়েছে, তাই সর্বাধিক স্মরণীয়। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে 'বিচিত্রা',

'ছিন্নপত্রাবলী' প্রভৃতি যে সব গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে, আমরা তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের পল্লীমঙ্গল বিষয়ক প্রবন্ধ, ভাষণ, চিঠিপত্র একত্র সঙ্কলিত হয়ে 'পল্লীপ্রকৃতি' নামে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তো এরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন বিশেষ অনুভব করেছি, এখন তা লাভ করে সকলেই আনন্দিত হবেন। অবশ্য 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র যে সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, তা, 'বিচিত্রা'র পরেই, একদিক থেকে এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ আয়োজন। সে সম্বন্ধে সাধারণের কিছু অসন্তোষ আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রারব্ধ কর্মের মধ্যে সবচেয়ে এই প্রকাশনটিই শ্রেষ্ঠ প্রয়াস—এজন্য তাঁরা প্রশংসার্হ। তা নির্দোষ হোক, আমরা এই কামনা করি। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গ্রন্থসমূহেরও সংস্করণ এ উপলক্ষে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু যে কারণেই হোক, কোনো কোনো ইংরেজি গ্রন্থ (ইংরেজি 'সাধনা', 'পার্সোনালিটি', 'ন্যাশনালিজম্' প্রভৃতি) এখনো বাজারে দুষ্প্রাপ্য। অবশ্য মার্কিন মুলুকের ইংরেজিভাষীদের জন্য শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্কলন 'ঠাকুর-সঙ্কলন' ('A Tagore Reader') এবং শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীরের সঙ্কলন 'বিশ্বমানবের উদ্দেশে' ('Towards Universal Man': ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ গ্রন্থের লেখাসমূহ নির্বাচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত) এই দু-খানা গ্রন্থই রবীন্দ্রনাথের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কয়েকটি বিশিষ্ট লেখা সম্বন্ধে উপস্থাপিত করেছে। সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় তাতে পাওয়া যায় কিনা, তা ইংরেজিবেত্তারা বুঝবেন, কিন্তু সৃজনীচিন্তার যথাসম্ভব সুনিবদ্ধ সাক্ষ্য দুখানা বইতেই পাওয়া যাবে; তবে অ-বাঙালী ভারতীয়দের পক্ষে নিশ্চয়ই এসব ইংরেজি সঙ্কলন দুর্মূল্য ও তাই দুর্লভ—অবশ্য সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারসমূহ হুমায়ুন কবীর সাহেবের সঙ্কলন নিশ্চয়ই ক্রয় করবেন। ভারতীয়-অভারতীয় সাধারণ ইংরেজি পাঠকদের পক্ষে যে সঙ্কলন সুলভ হতো তা একটু স্বতন্ত্র ধরনের এবং দুর্ভাগ্যক্রমে খণ্ডিতাকারে তা প্রকাশিত। রবীন্দ্রশতবার্ষিকী শান্তি উৎসব কমিটি সঙ্কলিত গ্রন্থে ('Tagore & Man', আড়াই টাকা) রবীন্দ্রনাথের মানবতার দিকটিকেই আশ্রয় করে কালানুক্রমে তাঁর ভাবনাকে উপস্থিত করতে চেয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল বিনালাভে এবং তাই স্বল্পমূল্যে, অ-বাঙালী দেশী-বিদেশী সকল পাঠকের নিকট রবীন্দ্রনাথের মূল জীবনদৃষ্টি স্থাপন করা। বিলাতের ম্যাকমিলান কোম্পানি সম্পাদকদের নামমাত্র

দক্ষিণায় তাঁদের স্বত্বাধিকৃত ইংরেজি লেখা সংকলন করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্য সমুদায় লেখার স্বত্বাধিকার যাঁদের, বিশ্বভারতীর সেই স্বদেশীয় কর্তাদের অনুমোদন শেষমুহূর্তেও এ সংকলনের জন্য লাভ করা গেল না। সংকলনের সম্পাদকবর্গ জানিয়েছেন—এই স্বদেশীয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্বত্বাধিকারীরা স্থির করেছেন—যেহেতু 'বিচিত্রা' প্রভৃতি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে অতএব ওরূপ ('Tagore & Man') সংকলনের প্রয়োজন নেই। এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে মানতে হবে—এ যুক্তি নয়, চক্রান্ত; এবং চক্রান্ত কোনো বিশেষ সম্পাদনার বিরুদ্ধে হলেও, আসলে চক্রান্ত বিশ্বব্যাপী রবীন্দ্রসাহিত্যের জিজ্ঞাসুদের বিরুদ্ধে, এবং রবীন্দ্রনাথেরও বিরুদ্ধে। আর কিছু না হোক, এই সংকলন ইংরেজি পাঠকদের জন্য, আর 'বিচিত্রা' প্রভৃতি যতদূর বুঝি, বাঙলায় বাঙালীর জন্য কবির লেখার সংকলন। শুনেছি, রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বত্বাধিকার এসব কর্তৃপক্ষের আইনানুযায়ী আছে কিনা, তাও নাকি অনিশ্চিত। কিন্তু সে তো সুদূর প্রশ্ন। আর এ কর্তৃপক্ষ তো তা কখনো বলেন না। আপাতত যে অ-বাঙালীর জন্য স্বল্পমূল্যে রবীন্দ্রচিন্তা সংকলনের চেষ্টা পণ্ড হয়েছে, ঐ কর্তৃপক্ষেরই তা সম্পূর্ণ কৃতিত্ব। আর, কৃতিত্ব এখানেই শেষ হয় নি—একটি সুন্দর ইংরেজি (অনুবাদও) সংকলনগ্রন্থ আমাদের সম্মুখেই রয়েছে—ডান্‌লপ কোম্পানি-প্রকাশিত 'পথিক রবীন্দ্রনাথ' (The Wayfaring Poet); রবীন্দ্র-সাহিত্যের জবরদখলী (?) কর্তৃপক্ষ তো নগদ রজতমূল্যেই এ সংকলনের অনুমতি ডান্‌লপ কোম্পানিকে দিয়েছেন জানি, সে কি প্রবঞ্চনা? খণ্ডিতাকারে প্রকাশিত 'Tagore & Man' তথাপি অ-বাঙালী ইংরেজি-পাঠকদের পক্ষে একটি সুলভ, সুনির্বাচিত ও বিশেষ কার্যকর সংকলন। ডান্‌লপ কোম্পানির সংকলনটি দুর্লভ, কারণ তা বিক্রয়ার্থ নয়। এ প্রকাশনীটিতে যাত্রী রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় লাভ করা যায় তাতেও বিশ্ব-পথিক রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ। অংশের মধ্যেও সমুদায়ের আভাস সুনিশ্চিত হয়েছে সম্পাদনার সৌকর্যে। লেখা-নির্বাচন, চিত্র-মুদ্রণ প্রভৃতিতে রুচির ও যত্নের পরিচয়ও আনন্দদায়ক। বিদেশীয় ফোর্ড ফাউণ্ডেশন বা ডান্‌লপ কোম্পানি যে বুদ্ধির উৎকর্ষ এ ব্যাপারে দেখিয়েছেন তা কি স্বদেশীয় ধনিক প্রতিষ্ঠান দেখাতে পারতেন না? তাঁরাও উৎসব করেছেন, নিশ্চয় অর্থব্যয়ও করেছেন, কিন্তু সুচিন্তিত কিছু নিদর্শন রাখতে পেরেছেন কয়টি প্রতিষ্ঠান?

রবীন্দ্র-রচনা সঙ্কলন ক্ষেত্রে টাটা কোম্পানি প্রকাশিত রবীন্দ্র-চিত্রাবলী (Twelve Paintings of Rabindranath Tagore: আট টাকা) নিশ্চয়ই দেশীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রশংসনীয় কাজ। আমরা পূর্বেও ঐ প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেছি। দাম আট টাকা—দুর্মূল্য নয়। মাত্র ১২খানা হলেও এ ছবির নির্বাচনে, মুদ্রণে ও পরিচয়-সূত্রে রুচি ও বুদ্ধির প্রমাণ সুন্দর। অবশ্য, রবীন্দ্রচিত্রকলার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তর থেকে প্রকাশিত পোর্ট-ফোলিও-অ্যাল্‌বাম্ (Thirty-seven Paintings of Rabindranath Tagore) দুর্লভ সামগ্রী—জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রদর্শনীতে সাধারণ সেই চিত্রাবলীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছেন। শুনেছি মাত্র দুশো-আড়াইশো অ্যাল্‌বাম্ মুদ্রিত হয়েছে, প্রতিখণ্ডের দাম পনেরোশত-ষোলশত টাকা, মুদ্রণে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মূলের সমস্ত বিশ্বস্ততা রক্ষিত হয়েছে; আর তাই কালক্রমে মূলের ক্ষতি হলেও এ প্রতিলিপি থাকবে। সেদিক থেকে এ অ্যালবাম শুধু মূল্যবান নয়, অমূল্য। একটি পৃষ্ঠায় ছবিগুলোর তালিকা, পরিচয়-সূত্র, জন্মতারিখ প্রভৃতি উল্লেখ করা তবু আবশ্যক ছিল। দ্বিতীয় মূল্যবান ললিতকলা একাদেমির অ্যালবাম (Drawings and Paintings of Rabindranath Tagore, পঁচিশ টাকা)। শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ নিয়োগীর পরিচয়-নিবন্ধ শুদ্ধ, চল্লিশখানি সুমুদ্রিত, সুনির্বাচিত ছবি—এ প্রয়াসের প্রশংসা আমরা পূর্বেও করেছি—সুলভ না হলেও এ অ্যালবামকে দুর্মূল্য বলা যায় না।

এ প্রসঙ্গেই সঙ্গীত-নাটক-একাদেমির সম্প্রতি-প্রকাশিত বুলেটিন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore, Centenary Number)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। এখানি চিত্র-প্রকাশন নয়, তবে আটখানি (রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র প্রমুখের) চিত্রে, রবীন্দ্রাভিনয়ের আলোকচিত্রে ও তিনখানা পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিতে এ সংখ্যায় গৌরব বর্ধিত হয়েছে। আর, রবীন্দ্রনাথের নিজের লিখিত ও সঙ্গীত ও নাট্যকলা বিষয়ে ইন্দিরা দেবী, বাকে, প্রতিমা ঠাকুর প্রমুখ অন্তরঙ্গদের পূর্বলিখিত ১৫টি লেখার প্রকাশনই এই সংখ্যাটির আসল উদ্দেশ্য—একসঙ্গে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ও রবীন্দ্র-নাট্যের সম্বন্ধে যা প্রামাণিক ও সমসাময়িক রসিকদের বক্তব্য তা এভাবে লাভ করে সকলেই কৃতার্থ হবেন। সম্পাদক ও উদ্যোক্তাদের সুবিবেচিত নির্বাচন,

মুদ্রণ ও অলসজ্জার সহজ শ্রীও প্রশংসনীয়। (ললিতকলা একাদেমি—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামেও একটি চমৎকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। তা স্বতন্ত্র আলোচ্য)।

যদি ইংরেজিতে প্রকাণ্ড গ্রন্থের কথাই বলতে হয়, তা হলে মুক্তকণ্ঠে বলতে হবে সাহিত্য একাদেমি প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore—A Centenary Volume 1861-1961, ত্রিশ টাকা) আমাদের আশঙ্কাকে দূর করেছে, আশা সার্থক করেছে। এ সুবৃহৎ (৫৩১ পৃষ্ঠার), সুমুদ্রিত, চমৎকার চিত্র (১০+৫) সম্বলিত, বহু প্রবন্ধে ও তথ্যে (৫৬+২+২) সমালঙ্কৃত গ্রন্থ নিয়ে আমরা পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়াতে পারছি, লজ্জাবোধ করবার কারণ দেখছি না—সম্ভবত সাহিত্য একাদেমিকে এই বলে সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে যে সম্পাদক-মণ্ডলী এ গ্রন্থের লেখাদির জন্য প্রশংসার্হ, যে রুচিবান পরিদর্শকরা এর প্রস্তুতির জন্য দায়ী, তাঁদের কার কী বিশেষ কর্ম জানা অসম্ভব, সকলকেই আমরা সম্বর্ধিত করি। আরও কার লেখা সংগ্রহ করা চলত কিম্বা কার লেখা সংগ্রহে না থাকলেও চলত, বিচারে মতভেদ থাকবে—নির্বিচারে সব আমরাও মেনে নিতে পারি না—কিন্তু যা আমাদের প্রধান কথা তা এই—পূর্বোল্লিখিত ৩৭ খানা ছবির অ্যালবাম ও এই লেখন-সংগ্রহ গ্রন্থ বিদেশে আমাদের মুখ রক্ষা করেছে। এরূপ সংগ্রহ গ্রন্থে আমন্ত্রিত লেখকদের লেখা বিষয়ে সম্পাদকের কর্তৃত্ব সর্বাঙ্গীণ নয়, সব লেখা সমান নয়—ধর্মেও নয় রীতিতেও নয়, হতেও পারে না।' অনেক লেখা উপলক্ষোচিত প্রশস্তি, কিন্তু যা ততধিক তাও সংখ্যায় সামান্য নয়। শ্রীজওহরলাল ও অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের লেখা ব্যতীত স্মৃতিকথা বিভাগের রচনার মধ্যে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর (পূরবীর 'বিজয়া'র) লেখা আছে। আলোচনা বিভাগে জেরা ব্রিটেন, রিচার্ড চর্চ, এথার্স ওস্টারলিং প্রভৃতি লিখেছেন। প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ বিভাগে অন্তত হালডর্ লাক্সনেস্ সুবিখ্যাত নাম। এ সব মনীষীদের লেখা আপন গৌরবেই আকর্ষণীয়। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধূর্জটীপ্রসাদ কিম্বা অন্নদাশঙ্কর, পিয়ের ফালোঁ, দুশান জ্বাভিতেল, নর্মান ব্রাউন প্রমুখ কারও কারও লেখা বাঙালী পাঠকের নিকট নতুন করে উল্লেখের প্রয়োজন রাখে না। এসব লেখা অ-বাঙালীদের (ইংরেজি পাঠক) নিকটও নিশ্চয়ই সমান আদর লাভ করবে গ্রন্থ-খণ্ডে

অ-বাঙালী ভারতীয় লেখকদের সংখ্যা আশানুরূপ নয় ; তবে শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর যোশী একা সেদিকটি উজ্জ্বল করেছেন। অবশ্য ভারতবাসীর যে একটি প্রবন্ধ বিশেষ করে আলোচ্য তা হচ্ছে অধ্যাপক তারকনাথ সেনের লিখিত রবীন্দ্র-কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। সুপরিণত বিচার বুদ্ধির এমন পরিচয় সুলভ নয়। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতায় কোনো ইংরেজি কবির 'কথা', কোন ফরাসী কবির 'ছায়া' কোনো জার্মান কবির 'ভাব', এসব খুঁজে খুঁজে বেড়ান—আর বোদলেয়ার ম্যালার্মে বলে উচ্ছ্বসিত হন—তাঁদের এ প্রবন্ধের বিচারে নিরাশ না হয়ে উপায় নেই। শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেনের সঙ্গে আমরা মুখ্যত এক মত এবং বহুদিকে তাতে উপকৃত। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই—'পাশ্চাত্ত্য' কথাটা অনেক সময়ে 'আধুনিক যুগ' অর্থে প্রযুক্ত হয়। অবশ্য সে প্রয়োগ ভ্রমাত্মক বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু কথাটা এরূপ 'আধুনিক'-এর সমার্থক বলে ধরে নিলে, একথা মানতে হবে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যবাহী হলেও ইতিহাসের সহযাত্রী। জীবনদৃষ্টিতে, জীবনবোধে তিনি আধুনিক ; সাহিত্যাদর্শে ও সাহিত্য-সৃষ্টিতেও তিনি আধুনিক—যে আধুনিকতার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল পাশ্চাত্ত্য মহলে। তাঁর উপনিষদ শঙ্কর রামানুজের, এমন কি, আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যাত উপনিষদ নয় ; "মানুষের ধর্ম"র ভাবনায় তা নবায়িত ; তাঁর ভারতীয় সাধনাবোধও বিশ্বমানব-চেতনায় সমুদ্ভাসিত। কালিদাসকেও তিনি মল্লিনাথের দৃষ্টিতে আয়ত্ত করেন নি, এই আধুনিক মানুষের রসদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রকাব্যে আধুনিক জীবনদৃষ্টিতে ও কাব্যাদর্শে গঠিত, ভারতীয় জীবনদৃষ্টি ও কাব্যাদর্শের ঐতিহ্যকে তা আধুনিক ধর্মে জীবন্ত করেছে। অধ্যাপক সেনের এই মূল্যবান প্রবন্ধটি বাঙলায় অনূদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আরও কয়েকটি প্রবন্ধও বিশেষ আকর্ষণীয়—যেমন, হুমায়ুন কবীর, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, হিরণ সান্যাল, সুশীলচন্দ্র সরকারের মতো লেখা। সকল বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব নয়, তা না বললেও চলে। কিন্তু তা প্রণিধানযোগ্য। তবে সকলেরই নিকট বিশেষ মূল্যবান—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশ রায় সংকলিত জীবনপঞ্জী, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও জগদিন্দ্র ভৌমিক সংকলিত গ্রন্থপঞ্জী। এই তথ্যের বনিয়াদ না জোগালে আলোচনা-পাঠে বিদেশীয়দের অসুবিধা ঘটে—এ কথা প্রায়ই আমরা মনে রাখি না।

--সাহিত্য একাদেমির পরিচালনায় যে বর্জন-ধর্ম সক্রিয় সে সম্বন্ধে সচেতন হতে হয় অধ্যাপক হীরেন মুখুজ্জের 'Himself, a True Poem' (P. P. H.

দশ টাকা) হাতে নিলেই। হীরেন মুখুজ্জে, বিষ্ণু দে, সুশোভন সরকার প্রভৃতি যে অকৃতী লেখক নন' তা একাদেমির সম্পাদকমণ্ডলী ভালো করেই জানেন ; কিন্তু জাত বিচার না করে কোনো কাজ তাঁরাও করেন না। যাই হোক, ইংরেজি পাঠকরা হীরেনবাবুর থেকে এই সমুজ্জল রবীন্দ্রালোচনা লাভ করে আমাদের মতোই আনন্দিত হয়েছেন। 'পরিচয়'-এ গ্রন্থের স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন। বিশেষত এ সমীক্ষায় ইংরেজি গ্রন্থাদির অপেক্ষাও বাঙলা প্রকাশনীর পরিচয় দানই অধিক কাম্য।

বাঙলা প্রকাশনীর ক্ষেত্রে নতুন রবীন্দ্র রচনাবলী ও বিশ্বভারতীর 'পল্লী-প্রকৃতি' পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কথা পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। রবীন্দ্রালোচনার ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনকথা'ই প্রথম উল্লেখযোগ্য। এক খণ্ডের এই তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ সকলেরই পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়। গ্রন্থ অপেক্ষা সংকলন গ্রন্থাদি প্রথম উল্লেখ করছি। প্রথম উল্লেখযোগ্য : চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'শতবার্ষিকী জয়ন্ত উৎসর্গ' (রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী সমিতি : পাঁচ টাকা)—স্বভাবতই মনে করিয়ে দেয় সপ্ততি বর্ষ পূর্তির 'জয়ন্তী উৎসর্গ' গ্রন্থের কথা, —মনে করিয়ে দেয় এই 'শতাবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসর্গ' কী হতে পারত। বর্তমান গ্রন্থে কৃতী লেখকের সমাবেশ সামান্য নয়, কিন্তু অনেক লেখা সামগ্রিক রবীন্দ্র-পরিচয়ের চেতনায় উপস্থাপিত নয়, আলোচনায় তাই খণ্ডতা থেকে যায়। বিশ্বমনা রবীন্দ্রনাথ (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রযুক্ত সার্থক বিশেষণ)-এর বোধ অনুপস্থিত। কোনো কোনো লেখাতে রবীন্দ্রচর্চা অপেক্ষা উপলক্ষানুযায়ী প্রশস্তি রচনায় প্রয়াস অধিক। কোনোটিতে বা আলোচনায় অন্তর্দৃষ্টির খর্বতা। অবশ্য রবীন্দ্রপ্রতিভায় বিশেষ বিশেষ দিক দিয়ে সুলিখিত প্রবন্ধও এই সংকলনে আছে—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের, মৈত্রেয়ী দেবীর ও অন্যান্যের। তথ্য সমৃদ্ধ রচনারও অভাব নেই—অধ্যাপক সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ অধ্যাপকরা যখন লেখক। সবিনয়ে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন তার বিপরীত দৃষ্টিতেই অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ইতিহাস দেখা অভিপ্রেত, তলোয়ার দিয়েই যেন ইতিহাসের খাত কাটা হয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভাবাধিক্য আছে ; কিন্তু এই বিচারেই কি ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে ? এই উৎসর্গের দুটি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের ও শ্রীযুক্ত

ভবতোষ দত্তের। নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও দৃষ্টির সুস্থিরতায় দুটিই সর্বথা আদরণীয় আলোচনা। কিন্তু উৎসর্গ-গ্রন্থের আরও উৎকর্ষ কাম্য ছিল।

শতবার্ষিকী সমিতি আরও দুটি ছোট বই এ উপলক্ষে প্রকাশ করেছেন—একটি শিশুদের জন্য, শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারের লেখা। আরেকটি নব-সাক্ষর বয়স্কদের জন্য অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের লেখা। শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারের অপেক্ষা যোগ্যতর লেখিকা এ ক্ষেত্রে নেই,—সাহিত্যের অনেক ক্ষেত্রেই তিনি সুযোগ্যা। কিন্তু তাঁর লেখার সরস ঔজ্জ্বল্য এই বইটিতে তেমন স্বতঃসিদ্ধ নয়—হয়তো 'সংক্ষেপের চেষ্টা' বাধা হয়ে থাকবে। শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য অপেক্ষা 'জোগাড়ে' মানুষ বাঙলা দেশে স্বল্প, তার লেখার সম্বন্ধেও এইটিই উল্লেখযোগ্য কথা। এ গ্রন্থের পাঠক সত্যই কারা, আর কী তাদের লাভ হবে জানি না।

বাঙলা সংকলনের মধ্যে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ' (দুই খণ্ড, প্রতি খণ্ড দশ টাকা; বাক্-সাহিত্য প্রকাশিত) সর্ব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। পরিকল্পনায়, উদ্যোগ-সার্থকতায়, নির্বাচনে ও অঙ্গ সজ্জায় সর্ব দিকেই সম্পাদকের সযত্ন প্রয়াসে তা সমুজ্জ্বল। প্রথম খণ্ডের বিস্তৃত পরিচয় এ পত্রে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনায় আমাদের এ ক্ষেত্রে অধিকার সীমাবদ্ধ। পুনরুক্তি হলেও বলতে হবে—প্রথম খণ্ডের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অমলেন্দু বসু, সুনীলচন্দ্র সরকার প্রভৃতি লেখকদের কোনো কোনো আলোচনা আমাদের দুইবার পড়েও আনন্দ কিছুমাত্র লাঘব হয় নি। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, ভবতোষ দত্ত প্রভৃতিদের লেখা এখনো আমাদের নিকট মূল্যবান ঠেকছে। শ্রীযুক্ত প্রমথ বিশীর সাহিত্য দৃষ্টি ও বাক্-কুশলতায় সঙ্গে সমুচিত বাক্-সংযম ও মাত্রাবোধ না পেয়ে একটু খেদ এখনো থেকে গেল। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধ সংখ্যা বিশটি। এখানে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আছে তিন জনের লেখা,—সমাজ-চিন্তা, রাষ্ট্র-চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে সাতটি প্রবন্ধ আছে; শিক্ষা, বিজ্ঞান, সঙ্গীত দর্শন প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে আছে আরও দশটি আলোচনা। প্রথম খণ্ডের প্রধানত আলোচ্য রবীন্দ্র-প্রতিভার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য, সেই বহুমুখী প্রতিভার চিন্তাধারার পরিচয়ই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথমেই চিত্রশিল্পের আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীশ নিয়োগী। এঁদের নামোল্লেখই যথেষ্ট। চিত্রশিল্পের মতো সঙ্গীত সৃষ্টিরও আলোচনা

আছে। আর সে আলোচনায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাস ও রাজ্যেশ্বর মিত্রের আলোচনা দুটি বিশেষ মূল্যবান। বিমলচন্দ্র সিংহের নৃত্যনাট্য বিষয়ক মনোজ্ঞ আলোচনাটি পড়তে পড়তে দীর্ঘশ্বাস পড়ে—এমন রসজ্ঞ মানুষটি কেন স্বল্পায়ু হলেন। রথীন্দ্রনাথের লেখাটি তথ্যের গুণে ও লেখার প্রাঞ্জলতায় বিশেষ মনোরম। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বিশ্বাসের 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-চিন্তা' সুগ্রথিত ও সুলিখিত আলোচনা। তবে বিষয় ব্যাখ্যায় ও আলোচনার প্রাঞ্জলতায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ('রবীন্দ্র শিক্ষানীতির মূল কথা') ও পরিমল গোস্বামীর ('রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান') এই আলোচনা দুটি সর্বাপেক্ষা উপাদেয় ও সার্থক। আর, শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্তের ('আর্থিক উন্নতি ও রবীন্দ্রনাথ') ও রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের ('দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ') বিষয়ের দিক থেকে দুটি পরম প্রয়োজনীয় আলোচনা,—বিষয়ের জটিলতা যে পণ্ডিত লেখকদের বাধা হয় নি, তাতেই তাঁদের সার্থকতা প্রমাণিত। আসলে এ সংকলনের প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সর্বগ্রাহ্য না হোক সর্বপাঠ্য। রবীন্দ্র-আলোচনায় ভবিষ্যতেও আলোচ্য হয়ে থাকবে। এবিষয় স্বীকৃতিতে পুলিন সেনও আমাদের সকলের মুখপাত্র হয়ে থাকবেন—শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে।

'রবীন্দ্রনাথ-শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন' (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, পাঁচ টাকা) সম্বন্ধে পুনরুল্লেখ আমাদের পক্ষে সুসঙ্গত নয়। করতে হচ্ছে কারণ অনেকেরই বিবেচনায় এ সঙ্কলন মূল্যবান, এক দিক থেকে বিশিষ্টও। আমাদের মনে হয়েছে, ভবিষ্যৎ সংস্করণে রবীন্দ্র সঙ্গীতের আলোচনা শুদ্ধ এ সংকলনে কবির সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজন প্রয়োজন। আরও একটু শোধন পরিমার্জনও অসাধ্য নয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ধারায় শ্রীযুক্ত আদিত্য ওহদেদার ইতিপূর্বেই একটি প্রয়োজনীয় কাজ আরম্ভ করেছিলেন। সে ধারায় একখানি সংকলন গ্রন্থ 'রবীন্দ্রবিতান' (এ মুখার্জি কোং প্রকাশিত, পাঁচ টাকা)। শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত রবীন্দ্র সমসাময়িক সাহিত্যিক ও লেখকদের রবীন্দ্রালোচনা ও সমালোচনা থেকে সেদিনের বাঙলা সাহিত্যের পরিবেশের একটি আবশ্যকীয় পরিচয় পাওয়া যায়, আর সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-প্রতিভারও বিস্ময়করতার কথা উপলব্ধি করা যায়। 'রবীন্দ্রবিতান'-এ নোবেল পারিতোষিক প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত (১৮৭৮—১৯১৩ ইং) এরূপ

রবীন্দ্রালোচনার ছাব্বিশটি নিদর্শন সংকলিত হয়েছে—সম্পাদকের একটি সুন্দর ভূমিকাসহ। প্রত্যেকটিই পরিবেশ অনুমানের পক্ষে মূল্যবান, কোনো-কোনোটি, প্রশস্তিই হোক বা বিরূপ সমালোচনাই হোক, রবীন্দ্রালোচনায় অপরিহার্য—প্রিয়নাথ সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখদের প্রাসঙ্গিক লেখা এভাবে এক সঙ্গে উপস্থাপিত করে জিজ্ঞাসুদেরও বিশেষ উপকার সাধন করা হয়েছে। এই সঙ্কলনের পরিশিষ্টে ইংরেজিতে লিখিত আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ইং ১৮৯১ সালের আলোচনা ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ইং ১৯০০-তে লিখিত আলোচনা প্রভৃতি পুনর্মুদ্রিত করাতে কী বাধা ছিল? ইংরেজিতে হলেও তা বাঙলা সাহিত্যেরই কথা। অনেকটা 'রবীন্দ্র বিতান'-জাতীয় আর একখানা সঙ্কলন গ্রন্থ 'রবীন্দ্রবীক্ষা' (এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, বারো টাকা।) বইখানি এক হিসাবে পূর্ব সঙ্কলনের পরিপূরকও বটে। তার 'পূর্বভাগ'-এ (১-১৩৩ পৃঃ) আছে দুষ্প্রাপ্য রবীন্দ্ররচনা সংকলন ও ধর্ম-বিতর্ক, রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিষয়ক রচনাসমূহ, আর বঙ্কিম-রবীন্দ্র বিতর্কের ('প্রচার', 'নববিধান' 'তত্ত্ববোধিনী'তে বাংলা ১২৯১ সালের বিতর্ক) প্রয়োজনীয় প্রধান লেখা কয়টি। 'উত্তরভাগ'-এ (১-২৩২ পৃঃ) অবনীন্দ্রনাথ থেকে ভবানী সেন (১৯৬১) পর্যন্ত আঠারো জন লেখকের রবীন্দ্রবিষয়ক এক একটি প্রবন্ধ। সব কয়টি আলোচনাই উল্লেখযোগ্য। ইন্দিরা দেবী, মোহিতলাল মজুমদার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কারও কারও প্রবন্ধ দুষ্প্রাপ্য না হলেও বাঙলা সাহিত্যে স্মরণীয়। এক-আধটি (যেমন, শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ের রবীন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিকতা বিষয়ক) আলোচনা যেন অনুরোধ রক্ষা (?); এত সংক্ষিপ্ত যে তাতে আলোচনা ফুটে উঠতে পারে না। 'রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা' বিষয়ে সার্থক আলোচনা এবার না হয়েছে তা নয় (যেমন, শ্রীযুক্ত চিন্মোহন সেহানবিশের প্রবন্ধ পূর্বেকার সংকলনে, ও তথ্যোক্তি 'আন্তর্জাতিক' মাসিক পত্রের রবীন্দ্রসংখ্যায়)। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন সেন সাহিত্য দৃষ্টিতে ও লেখা নির্বাচনে নিষ্ঠা ও যত্ন নিয়েছেন। একটি ত্রুটি রেখে দিলেন কেন? প্রবন্ধ সমূহের রচনাকাল (ও সূত্র, পত্রিকা, গ্রন্থাদির নাম) কেন উল্লেখ করলেন না?

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং হাউসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীযুক্ত বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'কবি প্রণাম' (পাঁচ

টাকা), বাঙালী কবিদের প্রণাম ; বাঙলা কবিতারও রূপ-বৈচিত্র্যের তা পরিচায়ক, রূপ-বৈপরীত্যের ও রূপ-হানির লক্ষণও তাতে দেখা না যায় এমন নয়।

নানা কারণে আর একটি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য—এলাহাবাদের শতবার্ষিক উৎসব কমিটির প্রকাশিত 'রবীন্দ্রপ্রবাহ'—বাঙলা, ইংরেজি ও হিন্দী তিন ভাষাতেই প্রবন্ধ ও আলোচনাদি এ গ্রন্থে সংগৃহীত ও সম্পাদিত হয়েছে—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব ও শ্রীযুক্ত তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তীর যত্নে। রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুবাদও আছে হিন্দী ও ইংরেজিতে। এ আয়োজনের যাঁরা ব্যবস্থা করেছেন তাঁদেরকে অভিনন্দন করতে হবে।

ইচ্ছা করেই দুখানা সংকলন গ্রন্থের কথা শেষে উল্লেখ করছি—দু'খানাই উৎকৃষ্ট পর্যায়ের। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য (নিজেও অন্যত্র আলোচনা করেছেন) অধ্যাপক সমিতির পক্ষ থেকে সম্পাদনা করেন 'রবীন্দ্রনাথ' (ইষ্ট লাইট বুক হাউস, দশ টাকা)। সম্পাদনার কৃতিত্ব যথেষ্ট, এবং সম্পাদকের নিজের আলোচিত 'চরিত্র সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ'ও একটি সুলিখিত ও সার্থক প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসুর চমৎকার আলোচনা, শ্রীযুক্ত সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রকলা সম্পর্কিত আলোচনা সুধীরচন্দ্র রায়ের শিক্ষা বিষয়ক ও প্রিয়তোষ মৈত্রেয়-এর অর্থনীতি সম্পর্কিত রবীন্দ্রালোচনা নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে। জীবন চৌধুরীর সাহিত্য দর্শন ও শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ ও অমরতা' বিষয়ক প্রবন্ধ গভীর চিন্তা ও বিচার বুদ্ধিতে সুপরিণত। সঙ্কলন পরিকল্পনানুযায়ী সর্বাঙ্গীণ না হয়ে ওঠার ত্রুটি অনেক সময়ে সম্পাদকের নয়—বরং এ বৎসরে যোগ্য লেখকদের উপর লেখার জন্য অতিরিক্ত চাপ। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যবান বক্তব্য একাধিক ক্ষেত্রে মুদ্রিত হওয়ায় একটা উপকার হয়েছে—সহজে তা সকল পাঠকদের লভ্য হবে। কিন্তু অন্য অনেক লেখকদের বক্তব্য তত গুরুতর নয় ; ইংরেজির বদলে বাঙলা, বা এক বাঙলার বদলে শব্দান্তরে অন্য বাঙলায় তা সাজিয়ে দেবার প্রয়োজন বেশি নেই। অনেক সংকলনেই অনেক কৃতী মানুষের প্রায় একই কথা এভাবে বারবার পরিবেশিত হতে দেখেছি। অধ্যাপক সমিতির সঙ্কলনে আমরা যা লাভ করেছি তার জন্য কৃতজ্ঞ, কিন্তু বলতে বাধ্য—প্রত্যাশা ছিল আরও অধিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথাও একটা গলদ এখন এমন পুঞ্জিত যে সম্ভবত তা এখন

নিঃশ্বাস ফেলতেও অক্ষম। তা বুঝতে পারি যখন তার রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের আয়োজন-দৈন্য দেখি। বাঙলা বিভাগ ও অন্য কোনো কোনো বিভাগের অধ্যাপকরা নিজ কর্ম বিস্মৃত হন নি। কিন্তু সমগ্রভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে কী করেছেন, তার হিসাব দেখা যায় তার সমাবর্তন উৎসব নিবেদনে। যথা, রবীন্দ্র অধ্যাপক 'ভবিষ্যতে' নিযুক্ত হবে; এ বৎসর কিছু উৎসবও (অনির্দিষ্ট) হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র উপাচার্য সিদ্ধান্ত মহাশয়ের উৎসাহে প্রারব্ধ (ভাতঘরায়) ছাত্রদের পল্লী-সংগঠন কর্মের, আর স্নাতকোত্তর ছাত্র সমিতির প্রকাশিত সংকলনের। সত্যই এই কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মাত্র চেষ্টা? তা হলে তা পশ্চিম বাংলা সরকারকেও এই সাংস্কৃতিক নিরঙ্কুশতায় হার মানিয়েছে। অর্থাৎ গভীর অর্থেই এ কথা সত্য —পুরনো সিনেট হাউস ভাঙতেই তাঁরা জানেন, গড়া তাঁদের সাধ্য হবে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (বাইরের ও ভিতরের বাধায়) রবীন্দ্রনাথকে সমাদর করতে শিখেছে বিলম্বে। সে সমাদর অকুণ্ঠিত হয়েছিল স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায়—অনেক দিকেই সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংস্কৃতির সাধনার কেন্দ্র হতে চলেছিল—রবীন্দ্রনাথকে নিজের অধ্যাপকরূপে তখন বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বান করেছে, বাঙলা ভাষায় প্রথম তাঁর সমাবর্তন উৎসব অভিভাষণ পরিবেশন করিয়েছে, আর সে সূত্রে এমন গৌরবের অধিকারীও হয়েছে যার জন্য ইতিহাসে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমাবর্তন অভিভাষণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অন্তত আত্মগরিমাবোধও কি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই?

এই ক্ষোভ মন থেকে অনেকাংশে মুছে যায় যখন স্নাতকোত্তর ছাত্র সমিতির মুখপত্র 'একতা'-র রবীন্দ্র-সংখ্যা আমরা খুলে বসি। এ সংখ্যায় পরিচালকেরা এখনো ছাত্র, লেখকরাও অনেকেই তাই, অনেকে ছাত্রজীবন শেষে কর্মজীবনে সন্ত-প্রবিষ্ট। আর বেদনার সঙ্গে স্বীকার করি—অনেক সময়েই আজকের ছাত্রদের অনেক আয়োজন উদ্যোগে আমরা উৎসাহহীন। এরূপ সময়ে 'একতা'-র এই রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যাটি হাত পেয়ে পূর্বেকার মতোই আবার মনে এই আক্ষেপই জাগল—আবাদ করলে ফলত সোনা। এমনি উর্বর, এমন স্বর্ণপ্রসূ ভূমি বুঝি আর কোনো দেশে নেই—বাঙলা দেশের যৌবনের মতো। কিন্তু তা কতটা আবাদ হচ্ছে? আর কীই বা হচ্ছে তাতে আবাদ?

অভিনন্দনযোগ্য 'একতা'-র পরিকল্পনা: 'রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়' (কেশব চক্রবর্তী লিখিত) নামক তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ দিয়ে তার প্রস্তাবনা। 'রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ' (লেখক—ভাস্কর বসু), 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' (লেখক—অরুণ সেন), 'প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ' (লেখক—নির্মাল্য আচার্য), দিয়ে তার পারিপার্শ্বিক বর্ণিত। তারপর, এক-একটি বিশেষ দিকের আলোচনা—'রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় শিক্ষা সমাজ' (লেখক—অশোক মুখোপাধ্যায়), 'রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চিন্তা' (লেখক—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়), 'রবীন্দ্রমন ও দার্শনিক দ্বন্দ্ব' (লেখক—বিজন পুরকায়স্থ), 'কান্ট ও রবীন্দ্রনাথ' (লেখক—দেবব্রত চক্রবর্তী) প্রভৃতি দশটি সুচিন্তিত আলোচনা। পর বিভাগে 'শিশুতীর্থ খ্রীষ্ট পুরাণের নব রূপান্তর' (লেখক—শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়), 'শেষের কবিতা' (লেখক—সরোজ চৌধুরী) প্রভৃতি দশ-এগারোটি বিশেষ গ্রন্থ বা রবীন্দ্রকৃতি বিষয়ক সুষ্ঠু আলোচনা, এর মধ্যে আছে দুটি চিত্রকলাসম্পর্কিত। শেষ পর্বে আলোচ্য রবীন্দ্রের কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, চিত্রকলা প্রভৃতি। এ বিভাগের ছয়টি লেখা নিশ্চয়ই সাহসের ও আত্মজিজ্ঞাসার প্রমাণ, আগামীর আভাস। পরিশেষে সম্পাদক এ বৎসরের সত্যজিৎ রায় প্রযোজিত প্রামাণ্য চিত্র ও 'রবীন্দ্রায়ণ', 'রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি কয়েকটি পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের আলোচনা করে বাঙলা বিভাগ শেষ করেছেন। ইংরেজি বিভাগেও চারটি প্রবন্ধ। তাছাড়া সাত-আটটি করে লেখা (কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি) রয়েছে। হিন্দী ও উর্দু বিভাগেও—কিন্তু শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব' (ইংরেজি) ব্যতীত সব কয়টি লেখাই ক্ষুদ্র। সর্বতঃ এই একাধিক ভাষায় আলোচনার ব্যবস্থাপনা প্রশংসনীয়। আর অভিনন্দনযোগ্য সর্বব্যাপী পরিকল্পনানুযায়ী এই প্রযোজনা, প্রবন্ধ-সংগ্রহ ও পরিবেশন।

ঠিক এরূপই সুশিক্ষিত এ সঙ্কলনের প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধ। আমরা এর কয়েকটি প্রবন্ধের বিশদ আলোচনা করবার মতো অবকাশ না পেয়ে দুঃখিত। কারণ, সত্যই চিন্তায়, অন্তর্দৃষ্টিতে, পরিশ্রমে, দায়িত্বচেতনায় লেখকদের তা কৃতিত্বসূচক। আমাদের আনন্দদায়ক শুধু নয়—আশার কারণ। এমন সুদক্ষতার সঙ্গে যাঁরা দার্শনিক বিচার (দেবব্রত চক্রবর্তী ও বিজন পুরকায়স্থের মতো) করতে পারেন, সাহিত্যবিচার (শিশিরকুমার দাশ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতো) করতে জানেন, সমসাময়িক জীবন ও শিল্পকৃতির পরীক্ষায় (দেবেশ রায়, সুধীর রায়চৌধুরী প্রভৃতির

মতো) সক্ষম—বাঙলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের তাঁরা প্রতিশ্রুতি। এঁরা কেউ-কেউ এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, বার্নিক রায়, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছাত্রজীবনোত্তীর্ণ এবং সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁদের আলোচনায় বিস্ময় তত অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁদের বিষয়ে বেশি আলোচনা তাই বাহুল্য। সবতন্ত্র এই লেখকদের একত্র সমাবেশ একটা কৃতিত্ব। তবে অপেক্ষাকৃত অল্প-পরিচিতদের প্রয়াসই আমাদের নিকট সর্বাধিক আশার কারণ। আর ঠিক এই দুই কারণেই সমালোচনা করব তাঁদের যাঁদের লেখায় দেখছি ত্রুটি—নিষ্ঠার বা পরিশ্রমের অভাব। একটা বয়সে ভাবের বা ভাষার চমক লাগাবার লোভ অমার্জনীয় নয়, তবু তা বর্জনীয়। এজন্যই রবীন্দ্রোত্তর কবিতার আলোচনা, এমন কি, ভাবনায় ও ভাষায় অনিশ্চয়তার জন্য নাট্যমুহূর্ত ও ভাষায় সন্ধান পর্যন্ত আমাদের আশানুরূপ তৃপ্তি দান করে নি। দ্বিতীয় কথা—কোনো কোনো আলোচনায় চিন্তার গভীরতা থাকলেও আমরা ভাষার স্বচ্ছতা পাই নি। যে ছাত্রসমাজ প্রমথ চৌধুরীকে নিয়ে গৌরব করেন তাঁরা বিস্মৃত হন কি করে গদ্যশৈলীর (আনাতোল ফ্রাঁসের ভাষায়) তিনটি প্রধান গুণ—প্রথম স্বচ্ছতা, দ্বিতীয় স্বচ্ছতা, সর্বশেষ স্বচ্ছতা।

যারা উদীয়মান তাদের কাছেই আমাদের আশা—তাই এই সমালোচনা, অভিনন্দনের সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, তাও এই সঙ্কলনের গ্রহণীয়। প্রত্যেক মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রই বিশেষাঙ্ক প্রকাশ করেছেন। কেউ-কেউ সেদিকে বিশেষ উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছেন। বড়দের কথা নিরর্থক, যা ঠিক সর্ববহ নয়, তেমন সাময়িক পত্রের মধ্যেও আমাদের মনে পড়ছে 'নতুন সাহিত্য'-এর কথা, 'আন্তর্জাতিক'-এর কথা এবং 'উত্তরসূরী'র কথা—'স্বাধীনতা'র মতো দৈনিকগুলি তাদের বৎসরব্যাপী প্রকাশিত এ জাতীয় লেখার সঙ্কলন বা তদভাবে সংক্ষিপ্ত সূচী প্রকাশ করবেন, তাও আমরা আশা করি। অবশ্য স্মারক গ্রন্থসমূহের সূচী কেউ রচনা করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

যা ইচ্ছা থাকলেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা অসম্ভব হল তা হচ্ছে এ বৎসরে প্রকাশিত রবীন্দ্রালোচনা গ্রন্থসমূহ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবন কথা' প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে—তাই যথেষ্ট। কিন্তু নব-প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে দু-একখানির জন্য আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকব—

তার মধ্যে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ' (এ. মুখার্জি ; সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা) অন্তত আমাদের প্রথম মনে পড়ছে। লেখকের নিষ্ঠা, সততা, গভীর দৃষ্টির জন্ত তাঁর আলোচনা আমাদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। তাঁর বক্তব্যও প্রায় সর্বত্রই গ্রাহ্য। সজনীকান্ত দাসের 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য' নিশ্চয়ই তথ্য ও আলোচনার জন্ত উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত কানাই সামন্তের 'রবীন্দ্র-প্রতিভা' (দশ টাকা) কিন্তু লেখকের নিকট আমাদের ওদিকে যতখানি প্রত্যাশা তা পূরণ করে নি। 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ' 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' লেখিকার (শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবীর) পরিশ্রম ও নিষ্ঠারও সুন্দর প্রমাণ; শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'বাইশে শ্রাবণ' একটু পূর্বে প্রকাশিত হলেও এখনো স্মরণীয় নতুন বই। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের 'রবিচ্ছবি'তেও (মূল্য ছয় টাকা) নূতন সংবাদ ও নূতন তথ্য আছে। সোমেন্দ্রনাথ বসুর 'রবীন্দ্র অভিধানের' পরবর্তী খণ্ডের জন্ত আমরা এখনো অপেক্ষা করছি। একাধিক লোক এরূপ রবীন্দ্রকোষ লেখায় তৎপর হয়েছেন বলে শুনেছি। হয়তো যোগ্য লোকদের একটি কমিটি এ কাজ হাতে নিলে তা অধিকতর সুফলদায়ক হতো। অথবা 'ভারতকোষ'-এর কথা শুনে মনে হয়—কি হতো কে জানে। একসঙ্গে অকাজ করতে আমরা যতটা পটু কাজ করতে যে ততটাই অক্ষম— বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতা তো এখনো মিথ্যা হয় নি। এই প্রসঙ্গেই তাই মনে পড়ে—এখনো কত বাকী। একমাত্র সৃজনমূলক সাহিত্য ছাড়া অন্ত কোনো সৃজনমূলক আয়োজনই এ যুগে একা করা যায় না।

এইবার তাই শেষ কথায় আসি। মোটামুটি এ শতবর্ষ উৎসবের সমস্ত অনুষ্ঠান ও প্রয়াস থেকে আমরা আর একবার বলি—'অল্ ইজ নট্ লস্ট্'। আর তাই এখন একবার যা বাকী, যা অবশ্য কার্য, তেমনি আরও দুয়েকটি বিষয়ের কথা স্মরণ করি :

প্রয়োজনের দিক থেকে কয়েকটি প্রস্তাব আমাদের এখনো আছে। (১) রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি সকল পাঠশুদ্ধ সংস্করণ (Variorum Edition) প্রস্তুত করা। এ কথা পূর্বেও আমরা বলেছি। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসু পত্রান্তরে সুচিন্তিত প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, দেখে আমরা আনন্দিত হলাম। এখানে তাই প্রস্তাবটি বিশদ করা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও কানাই সামন্ত

প্রমুখ রবীন্দ্রসাহিত্যকাণ্ডারীরা এ কর্মভার গ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু ভার তাঁদের অর্পণ করবে কে—বিশ্বভারতী না, রবীন্দ্রভারতী, না কোনো সরকার? (২) অবশ্য রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী ও চিত্রপঞ্জীও যে তৎপূর্বেই সযত্নে প্রণীত হবে, আমরা তা আশা করি। (৩) শুনেছি শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রদিনপঞ্জী সঙ্কলিত হচ্ছে—আশা করি, তাঁর পথ নিষ্কণ্টক। (৪) 'রবীন্দ্রভারতী' রবীন্দ্রসাহিত্য ও নৃত্যনাট্য প্রভৃতির প্রতিষ্ঠানসমূহকে কীভাবে সংযুক্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত করবেন তাও এখন দ্রষ্টব্য। বলেছি একযোগে কাজ না করলে অনেক ক্ষেত্রেই অরাজকতা দেখা দেবে। (৫) বৎসরে একবার শান্তি উৎসব কমিটির আয়োজিত-রবীন্দ্রমেলার মতো একটি রবীন্দ্রমেলার ব্যবস্থা এ সমিতি করবার কথা ভাবছেন, শুনেছি। নিশ্চয়ই এরূপ মেলার প্রয়োজন সকলেই অনুভব করেন। (৬) রবীন্দ্র গবেষণার আসর হিসাবে একটি সাময়িক পত্র (বার্ষিক দুই বা তিন সংখ্যার) প্রকাশ একান্ত বাঞ্ছনীয়—রবীন্দ্রায়ণ, রবীন্দ্রায়তন, রবিসত্র, রবীন্দ্রচর্চা—যাই হোক তার নাম। শেক্‌স্‌পীয়র স্টাডিজ-এর মতো রবীন্দ্রচর্চার তা আয়তন হতে পারে। (৭) শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার জন্য প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের নামে সঙ্কলিত একটি উচ্চতর গবেষণাকেন্দ্রের (সোভিয়েত প্রভৃতি দেশের পেডাগজিক ইন্‌স্টিটিউটের মতো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য হয় এরূপ প্রতিষ্ঠান)। (৮) জনশিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা। (৯) পল্লীসেবার জন্য বিশেষ আয়োজন, (১০) সমবায় নীতির বিস্তারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ এখনো অবহেলিত হলে রবীন্দ্র উৎসব পালন যে ব্যর্থ হয়ে থাকবে তা আবার না বললেও চলে।

অবশ্য সর্বাপেক্ষা বড় কামনা—রবীন্দ্রঐতিহ্য বা রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতাবোধ, তাঁর মানবতাবোধ, তাঁর সর্বমুখী জীবনানুরাগ—আমাদের জীবনে ফলপ্রসূ হোক, নব নব সৃজনপ্রয়াসে চিরজীবী হয়ে উঠুক! আমরা যাতে রবীন্দ্রনাথের জাতির মানুষ বলে পরিচয় দিতে পারি।

গোপাল হালদার।

আহারের পর
দিনে দু'বার..

পরিচয়
বর্ষ ৩১ । সংখ্যা ১১
জ্যৈষ্ঠ । ১৩৬১

বিংশশতকের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি

রণজিৎ দাশগুপ্ত

"There are times which are not ordinary, and in such times it is not enough to follow the road. It is necessary to know where it leads, and, if it leads nowhere, to follow another." R. H. Tawney.

১৮৪৫ সালে এঙ্গেলস-এর 'Conditions of the Working Class in 1844' বইটি প্রকাশিত হয়। ৪৭ বছর পরে ১৮৯২ সালে বইটির ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় পূর্বেকার আলোচনা ও মতামতের যথার্থতা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস লিখেছিলেন : "The wonder is, not that a good many of them proved wrong, but that so many of them proved right." বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এই মন্তব্য শুধুমাত্র ঐ বইটি সম্পর্কেই নয়, মার্কস-এঙ্গেলস-এর সমগ্র চিন্তাধারা সম্পর্কে কী আশ্চর্যজনকভাবেই না প্রযোজ্য!

সমাজতন্ত্রের জীবনযাত্রা

'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৪৮ সালে। ঐ ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রে মার্কস-এঙ্গেলস তৎকালীন সমাজবাস্তবতার বিশ্লেষণ করে ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্রমবর্ধমান অন্তর্বিরোধ, শ্রমিক-মালিকের দ্বন্দ্ব, শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমপ্রসার, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবক্ষয় ও অবসান, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজের নিশ্চিত অভ্যুদয় সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তারপর এক-শ বৎসরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। এই এক-শ বৎসরের

ইতিহাসে, অভূতপূর্ব পরিবর্তন ও বিস্ময়াবহ ঘটনাবলীর ইতিহাসে, মার্কস-এঙ্গেলস-এর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে নিঃসংশয়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই ইওরোপের দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলন ও বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। ইতিহাসে প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। শতাব্দীর প্রথমার্ধেই জগতের এক-তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলো শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে মার্কসবাদী নীতির ভিত্তিতে। আরও এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যেপে ত্বরিত অবসান ঘটেছে ও ঘটছে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের। এই শতাব্দীরই ষষ্ঠ দশকে শুরু হয়েছে যুদ্ধের বিভীষিকার চির অবসান, সোভিয়েত দেশে সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ আর মহাকাশ জয়ের উদ্দীপনাময় অভিযান। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা মানব-ইতিহাসের কেন্দ্রীয় নির্ধারক উপাদান। সমাজের গতি-প্রকৃতি ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনাসমূহ মার্কসবাদের আলোকে উদ্ভাসিত, অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট, অনেক বেশি স্বচ্ছ।

মার্কসবাদ বাতিল

তবু প্রশ্ন উঠেছে, মুমূর্ষু পচনশীল ধনতন্ত্রের অন্ধ ভাবকেরা, বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা, 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'-এর পুরোহিতেরা প্রশ্ন তুলেছেন। বুড়ো মার্কস সেই কোন কালে কত বৎসর আগে কি লিখে গিয়েছেন তার কি উপযোগিতা রয়েছে আজকের দিনে, এই বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে? বিলেতের দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের অন্যতম প্রধান তত্ত্ববিশারদ ক্রসল্যাণ্ড সাহেব তো একেবারে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে জানিয়েছেন', "His prophecies have been almost without exception falsified, and his conceptional tools are now quite inappropriate." কারণ মার্কস-এঙ্গেলস যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা লিখেছিলেন তার তো কবেই ক্রম পরিবর্তন হতে হতে একেবারে মৌলিক রূপান্তর ঘটে গেছে। সে ধনতন্ত্র আর নেই।

কথাটা অবশ্য নতুন নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আর এই শতাব্দীর গোড়াতে আক্ষরিক অর্থেই শত শত বই লেখা হয়েছে মার্কসবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে, বিশেষত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিটি সাময়িক সমৃদ্ধিকালে রাশি

রাশি বই প্রকাশিত হয়েছে ধনতন্ত্রের প্রগতিশীলতা বোঝানোর জন্য, আর তাতে কতবার যে মার্কসবাদকে চূড়ান্তভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে তারও কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাতে সমাজতন্ত্রের সংক্রামক অগ্রগতি রুদ্ধ হয় নি, মার্কসবাদের বিশ্ববিজয়ী অভিযান প্রতিহত হয় নি; বরং সে সব সমালোচনাগ্রন্থই আজ কীটের উপজীব্য।

তবু যে কালে দুনিয়ার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের আধিপত্যই ছিল একচ্ছত্র এবং ধনতন্ত্রের প্রসারের সুযোগ ছিল প্রচুর, সেকালে ধনতন্ত্রের মহিমাকীর্তনের আর মার্কসবাদের ভ্রান্তি অন্বেষণের অর্থ বোধগম্য। কিন্তু একালে যখন ধনতন্ত্র ক্রমে বেশি বেশি ক্ষয় পাচ্ছে, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমে বেশি বেশি শক্তিলাভ করছে তখন বুর্জোয়া ও দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী তত্ত্ববাগীশদের ধনতন্ত্রকে নবজীবনদানের প্রয়াস নিতান্তই কৌতুকাবহ ও করুণ। তবে এঁদের বক্তব্য যতই অসার হোক না কেন, তার আলোচনা প্রয়োজন। কারণ নানা তর্কের জালে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের একাংশ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ধাঁধা লাগানোর জন্য প্রচার ও চেষ্টার' তো কোনো অভাব নেই।

নব্য ধনতন্ত্র

নব্য ধনতন্ত্রের প্রচারবিদদের মতে ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক দেহে গত কয়েক দশকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে পরিবর্তন এতই মূলগত যে তা বিপ্লবের সামিল। একজন তো বই লিখে ফেলেছেন। 'বিংশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক বিপ্লব'।[২] এই বিপ্লবোত্তর সমাজের হরেক নাম—'প্রাচুর্যের সমাজ',[৩] 'লোকায়ত্ত ধনতন্ত্র', 'ধনতন্ত্র-পরবর্তী সমাজ',[৪] 'কল্যাণ রাষ্ট্র'[৫] ইত্যাদি—শোনা যাচ্ছে। এই সমাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এঁদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও মোটের উপরে এঁরা এক মত। সংক্ষেপে এঁদের বক্তব্য নিম্নরূপ। এ সমাজে দারিদ্র্য ও দুর্দশা দূরীভূত। জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম প্রচুর। এখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত। অতীত-ধনতন্ত্রের মতো এখানে ক্ষমতার অধিকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মালিক বা ধনিকশ্রেণী নয়। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন-ক্ষমতা এখন বেতনভুক ম্যানেজার ও টেক্‌নোলজিস্টদের।[৬] এদের লক্ষ্য মুনাফা নয়, জনসেবা। ব্যাপকতর

সমাজজীবনে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার ফলে ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা খর্বিত। শ্রেণীনিরপেক্ষ আমলারা এই রাষ্ট্রের নিয়ামক শক্তি। এখানেও লক্ষ্য জনকল্যাণ। সেই উদ্দেশ্যেই এ ব্যবস্থা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত। ফলে সমাজের সম্পদ ও সম্পত্তির মালিকানায় গণতন্ত্রীকরণ তাৎপর্যপূর্ণ আর বণ্টন ক্রমশ বেশি বেশি প্রগতিশীল। উৎপাদনের নৈরাজ্য ও অস্থিরতা এড়ানোর গূঢ় তত্ত্বটি এই সমাজের করায়ত্ত। এই সমাজ সংকটমুক্ত, সংঘর্ষমুক্ত। শ্রেণীবিরোধ অতীত ইতিহাসের বিষয়। এহেন পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ 'তপমা' মাত্র. শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে উৎপাদনের উপাদানসমূহকে জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করার সমাজতান্ত্রিক আদর্শটি অচল, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস আমাদেরই পরিবর্তন-বিমুখ, রক্ষণশীল মনোবৃত্তির প্রকাশ।

ক্লাসিকাল মডেলের অবসান

একথা অবশ্য ঠিক, গত সত্তর-আশি বৎসরে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রভূত বদল, অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তন ঘটেছে। এ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো প্রমুখ ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধনতন্ত্র সম্পর্কে ধারণাটি আধুনিক ধনতান্ত্রিক বাস্তবতাকে আর প্রতিফলিত করে না। ক্লাসিকাল মডেল অনুসারে ধনতন্ত্র মূলত প্রতিযোগিতামূলক, স্বয়ংচালিত ও স্বয়ংসামঞ্জস্যসাধক। অসংখ্য ছোট ছোট শিল্প ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা, সামগ্রিক উৎপাদনে প্রতিটি উৎপাদক ও বিক্রেতার নগণ্য অংশ, পণ্যের দাম নির্ধারণে কোনো একটি বা এমনকি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের যুক্তভাবে কার্যকরী প্রভাব বিস্তারে অক্ষমতা—এই ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। উৎপন্ন দ্রব্য এবং কাঁচামাল ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের দাম নির্ধারিত হতো বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে। আর এই বাজারে নির্ধারিত দামগুলিকে হিসেবের মধ্যে এনে প্রতিটি উৎপাদক বা প্রতিষ্ঠান স্থির করত কোন দ্রব্য উৎপন্ন হবে ও কতটা উৎপন্ন হবে, কেমন করে উৎপাদন হবে, কতজন শ্রমিক নিয়োগ করা হবে, কি পরিমাণ মূলধন কোথায় বিনিয়োগ করা হবে ইত্যাদি। অবশ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একক সিদ্ধান্তসমূহের একটা সামগ্রিক প্রভাব ছিল, সেই প্রভাবের ফলেই দেখা দিত বিভিন্ন দ্রব্য ও উৎপাদন উপকরণগুলির

ইংল্যাণ্ডের মতো দেশে দারিদ্র্যের আর কোনোই স্থান নেই। গলব্রেথ সাহেব তো লিখেছেন, মার্কিন দেশের 'প্রাচুর্যের সমাজ'-এ লোকে আর না খেয়ে মরে না, বরং বেশি খেয়ে মরে। অতএব, মার্কসবাদ নেহাৎই একটা প্রাণহীন 'ডগমা' ভিন্ন আর কি? কিন্তু সত্যিই কি তাই? বাস্তবের সাক্ষ্য অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত।

সন্দেহ নেই, এক-শ বৎসর আগের ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আজকের ইংল্যাণ্ডের প্রভেদ বিস্তর। এ বিষয়েও সন্দেহ নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ার সমৃদ্ধতম দেশ, এখনো সে দেশে অধিকাংশ দ্রব্যের মাথা পিছু উৎপাদন সোভিয়েত রাশিয়া থেকে অনেক বেশি। কিন্তু এ সবের অবশ্যম্ভাবী অর্থ যে সাধারণ মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক দৈন্যের অবসান নয়, তার নমুনা বিস্তর।

নিউ ইয়র্কের কমিউনিটি কাউন্সিল ১৯৫৭ সালের জন্য পারিবারিক বাজেট তৈরি করেছিলেন। সে বাজেট অনুসারে নিউ ইয়র্কে চারজন সভ্যের একটি পরিবারের অতি সাধারণভাবে ভরণপোষণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ইত্যাদি বাবদে নিম্নতম প্রয়োজন বার্ষিক চার হাজার ডলারেরও বেশি আয়। অন্যান্য নানা সংস্থাসমূহের প্রণীত হিসেবও অনুরূপ। নিঃসন্দেহে চার হাজার ডলার আয়ে আমাদের দেশের সাধারণ জীবনযাত্রার মানের থেকে অনেক ভালো থাকা যায়। কিন্তু এই চার হাজার ডলারই ও দেশের বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি, জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক বিকাশ অনুসারে, মার্কসের বিশিষ্ট সংজ্ঞার্থে subsistence wage বা জীবন ধারণোপযোগী মজুরী। এই চার হাজার ডলারই হলো ও দেশের দারিদ্র্যের সীমারেখা।[৭]

কিন্তু কতজনের বার্ষিক আয় চার হাজার ডলার? মার্কিন সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, মার্কিন পরিবার-সমষ্টির শতকরা ৩৬·৩টির আয় নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়ের কম; আর শতকরা ২৪·৫টি পরিবারের আয় তিন হাজার ডলারেরও কম। অর্থাৎ বহু বিজ্ঞাপিত 'প্রাচুর্যের সমাজ'-এও মোট পরিবারসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি দারিদ্র্যক্লিষ্ট। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, সুচিকিৎসার অভাব—সংক্ষেপে, সুস্থ ও সুন্দর জীবনের অভাব হলো এক-তৃতীয়াংশ পরিবারের ভাগ্য।

'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর মতো পত্রিকার বিবরণী থেকে জানা যায়[৮], ১৯৫৯ সালে ৭০ লক্ষেরও বেশি লোক অর্থাৎ ও দেশের জনসমষ্টির শতকরা ৪

তাদেরই কোনো না কোনো ধরণের খয়রাতি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। অন্তত ২ কোটি শ্রমিক নিম্নতম মজুরী আইনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এসবের অর্থ কিন্তু খুবই সহজ-সরল: প্রাচুর্য নয়, বরং দুঃস্থতা ও দুর্দশা আজও মার্কিন দেশে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের জীবনের নিদারুণ বাস্তবতা।

কিন্তু এখানেই দুর্গতির শেষ নয়। গলব্রেথ সাহেব নিজেই জানিয়েছেন*, মার্কিন দেশে জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি অবহেলিত। জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা-সমূহ উপেক্ষিত। স্কুলগুলি পুরনো ও ভীড়াক্রান্ত। রাস্তা আর ফাঁকা জায়গাগুলি নোংরা। পরিবহন ব্যবস্থা অস্বাস্থ্যকর ও ময়লা। বাসস্থান ঘিঞ্জি। বস্তি-অঞ্চল এখনো বর্তমান।

ধনতান্ত্রিক সমৃদ্ধির পীঠস্থান মার্কিন দেশেই যদি অবস্থা এই ধরণের হয়, তবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাভুক্ত অন্যান্য দেশের পরিস্থিতি সহজেই অনুমেয়। আর দারিদ্র্য ও দুঃস্থতার অবসানে ধনতন্ত্রের 'কৃতিত্ব' বিচারে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইংল্যাণ্ডের মতো দেশের অবস্থা আলোচনাই যথেষ্ট নয়। কেননা ধনতান্ত্রিক বন্দোবস্তের চৌহদ্দি তো শুধুমাত্র ঐ দুটি কিংবা ঐ রকমের আর দু-একটি দেশে সীমাবদ্ধ নয়। ধনতন্ত্র মূলত একটি আন্তর্জাতিক বন্দোবস্ত। মার্কস-এঙ্গেলস সেই পটভূমিতেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলাফল আলোচনা করেছেন। সুতরাং, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির রেকর্ড বিচারে, পৃথিবীর অন্যত্র যেসব দেশে ধনতন্ত্রের প্রবেশ ঘটল, সেসব দেশে ধনতন্ত্র কি ফল প্রসব করল তারও হিসেব-নিকেশ নিতে হবে। আর একথা কার না জানা আছে যে, এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায় তো বটেই, এমন কি ইওরোপেরও কোনো কোনো (যেমন, স্পেন, পর্তুগাল, গ্রীস ইত্যাদি) দেশে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে ধনতন্ত্রের পরিণাম একান্তই মর্মান্তিক। দুঃসহ দারিদ্র্য, অনশন-অর্ধাশন, ব্যাপক অশিক্ষা, ভয়াবহ শিশুমৃত্যু, রোগের বিভীষিকা এসব দেশের জনসাধারণের নিত্যসঙ্গী। আর এসবই তো বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশেষত্ব।

নব্য ধনতন্ত্রের দাবিদারেরা যে এসব বিষয়ে অনবহিত তা মোটেই নয়। তাঁরা এ সম্পর্কেও অবহিত যে ইংল্যাণ্ড বা মার্কিন দেশের শ্রমিকদের যে অতীতের তুলনায় এবং অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় বেশি মজুরী দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে তার কারণ হলো: [১] জীবনমানের উন্নয়ন ও মজুরী বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকশ্রেণীর দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র সংগ্রাম, [২] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও

তার পরবর্তীকালের বিশেষ পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি এবং ধনিকশ্রেণীর দুর্বলতাবৃদ্ধি. [৩] উপনিবেশগুলির প্রত্যক্ষ লুণ্ঠন এবং সেগুলির সঙ্গে অসম বাণিজ্য। তদুপরি রয়েছে কোনো কোনো দেশের বিশেষ আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি, যেমন মার্কিন দেশে [ক] প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য, [খ] দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভৌগোলিক সীমা প্রসারের সুযোগ, [গ] জন-স্বল্পতা, এবং [ঘ] কোনোরকম সামন্ততান্ত্রিক পটভূমি ও অবশেষের অনুপস্থিতি। বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা এসব বিশেষ কারণ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তথাপি এঁরা প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ডের বিশেষ কতকগুলি দিককে আলাদা করে তুলে ধরে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কৃতিত্ব জাহির করতেই ব্যস্ত। ফলে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিকব্যবস্থার দুঃস্থতা ও দুর্দশার চিত্রটি এঁদের কাছে একেবারেই উপেক্ষিত।

সম্পত্তির মালিকানা-সম্পর্ক

ধনতন্ত্রের আওতাভুক্ত দেশগুলিতে জনসাধারণের শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থা এবং জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহের চরম অবহেলা আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এর মূল কারণ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। যে সমাজে সম্পদ ও আয়ের উৎপাদন ও বণ্টনে তীব্র বৈষম্য বর্তমান এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কর্তৃক কেন্দ্রীভূত সে সমাজের অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ দারিদ্র্য আর দুর্দশা, একচেটিয়া মালিকদের ব্যক্তিগত মুনাফার স্বার্থে জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি ও জনস্বার্থের সম্পূর্ণ অবহেলা।

গণতান্ত্রিক সমাজবাদের অন্যতম প্রবক্তা ক্রসল্যাণ্ড সাহেব অবশ্য 'ধনতন্ত্র-উত্তর সমাজ'-এর কথা প্রচার করছেন। কিন্তু এই 'ধনতন্ত্র-উত্তর সমাজ'-এও উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা, সম্পত্তির মালিকানা ধনিকের। ইস্পাত এবং এ্যালুমিনিয়াম কারখানা, কয়লা ও তেলের খনি, জমি আর ব্যাঙ্ক—এসবেরই মালিকানা-পরিচালনার অধিকার মুষ্টিমেয়র কুক্ষিগত; পক্ষান্তরে, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি শ্রমজীবী জনসাধারণ উৎপাদনের উপায়ের, জাতীয় সম্পত্তির মালিকানা ও কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

কিন্তু যেহেতু সমাজে আয়ের পন্থা মাত্র দুটি—সম্পত্তির মালিকানা অথবা শ্রম, সেহেতু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনিকের আয় সম্পত্তির মালিকানাজাত

(শ্রমে তারা অংশ নিতে পারে—কিন্তু সেটা গৌণ), অন্যদিকে জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের আয় হলো মজুরীজনিত শ্রমের ফল। বস্তুতপক্ষে যে সমাজে সম্পত্তির মালিকানা ও কর্তৃত্ব মুষ্টিমেয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন, সে সমাজে সম্পত্তিহীন জনসাধারণের বেশির ভাগই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সম্পত্তি ও মূলধনের মালিকের কাছে শ্রমশক্তি বিক্রয়ে, মজুরীর বিনিময়ে শ্রমশক্তি বিক্রয়ে, বাধ্য। শ্রমিকের সামনে এই মজুরী-দাসত্ব ভিন্ন আয়ের অন্য কোনো পথ খোলা নেই। শ্রমিক মজুরীর বিনিময়ে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করে, মালিকের জন্য শ্রম করে, উৎপাদন করে। কিন্তু সে যে পণ্য উৎপাদন করে তার মূল্য প্রাপ্ত-মজুরীর থেকে অনেক বেশি। কিন্তু নিজের শ্রমের ফলে শ্রমিকের কোনো অধিকারই নেই, মূলধনের মালিকই উৎপন্ন পণ্যের মালিক। সুতরাং শ্রমিক প্রদত্ত-মজুরীর অতিরিক্ত যে মূল্য উৎপাদন করছে তার মালিকও ধনিক। সম্পত্তির মালিকানার জোরে মজুরীহীন শ্রম বা উদ্বৃত্ত মূল্যের অধিকারী হলো ধনিকশ্রেণী। আর এই অনুপার্জিত আয় আত্মসাৎ করেই মালিকের ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, মর্যাদা। পরিণামে সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। শ্রমিক-মালিকের সংঘর্ষে সংক্ষুব্ধ ও খণ্ডিত। মার্কস ও এঙ্গেলস ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এই স্বরূপটিকেই বিশ্লেষণ করেছিলেন তাঁদের রচনাবলীতে।

অবশ্য ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক ও ধনিক ভিন্ন আর কোনো শ্রেণী নেই এমন নয়। কৃষক, কারিগর, ছোট ব্যবসায়ী, অফিস কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার ইত্যাদি মধ্যবর্তী নানা শ্রেণী ও অংশ রয়েছে। কিন্তু এসব মধ্যবর্তী শ্রেণী ও অংশের অস্তিত্ব সত্ত্বেও শ্রমিক ও ধনিকের বিভাগ ও বিরোধটাই ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রধান কথা।

'ধনতন্ত্র-উত্তর সমাজ'

বিংশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও মার্কস-এঙ্গেলস বিবৃত এই মূল চিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। আজও সম্পত্তি ও মূলধনে মালিকানার অধিকার অসম। এবং ফলস্বরূপ আয়ের বণ্টনও বিষম। নমুনা হিসেবে বলা যায়, ইংল্যাণ্ডে দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে দেশের মোট মূলধনের অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা ৫৯ ভাগেরও বেশির মালিক ছিল জনসমষ্টির শতকরা ১ ভাগ, আর শতকরা ৮০ ভাগ মূলধন কেন্দ্রীভূত ছিল জনাধারণের শতকরা ৫ কি

৬ ভাগের হাতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালেও সম্পত্তি বণ্টনের এই প্যাটার্নে উল্লেখযোগ্য কিছু হেরফের হয় নি। ১৯৪৬-৪৭ সালে মোট মূলধনের অর্ধেকই জনসাধারণের শতকরা ১ ভাগের সামান্য কিছু বেশির হাতে পুঞ্জীভূত ছিল আর মূলধনের শতকরা ৮০ ভাগ ছিল মাত্র শতকরা ১০ জনের হাতে। অপর দিকে জনসমষ্টির দুই-তৃতীয়াংশ মালিক ছিল মাত্র শতকরা ৫ ভাগ মূলধনের।[১০]

'জনগণের ধনতন্ত্র'-র সেলসম্যানেরা জোর গলায় দাবি করছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূলধনের মালিকানায় গণতন্ত্রীকরণ ঘটছে, শেয়ার মালিকানায় বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে। এই দাবির সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৭ সালে শেয়ার-মালিকের সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ থেকে ৬০ লক্ষ, ১৯৫৬ সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয় ৮৬ লক্ষেরও বেশি। শেয়ার-মালিকদের এই সংখ্যা বৃদ্ধি কি বৈষম্য হ্রাসের প্রমাণ নয়? না, তা নয়। কেননা উল্লিখিত তথ্যটুকুই সব নয়। এ বিষয়ে দেখা প্রয়োজন, প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসমষ্টিতে শেয়ার-মালিকদের অনুপাত কত? দ্বিতীয়ত, কোন ধরণের লোক শেয়ারের মালিক? তৃতীয়ত, মালিকানাধীন শেয়ার থেকে কোন ধরণের লোকের কত আয় হয়?

এক: ১৯২৭ থেকে ১৯৫৬, এই ৩০ বৎসরে শেয়ার মালিকদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু জনসমষ্টিতে শেয়ার-মালিকদের অনুপাতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে নি। নিচের তালিকাটি[১১] থেকেই এ সিদ্ধান্তের প্রমাণ পাওয়া যায়:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসমষ্টিতে শেয়ার-মালিকদের অনুপাত

সাল	শেয়ার-মালিকদের সংখ্যা [লক্ষ]	জনসংখ্যা [লক্ষ]	শেয়ার-মালিকদের অনুপাত
১৯২৭	৪০—৬০	১১৯০	৩'৪—৫'০
১৯৩০	৯০—১১০	১২৩০	৭'৩—৮'৯
১৯৩৯	৮০—৯০	১২৯০	৬'২—৭'০
১৯৫২	৬৪'৯	১৫৭০	৪'১
১৯৫৪	৭৫	১৬২০	৪'৬
১৯৫৬	৮৬'৩	১৬৮০	৫'১

দুই: সরকারী বিবরণ অনুসারে,[১২] ১৯৫৫ সালে ৫ লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী-পরিবার শেয়ারের মালিক। কিন্তু কত শেয়ারের তারা মালিক?

হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে, শ্রমিক-কর্মচারীদের শেয়ারের মূল্য দেশের সমস্ত শেয়ারের মোট মূল্যের মাত্র শতকরা এক ভাগেরও দুই-দশমাংশ। পক্ষান্তরে, রকফেলার মর্গান ইত্যাদির মতো যে কোনো একটি ধনকুবেরগোষ্ঠীর মালিকানাধীন শেয়ারের মূল্য দেশের সকল শ্রমিক যত শেয়ারের মালিক তার মোট মূল্যের কয়েকগুণ বেশি। ঐ হিসেব অনুযায়ী, শ্রমিক সাধারণের শতকরা ৯৭·৩ জনই শেয়ার মালিকানার সামান্যতম সুযোগের থেকেও বঞ্চিত। আর অন্য দিকে, দেশের পরিবার-সমষ্টির মাত্র শতকরা ১ ভাগ শতকরা ৮০ ভাগ শেয়ারের মালিক।

তিন: ১৯৪৯ সালে যে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়েছে তার মোট মূল্যের শতকরা ৪২ ভাগই পেয়েছে ১৬৫,০০০ শেয়ার মালিক বা প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন জনসাধারণের মাত্র শতকরা এক ভাগের এক-দশমাংশ।[১৩] অপর দিকে 'শ্রমিক-মালিক'দের শেয়ার মালিকানা থেকে গড় বার্ষিক আয় হলো মাত্র দু-দিনের মজুরীর সমান অর্থাৎ বৃহৎ শেয়ার মালিকদের বিপুল পরিমাণ মুনাফার তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশ।[১৪] এসবই শেয়ার-মালিকানা গণতন্ত্রীকরণের এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের co-proprietors-এ পরিণত করার অতি চমৎকার নিদর্শন!

মহাধনিকদের আধিপত্য

প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমসাময়িক ধনতান্ত্রিক সমাজে সম্পদ বণ্টনে শুধু যে অসাম্য বর্তমান তা নয়, এই সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রবণতাটিও অতি প্রকট। (বিশিষ্ট আমেরিকান অর্থনীতিবিদ এফ. সি. মিলসের হিসেব অনুসারে[১৫]) বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস পায় এক-পঞ্চমাংশ, আর একই সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি। মার্কিন সরকারী অনুসন্ধানের থেকে জানা যায়,[১৬] ২০০টি বৃহত্তম উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ১৯৩৫ সালে ব্যবসায়ে অংশ ছিল ৩৮ শতাংশ; ১৯৫০ ও ১৯৫৫ সালে অংশ বেড়ে গিয়ে হয় যথাক্রমে ৪১ শতাংশ ও ৪৬ শতাংশ।

এই একচেটিয়া প্রবণতা বৃদ্ধি এতই প্রকট যে মার্কিন দেশে "ইতিহাসের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি একত্রীভূত (concentrated) অর্থনৈতিক মালিকানা"র কথা 'বিংশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক বিপ্লব'-এর গ্রন্থকার স্বয়ং বার্লকেও মানতে হয়েছে। তিনি লিখেছেন, দেশের প্রতিটি শিল্পের, প্রতিটি

ব্যবসায় অর্ধেকেরও বেশি দুটি বা তিনটি বা খুব বেশি হলে পাঁচটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কুক্ষিগত।[১১]

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলি নাকি এই একচেটিয়া প্রবণতা থেকে মুক্ত। কিন্তু এ দাবি যে ভিত্তিহীন তার প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, সুইডেনের মতো দেশেও ১৯৩১ থেকে ১৯৫১—এই ২০ বৎসরের মধ্যে দেশের মোট ব্যবসায়ে ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অংশ শতকরা ১৮ ভাগ থেকে কমে হয়েছে শতকরা ১২ ভাগ, আর বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির অংশ শতকরা ২১ ভাগ থেকে বেড়ে হয়েছে শতকরা ২৮ ভাগ।[১৮]

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ধনতান্ত্রিক দেশেরই বৈশিষ্ট্য এই একচেটিয়া প্রবণতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জগতে তো দু-শ বা তিন-শটি দৈত্যাকার শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান জেঁকে বসে রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি আবার নানা ভাবে একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ গ্রন্থিবন্ধনে আবদ্ধ। কাঁচামালের যোগান, নতুন উদ্ভাবন, বিনিয়োগের পরিমাণ ও প্রকৃতি, শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মসংস্থান, পণ্যদ্রব্যের মূল্য, বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থাদি যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় এই অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে। শিল্প-অর্থ-বাণিজ্যের জগতে তো বটেই, এমন কি গোটা সমাজে ব্যক্তির চিন্তা, ক্ষমতা, খ্যাতি—সবেরই ভিত্তি এই প্রতিষ্ঠানগুলি। এই প্রতিষ্ঠানগুলিই ক্ষমতা ব্যবহার করার, সম্পদ আহরণ ও সঞ্চয়ের প্রধানতম উপায়। এই বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা দিয়েই নির্ধারিত হয় ব্যক্তির ঐশ্বর্যের পরিমাণ, ক্ষমতার ব্যাপ্তি, খ্যাতির শিখর। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এই সত্যকে খণ্ডন করার কোনো উপায়ই নেই।

'আয়গত বিপ্লব'

যে অর্থনৈতিক বন্দোবস্তে সম্পত্তির বণ্টনে তীব্র অসাম্য এবং শিল্প-আর্থিক-ব্যবসা জগতে প্রবল একচেটিয়া-কর্তৃত্ব বিদ্যমান, সে ব্যবস্থায় আয়ের বণ্টনও যে অনুরূপ হবে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জাতীয় আয়ের শ্রেণীগত বণ্টন সম্পর্কে যেসব অনুসন্ধান করা হয়েছে, সে অনুসন্ধানগুলির ফলাফল অবশ্য অবিকল এক নয়। গত কয়েক দশকে জাতীয় আয় বণ্টনের প্যাটার্নে বিশেষ যে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি, তা এই অনুসন্ধানগুলির থেকে বেশ বোঝা যায়। জন স্ট্র্যাচি তো 'কল্যাণ রাষ্ট্র'-র তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী।

কিন্তু তাঁকেও মানতে হয়েছে যে[১০], ১৯১১-১৯৩৯—এই কয় বৎসরে জাতীয় আয়ের মধ্যে একদিকে শ্রমিক-কর্মচারীর মজুরী ও বেতন, অন্যদিকে মালিককুলের মুনাফা, খাজনা ও সুদের আপেক্ষিক অংশ মোটামুটি অপরিবর্তিত রয়েছে।

প্রগতিশীল ধনতন্ত্রের পক্ষে যাঁরা ওকালতনামা নিয়েছেন তাঁরা বলছেন, আগে যাই হোক না কেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নাকি একটা 'আয়গত বিপ্লব' ঘটে গেছে। এর ফলে জাতীয় আয়ের মধ্যে সম্পত্তিজাত আয়ের অংশ কমেছে, আর শ্রমজাত আয়ের অংশ বেড়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ষ্ট্যাটিস নিজস্ব জবানীতেই জানা যায়, সম্পত্তিজাত আয়ের মধ্যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আয় অর্থাৎ যে আয় বিতরণ করা হয়েছে তাকেই হিসেবের মধ্যে ধরা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিপুল মুনাফার যে অংশটি বণ্টন না করে রিজার্ভ ফাণ্ডে বা অন্যান্য বাবদে জমা রাখা হয় তাকে ধরা হচ্ছে না। কিন্তু এই undistributed profit বা অবিতরিত মুনাফা তো কার্যত ধনিকদের শ্রেণীগত আয়।

এ দিকটি মনে রেখে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতেও জাতীয় আয় বণ্টনের ধারায় তেমন কোনো পরিবর্তন আসে নি। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ডাডলে সীয়ার্সের অনুসন্ধান থেকে জানা যায়,[১১] ইংল্যাণ্ডে মোট উপার্জকদের মধ্যে সর্বোচ্চ আয়বিশিষ্ট ১ শতাংশ ১৯৩৮ সালে আত্মসাৎ করত জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ, ১৯৪৭ সালে এদের ভাগ মাত্র ১ শতাংশ কমে হয়েছে ১৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে উপার্জক সমষ্টির মধ্যে নিম্ন আয়বিশিষ্ট ৫০ শতাংশের ভাগে ১৯৪৭ সালে পড়েছে জাতীয় আয়ের মাত্র ২৫ শতাংশ—এক্ষেত্রে ১৯৩৮ সালের তুলনায় প্রায় কোনো উন্নতিই ঘটে নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয় বণ্টনের ধারাও ভিন্ন নয়। সাইমন কুযনেট্স-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী[১২] ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৯ মাত্র এক-পঞ্চমাংশ।

'ম্যানেজারিয়েল বিপ্লব'-এর অন্তিকথা

আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, জাতীয় আয় বণ্টনে এই যে উৎকট অসাম্য, এর মূলে রয়েছে কয়েক শ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া কর্তৃত্ব। আর এই প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয় মালিক গোষ্ঠীর স্বার্থে, মালিক গোষ্ঠীর দ্বারা।

ধনতন্ত্রের নবীন ত্রাণকর্তারা অবশ্য বলছেন ইংল্যাণ্ড বা মার্কিন দেশে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটছে। বিরাট বিরাট মনোপলি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় এবং আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির বিশেষ জটিলতা বৃদ্ধির ফলে এসব দেশে ধনিক বা মালিকশ্রেণী দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন তো বটেই, এমন কি নিজেদের মালিকানাধীন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উৎপাদন সংগঠনসমূহে কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ক্ষমতা ক্রমশ হারাচ্ছেন। তাঁদের পরিবর্তে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ত সর্বোচ্চ কর্মকর্তারা বা ম্যানেজার ও টেকনোলজিস্টগোষ্ঠী বিভিন্ন শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সর্বেসর্বা। রান্নাঘরের জন্য রেফ্রিজারেটার থেকে সুরু করে যুদ্ধের প্রয়োজনে বোমারু বিমান উৎপাদন—সব কিছুর ক্ষেত্রেই এই বেতনভুক বড় সাহেব বা ম্যানেজারগোষ্ঠী প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। 'পুরনো দিনের সঙ্কীর্ণ মনোভাবাপন্ন মালিককুল' থেকে এদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র—অনেক ব্যাপক ও প্রসারিত। যে বিশেষ প্রতিষ্ঠানে এরা নিযুক্ত কেবলমাত্র সেই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষা নয়, ছোট উৎপাদক, ক্রেতাসাধারণ ও শ্রমিক-কর্মচারীদের বহুবিধ স্বার্থরক্ষার কাজে এরা ব্যাপৃত। এদের লক্ষ্য মুনাফাশিকার নয়—এদের লক্ষ্য জনকল্যাণ ও জনসেবা।

মজা হলো যে, পণ্ডিতরা ম্যানেজারিয়েল বিপ্লবের দাবি ঘোষণায় যে পরিমাণ সোচ্চার এই দাবিকে যুক্তিতথ্য প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে ঠিক সে পরিমাণেই নীরব। গলব্রেথ, স্ট্র্যাচি, ক্রসল্যাণ্ড বা অন্য যে কোনো 'বিশেষজ্ঞ'-র লেখাই দেখা যাক না কেন, এই তত্ত্বের সমর্থনে তথ্যের অনুসন্ধান পণ্ডশ্রম মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে এঁদের সকলের সিদ্ধান্তেরই একটি সাধারণ ভিত্তি আছে। তা হলো ১৯৩৩ সালে গার্ডনার মীনস ও এ. এ. বার্লে রচিত 'The Modern Corporation and Private Property' বইটি। ঐ বই-এ উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে, যেমন বার্নহাম লেখেন 'Managerial Revolution।'[১১] প্রথমোক্ত বইটিতে লেখকদ্বয় আধুনিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে অনেক পরিশ্রম করে প্রচুর মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সে-সবের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। এখানে যা প্রাসঙ্গিক ও উল্লেখযোগ্য তা হলো ঐ লেখকেরা দেখিয়েছিলেন, ১৯২৯ সালে ২০০টি যৌথ মূলধনী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৬৫টিই কার্যকরীভাবে ম্যানেজার নিয়ন্ত্রিত।

সত্য হলে উপরোক্ত তথ্য নিঃসংশয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তীকালে

মার্কিন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত Securities and Exchange Commission-এর মতে[১১] ঐ ২০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪০টিই মালিক নিয়ন্ত্রিত। ঐ লেখক দুজন ৩৬টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ করে ম্যানেজার নিয়ন্ত্রিত হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের বিভিন্ন সরকারী কমিটির অনুসন্ধানের ফলাফল থেকে জানা যায়, এদের ততটিই নিশ্চিতভাবে মালিকানা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান।

ম্যানেজারিয়েল বিপ্লব যে একটা অতিকথা বা myth ভিন্ন কিছু নয়, তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেকার নানা বিশ্লেষণ থেকেও প্রমাণিত হয়। অধ্যাপক ম্যাবেল নিউকামারের অনুসন্ধান অনুসারে ১৯৪৯ সালে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির ৫ হাজার পরিচালক বা ডাইরেক্টারের মধ্যে শতকরা মাত্র ৩১.৩ জন ছিলেন বেতনভুক কর্মকর্তা।

ইংল্যাণ্ডেও পরিস্থিতি ভিন্নতর কিছু নয়। সেখানকার শিল্প-কাঠামো ও সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করে অধ্যাপক সার্জেন্ট ফ্লোরেন্স লিখেছেন,[১৩] "ম্যানেজারিয়েল বিপ্লব যতটা অগ্রসর হয়েছে বলে চিন্তা করা হয় (বা চিন্তা না করেই বলা হয়) তা যে হয় নি এবং অনেক কোম্পানী ও কর্পোরেশনেরই সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা যে বৃহৎ শেয়ার মালিকদের হাতেই ন্যস্ত—একথা বিশ্বাস করার মতো নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে।"

মালিকগোষ্ঠী ও ম্যানেজারগোষ্ঠীর সমস্বার্থবোধ

একথা যথার্থ যে, আধুনিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বেতনভুক কর্মকর্তা বা ম্যানেজারগোষ্ঠীর ক্ষমতা ও ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাদের এই ক্ষমতার ভিত্তি বা উৎস কোথায়? এই ম্যানেজারগোষ্ঠীর স্বার্থ কি মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থ থেকে ভিন্ন এবং যদি তা ভিন্ন হয়, তবে সেই বিশেষ স্বার্থটি কি?

এসব প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথম কথা হলো, দৈত্যাকার বিরাট একচেটিয়া শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংগঠিত কেন্দ্র। বেতনভুক কর্মকর্তারা এই সম্পত্তি-কাঠামোর একাধারে ফল এবং সংগঠক। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্পর্কের নৈকট্যের মাত্রা দিয়েই নির্ধারিত হয় ম্যানেজারগোষ্ঠীর বিত্ত, ক্ষমতা, সুবিধা, যশের পরিমাণ।

দ্বিতীয়ত: মালিকগোষ্ঠী ও ম্যানেজারগোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের ভিন্নতা ও

বিরোধ নয়, বরং ঘনিষ্ঠ সমস্বার্থবোধ বর্তমান। এবং এই সমস্বার্থবোধের ভিত্তি প্রধানত তিনটি।

এক : অধ্যাপক রাইট মিলস তাঁর 'Poner Elite' বইতে দেখিয়েছেন, ১৯৫০ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষস্থানীয় মালিক ও কর্মকর্তাদের অধিকাংশেরই জন্ম অন্তত উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে ; এদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ধর্মবিশ্বাসে প্রোটেস্ট্যান্ট, প্রায় সকলেরই চামড়ার রং সাদা ; বেশির ভাগেরই শিক্ষা বাছাই করা বিশিষ্ট কলেজ ও প্রতিষ্ঠানে। পারিবারিক ও শিক্ষাগত পৃষ্ঠপটের এই মিল, জীবনযাত্রার ঢং-এ সাদৃশ্য এবং একই ধরণের ক্লাব, খানাপিনার আসর ইত্যাদিতে সামাজিক মেলামেশার মধ্যে মালিক-গোষ্ঠী ও ম্যানেজারগোষ্ঠীর সামাজিক ও মানসভঙ্গিগত ঐক্যের কারণ নিহিত।

দুই : মালিকগোষ্ঠী ও ম্যানেজারগোষ্ঠীর সমস্বার্থবোধের কারণ অবশ্য শুধুমাত্র সামাজিক নয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সম্পত্তি-কাঠামোর বিশিষ্ট প্রকৃতির মধ্যেও উপস্থিত রয়েছে এই সমস্বার্থবোধের কারণ। 'ম্যানেজারিয়েল বিপ্লব'-এর প্রবক্তারা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, জনসেবাই ম্যানেজারগোষ্ঠীর লক্ষ্য। মনোগত অভিপ্রায় প্রমাণ করা অবশ্য যথেষ্ট তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যায়, মনোগত অভিপ্রায় যাই হোক না কেন, ম্যানেজারগোষ্ঠীর জীবনের বাস্তব ব্রত জনসেবা বা জনকল্যাণ নয়, মালিকের সেবা। শ্রমিক-কর্মচারী, ক্রেতাসাধারণ, কারিগর ও ছোট উৎপাদক—এদের সকলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মালিকের স্বার্থরক্ষাই ম্যানেজারগোষ্ঠীর একমাত্র জীবনসাধনা। কারণ মালিকের প্রসাদলাভে এদের তুষ্টি, মালিকের অনুগ্রহ বর্ষণে এদের পদোন্নতি, মালিকের কৃপাদৃষ্টিতে এদের প্রতিষ্ঠা। আর মালিকের স্বার্থরক্ষার মানে হলো অর্থ, আরও অর্থ, মুনাফা অর্জন।

তিন : বস্তুতপক্ষে ধনতান্ত্রিক বন্দোবস্তের চৌহদ্দিতে মুনাফাশিকার ভিন্ন অন্যবিধ কোনো লক্ষ্যের ; মুনাফা নিরপেক্ষ কোনো উদ্দেশ্যের অনুসরণ, মালিক-গোষ্ঠী কিংবা ম্যানেজারগোষ্ঠীর কারুর পক্ষেই সম্ভবপর নয়। আগেই বলা হয়েছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মাত্রা দিয়েই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিত্ত-ক্ষমতা-খ্যাতির পরিমাণ নির্ধারিত। আর ধনতান্ত্রিক বন্দোবস্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিশিষ্ট, নির্দিষ্ট রূপ হলো মূলধনের মালিকানা, পরিচালনা,

রক্ষণাবেক্ষণে অংশ গ্রহণ এবং এ সমাজে ঐশ্বর্য বৃদ্ধির, ক্ষমতা লাভের, প্রতিষ্ঠা অর্জনের সেটিই সহজতম সরলতম পন্থা। কিন্তু মূলধনের স্বাভাবিক সঙ্কোচনের দিকে—প্রতিযোগিতা, কারিগরী উন্নয়ন, নিত্য নতুন উদ্ভাবনাদি নানা উপাদান এ বিষয়ে সক্রিয়। এ অবস্থায় সমাজে নিজের বিত্ত-ক্ষমতা-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার একমাত্র উপায় মূলধনের প্রসারের জন্য ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন প্রযত্ন। আর মুনাফা তো মূলধনেরই increment, মূলধনের প্রসার বা বৃদ্ধির বিশেষ রূপ। অতএব মূলধনের আইনসঙ্গত মালিক ও বেতনভুক বড়সাহেব—এদের সকলেরই, আত্মগত বাসনা যাই হোক না কেন, বাস্তব পরিস্থিতির চাপে মুনাফা অর্জনই একমাত্র উদ্দেশ্য। মালিকগোষ্ঠী ও ম্যানেজারগোষ্ঠীর সমস্বার্থবোধের অন্যতম ভিত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি-কাঠামোর এই বিশেষত্ব।

উপরের আলোচনা থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, এক বিশ্ববিপ্লবের ফলে মালিকগোষ্ঠী তার ক্ষমতা ও সুবিধা হারিয়েছে, পরিবর্তে ম্যানেজারগোষ্ঠী হস্তগত করেছে সব ক্ষমতা ও সুবিধা—এমন সিদ্ধান্তের তথ্যগত অথবা তত্ত্বগত, কোনো রকম সমর্থনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইংল্যাণ্ডের বাস্তব সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে মেলে না। সে জীবনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষমতা ধারাবাহিক, সেখানে ধনতান্ত্রিক সম্পত্তির স্বার্থই প্রধান কথা, একচেটিয়া ধনিকদের আধিপত্য অপ্রতিহত। এবং দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয় তার বিশেষ অবস্থানের দরুণ বেতনভুক বড়কর্তাদের গোষ্ঠী এই ধনিকশ্রেণীর থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র কোনো শ্রেণী নয়—আসলে ঐ শ্রেণীরই একটি অংশ। গত কয়েক দশকে অবশ্য ধনিকদের শ্রেণীগত কাঠামোর অভ্যন্তরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে ও ঘটছে। কিন্তু সে সব পরিবর্তন সত্ত্বেও ম্যানেজারগোষ্ঠী স্বতন্ত্র কোনো শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয় নি, অর্থনৈতিক জীবনে ধনিকশ্রেণীর প্রভুত্বের অবসানও ঘটে নি।

রাষ্ট্রের ভূমিকা

ধনিকশ্রেণীর এই প্রভুত্ব, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রবল ক্ষমতা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক জীবনেই গণ্ডিবদ্ধ নয়, সে প্রভুত্ব ও ক্ষমতা রাজনৈতিক জীবনেও প্রসারিত এবং ক্রমপ্রসারমান।

নব্য ধনতন্ত্রের মুখপাত্ররা কিন্তু বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখাতে চাইছেন।

তাঁদের বক্তব্য হলো, অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমবর্ধমান, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ। শ্রেণী-নিরপেক্ষ কল্যাণব্রতী আমলারাই এ রাষ্ট্রের নিয়ামক-শক্তি, কার্যকরী ক্ষমতার অধিকারী। ফলস্বরূপ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি মৌলিক অর্থেই রূপান্তরিত।

এ নিয়ে অবশ্য তর্কের কোনো অবকাশ নেই যে, মার্কস-এঙ্গেলস যে কালে লিখেছেন সে কালের তুলনায় তো বটেই, এমন কি তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের অবস্থার তুলনাতেও আজকের দিনে রাষ্ট্রের ভূমিকা অনেক বেশি। আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক দেহে দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ, কাঁচামালের বরাদ্দ স্থিরীকরণ, উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে নানাভাবেই রাষ্ট্রের প্রভাব সক্রিয়; কর ব্যবস্থা, শ্রম আইন, শুল্ক নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রত্যক্ষ; রাষ্ট্রের নিজস্ব মালিকানা ও পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খাস মার্কিন মুলুকেও নগণ্য নয়। কিন্তু অর্থনৈতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্রের অংশ গ্রহণ মানেই ধনতন্ত্রের অবলুপ্তি নয়।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, ধনতন্ত্রের পূর্বতন চিত্রটি ছিল প্রতিযোগিতামূলক। অসংখ্য ছোট ছোট উৎপাদকের বাধাহীন প্রতিযোগিতার জগতে কোনো একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান অনুপস্থিত, রাষ্ট্রের ভূমিকাও নেতিবাচক। সেদিনের পরিস্থিতিতে ও বিচারে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্রের কোনো অংশগ্রহণ ছিল অনভিপ্রেত, কোনো হস্তক্ষেপ ছিল অনধিকার চর্চা। এর মানে এ নয় যে, রাষ্ট্রের স্থান ছিল গরীব ও বড়লোকের, শ্রমিক ও মালিকের সংঘাতের ঊর্ধ্বে বা রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল নিরপেক্ষ আম্পায়ারসুলভ। মোটেই তা নয়। সেদিনও রাষ্ট্র ছিল শ্রেণীশাসনের, সংখ্যাগুরু শ্রমজীবীমানুষের উপর সংখ্যালঘু ধনিকদের জবরদস্তি ও শাসনের যন্ত্র। তবে সেই যন্ত্রের কার্যক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। সেদিনের রাষ্ট্র ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তার, ধনিকদের সঙ্কীর্ণ শ্রেণী স্বার্থের পাহারাদার মাত্র। এবং এ ভূমিকা পালনে রাষ্ট্র যে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি তার পরিচয় পাওয়া যায় এক-শ বছর আগেকার ইংল্যাণ্ডে প্রতিটি শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থায়, ট্রেড ইউনিয়নের গঠনকে এবং প্রতিটি ধর্মঘটকে বেআইনীকরণে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে এই পুলিশী ভূমিকার অতিরিক্ত কোনো কিছুর জন্য তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতি দাবি করে নি।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র

কিন্তু তারপর দিন বদলেছে, রাষ্ট্রের ভূমিকাও পালটেছে। বর্তমানে অসংখ্য ধনিকের প্রতিযোগিতার পরিবর্তে মুষ্টিমেয় মহাধনিকেরাই সর্বশক্তিমান, মূলধন একত্রীভূত ও কেন্দ্রীভূত, যুদ্ধের চরিত্র আমূল পরিবর্তিত, সংকটে ধনতন্ত্র জর্জরিত, ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট বিস্তারিত ও ঘনীভূত। এই পরিস্থিতির পশ্চাৎপটে রাষ্ট্রের ভূমিকাও যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হবে ও ইতিমধ্যেই হয়েছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। রাষ্ট্র আর ধনিকের স্বার্থে শুধু আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক নয়, রাষ্ট্র এখন সামগ্রিকভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও ধনিকশ্রেণীর, বিশেষত একচেটিয়া ধনিকের ত্রাণকারী শক্তি।

রাষ্ট্রের এই ভূমিকার প্রকাশ নানাবিধ: ধনিকশ্রেণীর সাধারণ স্বার্থ রক্ষার তাগিদেই রাষ্ট্র কখনও মজুরীর সর্বোচ্চ সীমা নিয়ন্ত্রণ করছে, কখনও বা নির্ধারণ করছে ধনিকশ্রেণীর মুনাফার অনুকূল কর-কাঠামো ও আমদানী-রপ্তানীর নীতি, আবার কখনও ধনিকশ্রেণীকে গ্যারান্টি দিচ্ছে আইনত নির্দিষ্ট মুনাফার, কখনও আবার পরিবহনব্যবস্থা পরিচালনার কিংবা শক্তি-উৎপাদন ইত্যাদির সরাসরি দায়িত্ব ও ঝুঁকি গ্রহণ করে ধনিকশ্রেণীকে সস্তায় এইসব সুযোগ সরবরাহ নিশ্চিত করছে (ইংল্যাণ্ডে যুদ্ধপরবর্তী প্রথম লেবার সরকারের আমলে ক্রমশ লোকসানজনক রেলপথ, কয়লাখনি ও বিদ্যুৎশিল্পের জাতীয়করণ এই ধরনের কাজের নমুনা), কখনও রাষ্ট্র ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্প-ব্যবসায়ের বৃহত্তম খরিদ্দার হিসেবে আগাম অর্ডার দিয়ে ধনিকদের বাজারকে করে দিচ্ছে নিশ্চিত, সম্পাদন করা হচ্ছে আন্তর্রাষ্ট্রীয় ব্যাপক চুক্তি (যেমন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও লাক্সেমবার্গ—এই ছয়টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত European Steel and Coal Community ও European Common Market), আধুনিক মারণাস্ত্র সরবরাহের ঠিকা দেওয়া হচ্ছে একচেটিয়া ধনকুবেরদের, প্রয়োজনমতো উপনিবেশগুলিতে চালানো হচ্ছে হিংস্র লড়াই কিংবা আয়োজন করা হচ্ছে নতুন যুদ্ধের। ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ গায়েনার প্রগতিশীল সরকারের উচ্ছেদ এবং গত বৎসর কিউবায় মার্কিন বোম্বেটে আক্রমণ 'কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র'-র পক্ষ থেকে মহাধনিকদের সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষায় যে প্রয়াস, তারই দুটি খুব বড় নমুনা।

উপরে উল্লিখিত নানা কাজ ও ব্যবস্থাবলী একই নীতির রকমফের।

লক্ষ্য নির্দিষ্ট, অভিন্ন—মুনাফার উদ্দেশ্যে মূলধনের ব্যবহার। অর্থাৎ ধনিক-শ্রেণীর এবং বিশেষত ও মুখ্যত একচেটিয়া ধনকুবেরদের বিপুল সম্পত্তি ও স্বার্থ সংরক্ষণ। স্পষ্টতই একাজ যথেষ্ট দুরূহ ও জটিল। ধনিকশ্রেণীর ভিতরে রয়েছে নানা গোষ্ঠী ও স্তর ভেদ, তাদের মধ্যে রয়েছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আশু স্বার্থের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা পার্থক্য ও সংঘাত। এরকম অবস্থায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনে কখনো-কখনো ধনিকদের গোষ্ঠী ও অংশবিশেষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে, তার বিরুদ্ধে সমালোচনা ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবনে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ ও কার্যকলাপে, দেশের সকল স্তরের মানুষের প্রভাব ও ইচ্ছার তুলনায় ধনিকদের এবং প্রধানত একচেটিয়া ধনিকদের প্রভাব ও ইচ্ছাই চূড়ান্ত। রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ ও ব্যবস্থাবলীর এই প্রকৃতি ধনতন্ত্র বা একচেটিয়া ধনতন্ত্রের রূপান্তর তো সূচিত করেই না, বরং সূচিত করে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে একচেটিয়া ধনকুবেরদের ঘনিষ্ঠ গ্রন্থিবন্ধন এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ।

প্রসঙ্গক্রমে বলে নেওয়া প্রয়োজন, অর্থনৈতিক কার্যকলাপে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ যে ধনতন্ত্রের বিরোধী নয়, বরং তার সঙ্গে অনেক সময়ে সঙ্গতিপূর্ণ—একথার সাক্ষ্য শুধু সম্প্রতিকালের ঘটনাবলীতেই পাওয়া যায় তা নয়, একথার সাক্ষ্য ধনতান্ত্রিক বিকাশের অতীত ইতিহাসেও মেলে। নির্ভেজাল laissez faire বা অবাধ প্রতিযোগিতার সাক্ষাৎ একটা বিশেষ সময়ে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা মার্কিন দেশে মিলেছে ঠিকই। কিন্তু ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই জানা আছে, ধনতান্ত্রিক বিকাশের গোড়ার দিকে Mercantile Capital-এর প্রসার ঘটেছে সরাসরি রাষ্ট্রেরই পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনে। আর জার্মানী ও জাপানে ধনতন্ত্রের বিকাশ একেবারে গোড়া থেকেই রাষ্ট্রীয় উদ্যমে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষপুটে। অবশ্য তফাৎ আছে, সেকাল আর একালে অনেক তফাৎ। সেদিনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছিল উদীয়মান নবীন ধনিকশ্রেণীর বিকাশের প্রয়োজনে, আর আজকের হস্তক্ষেপ ঘটছে ধনতন্ত্রের শেষ দশায় কালে নেহাৎ আত্মরক্ষার তাগিদে। কিন্তু সে যাই হোক, আসল কথা হলো, অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের অংশ গ্রহণই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে পাল্টে কিংবা বাতিল করে দেয় না। কেননা রাষ্ট্রের ভূমিকা ও অবস্থান কোনো কালে কোনো দেশে কোনো ভাবেই ধনী ও নির্ধন, সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীনদের

সংঘর্ষের ঊর্ধ্বে নয়। রাষ্ট্র সব দেশে সব কালে সম্পত্তিবানদের, শাসকশ্রেণীর নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির উপায়, এবং বর্তমানকালে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধনিকদের, বিশেষত একচেটিয়া ধনিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি-কাঠামো সংরক্ষণের যন্ত্র।

গলব্রেথ ও অন্য অনেকে অবশ্য খুব জোর গলায় বলছেন, রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের সঙ্গে ধনিকশ্রেণীর সম্পর্ক ক্ষীণ। কিন্তু আইসেনহাওয়ারের শাসনকালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক ও প্রধান আমলাদের অনেকেই যে শিল্প-আর্থিক-বাণিজ্য জগতের শিরোমণিদের অতি ঘনিষ্ঠ ছিল বা অনেকে যে সরাসরি ঐ জগতের প্রতিনিধি ছিল তার বেশ কিছু নমুনা অধ্যাপক রাইট মিলস দিয়েছেন। 'ডেমোক্রাট' কেনেডির শাসন পরিষদেও দেখা যাচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রবার্ট ম্যাকনামারা ফোর্ড মোটর কোম্পানীর প্রাক্তন সভাপতি, অর্থমন্ত্রী ডগলাস ডিলন একটি বৃহৎ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সভাপতি, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডীন রাস্ক রকফেলার ফাউনডেশানের প্রাক্তন সভাপতি। অর্থাৎ প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও অর্থ—এই তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের নীতিনির্ধারণের চাবিকাঠিটি শুধু ধনিকশ্রেণীর নয়, একেবারে শীর্ষস্থানীয় একচেটিয়াপতিদের প্রতিনিধিদের দখলে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সম্পত্তিবানদের এরকম সরাসরি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আরও বহু নমুনাই দেওয়া যায়।

প্রশ্ন হতে পারে: রাষ্ট্র যদি বাস্তবিকই সম্পত্তিবানদের শ্রেণীগত স্বার্থ-সিদ্ধির উপায়মাত্র হয়, তবে কেমন করে সম্পত্তিবানদের, এমন কি একচেটিয়া ধনকুবেরদের অধিকার ও স্বার্থকে সঙ্কুচিত করে আইন গৃহীত হয়, কেমন করেই বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শ্রমিক কল্যাণমূলক নানা ব্যবস্থাদি প্রবর্তিত হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন নয়। সম্পত্তিবানদের বিরুদ্ধে সম্পত্তিহীনদের সপক্ষে আইন ও ব্যবস্থাদি গৃহীত হয় শেষোক্তদের আন্দোলন ও সংগ্রামের চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে, তাদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য, 'আইন ও শৃঙ্খলা'র স্রেফে পড়াকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনে। কিন্তু যে ধরণের আইন ও ব্যবস্থাদি গৃহীত হোক না কেন, তা গৃহীত হয় প্রচলিত সম্পত্তি-কাঠামো অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চৌহদ্দির ভিতর।

ধনতান্ত্রিক সম্পত্তি-সম্পর্কের পরিবর্তন এই সব আইন-কানুনের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনমতো কিছু কনসেশান দিয়ে এই সম্পত্তি-সম্পর্ককে

অক্ষুণ্ণ রাখা। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও ধনিকশ্রেণীর কার্যকলাপ, 'বিপদ উপস্থিত হলে পণ্ডিতেরা অর্ধেক ত্যাগ করেন'—এই আপ্তবাক্য প্রয়োগের নমুনাবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা অন্যান্য অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে সম্পত্তিবানদের অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে কম আইন-কানুন তো গৃহীত হয় নি। কিন্তু তার ফলে ধনিকেরা তাদের সম্পত্তির উপর মালিকানা ও কর্তৃত্বের অধিকার হারায় নি, সমাজ ও অর্থ-নীতিতে শ্রমিকদের অবস্থানেরও কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। এক-শ বছর ধরে সম্পত্তি-সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রয়েছে অব্যাহত—একথা এই প্রবন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে।

ধনতন্ত্রের মূলগত অসঙ্গতি

পরিণতিতে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলগত অসঙ্গতিও অপরিবর্তিত। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজে একক, বিচ্ছিন্ন উৎপাদক—কারিগর, কৃষক ইত্যাদি উৎপাদন করত নিজের হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি নিয়ে নিজের বাড়িতে বসে। কিন্তু ধনতন্ত্রের কল্যাণে উৎপাদন প্রক্রিয়ার এই একক, বিচ্ছিন্ন রূপটি পাল্টে গিয়ে হলো সামাজিক ও সহযোগিতামূলক। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন হলো একই সময়ে, একই সঙ্গে বহু মানুষের, হাজার হাজার শ্রমিকের মিলিত সামাজিক শ্রমের ফসল। কিন্তু হলে কি হবে? নিজেদের শ্রমের ফসলে উৎপাদকের নেই কোনো অধিকার—সে অধিকার ষোল-আনা রয়েছে ধনিকের। অর্থাৎ কারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদির মালিকের। আশ্চর্য মনে হতে পারে—কিন্তু এটাই বাস্তব যে, একদিকে, উৎপাদন প্রক্রিয়া সামাজিক ও সহযোগিতামূলক, অন্যদিকে, উৎপন্ন পণ্যের মালিকানা বা অধিকার ব্যক্তিগত—সম্পত্তিবানেরা ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করছে বহু উৎপাদকের সহযোগিতা ও সমবেত শ্রমের ফল। মার্কস-এঙ্গেলস দেখিয়ে-ছিলেন, এই বাস্তবটিই হলো ধনতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতির বুনিয়াদী বিরোধ বা মূলগত অসঙ্গতি এবং এই বিরোধের সমাধান আজও ঘটে নি।

ধনতন্ত্রের এই মৌলিক অসঙ্গতি, এই দুঃসমাধেয় অন্তর্বিরোধের লক্ষণ ও প্রকাশ বহুবিধ। জনসাধারণের দারিদ্র্য ও দুর্দশা, অর্থনৈতিক সংকট, মূল্যবান মানবিক ও বস্তুগত সম্পদের অপচয়, যুদ্ধ—এসবই অর্থনৈতিক উপরোক্ত মূল ব্যাধির নানা প্রকাশ ও লক্ষণ। এ প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই

দেখানো হয়েছে, অর্থনৈতিক দারিদ্র্য ও দুর্গতি এখনো সব থেকে সমৃদ্ধ ও উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেরও মর্মান্তিক বাস্তবতা। কিন্তু শুধু তা নয়, রোগের অন্যান্য লক্ষণগুলিও আগের থেকে বেশি ব্যাপক ও গভীর।

সংকটমুক্ত-ধনতন্ত্র

এই লক্ষণগুলির কোনো কোনোটার তীব্রতা হ্রাসের জন্য, বিশেষত অর্থনৈতিক মন্দায় প্রতিবিধানের জন্য বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনেতাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার অবধি নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধির ফলে এ ধারণার সৃষ্টিও হয়েছে—অর্থনৈতিক মন্দা ও সংকট এড়ানোর গোপন রহস্যটি সমসাময়িক ধনতন্ত্রের কাছে আর অজানা নেই। বস্তুতপক্ষে সে দাবিই করা হয়েছে নব্যধনতন্ত্রের তত্ত্বজ্ঞদের পক্ষ থেকে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? ১৯৪৫ সালে যুদ্ধশেষের পর কেটে গেছে ১৬ বছর, ১৯২৯-এর Great Depression-এর পর তিরিশ বছরের বেশি। গত ১৬ বছরে মার্কিন অর্থনীতিতে, বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের ভাষায়, মৃদু অর্থ-নৈতিক অবনতি বা recession, কিংবা সহজ সরল ভাষায়—অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ থেকে সঙ্কোচন দেখা দিয়েছে চারবার—১৯৪৯, ১৯৫৩, ১৯৫৭ ও ১৯৬০-এ। আর এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, সংকটমুক্ত ধনতন্ত্রের কথা নেহাতই গালভরা প্রচার।

কিন্তু অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন অর্থাৎ বাণিজ্য চক্রের উদ্বর্তনের উপরোক্ত তথ্যটি ভিন্ন উদ্বর্তনের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, যুদ্ধোত্তর কালের প্রথম তিনটি বাণিজ্য চক্রের ঊর্ধ্বগতি বা upswing-এর স্থিতিকাল ছিল যথাক্রমে ৩৭, ৪২ ও ৩৯ মাস বা গড়পড়তা হিসেবে ৩৯⅓ মাস। আর সর্বশেষ বাণিজ্য চক্রের ঊর্ধ্বগতির স্থিতিকাল ছিল ১৯৫৮-র এপ্রিল থেকে ১৯৬০-এর মে পর্যন্ত ২৫ মাস অর্থাৎ গড়পড়তা স্থিতিকালের দুই-তৃতীয়াংশেরও কম।

বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধি পর্যায়ের দৈর্ঘ্যের এই দ্রুত হ্রাস তাৎপর্যপূর্ণ। পল স্যুইজি, লিও হুবারম্যান প্রমুখ বিশিষ্ট মার্কিন অর্থনীতিবিদদের অভিমত হলো—যুদ্ধোত্তরকালে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের অনুকূলে কতকগুলি বিশেষ উপাদান সক্রিয় ছিল; কিন্তু সেগুলির প্রভাব যে ক্রমশ দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে আসছে, সমৃদ্ধিকালের হ্রাস তারই নিশ্চিত ইঙ্গিত।[৫৫]

দ্বিতীয়ত : গত ১৬ বছরে ক্রমশ বেশি বেশি কর্মহীন ও কর্মসন্ধানী নাম লেখাচ্ছে বেকারদের পল্টনে—অর্থনৈতিক সঙ্কোচনের সময়ে তো বটেই, এমন কি সম্প্রসারণের সময়েও।[৭৭] সবিশেষ তিনটি বাণিজ্য চক্রের ঊর্ধ্বগতির সর্বোচ্চ শিখর ১৯৫৩, ১৯৫৭ ও ১৯৬০-এ বেসামরিক শ্রমিকসমষ্টিতে বেকারের অনুপাত ছিল যথাক্রমে ২.৯, ৪.৩ ও ৪.৯ শতাংশ। নিম্নগতির সর্বনিম্ন তলদেশে [bottom of the downswing] এই অনুপাত স্বভাবতই আরও অনেক বেশি। সরকারী হিসেব অনুসারে ১৯৬১-র প্রথম ভাগে মার্কিন দেশের অন্তত অর্ধেক শিল্পাঞ্চলে, ঐ অঞ্চলগুলির শ্রমিকসমষ্টিতে বেকারের অনুপাত ছিল ৬ শতাংশেরও বেশি—সরকারীভাবেই ঐ অঞ্চলগুলিকে ঘোষণা করা হয়েছে 'দুর্দশাগ্রস্ত' বা 'distressed' বলে। ঐ বছরের ফেব্রুয়ারিতে দেশে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫৭ লাখে। এবং এই হিসেবগুলিতে বেকারের সংখ্যা ও অনুপাত বাস্তবের থেকে অনেক কম করে দেখানো হয়েছে একথাই অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন।

তৃতীয়ত : অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা, অব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ভারে মার্কিন অর্থনীতি টলোমলো। ১৯২৯-এ মার্কিন দেশের মোট উৎপাদন ক্ষমতার ২০ শতাংশই ছিল অব্যবহৃত। ৩২ বছর পরেও এ অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটে নি। ইস্পাত, এ্যালুমিনিয়াম, খনিজ তেল ইত্যাদি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পেই পুরো উৎপাদনক্ষমতাকে ঊর্ধ্বগতির সর্বোচ্চ শিখরেও কাজে লাগানো হচ্ছে না। অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে তো কথাই নেই—১৯৬১-র হিসেবে দেখা যায়, সমস্ত শিল্পের মোট উৎপাদনক্ষমতার ৭৯ শতাংশকে কাজে লাগানো হচ্ছিল, বাকি ২১ শতাংশ উৎপাদনক্ষমতা ছিল অব্যবহৃত।[৭৮]

অর্থনৈতিক অচলাবস্থা

এখানে অবশ্য সমস্ত আলোচনাই করা হলো মার্কিন অর্থনীতি প্রসঙ্গে। কিন্তু এ আলোচনা মোটামুটি ভাবে গোটা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য এবং সে অর্থনীতি সম্পর্কে দুটি বিষয় খুবই পরিষ্কার।

এক : বুর্জোয়া তত্ত্ববাদীরা যতই বলুন না কেন, মার্কিন তথা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি মোটেই উন্নয়নশীল বা ক্রমবৃদ্ধিমূলক অর্থনীতি নয়। একথা অস্বীকার করার প্রশ্ন আসে না যে, যুদ্ধোত্তরকালীন বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ কতকগুলি কারণ অর্থনৈতিক সম্প্রসারণকে যুদ্ধপূর্ব কালের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী

করে তুলেছিল এবং এখনো সে কারণগুলি কিছু পরিমাণে সক্রিয়। সে কারণগুলি দ্বারা বাণিজ্য চক্রের গতি-প্রকৃতি প্রভাবিত হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু সে কারণগুলি ও তাদের প্রভাব এখানে আলোচনার বিষয় নয়। এখানে যেটুকু বলা প্রয়োজন তা হলো, সে কারণগুলি নেহাতই সাময়িক—বিশেষ পরিস্থিতি-প্রসূত। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে কারণগুলির প্রভাব ক্ষীণ হয়ে এসেছে—একথা মনে করার ভিত্তি যে রয়েছে তা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এর থেকে একথা মনে করে নিলে ভুল হবে যে, এখুনি এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকের অনুরূপ ব্যাপক ও তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা দেখা যেবে। নিকট ভবিষ্যতে তেমন কোনো সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু এটা নিশ্চিত ও যা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে, সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক ও বিশেষত মার্কিন অর্থনীতির সর্বদেহে গভীর stagnation বা অচলাবস্থার লক্ষণগুলি অতি প্রকট—তীব্র ভাবেই প্রকট।

অপচয় ও অপব্যবহার

দুই: মার্কিন তথা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি তর্কাতীত অর্থে অপচয় ও অপব্যবহার-মূলক। শুধু নিম্নগতির সময়ে নয়, ঊর্ধ্বগতির সময়েও মানবিক ও বস্তুগত সম্পদের অপচয় বিপুল। এবং যে অপচয় ও অপব্যবহার কেবলমাত্র বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি কিংবা উৎপাদনক্ষমতার অপব্যবহারেই সীমাবদ্ধ নয়। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিযুক্ত রয়েছে সমাজ ও ব্যক্তির প্রকৃত প্রয়োজন-মাফিক উৎপাদনের কাজে নয়, তারা রয়েছে দৈত্যাকার কারবারগুলির বিজ্ঞাপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেলসম্যানশিপ, জনসংযোগ রক্ষা, ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার কৌশল উদ্ভাবন, শেয়ার বাজারে দালালী, ফাটকাবাজি, পরমাশ্চর্য সব বিলাস-সামগ্রীর উৎপাদনাদির কাজে। এদের শ্রম, বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি, মেধা—সবই অনুৎপাদক কাজে, অনেক ক্ষেত্রে সমাজবিরোধী কিন্তু আইনসঙ্গত কাজে অপব্যবহৃত ও অপচয়িত।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এই অপচয়ের সবচেয়ে বড় নমুনা—যুদ্ধ।

যুদ্ধ নিয়ে আসে লক্ষ লক্ষ নরনারীর বিপুল বিপর্যয়; আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন—সবই হয়ে যায় তছনছ; কত বাসগৃহ, স্কুল-কলেজ, হাঁসপাতাল, মিউজিয়ম, কারখানাবাড়ি, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কৃষিক্ষেত পরিণত হয় ধ্বংস-

স্তূপে। বাস্তব ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব হয়তো করা যায়। কিন্তু অগণ্য মানুষের চোখের জল আর বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস, প্রিয়জন হারানোর বেদনা আর আশাভঙ্গের যন্ত্রণার পরিমাপ করবে কে ?

তথাপি যুদ্ধ হয়। কেননা তাতে রয়েছে ধনতন্ত্রের স্বার্থ। যুদ্ধকালের বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্ভবপর হয় লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান, বিরাট বাড়তি উৎপাদনক্ষমতার পুরোপুরি ব্যবহার। তদুপরি মারণাস্ত্রের উৎপাদন ও মৃত্যুর ব্যবসায়ে মুনাফা প্রচুর।

তাই লোকায়ত ধনতন্ত্রের আমলেও চলছে অর্থনীতির সামরিকীকরণ, মারণাস্ত্রের উৎপাদন, নিউক্লীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি। এই একান্ত স্থূল মুনাফা-সর্বস্বতাই সমগ্র মানবজাতি ও সভ্যতাকে নিয়ে এসেছে সর্বাত্মক মৃত্যু ও ধ্বংসের ভয়ঙ্কর কিনারায়। এই রণসজ্জা বাবদ শুধু ব্রিটেনেই বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ ১,৫০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। মার্কিন দেশে তো এই ব্যয়ের বহর আরও অনেক বেশি।

মার্কস-এঙ্গেলস ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে সিদ্ধান্ত করেছিলেন : "The conditions of bourgeois society are too narrow to comprise the wealth created by them. And how does the bourgeoisie get over these crises ? On the one hand by enforced destruction of a mass of productive forces ; on the other, by the conquest of new markets, and by the more thorough exploitation of the old ones. That is to say, by paving the way for more extensive and more destructive crises and by diminishing the means whereby the crises are prevented." মার্কসের এই বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্পর্কে তর্কের যে কোনো অবকাশই নেই তা উপরের আলোচনা থেকেই সুস্পষ্ট। গত এক-শ বছরে উৎপাদনীশক্তি, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিভার অভাবিত উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু উৎপাদনী শক্তির এই বিপুল বিকাশকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চৌহদ্দিতে একেবারেই অসম্ভব তারই নিদর্শন বেকার পল্টনের সংখ্যা কিংবা বাড়তি উৎপাদনক্ষমতার বোঝা বৃদ্ধি অথবা যুদ্ধের মারফৎ উৎপাদনী শক্তির বর্বর অপচয়।

মনে রাখা দরকার, একদিকে যখন ঘটছে মূল্যবান মানবিক ও বস্তুগত সম্পদের এই নানাবিধ অপচয় ও অপব্যবহার, অর্থাৎ "enforced destruction", ঠিক তখনই অন্যদিকে গোটা ধনতান্ত্রিকজগৎ জুড়ে—এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায়, স্পেন-পর্তুগাল-দক্ষিণ ইতালি-গ্রীসে, এমন কি অতুলনীয় বৈভবের দেশ কিংবা 'কল্যাণ রাষ্ট্র' খাস মার্কিন মুলুকে রয়েছে ভালোভাবে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের অর্থাৎ উপযুক্ত খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়ের অভাব, রোগে ওষুধ ও চিকিৎসার অভাব, অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাদির অভাব। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কাছে নিছক অস্তিত্ব রক্ষাটা তিক্ত বিড়ম্বনা ভিন্ন আর কিছু নয়। বেন্থামের সেই প্রসিদ্ধ উক্তিকে একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, এখানকার বাস্তবতা হলো : greatest unhappiness of the greatest number.

যে কোনও ন্যায্য, মানবিক সমাজ ও অর্থনীতিতে এটাই কি স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত নয় যে—শিল্পের অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা, কর্মহীন ও কর্মসন্ধানী মানুষদের বৃদ্ধি এবং শ্রমশক্তি, যুদ্ধসজ্জা বাবদ বিশাল ব্যয়, নানা ভাবে অপচয়িত ও অপব্যবহৃত সম্পদাদি পুরোপুরি ব্যবহার করা হবে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কাজে লাগানো হবে প্রকৃত প্রয়োজনানুগ দ্রব্যের অর্থাৎ আহার্য পানীয়-পরিচ্ছদ-আশ্রয়ের উৎপাদনে, শিক্ষা-সংস্কৃতি-চিকিৎসার জন্য দরকারী উপকরণ-সমূহের উৎপাদনে কিংবা বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্রাসে, শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী ও বেতন বৃদ্ধিতে, কাঁচামালের উৎপাদন অর্থাৎ কৃষকদের পণ্যের ন্যায্য মূল্যের নিশ্চয়তাদানে অথবা অর্থোন্নত অঞ্চলগুলির দারিদ্র্য ও দুর্দশার শোকাবহ রূপটির দূরীকরণ অভিযানে? ধনতান্ত্রিকজগৎ-জোড়া এই শোচনীয় দুর্গতির পটভূমিতে 'প্রগতিশীল ধনতন্ত্র'-এ ঘটছে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত।

শ্রেণী-সংঘাতের বাস্তবতা

এই বন্দোবস্তে আসলে উপরোক্ত ব্যবস্থা অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক। কেননা অর্থ, আরও অর্থের জন্য সীমাহীন, অন্তহীন লালসাই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রথম ও শেষ কথা। কৃষিপণ্যের উৎপাদকদের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত করে, শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী হ্রাস করে কিংবা মজুরীর বৃদ্ধি স্থগিত রেখে, ক্রেতাসাধারণের পকেট কেটে অর্থাৎ নানা কায়দায়

শোষণের তীব্রতাকে বাড়িয়ে তুলে, অর্ধোন্নত দেশগুলির জনসাধারণ ও সম্পদকে লুণ্ঠন করে, কোটি কোটি মানুষকে রক্ত ও মৃত্যুর তাণ্ডবে জড়িয়ে ফেলেই একচেটিয়াপতি তথা ধনিকশ্রেণীর সমৃদ্ধি—সংকট মোচনেরও উপায়।

কিন্তু এখানেই রয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনীতির অবলুপ্তির বীজ। স্বাভাবিকভাবেই ধনিকশ্রেণীর এই স্থূল, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সঙ্গে বিরোধ ও সংঘাত সমাজের অন্যান্য সকল শ্রেণীর, এবং বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর। পরিণামে ধনতান্ত্রিকসমাজ শ্রেণী-বিরোধে বিদীর্ণ, শ্রেণী-স্বার্থের সংঘাতে আলোড়িত। সে সংঘাত কখনো প্রকাশ্য, কখনো বা প্রচ্ছন্ন—কোথাও তীব্র, আবার অন্য কোথাও মৃদু। পশ্চিম জার্মানী থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কিউবা থেকে লাওস পর্যন্ত সর্বত্রই এই সংঘাত অনবরত, অবিরাম। একদিকে, মার্কিন দেশে ইস্পাত শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট, পশ্চিম জার্মানীতে শ্রমিক অসন্তোষ, ফরাসী দেশে দ গলের personal power-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ইতালিতে ফ্যাসিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে আন্দোলন, জাপানে বা ব্রিটেনে পারমাণবিক পরীক্ষাবিরোধী কর্মতৎপরতা, ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সাধারণ ধর্মঘট, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আফ্রিকার জাগরণ, ল্যাটিন আমেরিকার সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য আলোড়ন, সাধারণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ এবং শান্তির জন্য বিশ্বব্যাপী মহৎ প্রয়াস—অন্যদিকে স্পেনে পর্তুগালে ফ্যাসিস্ত শাসন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টিকে কার্যত বেআইনীকরণ, কঙ্গোর সাম্রাজ্যবাদীদের নানা কুকীর্তি—এসবই দেশ ও পাত্রবিশেষে মার্কস-এঙ্গেলস কথিত শ্রেণী-সংগ্রামের বিভিন্ন ও বিশেষ রূপ।

শ্রেণী-সমন্বয়ের কথা বলে, 'লোকায়ত ধনতন্ত্র'-র মস্ত-বড় আওয়াজটি দিয়ে কিংবা রঙীন কথার জাল বুনে এই তীব্র সংঘাতের বাস্তব সত্যটিকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলগত বিরোধে—সামাজিক উৎপাদন এবং ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার বিরোধে এই শ্রেণী-সংঘাতের ভিত্তি নিহিত।

সমাজে সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীনের, ধনিক ও শ্রমিকের এই যে সংঘাত-তার দূরীকরণ ঘটতে পারে একমাত্র এই সংঘাতের মূলকে উচ্ছেদ করে। এই অবস্থায় একটিমাত্র সমাধানই সম্ভবপর—সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার

পাশাপাশি মালিকানা বন্দোবস্তের সমাজীকরণ। এর অর্থ—বহুজনের মিলিত শ্রমভিত্তিক যে উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্তমান, তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মালিকানা সম্পর্কের সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনসাধন ; উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর—জমি, খনি, কারখানা ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ; পরিবর্তে জনসাধারণের সামাজিক মালিকানার প্রবর্তন। এবং এটাই হলো সমাজতন্ত্র। মার্কস-এঙ্গেলস এই পথের কথাই বলেছেন।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ মানবজাতি ও সভ্যতার জীবনে এক পরম সন্ধিলগ্ন। জীবনের প্রাচুর্য, না মৃত্যুর অন্ধকার : এই হলো আজকের মৌলিক জিজ্ঞাসা। নিঃসংশয়েই এ জিজ্ঞাসার উত্তর : জীবনের প্রাচুর্য। এবং সমাজতন্ত্রই সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একমাত্র পথ। ১৯১৭ সালের পরবর্তী ৮৫ বছরের ইতিহাসে একথার সত্যতা তর্কাতীত।

মার্কস-এঙ্গেলস-এর কি কি বিশ্লেষণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে, কোন কোন ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা যদি সে তালিকা তৈরি করতে চান, তা তাঁরা নিশ্চয়ই করতে পারেন। কিন্তু ধনিক-শ্রমিক সংঘাতের ক্রমবিস্তার, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলগত অসঙ্গতি, সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় ও বিজয়অভিযান সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস-এর বিশ্লেষণের অভ্রান্ততার অগণতি প্রমাণ যেকোনো চক্ষুষ্মান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছেই ধরা পড়বে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১ C. A. R. Crossland—Future of Socialism [পৃঃ ২১]

২ A. A. Berle—The 20th Century Capitalist Revolution

৩ J. K. Galbraith—The Affluent Society

৪ Crossland—ঐ

৫ John Strachey—Contemporary Capitalism

৬ James Burnham—The Managerial Revolution

৭ Leo Huberman—'The Distribution of Income' : Monthly Review [July-August 1959]

৮ ঐ

৯ Galbraith—ঐ

১০ Maurice Dobb—Capitalism Yesterday and Today [পৃ: ১১—১২]

১১ Victor Perlo—'People's Capitalism and Stock Ownership': American Economic Review [June 1958]

১২ V. Perlo—Empire of High Finance [পৃ: ৩৬—৩৮]

১৩ C. Wright Mills—The Power Elite [পৃ: ১২১]

১৪ Perlo—ঐ

১৫ F. C. Mills—Economic Tendencies in the United States [পৃ: ৩০০- থেকে Science and Society, Summer 1961-তে উদ্ধৃত]

১৬ Perlo—ঐ [পৃ: ২১]

১৭ Berle—ঐ [পৃ: ২৫—২৬]

১৮ Science and Society [Summer 1961, পৃ: ২৬২]

১৯ J. Strachey—'Marxism Reinstated' [New Statesman and Nation থেকে Paul Baran-এর 'Political Economy of Growth', [পৃ: ৬২-তে উদ্ধৃত]

২০ Dobb—ঐ [পৃ: ৬২]

২১ Paul Baran—ঐ [পৃ: ৮৩]

২২ Paul Sweezy—The Present as History [পৃ: ৩৯—৬৬]

২৩ Sargant Florence—The Logic of British and American Industry, [পৃ: ১৯৩]

২৪, ২৫, ২৬ 'The Economics of Insanity' : Monthly Review [January 61]

রক্তকরবীর পাপড়িগুলি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা ব্যাপার রবীন্দ্র-রসানুধ্যায়ীরা সবাই লক্ষ্য করে থাকেন। ব্যাপারটা এই যে তিনি একাধিকবার একই প্রসঙ্গ নিয়ে প্রকরণগত নবীনতর প্রয়াস করেছেন। 'শ্যামা', 'রাজা ও রাণী' প্রভৃতিপ্রসঙ্গ একেত্রে স্মরণীয়। প্রসঙ্গ-গুলিকে ঠিকমতো প্রকরণসাৎ করার জন্যই যে এই প্রয়াস সেকথা আংশিক সত্য—প্রকরণের আলোকে বিষয়গুলিকে গভীর মূল পর্যন্ত আলোকিত করাই একেত্রে ছিল শিল্পীর নিগূঢ় অভিপ্রায়। 'শ্যামা'র কাব্য-কাহিনীর রূপ আর তার নৃত্য-গীতিনাট্যময় রূপের পার্থক্যে কেবল প্রকরণগত পার্থক্যই নয়, রসাবদানের পার্থক্যও লক্ষণীয়। কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এমন একখানি সৃষ্টির সাক্ষাৎ পাচ্ছি যেখানিতে কবির দীর্ঘ শিল্পীজীবনে পরিবেশিত বিভিন্ন প্রসঙ্গই একত্র সমাবেশিত হয়ে এক রসসিদ্ধি লাভ করেছে—অবশ্যই সে রসসিদ্ধির প্রত্যক্ষ মূলে রয়েছে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। 'রক্তকরবী' সেই গ্রন্থ। পশ্চিমী ধনতন্ত্রের বিকারের মধ্যে কয়েকমাস অতিবাহিত করে কবি যে মানসিক প্রতিঘাতের মধ্যে পড়েছিলেন তা-ই 'রক্তকরবী' রচনায় প্রত্যক্ষ প্রেরণা। আর সেই প্রেরণার টানে কবির দীর্ঘ শিল্পীজীবনের বহু অভিজ্ঞতা, বহু প্রসঙ্গ একত্র সংহত হলো। এ শুধু একই প্রসঙ্গের পূর্বোক্ত রূপান্তরসাধন ও রসের গভীরায়ন নয়। এ হলো বহু-প্রসঙ্গের সমন্বয়ে ভিন্ন রসসৃজন—যে প্রসঙ্গগুলি তিনিই ছড়িয়ে রেখেছিলেন তাঁর সৃষ্টির বিচিত্রপথের নানা প্রান্তে। তাই 'রক্তকরবী'র, রবীন্দ্রনাথের সমগ্রের প্রতিনিধি হবার স্পর্ধা সর্বাপেক্ষা বেশি।

যেসব উপাদান-সমূহের সমাবেশে 'রক্তকরবী'র কথাবস্তুর মূল আকর্ষণ সৃজিত হয়েছে, এবং 'রক্তকরবী'র আত্মা যেসব প্রসঙ্গকে নিজ আলোকে বিভাষিত করে তুলেছে, পৃথকভাবে দেখতে গেলে সেগুলি সবই পুরাতনপ্রসঙ্গ বলে প্রতিভাত হবে। আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনায় প্রথমে প্রসঙ্গ-গুলির পুরাতনত্ব নিয়ে বিচার করব। পরিশেষে কোন ভাবনাগত কার্যকারণের

সংযোগে এরা 'রক্তকরবী'র আলোকে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে তার কথাও আলোচনা করব।

যে সমস্ত উপাদানের জন্য 'রক্তকরবী'র গল্পে একটা রূপকোত্তর টান বিদ্যমান সেগুলি এই :

[ক] জগৎ বিচ্ছিন্নতা ও তজ্জনিত যন্ত্রণা।
[খ] অন্ধকারের রাজা।
[গ] মহাপ্রতীক্ষা।
[ঘ] কিশোর-প্রেম।
[ঙ] ধ্বংস বা ভাঙন বা উচ্চণ্ড শক্তির পতন।

এই সমস্ত প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের প্রিয়-প্রসঙ্গগুলির অন্যতম। তাঁর সারাজীবনে নানাভাবে এই প্রসঙ্গগুলির পৃথক পৃথক পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই প্রসঙ্গগুলিকে কেমনভাবে ব্যবহার করতে হয়, অনুভূতির কোন স্তরে তারা কী জাতীয় বেদনা সঞ্চার করে, কেমন করে করে, রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তাই 'রক্তকরবী'র রসলোক নির্মাণে এদেরই ডাক পড়েছে জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে।

দুই

জগৎ-বিচ্ছিন্নতা ও তদ্ভূত দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনে প্রথম প্রকাশ্যে দেখা দেয় তাঁর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' কাব্যনাট্যে। অন্ধকার গুহায় অলৌকিক শক্তির সন্ধানী সন্ন্যাসীর স্বেচ্ছানির্বাসন এবং বালিকার সংস্পর্শে সেই জগৎ বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর মূল বিষয়। বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণার বিষয়টি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো বিচ্ছিন্নতার বোধ বা নৈঃসঙ্গ্যের বেদনা নায়কেরা অনুভব করেছে কোনো একটি চরিত্রের সংস্পর্শে এসে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'রক্তকরবী'তে এই নৈঃসঙ্গ্যবোধের উদ্দীপক চরিত্র দুটি হলো নারী। বালিকা এবং নন্দিনী। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এও দেখা যায় জগৎ-বিমুখ, গুহান্ধকারবাসী সন্ন্যাসীর নীরস নিষ্প্রাণতার পটভূমিতে কৃষকদের গোষ্ঠে যাবার গান ধ্বনিত হচ্ছে। 'রক্তকরবী'তেও পৌষের ফসল-কাটার গান যক্ষপুরীর অন্ধকার নিষ্প্রাণতায় মাঝে মাঝে শোনা গেছে। দুটি নাটকেই বিচ্ছিন্নতার মূল দেখানো হয়েছে একই জায়গায়। মানুষ

আপনার প্রাপ্যের সীমাকে ছাড়িয়ে কোনো একটা বাসনাকে উদগ্র করে তোলে। সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে যেটা তত্ত্ববাসনা, কারো কারো কাছে সেটা ধনবাসনা, স্বর্ণ বাসনা। ধনবাদী সভ্যতার সঞ্চয়লোভী মানুষ ক্রমশই নিজের চারপাশে একটা কারাগার রচনা করে। তার লোভ শুধু তাকেই বন্দী করে না, যারা যারা তার লোভের সঙ্গে কোনো না কোনো প্রকারে সংশ্লিষ্ট সে তাদেরও বন্দী করে। অনিয়ন্ত্রিত বাসনা নিজেই লৌহপ্রাচীর হয়ে ওঠে। পরিশেষে মানুষের হয়তো চৈতন্য হয়। তখনই জন্মলাভ করে জগৎ-বিচ্ছিন্নতা-বোধ, তখনই প্রয়াস জাগে আবার বিশ্বস্রোতের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। অস্বাভাবিকতাই অসুন্দর। তাই অস্বাভাবিকতা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করে সব থেকে বেশি। উদগ্র বাসনার বশবর্তী মানুষ ধরিত্রীর সকল স্বাভাবিকতার কাছ থেকে হাত ছিনিয়ে (গুহাভ্যন্তরে কিংবা) ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হচ্ছে শুধু চূড়ান্ত ব্যর্থতাকে বরণ করার জন্যই একথা রবীন্দ্রনাথ 'স্বর্ণমৃগ' গল্পেও বলেছেন। তবে এই বক্তব্য সেখানে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট। গল্পের নায়ক আদ্যনাথকেই প্রধান করে তুলতে গিয়েছেন বলে গল্পটি গল্পার্থে চরিত্র-প্রধান। বক্তব্যকে রূপকান্বিত করার জন্য সেখানে কোনো প্রয়াস ছিল না। কিন্তু উদগ্র বাসনাই মানুষকে জগৎ-বিচ্ছিন্ন করে, এ ধারণা কাশীর বাড়িতে আদ্যনাথের অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমর্থিত হচ্ছে।

'গুপ্তধন' গল্পে ব্যাপারটি অধিকতর বক্তব্যগত স্পষ্টতা লাভ করেছে। ভূগর্ভে প্রোথিত গুপ্তধনের জন্য মৃত্যুঞ্জয়ের ঐকান্তিক বাসনা তাকে সহজ স্বাভাবিক সংসারজীবন থেকে দূরে নিয়ে গেল। এমন কি ভূগর্ভের অন্ধকারে রাশীকৃত স্বর্ণসম্পদের সন্ধানও সে পেল। এবং সেই স্বর্ণসম্পদের মাঝখানেই সে বন্দী হলো। সেই স্তূপীভূত স্বর্ণরাশির সোনালি মরুভূমিতেই মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে জাগ্রত হলো জগৎ-বিরহবোধ। 'গুপ্তধন'-গল্পপাঠক মাত্রেই জানেন কী কৌশলে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুঞ্জয়ের স্মৃতিলোককে উদ্ভাসিত করে, তার তৎকালীন জগৎ-বিরহবোধের তীব্রতাকে রূপায়িত করেছেন। মনে হয় রবীন্দ্রনাথ এই ভূগর্ভের রাজত্বে স্বর্ণপ্রহরী মানুষের কথা কল্পনা করেছেন আমাদের দেশেরই প্রচলিত কিংবদন্তীর কথা স্মরণ করে। কারো সারাজীবনের কার্পণ্যের সঞ্চয় মৃত্যুর পরেও পাহারা দেবার দরকার হলে একজনকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে নাকি মন্ত্রপূত অবস্থায় মেরে ফেলা হতো। সে হতো যক্ষ। 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে জীবন্ত শিশুকে যক্ষে পরিণত করার বিবরণ রয়েছে। সেখানেও ভূগর্ভের

অন্ধকারে বিলীন হবার প্রাক্‌মুহূর্তে শিশুটির ধরিত্রীর স্বাভাবিক জীবনের প্রতি লোভই ফিরে এসেছে।

অস্বাভাবিকের সন্ধানে মানুষের এই কীটানুগমন জীবনস্রোতের বিপরীতাচরণ। সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ যে একাধিকবার এই প্রসঙ্গ চিন্তা করেছেন তার প্রমাণ আমরা দিলাম। আমেরিকা ভ্রমণের কালে কবির তৎকালীন আমেরিকার অভিজ্ঞতাও কবিমানসে অনুরূপ প্রসঙ্গের স্মৃতিকেই ফিরিয়ে এনেছে। তাই যে কথা তিনি বলছেন 'শিশু ভোলানাথ' রচনার পূর্বসূত্র হিসেবে, সে কথার ভেতরেই ধরা পড়ছে 'রক্তকরবী'র পূর্বাভাস। 'রক্তকরবী'র মূল কল্পনার যেটি বীজস্বরূপ তা যে তখনই কবিকে ক্ষণে ক্ষণে অধিকার করেছিল স্মৃতিকথায় তা স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান। আধুনিক সভ্যতার যে সমস্যা নানাভাবে সারাজীবনই তিনি অনুভব করেছেন সেটা অনেকটা সঠিকমূর্তি পরিগ্রহ করল পশ্চিমী ধনতন্ত্রের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে। 'শিশু ভোলানাথ'-সংক্রান্ত চিঠির পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর তৎকালীন আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে নিজ অনুভূতিকে এই ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

> "In this country I live in the dungeon of the Castle of Bigness. My heart is starved everyday. Here I feel everyday what a terrible nightmare it is for the human soul to bear this burden of monster Arithmatic."

Dungeon শব্দটির মধ্যেও সেই অন্ধ ভূগর্ভের বন্দীশালার চিন্তা প্রকট। এর পরে স্মৃতি হিসাবে উদ্ধার করে বলছেন :

> "কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদগারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তু সঞ্চয়ের অন্ধ ভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষ বাষ্পে শ্বাসরুদ্ধ প্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেওয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ওই পথিকের সহচর। ...দেওয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্য এত বড় আকাশের ফাঁকটাই দরকার।"

রবীন্দ্রনাথ এই শেষের কথাগুলো বলেছেন 'শিশু ভোলানাথ' রচনার পূর্বকথা হিসাবে। কিন্তু 'শিশু ভোলানাথ'-এর প্রথম কবিতাটি ছাড়া 'শিশু ভোলানাথ'-এর আর কোনো কবিতায় "অন্ধ ভাণ্ডারে বদ্ধ জীবনের" প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া আস্বাদন-গোচর হয় না। বরঞ্চ উদ্ধৃত অংশটুকু পড়লে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেন 'রক্তকরবী'র ইতিবৃত্তান্তই বলছেন। এবং প্রত্যক্ষত যাই হোক বস্তুত ব্যাপারটা তাই। 'রক্তকরবী'র মূল পরিকল্পনা আমেরিকা ভ্রমণের কালেই সংগঠিত হয়েছে। আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন তা 'রক্তকরবী' রচনার প্রধান প্রেরণা। এবং এই প্রেরণার টানে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব লেখক-জীবনে বহুকাল পোষিত নানা ধ্যান ধারণায়, তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গগুলির সমাবেশ ঘটল 'রক্তকরবী'তে। "অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধজীবন" আর "ঘন দেওয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ"ই যক্ষপুরীর বদ্ধজীবন ও তার প্রতিমুখে ফসল-কাটানীদের গানের সুরের পূর্বাভাস। 'গুপ্তধন'-এর মৃত্যুঞ্জয় যেমন করে আবদ্ধ পাতালপুরীতে স্মরণ করেছিল বাইরের অনাড়ম্বর স্বচ্ছন্দ জীবনধারাটাকে এবং এই অনিবার্য স্মৃতির জন্যই যেমন তার জগৎ-বিচ্ছিন্নতাবোধের যন্ত্রণা হয়ে উঠেছিল তীব্র, 'রক্তকরবী'তেও দেখা যায় কতকটা সেইভাবেই যক্ষপুরীর বদ্ধজীবনের অন্ধ আকাশে "আজ নবান্নের দিন" প্রমুখ স্মৃতি জেগে উঠেছে। নিংড়ে নেওয়া মানুষগুলোর নিক্ষিপ্ত অবশেষের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নন্দিনীর যে একরাশ স্মৃতিকথা মনে পড়েছে তাতে যক্ষপুরীর অন্ধকারে জগৎ-বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারটিই তীব্র হয়ে উঠেছে।

তিন

অন্ধকারের রাজার প্রসঙ্গ রবীন্দ্রচেতনায় দীর্ঘকাল বিরাজিত। অন্ধকারের স্বামী, অন্ধকারের নাথ বা প্রভুর কথা কবির গানে অনেকবার ধ্বনিত হয়েছে। গীতিকবিতার এই অন্ধকারের স্বামী নাথ বা রাজা পূর্ণ পরিণতি লাভ করল 'রাজা' নাটকে। এই অন্ধকারের রাজা আর 'রক্তকরবী'র অন্ধকারের রাজা স্বভাবতই এক নয়। 'রক্তকরবী'র যিনি রাজা তিনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীর বিপরীত রূপ। কিন্তু উভয়ের জীবনেই সমগ্রতার বিচ্যুতি লক্ষণীয়। "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয়ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।" "যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধ তমসের মধ্যে প্রবেশ করে; তদপেক্ষাও ভূয় অন্ধকারের

মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।" 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ সন্ন্যাসীর অহাঙ্কার ও 'রক্তকরবী'তে রাজার যক্ষপুরীর অন্ধকার এইখানে কথিত অন্ধ তমসেরই রূপক। সমগ্রতাবিচ্যুত খণ্ডিত জীবনের অন্ধকারই এখানে মূর্ত। কিন্তু তা বলে গীতিকবিতার যে অন্ধকারের প্রভু বা স্বামীকে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' নাটকে পূর্ণাঙ্গ করে তুললেন তার সঙ্গে 'রক্তকরবী'র রাজা-কল্পনার কোনো সম্পর্ক নেই একথা যেন আমরা না ভাবি। 'রাজা' নাটকে যিনি রাজা মাধুর্যের পথেই তিনি বেদ্য বটে—কিন্তু অগ্নিদাহ সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতাও তাঁর আছে। তাপের পথে তাঁকে পাওয়া যাবে তাপের শীর্ষে যিনি বিরাজমান।[১] 'রক্তকরবী'র যিনি রাজা তাঁর শক্তির ঐশ্বর্য নেই। কিন্তু তিনিও শক্তির অধিপতি। এবং শক্তির অধিপতি বলেই রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার রাজাদের মতো তাঁরও আবির্ভাব ভাঙনের পথে। 'খেয়া'র আগমন কবিতায় এবং 'গীতিমাল্য'-এ "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি…" গানে প্রথমটিতে প্রত্যক্ষভাবে রাজার কথা ও দ্বিতীয়টিতে পরোক্ষভাবে রাজার অনুষঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। দুটিতেই দুর্যোগের পটভূমিকে ব্যবহার করা হয়েছে। ঝড়ের রাতের রাজা দুয়ার ভেঙে ফেলছেন এ রূপকত্ব 'রক্তকরবী'তে নেই। রাজা নিজেই ঝড় হয়ে উঠলেন এবং দুয়ার বা বাধাকে ভেঙে ফেললেন শেষে এই রূপকের প্রয়োগ ঘটেছে। 'রক্তকরবী'র রাজা-কল্পনা রবীন্দ্রনাথের অন্ধকারের স্বামী-কল্পনা থেকে পরোক্ষ সাহায্য নিলেও যেহেতু এই রাজা মানবিক যন্ত্রণার বশীভূত তাই পরোক্ষ প্রভাবের সে ছায়াকে সে দূরে সরিয়ে দিয়েছে নিজের ঐশ্বরিক বিভূতিতে নয়, মানবিক প্রামাণিকতায়। গীতিকবিতায় বা গানে অন্ধকারের স্বামীর মধ্যে যেমন আকাশের অন্ধকারময় বিশুদ্ধতা, 'রক্তকরবী'র রাজা সেই বিশুদ্ধতায় বিমূর্ত থাকেন নি। অন্ধকারের স্বামী তিনি নন। তিনি সভ্যতার প্রতীক। রাজা আঘাত করেন, রাজা রুদ্র হয়ে ওঠেন, রাজা ভাঙেন, ধ্বংস করেন—এ কথা অন্ধকারের প্রভু, নাথ বা স্বামী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। 'রক্তকরবী'র রাজা রুদ্র হতে পারেন, ভাঙতে পারেন কিন্তু নিজেরই অন্তর্দ্বন্দ্বের রক্তকমলের ওপর তাঁর অধিষ্ঠান; সে রক্তকমলের মূল জীবন-মৃত্তিকাকে স্পর্শ করে রয়েছে।

১। হয়তো এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকৃত 'কুমারসম্ভব'-এর ব্যাখ্যার কথা আমাদের মনে হতে পারে এবং বস্তুত 'রাজা' নাটকে 'কুমারসম্ভব'-এর মর্মার্থের সূত্র স্পষ্টতই অনুভবগম্য।

এই রূপকার্যে প্রত্যক্ষ জীবন অনুসন্ধের। রাজার ভ্রান্তিবোধেই তাঁর সত্য পরিচয়। সে বিষম ভ্রান্তির মূল ছিল নন্দিনীকে মিলিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করতে চাওয়ায়।

চার

'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে দুটো প্রতীক্ষা প্রথমাবধি ক্রিয়াশীল। কুশীলবদের মধ্যে নন্দিনী একটা প্রতীক্ষা প্রবলভাবে সঞ্চারিত করেছে: "আজ রঞ্জন আসবে।" আর দর্শকমণ্ডলী আরেকটা প্রতীক্ষা করেছে এরই সঙ্গে, অন্ধকারের অন্তরালবর্তী রাজা বাইরে আসবে। দুটো প্রতীক্ষার দুই প্রতিক্রিয়া আশ্চর্য বন্ধনে সংবেশিত হয়েছে। রাজা অন্ধকারের আবরণ ভেঙে যখন আবির্ভূত হবেন তখন কী হবে তা আমরা কেউ জানি না। বরঞ্চ আশঙ্কিত উদ্বেগে এই ভেবে আমরা চঞ্চল যে বাঁধভাঙা বন্যাবারির ধ্বংসকে কী বেশে দেখব। এই অনির্দেশ্য ভবিতব্যতার কোলে একটি মাত্র মাধুর্যের আশ্বাস: রঞ্জন আসবে। প্রতীক্ষা 'ডাকঘর' এবং 'অচলায়তন'-এ মূল নাট্যরসের উৎস। 'ডাকঘর'-এ রাজার চিঠির জন্য অমলের প্রতীক্ষা নাট্যোৎসাহকে সজীব করে রেখেছে। আবার 'অচলায়তন'-এ গুরুর জন্য প্রতীক্ষা 'অচলায়তন'-এর নাট্যকৌতূহল রচনার মূলশক্তি। 'ডাকঘর'-এ অমলের রাজার চিঠির প্রতীক্ষার সঙ্গে সোনার সুতোর মতো জড়িয়ে রয়েছে সুধার প্রতিশ্রুতির জন্য অমলের প্রতীক্ষা। 'অচলায়তন'-এর গুরুর প্রতীক্ষার ভেতরে আর কোনো জটিলতা নেই। একটা পরম অনির্দেশ্যতার জন্য কবিমানসে প্রতীক্ষা রয়েছে, গানে কবিতায় একথাও রবীন্দ্রনাথের মুখে ইতিপূর্বে বহু উচ্চারিত। জীবনের ছকবাঁধা অভ্যাসিকতা-ময় যে আবহমণ্ডল, তার প্রতিক্রিয়াতেই প্রতীক্ষার জন্ম—আবার এই প্রতীক্ষার সাহায্যেই সেই অচল সময়ের অনুভূতিকে তীব্র করে তোলা হয়। কবে যে তিনি আসবেন তার দিনক্ষণ কেউ জানে না, তাই সদাই প্রতীক্ষা। দশকুমারীর কথিকার শেষে 'বাইবেল'-এর গল্পে বলা হয়েছে যে যারা যারা প্রস্তুত ছিল বরের দেখা সেই পাঁচজনই পেল। সকলে যখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে ঢলে পড়েছে তখন সেই মধ্যরাত্রে হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল: "And at midnight there was a cry made, Behold the bridegroom cometh; ...and they that were ready went in

with him to the marriage." 'খেয়া'র আগমন কবিতায় প্রতীক্ষা ও অবিশ্বাসের পাশাপাশি বন্দময় মূর্তিটি প্রসঙ্গে 'বাইবেল'-এর এই কথিকাটির কথা মনে পড়ে।[১] মনে পড়ে অর্ধরাত্রে 'ডাকঘর'-এ রাজার আগমনের আশ্বাস, মাধব দত্তের অবিশ্বাস। বর এবং রাজার ভাবানুষঙ্গ এবং অর্ধেক রাত্রের ঘোষণার ভিতরে প্রভাব অনুসন্ধানের চলতি হাওয়ার পন্থী না হয়েও বলা চলে যে উভয় কবিই অন্ধতমসের কাছে বিকারহীন আত্ম-সমর্পণের মাঝখানে যে প্রতীক্ষাপরায়ণ, প্রস্তুতিশীল, তাকে পরম-প্রাপ্তির গৌরব দিয়েছেন। আজ রঞ্জন আসবে, জীবন বিচ্ছিন্ন যক্ষপুরীতে নন্দিনীর এই পরম প্রতীতির মধ্যেও সেই গৌরব নিহিত।

এই যে প্রতীক্ষা-প্রসঙ্গটি কবির গানে কবিতায় ও নাটকে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে 'রক্তকরবী'তে সেই প্রতীক্ষা একটা নতুন তাৎপর্য পেয়েছে। 'অচলায়তন'-এ 'ডাকঘর'-এ দেখা যায় এ প্রতীক্ষা ধন্য হলো কৃতার্থতায়। কিন্তু 'রক্তকরবী'তে রঞ্জন নাটকার্থে এসে পৌঁছল না—সে প্রাণ দিল। নন্দিনীর হাহাকার মথিত করল যক্ষপুরীর বদ্ধতাকে। এই সর্বব্যাপী হতাশার মাঝখানে রাজা তার আবরণ ভেঙে ফেললেন, ভেঙে ফেললেন ধ্বজদণ্ড, তিনি বাইরে এলেন। দর্শকরা রঞ্জনকে হারিয়ে রাজাকে পাচ্ছে। এবং এই হারানো আর পাওয়াকে তীব্রতা দিচ্ছে রাজার নিজেকে ভাঙাগড়া। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরাও নিজেদের মনোরাজ্যের ছকগুলোকে ভাঙে পড়ে বলে এর নাটকীয় আবেদন অভিনব।

পাঁচ

'রক্তকরবী'র আলোচনাকালে অনেক পূর্ববর্তী সমালোচক কিশোরের প্রসঙ্গে 'শ্যামা'র উত্তীয়ের কথা বলেছেন। শুধু উত্তীয় নয়, এ প্রসঙ্গে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের অমূল্যের কথাও স্মরণীয়। উত্তীয়, অমূল্য এবং কিশোর আত্মবুদ্ধিহীন ভালোবাসার তিনটি স্তম্ভ। এদের তিনজনের ক্ষেত্রে প্রথম

১। সেও আর এক সুন্দরী নিঃশঙ্কিনী তরুণী। তিনিও আর এক মহাপ্রতাপের অধীশ্বর সম্রাট। সম্রাটের সমস্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করে সে-তরুণী যে-সাহসে অধিকতর সুন্দর হয়ে উঠেছিল তাতে সম্রাটও হয়েছিলেন বিস্মিত। এই বিস্ময় ধীরে ধীরে বিধ্ব করে তুলল সম্রাটকে। তাঁর মনে হলো তিনি নিঃসঙ্গ। তরুণী, নির্মলকুমারী; সম্রাট, ঔরঙ্গজেব। বইটি 'রাজসিংহ'। বঙ্কিমের লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম উপন্যাস।

ভালোবাসার অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। আর এই প্রথম ভালোবাসার করুণ রঙীন পথ ধরে তিনজনেই পৌঁছে গেছে আত্মবিসর্জনের অনির্বাণ বিলুপ্তিতে। কিশোরপ্রেম বলেই এরা কখনো উক্তিতে এবং ব্যক্ততায় প্রগল্‌ভ হতে জানে না। আবার ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিতের বাঁধাধরা ছকেও এরা চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয়। প্রেমের বেদনায় এরা অসমসাহসিক। মৃত্যুর বেদীমূলে সেই বেদনাকে এরা উৎসর্গ করে। নৃত্য-নাট্যের উত্তীয়ের মুখে এর ব্যাখ্যা আছে—"ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে"। এবং "গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক তবে অবসান"। এখানে মৃত্যুর ভেতরে একটা কিশোর-ভাবাতিরেক বিদ্যমান যা অন্যের হাতে মর্যিত বলে মনে হতে পারত। "কিন্তু গোপন ব্যথার নীরব রাত্রির অবসান"-বাসনাই উত্তীয়দের একমাত্র পরিচয় নয়। উত্তীয় এবং অমূল্য যে মৃত্যুবরণ করল সে মৃত্যু উভয়ক্ষেত্রেই নৈতিক আঘাত সঞ্চার করেছে। আঘাত সঞ্চার করব বলে তারা মরে নি। কিন্তু তাদের মৃত্যুতে দুই নারীর অন্তরে উৎসর্জিত অসংযত কল্যাণ বিরহিত প্রেম একটা নৈতিক উপসংহারে পৌঁছেচে। শ্যামা এবং বিমলার শেষ বেদনার প্রধান ইন্ধন এরাই। কিন্তু কিশোর-প্রেম ও কিশোরের আত্মদানের প্রসঙ্গ 'রক্তকরবী'তে ব্যবহৃত হলেও তার তাৎপর্য অন্যতর। এখানে নন্দিনীর সৌন্দর্যটা কিশোরের কাছে শুধু আকর্ষণ নয়, প্রেরণা। সে সৌন্দর্য যক্ষপুরীতে সত্যের আঘাত হেনেছে বলে সে প্রেরণাও সত্যাদর্শমূলক। এদের দেখলে মনে হয় অগ্নিযুগের বাংলাদেশে এমন প্রেরণাদায়িনী মেয়ে ছিল যার নির্দেশে দলের তরুণ সদস্য অক্লেশে দেশপ্রেমের বেদীতে মাথা দিতে পারত। যেমন পারতে চেয়েছিল অমূল্য। কিশোর কতকটা সেই ছকের মধ্যে পড়ে। কিশোরের দুঃসাহসিক অভিযানের প্রমাণ নাটকের প্রারম্ভে আমরা একবার মাত্র পেলাম। বিশুর জন্য তার আত্মোৎসর্গের সাহস ছিল তা-ও একবার দেখলাম। নাটকের শেষের দিকে খবর পেলাম তার গৌরবময় আত্মঘোষণাহীন মৃত্যুর। বাকি সময়টা কিশোর কী করছিল না করছিল তার কোনো খবরই আমরা রাখি না। দুর্ভেদ্য অন্তরালে সুরক্ষিত রাজাকে বিদ্রোহতরে আহ্বান করে মৃত্যুবরণের আকস্মিকতায় অগ্নিযুগের অনেক চেনা মৃত্যুর ছায়া খুঁজে পাওয়া যাবে। অথচ উত্তীয় এবং অমূল্যের ভেতরে যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে তাদের প্রেম বা ভালোবাসার পাত্রীর নৈতিক

অসম্পূর্ণতার জন্য—কিশোরের ক্ষেত্রে সে অসম্পূর্ণতা নেই নন্দিনীর নিজস্ব ভূমিকাগত মাহাত্ম্যের জন্যই।

ছয়

রবীন্দ্রনাথ একটা অনড় অচলের প্রচণ্ড ভাঙনকে নাট্যকাহিনীর শেষে স্থাপন করেছেন 'অচলায়তন'-এ 'মুক্তধারা'য় এবং 'রক্তকরবী'তে। বিংশশতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে লেখা এই নাটকত্রয়ে ধ্বংসগত উপসংহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যা প্রাণস্রোতের স্তম্ভারক তাকে ধ্বংস ব্যতীত মুক্তি নেই—এখানে রবীন্দ্রচিন্তায় কোনো দ্বিধাচরণ নেই। এবং চিন্তায় এই স্পষ্টতার জন্য তাঁকে ইওরোপীয় হতে হয় নি—ভারতীয়তার সত্যার্থ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই ধ্বংস যে গুণগত পরিবর্তন আনে তাকে তিনি জেনেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় আর তৃতীয় দশকের ভারতবর্ষের বাস্তবপরিস্থিতি নিঃসন্দেহে এই উপলব্ধির প্রাথমিক ভিত্তিভূমি রচনা করেছে।

কিন্তু 'রক্তকরবী'র রাজা যে পরিবেশে জাল ছিঁড়ে ফেললেন, ধ্বজদণ্ডকে ভেঙে ফেললেন, তার তাৎপর্য গভীরতর। এবং সেই তাৎপর্য বিদ্যমান বলেই 'রক্তকরবী'তে কবিজীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ একত্রিত হয়ে একটি ঐক্যসূত্রের বশবর্তী হয়েছে, প্রাপ্ত হয়েছে একটা শিল্পময় অখণ্ডতা। সেই তাৎপর্য রাজার মধ্যেই অনুসন্ধেয়। সে ক্ষেত্রে 'রক্তকরবী'র নাট্যরস কোন নৈতিক সচেতনতার আধারে স্থাপিত সেটাই প্রথম প্রশ্ন। আমরা আগে বলেছি যে রাজা সভ্যতার প্রতীক। সভ্যতার অন্তর্নিহিত সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা দীর্ঘকালের। আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সভ্যতার সেই সমস্যার রূপটি তাঁর মনের মধ্যে আরো স্পষ্ট হয়েছে। পৃথিবীর নানা সভ্যতার অন্তর্গত সমস্যা একটাই, শক্তিকে কেমন করে শ্রীতে রূপান্তরিত করব, কেমন করে যা বিশেষের হাতে অধিগত হলো তাকে সার্বজনীন করে তুলব। যা অধিগত তা হোক আত্মস্থ। সমস্ত সভ্যতা গড়েছে এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে—ভেঙেছে এই উদ্দেশ্যের ব্যর্থতায়। এবং সভ্যতার এই অমীমাংসা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের চেহারা আরো বেশি প্রকট হয়েছে এ যুগের ধনবাদী সমাজে। সেখানে মানুষের প্রচণ্ড শক্তিমত্তার নিদর্শনও যেমন স্তূপীকৃত, তার ব্যর্থতার প্রমাণগুলোও তেমনি চারিদিকে পরিকীর্ণ। এই অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত শূন্যতাই ধীরে ধীরে সভ্যতাকে গ্রাস

করছে। বড় বড় সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি বা "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন"—এ সমস্তই সভ্যতার সেই মর্মগত পীড়াকে অনুধাবন। 'রক্তকরবী'র রাজা এই সভ্যতার প্রতীক। তার যেমন প্রচণ্ড শক্তি তেমনি প্রবল ক্লান্তি। পাঠক দর্শকের কাছে 'রক্তকরবী'র রাজার ক্লান্তিটাই বারে বারে প্রধান হয়ে বেজেছে। এই ক্লান্তির মধ্যেই শক্তির বিকার। এই ক্লান্তি থেকে উত্তরণের মধ্যেই শক্তির মুক্তি। রাজার অন্ধকার-আধারে সভ্যতার এই মর্মগত সমস্যাকে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রণার রূপ দিয়েছেন।

সভ্যতার ইতিহাসের আধুনিক অধ্যায়ে ব্যক্তি, ব্যক্তিমর্যাদাকে আবিষ্কার করেছে। অথচ মিকেল এ্যাঞ্জেলোর আদমের মতোই সংস্কারমুক্ত, অবিচলতার পটভূমিতে স্থাপিত এবং দূর লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেও সে কিন্তু নিঃসঙ্গই। মানুষের এই ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা নিজেকে ঘিরে ঘিরে যত বেড়েছে তত সে জয়লাভ করেছে বাইরের দিক থেকে, কিন্তু গত শতাব্দী থেকে অস্তিত্বের যে খণ্ডায়ন বিপুলভাবে অনুভূত হয়েছে তার বীজও ছিল সেই জয়লাভের মধ্যে। তাই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ইওরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলস্বরূপ অস্তিত্বের খণ্ডায়নের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের নিজস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সাধনার সন্ধান করেছেন ; সে সাধনার মূল লক্ষ্য "জীবনের সমস্ত খণ্ডতা ঘুচিয়ে দেওয়া", "বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে অবিরোধে মিলিত হওয়া"। রাজার শেষ মুক্তি তাকে সেই দিকেই নিয়ে গেল। সভ্যতার বিন্যাসে যে ত্রুটি রয়েছে তার ফলস্বরূপ খণ্ডতার আতিশয্য থেকে রেহাই নিয়ে সমগ্র জীবনের দিকে এই যাত্রা। কুবেরের শ্রীহীন সঞ্চয় থেকে বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভের দিকে সেই যাত্রার আহ্বান 'রক্তকরবী'তে বারে বারে বেজেছে। সভ্যতা নিজের অসম্পূর্ণতাকে, অচরিতার্থতাকে অতিক্রম করবে বলে তার শক্তির শেষ সংগ্রাম তাকেই ভেঙে গড়বে নতুন করে।

'রক্তকরবী'তে রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের প্রিয়প্রসঙ্গগুলির একত্র সমাবেশ এই সভ্যতার সমস্যাসংক্রান্ত সচেতনতার জন্য রসগত অখণ্ডতা লাভ করেছে। জগৎ-বিচ্ছিন্ন অন্ধকারের রাজা নিজের শক্তিতে নিজে বিকারগ্রস্ত, কিশোরের প্রাণময় বিদ্রোহ এই শক্তির বিকারের বিরুদ্ধে—প্রকৃতপক্ষে সমস্ত প্রতীক্ষাই ছিল বিদ্রোহের প্রতীক্ষা, কিশোরে এই বিদ্রোহের শুরু, রাজার নিজের বিদ্রোহে তার পরিণতি, সেই প্রতীক্ষারই উপসংহারে আমরা

পেয়েছি অবিচল অনড়তার পতন। এইভাবে 'রক্তকরবী' বর্তমান সভ্যতার আলেখ্য হয়ে উঠেছে।

সাত

'রক্তকরবী'র গল্পস্রোতকে টেনে নিয়ে গেছে রাজা। নন্দিনীকে অনেকটা বুঝতে হয় অপরের ওপর নন্দিনীর প্রতিক্রিয়া দেখে। এবং সে প্রতিক্রিয়াগুলি যদ্রূপত এক বলে নন্দিনীকে অনেকটা পূর্বস্বীকৃত বলে মনে হয়। তথাপি 'রক্তকরবী' নাটকের কুশীলবেরা নন্দিনী 'বাইগ্রস্ত' নয়। গোকুল এবং চন্দ্রার মধ্যে নন্দিনীকে অবিশ্বাসের প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। অবশ্য নানা দিক থেকে নাটকের সব থেকে গভীর-বোধ চরিত্র বিশু পাগল। সভ্যতার যে ক্লান্তি 'রক্তকরবী' নাটকের বিষয় বিশু পাগলের গানে তার ব্যক্তিগত রূপালেখ্য। তার গানে এই ক্লান্তির সুর প্রধানত এসেছে নন্দিনীর সঙ্গে তার পূর্বসম্পর্কের জের ধরে—কিন্তু মূলত তা নন্দিনীকে অবলম্বন করে জীবনের অখণ্ডতা সম্বন্ধে বিরহবেদনার দ্যোতক। বিশু পাগলের গানে সভ্যতার ব্যাধিবেদনাই যেন অনুরণিত ও স্পন্দিত। সে যেন সেই রোমান্টিক এ্যাগনির কবি—বর্তমান সভ্যতার কোলে যার জন্ম। লক্ষণীয় যে রাজাকে অবলম্বন করে নাটকের গতি যেখানে তীব্র সেখানে গান নেই। যেখানে নন্দিনী, সেখানে নাটকের গতি স্তিমিত, সেখানেই বিশু কথা বলেছে গানের পরিভাষায়। নাটকের সম্মুখগতি স্তিমিত, এই অবকাশে তাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করা হয়েছে গভীরে। এবং এই গভীরতা বন্ধন হয়ে ওঠবার আগেই 'রক্তকরবী'র প্রকৃতিচেতনা তাকে আবার গতিময় করে তুলেছে। অন্ধকার ভূগর্ভে সময়ের স্রোত স্থগিত হয়ে যায় বলেই যক্ষপুরীর অচল বিকার স্তূপীকৃত হয়। কিন্তু সময়ের স্রোতে স্থাপিত না করলে জীবনলগ্ন প্রকৃতিকেও স্বরূপে বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনায় এই বিবর্তন-সম্ভবময় সময়-স্রোতের উপলব্ধিতে রেনেসাঁসের প্রকৃতিতত্ত্বের পরবর্তী, আধুনিক প্রকৃতি-দ্রষ্টারই বিশিষ্টতা। তাই বারে বারে যক্ষপুরীর শীতবদ্ধতার মাঝখানে শোনা গেছে, বসন্তের ফুলের আহ্বান নয়, পৌষের জীবনধারার গান। নিষ্ঠুর মরণ ও প্রচণ্ড ভাঙন দুইই ব্যর্থ যদি সময়-স্রোতে স্থাপিত জগৎ-চেতনা সকল কিছুর পরিশেষে না থাকে।

মার্টিন অ্যানডারসেন নেক্সো

বেলা দত্তগুপ্ত

রূপকথার রাজা হানস ক্রিশ্চিয়ান অ্যানডারসেন বলেছিলেন "My life has been a wonderful fairy tale." অসাধারণ দারিদ্র্য, অপরিসীম লাঞ্ছনা ও জীবনের বহু ক্ষেত্রে নিদারুণ ব্যর্থতা সত্ত্বেও হান্স অ্যানডারসেন জীবনকে দেখেছিলেন রূপকথার অপরূপ মাধুর্যে সিক্ত করে, আর তাই না তাঁর Ugly Duckling পরিণতি পেল এক বরতর, সুন্দর রাজহংসে। এ যেন তাঁর নিজের জীবনেরই ক্রমিক পরিণতির এক রূপময় ইতিহাস। হান্সের লেখা 'রাজার পোষাক' গল্পটি লেনিনের হৃদয় জয় করে। Socialist Realism-এর একটি নিখুঁত রূপায়ণ দেখতে পান লেনিন এই বিখ্যাত কৌতুকদীপ্ত গল্পটিতে। লেনিনের কাছে বিচিত্র পোষাকপরা রাজাটি আর কেউই নয় স্বয়ং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আর এই ধনতন্ত্রের নগ্ন রূপটি আঙুল দিয়ে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে শিশু। এই শিশুটি সমাজতন্ত্র। লেনিনের মতে হান্সই সর্বপ্রথম সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমের স্বরূপ উপলব্ধি ও উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছিলেন।

লেনিনের মতে মত মেলানো শক্ত আমাদের পক্ষে। হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যানডারসেনকে প্রোলিটেরিয়েট সাহিত্যিক হিসেবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হইনি আমরা। আমাদের কাছে তিনি রূপকথার রাজা হয়ে রইবেন চিরদিন, তবে সে রূপকথা "too deep for tears"। 'ফারগাছ', 'লালজুতো', 'মা ও ছেলে', 'দেশলাই ফিরি করা মেয়ে' (Tinder Box) এমনি আরো অজস্র গল্প রূপকথার গণ্ডি পেরিয়ে সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের দুঃখ দুর্দশা, ব্যথা-বেদনার রূপকে উত্তীর্ণ হয়েছে।

লেনিনের আকাঙ্ক্ষিত প্রোলিটেরিয়েট সাহিত্যিক এলেন হান্সের পরের যুগে। মার্টিন অ্যানডারসেন নেক্সো (১৮৬৯—১৯৫৪)। হয়ত 'হ্যামলেট' নাটকে Marcellus-এর কথাই সত্য যে "Something is rotten in the state of Denmark।" নইলে এ লেখকের ভাগ্যও কেন এত বিড়ম্বিত হবে? হান্সের মতোই অপরিসীম দারিদ্র্যে, অযত্নে, অবহেলায় দিন কেটেছে নেক্সোর,

কিন্তু "অতৃপ্ত, অসুখী, অনমনীয়" এই যুবক স্বপ্ন দেখেছেন ভুবনের ভার গ্রহণ করার। তাঁর Pelle (Pelle, the conqueror) গেয়ে ওঠে "আমার যৌবন স্বপ্নে ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ"। তাঁর Ditte নেক্সোর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলে "From death comes our rebirth", আর গ্রহণ করে মৃত্যুকে জীবন অক্ষয় জেনে। Pelle ও Ditte-র জনক তখন চেয়ে বসে থাকেন Toward Dawn যেখানে

"প্রত্যহের ইন্দ্রধনু জেগে যাক স্তরে স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের স্বর্ণা
সহাস জীবনে এনে দিক
সহজ আনন্দ দিক মানবিক দুঃখের করুণা।"

গণসাহিত্যিক হিসেবে নেক্সোর খ্যাতি আজ পৃথিবীজোড়া। রুশদেশে ম্যাকসিম গর্কী, চীনদেশের লু স্বন-এর পরেই ডেনমার্কের মার্টিন অ্যানডারসেন নেক্সোকে স্মরণ করা হয় জনগণের সাহিত্যিক বলে।

১৮৬৯ সনের ২৬শে জুন কোপেনহাগেন শহরের এক বস্তিতে নেক্সোর জন্ম। কয়েক বছর কোপেনহাগেনে কাটিয়ে নেক্সোর বাবা মা সেখানকার বাস তুলে দিতে বাধ্য হন। বোর্নহোম দ্বীপে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ও কিছু সজ্জন প্রতিবেশী ছিল এঁদের। এখানেই ফিরলেন নেক্সোর বাবা মা কিশোর পুত্রকে নিয়ে। জেলের ছেলে, তায় অর্থাভাব, লেখাপড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না নেক্সোর। বরং বাবা মা-র মনে হয় কোনো একটা কাজে লেগে গেলেই পারে ছেলেটা। গরু ভেড়ার রাখালী করাই বা মন্দ কি? এতেই প্রথম শিক্ষানবিশী নেক্সোর। তারপর মুচির দোকানে। কিন্তু অভাবের তুলনায় অর্থের আমদানিটা মোটেই যথেষ্ট নয়। এর চেয়ে রাজ-মিস্ত্রির ইঁট বওয়ার কাজটা অনেক ভালো, বেশ মজুরীও পাওয়া যায়। সুতরাং মুচির কাজ ছেড়ে রাজমিস্ত্রির মজুরের কাজ নিলেন নেক্সো। কাজ করেন আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভাবেন রাজমিস্ত্রিদের কথা লিখলে কেমন হয় গল্পের ভিতর দিয়ে? কেমন হয় বল্টিক ও উত্তর সাগরে প্রকৃতির সব প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়া জেলেদের জীবন কাহিনী লিখলে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় কেমন করে লিখবেন—লেখাপড়া তো শেখেন নি, যান নি তো স্কুলে। এই "অতৃপ্ত, অসুখী, অনমনীয়" ছেলেটিকে কিন্তু চিনতে পেরেছিল তার বন্ধুবান্ধব। তারা জোর করে নেক্সোকে Ascov Folk

High School-এ পাঠায়। নেক্সোর জীবনে "নূতন উষার স্বর্ণদুয়ার" খুলে গেল। কয়েক বছর Ascov Folk School-এ পড়াশুনা করে রুচি ও বুদ্ধির একটি সংযত বিকাশ হলো নেক্সোর। বোর্নহোমের কপিল-গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বহির্বিশ্বকে দেখবার, জানবার সুযোগ পেলেন তিনি। আত্মবিকাশের পথটিও সহজ হয়ে উঠল। এতদিন যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন জীবনের মহাকাব্য থেকে আজ তা রূপ নিতে শুরু করল গল্পে, উপন্যাসে।

ত্রিরিশ বছর বয়সে তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম বই 'Shadows' : ছোট গল্পের সংকলন। বাল্যে ও যৌবনে যে সব জায়গায় কাটিয়েছেন, যাদের সঙ্গে মিলেছেন মিশেছেন সেই সব মুচি, মজুর, জেলে, কুলিকামিনদের নিয়ে লেখা এই বই। *Shadows*-এর সমাদর হয় অনায়াসে এবং অচিরেই। এ বই বেরোবার পর ডেনমার্কের নামহীন, গোত্রহীন মজুর সমাজ উল্লসিত অভিনন্দন জানায় নেক্সোকে এবং "they took him to be their mouthpiece". ইওরোপের বহুদেশ তিনি ঘুরেছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকসংঘের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে সুসংবদ্ধ চেতনা ও রাজনৈতিক বোধ জাগ্রত করাই ছিল, তাঁর মতে, আপন অবিচলিত লক্ষ্য। ১৯২০ সনে নেক্সো প্রথমবার সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। সেখানকার 'New Civilisation' দেখে তিনি মুগ্ধ হন। ডেনমার্কে ফিরে এসে কর্মের এক সুবৃহৎ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নেক্সো।

১৯২০—২৩ সনে 'Pelle, the Conqueror'-এর (হাইনমান কোম্পানীর প্রকাশনায় লণ্ডন থেকে) প্রথম ইংরেজী অনুবাদ বেরোয়। 'Pelle, the Conqueror'-কে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা যেতে পারে। তাঁর Pelle তাঁরই মতো "springs naked out of nothing and conquers the world." ডেনমার্ক ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অনতিআধুনিক সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সাহিত্যে বিদ্রোহ থাকা সত্ত্বেও গল্প উপন্যাসের চৌহদ্দি অভিজাত, অভিজাতকল্প কিংবা মধ্যবিত্তসমাজে বিস্তৃত ছিল। জোহান বোয়ার, ন্যুট হামসুনের মতো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ব্যতীত সেলমা লাগেরলফ (Selma Lagerlof), সিগ্রীড উণ্ডসেট (Sigrid Undset), হেনরিক ইবসেন (Henrik Ibsen) প্রমুখ লেখক-লেখিকাদের উপন্যাসের setting উচ্চ অথবা মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনকে কেন্দ্র করে।

ডেনমার্কে যাঁরা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন (K. Gojellerup, H. Pontoppidan, J. V. Jensen) তাঁদের লেখার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও অনুবাদ ও অন্যান্য মাধ্যমে তাঁদের রচিত সাহিত্যের যে আংশিক আভাষ আমরা পাই তাতে H. Pontoppidan ব্যতীত অন্য কাউকে জনগণের সাহিত্যিক বলা যায় না। নেক্সোর অনন্যতা এখানেই যে তাঁর নায়কনায়িকাদের কারোই জন্মের, অর্থের, বিদ্যার আভিজাত্য বা কৌলিন্য নেই অথচ "Nothing human is alien to them". Pelle-এর বিশ্বজয়ী ও Ditte-র তাপসী মূর্তিটি এই অসাধারণ মানবতাবোধ দিয়ে সৃষ্টি। কী অপরিসীম দরদই না ফুটে উঠেছে নেক্সোর এই অনবদ্য মানববন্দনায় :

> "Every second a human soul is born into the world—that which never been becomes flesh and blood. No human being is a repetition of any that has gone before or will ever be repented in future. Every new being is like a comet which only once in all eternity touches the earth's orbit—a phosphorescence between two eternities of darkness. Then no doubt there is joy among men at every newly lit soul."

এই আশ্চর্য কথাগুলো কি মায়াকভস্কির বিখ্যাত

> "To abhor all kinds of deathliness
> To adore all kinds of life."

চরণ দুটিকে স্মরণ করিয়ে দেয় না ?

এই অসাধারণ জীবনসংবেদ্যতা ছিল বলেই দারিদ্র্যের নির্মমতম কশাঘাতে, জীবনের অযুত ভাগ্যবিপর্যয়ে নেক্সো নিজে জীবনবিমুখ হন নি কিংবা তাঁর মানসপুত্র, মানসকন্যাকে জীবনপরাঙ্মুখ করেন নি। "To live life, to know it and yet to love it" এই ছিল এই আশ্চর্য মানবতাবাদী সাহিত্যিকের জীবনদর্শন।

১৯৪০-৪৫ এই ক-টি বছর ডেনমার্কের পক্ষে দারুণ দুর্দৈবের। ডেনমার্ক তখন জার্মান অধিকৃত, অবরুদ্ধ। নেক্সোর ওপর নাৎসী জার্মানদের খরদৃষ্টি। রেহাই পেলেন না নেক্সো ঈগলচক্ষু থেকে। যেতে হলো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে গ্যাস চেম্বারে কিংবা অন্য বীভৎসতায়

তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়নি। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে কি করে যেন পালাবার সুযোগ এসে গেল। ডেনমার্ক থেকে পালিয়ে সুইডেনের ভিতর দিয়ে অতিকষ্টে রাশিয়ায় এসে পৌঁছন দীর্ঘদিন পরে। যুদ্ধান্তে তিনি আবার ডেনমার্কে ফিরে আসেন। '*Toward Dawn*' সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার ও অভিমতের একটি প্রামাণ্য দলিল।

নেক্সোর নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তিনি বিবাহিত না অকৃতদার ছিলেন সে সম্বন্ধেও কোনো আলোকপাত করা সম্ভব নয়। যতদিন না তাঁর চার খণ্ড আত্মজীবনী ডেনিশ ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনূদিত হচ্ছে ততদিন আমাদের এই লেখকের জীবন সম্বন্ধে বিশদ সংবাদ পাওয়া অসম্ভব।

১৯৫৪ সনে এই বিখ্যাত সাহিত্যিকের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি 'Toward Dawn' তাকিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রতিটি মানুষ যেন জীবনে জীবন যোগ করে, বেঁচে থেকে, একলব্য সাধনায় বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় সুখী সুন্দর সমাজ গড়ে তোলে। হাম্স ও নেক্সোর মাঝখানে প্রায় দুইটি প্রজন্মের ব্যবধান অথচ জীবনময়তার নিবাত, নিষ্কম্প শিখাটি কী আশ্চর্য জালিয়ে রেখেছিলেন হান্সের এই উত্তরসাধক।

নেক্সোর লেখা বই :

১ The Shadows

২ Pelle, the Conqueror

(i) Boyhood

(ii) Apprenticeship

(iii) The Great Struggle

(iv) Daybreak

৩ Ditte

(i) Ditte, Daughter of man.

(ii) Girl Alive !

(iii) Towards the Stars.

৪ Toward Dawn

৫ Autobiography of Nexo (4 vols.)

৬ Collection of Short Stories

বজ্রমণি

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাথরের নিচে হৃৎপিণ্ডগুলি
যেন নীলকান্ত মণির
মধ্যখানের মায়াবী রক্তবিন্দু।

তারা পাশাবতীর সঙ্গে খেলতে খেলতে
তার মুখ স্তন পায়ের পাতা
কিছুই দেখে নি।

তাদের সকল লাবণ্য আজ ফোঁটাফোঁটা
তৃষ্ণার রক্ত হয়ে
মাটির সেই গভীরে তলিয়ে গেছে
যেখানে হীরা ছাড়া আর কোনো অভিগমন নেই;
যেখানে প্রেম ক্ষয় হ'তে হ'তে এক অবিনশ্বর কঠিনতা।

জন্মদিন

রণজিৎ সিংহ

এসো সকালবেলার হাওয়া। পাখির ডাক। মাঠের পর মাঠের স্রোত। এসো পুরনো বসতির ভুলে যাওয়া গন্ধ—গনগনে দুপুরে ঘুরে ফেরা, একলা জাগার রাত, ফুল কুড়নোর ভোর, মেলা থেকে ঘরে ফেরা, সমুদ্রপারের অস্থিরতা…একবার এসো। আবার ভুলে যাব।

পায়ে পায়ে এসেছি কতদূর। কেননা আলিঙ্গনের উত্তাল উল্লাসক্ষণে শিহরণে শিহরণে গড়ে উঠেছিলাম। ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম মাটির উষ্ণ শুশ্রূষায়। শূন্যে হাওয়ার দুন্দুভি বেজেছিল।

আর সে দিয়েছে দুরধিগম্য দুর্গ জয়ের আশা।

একবার এসো ও ছেলেবেলা ও বয়ঃসন্ধি। সকালবেলার হাওয়া ফিরছে, পাখি ডাকছে, মাঠের স্রোত চোখে ভাসছে। একবার মুখোমুখি এসো, আবার ভুলে যাব। যাব দূরের দেশে অন্য বাসভূমে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান এবং বাঁট

হীরেন চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচেতনার পশ্চাদ্‌ভূমিরূপে ধ্রুপদের ভূমিকা নূতন উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথের জবানিতেই যদি এর সম্যক স্বীকৃতি না থাকত তাহলেও একে প্রমাণ করা কিছুমাত্র কষ্টকর হতো না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বাণী-রচনার ক্ষেত্রে ধ্রুপদের চার-তুকী স্থাপত্যকে কদাচিৎ অস্বীকার করা হয়েছে। স্বরারোপেও ধ্রুপদী চালকে সাধারণত মেনে নেওয়া হয়েছে অন্তরা এবং আভোগের সমন্বয়ে। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ইত্যাদি চালের গানও অবশ্য অল্পসংখ্যক নয় তথাপি সাঙ্গীতিক চেতনার এই পশ্চাদ্‌ভূমি অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করা না হয় যে, বাংলাদেশের নিজস্ব-রীতির কীর্তন এবং লোকসঙ্গীতও সেই ভূমির কম জায়গা জুড়ে নেই। ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীতের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পরিচয় নিতান্ত আবশ্যক। তাতে দুর্বল রসমুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে। এ কিন্তু অনুশীলনের জন্য, অনুকরণের জন্য নয়। আর্টে যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়। সেই সৃষ্টি আর্টিস্টের সংস্কৃতিবান মনের স্বকীয় প্রেরণা হতে উদ্ভূত।" ['সুর ও সঙ্গতি', পৃঃ ১৩]। ধ্রুপদী সঙ্গীত থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তার পরিমিতিবোধ এবং সুসঙ্গতি। ভারতীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত বিশেষত ধ্রুপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাঙ্গীতিক প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন সত্য কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বহুবিস্তৃত আলাপ, বিস্তার এবং জটিল অলঙ্করণকে তিনি তাঁর সাঙ্গীতিক প্রকল্প থেকে বর্জন করেছিলেন। এই বর্জিত অলঙ্করণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে খেয়ালী তান, ধ্রুপদী লয়-বাঁটোয়ারা এবং টপ্পার জমজমা। এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তিনি লিখছেন: "অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান এবং প্রাণ ভর্তি হয়েছে, যেমন হয়েছে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভাবে ও রসে।

কিন্তু অনুকরণ করলেই নৌকাডুবি ; নিজের টিকি পর্যন্ত দেখা যাবে না। **হিন্দুস্থানী সুর ভুলতে ভুলতে তবে গান রচনা করেছি।"** বড় অক্ষরের কথাগুলো সর্বদা স্মরণীয় নতুবা রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক প্রত্যয় সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ঘটার সম্ভাবনা সমধিক। তাঁর মতে: "আমাদের গানেও **হিন্দুস্থানী যতই বাঙালী** হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল, অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে।" রবীন্দ্র-সঙ্গীতে হিন্দুস্থানী আঙ্গিক এবং বাংলাকাব্যের মেজাজ এক সুষ্ঠু এবং সুপরিণত সংশ্লেষে সমন্বিত হয়েছে বলেই তা আমাদের কাছে এমন মনোহরণ রূপে দেখা দিয়েছে।

অতঃপর দুটো সিদ্ধান্ত অনিবার্য—প্রথমত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিশেষত ধ্রুপদের ভক্ত হয়েও রবীন্দ্রনাথ যে নতুন সঙ্গীত রচনা করলেন তা পুরোপুরি কেন আদৌ হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ, খেয়াল অথবা টপ্পার বাংলা নিদর্শন নয়; হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুরের কাঠামোটুকু ছাড়া বাকি সব অঙ্গই তিনি বর্জন করেছেন। তাঁর কথা থেকে আরো একটি খবর জানা যাচ্ছে যে, হিন্দুস্থানী আস্থায়ী ভেঙে তিনি যে সব ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ অথবা টপ্পা-অঙ্গের গান রচনা করেছেন তাতে মূল গানের আলাপ, বিস্তার এবং অলঙ্কার অর্থাৎ তান ইত্যাদি যথাসম্ভব বর্জন করে সেগুলিকে পুরোপুরি বাংলা কাব্যসঙ্গীতে রূপান্তরিত করেছেন। বাংলাগানের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "বাংলাদেশে সঙ্গীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ।"

দ্বিতীয়ত ধ্রুপদের বিলম্বিত এবং বিস্তৃত আলাপপদ্ধতিকে বর্জন করে তিনি গ্রহণ করলেন তার সুরের এবং বস্তুর স্থাপত্য যার সাঙ্গীতিক নাম হলো স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ। সুরের স্থাপত্যেও ধ্রুপদকে অনুসরণ করলেন বটে কিন্তু অন্ধভাবে নয়—রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঞ্চারী এক নতুন সৃষ্টি, তা প্রায়শ স্থায়ী সুরের পুনরাবৃত্তি নয়। মূল গানের সঙ্গে ভাঙা গানের তুলনামূলক বিচার করলেই দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের সমুদয় ভাঙা গান একজন বাঙালী কবির পরিশীলিত রুচি ও সচেতন সৌন্দর্যানুভূতির দ্বারা আচ্ছন্ন, মূল হিন্দুস্থানী গানের সঙ্গে তার রক্তের সম্বন্ধ হয়তো থাকতেও পারে কিন্তু নাড়ির টান নেই।

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদী গানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রাগের আলাপই হলো ধ্রুপদের অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ; ধ্রুপদী যন্ত্রসঙ্গীত সম্বন্ধেও

একই কথা। আলাপের পরে ধ্রুপদে আর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না; চার-তুকের কাব্যাংশটি হলো এক প্রকারের কন্‌সোলেশন প্রাইজ যার অভিপ্রেত প্রাপক হলেন স্বল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী। খেয়ালী রীতিতেও আলাপ (অধুনা বিস্তার) এবং তানাদি অলঙ্কার অবশ্যকরণীয়। টপ্পার ক্ষেত্রে বোলতান এবং জমজমা তান; ঠুংরীর ক্ষেত্রে 'তাও বাজানো'—এগুলি নির্দিষ্ট রীতির অপরিহার্য অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে এইগুলিকে বর্জন করেছেন। টপ্পা-অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীতে সামান্য অলঙ্কার দেখা যায় যেগুলিকে আমরা সাধারণত গিট্‌কিরি বলে থাকি; এগুলিকে তান না বলাই সঙ্গত। অতঃপর একথা বোধহয় কোনো প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলা চলে যে, তথাকথিত পুরোপুরি ধ্রুপদ অথবা খেয়াল অথবা টপ্পা অথবা ঠুংরী অথবা কীর্তন গান রবীন্দ্রনাথ একটিও রচনা করেন নি। নতুন একজন বৈজু বাওরা অথবা সদারঙ্গ হওয়ার বাসনা তাঁর মনে স্থান পায় নি। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন: "আমি পথ জানি না বলিয়াই হোক কিম্বা আমার মনটা লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের বলিয়াই হোক এতদিন গানের ঐ অপথ এবং আঘাটা দিয়াই চলিয়াছি। সুতরাং আমার অভিজ্ঞতায় যাহা মিলিয়াছে তাহা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না" ['সঙ্গীতের মুক্তি']। রাগসঙ্গীতের অলঙ্কার অর্থাৎ আলাপ, বিস্তার, তান, বাঁট ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: "মহাদেব, নারদ এবং ভরত মুনিতে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যদি আমাদের সঙ্গীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়া থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানিতেই পারি সৃষ্টি করিতে না পারি তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।" ['সঙ্গীতের মুক্তি']।

ধ্রুপদী নির্মিতির প্রভাব শুধু যে, হিন্দুস্থানী ভাঙা গানের বেলায়ই এসেছে তা নয়, আইরিশ এবং স্কচ মেলডি ভেঙে যে গান বেঁধেছেন সেখানেও দেখতে পাই ধ্রুপদী চার-তুকের বাঁধন। বস্তুত ধ্রুপদী-গাম্ভীর্য এবং সংযমের প্রতি তিনি যে পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন, ক্লাসিকাল সঙ্গীতের অন্যতম স্তম্ভ খেয়ালের ভাগ্যে তার ছিটেফোঁটাও যে জুটল না এ ঘটনা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীকেই বলা যায় খেয়ালী-রীতির স্বর্ণযুগ। স্পষ্টই বোঝা যায় খেয়াল এবং ঠুংরী রবীন্দ্রনাথকে তেমন রস জোগাতে পারে নি এবং সেই কারণেই বোধহয়

এই দুই রীতির প্রভাব রবীন্দ্রসঙ্গীতে খুব সামান্য। তুলনায় বরং টপ্পা এবং কীর্তনের প্রভাব বেশি। এর পরে বুঝতে কষ্ট হয় না কেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে জটিল তান এবং অনাবশ্যক অলঙ্করণের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেছিলেন। খেয়াল ঢঙের রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তানের নামগন্ধও নেই যেমন দরবারী কানাড়ার আশ্রয়ে ত্রিতালের ছন্দে বাঁধা "এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে" গানখানি। আশ্চর্য! এই গানে তানের সামান্য একটা গিটকিরি পর্যন্ত নেই। অথচ কীর্তনের আখরে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর কোনো কোনো গানে তার যোজনাও করেছিলেন। আখরকে তিনি নিজেই বলেছেন "কথার বিস্তার"। এই কথার বিস্তার প্রচুর যোজনা করেছিলেন "আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ" গানটিতে, কবির হস্তাক্ষরে যা মুদ্রিত হয়েছে।

বাংলা গানের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মিশ্র সঙ্গীতের পক্ষপাতী, শুদ্ধ সঙ্গীতের নয়। সুরের বেশে বাণীর নব নব রূপধারণই তাঁকে আকৃষ্ট করত বেশি। কাব্যব্যঞ্জনা এবং সুরব্যঞ্জনার সম্মিলিত রূপই ছিল তাঁর আরাধ্য। বলা যায় সাঙ্গীতিক রসের বিচারে তিনি ছিলেন মিশ্র রসের রসিক। সুতরাং শুদ্ধ সঙ্গীত যেখানে একান্তভাবে ধ্বনিনির্ভর এবং শুধুমাত্র রাগরূপায়ণে মগ্ন থেকে কাব্যাংশকে নিছক একটা উপলক্ষে পরিণত করে, তার বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত তার কাব্যার্থকে পরিস্ফুট করবার জন্য সঙ্গীতের ব্যাকরণকে দরকার হলেই লঙ্ঘন করে থাকে। যেমন "ফুল বলে ধন্য আমি" গানখানি ইমন রাগের উপরে। কিন্তু যেইমাত্র "দেবতা ওগো" কথাটা এলো অমনি দেখা গেলো ইমনী ধৈবতের এমন ক্ষমতা নেই যে, ঐ কাকুতিকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। সুতরাং আমরা পেলাম শুদ্ধ ধৈবতের জায়গায় কোমল ধৈবত। কিন্তু এটা যদি তথাকথিত ধ্রুপদ অথবা খেয়াল হতো তাহলে সে বলত "চুলোয় যাক তোমার কাকুতিমিনতি, তার জন্য আমার শুদ্ধ ধৈবতকে অশুদ্ধ করতে পারব না।" অনুরূপ পরিবর্তন হয়েছে "এবার নীরব করে দাও" গানটিতে। এই গানের "বাজাও", "কেড়ে", "রাতে" ইত্যাদি কথাগুলিতে যে কোমল ধৈবতের পরিবর্তে শুদ্ধ ধৈবত লাগানো হয়েছে সেটা শুধু ব্যতিক্রমের খাতিরে নয়—কাব্যার্থকে গভীর করার জন্য। "রাতে" কথাটিতেও কোমল নিষাদের পরিবর্তে শুদ্ধ নিষাদের ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি যে ইচ্ছাকৃতভাবে এসেছে তাও হয়তো নয়,

কাব্যার্থের স্বাভাবিক আকর্ষণেই এদের আবির্ভাব। সঙ্গীত যেখানে একান্তভাবে স্বরনির্ভর যেমন ধ্রুপদ এবং খেয়াল, সেখানে ইমনে কোমল ঋষভ, অথবা দরবারী কানাড়ায় শুদ্ধ নিষাদ এবং ধৈবত শুধু যে ব্যতিক্রম তাই নয়, তার স্বরপরম্পরার সঙ্গেও অসঙ্গতিপূর্ণ। যেহেতু অসঙ্গতি বিকৃতির জননী সেইহেতু কোনো কিছুর বিকৃত রূপায়ণ প্রীতিকর না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কাব্যসঙ্গীতের ব্যাকরণ আলাদা। সেইজন্য এই সামান্য ভ্রষ্টতার জন্য ইমনের এবং দরবারী কানাড়ার হয়তো মান গিয়ে থাকতে পারে কিন্তু গানের ব্যঞ্জনা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বচনীয় থেকে অনির্বচনীয়ের পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাকরণ শাস্ত্রীয় ব্যাকরণের ঘানি টেনে চলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়: "হিন্দুস্থানী গানকে আচারের শিকলে যাঁরা অচল করে বেঁধেছেন সেই ডিক্‌টেটারদের আমি মানি নে। যাঁরা বলেন, ভারতীয় গানের বিরাট ভূমিকার উপরে, নব নব যুগের নব নব যে সৃষ্টি স্বপ্রকাশ, তার স্থান নেই; ঐখানে হাতকড়ি-পরা বন্দীদের পুনঃপুন আবর্তনের অনতিক্রমণীয় চক্রপথ আছে মাত্র এমনতর নিশ্চোক্তি যাঁরা স্পর্ধাসহকারে ঘোষণা করে থাকেন তাঁদেরই প্রতিবাদ করবার জন্যই আমার মতো বিদ্রোহীদের জন্ম—সেই প্রতিবাদ ভিন্ন প্রণালীতে কীর্তনকাররাও করে গেছেন।" ['স্বর ও সঙ্গতি', পৃঃ ৮]। বলাই বাহুল্য ইমন, দরবারী কানাড়া প্রভৃতি সম্পূর্ণ রাগের বেলায় বিবাদী স্বর ব্যবহারের যুক্তি অচল।

রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ থেকে যখন মুক্তি পাওয়া গেল তখন গানের সম্মুখে একটা নতুন পথ খুলে গেল। শুধু যে বিদেশী গানগুলোকেই চার-তুকে বাঁধা হলো তা নয়, খেয়াল-ভাঙা এবং খেয়ালী ঢঙের গানেও এর পরে দুই-তুকের জায়গায় চার-তুক দেখা দিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখযোগ্য নটমল্লারের তেলেনা-ভাঙা ত্রিতালের গান "সুখহীন নিশিদিন"। এ ছাড়া ত্রিতালে বাঁধা বহু গান পাওয়া যায় যেগুলি প্রকৃতপক্ষে খেয়ালী রীতির দ্বারা প্রভাবিত যথা ইমনকল্যাণে রচিত "বাজোরে বাঁশরী বাজো", মল্লারের আশ্রয়ে রচিত "ঝর ঝর বরিষে বারিধারা", ত্রিতালের ছন্দে 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের পারে" ইত্যাদি গান। এই সমস্ত গানের ঢং যদিও খেয়ালী রীতির অনুরূপ কিন্তু এদের কাব্যাংশের নির্মিতি ধ্রুপদী পদ্ধতির অনুসারী অর্থাৎ চার-তুকে নিবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখ্য

রাখি রাখে সেতারের গৎ-ভাঙা দুটো গান "এসো শ্যামল সুন্দর" (দেশ, ত্রিতাল) এবং "মোর ভাবনা রে কী হাওয়ায় মাতালো" (গৌড়মল্লার, ত্রিতাল)। অর্থাৎ বিশুদ্ধ সঙ্গীত এবং বিশুদ্ধ খেয়ালের প্রেরণায় যে গান রচিত হলো সেখানেও গানের স্থাপত্য গড়ে উঠল ধ্রুপদী রীতিতে অর্থাৎ চার-তুকে। বস্তুত সাঙ্গীতিক প্রত্যয়ে সাবালকত্বপ্রাপ্তির পরে রবীন্দ্রনাথ আর দুই-তুকের গান রচনা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। খেয়ালী রীতির যতটুকু বা প্রভাব প্রথম যুগে তাঁর উপরে পড়ছিল, পরবর্তী যুগে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছিলেন। ফলত গাঠনিক বিচারে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, বাউল, কীর্তন ইত্যাদির মধ্যে কোনোই প্রভেদ নেই। এর প্রধান কারণ হলো এই যে, রাগ-রাগিণীর রূপবিকাশ অথবা বাদীসংবাদী, পকড়, গ্রহ, মূর্চ্ছনা ইত্যাদি ক্লাসিকাল বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনা করেন নি; তাঁর গান রচিত হয়েছে কাব্যার্থ ব্যক্তিত করার আবেগে। অথবা রচিত হয়েছে বলাও হয়তো ভুল, বলা উচিত আপনা থেকেই জন্মলাভ করেছে। কারণ ব্যতিক্রমগুলো যে সবসময় সজ্ঞানেই সাধিত হয়েছে এমনও নয়; কাব্যব্যঞ্জনার আকর্ষণে ব্যতিক্রমগুলো যেন আপনা থেকেই ঘটে গেছে—চেষ্টার দ্বারা তাদের ঘটানো হয় নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে তেওরার ছন্দে এবং বেহাগ রাগের আশ্রয়ে রচিত "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে" গানখানির উল্লেখ করা যায়। এই গানের অন্তরা এবং আভোগের "চোখে চোখে" এবং "তোমারি লাগিয়া" অংশদ্বয়ে শুদ্ধ নিষাদের জায়গায় যে কোমল নিষাদ ব্যবহার করা হয়েছে, শুদ্ধ সঙ্গীতের বিচারে তার কোনোই প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু আত্মনিবেদনের যে ব্যাকুলতা কথাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে তার সম্যক পরিস্ফুটন শুদ্ধ নিষাদের দ্বারা সম্ভব ছিল না। একটিমাত্র কোমল স্বরের ব্যবহার সুরব্যঞ্জনার সমস্ত পরিবেশকে অলৌকিক করে তুলেছে। বিবাদী স্বরের যুক্তি এখানে আদৌ খাটে না কারণ প্রথমত বেহাগে বর্জিত স্বর নেই এবং দ্বিতীয়ত বেহাগের নিষাদ খরজ অথবা ভৈরবের মতো দুর্বল নয়, এখানে নিষাদ হলো বেহাগের সংবাদী স্বর অর্থাৎ বেহাগের প্রাণের খবর দিচ্ছে—প্রাণটা হলো শুদ্ধ গান্ধার। শুদ্ধ নিষাদ থেকে মীড় টেনে সুর যখন পঞ্চমে এসে দাঁড়ায় তখনই আমরা চিনতে পারি এ ব্যক্তি বেহাগ ছাড়া আর কেউ নয়। কিন্তু, পূর্বেই বলেছি, রাগসঙ্গীত

আর কাব্যসঙ্গীতের ব্যাকরণ এক নয় এবং নয় বলেই এই স্রষ্টতা সত্ত্বেও গানখানি এক অনুপম ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এবংবিধ ব্যতিক্রম রবীন্দ্রসঙ্গীতে অজস্র। তালের দিক থেকেও দেখা যায় মূল গানের তালি ছন্দ তিনি বর্জন করেছেন, যেমন, ত্রিতালের বন্দেজে বাঁধা "বাজে ঝনন ঝনন" গানখানি ভেঙে রচিত হলো "এসো শরতের অমল মহিমা"। এই গানে শুধু যে গান্ধারী রাগ জৌনপুরীতে পরিবর্তন লাভ করেছে তাই নয়, তালটাও বদলে গেছে ত্রিতাল থেকে ঝং-এ। অনুরূপভাবে আমরা এমন অজস্র গান পেয়েছি যেগুলি বিশেষ কোনো রাগের আশ্রয়ে রচিত কিন্তু তাদের চাল লঘু—দাদরা অথবা কার্ফা। যথা বাহারের আশ্রয়ে দাদরা তালে "আমি তোমারি সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ" ইত্যাদি। এগুলিকে একতাল অথবা ত্রিতালের তালি ছন্দে বাঁধলে কারো কারো আচারলালিত সাঙ্গীতিক কুসংস্কার হয়তো পরিতৃপ্ত হতে পারে কিন্তু তাতে গানের শ্রী অন্তর্হিত হবে। যেমন দাদরা তালে বাঁধা "প্রখর তপনতাপে" গানখানিকে একতালের বন্দেজে খেয়ালের মতো করে যে গাওয়া যায় না তা নয় কিন্তু তা করলে এই গানের বাণী, ছন্দ এবং সুরের সমন্বয়ে নৈদাঘ প্রকৃতির যে তাপক্লিষ্ট অবসন্ন কারুণ্য প্রকটিত হয়ে উঠেছে, সেই সুকুমার লঘুপক্ষতা খেয়ালী দাপটের ঠেলায় পালাবার পথ পাবে না। কাহারবা ছন্দেও এমন অসংখ্য গান আছে যেগুলিকে ত্রিতালের বন্দেজে খেয়ালী ঢঙে গাওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু তার ফলে সেগুলিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে আর চেনাই যাবে না।

যে কোনো জাতির পরিচয় যেমন তার সাধারণ বিশিষ্টতায় এবং তার দ্বারাই যেমন তার চারিত্র্য সূচিত হয় তেমনি যে কোনো জাতের গানের পরিচয়ও তার চলনের বিশিষ্টতায়, তার বলনের অনন্যতায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যে আমরা শোনামাত্রই অন্য যে কোনো সঙ্গীত থেকে স্বতন্ত্র করে চিনতে পারি সে হচ্ছে তার এই চলনবলনের স্বাতন্ত্র্যের কারণে। এর দ্বারা অবশ্য অপরাপর সঙ্গীতের ঊনত্ব সূচিত হচ্ছে না, বরং স্বীকৃত হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বকীয়ত্ব। ভালো হোক, মন্দ হোক, এইটে তার নিজস্ব পরিচয়। এই পরিচয় বিশেষ রূপে সূচিত হয় তার গায়নভঙ্গি এবং রীতির দ্বারা। এই গায়নরীতি পুরোপুরি ধ্রুপদী নয়, খেয়ালী নয় বা কীর্তনীও নয়—এই গায়নরীতিও রবীন্দ্রনাথের অনুপম সৃষ্টি। সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে,

গায়নরীতি গানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই রীতিকেই সাঙ্গীতিক পরিভাষায় বলা হয় গায়কি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সৃষ্টির সঙ্গে তার একটা বিশেষ গায়কির নক্সাও সৃষ্টি হয়ে গেছে—এ জিনিষ অনেকের ভালো লেগেছে, অনেকের লাগে নি। 'রাবীন্দ্রিক' অথবা 'শান্তিনিকেতনী ন্যাকামী' বলে এককালে অনেকেই একে ব্যঙ্গ করেছেন। কারো কারো কাছে আবার এই রীতি এফিমিনেসির প্রকারভেদ বলে নিন্দিতও হয়েছিল। যাই হোক মূলকথা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা নিজস্ব গায়নপদ্ধতি বহুকাল যাবত স্বীকৃত হয়ে এসেছে যা অপরাপর গায়নপদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। এ গায়কি যাদের মনঃপুত হয় নি তারা চিরকাল একে বর্জন করে এসেছেন। এই গায়কি উদ্ভবের একটা প্রায়োগিক ইতিহাসও রয়েছে। শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতভবন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলাদেশের কিছু আলোকপ্রাপ্ত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে এবং তৎকালীন গায়কগায়িকাদের মধ্যে অপেশাদার মনোবৃত্তি প্রবল হওয়ার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীত বৈঠকী সঙ্গীত হয়ে উঠতে পারে নি। সেদিনেও রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল গুটিকয় রুচিমান ব্যক্তির নিরালায় ভালো লাগার গান। অনুষঙ্গ (accompaniment) হিসেবে থাকত একটিমাত্র যন্ত্র—হারমোনিয়ম, নয়তো এস্রাজ, নয়তো পিয়ানো, নয়তো অর্গান—প্রায়শ খালি গলায়ই এ গান গাওয়া হতো। তবলা প্রভৃতি তালযন্ত্রের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এর নানাবিধ কারণ থাকা স্বাভাবিক তবে সে আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর। তালযন্ত্রের শাসন না থাকার ফলে গায়কি এক নতুন রূপান্তর লাভ করল যার সাক্ষাৎ ফলশ্রুতি হলো এক নতুন জাতের গান যার সাঙ্গীতিক নাম মুক্ত ছন্দের গান। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখযোগ্য "মেঘের পরে মেঘ জমেছে", "কখন দিলে পরায়ে", "বাজে করুণ সুরে" ইত্যাদি। স্বরলিপিতে যদিও এদের রূপ তালবদ্ধ কিন্তু কার্যত এগুলি বি-তালের অর্থাৎ গদ্যছন্দের গান। কবিতায় গদ্যছন্দের মতো গানে গদ্যছন্দের প্রবর্তকও রবীন্দ্রনাথ।

এযাবৎ আলোচিত তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা হয়তো অন্যায় হবে না যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চায় ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন এই সব কথা বলার মতো অসার্থকতা আর কিছু হতে পারে না। অবিমিশ্র ধ্রুপদ অথবা খেয়াল অথবা কীর্তন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারে একটিও নেই। না থাকার কারণ এই যে, বাঁধা সড়কের ধ্রুপদীয়া অথবা খেয়ালীয়া অথবা

কীর্তনীয়া হিসেবে চিহ্নিত হবার জন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভাকে নিয়োজিত করেন নি। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন ইত্যাদি সহজ ভাগে বিভক্ত করা মস্ত বড় একটা ভ্রান্তি। পূর্ণাঙ্গ ধ্রুপদ অথবা খেয়াল অথবা টপ্পা অথবা ঠুংরী অথবা কীর্তনের আস্বাদ রবীন্দ্রসঙ্গীতে দুর্লভ— রবীন্দ্রসঙ্গীতে যা পাওয়া যায় তা হলো সূক্ষ্ম কাব্যানুভূতির সঙ্গে সাঙ্গীতিক কল্পনার নিঃশেষে এক হয়ে যাওয়া। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রকৃত অভিধা হলো এককথায় রবীন্দ্রসঙ্গীত—না ধ্রুপদ, না খেয়াল, না টপ্পা, না কীর্তন— শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত। ভারতীয় সঙ্গীতের কণ্ঠে নানান্ সঙ্গীতের নানান্ ধরনের মালা চিরকালই ছিল, চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকবেও আশা করা যায়—বাউল আছে, ভাটিয়ালী আছে, কাজরী আছে, কাওয়ালী আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত তেমনি স্বতন্ত্র এক জাতের সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক প্রত্যয়ের কথা স্মরণ রাখলে তাঁর গানের গায়নরীতির বিষয়ে অন্তত সমস্যা উদ্ভবের কোনো হেতু নেই।

দুই

হেতু না থাকলেই কিছু অহৈতুকী উপদ্রব মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পর্বে এর বিলক্ষণ প্রাবল্য প্রমাণিত সত্য। আড়ানা রাগে বারো মাত্রার ত্রৈমাত্রিক ছন্দের একটা গান যখন সাকুল্যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাঙ্গ হয়ে গেল, সমবেত ওস্তাদমণ্ডলী তখন হৈ-চৈ বাধিয়ে দিলেন: "আলাপ নেই, তান নেই, বাঁট নেই, এ কেমনতর গান?" এতে তাঁরা সন্তুষ্ট নন বলেই তাঁরা একে নতুন রূপে বাঁধলেন; এলো তান, এলো বাঁট, তেহাই দিয়ে গান সমাধা হলো। গানটির নাম "মন্দিরে মম কে আসিলে হে"। এই গানটির কালোয়াতী রূপ আমরা বহুলোকের মুখে শুনেছি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়। আবার এ গান আমরা শান্তিনিকেতনের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের মুখেও শুনেছি—তাঁদের গানের প্রতিরূপ স্বরলিপিতে নিবদ্ধ আছে ['স্বরবিতান': ৩৪র্থ খণ্ড]। রাবীন্দ্রিক গায়কিতে তান-বাঁট কিছুই নেই—নিরাভরণ একটি কাব্যসঙ্গীত। সেযুগে যেহেতু রেকর্ড করবার অনুমতির দরকার হতো না সেইজন্ত প্রথমোক্ত ধরনের কিছু কিছু রেকর্ডও বেরিয়েছিল। বেরিয়েছিল বলেই যে সেগুলি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত এমন মনে করবার অবশ্য কোনো

হেতু নেই এবং এই রকম দৃষ্টান্তও খুব বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বিরোধী আন্দোলনটা তেমন শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি যেহেতু স্বয়ং স্রষ্টার ভর্ৎসনাকে তাঁরা একটু ভয়ের চোখে দেখতেন। তাছাড়া ১৯৩৪ সালের পর থেকে রেকর্ড বেরুবার পূর্বে অনুমোদন সংগ্রহের একটা শর্তও কোম্পানীগুলোর স্কন্ধে চাপানো হয়েছিল যার পরিণতি হচ্ছে অধুনাতন মিউজিক বোর্ড।

বাংলা গানে যদি রাগরাগিণীর ছায়া থাকে এবং তথাপি যদি তাতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অলঙ্কারের কমতি দেখা যায় তাহলেই তা অসম্পূর্ণ— এই সাঙ্গীতিক কুসংস্কারটির বয়স খুব প্রাচীন। একদা কৃষ্ণনগরে এক গানের বৈঠকে রবীন্দ্রনাথকে গান গাইতে অনুরোধ করায় তিনি গেয়েছিলেন: "বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই"। তান-বাঁট বিবর্জিত সাধারণ একটা গান। কিন্তু এরই জন্য রবীন্দ্রনাথকে সেদিন বড় নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল। ওস্তাদমহল ছাড়বার পাত্র নন, তাঁরা মন্তব্য করলেন: "হ্যাঁ, বাঁশরী অনেকেই বাজাতে চায় বটে কিন্তু সকলেই তা পারে না কারণ বাঁশরী বাজাতে জানা চাই" ইত্যাদি। গান শুনে সন্তুষ্ট না হওয়ার হেতু, বলাই বাহুল্য, যোগ্যতার অভাব নয়, হেতু সেই সাঙ্গীতিক কুসংস্কার। গায়ক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতা তখনকার দিনে প্রশ্নাতীত।

রবীন্দ্রনাথের লোকান্তরের পরে এই কালোয়াতী আন্দোলনটা আবার মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। কিছু কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে যেহেতু কালোয়াতী ধ্রুপদ এবং খেয়াল গানের সাদৃশ্য দেখা যায় সেইহেতু এক শ্রেণীর বাঙালী কালোয়াতের ধারণা হয়েছে যে, ওগুলি আসলে বাংলা ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল এবং টপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলিতে যে পূর্ণাঙ্গ রাগসঙ্গীতের অলঙ্করণ অর্থাৎ তান, বাঁট, বিস্তার ইত্যাদি যোজিত হয় নি তা (এঁদের মতে) হয় রবীন্দ্রনাথের অথবা তাঁর উত্তরসাধকদের অজ্ঞতা এবং অক্ষমতা।

আমাদের সঙ্গীতের একটা প্রাচীন রেওয়াজ এই যে, স্রষ্টার কর্ম যেইমাত্র সমাপ্ত হলো অমনি একজন মিড্‌লম্যান এসে হাজির হন; তাঁর বক্তব্য: "হয়েছে, তোমার কর্তব্য শেষ। এই বেলা বেবাক মালপত্র আমার হাতে দিয়ে দাও। এর পরের কাজ আমিই করব, তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না।" এই মিড্‌লম্যানটির পারিভাষিক নাম হলো ওস্তাদ বা

গাইয়ে। তাঁর প্রকৃতি অনেকটা সরকারী আমলার মতো—শুধু মাইনে নিয়ে তিনি খুশি নন, উপরি পাওনা কিছু না দিলে তাঁর কাছ থেকে কাজ পাওয়াই কঠিন। উপরি পাওনাটা হলো গানে স্বেচ্ছাচারের অবাধ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন মানতে চান নি এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বোধহয় প্রত্যেকটি গানের সুর স্বরলিপির বাঁধনে বেঁধে দিয়ে গেছেন যাতে ওস্তাদের দর্প খর্ব থাকে। ওস্তাদ লোকটাকে তিনি বিলক্ষণ ভয় করে চলতেন যেজন্য তিনি লিখেছেন: "কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাড়িতেই থাকে। কেননা, ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। এইজন্য ভারতের বৈঠকী সঙ্গীত কালক্রমে স্বরলতা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে। সেখানে তানমানলয়ের তাণ্ডবটাই প্রবল হইয়া ওঠে, আসল গানটা ঝাপসা হইয়া থাকে।" ['সবুজপত্র', ভাদ্র ১৩২৪, পৃঃ ২৫৯]।

ইদানীং কলকাতার এক শ্রেণীর গায়কদের মধ্যে একটা ধুয়ো উঠেছে—রবীন্দ্রসঙ্গীত বড় সাদামাটা, বড় নিরাভরণ; রাগসঙ্গীতের কিছু ভারি এবং জমকালো অলঙ্কার তার অঙ্গে না চাপালে তার চেহারাটার নাকি তেমন খোলতাই হচ্ছে না। ফলত খেয়াল-ভাঙা রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান এবং ধ্রুপদ-ভাঙা রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাঁটের ধুম পড়ে গেছে। প্রথম যুগে ওস্তাদমহলে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে যে উন্নাসিক মনোভাব দেখা গিয়েছিল, বর্তমান আন্দোলনকে তার বংশধর বলা চলে। তখনকার ওস্তাদেরা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বিচার করেছিলেন রাগসঙ্গীতের নিরিখে যেজন্য বিচারে কিঞ্চিৎ বিভ্রাট ঘটেছিল। তাঁরা এই সামান্য কথাটা সেদিন অনুধাবন করেন নি যে, দেশে এমন জাতের সঙ্গীত পূর্বেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকা সম্ভব যার বিচার রাগসঙ্গীতের তুলাদণ্ডে করা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। রাগসঙ্গীত, কাব্যসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের স্বাদ এবং ব্যাকরণ যেমন আলাদা, তাদের বিচারপদ্ধতিও তেমনি স্বতন্ত্র হওয়াই স্বাভাবিক। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ ধরনের বিচারবিভ্রাট আমরা হামেশাই দেখতে পাই। কাব্যবিচারের ভারটা যতদিন আলঙ্কারিকদের হাতে ন্যস্ত ছিল ততকাল তাঁরা অলঙ্কারের নিরিখেই কাব্যের বিচার করেছেন। ফলাফল কি হয়েছিল সাহিত্যসেবীমাত্রেই জানেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাণশক্তির প্রাবল্যে ঊনবিংশ শতকীয় কালোয়াতী

শিবিরের বৈরিতা ব্যর্থ হয়েছে বটে কিন্তু অদ্যতন বাংলাদেশে সেই বৈরিতাই মিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আজকের দিনে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যথেষ্ট অলঙ্কারমণ্ডিত নয় সিদ্ধান্ত করে তাকে যথোচিত আভরণমণ্ডিত করার স্ব-আরোপিত দায়িত্ব স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন তাঁরা সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের আপাত অনুরাগী এবং চর্চাকারী। এর মধ্যে প্রথম উল্লেখের দাবি রাখেন এই রাজ্যের সঙ্গীতনাটক আকাদমির ডীন শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত ধ্রুপদীয়া শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র এবং নিজেও হিন্দুস্থানী ধ্রুপদীরীতির একজন প্রবক্তা বলে দাবি করে থাকেন। অবশ্য এঁর কণ্ঠে পূর্ণাঙ্গ হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ শোনার খুব বেশি সুযোগ আমাদের ঘটেনি কারণ রমেশবাবু বেশির ভাগ (এমন কি বেতারেও) ধ্রুপদাঙ্গ এবং খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতই করে থাকেন। ধ্রুপদের বিশিষ্ট এবং প্রধান অঙ্গ আলাপচারিতে এঁর দক্ষতা, স্বকীয়তা এবং রসবোধ পরিমাপ করবার সুযোগ আমাদের বিশেষ ঘটেনি। শিশিরকালীন যে জলসা এবং সম্মেলনগুলিতে যাদৃশ-তাদৃশ-বিত্ত সঙ্গীতরস সংগ্রহ করে থাকে, সেখানে রমেশবাবুর মতো গায়কের সাক্ষাৎ সচরাচর মেলে না। তবে ত্রৈবার্ষিক রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনে, শতবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং বেতারে রমেশবাবুর তান-বাঁট লাগানো কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনবার উপলক্ষ আমার ঘটেছিল। রমেশবাবুর গান শোনার পরে এই বিষয়টা আমার সাধ্যমতো অনুসন্ধান করেছি; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতসম্পর্কিত রচনা এবং বিভিন্ন লেখকের রবীন্দ্রসঙ্গীতবিষয়ক আলোচনাদি পর্যালোচনা করেছি; রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এমন সাহিত্যিক এবং গায়কদের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। অতঃপর যে কয়টি সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে উঠেছে, সেগুলিকে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎপথবর্তীদের তথা সঙ্গীতজিজ্ঞাসু পাঠকবর্গের গোচরীভূত করতে ইচ্ছা করি। এই প্রসঙ্গে আরো একজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা উচিত—তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বনামখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত। খেয়ালাঙ্গ এবং টপ্পা-অঙ্গের গান পরিবেশনে শ্রীমতী দত্তকেও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে দেখা যায়। জনশ্রুতি এই যে, শ্রীমতী দত্তর অধুনাতন সঙ্গীত-উপদেষ্টা শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তা যদি হয় তাহলে অবশ্য অনুসৃতি বা প্রভাব অস্বাভাবিক নয়। এই সম্পর্কে আমার যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন এঁদের সকলের কাছেই বিনীতভাবে উপস্থিত করছি।

সংযোগ করে গেয়েছিলেন। আরো একজন ব্যক্তি আজো জীবিত আছেন যিনি ছিলেন দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী। তিনি হলেন সঙ্গীতভবন-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার। তাঁর অভিমতও তান-বাঁটের বিপক্ষে। সঙ্গীতভবনের শিক্ষক এবং প্রবীণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাক্ষ্যও তান-বাঁট সংযোগের দাবিকে সমর্থন করে না।

বাকি রইলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শ্রীদিলীপকুমার রায় এবং স্বর্গীয় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কবির সঙ্গে একদা যে পত্রযুদ্ধ করেছিলেন, বাংলা-সাহিত্য এবং সঙ্গীতের ইতিহাসে সে কথা অবিস্মরণীয়। তান-বাঁট ইত্যাদির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি ধূর্জটিবাবুর 'সুর ও সঙ্গতি' গ্রন্থটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্র-দিলীপ পত্রাবলীও প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রকৃতি এবং তাদের পারস্পরিক পার্থক্য সম্বন্ধে কবি তাঁর মতামত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এছাড়া 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধটিতেও তিনি তাঁর সাঙ্গীতিক প্রত্যয় ব্যাখ্যা করেছেন। এই মতামত-গুলো মনে থাকলে রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান-বাঁট ব্যবহার করা রমেশবাবুদের পক্ষে সম্ভব হতো না বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি যুক্তি প্রায়ই শোনা যায়—স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী এবং শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়রা নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীতে তান-বাঁট যোগ করে গেয়ে শুনিয়েছিলেন এবং সেই গায়নরীতি নাকি কবির অনুমোদন লাভ করেছিল। রাধিকাবাবুর গানের রেকর্ড আমরা শুনেছি; যদিও রেকর্ড তবু একটা ভাত টিপলেই তো হাঁড়ির খবর পাওয়া যায়। রেকর্ডে (P9178) রাধিকাবাবু দুটো গান গেয়েছেন—একতালে রামকেলী রাগে "মগন যদি জাগিলে" এবং ত্রিতালে বাঁধা গান্ধারী রাগে "বিমল আনন্দে জাগোরে"। দুটি গানই খেয়ালের ঢঙে গাওয়া। বস্তুত কেউ যদি গান দুটি শোনেন তাহলে প্রথমেই যে কথাটি তাঁর মনে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, বাংলা খেয়ালের আদর্শ নিদর্শন যদি কোথাও থেকে থাকে তাহলে সে হলো ঐ দুটি গান। গানের বাণীটুকু গাওয়ার পরে বিভিন্ন তাল থেকে তান নিয়ে গানের মুখে এসে পড়েছেন গায়ক। রেকর্ডের অর্ধাংশে আছে গান বাকি অর্ধাংশে তান। এত দীর্ঘ মাপের তান রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো গানে কোনোদিন ব্যবহার হতে দেখা যায় নি। বস্তুত এই গান শুনলে কারো মনে হবে না যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছি; বরং মনে হওয়া

স্বাভাবিক যে, হিন্দী খেয়ালের বাংলা অনুবাদ শুনছি। গান্ধারী রাগে শ্রীযুক্ত শচীন দেববর্মনের "যদি দখিনা পবন" রেকর্ডের সঙ্গে গায়নরীতির বিচারে রাধিকাবাবুর গানের কোনোই পার্থক্য নেই। রাধিকাবাবুর রেকর্ডকে যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে মেনে নিতে হয় এবং এই তানক্রিয়া যদি রবীন্দ্র-অনুমোদিত হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, বাংলা খেয়াল অর্থাৎ আধুনিক রাগপ্রধান গানে আর রবীন্দ্রনাথের খেয়াল-ভাঙা গানে কোনোই তফাৎ নেই। তাহলে কি আমরা সঙ্গত কারণেই বলতে পারি না যে, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় সৃষ্টি বলে কিছু নেই? রাধিকাবাবুর গাওয়া "বিমল আনন্দে" গানটির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এটিও একটি বাংলা খেয়াল—রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়। এই গানের একটা রাবীন্দ্রিক রূপ প্রকাশিত হয়েছে, গেয়েছেন শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রেকর্ড বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড-এর অনুমোদিত এবং রবীন্দ্রনাথের সুরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ['স্বরবিতান' : ৪৫]। রাধিকাবাবুর তান এই রেকর্ডে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, রাধিকাবাবুর গাওয়া গান দুটোর সুরের ছকটুকু মাত্র রবীন্দ্রনাথের—সম্পূর্ণ সুরটা রবীন্দ্রনাথের নয়। এই রেকর্ডের স্বরলিপির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বরলিপির তুলনামূলক বিচার প্রকৃত শিক্ষাদায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। রাধিকাবাবুর এই সুর রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করেছেন এমন প্রমাণ নেই বরং প্রকাশ্যে ধিকৃত করেছেন এমন প্রমাণের অভাব আছে বলা যায় মাত্র। তাছাড়া নিন্দা করেন নি বলেই কি বুঝতে হবে প্রশংসা করেছেন? এমনও তো হতে পারে যে, ভালোও লাগে নি অথচ নিন্দা করবারও উপায় ছিল না। এই গানের বিরোধী নঞর্থক প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে, এই গান শোনার পরেও "বিমল আনন্দে জাগোরে" গানের স্বরলিপিটি তিনি 'স্বরবিতান'-এ স্থান দিয়েছেন। সেটাকে বর্জন করে রাধিকাবাবুর গানের স্বরলিপিকে তার স্থানাভিষিক্ত করার নির্দেশ দেন নি। তাঁর প্রত্যক্ষ শিক্ষণের অধীন ছাত্রছাত্রীদের এই সুর না শিখিয়ে তাঁর পূর্ববর্তী সুরই শিখিয়ে গেছেন। সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ, অমলা দাশ, কনক দাশ, শৈলজারঞ্জন, শান্তিদেব, সুবিনয় রায়—কারো মধ্যেই আমরা রাধিকাবাবুর সুরের প্রভাব খুঁজে পাই না।

গান শোনানোর পর রবীন্দ্রনাথ যদি রাধিকাবাবু অথবা গোপেশ্বর-

বাবুদের তারিফ করে থাকেন তবে সেটা সাধারণ সৌজন্য হিসেবেই গ্রহণীয়, অনুমোদনের লক্ষণ হিসেবে নয়। আর রাধিকাবাবুর গানের প্রশংসা করেছেন হিন্দুস্থানী পদ্ধতির গান হিসেবে, রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবে নয়। এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবুকে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন: "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকার তাঁদের সুরের মধ্যেকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা চেয়েছিলেন।......কিন্তু আমার গানে তো আমি সে রকম ফাঁক রাখি নি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।" এইজন্যই বোধহয় রাধিকাবাবুর রেকর্ড সম্বন্ধে সারাজীবন তিনি নীরব থেকে গেছেন; প্রখর সৌজন্যবোধের জন্য হয়তো সমালোচনা করতে বেধেছে। এই নীরবতা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওস্তাদ হিসেবে রাধিকাবাবুর গুরুত্ব লাঘব করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বিনীত বক্তব্য এই যে, রাধিকাবাবুর রেকর্ড রাধিকাবাবুরই নিজস্ব সৃষ্টি, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তার যোগ নেই—রবীন্দ্রসঙ্গীতের আদর্শ হিসাবে তা কদাপি গ্রহণীয় নয়।

আর রাধিকাবাবুর দোহাই দিয়ে রমেশবাবু পার পাবেন কি করে? রাধিকাবাবু তান করেছেন সত্যিকারের বাংলা খেয়াল গানে যার বাণী দুই-তুকে নিবদ্ধ কিন্তু রমেশবাবু তান করেছেন চার-তুকের ধ্রুপদাঙ্গ গানে। গায়ক হিসেবে এখানেই তিনি ভ্রষ্ট। এর পরে যদি তিনি যাবতীয় ত্রিতাল, একতাল এবং ঝাঁপতালের চারটে তুকে তানক্রিয়া করতে থাকেন তাহলে বাংলা খেয়াল এবং রাগপ্রধান গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনোই পার্থক্য থাকবে না। রমেশবাবু ইচ্ছা করলে "মেঘের পরে মেঘ জমেছে" গানটাকেও তো ত্রিতালের বন্দেজে ফেলে তাতে কবে তান লাগাতে পারেন। তবে সামান্য অসুবিধে হবে এই যে, তানের ঠেলায় মেঘ আর জমবার অবকাশ পাবে না, তার আগেই হাওয়া হয়ে উড়ে যাবে। ইচ্ছা করলে "সমুখে শান্তি পারাবার" গানটিতেও তো অনুরূপ ভাবে তান করতে পারেন, বাধা দিচ্ছে কে? এটাও খেয়াল-ভাঙা গান এবং এটার বন্দেজও ত্রিতালের। তৎপূর্বে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির প্রতি রমেশবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করব: "কিন্তু যদি আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে ফল উল্টাই হয়। তাহা হইলে গান কেবল দুর্বল হইতে থাকে। সে তানে নিয়ম যতই জটিল এবং বিশুদ্ধ থাকনা কেন গানকে সে কিছুতেই রস দেয় না, তাহা হইতে সে কেবল হরণ

করিয়াই চলে"। রমেশবাবুর তান গানের কোনো আনন্দানুভূতিকে ব্যক্ত করে না বলেই তা ব্যর্থ। রমেশবাবু যে তান করেন তা কাব্যসঙ্গীতের তান নয়, তা হলো খেয়াল অর্থাৎ শুদ্ধ সঙ্গীতের তান। কাব্যসঙ্গীতের তান রবীন্দ্রনাথ নিজেই যোগ করে গেছেন, পুনঃসংযোজনের অবকাশ রেখে যান নি।

কালোয়াতী সঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম প্রধান পার্থক্য শব্দ উচ্চারণের পদ্ধতিতে। ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রধান তাল হলো চৌতাল, এর গতি দ্বিমাত্রিক—তার চলন অনেকটা লেফ্‌ট-রাইটের মতো। এই দ্বিমাত্রিক ছন্দের প্রভাবে গানের বাণী কাটা কাটা ভাবে উচ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্রুপদ-ভাঙা গানে বাণীর উচ্চারণকে কাব্যিক আবৃত্তির অনুসারী করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানের উচ্চারণ হিন্দী প্রভাবিত নয়, বাংলা উচ্চারণের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এতে বজায় রাখা হয়েছে। ধ্রুপদী উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেক পর্বের অর্থাৎ তালের প্রথম অক্ষরটিকে একটু ধাক্কা দিয়ে উচ্চারণ করা যায় ফলে একটা অল্পপ্রাণ বর্ণও অনেক সময় মহাপ্রাণ বর্ণে রূপান্তরিত হয়। ব্রজভাষায় অথবা হিন্দুস্থানী যে কোনো একটা ধ্রুপদের কাব্যাংশ গাইলেই একথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে এই রকম আঘাত সৃষ্টি করার রেওয়াজ নেই। আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো সমের অক্ষরটাতে এসে আঘাত করে দাঁড়ানো—এটিকেও রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন। কিন্তু রমেশবাবুরা যখন "বাণী তব" গানটি করেন তখন গানের বাণীগুলিকে উচ্চারণ করেন হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের রীতিতে। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী, সুর এবং অলঙ্কার মিলে এক অখণ্ড ঐক্যে সমন্বিত হয়েছে। কিন্তু রাধিকাবাবু বা রমেশবাবুর গানে এই অখণ্ড ঐক্যের সমাবেশ নেই।

বাঁট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিমত এখানে উদ্ধৃত করছি। "তোমাদের (ধূর্জটিবাবুদের—লেখক) ওখানে গানের মজলিশে ছায়ানট গাওয়া হয়েছিল।......ছায়ানটের যত রূপান্তর আছে, তান-কর্তব, সারেগম, যত রকম লয়ে-বিলয়ে তাকে উল্টানো-পাল্টানো যেতে পারে তার কিছুই বাদ পড়ে নি। আমার অভিমত জানতে চাও; সময় খারাপ, বলতে সাহস করিনে।......সুন্দরীর গায়ে যখন মানানসই একখানি মাত্র শাড়ি দেখি, বলি বাস্‌ হয়েছে, বলিনে জন্মাগত সব কটা শাড়ি ওর গায়ে চাপালে ভালোর মাত্রা বাড়তেই থাকবে......ইংরেজি ভাষায় বলতে পারি, যদি ক্ষমা করো, art is never an exhibition, but a revelation" ['সুর ও সঙ্গতি',

পৃঃ ৯—১১]। রমেশবাবুরা যখন "বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে গগনে লোকে লোকে" কথাগুলোকে চৌতালের ছন্দে দুনে চৌদুনে বন্টন করে দেখান, তাতে কৌশলের পরিচয় থাকে বটে কিন্তু সুন্দরের রিডিলেশান থাকে না। সেইজন্যই এই লয়-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "সঙ্গীতের বক্স-ভাণ্ডার থেকে তালের পর তাল আসতে লাগল দুন চৌদুন বেগে, বাহবা দিতে দিতে তোমার গলা যায় ভেঙে। মূল্যের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না; কিন্তু সে মূল্য বক্সরাজের খাতাঞ্চিখানায়।" রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর গানে তান-বাঁটের ব্যবহার অনমুমোদন করেছিলেন, এই উদ্ধৃতিগুলি হচ্ছে তারই অকাট্য প্রমাণ।

যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি রমেশবাবুর দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তার মধ্যে আশ্চর্য এবং শোচনীয় দৃষ্টান্ত হলেন শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত। শ্রীমতী দত্ত শান্তিনিকেতন সঙ্গীতভবনের প্রাক্তন ছাত্রী এবং সেই কারণেই তাঁর মধ্যে কোনো বিচ্যুতি দেখলে আমরা স্বভাবতই ব্যথিত না হয়ে পারি না। গত ৭ই মে সকালে কলকাতা বেতারে "গগন যদি ডাকিলে" গানখানি তিনি যেভাবে গেয়েছেন, তার সঙ্গে বাংলা খেয়াল অথবা রাগপ্রধান গানের পার্থক্য কোথায় বা কতটুকু? সুরকার হিসেবে হিমাংশু দত্ত মহাশয় এবং রবীন্দ্র-নাথের মধ্যে যে একটু পার্থক্য আছে (যতটুকুই হোক), আশা করি শ্রীমতী দত্ত তা অনুধাবন করে দেখবেন। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় ত্রিতাল এবং একতালের গানগুলি যদি এই রীতিতে গাওয়া যায় তাহলে তার মধ্যে রবীন্দ্রত্ব কতটুকু থাকবে? মুক্ত ছন্দের গানগুলির বেলায়ই বা কি ব্যবস্থা—এ জিজ্ঞাসাটুকুও শ্রীমতী দত্তর কাছে রাখছি। অথচ "গগন যদি ডাকিলে" গানটির একটা রাবীন্দ্রিক সুরও আছে—কলকাতা বেতার থেকে যে মাসের এগারো তারিখের সকালে শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সুরটি গেয়েছেন। এতে সংক্ষিপ্ত টপ্পার অলঙ্করণ আছে কিন্তু লহরে লহরে তান নেই। এ গান আদৌ তালের গানই নয় যেমন নয় "বাজে করুণ সুরে"। শ্রীমতী দত্ত একথাও নিশ্চয়ই মানবেন যে, রাধিকাবাবুর সুর যদি রবীন্দ্রনাথের এতই অনুমোদিত হতো তাহলে তার একটা স্বরলিপি করিয়ে সঙ্গীতভবনে সেটা শেখানোর ব্যবস্থা তিনি অনায়াসে করে যেতে পারতেন এবং 'স্বরবিতান'-এও তাকে স্থান দিতে পারতেন। এই নিষ্ক্রিয়তা কি খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়? আশী বছরের সুদীর্ঘ জীবনে কোনো অনুষ্ঠানেই যে তিনি রাধিকাবাবুর ঢঙে একটা গানও কাউকে

দিয়ে গাওয়ালেন না—এ ঘটনাও কি কম তাৎপর্যের? আর একথাও কি শ্রদ্ধেয় যে, রবীন্দ্রনাথ মুখে বলেছেন এক কথা আর কাজে শিখিয়েছেন অন্য রকম?

রমেশবাবু এবং শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত নিশ্চয়ই জানেন, ভারতবর্ষে রাগাশ্রিত এমন বহুগীতরীতি আছে যাতে তান এবং বাঁটের দৌরাত্ম্য নেই, খোদ ধ্রুপদেই তো তান নিষিদ্ধ। লখ্‌নউ এবং বেনারসী ঘরানার ঠুংরিতে তান করা নিন্দনীয়। রাগাশ্রিত কীর্তন গানে তানও নেই, বাঁটও নেই। কালোয়াতী গানেই যদি তান বর্জিত হতে পারে তাহলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো মেজাজী কাব্যসঙ্গীতেই বা তা হবে না কেন? তাছাড়া রাগের আশ্রয় আছে বলেই কি রবীন্দ্রসঙ্গীত রাগসঙ্গীত? "এবার নীরব করে দাও" অথবা "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে" গানে যে স্বরসমন্বয় আছে তার দ্বারা কোন রাগের পরিচয় সূচিত হচ্ছে? রমেশবাবু এবং রাজেশ্বরী দত্ত কি এমন কোনো কালোয়াতের সন্ধান জানেন যিনি রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ইমন-কল্যাণ অথবা বাগেশ্রীতে বর্ষার গান রচনা করেছেন? এটা কি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুমোদিত? রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক প্রত্যয়ে অনাস্থা প্রকাশ করবার অধিকার রমেশবাবুর এবং শ্রীমতী দত্তর নিশ্চয়ই আছে; রবীন্দ্রনাথের কোনো গানকে তাঁরা যদি যথেষ্ট অলঙ্কৃত বিবেচনা না করেন তাহলে সেগুলিকে মন্দ বলবার অথবা সেগুলিকে বর্জন করার অধিকারও তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেগুলিকে নিজ খেয়াল-খুশিমতো সংস্কৃত করার অথবা তাতে স্বকীয় অলঙ্কার সংযোজনের অধিকার তাঁদের আছে কি? তাঁরা কি শেক্‌স্পীয়রীয় নাটকের সংলাপে কোনো সংযোজন করতে পারেন? পারেন কি তাঁরা পাশ্চাত্য কোনো সুরকারের রচনায় হস্তক্ষেপ করতে? অথচ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের গুণগানে এঁরাই আবার পঞ্চমুখ। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে শিল্পীর স্বাধীনতা কতটুকু তা কারো অজানা নেই। তবু তো পাশ্চাত্য নিবদ্ধসঙ্গীত মরে যায় নি। তাহলে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কেই বা এই অহেতুক দুশ্চিন্তা এবং অবরদস্তির হেতু কি? পুনশ্চ অলঙ্কৃত গানই দীর্ঘজীবী, অনলঙ্কৃত গান নয়—এ সিদ্ধান্তের পিছনেও ইতিহাসের সমর্থন নেই। এককালে বাংলা দেশে 'চর্যাপদ' এবং 'গীতগোবিন্দ'-এর পদ রাগসঙ্গীতের প্রভাবে গাওয়া হতো। কিন্তু আজ তাদের সুরের বা রীতির হদিশ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে যে হিন্দুস্থানী-মার্কা বাংলা গানের প্রচলন

হয়েছিল, তারা আজ কোথায়? তারা বাঁচতে পেয়েছে কি? অথচ কাওয়ালী, কীর্তন, হিন্দুস্থানী ভজনগীতি এবং লোকসঙ্গীত আজো বেঁচে আছে। অনলঙ্কৃত গান যদি ক্ষীণজীবী হতো তাহলে এদের তো এতদিনে যমালয়ে জায়গা হওয়ার কথা।

আর একটি পুরনো রেকর্ডের প্রতি আমি শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—শ্রীহরেন দত্তর গাওয়া "এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর" (P6574)। শ্রীমতী দত্ত নিশ্চয়ই এই গানের সুরের সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত আছেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি—এই রেকর্ড শুনলে তিনি আমার চেয়েও অবাক হয়ে যাবেন। শ্রীহরেন দত্ত যেভাবে গানটার মধ্যে স্থানে অস্থানে গিটকিরি মেরেছেন তাতে রবীন্দ্রসুরের খোলসটুকুই মাত্র আছে, প্রাণটা নেই। হরেনবাবুর আড়ির ছন্দ, বটকা, গিটকিরি ইত্যাদি কর্ণগোচর না করে লিখে বোঝানো কঠিন। আশা করি শ্রীমতী দত্ত রেকর্ডটি সংগ্রহ করে শুনে নেবেন। রাজেশ্বরী দেবী কি এই গান এই ঢঙে গাইবেন? রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের দ্বারা রেকর্ড হয়েছে বলেই এগুলি তাঁর অনুমোদিত, এর চেয়ে কুযুক্তি আর কিছু হতে পারে না। সন্দেহ নেই যে, এই সব ভদ্রলোকেরা রবীন্দ্রনাথের সুজনতা এবং সহনশীলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সকলেই তাঁর গানের পিছনে আপন আপন পাণ্ডিত্যের লেজুড় জুড়ে দিয়েছেন। আর এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল এমন সময়ে যখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে একটা স্বতন্ত্র গায়নরীতি ও বৈশিষ্ট্য আছে, একথাটা তখনো পরিপূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেনি। তখনকার গাইয়েরা এই সামান্য কথাটা মেনে নিতে পারেন নি যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, বাইরে থেকে তার মধ্যে যোগ করার মতো কোনো অবকাশ রচয়িতা রাখেননি। সেরকম অবকাশ থাকলে তিন হাজার গানের স্বরলিপির কোনো না কোনোটাতে আমরা তান অথবা বাঁটের দেখা পেতাম।

এই ধরণের এক্সপেরিমেন্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন বলেই তিনি বলেছেন: "আমার গানের বিকাশ প্রতিদিন আমি এত শুনেচি যে আমারও ভয় হয় যে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়ত সম্ভব হবে না।" তার সাম্প্রতিক প্রমাণ আমরা রমেশবাবু এবং শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তর মধ্যেই দেখছি—তাঁদের গানে যে পরিমাণগত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে

তার ফলে গুণগত পরিবর্তন না হয়েই পারে না। এই নতুন রীতির গানকে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতরূপে গ্রহণ না করে বলা উচিত কালোয়াতী রবীন্দ্রসঙ্গীত, অথবা রমেশসঙ্গীত আখ্যা দেওয়াই বোধহয় অধিকতর বৈজ্ঞানিক।

কিছু খেয়াল-ভাঙা এবং টপ্পা-ভাঙা গান শান্তিনিকেতনে চিরকাল মুক্ত-ছন্দে গীত হয়ে এসেছে। মুক্তছন্দের গানগুলি কোন রীতিতে গাওয়া উচিত তার নির্দেশ রবীন্দ্রনাথের নিজের রেকর্ড থেকেই তো তাঁরা নিতে পারতেন। ভৈরবীতে বাঁধা "অন্ধজনে দেহ আলো" গানখানি স্বরলিপিতে ত্রিতালের ছন্দে আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ গানটি গেয়েছেন মুক্তছন্দে (P8867)। ফলে সুরের যে একটু পার্থক্য হয়েছে তার পরিচয় পুরনো স্বরলিপি এবং রেকর্ডের স্বরলিপির তুলনামূলক বিচার থেকেই প্রমাণ হবে ['স্বরবিতান' : ২৭, পৃঃ ৭ এবং ৮৮]। অনুরূপ রীতিতে রবীন্দ্রনাথ আরো একটি গান রেকর্ড করেছেন, সেটি হচ্ছে "তবু মনে রেখো" (H. 1.)। পুরনো স্বরলিপি এবং রবীন্দ্র-রেকর্ডের স্বরলিপিতে যে পার্থক্য আছে ['স্বরবিতান' : ৫০, পৃঃ ১২-১৫] তার দ্বারা একথাই প্রমাণ হবে যে মুক্তছন্দের গান তালবদ্ধ ভাবে গেয় নয়। প্রায়োগিক ইতিহাসের মাধ্যমে মুক্তছন্দের গানের গায়কির যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে সেগুলিকে তালবদ্ধ করে গাওয়ার অত্যুৎসাহ সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতা এবং রসবোধের পরিচায়ক নয়। রবীন্দ্রনাথের গাওয়া যদি হয় গেরস্থবাড়ির আলপনা তাহলে রমেশবাবু-রাজেশ্বরী দেবীর গাওয়াকে বলব আর্ট কলেজের আলিম্পন। কালোয়াতী-রবীন্দ্রসঙ্গীত গানে এবং অলঙ্করণে পরিপূর্ণ ঐক্যে সার্থক হয়ে ওঠে না।

রবীন্দ্রনাথ বহুবার দেশবাসীর কাছে মিনতি জানিয়েছেন যাতে তাঁর গানগুলো তাঁর সুরে তাঁর মতো করেই গাওয়া হয়; যাতে ওগুলিকে তাঁর গান বলেই চেনা যায়। তিনি আরো অনুরোধ করেছেন, সাঙ্গীতিক স্থূলতার স্টীম রোলার যেন তাঁর গানের উপর দিয়ে চালানো না হয়। আজ দেখা যাচ্ছে, ভদ্রলোকের ঐ কাতর আবেদন বধির কর্ণে নিপতিত হয়েছে। তবু আমরা আশা করব, শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত আমাদের কথাগুলো অনুধাবন করবার চেষ্টা করবেন। আমরা আরো আশা করব, তাঁদের গায়নের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত রবীন্দ্রসঙ্গীতই থাকবে; অন্য কিছু, কোনো রবীন্দ্রেতর-সঙ্গীত, হয়ে উঠবে না।

প্রবন্ধটি বিতর্কমূলক। বিশেষত শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত সম্পর্কে লেখকের সিদ্ধান্ত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আহ্বান করছি—সম্পাদক

জতুগৃহ

বিজন ভট্টাচার্য

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অধ্যাপক রসময় গুপ্ত-র স্টাডি। সকালবেলা। আরাম কেদারায় শুয়ে মোটা একখানা বই পড়ছেন হাতলের ওপর রেখে। বুদ্ধিদীপ্ত প্রৌঢ়ত্বের শেষ প্রসন্ন চেহারা সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। চোখে কালো ফ্রেমের মোটা চশমা। মুখে চুরুট। পাশের সেন্টার-টেবিলে স্তূপাকার বই। কাঠের দুই ব্লেডওলা পুরনো মডেলের একটি ফ্যান এক পয়েন্টে মাথার ওপর ঘুরছে। দরজায় জানালায় ভারি স্ক্রীন। নিস্তব্ধ পরিবেশ।

ভৃত্যসহ স্ত্রী সুহাস-এর প্রবেশ। ভৃত্যের হাতে ট্রে-তে কফির সরঞ্জাম। কফি দিয়ে ভৃত্য চলে গেলে সুহাস কফি বানাতে থাকেন নারী চরিত্রের সেই সব বিশিষ্ট গতিপ্রকৃতি দিয়ে, স্থূলাঙ্গিনী হয়েও যা গোটা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ধীর মন্থরে সভ্যশালীন।]

সুহাস : হ্যাঁগা, অসীম নাকি রিসার্চ স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাচ্ছে?

রসময় : উঁ,—হ্যাঁ।

সুহাস : ঠাকুমা মত দিলেন? [কফি দেন]

রসময় : [উঠে বসেন] তা এখন সে কালাপানি তো আর কালাপানি নেই। কালাপানি হয়েছে গঙ্গাজল। গঙ্গাসাগর-মেলার যাত্রীর মতোই লোকে এখন বিলেত আমেরিকা যাচ্ছে।

সুহাস : যাচ্ছে বলে যাচ্ছে! খোদ লণ্ডন শহরে বাঙালীরা এখন নাকি শুনি খুলনা সমিতি, যশোর সমিতি খুলে বসেছে। কে-এক দত্ত নাকি সেখানে হোটেল খুলে বসেছে কেশ বলছিল; কালোজিরে, সরষে-বাটা আর কাঁচালঙ্কার ছড়াছড়ি সেখানে। সে ইলিশ মাছের পাতুরি নাকি তুমি বাংলাদেশেও খেতে পাবে না। অথচ আগে শুনতুম এই বিলেত যাওয়া নিয়ে সে কত হাপা!

রসময় : তারও কারণ ছিল। তখনকার দিনে ছেলেপুলে বিলেত যাবে শুনলে মা বাপ ভাবত ম্লেচ্ছ হয়ে যাবে ছেলে। জাতকুল ডুবিয়ে ফেরবার সময় নির্ঘাত একটি মেমসাহেব বিয়ে করে আনবে। পরে যুগধর্মে সে ভয়টাও অনেকটা কেটে গেল। ব্রহ্মণ্যতেজের সঙ্গে ইণ্ডিয়া হাউসে স-টিকি তিন-চার বছর কাটিয়েও সেই ছেলে আবার বাংলাদেশে ফিরে এসে কুলুজী কোষ্ঠী মিলিয়ে পালটি-ঘরে বিয়ে করে ঘর-সংসারী হলো, তারও নজির আছে।…নৈরাত্ম্যবাদী নৈরেকার হলো তার অনেক পরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকে ও তার পরবর্তীকালে। উগ্র জাতীয়তাবাদ খতম হলো তো এলো তোমার গিয়ে খানিকটা পোস্ট সেভেনটিন এইট্টি নাইনের আবহাওয়া। বিশ্বপ্রেম-সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার যুগ—গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় আবার মালাবদল শুরু হলো, বিক্রমপুরের ছেলে বিয়ে করে আনল আমেরিকান বউ, কেউ নরউইজিয়ান, কেউ সুইডিস, কেউ জার্মান ; তোমার ছেলে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে বিয়ে করে নিয়ে এলো যেমন স্কচ্-মেয়ে। …অবিশ্যি ভালো বুঝেছে বিয়ে করেছে সে-কথা নয়, আসলে কি জানো, এই মন দেয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা আমার মনে হয় বিদেশিনীর সঙ্গে তেমনটি জমে না। অবিশ্যি জানি না, আমার ক্যালকুলেশন সত্যি না-ও হতে পারে।

সুহাস : আবার সত্যি নয় তো কি ? তোমার আস্কারা পেয়ে পেয়েই তো ছেলেপুলে আজ এতটা স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছে। …বাপমায়ের ইচ্ছে জলাঞ্জলি দিয়ে বংশ কিনা বিয়ে করে আনল একজন মেমসাহেব ; বীরু একজন বিয়েই করল না, কি না স্ত্রীলোক তার জীবনে 'স্যাট্' করবে না। ছোট ছেলে অমল যদি বা বিয়ে করে ঘরসংসারী হলো তো ভোগবাসনা তার বাড়তে বাড়তে এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে কুবেরের সম্পদেও তার নিবৃত্তি নেই। টাকা আর টাকা, সে একেবারে হন্তে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভূ-ভারত। অথচ ত্যাখো, তাতেও কি শান্তি আছে ?

রসময় : দুঃখ করো না, দুঃখ করো না। দুঃখু করে কোনো লাভ নেই। কার্পণ্য তো কিছুই করো নি। অর্থে, সামর্থ্যে, ছেলেদের জন্যে

যতটুকখানি যা করবার মোটামুটি সবই করেছ। এখন তারা যদি তাদের কর্তব্য না করে তো…

সুহাস : আমি কিছুই চাই না। আমি নিজে কি কিছু প্রত্যাশা করি রে! শুধু ভাবি যদি কোনো কাজে লাগি তোদের, এখনও। তা তোরা যদি মনে করিস প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে আমার, তো নিস না পরামর্শ।

রসময় : কি জানো, জীবনে যদি আদর্শবাদ একটা না থাকে তো দাঁড়ানো বড্ড মুস্কিল। কোনো একটা কিছুতে স্থির বিশ্বাস দরকার।

সুহাস : ছেলে বিয়ে দেব, ঘর সংসার করব, কত আশা করেছিলাম। হুঁঃ, কোথায় ঘর আমি বাঁধব না ঘর আমার আরও ভেঙে গেলো।

রসময় : ঐ তো, কথা বল্লেই তোমার খালি হা-হুতাশ আর আত্মানুশোচনা। অত দুঃখ করো কেন?

সুহাস : রাখো রাখো, বোকার মতো কথা বোলো না। তোমরা বেটা-ছেলেরা পাঁচটা বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকো, দরকারী অদরকারী পঞ্চাশটা ঝামেলায় সময় কাটে তোমাদের। কিন্তু মেয়েরা, মেয়েরা কি করবে শুনি? এক তোমাদের পরিচর্যা…

রসময় : কেন, বাইরের কাজও তো করছেন দেখি আজকাল মেয়েরা।…

সুহাস : তিনটে মেয়ে কেরানী হলো কি আর সমস্যা মিটে গেল মেয়েদের। কি যে বলো তার মাথামুণ্ডু নেই।

রসময় : তা অবিশ্যি বটে।

সুহাস : তো তবে?…তা সে যাই হোক মেয়েরা না হয় না-ই করল বাইরের কাজ, ঘরে কাজ আছে ঘরেই রইল তারা—সেবাব্রত, সাংসারিক দায়দায়িত্ব, সব কিছু সুষ্ঠুভাবে—করা সে-ও তো তোমার চাড্ডিখানি কথা নয়। কিন্তু এই সেবাধর্ম সংসার প্রতি-পালন, এ সব থেকেও যদি বঞ্চিত করে রাখা হয় তাদের তো তারা কি নিয়ে থাকবে বলতে পারো? স্বামীপুত্রের গৌরবে গরবিণী হবার স্বাভাবিক অধিকারটুকুও যদি তারা না পায়—কেন, আমি কি কিছু বেশি চেইছিলাম সংসারের কাছে।

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী : ও, হোম পলিটিক্স। যাই বাবা!

রসময় : আহা, কি বলবে বলে এসেছিলে বলেই যাওনা, শুনবেন মা।

সুহাস : [মেয়েকে] চিপটেন কেটে কথা বলতে শিখছিস খুব তোরা। পলিটিক্সটা আবার কি হলো শুনি? ঝক্কি তো আর নিতে হলো না।

কল্যাণী : না বাবা, কেউ কোনো ঝক্কি নেয় নি, গোটা সংসারটা তুমি একা চালাচ্ছ, হলো তো।

সুহাস : [রসময়কে] শুনলে, শুনলে মেয়ের কথা, ভাখ কন্নু···

রসময় : [চতুর হেসে] একেবারে Scathing যাকে বলে। ইস্, এটা কল্যাণী তোমার···

সুহাস : [মেয়েকে] তোদের এই ঘোরানো প্যাঁচানো কথায়—ভাবিস খুব বড় বড় একজন বুবরায় হইছিস তোরা, তুই একজন, তোর দাদা একজন···[রসময়কে] আর তুমি বুড়ো-মানুষ, মুখ টিপে হাসছ তোমার লজ্জা করছে না?

রসময় : [সভয়ে] এই কন্নুই তো এসে সব গণ্ডগোল বাধালে। না না, এ তোমার ভারি অন্যায় কল্যাণী, যাই বলো।

কল্যাণী : বারে, আমি আবার কি অন্যায় করলুম।

রসময় : না না, একটা subtle অন্যায় হয়েছে।' You must admit.

সুহাস : [রসময়ের প্রতি] থাক, আর ব্যাখ্যানে কাজ নেই তোমার।

রসময় : আচ্ছা চুপ, এই চুপ করলাম।···কি বলতে এসেছিলে বলো মাকে স্পষ্ট করে, হ্যাঁ।

কল্যাণী : আমি বলতে এসেছিলাম, আমার একটা জায়গায় বেরুবার কথা ছিল বিকেলে। আমার এক বন্ধুর বাড়ি। সে ফোন করেছে। কি করব?

সুহাস : বেরোবার কথা ছিল, এদিকে আমরা সব যোগাড়যন্তর করে বসে আছি, কথা দিয়েছি ভদ্রলোককে—তুমি আমায় আগে কেন বল্লে না? আগে জানলে আমি কক্ষনো···

কল্যাণী : আমি সেই কথাই জিজ্ঞেসা করতে এসেছিলাম, ঠিক আছে বেরুব না।

রসময় : Not to day. Make it to-morrow. To-morrow there-

will be no fooling and no dusty death. কালকে করো appointment, কেমন ?

কল্যাণী : As you like it. বেশ।

[প্রস্থান]

রসময় : একটা কথা ছিল সুহাস।

সুহাস : কি ?

রসময় : শোনো, বোসো। কথাটা হচ্ছে, রঞ্জনকে তোমাদের ভালো লেগেছে, কল্যাণীরও কি ঠিক ভালো লেগেছে ?

সুহাস : ভালো লেগেছে মানে ?

রসময় : ভালোলাগা বুঝতে পারো না ? কি বলব…

সুহাস : হ্যাঁ, সে ওপর ওপর যতটা বুঝি তাতে করে ভালো না লাগার তো কোনো কারণ দেখি নে। তবে ভেতর ভেতর মেয়ের এখন কি মনোভাব…

রসময় : সেইটেই তো বুঝতে হবে। রঞ্জন আসে-মেশে ভালো কথা। কিন্তু ব্যবহারিক ভদ্রতা এক, অনুরাগ জিনিসটা আর এক।

সুহাস : যখন সম্বন্ধ করেই বিয়ে হচ্ছে তখন অনুরাগের প্রশ্নটাই বা বড় করে ধরছ কেন তুমি। সমৃদ্ধ বড় বংশের ছেলে, শিক্ষিত, মার্জিত রুচি, সুদর্শন চেহারা, বীতরাগের তো কোনো কারণ দেখি নি মেয়ের। আর ধরো কথায় বলছি, কোনো কারণে মেয়ের যদি অপছন্দই হয়, সে ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধ কি তুমি হাতছাড়া করতে পারো ? মঙ্গলামঙ্গল দেখতে হবে না মেয়ের ?

রসময় : নিশ্চয় নিশ্চয়।

সুহাস : আর তা ছাড়া হাবভাবে তো বুঝতে পারি। মিশছে, হাসছে, খেলছে, বেড়াচ্ছে।

রসময় : সেইটুকুই তো শুনতে চাচ্ছি তোমার কাছে। তা তুমি সে কথা বলছ না, বাজে-বাজে তর্ক তুলছ। তবে আবার কি !

সুহাস : বন্ধুর বাড়ি appointment আছে বলছিল না, সব বানানো। আসলে বিকেল হলেই মেয়ের সে ছটফট ছটফট ভাব, দেখা তো করবি ছাই রঞ্জনের সঙ্গে।

রসময় : তা হলে তো Done. খুব ভালো কথা। মেয়ের temparament

তো আমি জানি। অত্যন্ত অভিমানিনী, ভীষণ sensative, একটা mental alliance যদি ইতিমধ্যে হয়ে থাকে তো খুবই ভালো বলতে হবে। I am happy Suhas.

সুহাস : তা হলে আমরাও একটু স্বস্তি পাই বাপু।

রসময় : যা হোক, রঞ্জনের বাবা নাকি মেয়ে দেখবেন শুনছিলাম।

সুহাস : হ্যাঁ, বলছিল তো কংশ। এখন কি করেন, কবে আসবেন, রাজারাজড়ার ব্যাপার।

রসময় : রঞ্জনের বাবার খেতাব আছে নাকি, রাজা বলছ ?

সুহাস : বাঃ, কত বড়লোক। খেতাবেই কি শুধু রাজা হয়।

রসময় : ও, টাকাওলা। তাই বলো।

[ফোন বেজে ওঠে]

সুহাস : হ্যালো। কে ? কে, কল্যাণী ? ডেকে দিচ্ছি। [রসময়কে] মেয়ের ফোন। কল্লু! এখন থেকে খালি ফোন আসবে। তিষ্টুতে দেবে বাড়িতে ? সত্যি ছেলেমেয়ের এই মন দেয়া-নেওয়া আমার এত ভালো লাগে।

রসময় : কে, রঞ্জন ফোন করছে বুঝি ?

সুহাস : আস্তে বলতে পারো না কথা। তোমার যদি কোনো সাড় থাকে। অ কল্লু। কোথায় গেলো। [স্বামীকে] বেরিয়ে যেও ঘর থেকে মনে করে। কল্লু।

[স্বামী-স্ত্রী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে রসময় একটু বেশি বিচলিত হয়ে পড়েন। সুহাসের প্রস্থান।]

[দ্রুত কল্যাণীর প্রবেশ]

রসময় : কল্যাণী, তোমার টেলিফোন।

[দ্রুত প্রস্থান]

কল্যাণী : [ফোন তুলে] Yes, yes, h'm h'm. এই তো সাড়া দিচ্ছি।... একা একা। কেন, taste tube তো সবেই আছে। যেতে হবে ? না, না। আমার কিন্তু বাড়িতে থাকবার কথা, জানো।... আচ্ছা আচ্ছা, এক্ষুনি আসছি, বাব্বাঃ।...এই ধরো পৌঁছে গেছি।

[আনন্দে আত্মহারা হয়ে গান গাইতে থাকে—বাশিজেতে যাব, আমি যাব আমি যাব। তাড়াতাড়িতে প্রসাধনটা শেষ করে নেয়]

[সুহাসের প্রবেশ]

সুহাস : কি রে! আমি না তোকে বারণ করলুম আজ বাইরে যেতে।

কল্যাণী : মা, এই যাব আর আসব। একদম দেরি করব না। লক্ষ্মী মা, অমত করো না।

[রসময়ের প্রবেশ]

রসময় : কি, ব্যাপার কি ?

সুহাস : দেখেছ মেয়ের কাণ্ড, বেরুতেই হবে বন্ধুর বাড়ি একবারটি।

রসময় : তুমিও রাজি হয়ে গেলে তো!

সুহাস : কি বলি বলো তো।

রসময় : [কল্যাণীকে] তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু মা।

কল্যাণী : হ্যাঁ বাবা।

[দ্রুত প্রস্থান]

সুহাস : দেখলে তো! রঞ্জন ফোন করলে…

রসময় : দেখলাম। আমার খুব ভালো লাগল সুহাস। খুব ভালো লাগল।

সুহাস : লাগবেই তো। লাগবে না! কত আনন্দের ব্যাপার!…কি দেখছ!

রসময় : দেখছি তোমাকে, আজ আবার নতুন করে। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, তোমার মনে পড়ে সুহাস—!

সুহাস : সব মনে আছে।

রসময় : তোমাদের সেই আলিপুরের বাড়ি…

সুহাস : টেনিস-কোর্টের লনে সন্ধেবেলা সেই বেতের চেয়ার পেতে বসা…

রসময় : আর পাগলা সাহেবের সেই ঝড়ের মতো পিয়ানো বাজানো…!

[রঞ্জনের নেপথ্য কণ্ঠ : কল্যাণী! কল্যাণী! সচকিত হয়ে ওঠেন রসময় ও সুহাস]

[রঞ্জনের প্রবেশ]

রঞ্জন : কল্যাণী!

সুহাস : কে রঞ্জন!

রঞ্জন : কল্যাণী কোথায় মাসীমা ?

সুহাস : কল্যাণী…[স্বামীর দিকে তাকান]…আচ্ছা, আমি দেখছি।

[রঞ্জনের দ্রুত প্রস্থান]

[রঞ্জনের নেপথ্য কণ্ঠ তখনও শোনা যায় : কল্যাণী, কল্যাণী, কল্যাণী—]

রসময় : তবে যে তুমি বলছিলে রঞ্জন টেলিফোন করছিল !

[হতবাক পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকেন]

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কাটা-জানালার ভেতর দিয়ে ল্যাবরেটরির একাংশ পরিদৃশ্যমান—কাঁচের জার, কাঁচের টিউব আর বর্নারের নলের মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। নীলচে আগুনে টেস্ট টিউবে কি একটা পরীক্ষা করছে অসীম। সন্তর্পণে কল্যাণী প্রবেশ করে। তার ছায়া গিয়ে পড়ে ল্যাবরেটরির ওপর।]

অসীম : এক্ষুনি আসছি, হুঁঃ। আবার বলা হলো, ধরো পৌঁছে গিছি, —chuky মেয়ে ! ···সব চালাকি, সমস্ত মিথ্যে কথা, liar. ···আরে বাবা এখান থেকে তো এখানে, তিন ফার্লং রাস্তা, এর ভেতরে তিনবার যাতায়াত হয়ে যায়—ঠিক আছে। হামভি দেখ লেগা।···এসো না, আজ টেরটি পাবে। অসীম সেনকে এখনও চেনো নি তুমি মেয়ে, [অনবধানতাহেতু টেস্ট টিউবটির পতন]—যা চলে !

কল্যাণী : [এগিয়ে গিয়ে] তা অত ঝগড়া করলে যাবে না পড়ে ?

অসীম : ছি ছি, কি করলে বলো তো ?

কল্যাণী : বাঃ, আমার দোষ বুঝি !

অসীম : আলবাৎ, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়েই তো হলো ব্যাপারটা।

কল্যাণী : তা, তুমি যদি এখন বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ঝগড়া করো !

অসীম : এই তুমি যদি খানিকটা আগে আসতে তো এ ঝগড়াও বাধত না, আমার টেস্ট টিউব-ও ভাঙত না।

কল্যাণী : আগে মানে কত আগে অসীম! কোন কয়বার দশ মিনিট-এর মধ্যেই তো এসে পড়েছি।

অসীম : আর কোনই বা করতে হবে কেন রোজ রোজ। নিজে থেকে আসতে পারো না?

কল্যাণী : বারে, কখন কোথায় থাকো…

অসীম : জেনে নেবে।

কল্যাণী : কি করে অসীম।

অসীম : গুণে।

কল্যাণী : মানে?

অসীম : মানে ··

কল্যাণী : শুনি শুনি।

অসীম : জানি জানি।

কল্যাণী : কি?

অসীম : কিচ্ছু না।

কল্যাণী : আচ্ছা কাল থেকে ঠিক আসব।

অসীম : মাফ করো। আজকের একটা finding-ও আমার corrct হয় নি।…আশ্চর্য, এমন একটা Vacuam-এর ভেতরে rut করছে মনটা, সকাল থেকে কি বলব স্রেফ তোমার কথা মনে হচ্ছে। ফানেল-এর ভেতরে তুমি, টেস্ট টিউবে তুমি, সব কিছু আড়াল করে আছ।

কল্যাণী : বিজ্ঞানী-তুমি যে কবি হয়ে উঠলে অসীম!

অসীম : তবে একটা কথা আমার সত্যিই মনে হয় কল্যাণী কি জানো, perhaps this Atom, অর্থাৎ পরমাণু, যেটা আমার research-এর বিষয়বস্তু, this atom can only be harnessed by poetry, love, an unbounding love for every quintessence of dust. সত্যি কল্যাণী, ভালোবাসা, প্রেম—কথাগুলো শুনেই এসেছি এতদিন, বুঝতে পারি নি। কি জানো, পুরুষ, পুরুষ যদি হয় পরমাণু, তবে তুমি-প্রকৃতি আমাকে বিদীর্ণ করতে পারো মহত্তর কোনো কল্যাণের খাতিরে—only a woman's love. কি জানি এমনি সব এলোমেলো কথায় বড়-

তুফান তুলে আনো তুমি আমার মনে আর আমি খড়কুটোর মতো দিশেহারা হয়ে যাই। তুমি কথা বলছ না কেন?

কল্যাণী : তুমি তো জানো অসীম, দর্শন শাস্ত্রের ছাত্রী ছিলাম আমি। বিজ্ঞানীর কোনো জ্ঞানই নেই আমার। বস্তু নিরপেক্ষ তত্ত্বের কথা যা জানি, তা তোমার ভালো লাগবে না।

অসীম : তত্ত্ব নিরপেক্ষ বস্তু নেই, আবার বস্তু নিরপেক্ষ তত্ত্ব-ও হতে পারে না, এই তো তোমার আমার সকলের আশার কথা কল্যাণী। তোমাকে বাদ দিয়ে আমি, যা আমি নেই শুধু এক তুমি, আমি ভাবতে পারি না কল্যাণী।

কল্যাণী : আমি-ও পারি না অসীম। তবে কি জানো, ভয় হয় পাছে তোমাকে এতটুকু খর্ব করি। ভালোবেসে শেষটায়…

অসীম : এ তোমার এড়াবার প্রশ্ন কল্যাণী। দুঃখ বিনা সুখ, সে সুখ— হ্যাঁ ঝুঁকি আছে। ঝুঁকি নিতে হবে।

কল্যাণী : তুমি আমাকে অভয় দাও।

অসীম : কিন্তু আগে চাই বরাভয়, তুমি 'কল্যাণী'। বাবাকে কথাটা বলেছ?

কল্যাণী : না।

অসীম : কেন?

কল্যাণী : আজ বলব।

অসীম : হ্যাঁ, যে কথা বলতেই হবে…

কল্যাণী : বলতেই হবে, না?

অসীম : নিশ্চয়। তোমার মনোরঞ্জন করতে পারবে এক এই অসীম সেন, এই বলে দিলাম। কোনো রঞ্জন রায়ের এতটুকু scope নেই সেখানে।

কল্যাণী : আচ্ছা আচ্ছা, বাব্বাঃ! আচ্ছা অসীম!

অসীম : চলো গল্প করতে করতে এগিয়ে যাওয়া যাক।

কল্যাণী : তাই চলো। দেখেছ!

অসীম : কি হলো?

কল্যাণী : তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরবার কথা ছিল আমার, ভুলেই গেছি।

অসীম : ওটা আপেক্ষিক। আবার কত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যায়।

কল্যাণী : আচ্ছা তুমিই বলো তো !

অসীম : আর বলো কেন। বাবাকে বলো, প্রফেসর ঠিক বুঝবেন।

কল্যাণী : বলব।

অসীম : না, আজই বলো।

কল্যাণী : আচ্ছা আজই। আজই বলব।

অসীম : চলো।

কল্যাণী : চলো।

পর্দা

[ক্রমশঃ

অস্ট্রিয়ার শুল্ক-কর্তৃপক্ষ

জারোস্লাভ হাসেক্

ড্রেসডেনের কাছে ভ্রমণকালে আমি এক দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম। যখন পদব্রজে সেখানে বিচরণ করছিলাম তখন হঠাৎ একটি এক্সপ্রেস ট্রেন আমাকে চাপা দিয়ে চলে যায় এবং এমন সুনিপুণ কৌশলে আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে যে ডাক্তারদের দেড় বছর সময় লেগেছিল আমাকে আবার জোড়া লাগাতে। এই দুর্ঘটনার আগে আমি ঠিক করেছিলাম চারদিনের মধ্যে প্রাগে ফিরে আসব কিন্তু চারদিন ছেড়ে আঠারো মাস লেগেছিল ড্রেসডেন থেকে ফিরতে।

আমি জানি মানুষ মাত্রেই ভগবানের হাতের পুতুল, কিন্তু আমি আবার চিকিৎসকদের হাতের পুতুলও হয়েছিলাম।

আমি একটি ভয়ানক দৃশ্য দেখেছিলাম। এখনও জানিনা এবং কখনও জানতে পারিনি আমার দেহের কোন কোন অঙ্গ একান্তই আমার নিজের' শুধু এইটুকু জানি আমাকে আবার খাড়া করতে আঠারোজন ডাক্তার ও তাঁদের বাহান্নজন সহকারী লেগেছিল। তাঁরা একাজে বিলক্ষণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সবশেষে আমাকে একটি ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তাতে আমাকে আবার মানুষ নামে জীবে পরিণত করার জন্যে কি কি উপাদান ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এখন আমার শরীরে কি কি মালমশলা আছে তার একটি হিসেবও লিখে দেওয়া হয়। এই দলিলখানি আমাকে সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকবার অধিকার দিল। আমার শারীরিক অবস্থার বর্ণনা লিখতে ডাক্তারের এই চোদ্দ পাতার দলিলটি তৈরি করতে হয়েছিল।

মস্তিকের কিছুটা অংশ, একখণ্ড পাকস্থলী, প্রায় পনেরো কিলোগ্রাম মাংস এবং অর্ধ লিটার রক্ত ছাড়া আমার নিজের বলতে কিছু ছিল না। বাদবাকি আর সব মোটেই আমার নিজস্ব নয়, কেবল ফুসফুস ছাড়া—তাও অংশত, বাকি যেটুকু হারিয়ে গিয়েছিল ষাঁড়ের ফুসফুস দিয়ে সেটুকু পূরণ করা হয়েছিল।

চিকিৎসা বিজ্ঞান তখন উন্নতির উচ্চ শিখরে। তারই নিচে আমি—সম্পূর্ণ

কৃত্রিম হাতে-গড়া একটি মানুষ। সার্টিফিকেটেও একথা লেখা ছিল। আমি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হয়েছিলাম। আমাকে দিয়ে প্রমাণ হয়েছিল যে চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা নানারকম খণ্ড খণ্ড উপাদান দিয়ে একটি নতুন মানুষ তৈরি করা সম্ভব, যেমন শিশুরা ছোট ছোট পাথর ও কাঠ দিয়ে একটি প্রাসাদ তৈরি করতে পারে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই আমার প্রথম কাজ হলো একবার এখানকার কবরখানায় ঘুরে আসা, কেননা আমার ভীষণ ইচ্ছে হলো সেই জায়গাটা দেখবার জন্যে যেখানে আমার শরীরের বাতিল অংশগুলো কবর দেওয়া হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে আগত মৃতদেহগুলো যেখানে থাকে সেখানে একটা আলাদা জায়গায় আমার অংশগুলি রাখা হয়েছিল। তারপর ওখান থেকে প্রাগে ফেরার জন্য সোজা রেলস্টেশনের দিকে চলে গেলাম। আমি জানতাম এই সুন্দর শহরে কখনও বেড়াতে এসেছে এইরকম যে কোনো ভ্রমণকারীর চেয়ে আমিই বোধহয় ড্রেসডেনে বেশিদিন থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম।

Dećin-এ অষ্ট্রিয়ার শুল্ক বিভাগের কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের মালপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করত। তারা আমাদের মালপত্র টানাটানি করে খুলতে লাগল এবং কিছুক্ষণের জন্যে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করল। তারপর কর্তৃপক্ষের একজন আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে হাসল এবং একদৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল। একজন জোড়াতালি লাগানো লোকের অদ্ভুত চেহারা সম্ভবত তার মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। বস্তুত কোনো মানুষের পক্ষে আমার মতন তাকানো মানে—সে নিশ্চয় নিদেনপক্ষে ডাকাতিদের চোরাকারবারী! আমাকে বেশ পাকা উত্তম মধ্যম খাওয়া চোরাকারবারীর মতোই দেখাচ্ছিল।

অফিসার আদেশ করল: "তোমার পোঁটলা নিয়ে আমার পেছনে পেছনে অফিসের দিকে এসো।"

সেখানে তারা আমার পোঁটলা খুলল। এবং ভালো করে অনুসন্ধানকার্য চালাল। কিন্তু সন্দেহ করার মতন কিছুই খুঁজে পেল না। পরক্ষণেই হঠাৎ পোঁটলার নিচে কিছু কাগজপত্র তাদের দৃষ্টিগোচর হলো। এর মধ্যে ড্রেসডেন হাসপাতাল থেকে পাওয়া আঠারোজন ডাক্তার ও তাদের বাহান্নজন সহকারীর স্বাক্ষর করা সার্টিফিকেটখানাও ছিল।

: "হায় ভগবান!" তারা সার্টিফিকেটখানা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল: "তোমাকে ওপরে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এই অবস্থায় আমরা তোমাকে অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করতে দিতে পারি না।"

ভারপ্রাপ্ত অফিসারটি অত্যন্ত সম্মানীয় ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি শত ক্লেশ সত্ত্বেও স্বীয় কর্তব্যের প্রতি অবিচলিত। আমার সার্টিফিকেটখানা পরীক্ষা করার পর বললেন: "প্রথমত এই দলিলানুসারে তোমার মাথার খুলির পেছন দিকটা রৌপ্যপাত দিয়ে পূরণ করা হয়েছে। এই পাতে কোনোরকম অবশ্য প্রয়োজনীয় ছাপ নেই, সেইজন্যে বারো ক্রাউন জরিমানা দিতে হবে। তোমার মাথার খুলিতে একশো কুড়ি গ্রাম রুপো আছে। কোনো অবশ্য প্রয়োজনীয় ছাপ নেই জানা সত্ত্বেও উপযুক্ত শুল্ক ফাঁকি দিয়ে তুমি সীমানা অতিক্রম করতে যাচ্ছিলে, এরদ্বারা তুমি পণ্য আমদানী রপ্তানীর ২৪৬ নম্বর আইনের ৬ ও ৮বি ধারা লঙ্ঘন করেছ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তোমাকে তিনগুণ জরিমানা অর্থাৎ ১২ ক্রাউনের তিনগুণ বা ৩৬ ক্রাউন সর্বসমেত দিতে হবে। তাছাড়া ১৯০২ সালের রৌপ্যকর সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বি. এফ. ও জি ধারায় যে সংশোধন হয়েছিল সেইমতে প্রতি গ্রামে ১০ হেলার ধার্য করা হয়েছে। তাহলে অতিরিক্ত আরও ১২ ক্রাউন আসছে। শুধু তাই নয়—তোমার বাঁ পায়ের ঊরুতে ঘোড়ার হাড় লাগানো হয়েছে। এটাকেও আমরা—অস্থি-সংবাদ গোপন করে সীমানা অতিক্রম করা হিসেবে ধরব। বুঝতে পেরেছ, বন্ধু, এইভাবে তুমি অস্ট্রিয়ার হাড়ের ব্যবসায় পেছন থেকে ছুরি মেরেছ। এইভাবে ঘোড়ার হাড় লুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণ কি এবং কেন? হাঁটতে পারবে বলে—এ্যাঁ—তাহলে আমাদের খাতায় লিখতেই হবে যে তোমার ব্যবসা চালাবার জন্যে ঘোড়ার হাড় ব্যবহার করেছ। একেবারে নিজের সম্পত্তি করে ফেলেছ—এ্যাঁ—জবর বন্ধু আমার—

"বলতে খুবই ভালো শোনায় যে তোমার ব্যবসা চালাবার জন্যে এটা দরকার কিন্তু তারজন্যে এখন তোমাকে মূল্য দিতে হবে। কারণ যখন জীবজন্তুর হাড় ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়ে অস্ট্রিয়াতে আনা হয় তখন তার ওপর আমাদের পণ্যশুল্কের তালিকা খুব কড়া হয়।

"তোমার রিপোর্টে এখনও আরও একটি অংশ আছে। তোমার পাঁজরার

তিনটে হাড় প্ল্যাটিনামের তার দিয়ে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। হা ঈশ্বর—তুমি কি অস্ট্রিয়াতে অবৈধভাবে প্ল্যাটিনাম আমদানী করছ? জানো এর পরিণাম কি—

"তিন শতগুণ জরিমানা—তিনটে তারের ওজন ২০ গ্রাম। জরিমানা দাঁড়াচ্ছে ১৮০০ ক্রাউন। এইরকম কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্যে তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত।

"কিন্তু—এখানে আবার কি দেখছি—

"এই সার্টিফিকেট যা বলছে তোমার কিডনির এক অংশ—মানে বাঁ দিকেরটাতে শূকরের কিডনি ব্যবহার করা হয়েছে—

"মানিক!—শূকরের মাংস অস্ট্রিয়াতে আমদানী একেবারে নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধকরণ শূকরের মাংসের অংশ-বিশেষের ওপরও প্রযোজ্য। এবং যেহেতু তুমি বোহেমিয়ায় যেতে চাও সেহেতু তোমার কিডনিটাকে জার্মানীতে রেখে যেতে হবে।"

যেহেতু আমি আমার কিডনি স্থানচ্যুত করতে সম্মত হইনি সেইজন্যে গত দশ বৎসর যাবৎ জার্মানিতে পড়ে রয়েছি এবং এগ্রারিয়ান পার্টির দিকে মুখ চেয়ে বসে আছি—অস্ট্রিয়াতে শূকরের মাংস আমদানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্যে। কারণ আমিও সেই দলমতে বিশ্বাসী। তারপর—আমি দেশে ফিরে যাব।

চেক্ গল্পকার Jaroslav Hac'ek রচিত কয়েকটি গল্পের ইংরিজি অনুবাদ-সংকলন 'Tourist Guide' গ্রন্থের 'Austrian Customs Authorities' গল্পটির বাংলা ভাষান্তর করেছেন: প্রভাস বসু

বা তা য় ন

লেনিন শান্তি পুরস্কার

শান্তি—এই শব্দটি আজ পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাষায় উচ্চারিত হচ্ছে কোটি মানুষের কণ্ঠে। এই শান্তির জন্য এই শতাব্দীর মানুষের মতো আকাঙ্ক্ষা আর কে করেছে? কারণ, শান্তির নামে চলেছে যুদ্ধের চক্রান্ত, শক্তিমানরা শক্তির ভয় দেখিয়ে শান্তি নামক বস্তুটিকে নিজেদের মনোপলি করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে এই শতাব্দীর মানুষ। সেই সর্বনাশা আগুনে মানুষের ঘর পুড়েছে, প্রিয়জনের ঘটেছে মৃত্যু। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সমাধির ওপর ডিক্টেটররা নিজেদের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফাসিস্তদের বিনাশের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পশ্চিমী মিত্রশক্তি এক মহামৈত্রীতে আবদ্ধ হয়েছিল। সোভিয়েতের মানুষ সেই মৈত্রীকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ দিয়েছে—ফাসিজমের সমাধি রচিত হয়েছিল স্তালিনগ্রাদে, শ্রমজীবী মানুষের লাল পতাকা উড়েছিল কুখ্যাত রাইখস্ট্যাগে। কিন্তু যুদ্ধের পর মিত্রশক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় সেই মহামৈত্রী অতলান্তিকের অতল জলে নিক্ষিপ্ত হলো। চার্চিল তাঁর কুখ্যাত 'ফুলটন বক্তৃতায়' ঘোষণা করলেন কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নূতন জেহাদ। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূত্রপাত করলেন এই জঙ্গীবাদী রাজনীতিবিদ, যিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে বার্লিন পতনের পর ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমেরীকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন লালফৌজ আরও এগিয়ে এলে যেন তাদের প্রতিরোধ করা হয়। লালফৌজ আর এগোয় নি। কারণ সাম্রাজ্যবিস্তারের বাসনা নিয়ে তারা যুদ্ধে নামে নি, নেমেছিল ফাসিজমের হাত থেকে মানবজাতিকে, পৃথিবীর শান্তি ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। সেই শান্তির নামে সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে। প্রতি বৎসর পৃথিবীর শান্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। এই শান্তি পুরস্কার এখন মহামতি লেনিনের নামে উৎসর্গীকৃত। ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত এই দুর্লভ সম্মান পেয়েছেন তিনজন: সৈফুদ্দিন কিচলু, মেজর জেনারেল সাহেব সিং সোখে এবং শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু। এবারে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বিশ্বের পাঁচজন রাষ্ট্রনেতা, কবি ও শিল্পীকে।

ঘানার প্রেসিডেন্ট ডাঃ কোয়ামে এনক্রুমা, বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী পাবলো পিকাসো, পাকিস্তানের কবি ও সংবাদিক ফয়েজ আহ্‌মেদ ফয়েজ, হাঙ্গারীর রাষ্ট্রপ্রধান ও জননেতা ইস্তভান দোবি ও চিলির জননেতা অলগা পাবলেভো ডি এসপিনোজা এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এশিয়া, আফ্রিকা, ইওরোপ ও লাতিন আমেরিকার এই পাঁচজন মানুষ নিজেদের কর্মক্ষেত্রেই শুধু শ্রুতকীর্তি নন, মানবতার জন্য এঁদের অক্লান্ত সংগ্রাম, শান্তিস্থাপনে অনলস আগ্রহ বিশ্বমৈত্রীকে দৃঢ়তর করেছে। আন্তর্জাতিক লেনিন শান্তি পুরস্কার সেই সংগ্রামেরই স্বীকৃতি। পিকাসো ও ফয়েজ আহ্‌মেদ ফয়েজের সঙ্গে পৃথিবীর সংস্কৃতিকামী মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ডিক্টেটর ফ্রাঙ্কোর সহযোগী হিটলারের বিমানবাহিনী কর্তৃক মুক্তনগরী গুয়ের্নিকার ভয়াবহ ধ্বংসলীলাকে চিত্রিত করেছিলেন মানবপ্রেমিক মহান শিল্পী পাবলো পিকাসো। বিশ্বশান্তি আন্দোলনের প্রতীক জলপাই পাতা মুখে শ্বেত পারাবত পিকাসোর সৃষ্টি। পিকাসো এযুগের বিস্ময়, তিনি সর্বকালের বিস্ময়। কবি ফয়েজ আহ্‌মেদ ফয়েজ উর্দু কবি, লাহোরের 'পাকিস্তান টাইমস্' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন তিনি। পাকিস্তানের গণ-আন্দোলনের পুরোগামী সৈনিক। বহু লাঞ্ছনা আর নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন। কিন্তু মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারান নি। তাঁর কবিতায় তিনি মুক্ত মানবতার, গণতন্ত্রের ও শান্তির জয়গান করেছেন। ফয়েজের এই সম্মান পাক-ভারত উপমহাদেশের গণতান্ত্রিক মানুষের সম্মান। লেনিনের নামাঙ্কিত এই পুরস্কার বিশ্বে শান্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করে পৃথিবীর মানুষের মনে জাগিয়েছে নতুন আশা।

চ্যাপলিনের সম্মান

আগের সংখ্যাতেই আমার উল্লেখ করা উচিত ছিল—চার্লস চ্যাপলিনকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যে ডক্টরেট ডিগ্রি দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চ্যাপলিনের এই সম্মান তাঁর শিল্পের স্বীকৃতি। চলচ্চিত্রে তিনি যে শিল্প-প্রয়োগ করেছেন, সাহিত্য ও জীবনবোধের সংস্পর্শে তা উজ্জ্বল। তিনি নিছক এন্টারটেনমেন্টের জন্য চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেন নি, চলচ্চিত্রকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন শিল্পসৃষ্টির জন্য এবং তাঁর শিল্পের উদ্দেশ্য শোষণহীন সমাজ ও মানবতার জয়। দীর্ঘজীবনের শিল্পসাধনায় চ্যাপলিন একনিষ্ঠভাবে

শোষিত, দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন, গণতন্ত্রের সপক্ষে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের কণ্ঠ মিলিয়েছেন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে। নিজে দরিদ্র ছিলেন বলেই দারিদ্র্যের অভিশাপে জীবনের বিবর্ণতা তিনি কোনোদিন বিস্মৃত হন নি। 'যারা মানুষকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয় তাদের তিনি কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেন নি। চ্যাপলিন সত্যদর্শী শিল্পীর অন্তর্চক্ষু দিয়ে সমাজের অন্যায়-অবিচারকে মহত্তম শিল্পের ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করেছেন তাঁর চলচ্চিত্রে। তিনি জীবন থেকেই সংগ্রহ করেছেন তাঁর এই আশ্চর্য সাহিত্যের উপকরণ। রাজনীতিক দুঃমার্গীরা চ্যাপলিনকে সন্দেহের চোখে দেখেছে, যেমন দেখেছিল এ্যাডলফ হিটলার, দেখেছিল জো ম্যাক্‌কার্থি। কিন্তু তিনি অকুতোভয় শিল্পীর মতোই এদের কাছে কোনোদিন মাথা নত করেন নি, আপোস করেন নি তাঁর শিল্পসত্যের সঙ্গে রাজনীতিক ভাইনী-তাড়ুয়াদের নির্দেশনামায়। যুদ্ধের সময়ে তিনি হলিউডে জনসভা সংগঠন করেছিলেন সেকেণ্ড ফ্রন্ট খোলার জন্ত; সোভিয়েত-সুহৃদ চার্লস চ্যাপলিনকে সে কারণেই ম্যাক্‌কার্থির আমেরিকা ক্ষমা করতে পারে নি। তিনি হলিউড ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন—এখন তিনি সুইজারল্যাণ্ডে। বৃটেনেও এক শ্রেণীর রাজনীতিক চ্যাপলিনের এই সম্মাননায় খুশি হতে পারেন নি। তাঁরা চ্যাপলিনকে রাজকীয় খেতাব দেবার পক্ষপাতী, সাহিত্যের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই কলরবে পিছিয়ে যায় নি—বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় এযুগের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীকে এই স্বীকৃতি দিয়ে নিজেই গৌরবভাগী হবে। চ্যাপলিন শিল্পীসমাজের গৌরব।

'প্রাভদা'র জয়ন্তী উৎসব

বিশ্বের প্রথম সর্বহারাদের রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র 'প্রাভদা'র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলো। ১৯১২ সালের ৫ই মে তারিখে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে (এখন যার নাম লেনিনগ্রাদ) 'প্রাভদা'র প্রথম আত্মপ্রকাশ। এই অর্ধশতাব্দী ধরে 'প্রাভদা' বিপ্লবের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত রেখেছে। 'প্রাভদা'র জন্মদিন থেকেই এর প্রধান সম্পাদক ও প্রধান লেখক ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। জারের আমলে 'প্রাভদা'কে বহুবার নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯১৩ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে একবছরেই

দুশোবার এর বিরুদ্ধে আরেস্ট পরোয়ানা জারি হয়েছে। প্রত্যেকবারই নাম বদল করে 'প্রাভদা' বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষে অত্যাচারী জারতন্ত্রের ভিত্তি কাঁপিয়েছে। বহুবার 'প্রাভদা'র সম্পাদককে কারাবরণ করতে হয়েছে। ১৯১৭ সালের ৮ই নভেম্বর 'রাবোচি পুট' ('প্রাভদা'র বহু নামের একটি) মহান অক্টোবর বিপ্লবের জয় ঘোষণা করে। পরদিন থেকেই আবার 'প্রাভদা' নামে তার আত্মপ্রকাশ। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সংবাদপত্রের সঙ্গে 'প্রাভদা'র চেহারায়, চরিত্রে ও সংবাদপরিবেশনে বিপুল পার্থক্য। চাঞ্চল্যকর শিরোনামা নেই, হত্যাকাণ্ডের সংবাদ নেই, শেয়ার বাজারের স্পেকুলেশন নেই এবং স্বল্পবসনা নারীদেহের চিত্রসম্বলিত পণ্যের বিজ্ঞাপনও তাতে পাঠকরা খুঁজে পাবেন না। কিন্তু এর পরিবর্তে 'প্রাভদা'র এবং সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সংবাদপত্রে শ্রমজীবী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মী মানুষের কর্মকাণ্ডের সংবাদ সশ্রদ্ধায় প্রকাশিত হয়। 'প্রাভদা'র বৈশিষ্ট্য এখানেই। সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে জন্মলগ্নেই কণ্ঠরোধ করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। সে ষড়যন্ত্রে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সমাজতন্ত্রের বাণী বহন করে 'প্রাভদা'র পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি নিপীড়িত, শোষিত মানুষের জয়যাত্রার একটি উজ্জ্বল প্রতীকরূপেই গণ্য।

হোয়াইট হাউস-এ বুদ্ধিজীবী

আমেরিকার তরুণ প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডি নতুনত্বের চমক আনতে চান। আমেরিকার মানুষ আশা করেছিল কেনেডির বয়স অল্প, রাজনীতিতে এতটা পাকা-পোক্ত হন নি। নতুন যুবক নতুন পথেই হয়তো আমেরিকাকে নিয়ে যাবেন। দেখা গেল যুবকটির টিকি ওয়াল স্ট্রীটেই বাঁধা আছে। কিউবার সমুদ্রোপকূলে নাকানি-চোবানি খেয়ে এতদিনে কেনেডি বোধহয় খানিকটা সামলে নিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আমেরিকার নোবেল পুরস্কারবিজয়ী শিল্পী, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের। যাঁরা লোকান্তরিত তাঁদের পত্নীদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এই বিশেষ সাম্মানিক অনুষ্ঠানে। ডাঃ ওপেনহাইমার, ডাঃ লাইনাস পলিং, শ্রীমতী পার্লবাক, শ্রীমতী হেমিংওয়ে প্রমুখ পঞ্চাশজন নোবেল পুরস্কারবিজয়ী আমেরিকান বুদ্ধিজীবী এবং তাঁদের প্রতিনিধি হোয়াইট হাউসে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কোনো উপদেশ বর্ষণের

জন্ত তিনি তাঁদের ডাকেন নি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে কেবল ধনকুবেরদের কথাতেই চলেন না, বুদ্ধিজীবীদের প্রতিও যে তাঁর মনোযোগ রয়েছে, এ আমন্ত্রণের পেছনে কেনেডির এমন অভিলাষই কাজ করেছে। তবু ভালো, হোয়াইট হাউসে এতদিন পর মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের পদার্পণ ঘটল। যদিচ একথা সর্বজনবিদিত যে মার্কিন রাজনীতিতে কিংবা সমাজজীবনে বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব সামান্ত। তাঁদের বক্তব্য কাগজে ছাপা হয় না, অর্থাৎ এমন বক্তব্য যা সরকারের নীতির বিরোধী। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরাই সেখানকার সর্বেসর্বা। কে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, কী বিষয়ে, সাধারণ মার্কিনী তার খবর রাখে না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নোবেল পুরস্কারবিজয়ীদের এই সম্মান দিয়ে একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তই স্থাপন করলেন।

মম-এর চিত্রসংগ্রহ

সমারসেট মম তাঁর সারাজীবনে শুধু খ্যাতি, অর্থ ও জনপ্রিয়তাই অর্জন করেন নি। আটাশী বছরের জীবনে তিনি সঞ্চয় করেছেন কতকগুলি সম্পদ, যা দুর্লভ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা দুষ্প্রাপ্য চিত্রাবলী তিনি সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। মম তাঁর বইয়ের রয়্যালটির টাকা গচ্ছিত করে রেখে যাচ্ছেন উত্তরকালের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জন্ত এবং তার সঙ্গে যোগ করে দিয়ে গেলেন এই দুর্লভ চিত্রাবলী থেকে প্রাপ্ত অর্থ। মাতিস, তুলুস-লত্রেক, পিকাসো, রেনোয়া প্রভৃতি উজ্জ্বলতম শিল্পীদের স্বাক্ষরিত এই চিত্রভাণ্ডার তিনি নীলামে বিক্রি করেছেন। এই আশ্চর্য নীলামে অর্থ সংগৃহীত হয়েছে ৫২৩,৮৮০ স্টার্লিং। তরুণ সাহিত্যিক ও শিল্পীদের জীবনসংগ্রামে সাহায্য করার জন্ত মম যে অর্থভাণ্ডার তৈরি করেছেন তা পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যিকদের পক্ষেও অনুকরণীয়। মম-এর সাহিত্যকীর্তি হয়তো শ্রেষ্ঠতমদের মধ্যে গণ্য হবে না। হয়তো তিনি জনপ্রিয় লেখক হিসেবেই পরিচিত থাকবেন। কিন্তু তাঁর এই সাহিত্যিক-দান নিশ্চয়ই একটি উল্লেখযোগ্য ও অনন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

অরুণ দেব

সমুদ্র : তথ্য ও তাৎপর্য

"ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ু বহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে।"

সমুদ্রের এই বর্ণনাটি নেওয়া হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় অবশ্য সমুদ্রের বর্ণনা আরো আছে। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, কালিদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলের লেখা থেকেই সমুদ্রের কিছু না কিছু বর্ণনা নিশ্চয়ই উদ্ধার করা চলে। সমুদ্র দেখে উদ্বেলিত হননি এমন মানুষ খুব সম্ভবত নেই। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণাল বলছে: "তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।" সমুদ্র এতই বিপুল, এতই মহান, এতই গভীর, এতই উচ্ছল যে সমুদ্রকে দেখে মানুষ যেমন আত্মহারা হয় তেমনি আত্মসচেতনও হয়ে ওঠে। সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার চরিত্রগুলিকে যদি সমুদ্রের পটভূমিতে দাঁড় করানো যেত তাহলেও গল্পের মূল সুর (আমি যতোটুকু বুঝেছি) ক্ষুণ্ণ হতো না বলে আমার বিশ্বাস। সমুদ্র অতুলনীয়। সমুদ্রের তুলনা একমাত্র সমুদ্রই।

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সমুদ্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল 'সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ' ও 'সমুদ্র-তরঙ্গ'।

স্বভাবতই বিজ্ঞানীরাও সমুদ্র সম্পর্কে চিরকালই অতিমাত্রায় কৌতূহলী ও অনিসন্ধিৎসু। বিজ্ঞানীদের আরো বিশেষ আগ্রহের কারণ এই যে সমুদ্র ছিল ও আছে বলেই আমরা আছি। সমুদ্রকে বলা চলে প্রাণের আদি জননী। আজ থেকে দু-শো কোটি বছরেরও আগে পৃথিবীর আদি সমুদ্রে আদি প্রাণের সূত্রপাত হয়েছিল। রুশ বিজ্ঞানী ওপারিনের এ-বিষয়ে বিশেষ গবেষণা আছে। প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশের প্রত্যেকটি পর্বকে তিনি নিখুঁত-

ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এবং জড় থেকে প্রাণের বিবর্তনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু তবুও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ১৯২০ সালের আগে পর্যন্ত গভীর সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণাই ছিল না। অবশ্যই ধারণা না থাকার কারণ বিজ্ঞানীদের নিষ্ক্রিয়তা নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি তখনো পর্যন্ত এমন পদ্ধতির সন্ধান দিতে পারেনি যার সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশে বৈজ্ঞানিক অভিযান চালানো যেতে পারত। শব্দতরঙ্গের সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশের হদিশ নিতে পারাটা পরবর্তীকালের আবিষ্কার।

অথচ সমুদ্রকে খুঁটিয়ে না জানা পর্যন্ত এই পৃথিবীও আমাদের কাছে অনেকাংশে অপরিচিত থেকে যেতে বাধ্য। পৃথিবীর বাইরের দিকের চেহারাটা কী? তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল। অবশ্য এটা নিতান্তই মোটামুটি হিসেব। অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে বলতে পারলে যথার্থ অনুপাত সম্পর্কে ধারণা হতে পারে। ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তন ৫১ কোটি বর্গ কিলোমিটার। জলভাগের আয়তন ৩৬'১ কোটি বর্গ কিলোমিটার বা মোট আয়তনের শতকরা ৭০'৮ ভাগ। বাকি শতকরা ২৯'২ ভাগ স্থল। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে স্থলভাগের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও অনেক কম।

সমুদ্র সম্পর্কে আরো একটা লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে যদিও সমুদ্রের এক-একটি বিশেষ এলাকাকে আমরা আলাদা আলাদা নাম দিয়েছি কিন্তু সমুদ্র অখণ্ড—উত্তরে-দক্ষিণে পুবে-পশ্চিমে বিস্তৃত এক বিপুল জলরাশি। নিতান্তই ভৌগোলিক সুবিধের জন্যে আমরা কোথাও এর নাম দিয়েছি মহাসাগর, কোথাও সাগর, কোথাও উপসাগর, ইত্যাদি। মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তিনটি অতিকায় বাহুর মতো তিনটি মহাসাগর এই পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে—প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর। তাছাড়া আছে পৃথিবীর দুই মেরুদেশের দুটি মহাসাগর—উত্তর ও দক্ষিণ।

সমুদ্রের মোট জলের পরিমাণ ১৩৭ কোটি ঘন কিলোমিটার। এ-থেকে সমুদ্রের গভীরতা সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা হতে পারে। সমুদ্র যদি সব-জায়গায় সমান গভীর হতো তাহলে এই গভীরতা হতো ৩৮০০ মিটার। কিন্তু

সমুদ্রের গভীরতা সবজায়গায় সমান নয়—মোটামুটি হিসেবে বলা চলে তিন হাজার থেকে ছ-হাজার মিটারের মধ্যে।

হালের গবেষণায় আরো একটি আশ্চর্য ব্যাপার জানা গিয়েছে। গভীর সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে অজস্র পর্বতমালা। এই পর্বতমালার একটি শাখাকে পাওয়া যায় আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝ-বরাবর। এই শাখাটি দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে ভারত মহাসাগরে এসে দুটি উপশাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি উপশাখা চলে গিয়েছে লোহিত সাগরের মুখ পর্যন্ত। অন্যটি অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ঘেঁষে শেষ পর্যন্ত এসে মিশেছে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে। হাওয়াই দ্বীপের কাছে এই পর্বতমালার কোনো কোনো শিখর এমন কি মাউন্ট এভারেস্টের চেয়েও উঁচু। আর পর্বতমালা থাকলে গহ্বর থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। সব মিলিয়ে গভীর সমুদ্রের তলদেশ আমাদের চোখের দেখায় ভূপৃষ্ঠের চেয়েও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

আর সমুদ্রের জল সবসময়েই আলোড়িত, আবর্তিত ও বিক্ষুব্ধ। ঝড়-বাতাস, পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন, বিভিন্ন স্তরে সমুদ্রজলে ঘনত্বের পার্থক্য এবং জোয়ার-ভাঁটা—সব মিলে সমুদ্রে নানা বিভিন্নমুখী স্রোতোধারার সৃষ্টি হয়ে থাকে। সমুদ্রের উপকূল-ভাগে বড় রকমের ধ্বস নামার ফলেও সমুদ্রের তলদেশ বহুদূর পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার কারণ ঘটে। ধ্বস নামা মানেই অনেকখানি পরিমাণে ঘোলা জল সৃষ্টি হওয়া। ঘোলা জল পরিষ্কার জলের চেয়ে ভারী। কাজেই ঘোলা জল নিচে নামে ও মাটি ও কাদার সংস্পর্শে এসে আরো বেশি ঘোলাটে হয়ে ওঠে। তারপরে এই ঘোলা জল পর্বতের চূড়ো থেকে হিমবাহের নেমে আসার মতোই গভীর সমুদ্রের দিকে নামতে শুরু করে। আর বেগও হয় প্রচণ্ড—মিনিটে এক থেকে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত। এই ঘোলা জলের ধাক্কায় সমুদ্রের তলদেশের কেব্‌ল্ ছিঁড়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এমনি আরো নানা কারণে সমুদ্রের তলদেশের শান্তি-ভঙ্গ হয়ে থাকে। অবশ্য শান্তি কথাটা ব্যবহার করা ভুল। সমুদ্র চির-অশান্ত।

অধ্যাপক জে-বি-এস হলডেন কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকায় সমুদ্র-অভিযান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির শুরু এইভাবে: "আমাদের এই গ্রহের উপরিতলের সমগ্র স্থলভাগ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান মোটামুটি ভালোই। আর খুব সম্ভবত সমুদ্রের প্রায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারেই

কোনো না কোনো সময়ে কোনো না কোনো জাহাজ হাজির হতে পেরেছে। সুতরাং নতুন কোনো দ্বীপ বা চর আবিষ্কার হবার সম্ভাবনা না-থাকার মতো। কিন্তু তবুও সমুদ্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই কম।"

কথাটা অপ্রিয় হলেও পুরোপুরি সত্যি। আসলে সমুদ্র যদিও এতকাল আমাদের চোখের সামনেই ছিল কিন্তু সমুদ্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে ব্যাপকভাবে শুরু হতে পেরেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালেই। সমুদ্রকে বলা হয় 'ইনার স্পেস'—যেমন মহাকাশ হচ্ছে 'আউটার স্পেস'। এই 'ইনার স্পেস' এমন এক বিপুল রহস্যের এলাকা যে এ-সম্পর্কে জানার শেষ নেই। অথচ এখনো পর্যন্ত কতটুকু আমরা জানি? অধ্যাপক হলডেন বলছেন: "স্থলভাগের কোনো অঞ্চলে সারা বছরে গড়ে কী পরিমাণ বৃষ্টি হয়ে থাকে তার একটা মানচিত্র আমরা তৈরি করেছি। বাকি অংশ সম্পর্কেও আমরা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারি সেই অংশে কী ধরনের উদ্ভিদ জন্মাচ্ছে—তা থেকে। কিন্তু সমুদ্রের এলাকায় বৃষ্টিপাত সম্পর্কে আমাদের কোনো হিসেবই নেই।"

ভাবলে অবাক হতে হয় যে মানুষ যে-সময়ে মহাকাশকে জয় করতে চলেছে তখনো সমুদ্র সম্পর্কে তার জ্ঞান কত সামান্য! অথচ, বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সমুদ্র সম্পর্কে তার জ্ঞানের ওপরে ও সমুদ্রের বিপুল সম্পদরাশিকে ভোগ্য করে তোলার ক্ষমতার ওপরে। সমুদ্রের সম্পদ বলতে শুধু সমুদ্রের মাছই নয়, সমুদ্রের জলের সঙ্গে দ্রবীভূত তাবৎ পদার্থভাণ্ডার। মেণ্ডেলিয়েফের তালিকায় যা কিছু পদার্থের নাম আছে সমস্তই কিছু না কিছু পরিমাণে সমুদ্রের জল থেকে পাওয়া যেতে পারে। এই পদার্থভাণ্ডারের চাবিকাঠিটি আয়ত্ত করতে পারলে মানুষের জীবনে যে কী প্রাচুর্য শুরু হবে তা কল্পনা করতে হলে শুধু এইটুকুই মনে রাখা দরকার যে আমরা এতকাল ভূপৃষ্ঠের শতকরা মাত্র ২৯.২ ভাগের সম্পদকে আংশিকভাবে আহরণ করতে পেরেছি।

অবশ্য আরো কিছুকাল শুধু প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের জন্যেই সমুদ্রের ওপরে আরো বেশি করে নির্ভর করা চলতে পারে। আপাতত পৃথিবীতে প্রোটিনজাতীয় খাদ্যেরই অভাব সবচেয়ে বেশি। এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অভাব ভবিষ্যতে অবশ্যই তীব্রতর হবে। অথচ এই

বিপুল সমুদ্র তার বিপুল প্রোটিন-ভাণ্ডার নিয়ে আমাদের প্রায় নাগালের মধ্যেই রয়েছে!

সামুদ্রিক জীবসম্পর্কে অধ্যাপক হলডেনের প্রবন্ধ থেকে কিছু তথ্য উদ্ধার করা যেতে পারে। অধ্যাপক হলডেন বলছেন: "আমি নিজে মাছ খাই না। কিন্তু স্তন্যপায়ী জীব বা পাখি খাওয়ার চেয়ে আমি বরং মাছ খাওয়াটাই পছন্দ করব। মুণ্ডহীন শামুক খেতেও আমার কোনো আপত্তি নেই। যেমন, অয়স্টার। ভারতের অধিকাংশ লোক অবশ্য শামুককে খাদ্য বলেই গ্রাহ্য করে না। উদ্ভিদের মতো শামুকেরও অবশ্য প্রাণ আছে। তবে শামুকের খুব বেশি চেতনা (consciousness) থাকা সম্ভব নয়। কাজেই আমি মনে করি যে মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধি করার চেয়ে মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি করার পক্ষেই যুক্তির ভার বেশি।"

সমুদ্রের মাছ অধিকাংশই আমিষভোজী। অর্থাৎ, সমুদ্র হচ্ছে নির্বিচার এক হানাহানির এলাকা। সেখানে বড়রা ছোটদের ভক্ষণ করে থাকে। ছোটরা আরো ছোটদের। আর একেবারেই যারা ছোট তারা খুব সম্ভবত উদ্ভিদভোজী। এর কারণ সম্ভবত এই যে সমুদ্রের উদ্ভিদ স্থলভাগের উদ্ভিদের মতো বৃহদাকার নয়। ফলে, খুব ছোট ছোট জীবের পক্ষেই এই উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব।

সমুদ্রের কোন জাতের মাছের খাদ্য কোন ধরনের জীব তা নিশ্চয়ই জীববিজ্ঞানীয় অনুশীলনের বিষয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত খবর সংগ্রহ করতে পারলে অন্য দিকেও সুবিধে। ভক্ষ্যের পরিমাণ থেকে ভক্ষকের বংশবৃদ্ধি সম্পর্কে ধারণা হতে পারে। অবশ্য ভারতে এখনো সমুদ্রের মাছ ধরা হয় তীরের খুব কাছাকাছি এলাকাতেই। জেলেরা সাধারণত সকালে বেরিয়ে বিকেলের মধ্যেই গ্রামে ফিরে আসে। মাছ ধরার জন্য একটানা কয়েক সপ্তাহ বাইরের সমুদ্রে কাটিয়ে আসার রীতি এখনো আমাদের দেশে শুরু হয় নি। এ অবস্থায় ভক্ষ্য ও ভক্ষকের বিশ্লেষণ বিশেষ কাজে না লাগারই সম্ভাবনা।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক হলডেন তাঁর প্রবন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বঙ্গোপসাগরে মাছ-ধরার ব্যাপারে ভারতীয়দেরই আধিপত্য থাকবে—এমনটিই আশা করা উচিত ছিল (অবশ্যই বঙ্গোপসাগর ভারতীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত নয়, বহিঃসমুদ্রের কোনো এলাকাই কোনো দেশের নয়)। কিন্তু দেখা

যাচ্ছে, আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাপানী জেলেদের। ব্যাপারটা শুধু জেলেদের তৎপরতার মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। তার আগে জীববিজ্ঞানীদের কাছ থেকে হদিশ পাওয়া দরকার—বছরের কোন সময়ে সমুদ্রের কোন বিশেষ এলাকায় মাছের ঝাঁক হাজির হয়ে থাকে। আর এজন্তে অবশ্যই সমুদ্রের বিন্দুসদৃশ পোকামাকড় সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করা চাই। তারতে সামুদ্রিক জীবসম্পর্কে যে-ধারায় গবেষণা চলেছে তাতে অধ্যাপক হলডেন উৎসাহিত হবার কারণ খুঁজে পান নি।

অধ্যাপক হলডেন মাছ খান না বলেই হয়তো গভীর সমুদ্রের মাছ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উৎকট ঠাট্টাটা গায়ে মাখেন নি।

যাই হোক, গভীর সমুদ্রের কথায় ফিরে আসা যাক। সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞানীরা একটি অসাধ্যসাধন করেছেন। কিছুকাল আগে পর্যন্ত সমুদ্রের তলদেশে সশরীরে হাজির হওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে করা হতো (যুলে ভার্নে যাই লিখুন না কেন)। কারণ সমুদ্রের জলে প্রতি দশ মিটার গভীরতায় চাপ বাড়ে ৮·৩৫ কিলোগ্রাম হিসেবে। এ-অবস্থায় যান্ত্রিক আয়োজন ছাড়া কোনো ডুবরীর পক্ষেই হাজার মিটারও ডুব দেওয়া সম্ভব নয়। এই যান্ত্রিক আয়োজনটি সম্প্রতি সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া পারমাণবিক তেজে চালিত এমন ডুবোজাহাজও তৈরি হচ্ছে যার সাহায্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্তে গভীর সমুদ্রে অবস্থান ও বিচরণ করা অসম্ভব নয়। একই সঙ্গে বিজ্ঞানীরা আরো একটি কল্পনাতীত কাণ্ড ঘটাতে চলেছেন। সমুদ্রের তলদেশ থেকে গর্ত খুঁড়ে ভূ-অভ্যন্তরের নমুনা সংগ্রহ করা। সোভিয়েত ও মার্কিন দেশে এ-সম্পর্কে ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অধ্যাপক হলডেন সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে চমৎকার একটি বর্ণনা দিয়েছেন। সেটি উদ্ধৃত করেই এই আলোচনা শেষ করছি। অধ্যাপক হলডেন বলছেন : "প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে নানা লোকের বর্ণনা আছে। এমনি একটি লোক হচ্ছে মাটির নিচের পাতাল। এই পাতালে সূর্যের আলো না থাকা সত্ত্বেও উজ্জ্বল আলো রয়েছে। পাতাল কেউ কোনোদিন চোখে দেখে নি। তবে গভীর সমুদ্র কিন্তু অন্ধকার নয়। সূর্যের আলোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ এমন কি স্বচ্ছতম জলেও সূর্যের আলো একশো মিটারের বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। সমুদ্রের নিচে শ-সাতেক মিটার নামতে পারলে এমন এলাকায় পৌছনো

যাবে যেখানে চারিদিক 'কৃত্রিম' আলোয় উদ্ভাসিত। ব্যাপারটাকে তখন আর কৃত্রিম বলে মনে হয় না। গভীর সমুদ্রের দশ-ভাগের ন-ভাগ মাছই আলোক-উদ্ভাসী।"

সমুদ্রের তলদেশের এই আলো চাঁদের আলোর চেয়েও ফুটফুটে এবং অধ্যাপক হলডেন আশা প্রকাশ করেছেন যে আগামী একশো বছরের মধ্যেই আমরা হয়তো গোরু-ছাগল পালন করার মতো কয়েক জাতের আলোক-উদ্ভাসী জীবকেও পালন করতে শিখব। সে-সময়ে খুব সম্ভবত শহরের রাস্তাঘাটে এই 'জৈবিক' আলোরই ব্যবস্থা করা হবে।

ইতিমধ্যে অধ্যাপক হলডেনের সঙ্গে আমরাও আশা করব—সমুদ্র বিজ্ঞানে গবেষণার সাহায্যে রাষ্ট্রীয় দাক্ষিণ্য আরো অকৃপণ হবে।

অমল দাশগুপ্ত

ভ্রম সংশোধন

চৈত্র সংখ্যার ৯৯৪ পৃষ্ঠার সপ্তবিংশ পংক্তির শুদ্ধপাঠ হবে: পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও মুক্তিযোদ্ধা সিকেরাস আজও মেক্সিকোর কারাগৃহে অবরুদ্ধ।

আজকের প্রহসন

আশ্চর্য হতে হয়, অভিনয় ও প্রয়োগনৈপুণ্যের এই পরাকাষ্ঠায়। শ্রীসবিতাব্রত দত্ত-এর পরিচালনায় 'রূপকার' অমৃতলাল বসু রচিত সম্প্রদায়ের 'ব্যাপিকা বিদায়'-রূপায়ণ মনে রাখার মতো। উনিশ শতকের সামাজিক ব্যঙ্গনাট্যের ঐতিহ্যে রচিত এই নাটকটিতে অবশ্য ব্যাজোক্তির, irony বা এমনকি satire-এরও অ্যাবড় নির্মমতা প্রহসনের প্রগল্‌ভতায় বিলীন। 'সধবার একাদশী' বা হুতোমের তীব্রতা এতে অনুপস্থিত।

তবু, সেকালের মানুষদের প্রাক্‌রাবীন্দ্রিক চলনে বলনে এক ধরনের মেঠো সরসতা ছিল, যা এই নাটককে মাঝে মাঝে প্রায় burlesque-এর পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে, এবং যা আজ আমরা আমাদের আধাশহুরে বৈদগ্ধ্যের মিড্‌-ভিক্টোরীয় কুশিক্ষায় হারিয়েছি। মঞ্চভাষিকায় সে অবাধ ম্যাবেলে-সুইফ্‌ট-ভল্‌তেয়র-বাল্‌জাক-জাতীয় অভিব্যক্তিকে অসুস্থ মুখ খারাপে পর্যবসিত না করে যদি ফিরিয়ে আনা যেত মন্দ হতো না—"সন্ন্যাসিনী" শব্দটির বদলে এই নাটকের জ্ঞানী-জঁড়টি যেমন অনায়াসে "মাদী সন্ন্যাসী", খুড়ি, "মেয়েছেলে সন্ন্যাসী", বলে ফেলে। ফিরিয়ে আনতে পারা প্রয়োজনও। কারণ, যে 'বাঙালী' অজাববর্ণা মেম-শাশুড়িটির ইংরেজিয়ানার বিরুদ্ধে এই নাটকের শাণিত আক্রমণ, তাঁকেই তো আবার এই সেদিন দেখলুম স্বাধীনবাঙলার শিক্ষার পীঠস্থানের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে। গত শতকে যখন নাকি একবার 'রেনেসান্স' হয়েছিল বাঙলাদেশে, তখন 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ বাঙ্গরণ আওড়াতে আওড়াতে "ব্যা ব্যা" শব্দে ডেকে উঠেছিল। নব্যস্বাধীনতার জমাটি সমাজতন্ত্রী-আসরে উক্ত নিমচাঁদের নবরূপ দেখতে পেলে লোকে খুশিই হবে। ন্যাকামি ও হিস্টিরিয়ার সর্বগ্রাসী স্রোতও বঙ্গসমাজের বিশেষ মহলে, অন্দরে ও বাহিরে এখন তো নবোদ্যমে বহমান। আর, ৺অমৃতলালের সেই 1st Class Patriot, 2nd Class Section I Patriot ইত্যাদি Patriot-শ্রেণীর বিন্যাস তো আজকাল আরো নব নব রূপে বিকশিত। অতএব 'ব্যাপিকা বিদায়'-এর অসমাপ্ত কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'রূপকার' সম্প্রদায় কালোপযোগী কাজই করেছেন।

সে কাজে তাঁদের প্রয়োগনৈপুণ্যও একেবারে বিস্ময়কর। দলগতভাবেই অভিনয়ের উৎকর্ষ সংশয়াতীত। গমকে গমকে নাটক এগিয়ে চলে, প্রায় কোনো ছন্দপতন ছাড়াই, বেতালা ঘাটে একবারও না পড়ে। ব্যক্তি ধরে বলতে গেলে সর্বাগ্রে বলা উচিত শ্রীবঙ্কিম ঘোষের নাম, ঘনশ্যাম সিকদার নামক জ্ঞানী-ভাঁড়ের ভূমিকায়। কোনো অত্যুক্তিই হবে না যদি বলি যে তাঁর অভিনয়ে কোনো কোনো মুহূর্তে সত্যিই Sublime ও ridiculous-এর হরিহর আত্মার পরিচয় মেলে। তারপরেই করতে হয় বৃদ্ধ সঞ্জীব চৌধুরীর ভূমিকায় শ্রীসবিতাব্রত দত্তর, অটিলেশ্বর ভাদুড়ির ভূমিকায় শ্রীস্বরূপ ভট্টাচার্যর, মিসেস লাহিড়ীর ভূমিকায় শ্রীমতী স্মৃতি মিত্র ও ঝি-এর ভূমিকায় শ্রীমতী কমলা ব্যানার্জির নাম। মেম-শাশুড়ির ভূমিকায় শ্রীমতী কালিন্দী সেন-এর অভিনয়ের stylisation, রীতিবিন্যাস, কিন্তু সব জায়গায় অনিবার্য হয়ে ওঠে নি, যেমনটি হয়েছে অন্যদের বেলায়।

'রূপকার' নাটকটি অনেকবার করুন ও কলকাতার লোকে দেখুক কামনা করি।

বোধারম চট্টোপাধ্যায়

পত্রিকা প্রসঙ্গ

বাঙলা সাময়িকপত্রজগতে যদিও সিনেমা তথা লঘুরসের কারবারী পত্র-পত্রিকাগুলিই জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে তবু ইদানিং চিন্তাশীল এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধের চাহিদা কিছু বেড়েছে। প্রকাশক মহলেরও খবর, প্রবন্ধের বই আজকাল কিছুকিছু বিক্রি হয়। এমন কি প্রধানত প্রবন্ধ-আশ্রিত পত্রিকাও আজকাল কেউ কেউ বের করতে উদ্যোগী হয়েছেন এবং চালিয়ে যেতে পারছেন। নিরাশাবাদীরা অবশ্য বলতে পারেন, একটি কি দুটি কোকিল বসন্তের সূচনা করে না। তাঁদের কথা মেনে নিলেও বলতে হয়, এই ঝোঁকটা বসন্ত না হোক, বসন্তের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই। আর তাই তাকে স্বাগত না করে পারা যায় না।

গত কয়েকমাসে নানা পত্রপত্রিকায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে পাঠকদের দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষণ করার জন্যই এই নিবন্ধের অবতারণা। কোনো কোনো রচনা সম্পর্কে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য অবশ্য করা হবে, সে শুধু আলোচনার একটা সূত্র ধরিয়ে দেবার জন্যই—বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা উপস্থাপন করা এই আলোচনার লক্ষ্য নয়। ভুল বোঝাবুঝি এড়াবার জন্য আরও একটি কথা প্রথমেই বলে রাখা দরকার—এই পর্যায়ের এই প্রথম আলোচনাটির জন্য কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয় নি। দ্বিতীয়ত, বর্তমান লেখক সমস্ত উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি। ফলত, অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হয়তো এ-আলোচনায় অনুল্লেখিত থাকবে। বলে রাখা দরকার এই অনুল্লেখ অনিচ্ছাকৃত। তৃতীয়ত, এই আলোচনায় ছোট কাগজগুলিকেই অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য দেওয়া হবে। তার কারণ, তথাকথিত বড় কাগজগুলি অনেকেরই চোখে পড়ে আর তাতে গুরু প্রবন্ধের স্থান অপেক্ষাকৃত গৌণ। চিন্তাশীল ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ ছোট কাগজগুলিতেই বেশি বেরয় এবং তা অনেকেরই দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়।

গত তিন-চার মাসের মধ্যে যে প্রবন্ধটি সবচেয়ে বেশি বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, এবং যার জের এখনও মেটে নি তার উল্লেখ করেই এই আলোচনার সূত্রপাত

করব। 'দেশ' পত্রিকায় 'সময় সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে শঙ্খ ঘোষের সাম্প্রতিক বাঙলা কাব্য সম্পর্কিত প্রস্তাবটির ['দুই বসন্তে'] কথাই বলছি। শঙ্খ ঘোষ নিজে কবি। কবিতা সম্পর্কে তাঁর মতামত নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুধাবনযোগ্য। সম্প্রতিকালে তাঁর যেসব প্রবন্ধ পড়বার সুযোগ হয়েছে (দুটি এক নিঃশ্বাসেই উল্লেখ করতে পারি : 'রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প' সঙ্কলনে রবীন্দ্রনাটকে গান সম্পর্কিত প্রবন্ধটি এবং 'একতা'র 'নাট্যমুহূর্ত ও ভাষার সন্ধান') তাতে তাঁর স্থিতধী সাহিত্যবোধের পরিচয় পেয়েছি। তবু না বলে পারছি না, 'দেশ' পত্রিকার এই প্রবন্ধের অধিকাংশ সিদ্ধান্তের সঙ্গেই আমরা একমত হতে পারি নি, আলোচনার পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও না। কিন্তু আর কোনো কারণে না হোক, একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনার সূত্রপাত করতে পেরেছে বলেই এই প্রবন্ধটি বিশেষ মর্যাদা দাবি করতে পারে। কবিতা সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন মৃগাঙ্ক রায় মাঘ-চৈত্র সংখ্যা 'নতুন সাহিত্য'-এ ['আধুনিক বাঙলা কবিতা : কালান্তরের চিন্তা']। শ্রীরায়ের বক্তব্যও বিতর্কমূলক, কিন্তু তা নিয়ে কেন যে কোনো আলোচনার সূত্রপাত হলো না, জানি না।

বাঙলা ছোটগল্পের সর্বাধুনিক ঝোঁক সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে ('সময়ের চাবি' : শান্তি বসু) 'একক' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায়। শ্রীবসুর বক্তব্যের সঙ্গে বর্তমান লেখকের অনেক বিষয়েই মতৈক্য আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয় ছোটগল্পের কাছে তিনি ইতিমূলকভাবে ঠিক কী দাবি করেন তা পরিষ্কার হলো না। কৌতূহলী পাঠক প্রায় একই বিষয়ে 'একতা' সঙ্কলনে দেবেশ রায় ('ছোটগল্প : রাবীন্দ্রিক ও অ-রাবীন্দ্রিক') ও সুবীর রায়চৌধুরীর ('রবীন্দ্রোত্তর উপন্যাস : নৈরাজ্য এবং নিরীক্ষা') প্রবন্ধ দুটি পড়ে দেখতে পারেন। শান্তি বসু এবং সুবীর রায়চৌধুরী যাঁদের সমালোচনা করেছেন—দেবেশ রায়ের প্রবন্ধে তাঁদের বক্তব্য জানা যাবে।

ইদানিং বাঙলা সাহিত্যে একটি নতুন আন্দোলনের কথা শোনা যাচ্ছে—যাকে বলা যেতে পারে কাব্যনাট্য আন্দোলন। কবিরা অনেকেই কাব্যনাট্য রচনায় হাত দিয়েছেন—কিছু কিছু অভিনয়েরও আয়োজন করা হচ্ছে। কিন্তু কাব্যনাট্য বস্তুটি কী—তাতে নাট্য কতখানি থাকবে আর কতটা কাব্য—এসব বিষয়ে সাধারণ পাঠক তথা দর্শক-শ্রোতার ধারণা স্পষ্ট নয়। কাব্যনাট্য সংখ্যা 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় এ-সম্পর্কে কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধ

প্রকাশিত হয়েছে, যথা, 'দুই ভুবন, একতারা' / অশ্রুকুমার সিকদার, 'বঙ্গমঞ্চ ও কাব্যনাট্য' / অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এছাড়া য়েটসের কাব্যনাট্যের ভূমিকার একটি তরজমাও প্রকাশিত হয়েছে।

কাব্যনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে আমরা কৌতূহলী। কবিতা এবং পাঠক-সমাজের বিচ্ছেদ সুবিদিত। কে জানে কাব্যনাট্যই হয়তো এদের মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করবে। 'গন্ধর্ব'-র পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে এ-সম্পর্কে আরও আলোচনার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করব।

'সুন্দরম'ই বোধহয় বাঙলা ভাষায় একমাত্র শিল্প-বিষয়ক পত্রিকা। এই পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যাটি আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য বিশেষাঙ্ক (দ্বিতীয় খণ্ড) হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। রাশিয়া, পূর্বজার্মানি ও পোল্যাণ্ডের ভাস্কর্য সম্পর্কে কয়েকটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ ছাড়াও আছে ঐ-সব দেশের ভাস্কর্যশিল্প নিদর্শনের বহুসংখ্যক সুন্দর আলোকচিত্রের প্রতিলিপি। কয়েক বছর আগে সোভিয়েত চিত্রকলা প্রদর্শনী উপলক্ষে 'পরিচয়'-এ অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, অতুল বসু প্রমুখের যে মূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল এই সংখ্যায় তা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

'চতুরঙ্গ'র রবীন্দ্রশতবার্ষিক সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যার চারটি প্রবন্ধই সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থের ইংরাজি প্রবন্ধের তরজমা। এর মধ্যে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রবন্ধটিও আছে। তবে এই সংখ্যায় পুস্তক-পরিচয় বিভাগটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। গত এক বছরে রবীন্দ্রালোচনায় যে বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় সবকটিরই সম্যক এবং দায়িত্বশীল আলোচনা আছে এই বিভাগে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, 'দেশ' রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যায় রবীন্দ্রসাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে কয়েকটি অতিমূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে এই সংখ্যায় পুলিনবিহারী সেনের 'রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র' প্রবন্ধটির প্রতি আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত এক বছরের রবীন্দ্রানুশীলনের একটি সমীক্ষা পাওয়া যাবে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের 'শতবার্ষিকী বৎসরে রবীন্দ্রচর্চা' প্রবন্ধে। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রবন্ধটির পরিপূরক হিসাবে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'বিজয়ার করকমলে' প্রবন্ধটি পাঠ্য। বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ: বিশ্বকবি ও বাঙালি' প্রবন্ধটি 'টু

সিটিজ'-এর প্রবন্ধটির মতো অশ্রদ্ধাসূচক নয়। চমকপ্রদ সিদ্ধান্তের তুরঙ্গে জন গিলপিন সুলভ অভিযাত্রার লোভ যে তিনি সংবরণ করেছেন এতে আশ্বস্ত বোধ করছি। ট্রিস্টান হে-র প্রবন্ধ তথ্যবহুল।

নতুন পত্রিকা 'উত্তরকাল'-এর প্রথম সংখ্যা আমাদের হাতে এসেছে। দুটি মাত্র মৌলিক প্রবন্ধ আছে সংখ্যাটিতে : 'আফ্রিকা : সভ্যের বর্বর লোভ'/ রবীন্দ্র মজুমদার ও 'নৈঃসঙ্গ্যের দীপ্তি' / সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নৈঃসঙ্গ্যের দীপ্তি' একটি ভালো প্রবন্ধের প্রতিশ্রুতি। এরিখ হার্টলে-র প্রবন্ধটি এক দশক পরে তরজমা করার সার্থকতা সম্পর্কে অন্তত আমি নিঃসন্দেহ নই। সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কে সোভিয়েত দেশেই নতুন মূল্যায়ন হচ্ছে—সমাজ বাস্তবতা বলতে কী বোঝায় তা নিয়েও নতুন করে আলোচনা চলছে। এই প্রবন্ধটি থেকে সে সম্পর্কে কোনোই আলো পাওয়া যাবে না। বিভাগীয় রচনাগুলি অগভীর ও অ্যামেচারসুলভ। সম্পাদকীয়তে যে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়েছে তা কার্যকরী করতে হলে সম্পাদকদের এ-বিষয়ে অবহিত হতে হবে।

প্রগতি সাহিত্যের সুস্থ বিকাশ ও নৈরাজ্য এবং অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যথার্থ সংগ্রাম এক মহৎ আদর্শ। এই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে তাঁরা ক্রমশই অধিকতর প্রাজ্ঞতা ও সংনিষ্ঠার পরিচয় দেবেন আমরা এমন আশা রাখি।

শচীন বসু

পুস্তক পরিচয়

গোরা কালার হাট। অশোক গুহ। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। ৮.৫০।

এই উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক অসবার্ট সিট্‌ওয়েলের মত উল্লেখ করে বলেছেন: "উপন্যাস ফর্মহীন, সুটকেশ সদৃশ বা। সে সুটকেশটি সজ্জিত হবে তার মালিকের রুচি এবং তাঁর গন্তব্যস্থান অনুসারে।" অর্থাৎ গন্তব্যস্থানের গুরুত্ব অনুযায়ী ভ্রমণকারী যেমন তাঁর সুটকেশে জামাকাপড় টুকিটাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে নেন, তেমনি উপন্যাসের আধারে বিষয়বস্তু অনুসারে লেখক টুকিটাকি ঘটনা গুঁজে দেবেন। বস্তুত লেখক সেই ভাবেই তাঁর উপন্যাসখানিকে বিচার করে দেখতে বলেছেন। তাঁর নিজের কথায়: "এর গন্তব্যস্থল দুশো বছরেরও আগেকার বাংলা, যখন তার নাম কালাদের মুখে মুখে বাঙ্গালা, এমন কি গৌড়বঙ্গ বলে প্রচারিত হলেও বিস্ময়ের কারণ ছিল না; আর ধলাদের মুখে তো সে ছিল বেঙ্গল-বেঙ্গালা। সেই সাবেক কালে বাংলার নানা জায়গা থেকে বহু মানুষের ধারা এসে মিশেছিল খালকাটা-কলিকাতা-ক্যালকাটায়—আবার বিদেশ থেকে ধলা মানুষের ধারাও এসে মিশেছিল—গড়ে উঠেছিল গোরার শ্রীপাট। সেই গন্তব্যগামী হতে সুটকেশ ভরতি করতে হলো তখনকার সমাজ আর ইতিহাসের রকমারি সাজসরঞ্জামে, রীতিনীতির টুকিটাকি এ-কোনে ও-কোনে গুঁজে দিতে হলো। আর তাতে করে এশিয়ার যে কিস্‌সা-কাহিনীর ঐতিহ্য মহাভারত-জাতক-আলিফ্‌ লয়লা ওয়া লয়লা থেকে বহতা—যা নানা সরিৎসাগর পার হয়ে একালে এসে ঠেকেছে, সেই কিস্‌সা কাহিনী আর ইতিহাসে জুটি বাঁধবারও একটা লক্ষণ দেখা দিলে। আবার এ-কালীন মন তাঁর ওপর কারিকুরি করতেও ছাড়লে না। এই সব মিলিয়ে-জুলিয়েই সেজে উঠেছে এই উপন্যাসের ফর্ম।"

এই উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে লেখক ইতিহাসের রকমারি সাজসরঞ্জাম এবং রীতিনীতির টুকিটাকি এ-কোনে ও-কোনে গুঁজে দিয়ে আর তার ওপর লেখকের একালীন মনের কারিকুরির প্রলেপ দিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনী এঁকেছেন, নজীর হিসাবে 'মহাভারত' ইত্যাদির নাম করেছেন। কিস্‌সা-

কাহিনী এবং ইতিহাসের একটা জুটি বাঁধবার চেষ্টাই এই উপন্যাসে তিনি করতে চেয়েছেন।

লেখকের এই "মিলিয়ে-ঝুলিয়ে" প্রচেষ্টাটি এখন কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হলো সেটা এইবার বিবেচনা করে দেখা যাক। লেখক এই প্রচেষ্টায় দুশো বছরেরও আগেকার বাংলাদেশের সমাজের নানা রীতিনীতি, ইতিহাসের নানা ঘটনা, কয়েক জায়গায় ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের উপস্থিতি ইত্যাদি মালমশলা যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন যদিও তার অধিকাংশই আমাদের অজানা ছিল না। পর্তুগীজ-হার্মাদ, ব্যবসায়ী ইংরেজ, দেশী শেঠ শেঠিয়া, আত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ, চক্রবর্তীদের শক্তিসাধনা, নবাবী আমলের নাচগান ফূর্তি তামাশা, স্বামীর মৃত্যুর পর সতী নারীর চিতায় সহগমন, বৈষ্ণবদের সাধনপদ্ধতি, নিমকের একচেটিয়া ব্যবসাকাঙ্ক্ষী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ইংলণ্ড থেকে সভ আগত সাহেববিবির বিবিধ ক্রিয়াকলাপ, নন্দকুমারের ফাঁসি ইত্যাদি নানা ঘটনা এবং তথ্য মিলিয়ে-ঝুলিয়ে লেখক এই কিস্সা-কাহিনীর জাল বুনেছেন; কিন্তু এত উপকরণ এত পরিশ্রম এত অধ্যবসায় যদি কাহিনীকে প্রাধান্য দেবার জন্যে হতো, যা একটা সুসংবদ্ধ গল্প বলার জন্যই যদি এগুলি তিনি অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করতেন তবে নিশ্চয় আমরা লেখকের ক্ষমতার এবং পরিমিতিবোধের তারিফ করতাম। তা করতে পারা যাচ্ছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

'মহাভারত'-এর নজীর লেখক দেখিয়েছেন বলেই একটা কথা লেখককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার। 'মহাভারত'-এ নানা কাহিনীর সমাবেশ, নানা ঘটনার ঘূর্ণাবর্ত। কিন্তু লক্ষ লক্ষ চরিত্র, হাজার হাজার ঘটনা থাকলেও সেখানে একটি কেন্দ্রীয় কাহিনী আছে; তার প্রস্তুতি, বিস্তার এবং পরিণতি আছে। প্রত্যেকটি ঘটনা সেই সুসংবদ্ধ কাহিনীর প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়েছে, তারা inevitable, excess নয়। সুদীর্ঘ আঠারোটি পর্বের ডালপালা ছড়িয়ে একটি দেশ-কাল ও মানুষের মিলিত ভূমিখণ্ডে সেই বিরাট মহীরুহ দণ্ডায়মান। কিন্তু এই উপন্যাসে সেইরকম কেন্দ্রীয় একটি কাহিনী আছে কি? লেখক তাঁর এই উপন্যাসের প্রথম সাতটি অধ্যায়ে সাতটি আলাদা কাহিনী বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সেগুলি আলাদা কাহিনী মাত্রই; সম্ভবত ইতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ এবং প্রদর্শনের নমুনা হিসাবেই সেগুলি ব্যবহৃত। এই সাতটি কাহিনী, আলাদা আলাদা ভাবে

সুখপাঠ্যও বটে, কিন্তু এই কাহিনীগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন, মূল কাহিনী (যদি কিছু থাকে) তাদের দ্বারা কোথাও দানা বেঁধে ওঠে নি, কোথাও সেগুলি মূল কাহিনীর পক্ষে inevitable নয়—নেহাৎই একটা ডকুমেন্টারি ছবির মতো চোখের ওপর দিয়ে সেগুলি ভেসে যায়, মনে কোনো দাগ কাটে না।

কোনো দাগ কাটে না তা এই কাহিনীগুলির চরিত্রকটির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। প্রথম অধ্যায়ের মকরন্দ সংস্কৃতকাব্য ভালো করেই পড়েছেন, হাফিজ আওড়াতে পারেন, গোলেবকাওলির কিস্সা বলতে পারেন, আবার সারেঙ্গি বাজিয়ে গজল গাইতে পারেন ব্রাহ্মণের, রাগরাগিণীর আলাপও সেতারে বাদ যায় না (ছবিটা কেন আঁকতে পারেন না বোঝা গেল না); সেই মকরন্দ বিদ্যাসুন্দরী কায়দায় এক আলাপিনী যোগাড় করে রাইয়ের কাছে প্রেমপত্র পাঠালেন, রাইকে পরে বিবাহ করলেন—সর্ত রইল একবৎসর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবেন না, হলে স্ত্রী বিপদগ্রস্তা হবেন। কিন্তু ভাগ্যের চক্রান্তে তা মেনে চলা মকরন্দের পক্ষে সম্ভব হলো না, বিয়ের কিছুদিন বাদেই তিনি নিষিদ্ধ কাজটি করলেন, রাইয়ের সন্তানসম্ভাবনা দেখা গেল, মকরন্দ কিছুদিনের জন্তে বাইরে গেলেন, ফিরে এসে দেখলেন গ্রাম শ্মশান, পর্তুগীজ জলদস্যুরা গ্রাম লুঠ করে নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, রাইকেও দংশন করেছে। রাই জানে তার জাত গিয়েছে, শ্বশুর তাকে সংসারে ফিরিয়ে নিতে চায় না। কারণ সে গন্ধরোগগ্রস্তা, মা মাথা চাপড়িয়ে ভাগ্যের দোষ দেন কিন্তু মকরন্দ তাকে ফিরিয়ে নিতে চায়। অবশ্য তা হলো না, রাই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল চিরদিনের মতো, আর মকরন্দ চলে এলো কলকাতায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের মেরী পাদরি-বাবার আশ্রয়ে ছিল লণ্ডনের এক মঠে। সুন্দরী মেরী সিন্থিয়া, ডরোথিয়া, সিল্ভিয়াকে ছাপিয়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিভিনিটিশাস্ত্রপড়া পাদরিগিরির শিক্ষানবিশ হেনরির কাছে ধরা দিয়ে কুমারী অবস্থায় জননীতে পরিণত হলো, যথারীতি হেনরির নাম মেরী জানাল না, সন্তান চলে গেল অনাথআশ্রমে, মেরী পরিণত হলো এক বহুবল্লভায়; কশাই-ধোবা-জাহাজের লস্করের সঙ্গে রাত কাটায় মেরী, হেনরিও এক শয়তানে পরিণত হলো, তারপর দুজনেই ভাগ্যের সন্ধানে চলে এলো কলকাতায়। তৃতীয় অধ্যায়ের লাজলীমোহনও মকরন্দের মতো নাগরবৃত্তায়

সেও সংস্কৃত-ফারসীতে পত্র লিখতে পারে। ফিরোজা, রুপাবাই, যমুনা— বহু-সুন্দরী রমণীর সে সঙ্গলাভ করেছে, কিন্তু শেষে বিয়ে করতে হলো কুৎসিত কুরূপা থাকমনিকে। পিতা প্যারীমোহন কবিরাজ, শক্তিসাধনা করেন তান্ত্রিকমতে চক্র করে ভৈরবী নিয়ে। লাঙলীমোহন একদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে চড়িভাতি করতে গিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এক চণ্ডালিনীর ঘরে আশ্রয় নিলেন, তাকে ভালো লাগল। ঘটনাচক্রে সেই চণ্ডালিনী এলো ভৈরবী হয়ে প্যারীমোহনের তন্ত্রসাধনায়, ব্যভিচারী চক্রবীরদের কামলালসায় সে এবং তার মা প্রাণ হারাল, বাধা দিতে গিয়ে চক্রের পুরোহিত প্রাণ হারালেন, মাতাল পিতার মুখে পদাঘাত করে পুত্র লাঙলীমোহনও মথুরাপুর ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায়। এইভাবেই কলকাতায় এসেছে হরানন্দ গঙ্গাগ্রামী, সিরাজের হত্যায় সে ব্যথিত, সে জানতে চায় তার জন্যে মোহনলালের বেটী, পল্লীবাংলার কবি কাঁদে কেন। হরানন্দের দাদা বীরানন্দ, বৌদি কৃষ্ণরঙ্গিনী। বীরানন্দ তাড়াশের নায়েব, পরে কোম্পানি বাহাদুরের ইজারাদার নন্দলালের অধীনে কাজ নিয়েছেন রানী ভবানীকে ছেড়ে। ইজারাদারদের অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহ করে, সেই বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে মারা গেলেন বীরানন্দ, কৃষ্ণরঙ্গিনী গেলেন সহমরণে আর হরানন্দ গঙ্গাগ্রামী চলে এলেন কলকাতায় ইংরেজের স্বরূপ বুঝতে। পঞ্চম অধ্যায়ের বৈষ্ণবী মেয়ে চাঁপালতা সখীভজা-নাগর মাধবের ভালোবাসাকে অগ্রাহ্য করে আখড়ায় নীলমণিরূপী সন্নার প্রেমে পড়ল, সন্না তাকে ঠকিয়ে ভরার নৌকায় করে নিয়ে এলো কলকাতায়। তার কারবার ছিল এই রকম ভাবে মেয়ে জোগাড় করে শহরে চালান দেওয়া— সেখানে সেই মেয়েরা বিক্রীত হবে কোনো টোলের বামুনের কাছে, কুলীন ব্রাহ্মণের কাছে—তাদের ঘরসংসার করবে। চাঁপালতাও অতএব এলো কলকাতায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ের পীতাম্বর মুনের চোরাকারবারী বিরজু প্রধানের পাল্লায় পড়ে কোম্পানির পুলিশের হাতে নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত হয়ে পালিয়ে চলে এলো কলকাতায়। আর সপ্তম অধ্যায়ের কাহিনী নীলাম্বর পালিকে নিয়ে, বাবা পীতাম্বর পালি কাপড় আর রেশম বেচে ক্রোড়পতি। নীলাম্বরের প্রেমিকা ছিল আর্মানি মেয়ে মরিয়ম, স্ত্রী ইন্দুরেখা। মরিয়ম চট্টগ্রামে চলে যাবার সময় নীলাম্বরকে দিয়ে গেলেন এক নীলা। সেই নীলার অভিশাপে বোধহয় পীতাম্বর কুঠির আগুনে পুড়ে মরলেন, নীলাম্বর

হলেন নিঃস্ব। পত্নী ইন্দুরেখাকে নিয়ে নিজের জলসাঘরে একরাত্রি কাটিয়ে নিদ্রিতা স্ত্রীকে ফেলে রেখে তিনিও চলে এলেন কলকাতায়। তারপরের চারটি অধ্যায়ে মহারাজা নন্দকুমারের শেষজীবন, তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত, তাঁর বিচার এবং ফাঁসি বর্ণিত হয়েছে।

সমগ্র উপন্যাসের কাহিনীর যে কাঠামো দেওয়া হলো তাতেই বোঝা যাবে এই কহিনীর মধ্যে একটা অখণ্ডতা দানা বেঁধে ওঠে নি। প্রেমে ব্যর্থ বা হতাশ্বাস, কিংবা জীবনযুদ্ধে পরাজিত—এদের নিয়েই কি সেকালের কলকাতা গড়ে উঠেছিল। ইংরেজশাসনের প্রথমদিকে যারা কলকাতায় এসেছিল নিজেদের ভাগ্য গড়ে নিতে, ইতিহাস বলে তারা অন্য শ্রেণীর লোক। সেই সুযোগসন্ধানী লোকগুলি বাদ দিলে দেশের যারা অগণিত জনসাধারণ, তাদের নিঃশব্দ অথচ সুদৃঢ় উপস্থিতি এই উপন্যাসে কোথায়। আট-দশজন লোকের জীবনে নানা ধরনের ব্যর্থতা (যার মধ্যে প্রেমই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান)—এই নিয়েই কি গোরা-কালার-হাট গড়ে উঠেছিল। অসংখ্য চরিত্র এই উপন্যাসে হাজির হয়েছে সত্যি কিন্তু তাদের কোনো ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে নি। মকরন্দ কলকাতায় এসে হলো এক সরাইখানার হিসাবলেখক, লাভলীমোহন হয়েছেন আর্জিলেখক, পীতাম্বর হয়েছে নন্দকুমারের চাকর, চাঁপালতা এক বিধানদাতা কুলীনের ঘরণী—কিন্তু এই হওয়া লেখকের মর্জি এবং সুবিধাকেই অনুসরণ করেছে, নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ধার ধারে নি, বোধহয় নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এদের নেই বলে। ইতিহাসের অমোঘ গতি যারা চিরকাল নির্ধারণ করে, সেই অগণিত মানুষ—তাদের ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা অশ্রুজল সংগ্রাম আনন্দ, তাদের নির্ভয় সত্যানুসন্ধান, ব্যর্থতাজনিত পরাজয়—এই সমস্তকে জড়িয়ে নিয়ে যে কালপুরুষ দেশের মাটিতে জন্ম নেয়, তার পরিচয় এখানে কোথায়। দেশ-কাল ও মানুষের যেটুকু পরিচয় এখানে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে সেটুকুও আংশিক এবং আরোপিত—সহজ, স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত নয়। যাঁরা নিজেদের ভিতর থেকে প্রশ্নের মাধ্যমে এবং বাইরের সংঘাতের ধারা অনুসরণ করে ইতিহাসের গতি না বোঝেন তাঁদের এই দুর্দশাই হয়। এই দোষ থেকে আধুনিক বাংলার সর্বজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিক থেকে বিপুলায়তন উপন্যাস রচয়িতাদের অধিকাংশই মুক্ত নন। অশোক গুহ কাহিনী এবং ইতিহাসকে আলাদা করে দেখেছেন। ফলে গল্প চলেছে

একদিকে আর ইতিহাস অন্যদিকে। শেষ চারটি অধ্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় কাহিনীর অবলম্বন থাকায় এখানে লেখককে কতকটা বাধ্য হয়েই ইতিহাসকে স্বীকার করতে হয়েছে। ফলে, সেখানে কাহিনী অনেক যুক্তিসহ, লেখকের ইতিহাসবোধ স্পষ্ট এবং বহুপরিমাণে নির্ভুল। কিন্তু আগের সাত-আটটি অধ্যায় লেখকের এই মনোযোগ থেকে বঞ্চিত। মহারাজা নন্দকুমারকে কেন্দ্র করে যে কটি অধ্যায় শেষের দিকে আছে তা নাটকীয়তায়, চরিত্রচিত্রণে, লিপিকুশলতায় ও লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত সহৃদয়তায় সত্যিই চমৎকার এবং বলতে দ্বিধা নেই এই কটি অধ্যায়ই এই বইয়ের প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু বাকি সাতটি অধ্যায় যেন সময়ের সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন এক-একটি দ্বীপের মতো—মাঝখানে সংযোগহীনতার ও অপ্রয়োজনীয়তার সুবিশাল বিস্তৃতি।

তবে যতই ব্যর্থতার কথা বলিনা কেন, তিন-চারশো পাতার যেমন-তেমন বিরাট উপন্যাস লিখে যাঁরা এপিক উপন্যাস লিখেছি বলে আত্মপ্রসাদ এবং সিনেমাওয়ালাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন, অশোক গুহ নিঃসন্দেহে সেইসব তথাকথিত বাজার চলতি ঔপন্যাসিকদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা ধরেন। তিনি form-এর দিক দিয়ে যে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন, তা তাঁর প্রথম উপন্যাসে অসার্থক হলেও ভবিষ্যতে সফল হবে না এমন বলা যায় না। তিনি উপাদান-সংগ্রহ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেখিয়েছেন, লিপি কুশলতার দিক দিয়েও তাঁর মধ্যে তীক্ষ্ণতা ও মিষ্টতার অভাব নেই। মোটামুটি যুক্তিগ্রাহ্য একটা ব্যাখ্যা দেবার দিকেও তাঁর ঝোঁক আছে। সেইজন্যই তাঁর এই নূতন প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এতগুণ থাকা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা ব্যালান্সের অভাব, যার ফলে তাঁর উপন্যাস মাঝামাঝির ওপরে উঠতে পারলনা। তবে তাঁর সম্বন্ধে নিরাশ হবার কিছু নেই এটুকু বিশ্বাস তাঁর প্রথম উপন্যাস পড়ে নিশ্চয় আমাদের হয়েছে।

অতীন্দ্র মজুমদার

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশক: ডি. এম. লাইব্রেরী। দু টাকা পঞ্চাশ ন.প.।

রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র। পরিমলচন্দ্র ঘোষ। প্রাপ্তিস্থান: এইচ. চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ। পাঁচ টাকা।

মার্কসবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেকেই ইতিহাস-সচেতনতার অভাবে মতবাদের শক্তিকে ঐতিহাসিক শক্তিগুলির অপেক্ষাও বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। প্রথমোক্ত পুস্তকটিতে পরোক্ষে ঐতিহাসিক শক্তিগুলিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের সচেতন পাঠকের কাছে তার বক্তব্য খুব অস্পষ্ট নয়। আর ওই পুস্তকটিতে ইতিহাসকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা ইচ্ছাকৃত, তাই সচেতন পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না এ বই কাদের জন্য লেখা এবং কাদের হয়েই বা এর ওকালতি।

প্রথমোক্ত পুস্তকটির মতে যুগে যুগে রাষ্ট্রনৈতিক তাত্ত্বিকগণ গণতান্ত্রিক নীতির কথা বললেও গণতন্ত্রের প্রথম ও শেষ শত্রু যে অতি-শাসনমূলক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা তার সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন না। লেখকের মতে একমাত্র গান্ধীজী-পরিকল্পিত শাসনমুক্ত সমাজই হলো এই সমস্যার সমাধান। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রসঙ্গে আর্থনীতিক বিকেন্দ্রীকরণ অতি প্রয়োজনীয়। দেশের অর্থনীতিতে ভোগ্যবস্তুর চাহিদা প্রধানত মিটবে গ্রাম্য জনসমষ্টি পরিচালিত কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের দ্বারা আর মূল শিল্পের মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের। এতে করে শাসনকে বিকেন্দ্রীত আর শোষণকে অবলুপ্ত করা সম্ভব বলে মনে করা হয়।

গান্ধীজীর আর্থনীতিক চিন্তাধারার স্ববিরোধিতা খুবই স্পষ্ট। ভারতের মতো দেশে যেখানে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে, যেখানে চাষযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ অফুরন্ত নয় বরং খুবই সঙ্কীর্ণ, যেখানে দু-শ বছরের ব্রিটিশ শাসনে পল্লী ও কুটিরশিল্প হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় মুমূর্ষু, সেখানে গান্ধীজীর সমাধান দারিদ্র্যের সমাধান নয় দারিদ্র্যের বণ্টন। এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে গান্ধীজীর সমাধান তথাকথিত শিল্প-বিপ্লবের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ romantic সমাধান। গান্ধীচিন্তার দুর্বলতা দেখানোর এই অর্থ নয় যে গান্ধীজীর ক্রিয়াকর্ম ভারতীয় ভূখণ্ডে কোনো স্থায়ী অবদান রেখে যায় নি। বর্তমান সমালোচকের মতে, গান্ধীজীর সামাজিক আন্দোলন ;] বিশেষ

করে, সেই সব আন্দোলন যা কিছু পরিমাণেও ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের অনুকূল, তার জন্ত ভারতীয় ইতিহাসে গান্ধীজীর অবদান স্মরণীয়।

গান্ধীজী সম্পর্কে সবচেয়ে আশার কথা ছিল যে তিনি 'কর্মবাদী' ছিলেন (সেইজন্তই কি ১৯৪৮ সালে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে?); তাই তিনি বারে বারে জনসাধারণের মধ্যে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আজ গান্ধীশিষ্যদের অবস্থা অনেকটা যেন গিরিগোবর্ধন-ধারণে অপারগতার মতো, অথচ তত্ত্বগত উল্লাসে (এবং তাও বিকৃত ব্যাখ্যা) এঁদের প্রচুর আগ্রহ।

সত্যই যদি গান্ধীজির শোষণমুক্ত তথা শাসনমুক্ত সমাজগঠন বাস্তব সত্য হতো তবে তা ইতিহাস-শিক্ষার স্বীকৃতিতেই সম্ভব ছিল। শৈলেশবাবুর বক্তব্য হলো: গণতন্ত্র আদর্শটি একমাত্র গান্ধী পরিকল্পিত সমাজ ব্যবস্থাতেই সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে গণতন্ত্র সম্বন্ধে 'স্থায়ী' ধারণাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রনীতিক তত্ত্বের তালিকা প্রণয়ন না করে লেখক ইতিহাসের শরণ নিলে দেখতে পেতেন যে 'গণতন্ত্র' বলতে কাল-নিরপেক্ষ কোনো ধারণা কোনো কালে ছিল না। গণতন্ত্রের ধারণাও যুগে যুগে পালটেছে এবং পরিবর্তিত হচ্ছে (গ্রন্থকারের গ্রন্থপঞ্জীটিতে এমন অনেক বইয়ের উল্লেখ আছে যেগুলিকে ঠিক মতো অনুধাবন করলে গ্রন্থকার তাঁর বিপরীত সিদ্ধান্ত ও লক্ষ্যেই পৌঁছতেন)। অথবা, ব্যক্তিস্বাধীনতারও যে বিকাশ হচ্ছে এবং হবে; অর্থাৎ তারও যে একটা ইতিহাস আছে এটাও ইতিহাসই আমাদের শিক্ষা দেয়। অথচ সেই ইতিহাসকে অনেকটা যেন সচেতনতার সঙ্গেই এড়িয়ে গিয়ে লেখক ব্যক্তিমানুষ ও মতবাদের ভূমিকাকে ইতিহাসের শক্তি থেকে বেশি প্রাধান্ত দিয়ে ফেলেছেন। এমন কি, ইতিহাসের যথার্থ শিক্ষা ব্যতিরেকেও লেখক খোলামন নিয়ে যদি সমস্ত সমস্যাটি আলোচনা করতেন তবে জয়প্রকাশ-প্রমুখের (নিজের নিবন্ধ রচনায় লেখক যাঁদের বইয়ের বা লেখার সাহায্য অপরিহার্য মনে করেছেন) চরিত্রের স্ববিরোধিতা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হতো না।

প্রথম পুস্তকের অনেক কথারই জবাব পাওয়া যাবে দ্বিতীয় পুস্তকটির সুলিখিত অধ্যায়গুলি থেকে। পরের পুস্তকটিতে পাঠ্য-পুস্তকের কঠিন নিয়মানুবর্তিতায় প্রথম আটটি অধ্যায়ে রাষ্ট্রের বিকাশ থেকে গণতন্ত্রের উদ্ভব-বিকাশ ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং জনগণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে

অবশিষ্ট তিনটি অধ্যায়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে 'গণতন্ত্রের মানদণ্ড ও দুই রাষ্ট্রব্যবস্থা,' 'ভারতবর্ষ ও গণতন্ত্র' এবং 'সমাজতন্ত্র ও রাষ্ট্রশক্তি'—এই বিষয়গুলির আলোচনা প্রসঙ্গে।

পরিমলবাবু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রহসন সুন্দরভাবে পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন বলে বর্তমান সমালোচকের ধারণা; তবে একটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই উল্লেখ করা হলো। সমস্যার অতি-সরলীকরণ করতে গিয়ে সোভিয়েত গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রেরও যে নিজস্ব স্থানিক এবং কাল-সম্পর্কিত সমস্যা থেকে যেতে পারে লেখক তা এড়িয়ে গেছেন। বর্তমানে সোভিয়েত দেশে এইসব সমস্যাগুলি নিয়ে খোলাখুলি, এমন কি তীব্র ভাষায়ও আলোচনা হচ্ছে। এতে করে সোভিয়েত গণতন্ত্রের শক্তি ও পৌরুষেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সকলে একথা স্বীকার করবেন কিনা জানি না। আশা করব পরবর্তী সংস্করণে লেখক খোলামনে সোভিয়েত গণতন্ত্রের আলোচনা করে তথাকথিত রাজনৈতিক তৃতীয় শিবিরবাসীদের মৌমাছি-বৃত্তির অন্বেষায় মাছিতন্ত্রের প্রকোপ থেকে আমাদের রেহাই দেবেন।

এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বইটি সুলিখিত ও প্রয়োজনীয় একথা বলতে পেরে আনন্দ অনুভব করছি।

বিমল চক্রবর্তী

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এম্. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ। দু টাকা।

আলোচ্য বইটির মধ্যে যথার্থ নবীনত্ব কিছু না থাক, রবীন্দ্রশতাব্দীতে রবীন্দ্র-নাথের নাম ভাঙিয়ে সংস্কৃতি-ব্যবসায়ীরা গীতের বিতানে যে অসহ্য কলঙ্কের আলামুখিতা এনে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে কিছু সত্য কথা আছে। এই সত্যের মূল্য দুইদিক থেকে পরীক্ষিত, প্রথমত লেখিকা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতজ্ঞা, দ্বিতীয়ত তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেছিলেন।

নিম্নলিখিত উক্তি স্মরণীয়:

"কিন্তু একথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করেন যে শুধু স্বরলিপির সাহায্যেই সব গান যথাযথ তোলা যায় না। ভাতখণ্ডের ছয় ভাগ বই দেখেই

যদি ওস্তাদ গাইয়ে হওয়া যেত তবে সাগরেদি করবার দরকারই হত না। কোনও কোনও বিশেষ প্রতিভাবানের ক্ষেত্রে হয়তো এর কিছু ব্যতিক্রম হতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভাবে তা সত্য নয়। মানচিত্র যেমন ভূপৃষ্ঠের হিসাব দেয়, পাঠ্যপুস্তক যেমন বৃহত্তর জ্ঞানের নির্দেশ, স্বরলিপিও তেমনি সঙ্গীতের কাঠামো। অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পী যেমন মৃৎপাত্রের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলেন, গুণী শিল্পীও তেমনি স্বরলিপির ভিত্তিতে সঙ্গীতের রস সৃষ্টি করেন। কণ্ঠের সূক্ষ্ম পর্দাগুলি, বিশিষ্ট টান টোন মিড় গমক মূর্ছনা, সূক্ষ্মতম যন্ত্রে পর্যন্ত ধরতে পারে না—স্বরলিপি তো দূরে কথা। লিখিত ভাষা যেমন যতই জোরালো হোক, মেজাজ আনতে হলে শুধু স্বরলিপির ওপর নির্ভর করলেই চলে না, সাগরেদির প্রয়োজন।" [পৃঃ ৪৫-৪৬]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা ব্যাপারে স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তিস্বত্বের কাছে খর্ব হয়ে গেছে সত্য, কিন্তু বিভিন্ন কণ্ঠস্বর ও কণ্ঠের প্রক্ষেপে বিশেষ গায়কী বৈশিষ্ট্য আনা যেতে পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনটি অঙ্গ : "কথার ভাব মাধুর্য, প্রকাশের ভঙ্গি এবং সুরের প্রকাশ মাধুর্য।" রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হলে গায়কীয় বিশিষ্ট ঢং, বিশুদ্ধ স্বর সংস্থান, বিশুদ্ধ ও পরিষ্কার উচ্চারণ, গানের অন্তর্নিহিত ভাবার্থ ও ব্যঞ্জনার প্রতি লক্ষ্য রেখে গান করা উচিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গাইয়ের মতো শ্রোতাকেও উপযুক্ত উপায়ে কিছুটা দীক্ষিত হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বিভিন্ন সুরের সমন্বয় সাধন করলেও মার্গ সঙ্গীতকেই ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এই কারণেই প্রথম স্তরের ধ্রুপদ-সঙ্গীত থেকে শেষ স্তরে সমন্বিত কাব্য-সঙ্গীত পর্যায়ে তাঁর গানের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। গানের মধ্য দিয়েই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সার্থক ভাবে উপলব্ধি করতে পারি, রূপের আড়ালে অরূপ বীণার ধ্বনি শুনতে পাই। মোটামুটি এই কথাগুলিই লেখিকা ও লেখক বইটির বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বিন্যাস' ও 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুর বিন্যাসটি যদি লেখিকা আরো সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মবাণী আমাদের কর্ণে মর্মরিত করে তুলতে পারতেন তাহলে পাঠকসাধারণ বিশেষ উপকৃত হতেন। আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঐতিহ্যবাদী গাইয়েরাই এই বিশ্লেষণ নিপুণভাবে করতে পারেন। বইটির যে দোষ ত্রুটি, গ্রন্থকারদ্বয় ভূমিকাতেই তা নিবেদন করেছেন, সুতরাং এ ব্যাপারে তার উল্লেখ না করাই ভালো। রবীন্দ্র-

সঙ্গীতের ভূমিকা হিসাবে 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা' সার্থক হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

স্বরলিপির অসম্পূর্ণতা, বিভিন্ন গায়কের কণ্ঠস্বর ও কণ্ঠের প্রক্ষেপ, রবীন্দ্র-ঐতিহ্যধর্মী গাইয়েদের কালের অগ্রগতিতে বিলোপ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েদের বিশেষ মর্জির পক্ষপাতিত্ব অথবা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমস্ত বৈচিত্র্য গ্রহণে প্রতিভার অক্ষমতা—পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকাশে সহায়তা করবে। রবীন্দ্রসঙ্গীত যে প্রকৃতই রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য অবিকৃতভাবে অটুট রাখতে পারবে না, এবং বাঙলাদেশে কীর্তন, রামপ্রসাদী, বাউলের মতো স্বরের বৈচিত্র্যে গীত হয়েও বিশিষ্ট ঢং-এর জন্য বিশেষ ব্যক্তিত্বকে দ্যোতিত করবে, এর অবশ্যম্ভাবী ইঙ্গিত যেন 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা'র মধ্যে উঁকি দিচ্ছে। যে কোনো সঙ্গীতের সজীবতার লক্ষণই এই বিকাশ। শুবার্ট-এর কাব্যসঙ্গীত কি আজও একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে? এ-ব্যাপারে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই পরিবর্তনের পথে দিশারী হবে 'স্বরবিতান', শুকতারা হবে রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব ও আদর্শ—যা তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

পার্থিব রায়

জনামরী ক্লাইভ স্ট্রীট। বিমল শর্মা। চিল্কো। চার টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনার জোয়ার কিঞ্চিৎ মন্থর হয়ে এলেও জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় নি। অতি-ব্যস্ত মানুষ অবসর ও অবকাশ যাপনের জন্য লঘু পাঠে অভ্যস্ত হয়েছেন। সামান্য তথ্য সম্বল করে কল্পনার চড়া-রঙ চড়িয়ে কিঞ্চিৎ ঝাল-নুন প্রয়োগে যে-কোনো রচনাকে তরল ও সহজপাঠ্য করা চলে, রম্যরচনাকারগণ এই সুযোগ অবাধে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে বিমল শর্মা সেই অনায়াস সুযোগ পরিহার করে মনোনিবেশসহকারে ক্লাইভ স্ট্রীট-কে প্রত্যক্ষ করেছেন। এর কারণ তিনি একদা এই অঞ্চলটের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পালটাবার সঙ্গে সামাজিক নৈতিক পরিবর্তনের চেহারা সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন, করছেন। এই পরিবর্তনের পিছনে ক্লাইভ স্ট্রীটের দান অসামান্য। বস্তুত এই

পাড়াটি দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে বললে অত্যুক্তি করা হয় না। লেখক ছোট ছোট ঘটনার সাহায্যে ক্লাইভ স্ট্রীটের মর্ম উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছেন। শঠতা, বঞ্চনা, পরস্বাপহরণ ইত্যাদি বৃত্তিই যে ওই পাড়ায় বিশেষ সদ্গুণ রূপে বিবেচিত লেখক তির্যক ভঙ্গিতে তা তুলে ধরেছেন। তবে ধন-আহরণের জন্য বাঙালীদের পশ্চাদপসরণের যে কারণ তিনি বলেছেন, তা অনেকে অগ্রাহ্য করবেন কারণ ধন-আহরণ ও হরণের ক্ষেত্রে জাতিগত বা সম্প্রদায়গত বিভেদ অতিসামান্যই বর্তমান থাকে।

লেখকের ভাষা সহজ ও সাবলীল। দু-এক স্থানে তত্ত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা না করলেই ভালো ছিল। তবু এই সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও 'ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীট' একটি উপভোগ্য রচনা।

কার্তিক লাহিড়ী

রামদুলাল সরকার [দেব]

সুকুমার মিত্র

পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে শুধু বাংলার স্বাধীনতার অবসান হলো তা নয় বাংলাদেশে যে বণিকশক্তির উদ্ভব হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা-ও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কার ও ধনপতি জগৎ শেঠ উপাধিধারী মুর্শিদাবাদের শ্রেষ্ঠিবংশ, বিশ্বাসঘাতক নবাব মীরজাফর এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি সামন্তবর্গ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফল হয়েছিল উল্টো। সিরাজের কাঁটা দূর হলো বটে, কিন্তু ইংরেজের কাঁটা গলায় বিঁধেই রইল। তারপর মীরকাশিম ও মীরজাফরের স্বাধীন হবার চেষ্টা এবং তার ব্যর্থতার কাহিনী সবারই জানা আছে। তার পুনরুক্তি করে কোনো লাভ নেই।

জগৎ শেঠ উপাধিধারী শ্রেষ্ঠিবংশের সর্বনাশ ইংরেজই করেছিল, নবাব মীরকাশিম নয়। জগৎ শেঠ পরিবারের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের মূলে ছিল নবাব-অনুমোদিত টাকশাল। চতুর ইংরেজ ক্ষমতালাভের পরই সেই টাকশাল বন্ধ করে নিজেদের টাকশাল চালু করল। তারপরের ইতিহাস হলো বাংলার ব্যবসাবাণিজ্য ও মুদ্রার ক্ষেত্রে ইংরেজদের সর্বময় কর্তৃত্ব বিস্তারের ইতিহাস। তবু ইতিহাসে স্ববিরোধী ঘটনার সমাবেশ ঘটে। তাই, ইংরেজ বাংলার সামন্ততন্ত্রের মূলে যে আঘাত হানল এবং উদীয়মান বুর্জোয়া বা ধনিক-সভ্যতার যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করল তাতে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নতুন এক ধনিকশ্রেণীর অঙ্কুর মাথা তুলেছিল। এই ধনিকশ্রেণী বা মধ্যশ্রেণীর (Middle Class) পুরোগামীদের মধ্যে রামদুলাল সরকার (দেব)-এর নাম সর্বাগ্রগণ্য।

রামদুলাল জন্মগ্রহণ করেন ১৭৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে দমদমের কাছে রেকজানি গ্রামে। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে কেমন করে তিনি বহুলক্ষপতি

হয়েছিলেন সে কাহিনী সুবিদিত। বাংলাদেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যসম্পর্ক রামদুলালের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ এক সভায় রামদুলাল সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

> "Ramdoolal may justly be said to be the pioneer of American Commerce in Bengal."

কিন্তু শুধু আমেরিকা নয় রামদুলাল ফিলিপাইন, চীন ও ব্রিটেনের বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কারবার করতেন। রামদুলাল ছিলেন বস্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, নিউবেরী পোর্ট প্রভৃতি মার্কিন বাণিজ্যকেন্দ্রের বড় বড় বণিকদের সোল এজেন্ট। চীনের ও ফিলিপাইনের বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কারবারও তাঁর মাধ্যমে চলত। এ সব ছাড়া তৎকালীন কলকাতার সর্ববৃহৎ বৃটিশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ফেয়ার্লি ফারগুসন এ্যাণ্ড কোম্পানীর তিনি বানিয়ান ছিলেন। রামদুলালের নিজস্ব তিনখানি বাণিজ্যপোত ছিল। কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করেন নি। রামদুলালকে বাণিজ্যনির্ভর বণিক (mercantile capitalist) বলা যায়। রামদুলালের মৃত্যু হয় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। রামদুলালের মৃত্যুর পর 'লণ্ডন টাইম্‌স্‌' রামদুলালের পুত্রদের (ছাতুবাবু ও লাটুবাবু) 'বাংলার রথসচাইল্ড' বলে বর্ণনা করেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা কোম্পানীকে সাহায্য করতেন এবং কোম্পানীর নানা কাজে নিযুক্ত থাকতেন সমাজে তাঁদের মানমর্যাদা অনেক বেশি ছিল। রামদুলাল দেব বা দে সরকার বহুলক্ষপতি হয়েও এই মর্যাদা পান নি। এমন কি যেসকল ধনী ব্যবসায়ী ইংরেজদের অনুগৃহীত ছিলেন তাঁদের তুলনায় রামদুলালের মানমর্যাদা কম ছিল এমন প্রমাণ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাতি বাবু আনন্দকৃষ্ণ বোস প্রণীত 'A Short Account of the Residents of Calcutta in 1822' নামক পুস্তিকায় পাওয়া যায়।

এই পুস্তিকাটিতে কলকাতার নাগরিকদের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তাতে দেখা যায় প্রথম শ্রেণীতে পড়েছেন রাজা নবকৃষ্ণ চৌধুরী, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ; দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েছেন দর্পনারায়ণ ঠাকুর, রামময় ঠাকুর, মুন্সী সদরুদ্দীন (সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্য বারওয়েল সাহেবের মুন্সী), দুর্গাচরণ মিত্র প্রমুখ। ব্যবসাবাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করে যাঁরা

এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বৈষ্ণবদাস শেঠ, আমীরচাঁদ বাবু, লক্ষ্মীকান্ত ধর, সুখদেব মল্লিক, নয়নচন্দ্র মল্লিক, শোভারাম বসাক (কোম্পানীর কাছে কাটা কাপড় বিক্রি করতেন), রামকৃষ্ণ মল্লিক।

রামদুলাল দে সরকার স্থান পেয়েছেন তৃতীয় শ্রেণীতে। তৃতীয় শ্রেণীতে আর যাঁরা স্থান পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন নীলমণি ঠাকুর (ইনিই দ্বারকানাথ ঠাকুরকে পোষ্যপুত্র নেন), হৃদয়রাম ব্যানার্জী (এঁর নাম বিকৃত হয়ে গলির নাম হয়েছে 'হিদারাম ব্যানার্জী লেন'), বলরাম সেন, অক্রুর দত্ত, যুগোলকিশোর আঢ্য (ব্যাঙ্কব্যবসায়ী), মথুরামোহন সেন (ব্যাঙ্কার ও স্রফ)। মথুরামোহন সেন ও নিমাইচরণ সেন দুই ভাই। ব্যবসাবাণিজ্যও এঁরা করতেন এবং যশোরে এঁদের সাতটি নীলকুঠি ছিল।

রামদুলাল সরকার মৃত্যুকালে রেখে যান নগদ ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা এবং বিপুল পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি। রামদুলালের ব্যবসাবাণিজ্যে কিছুটা মন্দা পড়ে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধায়। যুদ্ধ মিটলে রামদুলাল মার্কিন বণিকদের পাওনা কয়েক লক্ষ টাকা সুদসমেত ফিরিয়ে দেন। এতে খুশি হয়ে মার্কিন বণিকরা রামদুলালকে জর্জ ওয়াশিংটনের একটা তৈলচিত্র উপহার দেন এবং রামদুলালের জন্মান্ধ কন্যা বিমলার নামে তৈরি রামদুলালের 'বিমলা' বাণিজ্যপোতের (টিটাগড়ের ডকে তৈরি) তৈলচিত্র নিয়ে যান।

রামদুলালের ব্যবসাবাণিজ্য অনেকদিন চালু থাকলেও তাঁর ছেলে ছাতুবাবু (আশুতোষ দেব) ও লাটুবাবুর সময় থেকেই পূর্বসমৃদ্ধি হ্রাস পেতে থাকে। রামদুলালের দৌহিত্র শ্যামলাল (চাঁদ ?) মিত্র, অনুপ মিত্র প্রমুখ ছাতুবাবুর ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন। কোম্পানীর নাম ছিল Ashutosh Deb and Nephews.

রামদুলালের বড় ছেলে ছাতুবাবু গুণগ্রাহী ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। অমিতব্যয়ী কলকাতার 'সাত বাবু'র মধ্যে ছাতুবাবু একজন। স্বাধীনভাবে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছাতুবাবুও করেন নি। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ছাতুবাবুর মৃত্যু হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পরই ভারতবর্ষের ভাগ্য ব্রিটেনের ভাগ্যের সঙ্গে গ্রথিত

হয়। ব্রিটেনের উদীয়মান শিল্পনির্ভর ধনিকশ্রেণী যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে হটিয়ে ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা হবার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করেছেন তখন বাংলাদেশে প্রথম পাশ্চাত্ত্য বা বুর্জোয়া পদ্ধতি পরিচালিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কের নাম হলো ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল (১৮০৬)। পরে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী ও দেশীয় ধনিকগণ (জে. জি. গর্ডন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ) ১৬ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের সঙ্কটের ঢেউ বাংলাদেশেও লাগে এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বালে। এই ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় হাহাকার ওঠে। ছাতুবাবু ও লাটুবাবু গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হন। একটি গানে এই সঙ্কটের চেহারাটি ফুটে উঠেছে :

"দেতা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নাই।
কাকরেল নাই টাকা নাই।
জলে জাহাজ নাই।
কেবল ছাতু লাটু ধুলায় পড়ে কাঁদতেছে।
... ...
পেঁচে পড়ল কলিকাতারি লোক॥
অকস্মাৎ, কি আঘাত, বজ্রাঘাত॥
ছাতুবাবু হলো কাবু, পেলে পুত্রশোক॥
একে প্রাণের শোক বড় শোক।
তার আবার ধনের শোক।
রসের আশুতোষ নীরব হয়ে রয়েছে॥

কোম্পানীর যুগে বাঙালী ধনিকশ্রেণীর উদ্ভব পর্যায়ের অন্যতম নিবন্ধ।

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

প্রবীণ ও অগ্রগণ্য সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন-এর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে।

রমেশচন্দ্র পরিণত বয়েসে লিখতে আরম্ভ করেন। যদিও সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় কৈশোর থেকে।

রমেশচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে তাঁর এই বিচিত্র জীবনের ভূমিকা অনেকখানি। প্রথম জীবনে টোলে পড়াশুনো করেছেন। ফলে ধ্রুপদী সাহিত্যের ঐতিহ্যে তাঁর শিশু ও কিশোর মন লালিত হয়েছে। পরে প্রাইভেটে এনট্রান্স পাশ করে ঢুকেছেন কলেজে। আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের সূত্রপাত সেই থেকে। বংশগত পেশা কবিরাজীই তাঁর জীবিকা ছিল। আর, এই পেশার তাগিদে গত চল্লিশ বছর তাঁকে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে—শহরে, শহরতলীতে, গাঁয়ে। মানুষের রোগের চিকিৎসা করতে করতে অনিবার্যভাবে তাঁর শিল্প-দৃষ্টিতে সময়, সমাজ ও অস্তিত্বের বিবিধ রোগের উপসর্গ ধরা পড়েছে। চিকিৎসক হিসেবে তিনি জানেন মানুষ কি ভীষণভাবে বাঁচতে চায়; কি অপরাজেয় তার জীবনীশক্তি ও বাঁচার বাসনা। তাই চিরদিনই সাহিত্যজীবনের কর্মে তিনি তাঁর পায়ের তলায় এই অভিজ্ঞতার শক্ত মাটি পেয়েছেন।

এই প্রত্যক্ষ ও অমোঘ অভিজ্ঞতা রমেশচন্দ্রকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দিয়েছে। ফলে বিগত অর্ধশতাব্দীর একজন দীন, নীরব অথচ নিষ্ঠ কর্মী হিসেবে তিনি বাংলা দেশের প্রাক্‌স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন, রাখার সজ্ঞান চেষ্টা করেছেন। একদা যেমন করেছেন কংগ্রেসের ভলান্টিয়ারী, পরবর্তীকালে তেমনি যোগ দিয়েছেন প্রগতিসাহিত্য-শান্তি আন্দোলনে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বহু 'রাজনৈতিক অপরাধী' বহুবার গ্রেপ্তার এড়িয়ে আশ্রয়ের জন্য তাঁর কাছে যাবার ভরসা রেখেছে। এই ভরসা ছিল রমেশচন্দ্রের নির্দিপ প্রত্যয়ে। যার ঘোষণায় তিনি চিরদিনই অকুণ্ঠ। খানিকটা আকস্মিকভাবে হলেও, রমেশচন্দ্রের সর্বশেষ গল্প 'কথ ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া তাই সঙ্গত হয়েছে।

আকস্মিক, কারণ হঠাৎ তাঁর দেহান্ত হয়েছে। রমেশচন্দ্র দীর্ঘদিন অসুস্থ। হার্টের ব্যারামে বহুবার তাঁকে কষ্ট পেতে দেখেছি, কিন্তু তাঁর এই অসুস্থতা

বন্ধুজনের, এমন কি তাঁর নিজের কাছেও পুরনো হতে হতে গুরুত্ব হারিয়েছিল। আর ছিল তাঁর অপরিমিত প্রাণশক্তি ও বিশ্বাস। একটা চোখ নষ্ট হয়েছিল। আর একটা চোখও ছানি পড়ে যখন তাঁকে সম্পূর্ণ অন্ধ করেছে, তখনও দেখেছি তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে চোখ অপারেশন করে আবার যখন তিনি সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন, তখন রমেশচন্দ্র হাসপাতাল ত্যাগ করে বাড়িতে ফিরে সবপ্রথম তাঁর বিখ্যাত 'সাহিত্য সেবক সমিতি'র এক অধিবেশন ডেকেছিলেন। উদ্দেশ্য সকলকে আবার চোখ ভরে দেখা। নতুন করে কিছু লেখার বাসনাও ছিল। কিন্তু সে সভা বসবার আগেই রমেশচন্দ্রকে আকস্মিকভাবে আমরা হারিয়েছি।

'সাহিত্য সেবক সমিতি' তাঁর এক কীর্তি। সেই 'কল্লোল'কালীন লেখকদের সাহিত্যজীবনের শুরুতে এর প্রতিষ্ঠা এবং চিরদিনই এটি ছিল প্রবীণ-নবীন-অজ্ঞাত লেখক ও সাহিত্যরসিকের মিলনকেন্দ্র। রমেশচন্দ্রের জীবনে সাহিত্যপ্রেম ও সাহিত্যিকপ্রীতি কোন স্তব্ধ পর্যায়ে সদা জাগরূক ছিল তার সাক্ষ্য বাঙলাদেশের অধিকাংশ সাহিত্যিকই দেবেন। অথচ খুবই আশ্চর্য যে শেষপর্যন্ত অত্যন্ত অবহেলা আর অনাদরে তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে।,

ঠিক 'জনপ্রিয়' না হলেও রমেশচন্দ্র ছিলেন বাঙলা কথাসাহিত্যের এক অগ্রগামী লেখক। 'শতাব্দী' ও 'কুরপালা'র মতো অসামান্য উপন্যাস তিনি লিখেছেন। আর লিখেছেন কয়েকটি প্রথমশ্রেণীর গল্প—নিঃসন্দেহে যা বাঙলাসাহিত্যের সম্পদ।

অথচ পাঠক-সমালোচক ও সম্পাদকদল তাঁর প্রতি সর্বদা সুবিচার করেন নি। আলোচনা ও সঙ্কলনে তিনি বহুসময় বিস্মৃত হয়েছেন। আজ যাঁরা রাষ্ট্রীয় খেতাব ও বিভিন্ন পুরস্কার লাঞ্ছিত বাঙলা সাহিত্যের প্রবীণ সিংহ—তাঁদের প্রায় সকলেই রমেশচন্দ্রের দীর্ঘদিনের সুহৃৎ। বছরের পর বছর চোখের সামনে তিনি এঁদের শ্রীবৃদ্ধি দেখেছেন—রমেশচন্দ্র অল্পখ্যাত, দরিদ্র, বিড়ম্বিত। বছরের পর বছর চোখের সামনে তিনি দেখেছেন কত মামুলী লেখক ও মানুষ কি সোনারকাঠির স্পর্শে দিগ্বিজয়ী হয়—রমেশচন্দ্র অল্পখ্যাত, দরিদ্র ও বিড়ম্বিতই থেকেছেন। কোনোদিন তাঁকে এতটুকু ক্ষুব্ধ, বিচলিত বা প্রলুব্ধ হতে দেখা যায় নি।

আমরা একথা বলি না রমেশচন্দ্র বাংলাসাহিত্যের যুগান্তকারী লেখক।

তিনি অন্য বই লিখেছেন—তারও কয়েকটি মাঝারি, কয়েকটি দুর্বল। নিজের প্রবল ব্যাধি (যা বহুপূর্বেই তাঁকে যে কোনো মুহূর্তে নিভিয়ে দিতে পারত), প্রবল দারিদ্র্য, জীবিকার প্রবল চাপ তাঁকে লিখতে বসার সুযোগ অল্পই দিয়েছে। তাছাড়া শেষ জীবনে অন্ধতার জন্য অনেকগুলি রচনাই তিনি নিজের কলমে লিখতে পারেন নি। তদুপরি ছিল বৃহত্তর জগতের আহ্বান। সুতরাং 'শতাব্দী' ও 'কুরপালা'র মতো উপন্যাস তিনিও যে আর লিখতে পারেন নি একথা সত্য। তবু 'শতাব্দী' প্রসঙ্গে মোহিতলালের সেই অব্যর্থ উক্তি মনে পড়ে: "আপনিই নবযুগের নবজীবনের সহজ ছন্দটি ধরিতে পারিয়াছেন—একেবারে বাংলার বাঙ্গালীর নবজীবন।...আপনার সারাজীবনের ধ্যান, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইহার সকল উপকরণ যোগাইয়াছে...অন্যে অনেক লিখিয়া একটাতেই পূর্ণসিদ্ধি লাভ করে, আপনি একটাতেই তাহা লাভ করিয়াছেন।"

চল্লিশের দশকে বাংলা দেশে প্রগতিলেখক-আন্দোলন শীর্ষ দেশে পৌঁছেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রমেশচন্দ্রকে বিচার করলে 'কুরপালা' উপন্যাসের অন্য তাৎপর্যও অনুদ্‌ঘাটিত থাকে না। কোনো ব্যক্তি নয়, একটা গ্রাম এই উপন্যাসের নায়ক। সাহিত্যে সমষ্টিজীবনের বাস্তব রূপায়ণের প্রয়াসে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাই গল্পে উপন্যাসে রমেশচন্দ্র অজস্র ও বিচিত্র চরিত্রের স্রষ্টা।

আজ এই শোকসন্তপ্ত মুহূর্তে রমেশচন্দ্রের সাহিত্যকৃতির আলোচনা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয়। তাঁর বেশ কয়েকটি গল্পের বিশ্লেষণ মারফৎ প্রমাণ করা যেত রবীন্দ্রনাথ-তারাশঙ্কর-মানিক বাঁড়ুজ্জে ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যপাঠের ফল ও নিজের অভিজ্ঞতা এবং জীবনবোধ কি ভাবে কোনো কোনো গল্প রচনায় রমেশচন্দ্রকে এক স্বতন্ত্র ভাষা ও ভঙ্গির সন্ধান দিয়েছে। তা বাস্তবতা নির্ভর, কখনো পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিকতার গুণবিশিষ্ট, কখনো নগরকেন্দ্রিক, অথচ লেখকভঙ্গিতে যা এক অন্য ধরনের কবিত্ব লাভ করে সর্বজনীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

আশ্চর্য হই রমেশচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসা ও জাগতিক সর্বব্যাপারে প্রবল কৌতূহলে। লুমুম্বার হত্যার পর 'হায় ছায়াবৃতা' নামে বাঙ্গালী কবিদের কাব্যসংকলনের প্রকাশ-সংবাদে উৎফুল্ল রমেশচন্দ্র বর্তমান লেখককে একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিহীন। তাঁরই আগ্রহে

যখন তাঁকে কয়েকটি কবিতা পাঠ করে শোনানো হলো তখন রমেশচন্দ্রের সেই অভিব্যক্তি অবিস্মরণীয়।

একই কারণে এই বৃদ্ধ বয়েসে হয়তো তিনি খারাপ লিখেছেন, কিন্তু বাস্তবতা থেকে পলায়ন করে অধ্যাত্মবাদ বা অলৌকিক রহস্যবাদের আশ্রয় নেন নি। টোলের ছাত্র এবং কবিরাজ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখায় কোনোদিন আকস্মিক বা যুক্তিহীন কিছু ঘটে নি। প্রগাঢ় নৈর্ব্যক্তিকতায় তিনি সমাজের ভাঙন ও ইতিহাসের গতিকে রূপ দিয়েছেন। প্রবল সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে যে অক্ষয় মানসসম্পদের অধিকারী করেছিল তারই ফলে ইতিহাস ও সমাজ ও মানুষই শেষদিন পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যের বিষয় থেকেছে। তাই মৃত্যুর পূর্বেও তিনি দু-চোখ ভরে এই পৃথিবী আর মানুষকেই দেখে গেছেন।

'পরিচয়' গোষ্ঠী ও বর্তমান লেখকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর। আমরা তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখব।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকটি প্রত্ন-সংবাদ

সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ার নানা জায়গায়—বিশেষ করে উজবেকিস্তান আর কাজাকস্তানে—যে খুব ব্যাপকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কাজ চলেছে, তার খবরাখবর মাঝে মাঝে আমরা পেয়ে থাকি। এই সব খননকার্যের ফলে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে এসব অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক-সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বহু মনোজ্ঞ তথ্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে। সোভিয়েত প্রত্নবিজ্ঞানীদের এক-একটি দল বিভিন্ন এলাকায় যে ঐকান্তিক মনোযোগের সঙ্গে এই শ্রমসাপেক্ষ কাজে নিজেদের দীর্ঘকাল ধরে নিযুক্ত রেখেছেন, তার পেছনে গভীর এক ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা ছাড়াও আছে বিশেষ করে ভারত-রুশ সম্পর্কের সুপ্রাচীন নিদর্শনগুলিকে খুঁজে বের করার মধ্যে দিয়ে আজকের ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী-সম্পর্ককে প্রাচীনত্বের দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস।

এইসব প্রত্ন-আবিষ্কারগুলির মধ্যে সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উজবেকিস্তানের আমু-দরিয়া নদীর তীরে কারা-তেপে গ্রামের কাছে এক দুর্গম অঞ্চলে খননের কাজ চালিয়ে সোভিয়েত প্রত্নবিজ্ঞানীরা মে মাসের শেষের দিকে সাম্প্রতিকতম যে বৌদ্ধ চৈত্যটি আবিষ্কার করেছেন, সেটাকে এ-অঞ্চলে এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলির মধ্যে প্রাচীনতম বলে তাঁরা মনে করেছেন। এই খননকার্য পরিচালনা করেন প্রত্নবিজ্ঞানী বোরিস স্তাভিস্কি।

এই বৌদ্ধ চৈত্যটি আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে, তার খুব কাছেই ছিল

প্রাচীন তেরমেজ শহর—যে-শহরটিকে ১২২০ খ্রীষ্টাব্দে চেঙ্গিজ খানের বাহিনী ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। ভারত থেকে মধ্য-এশিয়ার বুক চিরে ক্যাস্পিয়ান হ্রদ ও কৃষ্ণ সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত যে-বাণিজ্যপথটি ছিল ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান যোগসূত্র, সেই পথটির ওপরেই গড়ে উঠেছিল এই সমৃদ্ধ তেরমেজ শহর। এই সুপ্রাচীন বাণিজ্য-পথটির ধারে কাছে গোটা মধ্য-এশিয়া জুড়ে নানা সময়ে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্রের ও মঠ-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে কারা-তেপে গ্রামের এই আবিষ্কারটি সাম্প্রতিকতম। কারা-তেপে থেকে উদ্ধৃত প্রত্নদ্রব্যগুলি আর বিভিন্ন পাত্রের গায়ে উৎকীর্ণ লিপিগুলি পরীক্ষা করে সোভিয়েত প্রত্নবিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে এই চৈত্যটি নির্মিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যে। এখানে খননকার্য চালিয়ে সবচেয়ে মূল্যবান যে প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদটি সংগৃহীত হয়েছে, সেটা হলো—কয়েকটি পাত্রের ভগ্নাংশে উৎকীর্ণ ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে লেখা ষোলটি সংস্কৃত শব্দ। সোভিয়েত প্রাচ্যভাষাবিজ্ঞানী শ্রীমতী তাতিয়ানা গ্রেক এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করেছেন। প্রধানত এই লিপি থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে, প্রাচীন বক্ষু দেশে ও হিন্দুকুশের উত্তরাঞ্চলে এইটেই হলো প্রাচীনতম বৌদ্ধ চৈত্য। এখানে খননের কাজ চালিয়ে অন্য যেসব জিনিস উদ্ধার করা গেছে, তার মধ্যে আছে : নানারকম মুদ্রা, একটি লিপি-উৎকীর্ণ প্রস্তর-ফলকের কয়েকটি অংশ, শ্বেতস্ফটিকে তৈরি কতকগুলি রং-করা মূর্তির ভগ্নাংশ, একটি ছোট প্রস্তর-বুদ্ধমূর্তি এবং নানারকমের নিত্যব্যবহার্য গৃহস্থালীর জিনিস।

এই আবিষ্কারের খবরটি বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের মধ্যে যে গভীর আগ্রহ-ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছে, ঠিক সেই রকম আগ্রহ সৃষ্টি হবার মতো আরেকটি খবর এসেছিল আরও কয়েক মাস আগে। এই প্রত্ন-সংবাদটিও উজবেকিস্তানের।

এখানকার দক্ষিণ অঞ্চলে আরেকটি গ্রাম খানাকা-তেপে-তে (উজবেক-ভাষায় 'তেপে' কথাটির অর্থ জন-বসতি) কিছুকাল আগে খননের কাজ চালিয়ে কুশান যুগের স্থাপত্যানুসারী একটি প্রাসাদ আবিষ্কার করা হয়। খানাকা-তেপের এই খননকার্য পরিচালনা করেন সোভিয়েত দেশের বিশিষ্ট

প্রত্নবিজ্ঞানী গালিনা পুগাচেন্‌কোভা। শ্রীমতী পুগাচেন্‌কোভার এই আবিষ্কারের মাত্র মাস কয়েক আগে আরেকজন প্রখ্যাত সোভিয়েত প্রত্নবিদ নিকোলাই লিওনফ সোভিয়েত-আফগান সীমান্তের কাছে অনেকগুলি স্থাপত্য-নিদর্শন আবিষ্কার করেন এবং সেগুলিকে খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভকালে নির্মিত ও কুশান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মত প্রকাশ করেন। সকলেই জানেন, উত্তর-ভারত থেকে আরাল সাগর পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত ছিল এই কুশান সাম্রাজ্য।

খানাকা-তেপের খননকার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। ইতিমধ্যে শ্রীমতী পুগাচেন্‌কোভার প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে: কুশান যুগের এই প্রাসাদের যে-অংশটুকু এ-পর্যন্ত উদ্ধৃত হয়েছে, তা স্তম্ভশ্রেণী-শোভিত ও দ্বারমণ্ডপ-সমন্বিত একটি খুব বড় আকারের সম্মাবর্তন-প্রকোষ্ঠ; এর একপাশে রয়েছে একটি ছোট উপাসনাস্থলী; প্রাসাদটির স্থাপত্যবিন্যাস ও নির্মাণ-পরিকল্পনা লিওনফ-আবিষ্কৃত সোভিয়েত-আফগান সীমান্তের ইমারতগুলির অনুরূপ; অলঙ্করণে ভারতীয় ও গ্রীক প্রতীকের সংমিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়: যেমন, স্তম্ভচক্রগুলিতে আর ভিত্তি-অলঙ্করণে স্বস্তিক আর পদ্মের নক্‌শার সঙ্গে সুন্দর ভাবে মেশানো হয়েছে দ্রাক্ষাগুচ্ছ আর আইভি পাতার নক্‌শা। কতকগুলি প্রস্তর-ভাস্কর্যের ভগ্নাংশ আর পোড়া মাটির মূর্তিও এখানে পাওয়া গেছে।

পুগাচেন্‌কোভার এই রিপোর্টে ভাস্কর্যগুলির মূর্তিলক্ষণ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ না থাকলেও, ওই ভিত্তি-অলঙ্করণের বর্ণনা থেকে সেটাকে গান্ধার-শিল্পের গোড়ার দিকের নিদর্শন বলে বুঝতে অসুবিধে হয় না। কুশান-আমলেই এই গান্ধার শিল্পের অত্যন্ত ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ বিকাশ ঘটে। উত্তর-ভারত, আফগানিস্তান আর মধ্য-এশিয়ার (বক্ষ্‌ দেশ) এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে এই কুশান সাম্রাজ্যের আমলে গান্ধার-শিল্প বিকশিত হয় ভারতীয় শৈলীর সঙ্গে হেলেনিক ও রোম্যান শৈলী-সমন্বয়ের গ্রীকো-ব্যাকৃট্রিয়ান রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে।

কুশান সম্রাটদের মধ্যে কনিষ্ক যেমন আমাদের কাছে সবচেয়ে পরিচিত, তেমনি পার্থিয়ান সম্রাটদের মধ্যে গোটার্জ্‌-এর নামই ইতিহাসের ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি জানে। ভারত-গান্ধার-বক্ষ্‌দেশ জুড়ে কুশান সাম্রাজ্য দৃঢ়

ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় তিন-শো বছর আগে এখনকার ইরানে এই পার্থিয়ানদের অভ্যুদয় ঘটে। উত্তর-পশ্চিম চীনের কান্‌সু প্রদেশের শকদের একটি শাখা-জাতিগোষ্ঠি কুশান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলে আমরা জানি। কিন্তু পার্থিয়ানদের জাতিগত উৎপত্তির সন্ধান ইতিহাসের পাতায় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পার্থিয়ানদের কথা ভারতের ইতিহাসের ছাত্রদের জানতে হয় এইজন্তে যে ইরানে এই পার্থিয়ানদের অভ্যুত্থানের ফলেই গ্রীক সামন্তনায়ক ডিওডোটাসের শাসনাধীন বক্ত্রদেশ তার পাশ্চাত্ত্য হেলেনিষ্টিক জগতের মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যার ফলে তার ওই ছিন্নমূল হেলেনিষ্টিক-রোমক সাংস্কৃতিকসত্তা আত্মরক্ষার জন্তে ভারতীয় সংস্কৃতির মাটিতে শিকড় নামায় রস আহরণের জন্তে এবং এই সমীকরণের মধ্যে দিয়েই গান্ধার-শিল্পের এমন ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিকাশ ঘটে।

খ্রীষ্টজন্মের আগে-পরে পাঁচ-ছ'শো বছরের মধ্যে এই পার্থিয়ান সাম্রাজ্য এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে তা পাশ্চাত্ত্য জগতে আধিপত্যের ক্ষেত্রে একাধিকবার রোম্যান সাম্রাজ্যকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। কিন্তু পার্থিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক তথ্যাদি ইতিহাসবিদদের হাতে নেই বললেই চলে। পার্থিয়া সম্বন্ধে রোম্যানরা যা লিখে গেছে শুধু তার ওপরেই আমাদের এতদিন পর্যন্ত নির্ভর করে থাকতে হয়েছে। কিন্তু রোম্যানদের সেই অসম্পূর্ণ বিবরণ থেকে পার্থিয়ান সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা; তাদের সমাজব্যবস্থা, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না।

এক্ষেত্রে তাই ইরান-সোভিয়েত সীমান্তের খুব কাছে সোভিয়েত তুর্ক্‌মেনিস্তানের আশ্‌কাবাদ শহরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অনুসন্ধান চালিয়ে পার্থিয়ানদের সম্পর্কে যেসব প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রত্নাবিষ্কারের ফলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে ওই জায়গাতেই খ্রীষ্টীয় ২য়-৩য় শতকে ছিল প্রাচীন পার্থিয়ার বিখ্যাত রাজধানী নিসা শহরটি এবং এখানে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যগুলি থেকে এই প্রথম প্রত্যক্ষভাবে পার্থিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া গেল।

দীর্ঘ বারো বছর ধরে খুব ব্যাপকভাবে এই খননের কাজ চালিয়ে সোভিয়েত প্রত্নবিজ্ঞানীরা অন্যান্য বহুরকমের প্রত্নদ্রব্যের সঙ্গে ২,১৫০টি লিপিখোদিত পোড়া-মাটির ফলক এবং অন্যান্য মৃৎপাত্রের লিপি-উৎকীর্ণ

ভগ্নাংশ উদ্ধার করেন। নিসার এই পার্থিয়ান ভাষা ও লিপির নমুনাগুলি আবিষ্কৃত হবার আগে পর্যন্ত এই ভাষা ও লিপির একটি মাত্র নমুনাই প্রত্ন-ইতিহাসবিদদের হাতে ছিল। এটা হলো—প্রাচীন কুর্দিস্তানের যে-অংশটি বর্তমানে ইরানের অন্তর্ভুক্ত, সেইখানে ১৯১৫ সালে প্রাপ্ত একটি পার্চমেন্ট। কিন্তু ওই একটি মাত্র পার্চমেন্ট থেকে পার্থিয়ান লিপির পাঠোদ্ধার করা ভাষাবিদদের পক্ষে তখন সম্ভব হয় নি। এখন এইসব লিপিখোদিত মৃৎফলক আর মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হবার পর পার্থিয়ান লিপির পাঠোদ্ধার করা অনেক সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এই লিপি নিয়েই দীর্ঘকাল গবেষণা চালিয়ে দুজন বিশিষ্ট সোভিয়েত প্রত্নভাষাবিজ্ঞানী ইগর দিয়াকোনফ ও ভ্লাদিমির লিফ্‌শিৎস্ পার্থিয়ান লিপির সম্পূর্ণ অক্ষরমালা এবং সেই ভাষায় পাঠ ও ব্যাকরণ রচনার কাজ সম্পূর্ণ করেছেন।

লেনিনগ্রাদের ইন্‌স্টিট্যুট ফর দি স্টাডি অফ এশিয়ান পিপ্‌ল্‌স্ থেকে দিয়াকোনফ ও লিফ্‌শিৎস্-সম্পাদিত এই পার্থিয়ান মৃৎলেখগুলির মূল পাঠ এবং তার রুশ ও ইংরেজি অনুবাদ টীকা-ব্যাখ্যা-ভূমিকা সহ এক বিরাট গ্রন্থ কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। গত মাসে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা গেছে। এই মৃৎলেখগুলির পাঠোদ্ধৃত হবার পর সরাসরি পার্থিয়ানদের রচনা থেকেই পার্থিয়ান সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো, ক্রীতদাস-নির্ভর সমাজব্যবস্থা, করপ্রথা, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, আইন-আদালত ইত্যাদি সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান সব তথ্য জানা যাচ্ছে। কয়েকটি মৃৎলেখে সম্রাট গোটার্জ-এর রাজ্যাভিষেক সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিবরণ আছে এবং এই বিবরণ থেকেই জানা যাচ্ছে যে পার্থিয়ানরা ছিল ধর্মের ক্ষেত্রে জরথুস্ত্রপন্থী।

মস্কোর ইন্‌স্টিট্যুট ফর দি স্টাডি অফ আফ্রিকান্ পিপ্‌ল্‌স্-এর অধ্যাপক খ্যাতনামা আফ্রিকাতত্ত্ববিদ ইভান পোতেখিন এই ইন্‌স্টিট্যুট-এর মুখপত্র 'আফ্রিকা-অনুশীলন'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে আফ্রিকীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কতকগুলি নতুন তথ্য পেশ করেছেন যা বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য।

পোতেখিন লিখেছেন : "আফ্রিকার ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা প্রায় সকলেই সাধারণভাবে এই মতের সমর্থক যে নীলনদ উপত্যকায়

ফ্যারাওদের অধীন ভূখণ্ডে যে-সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল, সেটাই আফ্রিকার প্রাচীনতম সভ্যতা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সাহারার মরু-অঞ্চলে কতকগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের লিপিচিত্র খোদিত শিলা আবিষ্কৃত হবার পর অনেকেই ভাবতে শুরু করেন যে ফ্যারাওদের ওই 'পিরামিড-সভ্যতা'র চেয়েও প্রাচীনতর সভ্যতার অস্তিত্ব—অন্তত সমান প্রাচীন একটি ভিন্নতর সভ্যতার অস্তিত্ব—সম্ভবত আফ্রিকায় ছিল। ওই 'সাহারা-শিলালিপি'র পূর্ণাঙ্গ পাঠ এখনও উদ্ধার করা যায় নি। অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সোভিয়েত প্রত্নতাত্ত্বিকবিজ্ঞানীরাও তাই নতুন ধরণের চিত্রলিপির পাঠোদ্ধারের কাজে নিযুক্ত আছেন। এই কাজ সম্পূর্ণ হলে আফ্রিকীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য জানা যাবে বলে তাঁরা মনে করেন।

এই 'সাহারা-শিলালিপি' হয়তো 'রোসেটা পাথর'-এর মতোই অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী জুড়ে এক দারুণ সাড়া জাগাবে।

রথীন্দ্র মজুমদার

শিল্পী : মহেন্দ্রনাথ মল্লিক

পরিচয়
বর্ষ ৩১ । সংখ্যা ১২
আষাঢ় । ১৩৬৯

কয়েকটি নায়ক : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

ঔপন্যাসিকের জীবনভাষ্য প্রতিফলিত হয় ঘটনা নির্বাচনে, পরিণামী সংবেদনায় এবং প্রসঙ্গত কাহিনী বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে উচ্চারিত মন্তব্যে। লেখকের মানসপ্রবণতা এইভাবেই উপন্যাসমধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নায়ক নায়িকার চরিত্রবিশ্লেষণে অনুস্যূত হয়ে পড়ে। ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষভাষণে না থাকলেও তাই উপন্যাসের শিল্পরূপ থেকে লেখকের জীবনসমালোচনা ও সারস্বতপ্রত্যয় উপলব্ধি করা যায়। চন্দ্রশেখরের প্রারম্ভিক উক্তি "বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে" অথবা উপসংহার, "তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেখানে যাও"—বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক আদর্শ ব্যক্ত করে। শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসের অংশও অনুরূপভাবে উৎকলিত হতে পারে, দেবদাসের উপসংহারটিও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

যদি জীবনজিজ্ঞাসায় নতুন কোনো দিগন্ত লেখকের চোখে পড়ে, যেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয়, পূর্বের পথ চলায় ফাঁকি না থাকলেও ফাঁক ছিল, জীবন ও জগতকে চেনার দৃষ্টি ছিল না স্বচ্ছ, তাহলে লেখকের জীবনধারণায় পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্পীমানসেও ঘটবে গোত্রান্তর। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব পর্যায়ের রোম্যান্টিক উপন্যাসের নরনারী, সামাজিক উপন্যাসের নায়ক নায়িকা এবং শেষ জীবনের হিন্দুঐতিহ্যমণ্ডিত চরিত্র লেখকমানস-বিবর্তনেরই পরিচয় দেয়।

বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পর্যায়ের চারটি উপন্যাস : 'হলুদ নদী সবুজ বন', 'ইতিকথার পরের কথা', 'মাঝির ছেলে',

'শান্তিলতা'। তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদে দীক্ষিত। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের মোহ ত্যাগ করে তিনি পূর্ণজীবনের সন্ধানে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের জীবনসংগ্রামে শরিক হয়েছেন। "কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা" অর্জন করা দুরূহ। তবু মানিকবাবু সেই দুরূহের সাধনায় আমৃত্যু নিরলস ব্যাপৃত ছিলেন।

উপন্যাসের ভাষা, দৃশ্যবৎ বর্ণনা, মৌলিক উপমারীতি—এইসব দিকে খুঁটিনাটি বিচ্ছিন্ন করে দেখানো কঠিন নয় যে মার্কসবাদের সংস্পর্শে এসে মানিকবাবুর শিল্পীসত্তা নির্জিত হয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সংহতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে অনেক ছোট-বড় চরিত্রের মেলায়, সমাজপ্রেক্ষিতের ওপর বেশি জোর দিতে গিয়ে মনের জগৎ হারিয়ে গেছে অতি-সরলীকরণে। পদ্মানদীর মাঝিদের যে উদ্দাম জীবনবেগ অথবা শশী-কুসুম মতি-কুমুদের জৈব অনুভূতি একজন শক্তিমান কথাশিল্পীর ব্যঞ্জনাসঞ্চারী কলমের পরিচয় দেয়, তার বিশিষ্টতা যেন আর নেই। সত্যিই কি নেই? এ-প্রশ্নের উত্তরে শেষ পর্যায়ের গল্প-প্রসঙ্গে আলোচনা স্মরণ করা যেতে পারে। "পুরনো জীবন ত্যাগের পরেও থাকবে পুরনো পরিচ্ছদের মোহ? সাঙ্কেতিক ভাষা, তির্যক মন্তব্য, উপসংহারের বিদ্যুদ্দীপ্তি তো তৃতীয় পর্বের বাহন হতে পারে না। নেতি-বাচনের উপমা উৎপ্রেক্ষা সংলাপ যতই বলিষ্ঠ হোক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোত্রান্তর স্বীকার করলে এই পর্বে তা বরং স্বাভাবিক প্রত্যাশিত নয়। নতুন সমাজচেতনা প্রতিষ্ঠার পূর্বে তার সার্থক ভাষা আসে না।" তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাসেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন রচনাশৈলীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি যে এতদিনের সংস্কারের মোহ থেকে প্রায় রাহুমুক্ত হয়েছিলেন, এ সত্যটিই তাঁর পূর্ণজীবনজিজ্ঞাসার সাক্ষী।

তাই তৃতীয় পর্বে নতুন ধরণের কিছু নায়ক চরিত্র পাই। 'ইতিকথার পরের কথা'র কৈলাস, 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এর ঈশ্বর-এর পথে নিঃসন্দেহে বাঙলা উপন্যাসে নতুন নায়কের পদধ্বনি শোনা গেছে। সুখেন্দুও [শান্তিলতা] মধ্যবিত্ত থেকে শ্রমিকস্তরে পরিবর্তিত নায়ক, নাগা, নকুলের সমস্তরে এসে দাঁড়িয়েছেন 'ভদ্রলোক মাঝি' যাদববাবু [মাঝির ছেলে]।

চরিত্রচিত্রণে নতুন মূল্যবোধ, নতুন বক্তব্য পরিস্ফুট হলেই শিল্পীর গোত্রান্তর সাফল্য অর্জন করে। প্রথমে একটু ছকবাঁধা পুঁথিগত ধারণা দিয়েই গড়তে চেয়েছেন নতুন চরিত্র। চরিত্রগুলি পরিকল্পনায় নেপথ্যে যে শিল্পী-

বিধাতার মন সক্রিয়, সেই "মনের কারখানা ঘরে" তখন যে সামাজিক রাজনৈতিক প্রশ্ন সমাধানের প্রত্যাশী, তাদের প্রকাশ ঘটেছে চরিত্রায়নে। কিন্তু তারা যেন চলাফেরা কথাবার্তার সময় পেছন ফিরে লেখকের উপস্থিতি এবং অভিপ্রায় বুঝে নিতে চেয়েছে। তাই দেখি 'নাগপাশ'-এর আখ্যানভাগ অত্যন্ত শিথিল। অধ্যায় থেকে অধ্যায়ান্তরে অগ্রগতি অনিবার্য বা সাবলীল নয়, বহু ঘটনা ও চরিত্র যেন লেখকের কয়েকটি ধারণাসূত্রে ক্ষীণভাবে সংলগ্ন। স্বাভাবিক গতি পদে পদে ব্যাহত। নরেন, ছবিরানী, নন্দন, সন্ধ্যা, মহেন্দ্র, গৌরী, দীননাথ, মাধব, মানসী কয়েকটি বিচ্ছিন্ন নরনারী, আপতিক ঐক্যসূত্রে মিলিত। মধ্যবিত্ত যুবক নরেন্দ্র তার মনের শ্রেণীচ্যুতি ঘটানোর জন্যেই যেন গ্রামের প্রতিবেশী দীননাথের ছেলে মণ্টুর সঙ্গে বস্তিতে বাস করল। মাধব অসাধারণ জ্ঞানী অধ্যাপক, তিনি মৌলিক চিন্তার অধিকারী। নরেন তাঁর অনুরাগী। সে মাধববাবুর কাছে মোটা মোটা বই চেয়ে নিয়ে পড়ে। কিন্তু পাঠকের কাছে মোটেই পরিস্ফুট হয় না কি বিষয়ে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে, তাঁর মৌলিক চিন্তার লক্ষ্য কি এবং কেন নরেন মাধব-বাবুর এত অনুরাগী।

কিন্তু তবু নরেন জিজ্ঞাসু মধ্যবিত্ত যুবক, যার অনেক মধ্যবিত্তসুলভ মোহ নেই এবং যার শ্রমে শ্রদ্ধা আছে। ছবিরানী সংগ্রামশীল কর্মিনী মেয়ে, একালীন নায়িকা। 'হলুদ নদী সবুজ বন' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়ে গেছেন নতুন মানুষদের মর্মের সংবাদ। সেখানে শ্রেণীসংঘাত আছে, আরো আছে: "শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ হয়ে হয়েও একত্র সংগঠিত সমগ্র সমাজের কথা।"

দুই

'হলুদ নদী সবুজ বন' সুন্দরবনের গল্প। সেখানে বহু মানুষ, পুরুষ ও নারী, হিন্দু ও মুসলমান জীবিকার সূত্রে জীবনযাপনের দায়ে মিলেছে। বিদেশী টিম্বার কোম্পানীর কর্তৃপক্ষস্থানীয় জনসন, রবার্টসন, সাদারল্যাণ্ড এবং কারখানার ইঙ্গভাবাপন্ন দেশী কর্ণধার প্রভাস; তাদের অন্তঃপুরে আছেন স্ত্রী, বোন, শ্যালিকা। এইভাবেই মিনার্ভা, আইভি, বনানী, মিসেস বাগচীকে নিয়ে একটি অভিজাত নারীচক্র গড়ে উঠেছে। তাঁরা ক্লাবে, পিকনিকেও উপস্থিত। অন্যদিকে আছে কৃষক, মাঝি, ঘরামি, মজুর, শিকারী প্রভৃতি

ধরিত্রীর সন্তান—নিরঞ্জন, ভূতনাথ, আজিজ, মণ্টু, ঘনরাম, শান সায়েব এবং ঈশ্বর। এই ঈশ্বরই মানিক-কথাশিল্পের জগতে অন্যতম নতুন মানুষ। সে কুবের, ধনঞ্জয়, পীতাম্বর, যাদব থেকে স্বতন্ত্র। গল্পের ঘটনাকাল তিরিশের পরবর্তী সময়; স্থান অত্যন্ত বিঘ্ন-সঙ্কুল: "হলুদ কাদায় ঘোলা নোনা জলের নদী। হাঙর কুমীর আর নানা জাতীয় মাছে ভরা। ডাঙায় বন বাঘ ভালুক হায়েনা শেয়াল থেকে নিরীহ হরিণ এবং নানাজাতীয় সরীসৃপ জোঁক বিছা আর পোকামাকড়ে ভরা। সংখ্যায় হিসেবে স্বজনতান্ত্রিক মশারাই অতুলনীয়—হিংসার হিসাবেও বটে। নদীর হাঙর কুমীর আর বনের বাঘ ভালুক সাপেরা বছরে যত মানুষের প্রাণ নেয়, মশারা দলে দলে হুল ফুটিয়ে তার চেয়ে কত গুণ বেশি মানুষকে যে আধেয়ে ঘায়েল করে।" ঈশ্বর বাপ্পী চাষার ছেলে, কিন্তু এখন জমি নেই, বাবার পুরনো-কেনা গাদা বন্দুক দিয়ে সে শিকার করে। ঈশ্বর অব্যর্থ শিকারী। উপন্যাসের যখন যবনিকা উন্মোচন হলো, তখন একটি বাঘ লক্ষণের গরু এবং আরো অনেকের প্রাণ নিয়েছে। সেই বাঘ শিকারে উৎসাহী হলেন বর্ণসঙ্কর প্রভাস এবং খাঁটি সাহেব রবার্টসন। সাথী রইল দেশী শিকারী ঈশ্বর।

প্রভাস ও রবার্টসনের গুলি ব্যর্থ হলে ঈশ্বরের বন্দুকেই বাঘ ধরাশায়ী হলো। বাঘ নয়, বাঘিনী। খবর রাষ্ট্র হতে বাঘ-মারার বাহাদুরি প্রভাস ও রবার্টসন দুজনেই নিতে চায়। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি জানতে চান, কার গুলিতে বাঘ মরেছে। মৃত বাঘের পাশে তার ছবিও প্রকাশিত হবে। বাহাদুরি থেকে বচসা, বচসা থেকে হাতাহাতি। প্রভাস ও রবার্টসন দুজনেই সুরাপানে তখন অপ্রকৃতিস্থ। অসাধু পথ নেয় ঈশ্বর। তার বিবেকে বাধে, অনুশোচনা হয়, তবু সে মিথ্যা সনদে সই করে। কারণ তার স্ত্রী গৌরী অন্তঃসত্ত্বা, অসুস্থ এবং তার বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণ। প্রভাস ও রবার্টসন দুই পক্ষের টাকা নিয়ে দুজনকেই লিখে দেয়, বাঘ তার গুলিতে মরেছে। ছলনার আশ্রয়ে টাকা উপার্জন করে গৌরীকে হাসপাতালে দিয়ে সে যাত্রা মৃত্যুকে ঠেকাল। 'তিন পুরুষের চাষা' ঈশ্বর শেষ রক্ষা করতে পারে নি, ভুলের মাশুল দিয়েছে কঠিনতম। চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছে, রবার্টসনের প্রতিশোধ। ঘর পুড়েছে প্রভাসের রোষাগ্নিতে। গোয়াল ঘরে আশ্রয় নিতে হলো সদ্যপ্রসূতি গৌরীকে। প্রহারও কম হয় নি ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে।

ছাটাই ব্যাপারে প্রতিবেশী মন্টা, আজিজ, নন্দ অবাক হয়েছিল খুবই। ঈশ্বর এজন্যে ধর্মঘট করতে চায় নি। স্পষ্টই বলেছে: "আমার ছাটাইয়ের মধ্যে অন্য ব্যাপার আছে।" গ্রাম্য মানুষ, সংসারকর্তব্যের দায়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, বিবেকদংশনে জর্জরিত হয়েছে এবং নির্মম কঠোর শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছে। তারপর প্রকৃতির দুর্যোগ। সেবার প্রবল বন্যায় হলুদ নদী উত্তাল হয়ে সবুজবন এলাকায় বহু ক্ষেত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। লেখকের কথায়: "অনাবৃষ্টিতে মরে গেল বেশির ভাগ ফসল। যারা পারলো তারা আবার চাষ করলো, যারা পারলো না তারা কেবল চাপড়ালো। তারপর অতিবৃষ্টির বন্যায় সে ফসলও গেল পচে। ঈশ্বর কোন কারখানায় কাজ পায় নি।" অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কিন্তু ঈশ্বরের বর্তমান বিপর্যয়ের পটভূমির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়েছে। তার কারখানায় কাজ নেই এবং সারা পল্লী দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় কবলিত। হয়ত সেজন্যেই আর কোনো শাস্তি পায় নি ঈশ্বর।

প্রতিবেশী ধনরাম, আজিজ, মন্টা, নকুল, গাড়ি বোঝাই করে বাঁশ খড় নিয়ে এসে ঈশ্বরের ঘর ছেয়ে দেয়। সকলের আলোচনায় ঠিক হয়, ঈশ্বর "বজ্জাতি করে নি, বোকামিই করেছে। হাড়ে মজ্জায়, চোদ্দ পুরুষের চাষা তো!" কিন্তু এ কী গুণ্ডা আইন, গরীবের ঘর পুড়িয়ে দেবে। আজ ঈশ্বরের গৃহদাহ, কাল আজিজ, মন্টারও হতে পারে। তাই ঈশ্বরকে ঐ অপরাধে বাদ দিলে চলবে না। সবারই প্রতিরোধ চাই। ঈশ্বর প্রথমে বিমূঢ় হয়, পরে সবার জন্য তামাকের জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

অনেকে সমব্যথী হলে অতিবড় দুঃখেও সান্ত্বনা, স্বস্তি থাকে। তাই শান সায়েব সেদিন ভাইপো রোস্তমের কাছে ঈশ্বরের অবস্থা শুনে প্রচুর সিন্নী পাঠিয়ে দিয়েছে, কেবল পীরের প্রসাদ বলে নয়। শান সায়েব হলুদ নদীর খেয়াঘাট জমা নিয়েছে। সেই খেয়াঘাট তদারকি এবং পয়সা আদায়ের কাজ পেল ঈশ্বর। কাঁচা পয়সা প্রচুর, অথচ সে কোনোদিন বেইমানি করে নি। এইভাবে সুখে চলে যেতে পারত। কিন্তু ব্যবসায়ীরা খেয়াঘাটে ষ্টীমার চালাবেন। সুতরাং শান সায়েবের চাকরি ছেড়ে ঈশ্বরকে নিতে হলো প্রহরীর কাজ। প্রভাসের বাড়ির সদররক্ষী হবে ঈশ্বর। কারণ এ অঞ্চলে ঈশ্বরের মতো অব্যর্থসন্ধানী নেই এবং ইতোমধ্যে প্রভাস ও রবার্টসনের অন্তঃসংঘাত চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। শিকারী কিংবা চাষীর পক্ষে এই অকর্মণ্যের কাজ

অপমানজনক। তাই ঈশ্বর আক্ষেপ করেছে। কিন্তু জীবনের দায় জীবিকার দাবিতে আক্ষেপই চূড়ান্ত নয়।

প্রভাসের জন্মদিনের উৎসবে পানোন্মত্ততা মাত্রাতিরিক্ত হলে বনানী সর্বনাশ আশঙ্কা করে ঈশ্বরকে ছুটি দিয়ে দেয়। বহুদিন পরে ঈশ্বর শান্তিতে নিজের ঘরে ঘুমোয়। কিন্তু দারিদ্র্যের সবই প্রতিকূল। বেড়ার দেওয়ালে সিঁদ কেটে তার শিশুপুত্রকে নিয়ে গেল শেয়ালে। বন্দুক সত্ত্বেও ঈশ্বর কত অসহায়।

আবার তাড়াটে শিকারী হিসেবে ডাক পড়ল ঈশ্বরের। নতুন একটা বড়-মিঞা উৎপাত শুরু করেছে। মানুষখেকো বাঘ। পুত্রশোক তুচ্ছ করে প্রভাসের সঙ্গী হলো ঈশ্বর। বাঘ মরল ঈশ্বরের গুলিতে। সেই বন্দুক হাতে নিয়ে প্রভাস নিজেই শিকারীর গৌরব পেলেন। ঈশ্বরের মনে "আরেকটা কার্তুজ, খরচ করে প্রভাসের মর্মস্থানে গুলি করতেও ইচ্ছা হয়।" বন্দুক, কার্তুজ ফেরৎ দিয়ে ঈশ্বর ভাবে: "কী এমন কম জোরের লাথিটা সে খেলো?" চাকর মেঘনাদ পেয়েছে পদাঘাত, শিকারী ঈশ্বর পেয়েছে অপমান।

শিকারের স্মরণোৎসবে প্রচুর লোক খাওয়ানো হলো। লেখক জানিয়েছেন, উৎসবের সবটুকু অমিশ্র আনন্দ নয়। এই ভোজনপর্বে গুণধর বাগচীর গোপন গুদামে সঞ্চিত সাতশ মণ গম আর সাতাশী মণ আটা পচে যাচ্ছিল, তার আংশিক সদ্গতি হলো।

মর্জির দাম, মানুষের দাম নেই। তাই প্রভাসের মর্জিতে মেঘনাদ এবং ঈশ্বরের কাজ গেল। কিন্তু সে যেন দাবার ঘোড়ে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কখনো রবার্টসনের, কখনো প্রভাসের চালনায় চলে। প্রভাসের দারোয়ান-পদের দ্বিগুণ বেতনে রবার্টসন তাকে কারখানার প্রহরী নিযুক্ত করে। ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘটের সম্ভাবনা। ছোটখাট সংঘর্ষও অসম্ভব নয়। আজিজ, মন্টা, নকুলের কথায় সব পরিষ্কার বোঝা গেল। তাই কাজ পেয়েও ঈশ্বর চিন্তিত: "এ চাকরী কতদিন?" অন্তরা রসিকতা করে: "তোমার মত শিকারীর বন্দুকে মরাও সৌভাগ্য।" কারণ সবাই জানে, ঈশ্বর অমানুষ নয়; ঈশ্বর জানে, সে আবার বেকার হবে।

তিন

ইতোমধ্যে বড়লোকের খেয়ালে একদিন বনভোজন হলো। সেখানে মিসেস বাগচী, আইভি, বনানী ইত্যাদি পরস্পর আভিজাত্য ও ফ্যাশনের প্রতিযোগিতায় মত্ত, পুরুষেরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির গুণগানে পঞ্চমুখ। ঈশ্বরের ব্যাখ্যায় একমাত্র বনানীর আগ্রহ তার সহজ স্বরূপের পরিচয়।

'হলুদ নদী সবুজ বন'-এর প্রধান দুর্বলতা লখার মার চরিত্র। সে কথকতা করে। পৌরাণিক কথকতা। পরে রোত্তমের রচনায় সে 'হলুদ নদী সবুজ বন' অঞ্চলের নতুন পরিবর্তন, নতুন চেতনার কথা ব্যাখ্যা করে। পৌরাণিক রূপকে একালের কাহিনী। এক যে ছিল অরণ্যকন্যা, রাজকন্যারই মতো, তার রূপ ঐশ্বর্য। তাতে মুগ্ধ হয়ে এলো কৃষক, মজুর। দুজনের ভালোবাসায় অরণ্যকন্যা দ্বিধাগ্রস্ত। রূপক ভেদ করে চাষী মজুরের সংগ্রাম, সুখ দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত হয়।

ঈশ্বরের স্ত্রী গৌরীর সমব্যথী এবং ঈশ্বরের অনুরাগিনীরূপে উপন্যাসে তার ভূমিকা প্রয়োজনীয়, কিন্তু উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে লখার মার সুবিস্তৃত কাহিনী যেন শিথিলসংলগ্ন মনে হয়। ঈশ্বর ও লখার মার মধ্যে পরস্পরের প্রতি দুর্বলতাটুকু অস্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু প্রেমালাপের জন্য দুরুল-আজিজ, রোত্তম-ফুলজান এবং লখার মা ও ঈশ্বরের দলবেঁধে একত্র বনবিহার অপরিহার্য ছিল না।

সুন্দরবনের বর্ষা যেমন সর্বনাশা, তেমনি ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া। বোনের বিয়েতে গৌরী গেল বাপের বাড়ি। তখন ঈশ্বর অসুস্থ। তারপর অসুখের বৃদ্ধি। ম্যালেরিয়া জ্বর। দুদিনেই ফিরে এলো গৌরী। এদিকে তখন বর্ষার জল নদী কাঁপিয়ে ডাঙায় উঠেছে। অনেকে ডাঙনে মরেছে। নদেরচাঁদের বৌ পথ চলতে চলতে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, তিনবার হাত কপালে ঠেকায়। তারপরেই হলুদ স্রোতে নিশ্চিহ্ন। অরে বেহুঁস ঈশ্বরকে গৌরী আর পিসী কোনোমতে চৌকির ওপর তুলে ধরে। কিন্তু কতক্ষণ পারা যায়, মৃত্যু আসন্ন। ঘরের চালা পড়ে গেছে। তবু মানুষ বাঁচে। তাই শান সায়েবের নৌকা নিয়ে আসে রোত্তম, আসে বনানীর পাঠানো নৌকা। উপসংহারটি সংকেতভাষী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরই উপযুক্ত : "কোথা নিয়ে যাবে?

যেখানে উঁচু জমি আছে, যেখানে ঘরবাড়ী খাড়া আছে।...পায়ের নিচের

মাটি তো সরে যায় নি। আর সবাই মিলে ধরাধরি করে মানুষটাকে (ঈশ্বরকে) নৌকায় নামিয়ে আনি। মানুষের আশ্রয় মিলবেই, বন্যা হোক, আর ভূমিকম্প হোক।"

চার

ষোড়শ পরিচ্ছেদে মানিকবাবু বিবৃতি দিয়েছেন :

"নানা স্তরের নানা জাতের এতগুলি মানুষকে নিয়ে বন নদী গ্রাম এবং গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংস্ফূর্ত শিল্প কেন্দ্র নিয়ে আমাদের এই সচলায়তনের কাহিনী ফাঁদা হয়েছিল। এতদূর এগিয়ে দেখা যাচ্ছে, ব্যাপার বড় গুরুতর।

মানুষকে বাদ দেবার প্রশ্নই অবশ্য ওঠে না। সব গল্পই মানুষের কাহিনী, পুরাণে দেবতারা যতই জাঁকিয়ে বসে থাকুন। মানুষ ছাড়া দেবতারও গতি নেই। কিন্তু একটা অঞ্চল? একটা বিশেষ এলাকা? হলুদ নদী সবুজ বন, গ্রাম আর একটা শিল্পকেন্দ্রকে বাদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি মানুষ একেবারে বাতিল নিশ্চিহ্ন অর্থহীন হয়ে যায়।"

বলাবাহুল্য, উপন্যাসের অঙ্গে এ-বিবৃতি বহিরারোপিত, ভূমিকা বা পরিশিষ্ট রূপে তা যোজিত হতে পারত। তবু এই বিবৃতি থেকেই উপন্যাসের উদ্দেশ্য প্রস্ফুট হয়েছে। লেখক হলুদ নদীর ধারে সবুজবনে যারা চাষ করে, মাছ ধরে এবং মজুর খেটে জীবননির্বাহ করে, তাদের কাহিনী বলতে বসেছেন। মানুষগুলিকে সুখ, দুঃখ, বেদনা, স্বপ্নে জীবন্তরূপে ফোটাতে হলে পরিবেশকেও প্রাধান্য দিতে হয়। পদ্মানদীর মাঝিদের চরিত্র প্রস্ফুটনে পদ্মার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। লেখক সেদিকে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এও নদী ও বনের সঙ্গে মানুষগুলির জীবন শৈশব থেকে জড়িয়ে গেছে। এখানেই এদের পরিশ্রম, আনন্দ, দুঃখ, অপঘাত মৃত্যু—এই নিয়ে জীবনসংগ্রাম। অভিপ্রায় ছিল চরিত্রপ্রাধান্য রক্ষার, কিন্তু রচনার মধ্যপথে দেখা গেল, চরিত্রগুলির স্বাভাবিক গতিবিধির জন্যই আঞ্চলিক পরিবেশের প্রাধান্য চাই। তাই ষোড়শ অধ্যায়ের পরে কল্পিত হয়েছে সুরুলের শৌখীন বনবিহার। লেখক সুঁদরি, গশর, অর্জুন, গরাণ প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। জলোর বাধা আরণ্যক ঈশ্বরের কাছে বাধাই নয়।

আর-একবার উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের কৈফিয়ৎ আছে: "একবার লিখছি ঈশ্বর গৌরী আজিজ শান গায়েব ফুলজান মন্টা সাধুদের কাহিনী,

আবার আসছি প্রভাস বনানী ইভা রবার্টসনদের কথায়।...একেই কি বলে প্যারালাল মানে সমান্তরাল কাহিনী। বুদ্ধি খাটিয়ে চালাকি করে উচ্চমধ্য এবং নিম্ন অর্থাৎ চাষীমজুরদের হাজির করে ছককাটা গল্প রচনা করা?

এতকাল সাহিত্যচর্চা করে তাহলে আমার কাণ্ডজ্ঞান নিশ্চয়ই লোপ পেয়েছে বলতে হবে। শ্রেণীবিভক্ত জীবন কোন দেশে কস্মিনকালে প্যারালাল ছিল না, এখনও নেই, সোনার পাথর বাটির মতই সেটা অসম্ভব ব্যাপার।" (চতুর্দশ অধ্যায়)। প্যারালাল কাহিনী আছে কিনা এবং উচ্চ-মধ্য ও নিম্ন—তিনশ্রেণীর নরনারীর জীবনালেখ্য অঙ্কনে 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এর সাহিত্য মূল্য খর্ব হয়েছে কি না—বিচারের দায় পাঠকের, সমালোচকের। লেখক যে কাহিনীবিন্যাসের সময় কত সচেতন থাকেন, এই কৈফিয়তে সেটুকু বোঝা যায়। 'সমুদ্রের স্বাদ', 'তেইশ বছর আগে ও পরে', 'শহরবাসের ইতিকথা' প্রভৃতি গ্রন্থে লেখকের গ্রন্থ-পরিচায়ক ভূমিকা আছে। তিনি উপন্যাসে ভূমিকার বিরোধী ছিলেন, অথচ লিখেছেন। উপন্যাসের বক্তব্য চরিত্রমাধ্যমে উপস্থিত করেও লেখক স্বস্তি পান নি; গ্রন্থপাঠের প্রস্তুতিরূপে ভূমিকায় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এ ভূমিকা নেই, কিন্তু উপন্যাসের দুটি অধ্যায়ে লেখকের বক্তব্য প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। সাধুসন্তদের জীবনী বা আত্মস্মৃতি রচনায় ধাত তাঁর ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাঙলা কথাশিল্পে নিয়ত নিরীক্ষার শিল্পী। এই প্রাসঙ্গিক বিবৃতিগুলিতেই তাঁর শিল্পীমানসের ক্রমপরিবর্তমানতার সামান্য ইঙ্গিত রয়ে গেল। 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এ উচ্চকোটির প্রভাস, রবার্টসন; মধ্যবিত্ত সুখেন্দু এবং শ্রমিক ঈশ্বর, আজিজ, মন্টার জীবনে পার্থক্য প্রচুর, কিন্তু একটাই জীবন, কেউ কারও থেকে অসম্পৃক্ত নয়। এই উপলব্ধি নিঃসন্দেহে গোত্রান্তরিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগ্রসর চেতনার পরিচায়ক। "ঈশ্বর আজিজরা থাকে একস্তরে, প্রভাস রবার্টসনেরা আরেক স্তরে। তাই বলে জীবন কি তাদের সম্পর্কহীন? পরস্পরকে বাদ দিয়ে তাদের কারো জীবনযাত্রা সম্ভব? সম্পর্ক কি শুধু প্রেমে হয়! সংঘাত সম্পর্ক নয়?" যেন লেখকের স্বগতচিন্তা উপন্যাসে বিধৃত হয়ে পড়েছে। প্রশ্নাকার বাক্যগুলির মধ্যেই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে। প্রেম-প্রীতি সত্য, সংঘাত সত্য, তবু জীবনের ধারা অখণ্ড।

পাঁচ

নতুন নায়ক ঈশ্বর ভূমিহীন কৃষাণ, বর্তমানে মজুর। মজুর নায়ক মধ্যবিত্ত নায়কের মতো একক, স্বতন্ত্র নয়। তাই নগেন্দ্রনাথ বা মহিমের মতো স্ব-প্রধান মনোলোক বিশ্লেষণের নীতি এখানে মানিকবাবু গ্রহণ করেন নি। আজিম, মন্টু ইত্যাদিকে নিয়েই শ্রমিকদের সংহত সমাজ। একের দুঃখে অপরের সহযোগিতা, পরস্পরকে ভুল না বোঝা অগ্রসর শ্রমিকচেতনার পরিচায়ক। এই উপন্যাসে মানিকবাবু তাকেই রূপায়িত করেছেন। সেজন্যেই প্রশ্ন জাগে, এতগুলি পরিণতবুদ্ধি শ্রমিক থাকা সত্ত্বেও কারখানার অসন্তোষ শেষপর্যন্ত কেন ধূমায়িত বিক্ষোভের স্তরে রয়ে গেল? ঈশ্বর কারখানা গেটের প্রহরী মাত্র থাকায় উপন্যাসে নতুন নায়কের আবির্ভাব স্বীকৃতি মাত্র পেল, কিন্তু পরিণতি খণ্ডিত হলো। অথচ ধর্মঘটের পটভূমিতে উচ্চকোটির সঙ্গে নিম্নকোটির 'সংঘাত' ভালো ফুটত, ঈশ্বরের বাহুবল কেবল পশু-শিকারে এবং মনোবল নির্ভীকতায় মাত্র প্রতিফলিত না হয়ে আরো বাস্তবভাবে প্রকাশিত হতে পারত। ঈশ্বরের সারল্য, বস্তু বলিষ্ঠতা, সহজাত নীতি, বিবেকবোধ যতটা আছে; ততটা নেই সংগ্রামের পরিচয়। তবু ঈশ্বর কুবের, ধনঞ্জয় নয়; মনোভাবে, চিন্তায় সে অনেক আধুনিক। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কর্মী ঈশ্বর ভাবুক হয়ে পড়েছে: "মা ছাড়া জীব বা জীবন সম্ভব নয়। কিন্তু আরেকটা দিকও তো আছে। ভ্রূণহত্যা হচ্ছে না সংসারে? সন্তানকে মরণের মুখে তুলে দিয়েও স্ফূর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে না অনেক মা? অন্ধ মায়ার বিকারে অনেক সন্তানকে মেরে ফেলছে না? (আজকাল একটু ভাবতে শুরু করেছে বলেই কি এসব ভাবনা তার মগজে সহ্য হয়!)" মাতৃত্ব সম্পর্কে দরিদ্র ও অভিজাত নারীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেখকের শ্রেণীচেতনা যেন নায়কচরিত্রে আরোপিত হয়েছে, আখ্যানধারার অনিবার্য ঘটনাপরম্পরায় এই চেতনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে নি।

ছয়

'ইতিকথার পরের কথা' 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত, 'শহরবাসের ইতিকথা'র পরবর্তী কাহিনী বললে অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু আসলে স্বতন্ত্র কাহিনী। ক্ষীয়মান বায়তলার জমিদার পরিবারের একমাত্র সন্তান শুভময়। সে উচ্চশিক্ষিত, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাবে তারও স্বাধীন

শিল্প নির্মাণের স্বপ্নে তন্ময়। গ্রামের 'নবশিল্প মন্দির' তারই সাক্ষ্য। কিন্তু বৃহত্তর দেশের অর্থনৈতিক জীবন যখন কোটিপতিদের কবলে রাহুগ্রস্ত, তখন ছোট একটি লণ্ঠনের কারখানা কতটুকু আলোকিত করতে পারে। বিষন্ন হতাশ শুভময় অন্যতর বৃহৎ কল্পনার পূরণ করতেই সমুদ্রযাত্রা করল। বিদেশের দুরূহ বিজ্ঞানের পরীক্ষায় প্রভূত সাফল্য অর্জন করে সে দেশে ফিরে এলো। বোম্বাইয়ের বিরাট কাপড়ের কলগুলি দেখে শুভর মনে হয়েছিল : "এদেশে কাপড়ের মিল গড়ার জন্যই তো চরকার আন্দোলন।" শুভময় গতানুগতিক ধারার জমিদারনন্দন নয়। পারিবারিক আভিজাত্যের প্রচ্ছদপট ফেলে দিয়েও সে স্বগ্রাম, স্বদেশ, প্রতিবেশীর কথা চিন্তা করতে পারে। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথের সঙ্গে 'ইতিকথার পরের কথা'র শুভময়ের পার্থক্য আছে। শিবনাথের বাবা জমিদারগোষ্ঠীর কলুষমুক্ত ছিলেন—সর্বোপরি লক্ষনীয়, অজ্ঞান বয়সেই শিবনাথ পিতৃহীন হয়েছিল। তাই তার চরিত্রে স্নেহময়ী শৈলজা ও জ্যোতির্ময়ীর প্রভাবই বর্তমান, পিতৃপ্রভাব নেই। শুভময়ের পিতা জগদীশের ঐশ্বর্যরবি অস্তোমুখ ; তবু প্রজাপীড়ন, মিথ্যা মামলা, পুলিশের সহযোগ সবকিছুতেই তাঁর প্রতাপ অনুভব করা যায়। শিশু শুভময়ের প্রতি পিতৃস্নেহের প্রকাশই কি কম দুঃখজনক হয়েছিল। ভোলা বাগ্দীর আঙুল কাটা যায়, নায়েব কালীচরণের প্রহারে জর্জরিত কৈলাস অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

এহেন শুভময় যৌবনে পিতৃ-পিতামহের অনুগামী হয় নি। শিবনাথ নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য করতে না পেরে ময়ূরাক্ষীতীরে কৃষিক্ষেত্র বানিয়ে আত্মনির্বাসন বরণ করেছে ; শুভময় বহুভ্রান্তি, প্রতিকূলতা, বিরোধকে জয় করে নতুন শিল্পোন্নয়নে অংশীদার হতে চেয়েছে। কিন্তু 'ইতিকথার পরের কথা'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র শুভময় নয়, কৈলাস দত্ত, শ্যামাসঙ্গীত গায়ক ত্রিভুবন দত্তের পুত্র। কৈলাস কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করে, ছুটির দিনে বারতলা যায়। শ্রমিক কৃষক পৃথক নয়, গ্রামের কৃষাণ বোঝে না শহরের শ্রমিকের সংগ্রাম, শ্রমিকও জানে না কৃষকের সমস্যা। কৈলাস প্রাক্তন কৃষাণ, বর্তমানে শ্রমিক ; এবং কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে যোগসূত্র।

বুদ্ধকেরৎ খোঁড়া গজেনের মেয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে কৈলাসের যোগাযোগ দীর্ঘকালের, কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের কী গভীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তা সহজে বোঝা যায় না। নানা সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেই সম্পর্ক উপলব্ধি

করতে হয়। ইতোমধ্যে অন্যগ্রামে লক্ষ্মীর বিবাহ হওয়ায় তাদের সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটে। সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে লক্ষ্মীছাড়া মানুষটাকে গৃহমুখী করার বাসনা নিয়েই দূর সম্পর্কীয় বোনের সঙ্গে লক্ষ্মী কৈলাসের বিবাহ দেয়। তারপর লক্ষ্মী ফিরে আসে বাপের বাড়ি, কৈলাসের স্ত্রী দশদিন পর সাপের কামড়ে মারা যায়।

'হলুদ নদী সবুজ বন'-এর ঈশ্বর ও লখার মার প্রেম এবং কৈলাস-লক্ষ্মীর প্রেম তুলনীয়, অথচ সর্বথাতুল্য নয়। দুটিই অবৈধ প্রণয়ের নিদর্শন, দুটি ক্ষেত্রেই প্রণয়ের ভিত্তি গভীর সহমর্মিতা। লক্ষ্মী ও লখার মা "দুজনেই ঘা-খাওয়া পোড়-খাওয়া খাঁটী মানুষ সংসারের।" বাইরের জৌলুসে এই প্রণয় আলোকিত নয়। ঈশ্বরকে ভালোবেসেই লখার মা গৌরীর শোকমোচনে ব্রতী হয়, গৌরীকে সন্দেহ-বিষবাষ্প থেকে দূরে রাখবে বলেই দীর্ঘদিন সে ঈশ্বরের কুটিরের পথ মাড়ায় নি। আবার বন্যা-বৃষ্টির দুর্দিনে আসন্ন মরণের হাত থেকে সেই ঈশ্বরকে বাঁচাতে অগ্রণী হয়েছিল। 'ইতিকথার পরের কথা'র পরিস্থিতি ভিন্নতর। কৈলাস দায়মুক্ত, লক্ষ্মীরও স্বামীগৃহের স্মৃতি মধুর নয়। কৈলাস বাদাবনের শ্রমিকের চেয়ে অনেক পরিণত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন, লক্ষ্মীও কথকতাকরা মেয়ে নয়। নির্যাতিত প্রবীণ দেশকর্মী জীবনবাবু বহুদিন পর গ্রামে ফিরে অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সকলে লোচনের বাড়িতে জড়ো হয়ে যখন তার সেবা শুশ্রূষা করল, তখন লক্ষ্মীও ছিল। গভীর রাতে সে বাড়ি ফেরে। সুতরাং কৃষকের ঘরের মেয়ে হলেও লক্ষ্মী যথেষ্ট সপ্রতিভ মেয়ে। যুদ্ধের পর বলেই এমন সপ্রতিভতা সম্ভব। পুলিশের ব্যাটনের দাগ তার কপালে, আজো মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। "যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ সৈন্য পুলিশ দাঙ্গা হাঙ্গামা ধানের লড়াই একেবারে ওলটপালট করে দিয়ে গেছে চেতনা।...প্রচণ্ড ঘটনার আধুনিক ট্র্যাক্টর চষে দিয়ে গেছে অনুভূতির ক্ষেত, এখনো দিয়ে চলেছে।"

কৈলাস-লক্ষ্মীর ব্যক্তিগত জীবনে ব্যর্থতার অভিশাপ, অথচ তারা নৈরাশ্যপীড়িত নয়, জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত নয়। শুভময়ের ক্ষুদ্র শিল্পগঠনের উদ্যোগ যখন রূপায়িত হলো বাসন তৈরির কারখানায়, তখন লক্ষ্মী হলো তার সহায়িকা। চাকুরিপ্রার্থী হয়ে সে আসে নি, শুভময়ই উপযাচক হয়ে তার পরামর্শ চেয়েছে। কৃষকবধূদের মধ্যে আধুনিক সংগ্রামের বার্তা ছড়িয়ে দেয় লক্ষ্মী। কৈলাসও কৃষকসমাজে যথেষ্ট গণ্যমান্য। তার অভিমত, পরামর্শ

নন্দ ডাক্তারের কথার চেয়েও চাষীদের কাছে বেশি মূল্যবান। শুভময় সম্পর্কে সে প্রথমে সন্দিগ্ধ ছিল। কারণ শুভেচ্ছা বাইরের জিনিস, আর দৈনন্দিন জীবনে ছোট বড় নানা ব্যাপারে পিতৃনিন্দা শোনা বড় কঠিন। পিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো আরো কঠিন। কিন্তু শুভময় পরীক্ষায় অনেকটা উত্তীর্ণ হয়েছে, যার ফল গৃহত্যাগ। জগদীশ তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। শুভময়ও উদ্‌ভ্রান্তের মতো কিছুকাল কলকাতা ঘুরে আবার গ্রামে আশ্রয় নিল। গৃহে নয়, কৃষক-কারিগরদের মধ্যে। যে কোনো বাড়িতেই তখন তার ঠিকানা। শুভময়ের প্রণয়িনী মায়া প্রাণের তাগিদে সর্ব অভিমান ত্যাগ করে তাকে নিতে এসেছে কৃষকপল্লী থেকে। লেখক ইঙ্গিত দিয়েছেন, কৃষক আন্দোলনের সহধর্মী হয়েও শুভময়-মায়ার প্রেমে ভাঙন ধরে নি। প্রকৃত প্রেম মহত্তর। সেখানে লক্ষ্মী, মায়া, বনানী, আইভি ভিন্ন নয়।

শুভময় সামন্ত মনোভাব ধীরে ধীরে ত্যাগ করেছে, কৈলাস নিম্নবিত্ত থেকে কৃষক-মজুরে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক দায়ে, রাজনৈতিক চেতনার আলোকে ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী আঘাতে মানুষের মনের শ্রেণীচ্যুতি ঘটছে। 'ইতিকথার পরের কথা'র শুভময়; নন্দ কৈলাস তার সাক্ষী। এখানেও মানিকবাবু দেখিয়েছেন, রিক্ত দরিদ্র মানুষগুলি জেনেছে সংহতির শক্তি কী অমোঘ। ঘনরাম, গজেন, সনাতন, লোচন, কৈলাস, নন্দ সকলে মিলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।

'ইতিকথার পরের কথা' দ্বিধারা কাহিনী। শুভময়, মায়া, ভূদেব ইত্যাদিকে নিয়ে একটি ধারা; বিলাতী খেতাবধারী ডাক্তার ভূদেবের একমাত্র কন্যা মায়ার সঙ্গে শুভময়ের প্রণয় কাহিনী বহু উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে একটি পরিণতিলাভ করেছে। অন্যধারা হলো বারভলার গ্রামীণ মানুষদের জীবন-গাথা; সেই ধারায় নন্দ ডাক্তারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র কৈলাস ও লক্ষ্মী। 'হলুদ নদী সবুজবন'-এর মতোই এখানেও আছে প্যারালালিজ্‌ম, এখানেও যেন লেখকের বক্তব্য : "পরস্পরকে বাদ দিয়ে তাদের কারো জীবনযাত্রা সম্ভব ? সম্পর্ক কি শুধু প্রেমে হয় ! সংঘাত সম্পর্ক নয় ?" এ উপন্যাসেও পাই "শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ হয়ে হয়েও একত্র সংগঠিত সমাজের কথা।" তাই কৈলাস, লক্ষ্মী, লোচন, ঘনরাম প্রভৃতি প্রথমে শুভকে সন্দেহ করলেও তার সদিচ্ছাকে, তার প্রগতিশীল মনোভাবকে চিনে নিতে দেরি হয় নি। জগদীশ, জীবনবাবু টাইপ মাত্র ; শুভময়ের মতো যুবক একালে

দুর্লভ নয় ; নন্দ, কৈলাস প্রভৃতির জোট তো আধুনিক কৃষক আন্দোলনেরই আলেখ্য। মানিকবাবু আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতাকেই উপন্যাসে গ্রথিত করেছেন। প্রতিবেদকের কাজ শিল্পী নিয়েছেন। তাই প্রতিবেদন অল্প নেই, কিন্তু শিল্পও ক্ষুন্ন হয় নি। বিশেষত কৈলাস-লক্ষ্মীর মানসিক অবস্থা এবং উভয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে মানিকবাবুর নৈপুণ্য যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

কৈলাস-লক্ষ্মীর মিলনে যখন কোনো বাধা নেই, তখনও লক্ষ্মী ভাবে: "কদিন তারা মেতে থাকতে পারবে ওভাবে পরস্পরকে নিয়ে? কতদিন স্থায়ী হবে তাদের দুর্দান্ত উন্মাদনা? কদিন তাদের শুধু পরস্পরকে নিয়ে মেতে থাকার সুখ?" দুটি পোড়খাওয়া নর-নারীর জীবনে প্রেম এলো, কিন্তু তার প্রকাশ ব্যাহত। লক্ষ্মী ও কৈলাসের আন্তরিক জৈবআবেগ সত্বেও পরস্পরের প্রতি বিবেচনা, সংযম এবং সমব্যথী সকলের জন্ত সংগ্রামস্পৃহা তাদের প্রেমকে মহনীয় করেছে। "কৈলাস তার মনুষ্যত্বে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে।" সেজন্তেই লক্ষ্মী কৈলাসের সর্বতোভাবে কল্যাণ চায়।[১] সে তুলনায় মায়ার প্রেমের ভাষা একটু অশ্লীলই মনে হয়: "খিদে পেয়েছে খাবার রেডি, তুমি উপোস করছ কেন সেটা বরং বুঝিয়ে বল। আমিও খিদে নিয়ে উপোস করে চলেছি মনে রেখো কিন্তু।" রূপকের একটা আবরণ আছে বটে, কিন্তু সেখানেও খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ।

সাত

অতি সাবধানী লেখকের কলম থেকে উপরি-লিখিত বই দুটিতে একই ধরনের ত্রুটি নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতিভার পক্ষে গৌরবজনক নয়। মানিকবাবু অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লিখতেন। বলা বাহুল্য, বিশ্লেষপ্রাণ কথাশিল্পে বাগর্থ অপৃথগ্-যত্ন নির্বর্ত্য হয়ে থাকে না; তার জন্ত সুস্থির অনুশীলন চাই। তবেই মনে হবে যেন বাক্য ও ঈপ্সিত অর্থ এক প্রযত্নে সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু মানিকবাবু সে অবকাশ পান নি। তাই মানিকবাবু প্রচণ্ড শক্তিধর প্রতিভা, কিন্তু পূর্ণতার বৃত্তে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। তুলনীয় কাজী নজরুল ইসলাম। তিনিও অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্ত, উচ্চকণ্ঠ কবি। তাঁর কবিতা হাতে

১ লেখকের ব্যাখ্যা: 'কৈলাস আর লক্ষ্মীর মাঝখানে দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের মনের যুগ যুগান্তরের সংস্কার আর কুসংস্কারের স্তূপ, জনতাকে না ডিঙিয়ে তাদের মিলনের উপায় নেই।' এই ব্যাখ্যা গ্রন্থমধ্যে অপরিহার্য ছিল না।

নিয়ে ওয়ার্ডস্বার্থের সংজ্ঞাকে সর্বথা প্রযোজ্য মনে হয় না। আবেগের নির্জন স্মৃতিচর্বণাই কবিতার উৎস ("Poetry takes its origin from emotion recollected in tranquility") হলে নজরুল ইসলাম কবি নন। আগ্নেয়গিরিকে বলা যায় না, তুমি স্থির হও, স্নিগ্ধ হও, কান্ত হও। নজরুলের কবিতা যেমন ক্রোধ, ক্ষোভ, ঘৃণার অগ্নিস্রাবী বাণীরূপ; মানিকবাবুর কথাশিল্পও সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে বক্তব্যের তীব্রতা নিয়ে উপস্থিত। সেই বক্তব্য সর্বদা শান্ত, কান্ত হলে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে ব্যবধান হ্রস্ব হয়ে আসে। তবু কয়েকটি ত্রুটি উপন্যাসের প্রকরণকেই দুর্বল করেছে, সুতরাং বক্তব্যের গভীরসঞ্চারী প্রভাব সেখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। 'হলুদ নদী সবুজ বন'-এ ঈশ্বরের বারংবার অরণ্যচারণা (উপলক্ষ যতই ভিন্ন হোক) আসলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, তাই শেষপর্যন্ত চরিত্র তার প্রাণবেগ হারিয়ে ফেলেছে। 'ইতিকথার পরের কথা'র কোনো কোনো জায়গা অবান্তর ব্যাখ্যায় ভারাক্রান্ত। ভূতময়কে লোকজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেবার জন্য রুদ্ধদ্বার ডাক্তারখানায় তাকে রেখে বাইরের দাওয়ায় নন্দর কৃষক-বৈঠক চালানোর ব্যবস্থা কিঞ্চিৎ হাস্যকর। গ্রামীণ মানুষের গৃহস্থালীর সমস্যা জানার আগ্রহে লক্ষ্মীর ভূমিকাকে লেখক অহেতুক একটু বেশি মূল্য দিয়েছেন।

'শান্তিলতা' একটি চরিত্রের আশ্রয়ে লেখকের মানস-রূপান্তরের সাক্ষ্য। এখানে লেখকের কল্পনার ভিত্তি একটি উদ্বাস্তু মেয়ে, নাম শান্তিলতা। বৃদ্ধ পিতা চন্দ্রনাথকে নিয়ে সে কলকাতায় এসে বাসা বাঁধল শহরতলীর এক বস্তীতে। চন্দ্রনাথ তখন কাজকর্মে অপারগ, তারপরে আছে বিবাহযোগ্যা মেয়েকে পাত্রস্থ করার দুশ্চিন্তা। তাই সাময়িক উন্মত্ততা তাকে আক্রমণ করল। অবস্থামতো চিকিৎসা হলো, কিন্তু চন্দ্রনাথ হার্টফেল করে মারা গেলেন। এই উপন্যাসটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস নয়, টুকরো টুকরো বাক্যে লেখা উপন্যাসের খসড়া। এর বর্ণনা-বিবৃতি এত কাটা কাটা যে সাবলীলতা ব্যাহত হয়। উপন্যাস-কাহিনীর পরিপূর্ণ কাঠামো অনুধাবন করতে গেলে পাঠককে প্রতিটি বাক্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। "শান্তিলতার রঙ খুব কাল। গড়ন-পিটন আশ্চর্যরকম। খাঁটি ভীল সাঁওতাল মেয়েদের পর্যন্ত যেন হার মানায়।"

চন্দ্রনাথ প্রায়ই চিন্তিত থাকেন। আকাশ-পাতাল চিন্তা। দেশ-বিভাগের পর সুখ-শান্তি-ভালোবাসা, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে

খারণাগুলি সব যেন তাঁর গোলমাল হয়ে যায়। একদিনের ঘটনা। দু-তিন রাত্রির পর চন্দ্রনাথ ফিরে এলেন। উস্কোখুস্কো চুলে, কাদামাখা পায়ে। মেয়েকে বলেন, "মাঝে মাঝে মনটা কেমন বিশ্রী হয়ে যায় জানিস, সংসারে কাউকে ভালো লাগে না। চেনা মানুষগুলোকে তো আরও না। তোকেও না।" চন্দ্রনাথের সাময়িক উন্মত্ততা মানসিক ভারসাম্যহীনতার ফল। এখানে কোনো উদ্ভট মনস্তাত্ত্বিকতা মানিকবাবুর লক্ষ্য নয়, দৃঢ় বাস্তব ভিত্তির পরেই তার প্রতিষ্ঠা। চন্দ্রনাথের আত্মভাষণে তার পরিচয় আছে: "হিসেবে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে শান্তি, কোথাও থই পাচ্ছি না। এতদিন ধরে যা শিখেছি যা বুঝেছি এই সহরের সঙ্গে দেখি তার কিছুই খাপ খায় না। একদিন সব কথা তোকে বলব। তোকে ছাড়া আর কাকেই বা বলব?" কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার সারবস্তু তিনি আর শান্তিলতাকে বলে যাবার অবকাশ পান নি।

উপন্যাসে তথা শান্তিলতার জীবনে মোড় ফিরল সুখেন্দুর আবির্ভাবে। সুখেন্দুও উদ্বাস্তু, ভাগ্য অন্বেষণে শহরতলীতে একটা সাইকেল মেরামতের দোকান করেছে। পথিমধ্যে চন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাকে তিনি নিয়ে এলেন তাঁদের বস্তীতে। "খাঁকি সার্টের সব কটা বোতাম খোলা, আস্তিন দুটো গুটিয়ে কনুয়ের ওপরে তোলা, পায়জামার কিনার দুটো হাঁটুর ওপর উঠে এসেছে, পিছনে উলটনো চুলের ছোট ছোট দুটি গুছি ভুরুর ওপর এসে পড়েছে।" সে চন্দ্রনাথকে সৌভাগ্যের লোভ দেখিয়ে নিজের অজান্তেই তাঁকে কুপথে নিয়ে গেল। চন্দ্রনাথ মাঝরাতে মাতাল হয়ে ফিরলেন।

এহেন চন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শান্তিলতা সংসারে একা রইল না। বিমল তাকে একটি স্কুলে কাজ করে দিল। বিমলকে নিয়ে আর এক উপকাহিনী। ইঙ্গিতে আভাসে বোঝা যায়, বিমল মার্কসবাদে বিশ্বাসী, সে রাত জেগে এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অংশ তাকে উদ্দীপিত করে। এই বিমলের সাহায্যেই শান্তি বাবার চিকিৎসা চালিয়েছে, জেনেছে মানুষ কেন দরিদ্র হয়। বিমলের সাহায্যে ইস্কুলে শিক্ষকতা পেয়ে শান্তি বস্তী ছেড়ে চলে এসেছে জীবন মাইতির বাড়ি। সেখানে প্রধান শিক্ষিকা মনোলতার সঙ্গিনী হলো শান্তিলতা। যেমন শান্তিলতার জীবনের ছক বদলাল তেমন সুখেন্দুও বদলেছে। যে সুখেন্দু ছিল শান্তির চোখের বিষ, যার দেওয়া দুধের বোতল রাগ করে মাটিতে

ফেলে দিয়েছে, তার প্রতি আর শান্তি নির্মম নয়। মনোলতা ও শান্তির কথোপকথনে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

"—সুখেন্দুকে ভোগাচ্ছিস কেন? তাকে স্পষ্ট করে কিছু বলছিস না কেন?

—আমার কথাতো আমি বলে দিয়েছি। কারবার তুলে দিতে হবে।… ও লোক-ঠকানো কারবার, ওতে বুদ্ধি পচে যায়।

—তুলে দিয়ে খাবে কি?

—কারিগর মানুষ, কারিগর ছিল, আবার কারিগর হতে হবে।…মদ ছাড়বে বলে সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

—তোর কথা যদি ও মেনে নেয়?

—তার কথাও আমি মেনে নেব।"

সুখেন্দুর জানা হিসেবে এ-মেয়েকে মাপা যায় না। মেয়ে বলতে সুখেন্দু এতকাল সোজা হিসেবে তার মাকেই বুঝে এসেছে। নীরব, নম্র, বাধ্য। তাই ক্ষোভে, অসন্তোষে যে-মেয়ে অভাবগ্রস্ত হয়েও দুধের বোতল টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, তার প্রতি একটা কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। "তার মনে হয় শান্তিলতার রুখে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা যেন অনমুকরণীয়।"

সুখেন্দু কেমন করে নতুন হিসেব মিলিয়ে শান্তিলতার মনে স্থান করে নিল সেই কাহিনীটুকু ঔপন্যাসিক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে প্রয়োজনীয়। কিন্তু উপন্যাসের বর্তমান আকারে সেই অংশটি একেবারে উহ্য। হয়তো মনোবিকাশের স্বাভাবিক স্তরগুলি আত্ম-ঔপন্যাসিকের পুনর্লিখনে প্রস্ফুটিত করবার পরিকল্পনা ছিল। পূর্বেই বলেছি—'শান্তিলতা'র লিখিত রূপ উপন্যাসাকার নয়, উপন্যাসের খসড়া মাত্র।

সুখেন্দু ও শান্তিলতার বিবাহরাত্রি বর্ণনা ঔপন্যাসিকের মানসরূপান্তরের পরিচায়ক। মানিকবাবুর কমবেশি বাটখানি গল্প-উপন্যাসের মধ্যে মধুর মিলনদৃশ্য বিরল। 'শান্তিলতা' উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। লেখক এখানে নরনারীর দাম্পত্যপ্রেমকে তীক্ষ্ণ, তির্যক সমালোচনার শরে ছিন্নভিন্ন করেন নি। বস্তীর নিচু জানলা দিয়েও যেমন আকাশের রোদ আসে; তেমনই দুঃখী, জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত মানুষের জীবনেও মিলনের ফুল ফোটে।

ফুলশয্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি সহজ ও সুন্দর। তার পরেই ঘটনার পট-পরিবর্তন। দীর্ঘকালের ব্যবধান অকথিত। শান্তি-সুখেন্দুর আঘাত-

সংঘাতময় জীবনে ঘটনাপরিবর্তন হয়েছে আকস্মিক ভাবে (‘প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান’-এ চপলা-মৃন্ময়া বিবাহও ঘটনাচক্রে এবং আকস্মিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে)। কেবল তাৎপর্যময় মুহূর্তগুলিরই সংক্ষিপ্ত আলেখ্য লেখক লিপিবদ্ধ করেছিলেন পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে ব্যবহারের জন্ত।

আর একটি দৃশ্য। শ্রমিক বস্তী বারো ঘর এক উঠোনের সংসার। রাসমণি, লক্ষ্মী, চাঁদি, শান্তি প্রভৃতি সংলগ্ন খুপরির বাসিন্দা। এর ঘর থেকে ওর উঠোন, ওর উঠোন থেকে তার ঘর চোখে পড়ে। সুখেন্দু রাগের বশে শান্তিকে ‘আধালি পাথালি’ মেরেছে। দড়ি দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধেছে। ইচ্ছে করলেই যে কেউ খুলে দিতে পারে, সুখেন্দু বাড়ি নেই। কিন্তু তাতে অত্যাচার বরং বাড়বে, কমবে না। রাগী মানুষ সুখেন্দু। ব্যঙ্গের সুরে হয়তো জানিয়ে দেবে: “শান্তিকে তারা যখন আদর করে নিয়ে গেছে, শান্তি তাদের কাছেই থাকুক।”

তবুও তারা নির্মম হতে পারে নি। শান্তির তৃষ্ণায় সারদা এ্যালুমিনিয়ামের গেলাস ভরে জল এনেছে, রাসমণি তার মুখে দানাদার গুঁজে দিয়েছে। ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হয়, যে যার ঘরে শুয়ে পড়ে। সুখেন্দু তখনও আসে নি। একটু পরেই তার কারণ জানা গেল। তখন কারখানার ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে সুখেন্দু অচৈতন্ত। “গুণ্ডা হিসাবে রাজারই সামিল” রাজাবাবু সেই বস্তীতে সবারই পরিচিত। কারখানার মালিকের পক্ষ হয়ে শ্রমিক-বিক্ষোভ দমন করাই তার কাজ। “সুখেন্দুকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিছানায় আছড়ে ফেলে রেখে তারা বেরিয়ে আসে।” রাত গভীর হলেও বস্তীর উৎকর্ণ মানুষ ধীরে ধীরে জানলায়, গলিতে, উঠোনে সমবেত হলো। “কোনো দুঃখের নাটকে সবাই যেন নীরব দর্শক।” শান্তি দাঁত দিয়ে কামড়ে কাটল দড়ির বাঁধন, আলো জেলে দেখল “সুখেন্দুর চোখ টকটকে লাল।” সুখেন্দু দেখল, শান্তিলতার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। শান্তির ডাকে সকলে কাছে এলো, কিন্তু টিটকারি দিল না। সেবা-শুশ্রূষায় সারা বস্তী একটি একান্নবর্তী পরিবারের মতো নীরবে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ডাক্তার আসতেও দেরি হয় না। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর সুখেন্দুর কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত আত্মবিচারণা—“আর তোকে মারব না শান্তি, আর তোকে বাঁধব না।”

কারখানায় একটা গণ্ডগোল বেধেছিল। বড় সাহেবের ফুলবাগান কে মুড়িয়ে খেয়েছে। ছোটসাহেবের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে তিনি বলেছিলেন:

"ফুলগাছ কে মুড়িয়ে দিয়েছে জানি না সার। আমার ডিউটি মেশিনারি কেউ না ড্যামেজ করে দেখা, প্রভাকশন আরও অন্তত হাফ পার্সেন্ট বাড়াবার জন্ত ফ্যাক্টরী আইন মান্ত করে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।" কথা সম্পূর্ণ হবার আগেই বড়সাহেব এক চড় দিলেন ছোটসাহেবকে। তারপর কারখানায় গোলযোগ, চুরি ঘোষণা, পাগলা ঘন্টি এবং ছুটির পরে দেড়ঘন্টা বাধ্যতামূলক ওভারটাইম। তার প্রতিবাদ করেছিল সুখেন্দু। তারই ফলে সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল।

মানিকবাবু কতগুলি তাৎপর্যবহ কিন্তু বিচ্ছিন্ন কাহিনী একত্র গেঁথেছেন। নিছক গল্পরস পরিবেশনের জন্ত গল্পের মূল্য তিনি কোনোদিন স্বীকার করেন নি। উদ্বাস্তু চন্দ্রনাথ, শ্রমিক সুখেন্দু, ছোটসাহেব কুমার রায়—সকলেই ধনতন্ত্রের অলাতচক্রে বাঁধা। নিজের অসহায় বিক্ষোভ সুখেন্দু প্রকাশ করে শান্তির ওপরে; কুমার রায়ের প্রতিহিংসা শ্রমিক-প্রহারে প্রকাশিত। বড়-সাহেবের কাছে ছোটসাহেব এবং ছোটসাহেবের কাছে সুখেন্দু এক। কুমার রায়ের নাম ও পদবী পর্যন্ত বড়সাহেবের খেয়ালখুশিতে বদলে যায়।

আট

শান্তিলতা আর গ্রামবাংলার মেয়ে নয়, সুখেন্দুরও চোখে নেই গ্রাম্য যুবকের স্বপ্ন; একজন ইস্ট এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারীং ওয়ার্কসের টার্নার সুখেন্দু দাস, আর একজন তার স্ত্রী। ইয়াকুব আলি কেবল একটি নতুন নাম নয়, এই উপন্যাসে নতুন রক্তের সংযোজন। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষে এখন মধ্যবিত্তের দ্বৈধ দশা—এক অংশ সত্যোত্থিত ধনিকশ্রেণীর পক্ষপুটাশ্রয়ে আভিজাত্যের উচ্চতর সোপানের অভিমুখী। অন্ত অংশে যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত, নির্বিত্ত শ্রমিক-সমাজের সঙ্গেই তার আত্মীয়তা। ইয়াকুব আলির সঙ্গে সুখেন্দুর মিতালি সেই নবগঠিত মধ্যবিত্ত-শ্রমিকসমাজের পরিচায়ক। মানিকবাবু শেষ পর্বের উপন্যাসে ও গল্পে মধ্যবিত্তের এই নবপরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন।

কুমার রায়, মা নলিনী ও নিখিলকে নিয়ে মধ্যবিত্তের ওপরে ওঠার কাহিনী। কোম্পানীর পক্ষ থেকে কুমার রায় বিলেত যাবে। একটি এরোপ্লেনের অগ্নিদাহ দেখে নলিনী আপত্তি তুললেন। সেই অগ্নিদাহ দেখেছে সুখেন্দু। শম্ভু মাঝির গোটা চালাঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। তার দুঃখের কথা নিয়ে ভেবেছে সুখেন্দু। নিজের কথাও অনেক তোলপাড় করেছে মনে

মনে। সাথী ইয়াকুবের কথায় সে আত্মবিশ্বাস লাভ করে। "তার্নার সুখেন্দু। জড় ধাতুখণ্ডকে ঘষে মেজে গড়ে পেটে—নিরবয়ব শিশু রূপ পায়, আকার পায়। সুখেন্দুর মস্তিষ্কের নির্দেশে আর হাতের তাড়নায় যন্ত্র হয়ে ওঠে, যন্ত্র হয়ে ওঠে গতির প্রতীক, আর সৃষ্টির সহায় হয়ে ওঠে।" সুতরাং সেও অন্য নয়, তুচ্ছ নয়। এই দৃষ্টিতে শান্তিলতাকেও সে নতুন চোখে দেখেছে। এতদিনে শান্তিলতার মনের মূল্য দিতে চেয়েছে। "আজ শান্তিলতার মনের অগাধ ভালোবাসা, অসীম ধৈর্য আর অতল শান্তির উৎসে স্নান করে দিনে দিনে নতুন হয়ে উঠছে সুখেন্দু।"

অনেক ভুল বোঝাবুঝির পরে সুখেন্দু-শান্তিলতার এই প্রকৃত মিলন। তাই পরদিন সন্ধ্যায় যেন সুখেন্দুর কাছে নতুন রূপে উদ্ভাসিত হবার জন্যই শান্তি পরেছে ফুলশয্যার নীলাম্বরীখানা, সযত্নে চুল বেঁধেছে, খোঁপায় দিয়েছে মালা। পুষ্পর মা পরিয়ে দিয়েছে সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে কুমকুম্ টিপ। ঠিক এই মুহূর্তে কাহিনীর গতিপরিবর্তন। গর্ব করে শান্তিলতা বলেছিল: "আমার নাম শান্তি"। কিন্তু শান্তি সে কোনোদিন পায় নি। আর একটি মাহেন্দ্রলগ্ন যখন প্রত্যাসন্ন, তখনই উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে সুখেন্দুর সহকর্মী সহদেব। রাজাবাবুর দলের গুণ্ডামিতে শ্রমিকরা আহত হয়েছে, সুখেন্দুর মাথা ফেটে গেছে। সে হাসপাতালে। শান্তিলতা সহদেবের সঙ্গে হাসপাতালে গেল। এখানেই উপন্যাসের আপাত যবনিকা। বলা বাহুল্য, কাহিনী এখানে পূর্ণায়িত নয়, শান্তিলতার আরো বিবর্তন সম্ভাবিত ছিল।

'মাঝির ছেলে' একটু স্বতন্ত্র শ্রেণীর রচনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক বিলয় এই গ্রন্থের চরিত্র পরিকল্পনায় সুস্পষ্ট। প্রথম পর্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'-র স্থান, অঞ্চল, পাত্রপাত্রী প্রভৃতি উপাদানের নব রূপান্তর। যেন নিজের হাতে গড়া কাদা-মাটির মূর্তি ভেঙে শিল্পী সেই উপাদানে আর একবার মূর্তি রচনা করলেন। উপাদান এক, শিল্পমূর্তি ভিন্ন। হারু মাঝির ভাইপো নাগা এর নায়ক। আটখামার স্টীমারঘাটে চব্বিশ ঘণ্টায় তিনবার প্রাণ-স্পন্দন জাগে। সকালে, দুপুরে আর সন্ধ্যার পর। তিনবারই জাহাজ আসে। এই উপন্যাসে কদমতলার যাদববাবু আছেন, একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। মাধববাবু তাঁর ভাই, কলকাতায় থাকেন। তিনি দেশে আসছেন বলেই যাদববাবুর নৌকো এসেছে আটখামার ঘাটে। চাঁদ মাঝি দৈবজ্ঞের বাড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে নৌকোয় সাময়িকভাবে নাগা

মাঝির কাজে বহাল হলো। মানিকবাবুর সাহিত্যে কৈশোরচিত্র বিরল। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে কৈশোরের ছবি ফোটে নি। কিন্তু নাগা চরিত্রটি আকর্ষণীয়। তার কিশোরসুলভ দুর্ধর্ষপনা, অভিমান, ভোজনাসক্তি, অন্নে তৃপ্তি লেখক খুব সুন্দর ব্যক্ত করেছেন। ঘটনা যেমন এসেছে গল্পের অনিবার্য নিয়মে, চরিত্রের সক্রিয়তাও তেমনি ঘটনাকে গতিমণ্ডিত করেছে। অতিরিক্ত সংকেতপ্রবণতা মানিকবাবুর বহু উপন্যাসে চরিত্রগুলিকে অনেকসময় আদর্শপুত্তলি করেছে। 'মাঝির ছেলে' সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত।

এক আনায় কলহে খুড়ো হারু মাঝির নৌকো ছেড়ে নাগা যাদববাবুর নৌকোয় কাজ নিল। খাওয়াপরার ব্যবস্থা ভালো, আবার বেতনও আছে। ওবাড়ির ছেলেমেয়ে খোকা, কণিকা, মিনতির সঙ্গেও বেশ আলাপ হয়েছে। সে আছে ভালো, কিন্তু তার মতো প্রকৃতির মানুষ শান্তি, স্বস্তির বাঁধা ছকে চলতে পারে না। নাগা অনেকটা তোরাপের উপাদানে গঠিত। অত্যন্ত বলিষ্ঠ, একান্ত সরল, গ্রাম্য, অল্পে অভিমান হয় এবং গোঁয়ার।

বাগানের আম চুরি যায় শুনে সে প্রতিকারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সারারাত বনে ঝোপে বসে থেকে সে চোরের দল ধরে ফেলেছে। কিন্তু তাদের শাস্তির সময় সে-ই বেঁকে দাঁড়ায়। কারণ সে কথার মানুষ। প্রথমে তার কণ্ঠস্বরে ছিল "মিনতি", কিন্তু ছ্যাঁকা দেওয়া শাস্তির কথায় তার বিনয়ের ভাবটা "হঠাৎ যেন উপে গেল"।

"—বড় যে দরদ দেখিয়ে নাগা?

—দরদ না কর্তা, কইয়া আনছি আর কেউ মারব না।"

তারপরেই গোয়ালে আগুন লাগার ঘটনা। চোর ধরা এবং শাস্তি দেখার উল্লাসে পরেশ তাড়াতাড়ি গোয়ালঘরে খুঁত্তি পুড়িয়েছিল। শাস্তি হলো না দেখে মনোভঙ্গের বেদনায় সে আগুন নেভাতে ভুলে গেল। নাগাই প্রথম পোড়া জিনিষের গন্ধ শুঁকে বিপর্যয় টের পেল। আর সকলে যখন হতভম্ব, তখন নাগাই একমাত্র প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বিপদ্-ভঞ্জনে সে সেনাপতির মতো, সকলেই তার নির্দেশে খড়ের পুরনো চালাটি ভেঙে ফেলেছে। এই-প্রসঙ্গে যাদববাবুর চরিত্রও সুন্দর ফুটেছে। সকলের সামনে নাগার হাতে নিজের আংটি খুলে পরিয়ে দিয়েছেন যাদববাবু। "শো গিয়া।...ঘুম যদি ভাঙায় তর আমারে কইস্।" আংটি বা ঘুমের চেয়ে তখন

নাগার বড় দমকার খাওয়া। "ছুগাল মুড়ি খাইয়া যাই কর্তা।" পরেশ ভয়ে অগ্নিদাহের কারণ গোপন করেছে। তবু আশঙ্কা, পাছে নাগা বলে দেয়। "পরেশের ইচ্ছে হয় গলা টিপে ঘুমন্ত ছোঁড়াটাকে মেরে ফেলে আংটিটা নিয়ে পালিয়ে যায়।" ক্ষণকালীন আগুনের আলোয় মানিকবাবু দুটি কিশোরপ্রাণের অকপট বাসনা, ঘন সরলতার ছবি উজ্জ্বল রঙে এঁকেছেন।

মাঝির ছেলে চাঁদ, হারু, নকুল, নাগা এই উপন্যাসের প্রাণবীজ ধারণ করে আছে। তবু যাদববাবু এই মাঝিদের জীবনসূত্রেগ্রথিত কেন্দ্রীয় পুরুষ। আটখামার ঘাটে গিয়ে যাদববাবু পরেশের দু-টাকা জরিমানা করলেন। "তুই একটা আস্ত বাঁদর পরেশ।...এতকাল যে আছিস আমার কাছে, বিনা দোষে শাস্তি দিতে আমার তুই কবে দেখছস্ রে হারামজাদা? আমার হুকুমে শিক তাতানের লাইগা আগুন ধরাইছিলি দুপুর রাইতে, ঘুমের চোখে আগুন নিভাইতে ভুইলা গেছিলি তো গেছিলি। অমন ভুল মাইনসে করে। যখন জিগাইলাম মিছা কইলি ক্যান?" আবার পরেশের সঙ্গে নাগার কলহ বাধে। পরেশের ধারণা নাগাই সত্য প্রকাশ করেছে। বারবার "গোইন্দা বজ্জাৎ" বলায় নাগা পরেশকে এত কিল চড় লাগিয়েছে যে "এক মিনিটের মধ্যেই পরেশ চোখে সরষের ফুল দেখতে আরম্ভ করে।" ছোট ছোট কয়েকটি ঘটনা, অথচ বাংলা দেশের মাটির কত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পরেশ, নাগা, কণিকা, রূপা চারটি কিশোর চরিত্র। নানা স্তরের, কিন্তু সকলেই সংসার-অনভিজ্ঞ, মান-অভিমানের রাজ্যে সমকক্ষ।

যাদববাবুর লঞ্চ কেনা থেকেই উপন্যাসে বিশিষ্ট দিকপরিবর্তন। সমুদ্রের সাধ, ভাগ্যান্বেষণের স্বপ্ন তাঁকে দিশেহারা করেছিল। তাই সমস্ত গহনা এবং অনেক সম্পত্তি বন্ধক রেখে 'জলকন্যা' কেনার সময় বুঝতে পারেন নি, সখের লঞ্চে ব্যবসা জমে না। কিন্তু বন্ধ্যামাটির বুক চিরেও যদি ফসল ফলে, অফুরন্ত প্রাণবন্তের ভাগ্য সদয় হবে না কেন। তিমনা যেন সেই আকাঙ্ক্ষার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি। হোসেন মিয়ার মতো রাজাগিরির স্বপ্ন নেই তার, সে বহু দুঃখে পোড়-খাওয়া মানুষ। তীক্ষ্ণ তিমনার সত্তা; স্বল্পবাক বলেই হয়তো সে চরিত্র অনুধাবনে নির্ভুল। তার প্রভুভক্তি আরব্য গল্পের দৈত্যের মতো। তবে হোসেন ও তিমনা দুজনেই নির্ভীক পুরুষকারের প্রতীক। নাগার গ্রামীণ, সরল শিশুমন প্রথমে তিমনাকে গ্রহণ করতে

পারে নি। তিমনাও নাগাকে সঙ্গে নিতে রাজি নয়। সমুদ্র তো স্বপ্ন নয়, পদে পদে বিপদ, ঝড়, শত্রু, বিপর্যয়। নাগা, নকুল, পরেশের মতো মাঝির কাছে যাদববাবুই অভিভাবক। কিন্তু জলে অভিযানের কাজে যেন তিমনাই প্রকৃত কর্তা। অবশ্য তিমনা কোনো কিছু জোর করে না! তাহলে নকুলের ছেলে বলে পঙ্কু অনায়াসে 'জলকন্যা'-র স্থান পেত না। যে আকস্মিক বিপর্যয়ে উপন্যাসের ছেদ, তা-ও অন্যরকম হতো।

যাদববাবুর চরিত্রটি বড় মধুর। তিনি যে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বশালী নন এটাই তাঁর ত্রুটি। তবু ক্রোধ, ভালোবাসা, বিবেচনা, বিবেক সবকিছু মিলিয়ে অবিস্মরণীয়। সত্যিই যাদবাবু 'ভদ্রলোক মাঝি', কয়রতলার তালুকদার নেহাৎ বাইরের পরিচয়। হোসেন মিয়া কুবের-কপিলাকে চায় ময়নাদ্বীপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য। তার কোনো মানবিক অনুভূতি নেই। যাদববাবু সকলকে খুশি দেখতে চান। কিন্তু এমন মানুষ জলযাত্রায় অচল। বিশেষত চোরাইমাল বহন করাই যেখানে কারবার। নিতাই সাহার নীতি, ব্যবসায় বুদ্ধি, নীতির চেয়ে তিমনার কাছে 'জলকন্যা'র জলে ভাসাই ভালো। কিন্তু যাদববাবু এতে তৃপ্ত নন। তিনি চোর ডাকাতকে ঘৃণা করেন, অথচ তাদের সংসর্গেই নিজের সৌভাগ্য রচনার প্রয়াস—এহেন দ্বিধাগ্রস্ত লোকদের জন্য সংসারে কোনো স্থান নির্দিষ্ট নেই।

কিন্তু কোনো ঔপন্যাসিক জটিলতা তথা গভীরতা, কোনো গূঢ় মনস্তত্ত্বের উদ্ঘাটন বা কোনো বিশিষ্ট সমাজচেতনার পরিচয় 'মাঝির ছেলে'-তে নেই। কেতুপুরের জেলে কৃষকদের জীবনে [পদ্মা নদীর মাঝি] প্রকৃতির ভূমিকা কত অপরিহার্য একটি ঝড়েই তার সাংকেতিক পরিচয় উদ্ভাসিত। সে তুলনায় 'মাঝির ছেলে' উপন্যাসে মাঝির ছেলেদের বা তাদের কর্তা যাদববাবুর জীবনসংগ্রাম নেই, সংগ্রাম এড়িয়ে তারা সুরক্ষপথে সৌভাগ্য খুঁজেছে। সেই অনুসন্ধানও মাঝির ছেলেদের নয়; যাদববাবু, তিমনা, নাগার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান। এখানেই উপন্যাসটির মৌল ত্রুটি, এবং এ-ত্রুটি মানিকবাবুর মতো শিল্পীর হাত থেকে অপ্রত্যাশিত। যখন সমাজসমস্যার অতিরেকী উল্লেখে তিনি সাহিত্যে উদ্দেশ্যপ্রাণতাকে স্পষ্ট করে তুলছিলেন, তখনই এ-উপন্যাসের বর্তমান রূপ কি করে সম্ভব হলো? তাই মনে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে উপন্যাসটির উপসংহার অলিখিত। 'মাঝির ছেলে' 'শান্তিলতা', 'মাটি-ঘেঁষা মানুষ'-এর মতোই খণ্ডিত সৃষ্টি।

প্রথাসিদ্ধ নায়ক নায়িকাদের অন্তর্ধান ঘটেছিল 'কল্লোল' 'কালিকলম' ইত্যাদির লেখকদের রচনায়। শৈলজানন্দ কয়লাকুঠির অঞ্চলে কুলিদের মধ্যে পেয়েছিলেন বিষামৃতময় জীবনের স্বাদ; প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখেছিলেন সমাজের 'পাঁক', "বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে"; অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত গিয়েছিলেন হাড়ি-মুচি-ডোমবায়েনদের সমাজে; তারাশঙ্কর আদিম জীবনীশক্তির প্রাচুর্য দেখেছিলেন বাগ্দী-কাহার-বেদেদের জীবনে। তখন থেকেই অ-নায়ক নায়ক এবং অ-নায়িকা নায়িকারা বাংলা গল্পের আসরে প্রাধান্য পেয়ে আসছেন। তবু মানিকবাবুর তৃতীয় পর্বের (১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬) নায়কেরা বিশেষ অর্থে 'নতুন'। ঐতিহাসিক পোলার্ড মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শহরে সভ্যতার প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন: "Without these two there would have been little to distinguish between modern from medieval history.,.When you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation" কিন্তু একথাও ঠিক যে সমগ্র বিশ্বেই এখন মধ্যবিত্তের অগ্রগতি ব্যাহত, এখন মজুরশ্রেণীর অভ্যুত্থানের যুগ। কার্ল মার্কসের কথায়: "The lower strata of the middle class—the small tradespeople, shopkeepers and retired tradesmen generally, the handicraftsmen and peasants—all these sink gradually into the proletariat." মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পর্বের নায়কদের মধ্যে মধ্যবিত্তের সেই শ্রমিকশ্রেণীতে রূপান্তরের কাহিনী লিখিত হয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কী নির্মম পারিপার্শ্বিকের চাপে মধ্যবিত্তরা পুরনো ভিত্তি দ্রুত হারাচ্ছে, তার আংশিক চিত্র অন্তত উদ্ঘাটিত করেছে এই সব নরনারী।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

নিশীথ কর

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বশান্তি আন্দোলনে বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর আত্মনিয়োগ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁর দিকে আজ বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি।

কিন্তু শান্তির বেদীতে আত্মাহুতি ছাড়াও—তাঁর সৃজনশীল সাংস্কৃতিক অবদানের পরিমাণ যথেষ্ট। সেই অবদানকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রচনা এবং সামাজিক রচনা। তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনা স্বল্প হলেও তা অভিজ্ঞ মনের পরিচায়ক। সেসব রচনার রসগ্রহণ বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই সম্ভব। তবে তাঁর দার্শনিক ও সামাজিক রচনার জন্যই রাসেল পাঠক-সাধারণের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু একটু বিশ্লেষণী মন নিয়ে এইসব রচনার গভীরে প্রবেশ করলে রাসেলের একটি অদ্ভুত আত্মকেন্দ্রিক মন যেন ফুটে উঠতে থাকে।

রাসেলের রচনায় দুটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়। একটি তাঁর অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী মেজাজ, অন্যটি তাঁর সংশয়ধর্মী যুক্তিপ্রবণ মন। এই দুটি নিয়েই তিনি যুক্তিবাদী-বৈজ্ঞানিক-মানবতাবাদ-প্রচারে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। তবুও মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই রাসেলের এক আত্মিক দৃষ্টি তাঁর যুক্তিধর্মী বিজ্ঞানী মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই অনেক সময়ে তাঁর নিজের কাছে যা শ্রেয় বা প্রেয় তাকেই দেখি তিনি সমাজের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন। নিজের ভালো-মন্দ লাগাটাকেই তিনি অনেক সময়ে সামাজিক নীতিবোধের মাপকাঠি করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন: "Ethical argument could not be 'such and such a thing is good' but 'I think such and such is good'." তিনি আরও বলেছেন: "'Good' and 'Bad' are merely expressed subjective likes and dislikes." নীতিবোধের এই 'I'-এর উপর গুরুত্ব, এই Subjective likes and dislikes-এর দৃষ্টিই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেক সময়ে অযৌক্তিক ও অন্তর্মুখী করে তুলেছে।

অথচ বাস্তব জীবনকে তন্ন তন্ন করে বোঝবার জন্তে রাসেলের সংশয় ও জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। যিনি জীবন নিয়ে নানা এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছেন—যিনি গণিত নিয়ে, দর্শন নিয়ে, শিশুশিক্ষা নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে, স্ত্রীপুরুষের যৌনসম্পর্ক নিয়ে, যুদ্ধশান্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন; আর তার জন্ত নির্যাতন সহ্য করেছেন; সেই সক্রেটিসধর্মী রাসেল-জীবনকে কখনোই বাস্তববিমুখ বলা যায় না। তবুও এই সব সমস্তা সমাধানে মাঝে মাঝে তাঁর দৃষ্টি কেমন যেন আত্মমুখী হয়ে উঠেছে। তবে বিশ্বশান্তির ব্যাপারে মনে হয় একটা ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে, তিনি তাঁর সেই আত্মকেন্দ্রিক জীবনে সীমিত থাকছেন না। সেখানে যেন জগতের কল্যাণে তাঁর আত্মা উৎসর্গীকৃত—তিনি বিশ্বমানবের রক্ষাকর্তা। যিশুর মতো ইংলণ্ডের ক্রুশ বহন করেও তিনি যেন বিশ্বশান্তির জন্তু প্রাণ দিতে এগিয়ে চলেছেন।

কিন্তু শুধু আজকের কথা নয়। পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় তিনি এই শান্তির জন্ত সংগ্রাম করে চলেছেন ও তার জন্ত বহু নিগ্রহও ভোগ করেছেন। রাসেল বলেছেন: "একদা আমি সাম্রাজ্যবাদীই ছিলাম। বুওর যুদ্ধে আমার পূর্ণ সমর্থন ছিল। কিন্তু ১৯০১ সালের পর থেকেই হিংসার আস্ফালনে আমার আস্থা কমতে লাগল।" আর ১৯১৪-র বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরোধী করে তুলল। রাসেল ক্রমাগত যুদ্ধের বিরুদ্ধে লিখে যেতে লাগলেন। অগ্রণী হয়ে NCF (No Conscription Fellowship) গড়ে তুললেন। ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নাম ও তাঁর শান্তির মতবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নিজে তো যুদ্ধবিষয়ক কোনো কাজে যোগ দিলেনই না, উপরন্তু যাঁরা যুদ্ধবিরোধী তাঁদের সপক্ষে সরবে প্রতিবাদ করলেন। এই প্রসঙ্গে বৃটিশ সরকার ও আমেরিকার ফৌজকে সমালোচনা করার জন্ত ১৯১৮ সালে রাসেলের দশ পাউণ্ড খরচা সমেত একশ পাউণ্ড জরিমানা ও ছ মাস জেল হলো। যুদ্ধ চলাকালীন রাসেলের আশা ছিল হয়তো শান্তি এলে ভবিষ্যতে যাতে আর সর্বগ্রাসী যুদ্ধ না হয় তার ব্যবস্থা শান্তিকামী মানুষ করবে। কিন্তু ভার্সাই সন্ধি তাঁকে আশাহত করল। তিনি আবার যুদ্ধের আশঙ্কা করলেন এবং শান্তির পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আন্দোলন করা সত্ত্বেও—রাসেল দ্বিতীয় যুদ্ধে হিটলারের বিপক্ষে যুদ্ধকে সমর্থন করলেন। অবশ্য তাঁর অহিংসনীতির এই ব্যতিক্রম অনেকের কাছে সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হয়েছিল। তাই প্রথম যুদ্ধের

বিরোধিতা করার পর দ্বিতীয় যুদ্ধকে সমর্থন করতে গিয়ে রাসেল অসামঞ্জস্যতার আত্মবিশ্লেষণে বললেন: "যুদ্ধের চেয়ে কাইজারের দ্বারা পরাজিত হওয়াও ভালো মনে হয়েছিল কিন্তু হিটলারের দ্বারা পরাজিত হওয়ার চেয়ে যুদ্ধও ভালো।" আসলে হিটলারের সর্বধ্বংসী যুদ্ধের বীভৎসতাই রাসেলকে যুদ্ধমুখী করে তুলল।

দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষ হবার পর রাসেল আবার শান্তির জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন, আবার শান্তির বাণীপ্রচার শুরু করলেন। এবার কিন্তু শান্তি-প্রচারে তাঁর অহিংসনীতিতে আরও এক বড় অসামঞ্জস্যতার উদ্ভব হলো: ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে বোমাবর্ষণ করেও শান্তি বজায় রাখার কথা বলতে লাগলেন।

এই রুশবিরোধী বোমাযুদ্ধের সঙ্গে তাঁর শান্তিনীতির সামঞ্জস্যের কথা বিশ্লেষণ করে রাসেল বললেন: "আমি ভেবেছিলাম শান্তির জন্য একটি বিশ্বশক্তি প্রয়োজন। আর ১৯৪৯-এর পূর্বে যেহেতু শুধু একা আমেরিকারই এটম বোমা ছিল তাই আমি ভেবেছিলাম শান্তির জন্য প্রয়োজন হলে ওই একক শক্তিকেই রুশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেও শান্তি বজায় রাখা যাবে।" ১৯৪৯-এর পর রাশিয়া এটম বোমা তৈরি করে ফেলে। তখন থেকে রাসেল অবশ্য তাঁর মত পরিবর্তন করেন এবং তখন থেকে তিনি বলতে থাকেন—নিরস্ত্রীকরণ হলো বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ। তবে তাঁর উপস্থিত মত হলো: সোভিয়েত ও আমেরিকা—এই দুটি দেশের মধ্যে চুক্তি করে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে। আর অন্যান্য দেশে—এমন কি ইংলণ্ডেও—বিনা শর্তে এককভাবেই নিরস্ত্রীকরণ করা হবে শান্তির অনুকূলে।

এই নিরস্ত্রীকরণের জন্য তাই রাসেল ইংলণ্ডে অহিংস আন্দোলন করতে শুরু করলেন। আর সেখানকার সকল পার্টির লোক নিয়ে গঠিত 'সমস্ত-শতক' (A Committee of Hundred)-এর সভাপতিরূপে তিনি ইংলণ্ডের পারমাণবিক যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাতে লাগলেন। এই কমিটির উদ্যোগে আহূত এলডারম্যাস্টন্ (Aldermaston) মিছিলে ইংলণ্ডের শত শত সাধারণ লোক এসে যোগ দিতে লাগল। রাসেল ইংলণ্ডের শাসকশ্রেণীর চক্ষুশূল হলেন। ট্রাফালগার স্কোয়ারে সত্যাগ্রহ করার অপরাধ ঊনিনব্বই বছরের বৃদ্ধ রাসেল ১৯৬১ সালে আবার ইংলণ্ডের আইনে অভিযুক্ত হলেন এবং কারাবরণ করলেন। শান্তির জন্য এই নির্যাতন

ভোগ তাঁকে সারা বিশ্বের প্রশংসায় ও অভিনন্দনে ভূষিত করে তুলল।

কিন্তু বিশ্বশান্তির জন্য রাসেল যতই ব্যাকুল হয়ে উঠুন, এটম যুদ্ধের বীভৎসতায় মানুষের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি যতই আতঙ্কিত হোন—দুঃখের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে হচ্ছে যে যে-কারণে যুদ্ধের উদ্ভব হয় তার প্রতি তাঁর দৃষ্টির গভীরতা আজও যেন প্রসারিত হয় নি। কি করে শ্রেণীশোষিত সমাজ থেকে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়, আর সেই সাম্রাজ্যবাদ কি করে তার শোষণব্যবস্থা অন্য দেশে বজায় রাখার জন্য অনিবার্যভাবে যুদ্ধের আশ্রয় নেয়—শ্রেণীঅধ্যুষিত সমাজের সে কাহিনী রাসেলের মনে ধরে নি। তিনি মনে করেন যুদ্ধের বীজ আমাদের মনের মধ্যেই উপ্ত, আর সেখান থেকে তাকে উপড়ে ফেলতে পারলেই যুদ্ধের অবসান হবে। 'Has Man a Future?' নামক সদ্য প্রকাশিত বই-এ রাসেল এই কথাই লিখেছেন: "It is in our hearts that the evil lies and it is from our hearts that it must be plucked out." ১৯৬১-তে প্রকাশিত 'Fact and Fiction' নামক বই-এও তিনি বলেছেন: "War is due to our acquisitive tendency." এই আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টির মধ্যেই রাসেল যুদ্ধ-সমস্যার সব কারণ খুঁজে পেয়েছেন। আর তাই তাঁর সমাধানেরও পথ হলো আত্মশুদ্ধি। কিন্তু রাসেলকে এই কথা জিজ্ঞাস্য: সব দেশেরই বেশির ভাগ মানুষ তো মনেপ্রাণে শান্তি চায়—তাদের মনে তো যুদ্ধের বীজ উপ্ত নেই। যুদ্ধ তো বাধে মুষ্টিমেয় শোষক রাষ্ট্রনেতাদের প্ররোচনায়। তাদেরও এই শোষণমানসিকতা অনিবার্যভাবে উদ্ভব হয় ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার মধ্য থেকে—দেশের মধ্যে তা শোষণের জাল ফেলে শেষে বিদেশেও জাল ফেলে। আর, এই শোষণ যাদের স্বার্থ তাদের আবার প্রয়োজন শোষণহীন সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করা—সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধানো। তাদের এই সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক নীতিই কি যুদ্ধের জন্য দায়ী নয়? আসলে বর্তমান দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব বুঝতে চেষ্টা না করলে এবং সেই শিবিরের কোন পক্ষ সমর্থনযোগ্য তা স্থির করতে না পারলে, আধুনিক আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া দুরূহ। শোষণবাদী পৃথিবীতে ব্যক্তির মনে ও শ্রেণীর মনে দ্বন্দ্ব, বিক্ষোভ ও লোভ (acquisitive tendency) নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মানুষের মনে তাই

বলে মিলন, সহযোগিতা, সৌহার্দ্য, শান্তির আগ্রহ লোপ পায় না, পায় না বলেই তো সভ্যতা টিকে রয়েছে, টিকে থাকে। মনের দিক থেকেও সমস্যাটা রাসেল একপেশে করে দেখেছেন। আর মনের দিকে এত জোর না দিয়ে সমাজব্যবস্থার দিকে দেখলে তাঁর এত গোল ঘটত না।

পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যাপারে সোভিয়েত ও আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির সঠিক বিচারেও রাসেল পরাঙ্মুখ। কিন্তু সোভিয়েত যে সর্বপ্রথমে পারমাণবিক অস্ত্র বেআইনী করার কথা বলেছিল, এককভাবে পরীক্ষা বন্ধ করার যে ঝুঁকি নিয়েছিল, পূর্ণাঙ্গ নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে অস্ত্রবিলোপ করার যে পরিকল্পনা দিয়েছিল—এ সব কথায় গুরুত্ব না দিলে কি ঠিক হয়? অন্য দিকে গোড়া থেকেই আমেরিকা চেষ্টা করেছে একচেটিয়া আণবিক বোমার জোরে পৃথিবীর প্রভুত্ব। তারপর গত দশ বছর ধরে শুধু যে বলে চলেছে প্রথমে তদন্ত-তদারকী এবং তারপরে নিরস্ত্রীকরণ, অর্থাৎ অস্ত্র বর্জনের প্রতিশ্রুতি না দিয়েই অন্য রাষ্ট্রের অস্ত্রভাণ্ডারের খবর নেবার অভিসন্ধি—এসব কথারও মর্মার্থ না বুঝলে কি চলে? এসব বিচার না করলে কোন রাষ্ট্র শান্তির পক্ষে আর কোন রাষ্ট্র শান্তির পক্ষে নয়, তা সনাক্ত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। আর রাসেল তা করতে নারাজ। তিনি পক্ষ নির্বাচন করতে পরাঙ্মুখ। তাঁর নীতি হলো—দুই পক্ষকেই শান্তি বিঘ্নিত করার অপরাধে সমানভাবে দোষারোপ করা; আবার অন্যদিকে দুই পক্ষকেই শান্তিরক্ষার জন্য আবেদন জানানো।

অবশ্য এইভাবে দুই পক্ষকে সমানভাবে দোষারোপ করা রাসেল-দৃষ্টির যতই অযথার্থতা ও অবাস্তবতার পরিচয় দিক—দুই পক্ষকে সমানভাবে শান্তির জন্য আবেদন জানানোর মূল্য আছে, এ কথা স্বীকার করতে হবে। অন্তত দেশে দেশে সে আবেদনে সাড়া দিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তাতে শান্তির পথ প্রশস্ত বই সঙ্কীর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে না। রাসেল-দৃষ্টির বিচারে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, তিনি একটি অদ্ভুত ধরণের প্যাসিফিস্ট বা অহিংসাবাদী। অদ্ভুত বললাম এই কারণে যে তিনি অহিংসার নামে পূর্বে অনেক সুসঙ্গতিহীন মত বা প্রস্তাব পেশ করেছেন। তবে মোটামুটি তাঁর অহিংসনীতি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে তিনি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় হিংসার কারণ নির্দেশ না করে মানুষের বিবেককে যুদ্ধের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করতে চান। এই কাজে তিনি তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে

সকল দল, মত ও আদর্শের লোক নিয়ে ইংলণ্ডে শান্তি অভিযান চালাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, অন্যান্য বিশ্বশান্তি আন্দোলনেও উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন।

এই উদ্দেশ্যে কয়েক বছর পূর্বে পাগওয়াশ (Pagwash)-এ যে সর্বদলীয় সভা আহূত হয় তাতে বিশ্বশান্তির পক্ষে রাসেলের আবেদন হয়েছিল মর্মস্পর্শী। এর পরে ওই একই ভিত্তিতে ১৯৬১ সালে লণ্ডনে যে বে-সরকারী শান্তি সভা হয় তাতেও রাসেলের ভূমিকা প্রশংসনীয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সভার আহ্বায়কদের মধ্যে ছিলেন ইংলণ্ড থেকে রাসেল, বার্নাল, লর্ড বয়েড অর্; ফ্রান্স থেকে জাঁ-পল-সার্ত্র; আমেরিকা থেকে এ্যারিস ফ্রোম, হোমার জগল্, হিউগো উধা; আর ভারতবর্ষ থেকে ছিলেন বিনোবা ভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ভি-ভি-কোশাম্বী প্রভৃতি। এই জুলাই মাসে মস্কোতে বিশ্বশান্তি সংসদের উদ্যোগে যে সর্বদলীয় নিরস্ত্রীকরণ কংগ্রেস বসবে রাসেল তারও অন্যতম আহ্বায়ক। আর ভারতবর্ষে জুন মাসে গান্ধী সংসদের যে বিশ্বশান্তির সভা হলো সেখানেও রাসেল আমন্ত্রিত নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

সর্বদলীয় শান্তিসভা অবশ্য পূর্বে হয়েছে। তবে এই ধরণের শান্তি আন্দোলন পূর্বে হয়েছে বলে মনে হয় না। এত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের লোক এইভাবে ইতিপূর্বে এক সভায় মিলিত হন নি এবং দেশে দেশে শান্তি-অভিযান পূর্বে এত বিস্তৃতিলাভও করেনি। তাই মনে হয় রাসেল অনুসৃত শান্তির পথ হয়তো আশার আলোক নির্দেশ করবে। আর দেশে দেশে এই শান্তি সভা ও অভিযান যদি মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে উদ্বেলিত করে তুলতে পারে, তাহলে হয়তো যে ভাবী যুদ্ধের অমানিশা মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে তা চিরকালের জন্যই দূরীভূত হবে।

বর্তমান কালে এই শান্তির প্রশ্ন ছাড়া, অন্য প্রশ্নে রাসেলের ভাগ্যে জন-প্রিয়তা বেশি জোটে নি। কারণ জনপ্রিয়তার যে সহজ পথ হলো জনমতের স্রোতে গা ভাসানো তাতে তিনি কখনোই সায় দিতে পারেন নি। বরং সেই স্রোতের বিরোধিতাই তিনি আজীবন করে এসেছেন।

যুদ্ধের বিরোধিতা করে তিনি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শাসকদের কাছে প্রিয় হতে পারেন নি। ধর্মের বিরোধিতা করার জন্য তিনি প্রাচীনপন্থী মানুষের কাছে অপ্রিয়। কমিউনিজমের বিরোধিতা করেন বলে সমাজতন্ত্রী

দেশের লোক তাঁকে অপছন্দ করে। আর প্রায় বাধাহীন যৌনসম্পর্কের মতবাদ প্রচার করায় অনেক দায়িত্ববোধযুক্ত লোকই তাঁকে গ্রহণ করতে ভয় পায়। ফলে মানুষটাকে 'বিপজ্জনক পাগল' আখ্যাত হয়ে অনেক দেশে দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। অথচ মানুষটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে আশ্রয় করে সমাজে যা কিছু অযৌক্তিকতা ও গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দেয় তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাঁর বিদ্রোহী বৈজ্ঞানিক মন সমাজের প্রচলিত গোঁড়া মতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে নি বলেই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে এত দুর্ভোগ। সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচনার প্রধান কারণ তাঁর উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। তাঁর মতন ব্যক্তিত্বের পক্ষে ইংলণ্ডের বুর্জোয়া সমাজে যে পরিমাণ স্বাধীনতা আছে—সোভিয়েত রাশিয়ায় সমগ্র সমাজের নিরিখে সেই স্বাধীনতার উপর যুক্তিসঙ্গত সীমা আরোপ করা প্রয়োজন হতো—এরূপ বোধই মনে হয় তাঁকে সমাজতন্ত্রের প্রতি বিমুখ করে তুলেছে। রাসেলের কাছে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের উপর যে কোনো রকম বাধা নিষেধই একেবারে অসহ্য। অনন্যসাধারণ প্রতিভা-ভাস্বর রাসেলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধও অনন্য। এই অত্যুগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধই তাঁকে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুখরা করে তুলেছে। তবে রাসেল অপ্রিয়বাদী হলেও স্পষ্ট বক্তা। কারণ তিনি যা ভালো বুঝেছেন তা-ই তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—যদিও তাঁর সেই ভালোমন্দ বোঝাটা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক দোষে দুষ্ট। তাঁর বক্তব্যের সুস্পষ্টতার জন্য তাঁর রচনা সব সময়েই স্বচ্ছ।

রাসেল তাঁর প্রখ্যাত 'A Free Man's Worship' প্রবন্ধে এবং 'Why I am not a Christian' বইটিতে ধর্মের সকল গোঁড়ামি, সকল অযৌক্তিক বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। কিন্তু ওই গোঁড়ামিই তিনি আবার কমিউনিজমের মধ্যে দেখে তাকে এক প্রকার যুক্তিহীন ধর্ম বলে গ্রহণ করতে নারাজ হয়েছেন। 'Why I Oppose Communism' বইখানি এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা। 'Practice and Theory of Bolshevism' বইটিতে আছে মার্কসবাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকে সমালোচনা। 'Freedom and Organisation' বইখানিতে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসীয় তত্ত্বের সমালোচনাও সন্নিবেশ করা হয়েছে। 'উদ্বৃত্তমূল্যতত্ত্ব' ('থিওরি অব্ সারপ্লাস ভ্যালিউ'), 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ'—সবকিছুর বিস্তৃত আলোচনা ও সমালোচনা শেষোক্ত বইগুলিতে পাওয়া যায়।

রাসেলের এসব বই-এর লিখনশৈলী এত সহজ ও সুন্দর যে তা সকল মানুষেরই উপভোগের সামগ্রী। মার্কসবাদ সম্বন্ধে এসব রচনা এত বাস্তবানুগ যে বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও তা তৃপ্তিকর কৌতূহল উদ্রেক করে। স্পষ্ট মনে পড়ে তিরিশ দশকে যখন এদেশে মার্কস-এঙ্গেলসের বই ছিল দুর্লভ, তখন রাসেল-লিখিত এইসব বই পড়েই বহু লোক মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। জেলে বসে বহু সন্ত্রাসবাদী সেদিন রাসেলের 'Freedom and Organisation' পড়তে পড়তে দৃষ্টির রূপান্তর ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে ধীরে ধীরে পা বাড়িয়েছিলেন।

তবে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তিরিশ চল্লিশ বছর পূর্বে লেখা রাসেলের এসব সমালোচনার বোধহয় আজ আর উত্তর নিষ্প্রয়োজন। কারণ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূলগত নির্ভুলতা আজ বাস্তব সত্য; সমাজবিবর্তনে শ্রেণীদ্বন্দ্বও অল্পবিস্তর প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃত; আর আধুনিক বিজ্ঞানে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অনেক কথাই সমর্থিত। তবে বিশুদ্ধ দার্শনিক আলোচনায় সমাধান বোধহয় দুষ্প্রাপ্য। কারণ, রাসেল নিজেই ভাববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে দার্শনিক জীবন শুরু করেছিলেন। পরে কিন্তু বিশুদ্ধ নৈয়ায়িক জালে জড়িয়ে একপ্রকার প্রচ্ছন্ন ভাববাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করলেন। তাছাড়া, সাম্প্রতিক ইতিহাসের খবর রাখলে রাসেল-খণ্ডন বাহুল্য বলে মনে হতে পারে। গত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের যে অগ্রগতি ঘটেছে তাকেই বলা যেতে পারে মার্কসীয় অর্থনীতির বিরুদ্ধে সমালোচনার মূর্ত খণ্ডন। আর মার্কসবাদেরও শতায়ু উত্তীর্ণ—এই শতাব্দীকালের ব্যবধানে তাকে হত্যা করার নিরন্তর প্রচেষ্টার ব্যর্থতাও মার্কসবাদ খণ্ডনের মূর্ত অস্বীকৃতি বলা যেতে পারে। অবশ্য মার্কসবাদের মূল তত্ত্বের ব্যতিক্রম না ঘটলেও—দেশান্তরে ও কালান্তরে তার রূপের পরিবর্তন যে ঘটছেই, এ কথা স্বীকার করতে হবে। বাস্তবের নিকষে নীতির ও কৌশলের যাচাই না করলে মার্কসবাদ তো বস্তুবাদ থাকত না।

কিন্তু রাসেলের একটি সমালোচনার কথা অনেকের মনেই রেখাপাত করেছে। সে সমালোচনার মধ্যে হয়তো সখ্যমনের অভাব আছে—কিন্তু তাই বলে তাকে এড়িয়ে যাবার প্রবৃত্তি আমাদের পলায়নী মনের পরিচয় দেয়। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে—সোভিয়েত সমাজের অগ্রগতি

কোনোদিনই বিরূপ সমালোচনায় প্রতিহত হয় নি বরং সমালোচনার অন্তর্নিহিত সত্যটুকুর স্বীকৃতিতে তার গৌরব বেড়েছে আর যা মিথ্যা তার মৃত্যু ঘটেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্রীয়করণের বিরুদ্ধে তিনি যে আপত্তির কথা তুলেছেন তা অনেক মানুষের মনেই একটি প্রশ্নাকারে দেখা দিয়েছে। ১৯৪১ সালে লিখিত 'Power' বইখানিতে রাষ্ট্রীয় শক্তির নিরঙ্কুশ কেন্দ্রীয়করণের কুফল সম্বন্ধে রাসেল খুব হুঁশিয়ারী করেছিলেন ফ্যাসীবাদের ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে। আর ১৯৬১ সালে লিখিত 'Fact and Fiction' বইটিতে তিনি বলেছেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে তাঁর পূর্ব-উল্লিখিত সব আশঙ্কাই স্তালিনের কার্যকলাপের বিবরণে সমর্থিত হয়েছে। আর স্তালিনের রাজত্বে যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে তাকে শুধু ব্যক্তিগত ত্রুটিবিচ্যুতি বলে ব্যাখ্যা দিলে অগভীর রাজনৈতিক দৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হবে। সেই ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটবার যে অগণতান্ত্রিক পথ রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে ছিল সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে তার পথনিরোধ প্রচেষ্টাই বেশি করে করা উচিত ছিল। তা না করতে পারলে, স্তালিনের রাজত্বে যা ঘটেছে তা যে ক্রুশ্চেভের রাজত্বে বা পরবর্তী কোনো রাষ্ট্রনায়কের রাজত্বে পুনরায় ঘটবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? এই প্রশ্ন—অনেকের মনেই প্রশ্ন হিসাবে আজও রয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য ১৯২০ সালে রাসেল রুশ দেশ দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন সেখানে যান তখন সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত অনগ্রসর। রাসেল তখনকার রুশ দেশ দেখে তাই সন্তুষ্টিলাভ করতে পারেন নি।

তবে রাসেল-চিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব বোঝা যায় যখন দেখি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের খণ্ডনলীলা সমাপ্ত করার পর তিনি অন্য এক ধরনের সমাজতন্ত্রকেই সমর্থন করলেন। ধনতন্ত্রের সমর্থক তিনি হলেন না এবং সাম্রাজ্যবাদেরও তিনি বিরোধী।

রুশ দেশ থেকে ফিরেই—১৯২০ সালেই তিনি চীন গেলেন। চীনের সুপ্রাচীন সভ্যতার তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে লাগলেন। সেখানে গিয়েই তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করলেন, চীনের ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা দাবি করলেন। 'Problem of China' বইখানি আজও তাঁর প্রগতিদৃষ্টির

পরিচয় দেয়। তবে আবার সেখানকার কমিউনিজমের প্রতিও তাঁর সমালোচক দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।

একটি কথা মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের একদল বুদ্ধিজীবী ধনতন্ত্রের অসহ্য রূপ দেখে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন—অথচ পুরোপুরি মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র গ্রহণ করতে পারেন নি। রাসেল তাঁদের মতনই এক ধরনের Guild Socialism-এর সমর্থক হয়েছিলেন।

রাসেল-চিন্তার মূল্যায়ণে তাই শুধু এই কথাটুকু মনে রাখতে হবে যে তিনি কমিউনিস্টবিরোধী; কিন্তু তা বলে প্রতিক্রিয়ার সমর্থক নন। শ্রেণী-দৃষ্টিতে তাঁর শ্রমিক-চক্ষুর উন্মেষ হয় নি সত্য—তাই কড্‌ওয়েল, বার্নাল, হলডেন, ডব্‌, লিউইসের পথ তাঁর চোখে পড়ে নি। কিন্তু তাই বলে তিনি চার্চিল, ইডেন, ম্যাক্‌মিলনপন্থীদেরও পথের পথিক নন।

চীন থেকে ফিরে রাসেল শিশু-শিক্ষা নিয়ে মাতলেন। সাধারণভাবে তাঁর শিক্ষার মূলমন্ত্র হলো—সব গোঁড়ামি নিরাকরণ করে, নির্বিচারে কোনো কিছুকেই গ্রহণ না করে, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসু মন গড়ে তোলা। ১৯২৭ সালে বেকন হিলের কাছে তিনি একটি ছোট স্কুল গড়ে তুললেন। তাঁর স্ত্রীর সাহচর্যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল এক্সপেরিমেন্ট চালাতে লাগলেন শিশু-শিক্ষার ভিত্তিটিকে বদল করার জন্য। রাসেল প্রচলিত শাসনমূলক শিশু-শিক্ষার পক্ষপাতী কখনোই ছিলেন না। এমন কি যুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসাবে রাসেল শিশুপীড়ক শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করলেন। শিশুর স্বাধীন ব্যক্তিবিকাশে বাধা দিলে স্বভাবতই তার অন্তরাশ্রিত আবেগ নিরুদ্ধ আক্রোশে ও হিংসায় আন্দোলিত হয়ে ওঠে, পরে সেই হিংসা যুদ্ধে প্রকাশ পায়। কিন্তু রাসেলের সে মতবাদ সেদিন ইংলণ্ডে কেউই গ্রহণ করতে বিশেষ আগ্রহান্বিত বোধ করে নি। পরে ডোরা রাসেলের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তাঁর সে বেকন স্কুল উঠে যায়। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে যদিও রাসেলের শিশু-শিক্ষার মূলে একটি আত্মকেন্দ্রিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি পরিস্ফুট—তথাপি তাঁর সাধারণ শিক্ষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসু মেজাজটির মূল্য আছে; বিশেষ করে আজকের দিনে তার গুরুত্ব অনেক

১৯২৯ সালে 'Marriage and Morals' বইটি প্রকাশিত হলো। যৌনমত সম্পর্কে সে এক যুগান্তরকারী বই। সে বই পড়ে নি এমন যুবকের সংখ্যা অল্প। সে বই-এর বিষয়বস্তু সবিস্তারে আলোচনা করতে গেলে আমাদের দেশের শালীনতাবোধের মাত্রা বজায় রাখা দুষ্কর। আর যৌনসম্পর্কে এই শালীনতাবোধের বিরুদ্ধেই রাসেলের জেহাদ। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রয়েড ও হ্যাবলক এলিসের বিস্তৃত যৌনআলোচনায় পূর্বের যৌননীতিবোধ অনেকাংশে আঘাত পেয়েছিল। তবে সে আলোচনার মধ্যে দেহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের সমস্তা সমাধানে বিজ্ঞানীদৃষ্টির আংশিক পরিচয় ছিল। কিন্তু রাসেল স্ত্রী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের মূলেই যেন আঘাত হানলেন। অবশ্য এই আঘাত হানার মূলে ছিল রাসেলের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি। সমাজে যৌনসম্পর্কে যে অবাধ 'স্বাধীনতা' মানুষের 'মন' চায় তাকেই হয়তো তিনি সামাজিক স্বীকৃতি দিতে চাইলেন। মনস্তত্ত্বকেই বোধহয় তিনি যৌননীতিবোধের মাপকাঠি করলেন। তাই সমাজে স্ত্রী-পুরুষের যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে রাসেল যে কথা খোলাখুলিভাবে বললেন তা বোধহয় ইতিপূর্বে আর কেউ বলতে সাহস পায় নি। রাসেল বললেন: "Marriage should not regarded as excluding outside sexual relations; and that husbands instead of restraining their inclinations in this regard should confine themselves to restraining any jealousy at similar infidelities by their wives." রাসেলের মতে: "Adultery should not in itself be a ground for divorce."

এই সব কথা প্রচলিত যৌনমতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে মনে হলো; শুধু তাই নয়, রাসেল এই সব কথাকে নিজের জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। ডোরা রাসেলের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের অপ্রীতিকর অন্যান্য যৌনসম্পর্কের প্রকাশিত সংবাদে বহুলোক অস্বস্তিবোধ করলেন। এর পরেও রাসেল একাধিক বিবাহ করলেন এবং বিবাহবিচ্ছেদও করলেন। অনেকেই রাসেলের এই মতকে সুস্থচিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁর এক জীবনীলেখক ব্যঙ্গ করে লিখলেন: "By the end of life Russell had married four times and he had other friendships which were not Platonic!"

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও তিনি অবাধ যৌনসম্পর্কের মত প্রচার করতে লাগলেন। তিনি বললেন: "University students should enter into temporary childless marriage (companionate marriage), for that would make them better both intellectually and morally." ১৯৪০ সালে সিটি অফ নিউইয়র্ক কলেজে দর্শনের অধ্যাপকের পদটি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সব মতবাদ প্রচার করার জন্য কিছুদিনের মধ্যেই এক বিবাহিত মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা আনলেন এই অভিযোগে যে তিনি দর্শনশিক্ষার নামে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেচ্ছ যৌনচর্চার মতবাদ প্রচার করছেন। নিউ ইয়র্কের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি রাসেলের নিয়োগ বাতিল করে দিলেন এই বলে যে তিনি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষকতা করার পক্ষে অনুপযোগী। পরে রাসেল আবার কাজ নিলেন বার্নেস ফাউণ্ডেশনে; কিন্তু সেখান থেকেও তাঁকে ওই একই কারণে বরখাস্ত করা হলো। আমেরিকার মতন দেশে রাসেলের এই যৌনমতবাদের যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে সহজেই অনুমেয় আমাদের মতন দেশে তা কতটা গ্রাহ্য হবে।

তবে রাসেলের যৌনমতের পরিণাম যাই হোক—প্রত্যেক সমাজেই যৌননীতিবোধ ও বাস্তবপরিস্থিতির মধ্যে এত পার্থক্য যে বাস্তবপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যৌননীতিবোধের মাপকাঠির পুনর্বিচারের প্রয়োজন ছিল। পরীক্ষামূলকভাবে এই কাজই রাসেল করতে গিয়ে দুর্নাম অর্জন করেছেন সত্য; তবে তাঁর যৌনমতামত সম্বন্ধে সঠিক রায় হয়তো ভাবীকাল ও সমাজ দিতে পারবে।

এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে সোভিয়েত দেশে যৌনসম্বন্ধের ব্যাপারে যাঁরা কাল্পনিক ধারণা পোষণ করেন, তাঁদের জানা উচিত যে সে দেশে নর-নারীর সম্পর্ক ইওরোপের অন্যান্য বুর্জোয়া দেশগুলির চেয়ে অনেক সংযত ও সুস্থ এবং বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যাও অনেক কম। তাই মনে হয় সোভিয়েত সমাজের যৌনমতই হয়তো ভাবীকালের সুস্থ যৌন-সম্পর্কের পথ নির্দেশ করবে।

রাসেল মূলত দার্শনিক। যদিও তাঁর অন্যান্য বিষয়ের মতামত তাঁর দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়। তবু তাঁর অন্যান্য বিষয়ের মতবাদের

মতন তাঁর দর্শনের মূলেও যেন দেখতে পাই একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মমুখীনতা ফুটে উঠেছে। অন্ লুউস তাই বলেছেন: রাসেল হলেন আঠার শতকের "aristrocratic individualist"।

শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত রাসেলের দর্শন-জীবনের ইতিহাস সুদীর্ঘ। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাঁর দার্শনিক মতামতের যে উদ্ভব হয়েছে তারও কাহিনী কম দীর্ঘ নয়। রাসেলের পিতামাতা দুজনেই লর্ড-পরিবারভুক্ত ছিলেন। রাসেলের পিতা কিন্তু ছিলেন নাস্তিক। তিনি চেয়েছিলেন ছেলের দীক্ষা হোক নাস্তিকতায়। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ইচ্ছাপত্রে দুজন নাস্তিক অভিভাবকেরও নাম উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু কোর্ট ইচ্ছাপত্রকে উড়িয়ে দিয়ে রাসেলকে ন্যস্ত করেছিল খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী ঠাকুরদা-ঠাকুরমার হাতে।

শৈশবে রাসেলের শিক্ষালাভ হয়েছিল নিজের বাড়িতেই। এগারো বছর বয়সে ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়তে পড়তে রাসেল অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন বিষয়টির নতুনত্বে। তাঁর পরবর্তী জীবনের গণিত প্রতিভার উন্মেষের উৎস হিসাবে ইউক্লিডের যুক্তিসজ্জাকে দায়ী করা যেতে পারে। বাড়ির গ্রন্থশালায় তাঁর কৈশোরের নিঃসঙ্গ দিনগুলি রাসেলকে গ্রন্থমুখ করে তুলেছিল। ধর্মবিষয়ক বই পড়তে প্রথমে তিনি বেশ ভালোবাসতেন। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসের ঘোর তাঁর বেশি দিন টেকে নি। সৃষ্টির প্রথম কারণের প্রচলিত যুক্তির ফাঁকিটাকে রাসেল ধরেছিলেন মিলের আত্মজীবনী পড়ে। "আমার পিতা একদিন বলেছিলেন যে 'আমাকে কে সৃষ্টি করেছেন ?'—এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই ; কারণ এর পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে 'ঈশ্বরকেই বা কে সৃষ্টি করল ?'—"মিলের এই তীক্ষ্ণ যুক্তির কথাগুলি পড়তে পড়তে রাসেল তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। কৈশোরে শেলি ছিলেন তাঁর মনের কবি। বায়রণে, টেনিসনে রাসেলের অনুরাগ ছিল না। রুশ লেখকদের মধ্যে টুর্গেনিভ তাঁকে খুব প্রভাবান্বিত করেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা তিনি বলেছেন—টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি তাঁর মনের উপর ছাপ ফেলতে পারে নি।

আঠেরো বছর বয়সে বাড়ির গ্রন্থশালা ছেড়ে রাসেল সোজা এসে ভর্তি হলেন কেম্ব্রিজে। সেখানে হেগেলীয় দার্শনিক জে. এম. ই. ম্যাক্‌ট্যাগার্ট, লোয়েস ডিকিনসন্, ট্রেভেল্যান, জি. ই. মুর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরবর্তীকালে মুর তাঁর দার্শনিক মতবাদকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিলেন।

এঁরা সকলেই তখন লালিত হচ্ছিলেন হেগেলীয় দর্শনের ছত্রছায়ায়। রাসেলও এঁদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু কেম্ব্রিজের প্রথম তিন বছর গণিতের বাইরে মন মেলবার তাঁর কোনো অবসর ছিল না। চতুর্থ বছরে তিনি দর্শনচর্চা শুরু করেছিলেন এবং ক্রমশ হেগেলে (কিছু পরিমাণে কান্টেও) তিনি আসক্ত হতে থাকেন।

রাসেল কেম্ব্রিজ ছাড়লেন ১৮৯৪ সালে। তারপর কিছুকাল তাঁর কাটে বিদেশে—প্যারিসের বৃটিশ দূতাবাসে তিনি চাকরী নিয়েছিলেন। চাকরী তাঁর ভালো লাগেনি। চাকরী ছেড়ে গেলেন বার্লিনে—সেখান থেকে আমেরিকায়। পরে ইংলণ্ডে ফিরে তিনি মন দিলেন দর্শন ও গণিতের গ্রন্থরচনায়।

নানা কারণে ১৮৯৮-এর পর থেকেই কান্ট ও হেগেলের মতবাদে তিনি আস্থা হারাতে লাগলেন। হেগেলের 'গ্রেটার লজিকে'র গণিত-প্রসঙ্গ তখন থেকেই তাঁর কাছে অর্বাচীন উক্তি বলে মনে হয়েছিল। তাঁর কেম্ব্রিজ-বন্ধু মুরও হেগেলান্ধ ছিলেন। কিন্তু হেগেলের প্রভাবের ঘোর কেটে মুর যখন বেরিয়ে এলেন, রাসেলও সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অনুসরণ করলেন। কান্টের বিরুদ্ধে তাঁর গ্রন্থ-সঙ্গী ছিলেন হারভার্ডের হোয়াইট হেড্‌। হোয়াইট হেডের সাহচর্যে তাঁর বিখ্যাত বই 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা' প্রকাশিত হলো। তর্কশাস্ত্র ও গণিতের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণের প্রচেষ্টা হিসাবে 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা' একটি অভূতপূর্ব ও চিরস্মরণীয় রচনা। অবশ্য এই বই-এর মর্মার্থ বোধহয় পৃথিবীর এক ডজন লোকও গ্রহণ করতে পারেন কি না তা বলা শক্ত।

এর পর তিনি একটির পর একটি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করতে লাগলেন। অন্তত বিশটির অধিক তাঁর দার্শনিক রচনা—তার প্রত্যেকটিই উল্লেখযোগ্য। রচনাশৈলীর চমৎকারিত্বে, যুক্তির সরসতায়, বক্তব্যের স্বচ্ছতায় তাঁর প্রত্যেক দার্শনিক রচনাই বহুজন উপভোগ্য। দ্বিতীয় যুদ্ধের শেষাশেষি তিনি লিখলেন 'এ হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলজফি'। এই বই-এ তিনি দেখালেন—একদিকে দার্শনিকদের চিন্তা সামাজিক অবস্থার ফল, অপরদিকে সেই দার্শনিক চিন্তাই আবার সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়া দার্শনিকদের মধ্যে দর্শনের ইতিহাস লেখায় প্রচেষ্টা রাসেলেরই প্রথম। এই রচনার পর ১৯৫০ সালে রাসেল পেলেন সাহিত্যের নোবেল

পুরস্কার। বলা বাহুল্য এই বই-এর পরিপ্রেক্ষিত কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি নয়। তবুও এ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনেক পরিমাণে সমাজসচেতনতা আছে।

কিন্তু রাসেল-দর্শনের মূল প্রচেষ্টা হলো: দর্শনে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিষ্ঠা করা।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার একদল দার্শনিক লাগলেন ভাববাদ-খণ্ডন-প্রচেষ্টায়। বিশেষ করে বার্কলির ভাববাদের কথা: বস্তু মনের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল—এর বিরুদ্ধেই সকলের জেহাদ। বস্তুর যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তা যে মানস-নির্ভর নয়—এই কথা প্রমাণ করার প্রচেষ্টাতেই বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা দল বেঁধে লাগলেন। মুর ছিলেন এই বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের নেতা, আর রাসেলও তাঁর দার্শনিক বন্ধু মুরের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন।

রাসেলের এই দার্শনিক জীবনের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে—তবে তাঁর শেষ ও পরিণত দর্শন হলো 'নব্য-বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ'। বস্তু ও মন নিয়ে এই দর্শন-আলোচনার শুরু। বিষয়টি অমূর্ত বলে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন; নয় তো রাসেলের দর্শন-দৃষ্টিভঙ্গিটি বোঝা যাবে না। তিনি বলতে চান—আমরা বস্তুকে সরাসরি জানতে পারি না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুর বিভিন্ন দিকের সাক্ষাৎ পাই। বস্তুর এই বিভিন্ন দিকগুলির নাম 'ইন্দ্রিয়োপাত্ত' বা sensedata। রাসেলের অতিপরিচিত উদাহরণটি নিলে বোধহয় কথাটা স্পষ্ট হবে। মনে করা যাক একটি টেবিল সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ ঘটছে। এখানে কি সম্পূর্ণ টেবিলটারই সন্ধান আমি পাচ্ছি? তা সম্ভব নয়। যখন টেবিলের এক পিঠ দেখছি, তখন কি অন্য পিঠ চোখে পড়ে? না, তা পড়ে না। তাই মন-নিরপেক্ষ টেবিল বাইরে থাকলেও—সে টেবিলকে যখন প্রত্যক্ষে আমি পাই তখন তার সম্পূর্ণটা একসঙ্গে পাই না। প্রত্যক্ষে যে জিনিসের প্রকাশ সে জিনিস মন-নিরপেক্ষ হলেও বহির্বস্তুর সমগ্র সত্তা নয়। যেটুকু প্রত্যক্ষ করা যায় সেটুকুর নামই ইন্দ্রিয়োপাত্ত। রাসেলও তাই ইন্দ্রিয়োপাত্ত-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন; ইন্দ্রিয়বোধের সময় যেটুকু সাক্ষাৎভাবে জানি তার নাম দেওয়া হয় ইন্দ্রিয়োপাত্ত। যেমন, রঙ, শব্দ, গন্ধ, কাঠিন্য ইত্যাদি। এই সব জিনিসকে সাক্ষাৎভাবে জানার সময় কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন প্রথম সংস্পর্শ ঘটে তাকে বলে সংবেদন। চোখে রঙ দেখলে রঙের সংবেদন ঘটে, কিন্তু তা বলে

বস্তু জিনিসটা সংবেদন নয়—সেটা ইন্দ্রিয়োপাত্ত। এখন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে যে ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি আমরা পাই সেগুলির সমষ্টি হয় ওই টেবিলটি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো: ইন্দ্রিয়োপাত্ত-এর সঙ্গে বহির্জগতের টেবিলটির সম্পর্ক কি? রাসেল এর উত্তরে বলেন: বহির্জগতের ওই বস্তুটি ন্যায়শাস্ত্রের সৃষ্টি, বাহ্যিক পদার্থ নয়। কিন্তু তা যদি না হয়, তা হলে বিভিন্ন মানুষ যেহেতু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্ত-এর সন্ধান পায়, সেই হেতু ইন্দ্রিয়োপাত্ত অতিরিক্ত বহির্বস্তু না মানলে স্বীকার করতে হবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জগতের অধিবাসী। আর সবগুলি জগতই সমান সত্য—কোনোটিই মিথ্যা নয়, কারণ রাসেলের মতে ইন্দ্রিয়োপাত্ত শুধু সত্য নয়, তার সত্তা মানস-নিরপেক্ষ। তা হলে প্রশ্ন হলো: সাধারণ মানুষ যে মনে করে তারা সবাই একই জগতে বেঁচে আছে, সেটা একটা প্রকাণ্ড কুসংস্কারমাত্র? রাসেল এর উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, এই এক জগতের ধারণাটা সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে পাওয়া বিভিন্ন জগতের একটা কাজ চালানোর মতো সমন্বয়; মূর্তভাবে সত্যিই একে পাওয়া যায় না; পাওয়া যায় নৈয়ায়িক বা লজিকের বিচারে।

রাসেলের জগৎ তাই লজিকের সৃষ্টি। আর লজিক যেহেতু মানুষের মনের সৃষ্টি সেহেতু রাসেলের জগৎকে শেষপর্যন্ত লজিক-মানসের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু একথা প্রচ্ছন্ন ভাববাদীদের কথা ছাড়া আর কি কথা? যে ভাববাদ খণ্ডনের এত প্রচেষ্টা, এত ঔৎসুক্য—শেষপর্যন্ত রাসেলের লজিকের পরিণতি সেই ভাববাদের কাছেই নতিস্বীকার?

রাসেলের দর্শনের এই দ্বন্দ্বের মূলেও হয়তো আছে তাঁর একটি আত্মকেন্দ্রিক মনের প্রবণতা। কিন্তু সে যাই হোক—রাসেলের শান্তির ব্যাপারে তাঁর এই আত্মিক দৃষ্টি উত্তীর্ণ। সেখানে তিনি বিশ্বমানবের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। সেখানে তাঁর দৃষ্টি উদ্ভাসিত—আর তাঁর দৃষ্টির দ্বারা আজ শান্তির পথও উদ্ভাসিত।

এই বিষয়ের বহু অংশ নিয়েই মতপার্থক্যের অবকাশ আছে। আমরা বিশদ আলোচনা আহ্বান করছি—সম্পাদক।

বাংলায় আফ্রিকা-চর্চা

অংশুকুমার দত্ত

যাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়, তাদের দেশ, ভূগোল, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনৈতিক অবস্থা ও ভাষা-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের স্বাভাবিক কারণে ঔৎসুক্য জাগে এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানে নিজ স্বার্থরক্ষায় জন্ম এইসব বিষয়ে চর্চা করতেই হয়। যে কোনো রকমের সম্পর্কের পক্ষে এ-কথা প্রযোজ্য। কারণ বন্ধুকে চেনা ও জানা যেমন প্রয়োজনীয়, শত্রুর পরিচয়ের তাগিদ তার থেকে কিছু কম নয়। বহির্বিশ্বে যে জাতি যত ছড়িয়ে পড়েছে; অন্য দেশ, অন্য জাতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ ও বৃদ্ধির সুযোগ তার তত বেশি মিলেছে। অবশ্য, ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির মান, কী ধরনের লোক বাইরে যাচ্ছে এবং ব্যক্তিবিশেষের আহৃত জ্ঞান জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগাবার কী ধরনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা আছে, তার ওপর নির্ভর করবে পূর্বোক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার কার্যত কতদূর হচ্ছে।

প্রাচীন গ্রীকরা ছিল সমুদ্রচারী বণিক ও দেশবিজেতা। অন্য দেশ ও জাতি সম্বন্ধে গ্রীকরা তাই যথেষ্ট জ্ঞান রাখত। মেগাস্থেনেসের ভারত-বৃত্তান্ত আমাদের কাছে সুপরিচিত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে অনেক অজ্ঞাতনামা গ্রীকলেখক-সংকলিত 'পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সি' নামক গ্রন্থ লোহিত-সাগর, পূর্ব আফ্রিকার উপকূল ও আরব সাগর সম্বন্ধে বহুমূল্য সংবাদের আকর। পরের শতাব্দীতে রোমক সম্রাট হাড্রিয়ানের রাজত্বকালে আলেকজান্দ্রিয়ায় রচিত ক্লডিয়ুস টলেমিয়ুস টলেমি-র ভূবৃত্তান্ত তো সে-যুগের সুপ্রসিদ্ধ ভূগোল।

সাম্রাজ্যবিস্তার ও শাসনের খাতিরে রোমক নাগরিকেরা গেছেন দেশ-বিদেশে। এঁদের অনেকে স্বীয় অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন। তার মধ্যে স্বয়ং জুলিয়াস সীজার প্রণীত 'ডি বেলো গলিকো' বা গলদেশীয় (ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত) যুদ্ধ অন্যতম।

আরব সভ্যতার সম্প্রসারণ-যুগে আরব পর্যটক, বণিক, শাসক ও পণ্ডিতেরা অন্য দেশ সম্পর্কে বহু বিবরণ রেখে গেছেন। তার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আল বেরুনী এবং পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে এল. বেকরী ও এল. কজরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সর্বশেষে, ইওরোপের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগে ইওরোপীয় পর্যটক, বণিক, ধর্মপ্রচারক, শাসক ও বৈজ্ঞানিকদের অবদানের উল্লেখ নিশ্চয়ই বাহুল্যমাত্র।

দুই

বাঙলায় যে যথেষ্ট আফ্রিকা-চর্চা হয়নি, তার একটা বড় কারণ বঙ্গদেশের সঙ্গে আফ্রিকার যোগাযোগ অকিঞ্চিৎকর। ইওরোপের অধিবাসীরা আফ্রিকায় গেছে বাণিজ্য, শাসন ও ধর্মপ্রচারে। এমন কি, ভারতের অন্য প্রদেশের অধিবাসীরাও অর্থোপার্জনার্থে আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি করেছে। গত একশ বছরে সিন্ধি, গুজরাটি ও পাঞ্জাবীরা পূর্ব আফ্রিকায় এবং গুজরাটি ও তামিলেরা দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রধানত শ্রমিক ও ব্যবসায়ী হিসাবে গেছে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক বাঙালীরা বেশি সংখ্যায় আফ্রিকা মহাদেশে যায় নি, স্থায়ীভাবে বসতি করা তো দূরের কথা। অবশ্য, ব্যক্তিগতভাবে কিছু লোক যে একেবারে না গেছে, তা নয়। এই নিবন্ধের পরবর্তী অংশে বাংলা পুস্তকতালিকায় উল্লিখিত একটি গ্রন্থের লেখক শ্রীশ্যামলাল মিত্র ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের মিশর-অভিযানে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীমিত্র মিশরে অনেক ভদ্রলোকের আতিথ্যে আপ্যায়িত হন এবং কথায় কথায় প্রকাশ পায়, গৃহস্বামী বাঙালী ব্রাহ্মণ। কৈশোরে দেশ ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে মিশরে এসে সেখানেই বিয়ে করে স্থায়ীভাবে সংসার পাতেন। কিন্তু এই সব ঘটনা বিচ্ছিন্ন এবং সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

প্রশ্ন উঠবে, গুজরাটি, পাঞ্জাবী ও তামিলেরা অনেকে আফ্রিকায় যাওয়ার ফলে কি তাদের ভাষায় আফ্রিকার দেশ, জাতি, ভাষা, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে? তামিল সম্পর্কে কিছু বলা মুস্কিল। কিন্তু যতদূর জানি, গুজরাটি ও পাঞ্জাবীতে আফ্রিকা-চর্চা খুব বেশি এগিয়েছে বলে মনে হয় না।

অথচ গুজরাট ও পাঞ্জাবে আফ্রিকা-জিজ্ঞাসু পাঠকের সংখ্যা নেহাত কম

হওয়ার কথা নয়। ব্যবসায় ও চাকরীব্যপদেশে এই দুই প্রদেশ থেকে বহু লোক আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে গেছে। অতএব, নিজেদের স্থূল বৈষয়িক স্বার্থেই আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর রাখা তাদের প্রয়োজন। এ-প্রয়োজন অবশ্য অংশত মেটে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাবিনিময়ে, মৌখিক আলাপ-আলোচনায়। বাকি যেটুকু থাকে তার দাবি মিটিয়েছে ইংরাজি পত্রপত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা। ইংরাজি ভাষার প্রভুত্ব সর্বক্ষেত্রেই ভারতীয় ভাষাগুলির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল বা এখনও আছে। আফ্রিকা-চর্চাও তার ব্যতিক্রম নয়।

বাঙলাসাহিত্য অবশ্য ইংরাজি-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রগতির পথে কিছুটা এগিয়েছে। তবু তত্ত্ব ও তথ্যপ্রধান যে কোনো বাঙলা বইকে ইংরাজি বই-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। ইংরাজি বই-এর উৎপাদনব্যয় বেশি হলেও তার বাজার বিশ্বব্যাপী। অর্থাৎ ইংরাজি গ্রন্থ-প্রকাশকের আর্থিক সম্পত্তির সঙ্গে এদেশের প্রকাশকদের মূলধনের তুলনা হয় না। ইংরাজি প্রকাশক বহু অর্থব্যয়ে তথ্য ও তত্ত্ববহুল গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করার ঝুঁকি নিতে পারেন। কারণ তাঁর ক্রেতারা সংখ্যায় অনেক বেশি। বাঙলা-পুস্তকব্যবসায়ীর পক্ষে যেটা সম্ভব তা হচ্ছে উৎকর্ষ সম্বন্ধে মাথা না ঘামিয়ে, বই-এর দাম কম করা, যাতে বাঙলাভাষী লোকের কাছে এর বিক্রয় বেশি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও অসুবিধা আছে। এখনও বাঙলাদেশের সঙ্গে আফ্রিকার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নগণ্য। এবং সামান্য কয়েক বছর আগে পর্যন্ত আফ্রিকা-জিজ্ঞাসু বাঙালীর সংখ্যা ছিল একান্ত অল্প। তাই একেবারে রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার ও শিকারকাহিনী ছাড়া অন্য বই-এর চাহিদা একরকম ছিল না বললেই চলে। এ ছাড়া, আফ্রিকার নৃতত্ত্ব, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গুরুতর রচনা এখনও ভাষাগত কারণে দুরূহও বটে।

তিন

এতক্ষণ আমরা ধরে নিয়েছিলুম বাঙলায় আফ্রিকা-চর্চা প্রায় হয় নি। এবার তার সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা যাক। দেখা যাবে, বাঙলাভাষায় আফ্রিকা সম্পর্কিত বই-এর সংখ্যা খুব কম। তার ওপর, নির্ভুলতা, তথ্য-বহুলতা,

বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার-বিশ্লেষণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এইসব বই আরও অনেক উৎকর্ষের দাবি রাখে।

আফ্রিকা সম্বন্ধে বাংলাভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর এক তালিকা লেখকদের নামের বর্ণানুক্রমে নিচে দেওয়া হলো। এই তালিকা-প্রণয়নে কলকাতার জাতীয় পাঠাগারের গ্রন্থতালিকা, বৃটিশ মিউজিয়াম পাঠাগারের মুদ্রিত বাঙলা গ্রন্থের তালিকা (মোট তিন খণ্ড, ১৮৮৬, ১৮৮৬—১৯১০ ও ১৯১১—১৯৩৪) এবং বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার ১৯৬০ সালের পুস্তকতালিকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য, এতে যে তালিকার অসম্পূর্ণতা ঘুচেছে এমন দাবি কেউ করবে না।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ [কলিকাতা—১৯৩১]
গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। পৃথিবীর ইতিহাস : ৮ম খণ্ড—মিশর [কলিকাতা—১৯২৩]
চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ। প্রাচীন মিশর [কলিকাতা—?]
দত্ত, কালীপ্রসন্ন। বুয়র যুদ্ধ [কলিকাতা—১৯০২]
প্রিনসেপ, জেমস। প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় [কলিকাতা—১৮৩০]
বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা। আফ্রিকার চিত্র [কলিকাতা—?]
বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র। বিদ্যাকল্পদ্রুম···ইজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত : 'এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস'-এর ষষ্ঠ খণ্ড [কলিকাতা—১৮৪৭]
বসাক, নীলমণি। ইতিহাস সার (অর্থাৎ···ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত) [কলিকাতা—১৮৫৯]
বসু, কৃষ্ণদয়াল। ডেভিড লিভিংস্টোন [কলিকাতা—?]
বিশ্বাস, রামনাথ। মাউ মাউ-এর দেশে [কলিকাতা—?]
ঐ । দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা [কলিকাতা—?]
ঐ । ভয়ঙ্কর আফ্রিকা : ১ম ও ২য় খণ্ড [কলিকাতা—?]
মিত্র, শ্যামলাল। মিশরযাত্রী বাঙালী [কলিকাতা—১৮৮৪]
মুখোপাধ্যায়, অসিত ও চক্রবর্তী, মধুসূদন। আবিসিনিয়া [কলিকাতা—১৯৩৫]
মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীরাজ। আবিসিনিয়া ও ইটালী [কলিকাতা—১৯৩৬]
মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ ও মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ। বুয়র ইতিহাস [কলিকাতা—১৯০০]
সরকার, বিনয়কুমার। বর্তমান জগৎ : ১ম ভাগ—মিশর [কলিকাতা—১৯১৫]

সর্বাধিকারী, দেবপ্রসাদ। দক্ষিণ আফ্রিকা যৌত্য কাহিনী [কলিকাতা—১৯৩৫]
সেন, চাণক্য। ধীরে বহে নীল [কলিকাতা—১৯৫৮]

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে দু-টি অনুবাদ। একটি গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের কাহিনী, অপরটি জেমস প্রিনসেপ সংকলিত প্রাচীন ইতিহাসের অনুবাদ। ভ্রমণকাহিনী ছ-টি, তার মধ্যে তিনটি রামনাথ বিশ্বাসের লেখা। বাকি তিনটি ভ্রমণকাহিনী নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের মিশর ভ্রমণকাহিনী নিছক গতানুগতিক পিরামিড দর্শন ও প্রাসাদোপম হোটেলে রাত্রিবাসের কাহিনীই নয়। সারা গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে অনেক সারগর্ভ আলোচনা। পাঠকের চমক লাগবে লেখকের বহু বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যে। শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভ্রমণকাহিনী উল্লেখযোগ্য তার ঐতিহাসিক গুরুত্বে, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে লেখককে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সেদেশে পাঠানো হয়। শ্যামলাল মিত্রের 'মিশরযাত্রী বাঙালী' বইটি পড়তে রোমাঞ্চকর কাহিনীর মতো লাগে কারণ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মিশর-অভিযানে অংশগ্রহণকারী বাঙালী সৈনিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এতে আছে। বইটির প্রকাশক ভূমিকায় লিখছেন, "বাঙ্গালাভাষায় এরূপ ধরণের পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের লেখক ভিন্ন কোনও বাঙ্গালী এ পর্যন্ত সমুদ্রপার হইয়া দূরদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন নাই।"

গ্রন্থপঞ্জীতে মোট আটখানি বই আছে মিশর সম্বন্ধে। তার মধ্যে ছ-খানি মিশরের ইতিহাস বিষয়ে আর দু-খানি ভ্রমণ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ। এ ছাড়া গত শতাব্দীর শেষে বুয়র যুদ্ধের সময় দু-খানি এবং ১৯৩৫ সালে শুরু ইতালো-ইথিওপীয় যুদ্ধের সময় দু-খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেগুলিও আমরা তালিকাভুক্ত করেছি।

তালিকায় আরও কিছু নাম দেওয়া যেত: রোমহর্ষক শিশুপাঠ্য দুঃসাহসী কাহিনীর। কিন্তু এইসব কাহিনীর বাস্তব ভিত্তির একান্ত অভাব এবং আফ্রিকা-চর্চায় এদের প্রয়োজনও বিশেষ নেই। বরং শিশুদের গ্রহিষ্ণু মনে নানা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে এরা বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বোপরি, পূর্বোক্ত তালিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর ও ইথিওপিয়া সম্বন্ধে পুস্তকের বিপুল সংখ্যাধিক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ স্বাভাবিক। মিশরে বিকশিত হয়েছে পৃথিবীর

প্রাচীনতম সভ্যতা। তাই সেদেশকে বাদ দিয়ে মানুষের বিবর্তনের গতি বোঝা যায় না। আর ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইথিওপিয়ায় ইতালীর বর্বরোচিত আক্রমণের তরঙ্গ যে বাঙলায় মননশীল মহলে এসে লাগে তার প্রমাণ ঊর্ধ্বোল্লিখিত বই দুটি। কিন্তু এই দেশ তিনটি বাদে পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় যে বিরাট ভূখণ্ড পড়ে রয়েছে, যার আয়তন ভারতবর্ষের কয়েক গুণ, তার সম্বন্ধে পুস্তকের একান্ত অভাব।

জেমস প্রিনসেপ প্রণীত ও স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮৩০ সালে প্রকাশিত 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়'-এর প্রথম পরিচ্ছেদে মিশরীয়দের সম্বন্ধে আলোচনাটিই বোধহয় বাংলাভাষায় আফ্রিকা সম্পর্কে প্রথম রচনা। আসলে এটি ইংরাজিভাষায় রচিত এবং এর বঙ্গানুবাদ করেন হিন্দু কলেজের তরুণ কর্মীরা ও চুঁচুড়ার পিয়ার্সন সাহেব। এদেশের ছাত্রদের জন্য রচিত, তাই মিশরের ভৌগোলিক বর্ণনা, অধিবাসীদের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার, ধর্ম, সমাজ এবং ইতিহাসের সঙ্গে আছে প্রতি অধ্যায়ের বক্তব্যের ওপর সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী। আর আছে ছাত্রদের নৈতিক মান উন্নত করার জন্য প্রতি অধ্যায় থেকে গ্রহণযোগ্য উপদেশ। কয়েকটি উপদেশের নমুনা:

"লিপি বিদ্যাবিষয়ে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের উচিত, কি অন্য না, তাহাতে পূর্ব বৃত্তান্ত সমস্ত আমরা জানিতে পারিতেছি; আর ছাপা বিদ্যাতে ও কৃতার্থ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করা কর্তব্য, কারণ তাহাতে ঐ সকল ইতিহাস পুস্তক আমরা প্রত্যেক জন অল্পমূল্যে পাইতেছি।" [পৃষ্ঠা ৬৫]

মিশরীয় সভ্যতার মহৎ কীর্তির ধ্বংসের প্রতি তরুণ ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখক বলছেন:

"দেখ, যাহারা ঐ ২ নগরের পত্তন করিয়াছিল, এবং যতলোক সেই ২ স্থানে বাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে; তদ্রূপ অল্প দিবসের পর আমাদের এই মাটির দেহ মাটিতে মিশাইয়া যাইবে; অতএব লোকান্তরে গমন করিতে প্রস্তুত থাকা আমাদের কর্তব্য কি না।" [পৃষ্ঠা ৬৫]

অন্যত্র:

"বিচারকর্তাকে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে যে কতকগুলি কথা লেখা গিয়াছে, তাহাতে এই বোধ হয়, যে মিশর দেশের লোকেরা রাজ্যের ন্যায় বিচার করা ও

সত্যকথা কহা যে কেমন উচিত কর্ম তাহা জানিত; ইহাতে এই বড় খেদের বিষয়, যে এতদ্দেশে (বঙ্গদেশে) প্রায় সকলেই বাল্যকালাবধি মিথ্যাবাক্য কহিয়া কালযাপন করে।" [পৃষ্ঠা ৬১]

সে যুগের মানদণ্ডে 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়'-এর আলোচনা হয়তো নিম্নস্তরের নয়। কিন্তু তার সত্তর বছর পরে প্রকাশিত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত 'সচিত্র বুয়র ইতিহাস'-এ যুক্তিহীন, অর্থহীন, অপ্রাসঙ্গিক অর্ধসত্যের ভিড়। এর অযৌক্তিকতার কিছু নিদর্শন এখানে উপস্থিত করা যাক।

বুয়রদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে লেখকদ্বয় বলছেন: বুয়রদের "শয়ন করিবারও কিছুমাত্র স্থান নির্ণয় নাই, যাঁহার যে স্থানে ইচ্ছা, তিনি সেই স্থানেই মেজের ওপর পড়িয়া থাকেন।......একবার ইঁহারা যে বস্ত্র পরিধান করেন, তাহা মাসাবধির মধ্যে প্রায়ই আর পরিবর্তন করেন না।" [পৃষ্ঠা ১৪৭]

'সচিত্র বুয়র ইতিহাস'-এর ঐতিহাসিক গবেষণার নিদর্শনস্বরূপ অন্য একটি উল্লেখ্য অনুচ্ছেদ:

"বুয়রদের বিশেষত বুয়র স্ত্রীলোকদিগের একটু বেশ 'হাতটান' রোগ আছে।......স্ত্রীলোকগণ দোকান হইতে কোনো দ্রব্য ক্রয় করিবার সময় প্রায়ই কিছু না কিছু দোকানদারগণের বিনানুমতিতে আপন আপন পকেটে রাখিতে ত্রুটি করেন না। দোকানদারগুলিও প্রায় অতিশয় চতুর হয়; কি কি দ্রব্য বুয়র রমণীগণ অপহরণ করিতেছেন দোকানদারগণ তাহার দিকে বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখে। কিন্তু কিছু না বলিয়া রমণী যে দ্রব্য খরিদ করেন, তাহার বিলের সহিত অপহৃত দ্রব্যগুলিরও মূল্য লিখিয়া দেয়; বুয়র রমণীও আর কোনো কথা বলিতে সাহস না করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে অপহৃত দ্রব্যগুলিরও মূল্য প্রদান করিয়া থাকেন।" [পৃষ্ঠা ১৫৩]

এমন ইতিহাস চর্চায় মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বাংলাভাষায় যে আফ্রিকা সম্বন্ধে তথ্যমূলক ও যুক্তিনিষ্ঠ গ্রন্থ একেবারে রচিত হয় নি তা নয়। কালীপ্রসন্ন দত্ত লিখিত 'বুয়র যুদ্ধ' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এর আলোচ্য বিষয় দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস। লেখকের অবশ্য বুয়র-বৃটন দ্বন্দ্বে খানিকটা বৃটিশপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা আছে। তা সত্ত্বেও এটি স্থূল প্রচারধর্মী হয়ে ওঠে নি। বরং স্বীয় মতের সমর্থনে লেখক তথ্যপ্রমাণ দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ

হলো বুয়র যুদ্ধের ঘটনা। তাছাড়া, পরিশিষ্টে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : স্যাণ্ড নদী কনভেনশন (১৮৫২), প্রিটোরিয়া কনভেনশন (১৮৮১) এবং বাংলা ১৩০৯ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'বুয়ার নীতি'।

পূর্বোক্ত তালিকা থেকে আমরা একথাও বুঝতে পারি যে বাংলায় আফ্রিকা-চর্চা অবিচ্ছিন্ন ধারায় হয় নি। লণ্ডনের ইণ্টারন্যাশনাল আফ্রিকান ইনস্টিটুট ও রয়্যাল এম্পায়্যার সোসাইটি কিংবা পারীর ম্যুসে দ লম্-এর মতো কোনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে নেই। যেটুকু কাজ হয়েছে, তার কৃতিত্ব তথা দায়িত্ব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার এবং তার প্রগতি স্বভাবতই সবিরাম ও অনিয়মিত হতে বাধ্য। আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সমস্যা উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর প্রায় অধিকাংশের প্রেরণা যুগিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের বর্ণসমস্যা ও ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের শোচনীয় অবস্থাকে কেন্দ্র করে তিনটি বই লেখা হয়েছে। ইঙ্গ-বুয়র যুদ্ধ দুটি, ১৮৮২ সালের বৃটিশবাহিনীর মিশর-অভিযান একটি এবং ইতালো-ইথিওপীয় যুদ্ধ দুটি পুস্তকের বিষয়বস্তু। রামনাথ বিশ্বাসের একটি ভ্রমণ-কাহিনী কেনিয়ার 'মাউ মাউ' বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত। শ্রীচাণক্য সেনের 'ধীরে বহে নীল' মিশরীয় জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আরবজগতে বৃটিশপ্রভুত্ব অবক্ষয়ের কাহিনী।

উল্লিখিত রচনাবলীতে রাজনীতি ও ইতিহাসের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ ছাড়া, বাকি সবগুলিই প্রায় পূর্বোক্ত পর্যায়ের। অর্থাৎ ভাষান্তরে আফ্রিকার ভূগোল, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাভাষায় কোনো আলোচনা হয় নি বললেই চলে। আর আফ্রিকা দূরে থাক, ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশ সম্বন্ধে এ ধরনের আলোচনা বাংলাভাষায় কতই বা হয়েছে!

চার

এতক্ষণ বাংলাভাষায় আফ্রিকা-চর্চার কথা বলা হল। এবার বাংলাদেশে আফ্রিকা-চর্চার প্রসঙ্গে আসা যাক। যে কারণে বাংলাভাষায় আফ্রিকা-চর্চার সুযোগ সীমিত, কিছুটা সেই কারণে বাংলাদেশে আফ্রিকা সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও গবেষণা অনগ্রসর। অবশ্য উত্তর আফ্রিকার মুসলমান-প্রধান

আরব দেশগুলি (বিশেষ করে মিশর) ঐস্লামিক কিংবা আরব-ইতিহাসের প্রতি আমাদের কিছুটা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তেমনি কমনওয়েলথের ইতিহাসের কল্যাণে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন সম্পর্কে নাতিগভীর জ্ঞান আমরা রাখি। কিন্তু তথাকথিত 'নিগ্রো' আফ্রিকার মানুষ ও তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা বা চর্চা বিশেষ হয় নি বা হয় না বললেই চলে। ইদানিংকালে অবশ্য কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধিৎসায় আফ্রিকা সম্বন্ধে ইংরাজিতে গ্রন্থরচনা করেছেন কিংবা প্রবন্ধ লিখেছেন। তার মধ্যে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'আফ্রিকানিজম্' বইটি উল্লেখযোগ্য। যোগাযোগের অভাবই বোধহয় এই ব্যর্থতার একমাত্র কারণ নয়। বাংলাদেশের সঙ্গে জাপানের কী বা যোগাযোগ? অথচ 'দূর প্রাচ্য' বা 'পূর্ব এশিয়া' কলকাতা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়ে থাকে। যোগাযোগ ছাড়া তাই আঞ্চলিক গুরুত্বও উল্লেখনীয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একদিন আফ্রিকার ভূমিকা ছিল অকিঞ্চিৎকর। তাই তার পঠন-পাঠনে এত কার্পণ্য। অবশ্য ভারতের বিদেশী শাসকদের কাছে আফ্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য তত্ত্বের প্রয়োজন যে একেবারে ছিল না তা নয়। কিন্তু তার জন্য তো লণ্ডনে রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল আফ্রিকান ইন্সটিট্যুট, রয়্যাল এম্পায়্যার সোসাইটি এবং কলোনিয়াল অফিস।

পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের প্রতিফলন পাওয়া গেল ১৯৫৭ সালে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগে 'বর্তমান আফ্রিকা' নামক একটি ঐচ্ছিক বিষয় প্রবর্তনে। দুঃখের বিষয়, তিন বছর বাদে এই পাঠ্যক্রম উঠিয়ে দেওয়া হয়। অধুনা, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিপার্টমেন্ট অফ আফ্রিকান স্টাডিজ' ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে আফ্রিকা-তত্ত্বের পঠন-পাঠন ও গবেষণা চলছে বলে মনে হয় না।

অথচ, আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বাড়তির পথে। শ্রীনেহরু যে 'শান্তি এলাকা'র কথা বলেন আফ্রিকায় তার সম্প্রসারণের প্রচুর সুযোগ বর্তমান। এ ছাড়া পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় দশলক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত আফ্রিকাবাসীদের কথা ভুললে চলবে না। একে একে এই সব দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ভারতীয় বাসিন্দাদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে। এক কথায়, আজ না হোক কাল আফ্রিকাচর্চা করেছে এমন বহু লোকের প্রয়োজন আমাদের হবে। ভবিষ্যতের এ-দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি আজ থেকেই করা উচিত।

কিন্তু তার আয়োজন কোথায়?

আকাশ মাটি ও সূর্য

শঙ্কর চক্রবর্তী

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐদিন একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুৎনিক তিন স্তরবিশিষ্ট এক রকেটের মাথায় চাপিয়ে সর্বপ্রথম মহাকাশে পাঠালেন রুশ বিজ্ঞানীরা। তারপর রাশিয়া ও আমেরিকা—দুই দেশের বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আরো বহু স্পুৎনিক মহাকাশে উঠেছে, মহাকাশযাত্রী মানুষেরা বারকয়েক পৃথিবী পরিক্রমা করে নিরাপদে আবার পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছেন।

গোড়ার কথা

এই বৃহৎ ঘটনাপঞ্জীর আগেও রকেটেরা হানা দিচ্ছিল—তবে নিতান্তই বায়ুমণ্ডলের এলাকায়। কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে ওপরে ওঠা ও নামার সময় বায়ুর ঘনস্তরের সঙ্গে ঘর্ষণে জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হওয়া—এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই প্রাথমিক রকেটগুলোর জীবন। তারই ফাঁকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির কলকাঠির নাড়াচাড়ায় ওপর আকাশের বায়ুর ঘনত্ব, চাপ, গঠন ও সূর্যদেহজাত রশ্মির প্রাথমিক চরিত্র সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগৃহীত হত, বেতার-ঢেউয়ের মাধ্যমে তারা এসে পৌঁছত বিজ্ঞানীদের গবেষণামন্দিরে।

এরকম ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীরা খুশি হচ্ছিলেন না। অনেক বড়ো প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও তাঁদের জানা হয় নি। যেমন, পৃথিবীর জলবায়ু সত্যি সত্যি বদলাচ্ছে কি? সূর্যের আলো ও তেজ পৃথিবীর বাতাস ও সমুদ্র কিভাবে ভাগ করে নেয় নিজেদের মধ্যে? মেরুঅঞ্চলের জমাটবাঁধা বরফের স্তূপ গলতে কি পারে কোনোদিন? বরফাবৃত কুমেরু মহাদেশ বা অ্যান্টার্কটিকা পৃথিবীর আবহাওয়াকে প্রভাবিত করছে কি? সামুদ্রিক ঝড়ঝঞ্ঝা উপকূলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই খবরটা জানা যায় কিভাবে? পৃথিবীর সব অঞ্চলের আবহাওয়ার খবর আগে থেকেই

বলে দেওয়া কি সম্ভব নয়? মহাকাশের গহন অভ্যন্তর থেকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় যে মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে, কোথা থেকে আসে তারা? অতিতপ্ত ঊর্ধ্বাকাশে আয়নমণ্ডল গড়ে ওঠার পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে? মহাদেশগুলো কি আসলে মহাসাগরের বুকে ভেসে বেড়ায়? পৃথিবী কি সূর্যের করোনা (corona) বা আবহমণ্ডলের জালে বাঁধা পড়ে আছে? অ্যান্টার্কটিকা সত্যিই কি একটি মহাদেশ না বরফাবৃত কতকগুলো দ্বীপের সমষ্টি?

বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সঠিকভাবে পৃথিবীর জল, মাটি ও আকাশের এলাকা সম্বন্ধে অতি অল্প খবরই আমরা আয়ত্ত করতে পেরেছি। অসীম মহাকাশের বুকে কি এক অজানা রহস্যের রোমাঞ্চ—তার বৈজ্ঞানিক ছবিটি কতটুকু উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আমাদের কাছে?

এ যেন বিরাট এক নাটমঞ্চ জুড়ে অগণিত ঘটনার সমাবেশ, আর পৃথিবীর মানুষ অবাকবিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তারই দু-একটা টুকরো ছবি দেখে চলে। সে অল্প দেখায় তার তৃপ্তি নেই। মহাকাশের প্রাণঘাতী রশ্মির যাত্রাপথে বায়ুমণ্ডল এক রক্ষীদুর্গের মতো দাঁড়িয়ে আছে—যাদের সরাসরি সংঘাতে সমগ্র প্রাণীজগৎ মৃত্যুর শিকারে পরিণত হতো। কিন্তু বায়ুর তলায় পরমনিশ্চিন্ত আরামের যে কালযাপন, সে যেন ঘরবন্দী জীবন। যেখানে বসে ঘরের বাইরের জীবনের সঙ্গে ঘরের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টায় বড়ো কিছু সম্ভাবনা নেই। জানালাটা তার বড়ো ছোট, বাইরের খবর বেশি পৌঁছায় না। তার জন্যে প্রয়োজন ঘরের ছাদরূপী এই আকাশটার বাইরে গিয়ে মহাকাশের পটভূমিতে ঘর বা পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করা। আর সে সন্ধানেই মিলবে মুক্তো।

আ-ভূ-বর্ষ

মাতা পৃথিবীকে ব্যাপকভাবে দেখার এক বিরাট দৃষ্টি সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করে দিল এই স্পুৎনিকেরা। কিন্তু মহাকাশের বুকে এই যে প্রাথমিক জয়যাত্রা—তা কিন্তু বিজ্ঞানীদের একটা বিচ্ছিন্ন কার্যসূচী নয়। এ ছিল পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ, যার নাম আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞান বর্ষ (International Geophysical Year),

সংক্ষেপে আ-ভূ-বর্ষ। ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর—মোট এই আঠারো মাসব্যাপী ছিল আ-ভূ-বর্ষের কার্যকাল। পৃথিবীর ৬৭টি দেশের দশ হাজারের বেশি বৈজ্ঞানিক এই পরিকল্পনাকে রূপদান করার জন্তে কাজে নেমেছিলেন। এ উপলক্ষে সারা পৃথিবী জুড়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার তৈরি হয়েছিল দু হাজারের বেশি।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্ত ছিল পৃথিবী সম্বন্ধে অজানা প্রশ্নগুলোর সমাধানের একটা চেষ্টা এবং পুরনো জ্ঞান ও তথ্যগুলোর সংস্কারের মধ্যে দিয়ে এই পৃথিবীর সূর্য ও মহাকাশকে ভালো করে জানা। শুধু পৃথিবীকে জানার বিষয়বস্তুগুলোই এত বড়ো যে একটি দেশের মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায় সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। তার জন্তে প্রয়োজন সারা পৃথিবীর মহাদেশ, মহাসাগর ও বরফের এলাকা জুড়ে অগণিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা এবং সমস্ত লব্ধ তথ্যকে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণামন্দিরে পাঠানো। সেখানে তাদের বিশ্লেষণ চলবে দীর্ঘদিন ধরে। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ছাড়া এতবড়ো কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে না।

রাজনৈতিক স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যেও যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এরকম একটি ব্যাপক পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্তে সচেষ্ট হয়েছিলেন, পৃথিবীর মানুষ হিসেবে এজন্তে আমরা সবাই গর্ব অনুভব করি।

সুষ্ঠুভাবে রূপ দেবার জন্তে সমগ্র পরিকল্পনাকে তেরোটি গবেষণাক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছিল। তাদের নাম হলো:

১ Glaciology [হিমবাহ ও বরফবিজ্ঞান]

২ Oceanography [সমুদ্রবিজ্ঞান]

৩ Meteorology [আবহবিজ্ঞান]

৪ Solar activity [সৌরদেহের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া]

৫ Aurora and Airglow [মেরুজ্যোতি ও নৈশাকাশদীপ্তি]

৬ Cosmic Rays [মহাজাগতিক রশ্মি]

৭ Ionospheric Physics [আয়নমণ্ডলসংক্রান্ত পদার্থবিজ্ঞান]

৮ Geomagnetion [ভূ-চৌম্বকত্ব]

৯ Gravity [মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব]

১০ Seismology [ভূকম্পনতত্ত্ব]

১১ Redioactivity Studies [তেজস্ক্রিয়তাসংক্রান্ত গবেষণা]

১২ Latitudes, Longitudes and Measurements of the Earth [অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা ও পৃথিবীর বিভিন্ন পরিমাপ-সংক্রান্ত গবেষণা]

১৩ Rocket and Satellite Exploration of the Upper Atmosphere [রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশ-সংক্রান্ত গবেষণা]

বিরাট পটভূমি জুড়ে এতবড়ো তথ্যসংগ্রহপর্ব পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে কখনো ঘটে নি। সমগ্র ঘটনাচক্রের নায়ক হলেন সূর্যদেব। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গেই সূর্যদেবের বিভিন্ন ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার একটা নিগূঢ় যোগাযোগ বহুদিন ধরেই বিজ্ঞানীদের নজরে পড়ছিল। প্রতি এগারো বছর অন্তর অন্তর বিশেষ করে দেখা যেত, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রটা হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে পরিবর্তনশীল আর গোলমেলে হতে চাইছে। মেরুঅঞ্চলে চলাচলকারী জাহাজ আর বিমানের কম্পাসের কাঁটা অনড় হয়ে পড়ছে—ফলে দিগ্‌নির্ণয়ের স্থিরতা হারিয়ে নৌ-বিমান চলাচলব্যবস্থা বিপদ্‌সঙ্কুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হারিকেন আর সাইক্লোন সৃষ্টি হচ্ছে মহাসাগরের বুকে ও প্রচণ্ড ধ্বংস আর মৃত্যুর রূপে এসে আছড়ে পড়ছে মাটির ওপরে। পৃথিবীর এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশ পর্যন্ত বেতার-চেউয়ের আদানপ্রদান ব্যবস্থা মাঝপথে কোথায় যেন তার ঠিকানাকে হারিয়ে বসে আছে। আরো ছোটবড়ো নানা পরিবর্তন সম্বন্ধে অনুসন্ধানরত বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন, সকলের কার্যকারণের মূলে রয়েছে সৌরকলঙ্ক (sunspots)—সৌরদেহের একটি ঘটনা। এ প্রসঙ্গে সূর্যের অন্দরমহলের খানিকটা পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

সূর্য

সূর্যদেহকে মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। একটি রঙীন কাঁচের মধ্যে দিয়ে সূর্যের দিকে তাকালে যে নির্দিষ্ট গোলকটি চোখে পড়ে—সেটি প্রথম স্তর, নাম ফোটোস্ফিয়ার বা আলোকমণ্ডল। সূর্যের যাবতীয় তেজ আর আলোর সৃষ্টি এখানেই। এই মণ্ডলের উপরিভাগে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে কালো কালো কতকগুলো জায়গা—সৌরকলঙ্ক। ওরা

কোনো গর্ত নয়। ওদের তাপমাত্রা ৫৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর ওদের আশেপাশের অন্য জায়গার তাপমাত্রা হলো ৬০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাপমাত্রার এই স্বল্প তারতম্যের জন্মেই ওদের কালো দেখায়। সূর্যের কেন্দ্রের তাপ অবশ্য চার কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এক একটি সৌরকলঙ্ক আয়তনে এতবড়ো হয় যে প্রায় একশো পৃথিবীকে স্বচ্ছন্দে পুরে ফেলা যায় তার মধ্যে। ওদের সৃষ্টির কার্যকারণ নিয়ে তর্কের শেষ আজো হয় নি। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, আলোমণ্ডলের আভ্যন্তরীণ চৌম্বক-ক্ষেত্রজাত বিরাট কোনো আলোড়নের ওরা হলো বহিঃপ্রকাশ। সৌরকলঙ্কের চারপাশের তড়িৎচৌম্বকীয় পরিবর্তন প্রভাব বিস্তার করে সূর্যের দ্বিতীয় স্তরে, যার নাম ক্রোমোস্ফিয়ার। সেখানকার তাপ, বৈদ্যুতীকরণ ও আন্দোলন বেড়ে ওঠে। সৃষ্টি হয় সৌরদীপ্তি (Solar Flares) ও সৌরোৎক্ষেপ (Solar Prominences)। তারই সঙ্গে সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতি নিয়ে অস্মান বেগুনীপারের আলো, মহাজাগতিক রশ্মি ও তুলনায় অনেক কম গতিযুক্ত সৌরকণিকা। জীবদেহের ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকটির প্রভাব প্রাণঘাতী। এই রশ্মি ও কণিকার কিছু অংশ ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে আর কিছু অংশ প্রবেশ করে সূর্যের তৃতীয় স্তর—করোনা বা কিরীটিকার মধ্যে। সূর্যের আবহমণ্ডল যেন এটি। একটি পাতলা চাদরের মতো মহাকাশে কোটি কোটি মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, পৃথিবীবাসীও নাকি করোনায় প্রভাবিত এলাকার মধ্যেই। এখানে সৃষ্টি হয় মারাত্মক একজাতের রঞ্জনরশ্মি—যার কিছু অংশ এসে পৌঁছয় পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের ওপর। এই বিভিন্ন রশ্মি ও কণিকার সংঘাতেই পৃথিবীর সর্বাঙ্গ জুড়ে নানা পরিবর্তনের খেলা শুরু হয়ে যায়, যাদের কথা খানিক আগেই বলা হয়েছে।

এইসব পরিবর্তনের মূলে রয়েছে যে সৌরকলঙ্ক, প্রতি এগারো বছর অন্তর সংখ্যা ও তীব্রতায় তারা বেড়ে ওঠে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার জন্যে বিজ্ঞানীরা আ-ভূ-বর্ষের কার্যকালটা বেছে নিলেন এমন একটা সময়ে যখন জোরালো একটা Sunspot Cycle শুরু হয়েছে সূর্যের দেহে। এ অবস্থায় সৌরগবেষণায় অনেক নতুন খবর মিলতে পারে। একই সঙ্গে পৃথিবীবিজ্ঞানের সবগুলো শাখাতে গবেষণায় নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়ে বসে আছে।

আ-ভূ-বর্ষের তেরোটি কার্যক্রমের মধ্যে তার ত্রয়োদশ অর্থাৎ মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুৎনিক স্থাপনার পরিকল্পনাটি ছিল সবচেয়ে চমকপ্রদ। অন্য বারোটি পর্বের নানা প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহে এই উড়ন্ত গবেষণাগারগুলো বিপুলভাবে কার্যকরী হয়েছে। আমরা ক্রমিকভাবে সে আলোচনা করব।

হিমবাহ ও বরফবিজ্ঞান

পৃথিবীর মোট আয়তনের দশভাগের প্রায় একভাগ জায়গা জুড়ে বরফের রাজত্ব—সুমেরু ও কুমেরু। আকারে কুমেরু সুমেরুর চেয়ে অনেক গুণ বড়ো। কোনো কারণে যদি এই হিমরাজ্য গলে জল হয়ে বসে, পৃথিবীর সমস্ত মহাসাগরগুলোর পিঠ দুশো থেকে তিনশো ফুট উঁচু হয়ে উঠবে। মহাদেশের জমির ওপর দিয়ে সেই জল এগিয়ে যাবে ২০০ থেকে ৩০০ মাইল। এ জাতীয় একটা ব্যাপার সত্যিই কি কখনো ঘটতে পারে? বিজ্ঞানীদের মতে ঘটা সম্ভব—যদি পৃথিবীর তাপ বেড়ে চলে ক্রমাগত। তাপবাড়ার মূলে রয়েছে প্রাণীজগৎ। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাষ্প আমরা ত্যাগ করি, তার স্পর্শে বায়ু অনেকটা তপ্ত হয়। পৃথিবীর মাটি সেই তাপ অল্প পরিমাণে গ্রহণ করে। সূর্যের তেজ সরাসরিভাবে শোষণ করে পৃথিবীর উপরিভাগ নিজস্ব তাপ বিকীরণ করে লাল-উজানী (Infra-red) আলোর মাধ্যমে। তার ফলেও বায়ুর তাপ খুব সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এভাবে দেখা গেছে, গত একশো বছরে পৃথিবীর তাপ বেড়েছে গড়পড়তা দু ডিগ্রি ফারেনহাইট। আর এই বৃদ্ধির পালা নাকি শুরু হয়েছে গত হাজার বছর ধরে। এই মাত্রায় বেড়ে চললে দেড় দু হাজার বছর বাদে ঐ রকম একটা জলপ্লাবন ঘটলেও ঘটতে পারে। তাই পৃথিবী কতটা নিজস্ব তাপ বিকীরণ করছে, সেটা জানা দরকার আর সে খবরদারীর ভার দেওয়া হয়েছিল স্পুৎনিকের কিছু কিছু আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির হাতে।

আ-ভূ-বর্ষের কার্যকাল শেষ হবার পর জানা গেল, আগের হিসেবের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ বেশি বরফ পৃথিবীর মেরুঅঞ্চলে জমা হয়ে আছে। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের বিরাট বরফের স্তূপ পৃথিবীর আবহাওয়াকে কতটা প্রভাবিত করছে, এ ছিল একটা প্রশ্ন। কিছু তথ্য এ-প্রসঙ্গেও পাওয়া

গেছে। রুশবিজ্ঞানীরা সূর্যদেহের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চলের জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তনের একটা নিবিড় যোগাযোগ আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

সমুদ্রবিজ্ঞান

পৃথিবীর প্রায় ৭০ ভাগ জুড়ে জলের রাজত্ব। অথচ আশ্চর্য কথাটা হল এই, চাঁদের জমির খুঁটিনাটি আমরা যতোটা ভালো করে জানি, পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর তলদেশ সম্বন্ধে জানি সে তুলনায় অনেক কম।

সামুদ্রিক স্রোত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়াকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। ইংলণ্ড ও নরওয়ের তাপমাত্রা স্বাভাবিকভাবে আরো পনের কি পঁচিশ ডিগ্রী কম হবার কথা। একমাত্র উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবেই ওই দুটো দেশ ঠাণ্ডায় জমে বরফ হবার পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়েছে।

এই সমুদ্রস্রোতগুলোর সৃষ্টি হয় কিভাবে, তার পুরো খবর বিজ্ঞানীরা আজো লাভ করে উঠতে পারেন নি। সূর্যের তাপে সমুদ্রের বিভিন্ন স্তর বিভিন্নভাবে তপ্ত হয়। স্রোতের মাধ্যমে সেই তাপ এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশের উপকূল পর্যন্ত ছড়িয়ে চলে। ফলে পৃথিবীর জলবায়ুতে একটা সমতা রক্ষিত হয়।

মহাসাগরের গর্ভে আছে অগণিত পর্বতশ্রেণী, উচ্চতায় কেউ কেউ এভারেস্টকেও হার মানাতে পারে। তাদের মাঝে আবার কোথাও কোথাও রয়েছে বিরাট গভীর গর্ত বা ফাটলের মতো কতগুলো জায়গা। বেশির ভাগ ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের উৎস হল এরা। এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য বিজ্ঞানীরা খুঁজে চলেছেন। ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে বিরাট আকার ধারণ করে। এদের বলে সুনামি (Tsunami)। প্রচণ্ড শক্তিতে উপকূলের ওপর গিয়ে এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে ধ্বংসের মারমূর্তি নিয়ে। আগে থেকে এদের গতিবিধির খবর পাওয়া গেলে অনেক প্রাণহানি ও ক্ষতি এড়ানো যায়। এ ব্যাপারে স্পুৎনিকের আভ্যন্তরীণ কোনো ক্যামেরা যন্ত্র সামুদ্রিক বিপর্যয়ের যে কোনো দৃশ্যের ছবি তুলে বেতারে বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারে। সাবধান হবার যথেষ্ট অবকাশ তখন থাকবে।

সমুদ্র থেকে প্রতি বছর তিন কোটি টন মাছ খাদ্য হিসেবে ধরা হয়।

মহাসমুদ্রের বিশাল বক্ষে মাছেদের গতিবিধি সম্বন্ধে সঠিক খবর পাবার জন্যে বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্পুৎনিকে স্থাপন করা সম্ভব।

আ-ভূ-বর্ষের কার্যক্রম অনুসারে সমুদ্রবিজ্ঞানে গবেষণারত রাশিয়ান জাহাজ 'ভিতিয়াজ' ১৯৫৭ সালে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে Marianas Trench নামে একটি স্থানে সমুদ্রের সর্বগভীর অংশের সন্ধান পায়। জায়গাটার গভীরতা ছিল প্রায় সাত মাইল। অত গভীর অন্ধকার ও চাপযুক্ত প্রদেশেও রুশ বিজ্ঞানীরা নিম্নশ্রেণীর কিছু সামুদ্রিক প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন।

মহাসাগরের গর্ভের বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞানীরা মূল্যবান খনিজ পদার্থ খুঁজে পেয়েছেন। মানুষ একদিন তাকে কাজে লাগাবে, সন্দেহ নেই। প্রচুর উদ্ভিজ্জের সন্ধানও পাওয়া গেছে, খাদ্যপ্রাণে যারা খুবই সমৃদ্ধ। পৃথিবীর খাদ্য সমস্যার সমাধানে এরা একদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

আবহবিজ্ঞান

বায়ুমণ্ডলের একেবারে নিচুতলাটার নাম হল ট্রপোস্ফিয়ার। আবহাওয়ার কারখানা বাড়িটা এখানেই। সূর্যের সঙ্গে আবহাওয়ার এক নিবিড় সম্পর্ক। সূর্যের তাপে সাগরের জল বাষ্প হয়ে হয় মেঘের সৃষ্টি। ঠাণ্ডা আর গরম বায়ুস্রোত একঠাঁই হলে তৈরি হয় ঝোড়ো হাওয়া। সে হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে আসে মেঘ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। নেমে আসে ঝড়জল। নিরবধি কাল ধরে বায়ুমণ্ডলের মাঝে ঠিক এমনি ধারার ব্যাপার ঘটে চলেছে। কিন্তু সেই ঘটনার ক্ষেত্র এত বিরাট যে তার সব কার্যকারণের পুরো হিসেব সব সময়ে পৃথিবী থেকে পাওয়া যায় না। যার জন্যে আবহাওয়াবিদেরা প্রায়ই নাকাল হন।

এ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের কাজে স্পুৎনিক হবে বিজ্ঞানীদের পরম সহায়। একটি স্পুৎনিক প্রতি দেড় ঘণ্টায় সমগ্র পৃথিবীকে একবার 'প্রদক্ষিণ' করে চলেছে। কাজেই পৃথিবীর সমগ্র অঞ্চলের কোথায় আবহাওয়ার কি পরিবর্তন ঘটছে, তার ছবি ক্যামেরায় তুলে বেতারে মুহূর্তের মধ্যেই সে পাঠিয়ে দিতে পারবে। সূর্যদেহ নিঃসৃত বেগুনীপারের আলো ও সৌরকণিকার সঙ্গে বায়ুর সংঘাতে আবহাওয়ার মাঝে কি পরিবর্তন ঘটে, তার বিশদ ছবি বিজ্ঞানীরা পেতে চান। একটি স্পুৎনিকের পক্ষে কয়েক হাজার আবহাওয়া স্টেশনের তুলনায় অনেক বেশি নিখুঁত তথ্য যোগানো সম্ভব হবে। পৃথিবী থেকে

যতো দূরে তার কক্ষপথ তৈরি হবে, তার ক্যামেরার দৃষ্টি হবে ততো বেশি বিস্তৃত।

অ্যামেরিকান বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই 'ইকো' নামে একটি আবহাওয়া স্পুৎনিকের ভেতরে শক্তিশালী ক্যামেরা যন্ত্র বসিয়ে মহাকাশে পাঠিয়েছেন। সেই যন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার ওপর মেঘের ছবি তুলে পাঠাচ্ছে। ফলে দূরভবিষ্যতে আবহাওয়ার চেহারা কোথায় কিভাবে বদলাবে, অনেক পূর্বাহ্নেই তার খবর মিলছে। এভাবে অদূরভবিষ্যতে পৃথিবীর বিভিন্ন কক্ষপথ জুড়ে অগণিত স্পুৎনিকের দল এক আন্তর্জাতিক আবহাওয়াকেন্দ্রকে গড়ে তুলবে। প্রকৃতির এক রহস্যপুরীর চাবিকাঠি তখন পুরোপুরিই মানুষের করায়ত্ত হবে।

সৌরবিজ্ঞান

আ-ভূ-বর্ষের প্রধান নায়ক হলেন সূর্য। কারণ পরিকল্পনার প্রতিটি কার্যক্রমের পেছনেই তার সরাসরি হস্তক্ষেপের বহু সাক্ষ্য বিদ্যমান। সূর্যের অন্দর মহলের ঘটনাগুলোও কম নাটকীয় নয়। আর সেই রূপে তাকে ভালো করে দেখার এমন অপরূপ সুযোগ আগামী এগারো বছরের আগে পাওয়া যাবে না। সৌরকলঙ্কসমেত সৌরদেহের প্রতিটি ঘটনার রোজনামচা রেখেছেন পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আ-ভূ-বর্ষের পুরো দেড়টি বছর জুড়ে। সূর্য সব সময়ে তাদের কড়া নজরবন্দী ছিল। যখনই কোনো সৌরোৎক্ষেপ বা সৌরস্ফীতি সৃষ্টি হচ্ছিল, অমনি তারা পৃথিবীর কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে যন্ত্রপাতিসহ রকেট ছুঁড়ছিলেন। যাদের কাজ ছিল শুধু ওঠা আর নামা, কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতির সঙ্গে সৌরনিঃসৃত বিভিন্ন রশ্মির সংঘাতের ফলে, ঐসব রশ্মির প্রাথমিক চরিত্রের আনুপূর্বিক খবর পৃথিবীর গবেষণামন্দিরে পৌঁছোতে দেরি হচ্ছিল না।

পৃথিবীতে বসে যে সূর্যকে আমরা রোজ দেখি—সে তার খণ্ডিত রূপ। সাধারণ আলো আর তেজের মধ্য দিয়ে যেটুকু খবর আসে, সে যেন সহস্র সুরের মিশ্রিত ঐকতানের মাত্র একটা সুরের ঢেউ। আরো অগণিত তেজলহরী বায়ুসমুদ্রের বেড়াজাল পেরিয়ে মাটিতে পৌঁছনোর সার্টিফিকেট পায় না। রকেটের যন্ত্রের কাছ থেকে এদের যে খবর আমরা পেয়েছি তারই ভিত্তিতে প্রতিটি মহাকাশযানের অঙ্গসজ্জার নিরাপত্তার বিধান করা সম্ভব হয়েছে। বেলকা, স্ট্রেলকা থেকে শুরু করে গাগারিন, তিতভ, গ্লেন,

কার্পেন্টার মহাকাশযাত্রীরা সবাই নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পেরেছেন।

মেরুজ্যোতি ও নৈশাকাশদীপ্তি

পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র মহাকাশে আপন রশ্মিজালকে ছড়িয়ে রেখেছে। সৌরকণিকাস্রোতের যে দল পৃথিবীর দিকে নামতে শুরু করে, তারা সেই বেড়াজালে বন্দী হয়ে হাজির হয় মেরু অঞ্চলে। পৃথিবীর জমির ৫০ কি ৬০ মাইল দূরে এসে তারা যখন পৌঁছয়, তখন বায়ুর সেই অতিতনু অঞ্চলের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন কণিকাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ফলে বাতাসের মধ্যে এক অনুনির সৃষ্টি হয়—স্নিগ্ধতায় ও রঙের বর্ণাঢ্যতায় যা অপরূপ সুন্দর। মেরুজ্যোতি কখনো কখনো পৃথিবীর ছ'শ মাইল দূরেও দেখা যায়। আ-ভূ-বর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় ছিল মেরুজ্যোতি কারণ সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও চৌম্বকক্ষেত্রের পারস্পরিক যোগাযোগ এমন নাটকীয়ভাবে বোধহয় আর কোনো ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায় না। বিভিন্ন উচ্চতায় মেরুজ্যোতির আকৃতি ও রং দেখে সেই এলাকায় বায়ুর ঘনত্ব ও গঠনরূপের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বায়ুমণ্ডল যদিও মোটামুটিভাবে ২৫০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত, তার শতকরা ৯৯ ভাগ রয়েছে প্রথম পনের মাইলের মধ্যেই। তারপর ক্রমে লঘু হতে হতে যায়, ২৫০ মাইলের কোঠায় মিলিয়ে গেলেও, তার ছিটেফোঁটা হাজার মাইল দূরেও মিলতে পারে। কাজেই মেরু অঞ্চলের অক্ষরেখা বরাবর একটি স্পুৎনিকের কক্ষপথ রচনা করতে পারলে যন্ত্র মাধ্যমে ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুর ঘনত্ব সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য লাভ করা সম্ভব হবে।

বিশেষ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে রাতের কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞানীরা এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পেলেন। বাতাস যেন সব সময়ে কাঁপছে আর ছড়াচ্ছে এক দীপ্তি, খোলা চোখে যাকে দেখা মোটেই সম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন, কুকুর বেড়ালের চোখ বাতাসের এই সামান্য দীপ্তিতে স্পর্শকাতর বলে অন্ধকারের মধ্যেও তারা দেখতে পায়। এর সৃষ্টিরহস্য এখনো সঠিকভাবে জানা যায় নি।

দিনের বেলা সূর্যের তেজের সংঘাতে বাতাসের বিভিন্ন গ্যাসের অণুরা ভেঙে গিয়ে জন্ম দিচ্ছিল যে পরমাণুদের, তারাই আবার রাত্রিকালে একটাই

হয়ে গড়ে তোলে পুরনো অণুদের। এই গড়ার কাজের সময়েই হয়তো দিনের বেলা জমানো চাপ ছড়িয়ে পরমাণুরা আকাশদীপ্তিকে তৈরি করে বসে।

মহাজাগতিক রশ্মি

মহাকাশের গহন অভ্যন্তরে জাত এই পরম রহস্যময় রশ্মিটির জন্মরহস্য নিয়ে তর্কের শেষ আজো হয় নি। মোটামুটিভাবে জানা গেছে, সূর্য থেকে সব সময়েই একজাতের অল্পশক্তিমান মহাজাগতিক রশ্মির সৃষ্টি হচ্ছে। Supernova হল একটি নক্ষত্রের জীবনে সেই পর্যায়, যখন তার মৃত্যুর পালা শুরু হয়েছে। আভ্যন্তরীণ চাপের বৈসাম্যের ফলে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধাক্কায় সমস্ত নক্ষত্রটা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবার এক অবস্থায় পৌঁছেছে এবং বিকীরিত তাপের পরিমাণও বেড়ে উঠছে সহস্রগুণ, লক্ষগুণ। এই জাতীয় নক্ষত্র থেকেই বেশির ভাগ মহাজাগতিক রশ্মির সৃষ্টি হচ্ছে বলে একদল বিজ্ঞানী অনুমান করেন। সূর্য অথবা মহাকাশের চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে পথ তৈরি করার সময় এই রশ্মির দল এক দুর্ধর্ষ শক্তিকে লাভ করে বসে।

পৃথিবীর পনের থেকে পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যে এসে হাজির হলেই এই এই রশ্মিকণারা বায়ুর বিশেষ করে নাইট্রোজেন পরমাণুদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে এক একটি ছোটখাট পারমাণবিক বিস্ফোরণকে তৈরি করে। নাইট্রোজেন পরমাণু ভেঙে গিয়ে জন্ম দেয় একটি তেজস্ক্রিয় কার্বন কণা (কার্বন ১৪) ও একটি তেজস্ক্রিয় হাইড্রোজেন কণার (ট্রাইটিয়াম; এর পরমাণু কেন্দ্রীন একটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে)। বর্ষণার আকারে এরপর এরা নামতে শুরু করে নিচের দিকে। এই দ্বিতীয় চরিত্রের মাধ্যমেই মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে আমাদের পরিচয়—বায়ুর বাধার জন্যে এদের প্রাথমিক চরিত্র জানার সুযোগ পৃথিবী থেকে কখনোই ঘটে না। পৃথিবীর মাত্র উনিশ মাইল ওপরে এই রশ্মির তীব্রতা ভূপৃষ্ঠের তুলনায় আড়াই হাজার গুণ বেশি। মহাকাশের সে তীব্রতা আরো বহুগুণ। এই রশ্মির প্রাথমিক ও দ্বিতীয় চরিত্রের পরিমাপের জন্যে অতি সূক্ষ্ম যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্পুৎনিক সজ্জিত ছিল। যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, ভবিষ্যৎ মহাকাশ-যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে তা বিশেষভাবে কার্যকরী হবে। মহাকাশের সর্বশক্তিমান এই রশ্মিটির সরাসরি সামান্য সংঘাতে মানুষের বংশগতির ধারা পালটে যেতে পারে (Mutation)।

আয়নমণ্ডলবিজ্ঞান

পৃথিবীর পঁয়ত্রিশ থেকে আড়াই শ' মাইল দূর পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুর এই বৈদ্যুতিক স্তরটির অবস্থিতি আন্তর্মহাদেশীয় বেতারবার্তার আদানপ্রদান ব্যবস্থাকে সম্ভব করে তুলেছে। এর গঠনপর্বের মূলে রয়েছে সূর্যেরই ভূমিকা। সূর্যদেহ থেকে বেগুনীপারের আলো, রঞ্জনরশ্মি ও সৌরকণিকাস্রোত সব সময়েই ছাড়া পাচ্ছে। সৌরকলংকের সময় তারা তীব্রতায় ও পরিমাণে শুধু বেড়ে ওঠে। বায়ুর পরমতম্ভ এলাকার পরমাণুরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আপন আপন পরিবার থেকে একটি দুটি করে ইলেকট্রনকে হারিয়ে বসে। (পরমাণুর কেন্দ্রীনে রয়েছে প্রোটন ও নিউট্রন। প্রথমটি ধনতড়িতাবিষ্ট, দ্বিতীয়টির কোন বিদ্যুৎধর্ম নেই। কেন্দ্রীনের চারপাশে এক বা একাধিক কক্ষপথে ঘুরপাক খায় ঋণতড়িৎযুক্ত এক বা একাধিক ইলেকট্রন। স্বাভাবিক অবস্থায় একটি পরমাণুর আভ্যন্তরীণ এই দুটি বিপরীত বিদ্যুৎশক্তি একে অপরের সমান হওয়ার ফলে সে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ অবস্থায় বিরাজ করে।) সৌররশ্মিসংঘাতে একটি ইলেকট্রনকণা হারিয়ে সমস্ত পরমাণুটির ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তি গেল বেড়ে। এ নতুন নাম পেল, ধনাত্মক আয়ন। ছাড়া পাওয়া ইলেকট্রন চট্ করে ঢুকে পড়ল সবচেয়ে কাছের পরমাণুটার অন্দরমহলে। একটি বাড়তি না-ধর্মী ইলেকট্রন লাভ করে এই দ্বিতীয় পরমাণুটির বিদ্যুৎ-চেহারা হয়ে দাঁড়াল ঋণাত্মক। একে বলা হবে, ঋণাত্মক আয়ন।

দু জাতের প্রচুর আয়ন গড়ে উঠতে লাগল এভাবে। আয়নেরা হচ্ছে সুন্দর বিদ্যুৎ-পরিবাহী, গোছা গোছা বিদ্যুৎস্রোত ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল এদের মধ্যে দিয়ে। এক আশ্চর্য ক্ষমতাকে এরা আবার লাভ করে বসে আছে। আয়না যেমন প্রতিফলিত করে আলোর কণাকে, এরা তেমনি প্রতিফলিত করবে বেতারতরঙ্গের ঝাঁককে। আয়নমণ্ডলের বাড়িটাকে বিজ্ঞানীরা আবার চারতলায় ভাগ করেছেন। শর্ট-ওয়েভের-বেতার-ঢেউয়ের এক এক দল এক একটা আয়নস্তর থেকে ঠিকরে ফিরে আসে মাটিতে। মাটি থেকে আবার আকাশ, আকাশ থেকে মাটি—এমনি ধারায় ক্রমাগত প্রতিফলনের মধ্যে দিয়ে আকাশবাণী ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। খুব ছোট মাপের আকাশবাণী আছেএকদল যারা আয়নস্তর থেকে প্রতিফলিত হয় না, একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফুঁড়ে বেরিয়ে পালিয়ে যায় মহাকাশে। রাডার, টেলিভিশনের বেতার-ঢেউ এই দলে পড়ে।

আয়নমণ্ডলের সুন্দর সাজানো ব্যবস্থার মধ্যে হঠাৎ বিপর্যয় ঘটে। সৌরকলঙ্ক দেখা দিলেই সূর্যের রশ্মি আর কণিকার জোর যায় বেড়ে আর তারই ধাক্কায় আয়নমণ্ডলের ওপরকার তিনটে স্তর নেমে এসে জুড়ে যায় একেবারে তলাকার স্তরটার সঙ্গে। সেই পুরু স্তরটা তখন যাবতীয় বেতার-ঢেউকে বেমালুম হজম করে বসে ফিরিয়ে দেয় না কিছুই। বেতারবার্তার আদানপ্রদান মুহূর্তে অচল অবস্থায় পৌঁছয়। সৌরকলঙ্কের তীব্রতা কমলেই আয়নমণ্ডল আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, আকাশবাণীর চলাচলও শুরু হয়।

আয়নমণ্ডলের এই খামখেয়ালিপনার সঠিক কার্যকারণ পৃথিবীতে বসে বোঝা সম্ভব নয়। একদিক থেকে দেখার ফলে তার আংশিক রূপটাই চোখে পড়ার কথা। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের দূত স্পুৎনিক বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করবে। তার যন্ত্রসজ্জার কলকাঠির নাড়াচাড়ায় লব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্য আলট্রা-শর্ট-ওয়েভ বা খুব ছোট মাপের আকাশবাণীতে রূপ পালটে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীতে পৌঁছচ্ছে। আসার পথ যেটুকু আঁকাবাঁকা হচ্ছে, তার হদিশ মিলিয়ে আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের বৈদ্যুতিক ঘনত্ব ও সমগ্র অঞ্চলটার একটা এক্স-রে ছবি বিজ্ঞানীরা লাভ করে বসবেন। এই জ্ঞানের আলোতে বেতারবার্তার ভবিষ্যৎ আদানপ্রদান ব্যবস্থার মধ্যে বিপুল উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

মেরু অঞ্চলে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়, অবিচ্ছিন্ন একটানা ছ' মাস রাত্রির পর্যায় যখন শুরু হয়। সূর্য না থাকায় আয়নমণ্ডল তৈরির উপকরণের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব, অথচ শর্ট-ওয়েভ বেতারবার্তার আদান-প্রদান কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না। ঊর্ধ্বাকাশ থেকে কিভাবে আকাশবাণীর প্রতিফলন ঘটছে, এ রহস্যের মর্ম উদ্ঘাটনের জন্যে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে উদ্গ্রীব। হয়তো উল্কাকণাদের প্রতিনিয়ত সংঘাতের ফলে আয়নিতকরণের কাজ অব্যাহত থাকে—অবশ্য এটাও অনুমান মাত্র।

চুম্বকত্ব

পৃথিবী যে একটি চুম্বক—কম্পাসের কাঁটার চালচলনে অনেকদিন আগেই সে-কথা বোঝা গিয়েছিল। চুম্বকত্বের মূল কারণ নিয়ে তর্কের শেষ আজো হয় নি।

পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রটা স্থির নয়, সদাপরিবর্তনশীল। সে পরিবর্তনের মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন—নেপথ্যে রয়েছেন স্বয়ং সূর্যদেব। দুয়ের যোগাযোগের সঠিক চেহারার বিশ্লেষণ চলেছে, স্পুৎনিকের ম্যাগনিটোমিটার যন্ত্রের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। এ যন্ত্রটির কাজ যে কোনো বস্তুর চৌম্বকক্ষেত্রকে পরিমাপ করা। স্পুৎনিকের কাছ থেকে জানা গেছে, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র মহাকাশে ২৫০০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে যুগান্তকারী যে আবিষ্কারটি ঘটেছে, তা হল পৃথিবীকে বন্ধনীর মতো ঘিরে দুটি তেজস্ক্রিয় রশ্মির বলয়ের অবস্থিতি। একটি আমেরিকান স্পুৎনিকের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রব্যবস্থার দৌলতে এই খবরটি পাওয়া গেছে। কাছের বলয়টি পৃথিবীর দু' থেকে চার হাজার মাইল ও দূরের বলয়টি আট থেকে বারো হাজার মাইলের মধ্যে অবস্থিত। বলয়দুটির সবচেয়ে বেশি তীব্রতা অনুভূত হয় পৃথিবীর আড়াই ও দশ হাজার মাইল দূরে দূরে। কাছের বলয়টি গড়ে উঠেছে একশ কোটি ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন প্রোটন বস্তুকণাদের নিয়ে। খুব শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মির এরা একটি মূল উপাদান এবং এই রশ্মির কল্যাণেই প্রথম বলয়টির সৃষ্টি, বিজ্ঞানীরা এরূপ অনুমান করেন। পৃথিবীর দিকে নেমে আসার সময় এরা তার চৌম্বকরশ্মির বেড়াজালে বন্দী হয়ে পড়ে আর কর্কস্ক্রুর মত পাক খেতে থাকে পৃথিবীর উত্তরপ্রান্ত থেকে দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত। দূরের বলয়টির মূল উপাদান সৌরকণিকা এবং একইভাবে তারাও ঘুরপাক খেয়ে চলে। শক্তির মাপে এরা অবশ্য অনেক খাটো।

এই কাছের বলয়টি বিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে চিন্তিত করে তুলেছে। এর শেষের দিকটা মাঝেমাঝে পৃথিবীর তিন চারশ' মাইলের মধ্যে এসে পৌঁছয়। তখন কোনো মহাকাশযান এর তেজস্ক্রিয় কণাদের সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে তার অভ্যন্তরে জন্মাবে একজাতের শক্তিশালী রঞ্জন-রশ্মি—যার সংযোগ যে কোনো প্রাণীদেহের পক্ষেই হবে মারাত্মক। যে কারণে সমস্ত মহাকাশযাত্রীদের কক্ষপথের সর্বোচ্চ দূরত্ব পৃথিবীর দুশ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল।

এই তেজস্ক্রিয় বলয়দুটির সৃষ্টির সমগ্র কার্যকারণ জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা খুবই উদগ্রীব। মানুষের ভবিষ্যৎ দূর মহাকাশযাত্রার পথে এরা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে কিনা, সেটাই প্রশ্ন।

মাধ্যাকর্ষণ

মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণ পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। যেখানে বস্তু ঘন ও পরিমাণে বেশি, সেখানে এর প্রভাব বেশি মাত্রায় অনুভূত হবে। পরীক্ষা-কাজের জন্তে পেণ্ডুলাম বা ঘড়ির দোলক হল বিজ্ঞানীদের এক ভারী সুন্দর যন্ত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই দোলকের আন্দোলনের হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ্য করে তাঁরা বুঝতে পারেন, কোথায় মাধ্যাকর্ষণ কম, কোথায় বেশি। (একই কাজের জন্তে এখন গ্র্যাভিমিটার যন্ত্রকে ব্যবহার করা হচ্ছে—এ পেণ্ডুলামেরই উন্নত সংস্করণ।) এভাবে সমগ্র পৃথিবীর একটি নির্খুঁত 'মহাকর্ষ মানচিত্র' তাঁরা তৈরি করে ফেলতে চান। পৃথিবী ও তার উপরিভাগের গঠনবৈচিত্র্য সম্বন্ধে পরিষ্কার একটি ধারণা গড়ে তুলতে যা তাদের বিশেষ সাহায্য করবে। তাঁরা বুঝতে চান, কোনো পর্বত মহাদেশের জমির ওপর শুধু ভেসে রয়েছে কিনা, আবার কারো শেকড় ভূগর্ভে দশ মাইল গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত কিনা। কুমেরু অঞ্চলে বরফের তলায় সত্যি কোনো মহাদেশ আছে কি নেই, তাও তাঁরা জানতে চান।

এ বিষয়ের গবেষণাকাজেও স্পুৎনিক একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। স্পুৎনিকের পৃথিবী পরিক্রমার সময় তার বিভিন্ন কক্ষপথের নির্দিষ্ট চেহারায় যেটুকু বিচ্যুতি ঘটবে, তা বিভিন্ন স্থানে পৃথিবীর বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণে ও উপরিভাগের (crust) ঘনত্ব ও গঠন নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করবে।

সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ারের জল কোথাও কোথাও পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীর মহাদেশের জমির বুকেও সেই আকর্ষণে জোয়ার জাগে, তবে উচ্চতায় পাঁচ ইঞ্চির বেশি পৌঁছয় না। মাটির ওপর এই ছোট্ট জোয়ারের ঢেউয়ের ওঠানামা—এ যেন পৃথিবীর শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো। তার প্রকৃতি বিশ্লেষণে জমির শক্তি ও কাঠিন্য জানা যাবে। এই ঘটনায়, পৃথিবীর কেন্দ্রটা যে তরল, তার সমর্থনে একটি বড়ো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। অনুমান করা হয় সেই কেন্দ্রটাও এই জোয়ারের তালে ওঠানামা করে।

ভূকম্পনতত্ত্ব

মাতা ধরিত্রীর গর্ভে আলোড়নের শেষ আজো হয় নি। ভূকম্প হচ্ছে তারই বহিঃপ্রকাশ। প্রায় প্রতি বছরই ছ'টি বড় ও ৮০০টি ছোট ভূকম্প পৃথিবীর

বিভিন্ন স্থানে ঘটে চলেছে। ছোটয়া অবশ্য এতই স্বল্পশক্তির যে অতিসূক্ষ্ম সিসমোগ্রাফের (ভূকম্পনির্ণয়যন্ত্র) কাঁটায় আন্দোলন ছাড়া তাদের বোঝার উপায় নেই। কোথাও ভূকম্প ঘটলেই মাটির ভেতর দিয়ে তা ঢেউয়ের আকারে ছড়িয়ে চলে চতুর্দিকে, যাদের বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন স্তরের গঠনবিন্যাস সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ছবি লাভ করে চলেছেন।

পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে ২২০০ মাইল পুরু একটি তরল গোলক, নিকেল আর লোহা যার উপাদান। তার ওপরে হল ১৭০০ মাইল পুরু ম্যান্টল—শক্ত ব্যাসল্ট পাথরে তৈরি। সকলের ওপরের অংশটা ২০ মাইলের মত পুরু—হালকা গ্র্যানিট আর ব্যাসল্ট পাথরে যারা গড়ে উঠেছে। সমুদ্র-গর্ভে পৃথিবীর এই পৃষ্ঠদেশ মাত্র পাঁচ মাইল পুরু।

বেশির ভাগ ভূকম্পের উৎস হল সমুদ্রগর্ভে। অনুসন্ধানের ফলে এক আশ্চর্য খবর পাওয়া গেছে। সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে এক বিরাট ফাটল —উত্তর মহাসাগর থেকে যার শুরু, আটলান্টিক মহাসাগর বরাবর দক্ষিণে পৌঁছে কুমেরুকে বৃত্তাকারে ঘুরে, প্রশান্ত মহাসাগরের দুপাশ জুড়ে যার বিস্তৃতি। গভীরতায় এ প্রায় দু থেকে পাঁচ মাইল, প্রস্থে কুড়ি থেকে পঁচিশ মাইল। ফাটলের দুপাশ বরাবর পাহাড়ের দেয়াল উঠে গেছে— উচ্চতায় যা এক থেকে দু মাইল। পৃথিবীর বেশির ভাগ ভূকম্পের আস্তানা হল এর সমগ্র অঞ্চল জুড়ে। ভূগর্ভস্থ আন্দোলন এখানে বেশ জোরালো এবং একই সঙ্গে পর্বতগড়ার কাজও চলেছে। ফাটলের ধারে ধারে রয়েছে বহু আগ্নেয়পর্বত—যারা মাঝে মাঝে সমুদ্রের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি করেছে শ্রেণীবদ্ধ দ্বীপমালা, যেমন প্রশান্ত মহাসাগরে এ্যালিউশিন, জাপান, কুরিল, ইন্দোনেশিয়া ; আটলান্টিক মহাসাগরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ মেরু সাগরে সাউথ সেটল্যাণ্ড দ্বীপ। সমুদ্রগর্ভের একটি পরিষ্কার ছবি ও তার গঠনসংক্রান্ত সমগ্র তথ্য পাওয়া গেলে বহু পূর্বাহ্নেই সম্ভাব্য ভূকম্পের সঙ্কেত সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হবে না।

তেজস্ক্রিয়তার গবেষণা

পৃথিবীর অভ্যন্তরে নানাবিধ তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে—যেমন রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি, যাদের ক্রমাগত বিকীরণজনিত প্রক্রিয়ায়

পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের সৃষ্টি। এই স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত হয় একটি কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা। ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুর নাইট্রোজেন কণিকা ও মহাজাগতিক রশ্মির সংঘাতে তেজস্ক্রিয় কার্বন ১৪ ও ট্রাইটিয়াম কণিকা সৃষ্ট হয়ে চলেছে। তারা প্রথমে প্রবেশ করে মেঘরাজ্যে তারপর নেমে আসে বৃষ্টিধারার সঙ্গে মাটিতে, নদীর জলে, সাগরে। মাটি থেকে গুল্ম ও বৃক্ষের শেকড়ের মাধ্যমে তার শাখাপ্রশাখা, সেখান থেকে পত্র ও তৃণভোজী প্রাণী-দেহে—এভাবে ছড়িয়ে চলে চক্রাকারে। ফলে পৃথিবীর প্রতিটি জায়গায় কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বস্তুর সমাবেশ ঘটছে, তার গবেষণার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই অনুসন্ধানের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তেজস্ক্রিয়তা নির্ধারণ ছিল আ-ভূ-বর্ষের অন্যতম কার্যক্রম।

১৯৪৫ সালের আগে পর্যন্ত কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবীতে জমা হয়েছে, তা জানার জন্মে হিমবাহবিজ্ঞানীরা বরফের স্তর নিয়ে গবেষণা করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন যুগে জল জমে বরফ হওয়ার সময় কিছু ট্রাইটিয়ামও তার মধ্যে বাঁধা পড়েছে। আনুপাতিক হিসেবে পৃথিবীর জলে কতটা ট্রাইটিয়াম ছিল, জানা যাবে। আ-ভূ-বর্ষের পুরো দেড় বছর জুড়ে বিজ্ঞানীরা আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া, ইংলণ্ড, ভারত—বিভিন্ন দেশে জল ও বাতাসের নমুনা সংগ্রহ করে এক লাইব্রেরি গড়ে চলেছিলেন। উদ্দেশ্যটা ছিল এই, আগের হিসেবের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে দেখা—পৃথিবীর তেজস্ক্রিয়তা বাড়ছে কিনা। আরো কয়েকটি আইসোটোপ বা তেজস্ক্রিয় ভূড়িদারের সন্ধান বিজ্ঞানীরা এই সঙ্গে করেছেন, যেমন ষ্ট্রনটিয়াম ৯০, সিজিয়াম ১৩৭ ইত্যাদি, যাঁরা অনুপাতে বেড়ে চলতে থাকলে প্রাণীদেহের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

পৃথিবীর পরিমাপ

পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগ জরীপের কাজ খুব সম্পূর্ণ নয় বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। সমুদ্রের মধ্যে কোন plumb line বা খুঁটিপোতা জাতীয় ব্যাপার সম্ভব নয় বলে, গোলমালটা সেখানে আরো বেশি। তাই মানচিত্রে সীমানানির্ধারণে কয়েক শ ফুট থেকে শুরু করে কয়েক মাইল পর্যন্ত ভুল থেকে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। পৃথিবীর বিস্তৃত ভূখণ্ড ও জলভাগের ওপর

উড্ডয়নকালীন অবস্থায় স্পুৎনিক বিজ্ঞানীদের কাছে জরীপ কাজের একটি আদর্শ খুঁটির ভূমিকা গ্রহণ করবে।

পৃথিবীর আকৃতি সম্বন্ধে নতুন একটি খবর পাওয়া গেছে। একটি আমেরিকান স্পুৎনিকের কক্ষপথের চেহারা বিশ্লেষণে ধরা পড়ল, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে তার চলবার ধারাটা একটু অস্বাভাবিক। তা থেকে সিদ্ধান্ত হলো এই, পৃথিবীর আকার একটি পিয়ার ফলের মতো। উত্তরমেরু অঞ্চলে পঞ্চাশ ফুটের মতো একটা জায়গা উঁচু হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আছে ও দক্ষিণমেরু অঞ্চলে সমপরিমাণ একটা জায়গা ভেতরে বসানো। অঙ্কের হিসেবে ব্যাপারটা খুবই ছোট কিন্তু এরই ফলে ভূবিজ্ঞানশাস্ত্রের একটা মস্ত তত্ত্ব "পৃথিবীর স্থিতিস্থাপকধর্মীতা" (Plasticity of the Earth) নাকি টলতে বসেছে। এই তত্ত্বের মূল কথাটা হলো—পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কোনো আলোড়ন বা আবর্তনে যদি উপরিভাগে কোনো বিকৃতি দেখা দেয়, সেটা সাময়িক মাত্র। আভ্যন্তরীণ চাপ সমতায় পৌছলেই স্বাভাবিক চেহারা ফিরে পেতে দেরি হয় না। যাই হোক, এই তথ্য পুরোপুরি গ্রহণের আগে এ বিষয়ে গবেষণার এখনো যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

ঊর্ধ্বাকাশ গবেষণা ও স্পুৎনিক

স্পুৎনিক ছিল মহাকাশে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের দূত। ডিম্বাকৃতি (elliptical) কক্ষপথের Perigee বা অপভূতে (পৃথিবীর নিকটতম বিন্দু) কিছু কিছু স্পুৎনিক বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বতম স্তরগুলোয় প্রবেশ করে। তখন তাদের আভ্যন্তরীণ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুর ঘনত্ব, চাপ, গঠন, মহাকাশ-রশ্মিদের প্রাথমিক চরিত্র, উল্কাদের সংখ্যা ও তাদের সংঘাতের তীব্রতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু তথ্য পাঠিয়েছে। এ প্রসঙ্গে গবেষণার কথা অন্যান্য বিভাগের আলোচনায় কিছু কিছু বলা হয়েছে।

মানুষের হাতেগড়া স্পুৎনিকের সংখ্যা এ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ছিয়ানব্বুইটি। জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ এক নতুন জগতের দিগন্ত এরা খুলে দিয়েছে মানুষের সামনে। অনেক দিনের চেনা পৃথিবী, সূর্য ও অজানা মহাকাশের বহু রহস্য আজ বিজ্ঞানীদের আয়ত্তাধীন। আ-ভূ-বর্ষের প্রতিটি কার্যক্রম সার্থক করে তোলার পেছনে স্পুৎনিকের অবদান ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন বিভাগে অজস্র তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। কিছু বিশ্লেষিত হয়েছে, কিছু হতে চলেছে।

সমগ্র তথ্যের সুষ্ঠু রূপায়ণে বেশ কয়েকবছর সময় প্রয়োজন হয়ে পড়বে। তখন বিজ্ঞানের এতদিনকার স্বীকৃত অনেক তত্ত্ব ও ধারণা যদি বাতিল হয়ে যসে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আ-ভূ-বর্ষের সাফল্য সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। যার ফলে কার্যকাল শেষ হবার পরেও কয়েকটি বিভাগে তাঁরা সম্মিলিতভাবে কাজ করে চলেছেন। আন্তর্জাতিকভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যে নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র তাঁরা রচনা করলেন ও করে চলেছেন, কালক্রমে তার জোরালো হাওয়া এসে লাগবে স্নায়ুযুদ্ধের একেবারে ভিতটার ওপর। তখন সেটা টিকে থাকতে পারলে হয়।

একটি রাজনৈতিক কবিতা

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

অগ্নিময় চতুর্দিক। দীপ্ত শিখা লাওসে, সুয়েজে
সাহারায় মরুবালু কেঁপে ওঠে দুরন্ত বন্যায়
শয়তান চক্রান্ত করে তিনমাথা এক হলে ; হায়
ছত্রহীন ঈশ্বরের পুত্রকন্যা বৃষ্টিপাতে ভেজে !

আরব দুহিতা কিংবা কঙ্গোপুত্র জিঘাংসায় বলি
শৃঙ্খলিত নতশির সারি বাঁধে বধ্যভূমিপাশে
নির্বাক মায়ের অশ্রু ; কাপুরুষ পিতার অঞ্জলি
নেপথ্যে যীশুর আত্মা তৃপ্ত হয়ে হা হা করে হাসে।

ধর্ষিতা ভগ্নীর ভ্রাতা জেগে ওঠে এশিয়ার প্রতি ঘরে ঘরে
মালয় কোরিয়া চীন জাপানে ও কঙ্গোপ্রান্তরে
মুক্তির প্রত্যাশা করে আলজিয়র্স, গুণে চলে অগ্নিগর্ভ দিন
লক্ষ বুকে জেগে ওঠে লক্ষ কাস্ত্রো, সহস্র লেনিন।

দিনান্তের ছায়া নামে, দুশ্চরিত্র সূর্য দেয় উঁকি
সলজ্জ কৈশোর চাকে যৌবনের দুটি সূর্যমুখী।

আলোকস্তম্ভ : ১

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

অসংখ্য আলোকস্তম্ভ কে আবার দেখাবে আমাকে ?
হিংস্রজলকরতলে কতকাল প্রবাসী জাহাজ।
দেখেনি নীলিম-তট নারিকেলকুঞ্জবন।   যাকে
দেখেছে, সে নহে প্রিয়, আত্মীয় নহে তো কেহ আজ।
যারা ওঠে-নামে নানা বন্দরের মুখরিত ঘাটে
তারাও অপরিচিত, একবার ফিরেও চাহে না
যার সঙ্গে এতকাল কাটিয়াছে।   নিরুদ্বেগ হাটে
সঙ্কীর্ণ সরণি বাহি।   কোনো মুখ নাহি যায় চেনা।
অজস্র আলোকস্তম্ভ কে দেখায় আমাকে আবার ?
তোমরা নতুন যাত্রী—তোমাদের দীপ্ত করতলে
প্রদীপ্ত লণ্ঠন।   মুখ আশায় জ্বলিয়া ওঠে কার ?
যেন দেবদূত—যার মুখদ্যুতি কাঁপে কুন্তলে।
ওই মুখগুলি যদি আলোকের স্তম্ভ, আমি আজ
সামগ্রিক সর্বনাশ হতে রক্ষা করেছি জাহাজ।

ক্রান্তিকালের কোনো এক শিশুকে

কমলেশ সেন

হে ক্রান্তিকালের মানুষ
দেখো দেখো
সমুদ্রের সিংহাসনে
স্বর্ণ সিংহের পাদুকা, আলোকবর্ষী প্রাচীপট
দেখো দেখো
সমুদ্রের সিংহাসনে, সিংহাসনের সমুদ্রে
বাতাসের রক্তাক্ত কেশর
অভ্রময় ব্যাঘ্র কেতন
নরসিংহের আয়ের বিভূতি।

আর
আর আমি
আমি এই ক্রান্তিকালের দুর্ধর্ষ শিশু
দুর্ধর্ষ শিশুদের এই ক্রান্তিকালে
হে পিতা, হে প্র-পিতামহ
তোমাদের মৃতনগরীর
তোমাদের আলোকবর্ষী মৃতনগরীর
প্রাচীপটে
রেখে গেলাম আমার
রক্তাক্ত বিবেক, বিবেকের রক্তাক্ত সংগ্রাম
সমুদ্রের গর্জন আর গর্জনের সমুদ্রে
হিরণ্যকশিপু।

পিতা, হে অগ্নিময় নরসিংহ
হে নরসিংহের অগ্নিময়তা
তোমার স্বর্ণগর্ভ কমণ্ডলুর, তোমার
রুদ্রাক্ষের কণ্ঠহারে
তোমার নখাভাসের বিক্রমস্পর্শে
জলভুক সমুদ্র গায়ত্রী, আমি
আমি এই বর্ণাভ দুর্ধর্ষ শিশু, আর
সুরঙ্গমা উদ্ভিদের পৃথিবী, পৃথিবীর
সুরঙ্গমা উদ্ভিদ।

আমাকে তুমি দাও
দাও তোমার হাতের মণিপদ্মে
মহাজাগতিক শক্তির বিদ্যুৎ
দাও তোমার মেধা আর প্রজ্ঞা ;
আমার পিঠে
আমার পিঠের প্রবাল ছায়ায় কাঁপে
কালপুরুষের দ্যুতি
বাতাসের রক্তবলয়
আর প্রজাপতির নগর তোরণ।

তোমার মৃত্যু হলো
আমি দেখলাম
তোমার জন্ম হলো
আমি দেখলাম
তোমার জলগম্ভীর, তোমার অগ্নিগর্ভ
মৃতনগরীর
তোমার লবণাক্ত, তোমার
লবণাক্ত স্বর্ণ নিনাদে
নেপচুন, প্লুটো আর সূর্যগ্রহণ
শ্বেতকেতু আর আমি

আমি তোমার আয়ের প্রতিভা।

দেখো দেখো
হে ক্রান্তিকালের মানুষ
দেখো
সূর্যের পোতাগ্রে
অলক্তে
সর্প-সিংহের পাদুকায়, পাদুকায় সর্প-সিংহে
তোমাদের ক্রান্তিকালের
মহাদ্যুতিমান পুরন্দর।

পিতা, হে অগ্নিময় নরসিংহ
হে নরসিংহের অগ্নিময়তা
আর এক দুর্ধর্ষ সৌরমণ্ডল।

চায়ের আসরে

তরুণ সেন

আমরা গৃহকর্ত্রীর সুখ্যাতি করলাম। বন্ধুর কিছু ঈর্ষা
এবং লজ্জা। আমরা উপভোগ করলাম এবং বললাম—
"আহা এমন আসর। কেবল আসরের মৌতাতে
বেঁচে থাকা।" "কিন্তু কদিন?"

ভাবটা দার্শনিক। ভঙ্গি ততোধিক। এবং সংক্রামক।
লুনিক, উরি ও টিটভ্, কেনেডি ও পরমাণু
সব চায়ের চামচে মাপলাম। ভাবনাগুলো
তর্কের হাওয়ায় ঘোলাটে হলো। অস্তিত্ব হারাল।
সবের তলানি থিতিয়ে এলো। দৃশ্যটা গম্ভীর।

তারপর পরম ঔদাস্যে আমরা নির্লিপ্ত চিন্তায়
ভাবনার তলানি রেখে উঠে পড়লাম। রক্তে আমেজ এলো
বিষটুকু রেখে আমরা সবাই হলাম নির্বিকার নীলকণ্ঠ।

জতুগৃহ

বিজন ভট্টাচার্য

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

হাল ফ্যাশনের আসবাবে সাজানো প্রশস্ত একখানি ড্রইংরুম। রঞ্জন রায় একা বসে সিগারেটের পর সিগারেট টেনে সময় ক্ষেপন করছে। অস্বস্তি আর ক্লান্তি, দুটোই তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর। হঠাৎ উঠে পড়ে রঞ্জন রায়। বারকয়েক অস্থির পায়চারি করে। এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

রঞ্জন : This waiting and waiting.—লতা! লতা আছো!…

[নেপথ্যে নারী কণ্ঠ : আছি!]

…ধ্যাৎ কচুপোড়া, থাকো, আমি যাচ্ছি।

[দ্রুত লতার প্রবেশ]

লতা : কি হলো? কোথায় যাচ্ছ?

রঞ্জন : কেন, আমার কোনো যাবার জায়গা থাকতে পারে না?

লতা : বাব্বাঃ, রঞ্জন রায়ের যাবার জায়গার অভাব, এ কথা শত্তুরেও বলতে পারবে না। কিন্তু এই ভরসন্ধেবেলা ছোট্ট বৌদিটিকে একা ফেলে যাচ্ছ, কাজটা কি ভাই খুব ভালো হচ্ছে?

রঞ্জন : একাটা আবার কোথায়। আমি তো দেখছি তুমি সারাক্ষণই ভেতরে ব্যস্ত হয়ে আছো। তোমার শ্বশুর বাড়ির সিলিং-টা পর্যন্ত ঢালাই কংক্রিট-এর, কড়িকাঠ অবধি নেই যে গুণে দেখব।

লতা : এক বিহনে দেখছি গোটা বৃন্দাবনই অন্ধকার, বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু কি করব ভাই বলো? আমার তো আর কোনো হাত নেই!

রঞ্জন : না না, তোমার হাতে থাকতে যাবে কেন। ব্যাপারটা যদি সত্যি

সত্যিই আমার হাতে না থাকে তো তুমিই বা করবে কি?
(নিজের হাত দেখে) রাশি চক্র না কি যেন সব বলে তোমাদের!

লতা : ঠাট্টা করছ তো?

রঞ্জন : না।

লতা : আচ্ছা, তোমায় আমি একদিন নিয়ে যাব'খন হারান ভট্টচাজ্জের কাছে। এমনিতে হাতটাত বড় একটা দেখেন না। তবে গণনা যা করেন তাই, একেবারে অভ্রান্ত। তিনিই তো অমলের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বলেছিলেন, অথচ তাখ কোনো জানাশোনা ছিল না।

[রঞ্জন রায় সিগারেট-প্যাকেটের ভেতরকার সাদা flap-এ কোষ্ঠীর ছক আঁকে অন্য মনে গল্প শুনতে শুনতে]

রঞ্জন : য্যাসা!

লতা : তোমাকে ছুঁয়ে বলছি তাই, এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না। অমুখ মাস অমুখ দিন অমুখ-এর সঙ্গে অমুখ নক্ষত্রে তোমার বিয়ে, আর কি না ঠিক তাই হলো, কি বলছ কি?…তুমি বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।

রঞ্জন : হুঁ, তা হলে অবিশ্যি বলতেই হবে মগজমে কুছ্‌ শাস্ত্রজ্ঞান হায়।

লতা : না না, তোমার গিয়ে সেই হস্তরেখা বিচার করে তিনি কথা বলেন না; no astrology business. His is the stars and Moon. রীতিমতো Calculation করে কথা বলেন।

রঞ্জন : আচ্ছা!

লতা : You will see.

রঞ্জন : বুঝলাম, কিন্তু এ বিষয়ে আমি তো তাঁকে entrust করতে পারব না লতা।

লতা : কেন?

রঞ্জন : পারব না এই কারণে যে সত্যিই যদি ব্যাপারটা ভাগ্যে ফসকে গিয়ে থাকে! বলো, অতবড় একখানা Blow বুক পেতে নিতে পারব?

লতা : সেটা অবিশ্যি একটা কথা। কিন্তু রঞ্জন আমি অবাক হয়ে ভাবি

যে তোমার মতো ছেলে, আমি ভাবতে পারি না। বালিগঞ্জের সনকা সেন, এলাহাবাদের এবা পালিত থাকতে…

রঞ্জন : ঐ তোমার যত আজেবাজে ভাবনা। অথচ যেটা ভাবলে কাজ হয়, যেটা তোমার হাতের মুঠোয় রয়েছে…

শতা : ব্যাপার এতটাই গড়িয়েছে নাকি ?

রঞ্জন : ব্যাপার তো গড়াচ্ছে না ভাই, নিজেই গড়িয়ে যাচ্ছি। বুঝতেই পাচ্ছি না…

শতা : না সত্যিই এবার কল্যাণীকে আমি মারব। সে কি ভেবেছে কি ?

রঞ্জন : না বাপু মারধর কোরো না, ও জবরদস্তি প্রেম…

শতা : জবরদস্তি আবার কি ? রাগ হয়ে যায় কথা শুনলে আমার।… কিন্তু এ-ও তো আমি বুঝতে পারি না রঞ্জন, তোমার কথা বল্লেই সে যে রকম প্রাণোচ্ছ্বাস দেখায়, যতটা interest নিয়ে কথা বলে…

রঞ্জন : হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো তার কিছুটা শুনব, কিছুটা বুঝব।

শতা : আশ্চর্য। আচ্ছা দাঁড়াও, কল্যাণীর সঙ্গে খোলাখুলি আমি একবার কথা বলে দেখি। আমার তো মনে হয়…

রঞ্জন : ভাখ।

শতা : কি হয় জানো ভাই, সকাল থেকে রাত অবধি কারো সঙ্গে দু-দণ্ড বসে যে কথা বলব । আর কল্যাণীর সঙ্গে আমার তো দেখাই হয় না। সংসারের এত ভার আর ঝামেলা…আর সবাই তো মক্ষীরানী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আরও হয়েছেন তোমার প্রাণের বন্ধু অমলবাবু, অমলের জন্যে আমি এক দণ্ড শান্তিতে তিষ্ঠুতে পারি না এ বাড়িতে। তার এত বখেড়া…

রঞ্জন : কেন, অমল আবার তোমায় কি করল ?

শতা : কি করল না বলতে পারো ? যাগ গে, থাক সে সব কথা।

রঞ্জন : কি ব্যাপার।

শতা : ব্যাপার আর কি বলব ভাই। সংক্ষেপে শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, সারা শরীর তন্নতন্ন করে খুঁজেও এক বিন্দু রক্ত কি কোনো ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গেল না, অথচ পরীক্ষা করে ডাক্তা

বল্লেন, দেহে প্রাণস্পন্দন অনেকক্ষণ আগেই বন্ধ হয়ে গেছে—কতকটা এইরকম আর কি। At times, I feel so miserable Ranjan.

রঞ্জন : কিন্তু অমল তো শুনি…

লতা : নিজেই কি শান্তিতে আছে?…to fire from the frying pan and again to the frying pan from fire.

রঞ্জন : কেন, Jolly good Guy, দিব্যি আছে, ব্যবসা করছে, টাকা পিটছে…

লতা : পিটছেন না, পিট্টি খাচ্ছেন।

রঞ্জন : কি রকম।

লতা : থাক রঞ্জন, সে সব কথা বলে তোমাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হবে।

রঞ্জন : তা আর একটু না হয় দিলেই বা। আর দিলে তো সে তুমিই দেবে। আপত্তি না থাকে তো বলতে পারো কথাটা লতা।

লতা : অমলকে তুমি কিন্তু এর একটা কথাও বলতে পারবে না।

রঞ্জন : বেশ, বলব না।

লতা : …সেই business-এ টাকা লাগবে টাকা লাগবে বলে মায়ের কাছ থেকে তো ভুজিয়ে ভাজিয়ে দলিল পত্তর সব বার করে নিয়েছিল, সাত বছর আগেকার কথা, আর তুমিও জানো সে কথা…।

অমল : বাস সে, হবে।

লতা : তোমার টাকা পাবারও আগে।

অমল : একটু একটু মনে পড়ছে।

লতা : …কর্তা আবার ঘটনাটা জানতে না পারেন তাই নিয়ে সে কত রাত অবধি আমাদের সলা পরামর্শ, ছিলে তুমি সেদিন সে রাত্রে।

অমল : yes, right. মনে পড়েছে।

লতা : তখন তো দারুণ একটা Boom period, যুদ্ধোত্তর inflation—ধুলো মুঠো করে ধরলে সোনা হয়ে যাচ্ছে অমলের হাতে, সময়টা তো তখন অসম্ভব ভালো গেছে—তখন আমি সই সই করে বলেছিলাম—অমল! তুমি আর যাই করো বাড়ির মর্টগেজটা

অন্তত ছাড়িয়ে ফেলো, যাঁর বাড়ি হস্তান্তর করে দাও তাঁকে এই সময়। তা সে তখন মেজাজ গরম বাবুর, কাঁচা টাকা আসছে হাতে, আমার কথা তো শুনল না, বল্লে, ও যেমনি আছে তেমনিই থাক, business expansion-এর সময় এখন, mortgage-এর সময় expire করতে করতে এই দেড়লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা উশুল করে আনবে। যা হোক সে বাড়ি তো যেমন তেমনই পড়ে রইল মাড়োয়ারীর খপ্পরে, কুঞ্জলালও মুখফুটে কোনোদিন কিছু বল্লো না—weather cock হয়ে বসে আছে সে share market-এর, সে কেন উবচে বলতে যাবে তোমার বাড়ি নাও টাকা দাও, সে জানে দিন একদিন ঘুরবেই, ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে ওদিকে পৈতৃক বাড়িও mortgage হয়ে পড়ে রইল আর এদিকে চলল senseless investment—যে যা বলছে তাই কিনছে, ভাবলে বুঝি বা ব্রহ্মাণ্ডটাই হয়ে যাবে তার একদিন,—ভীষণ alluring তো, জিনিসটাও alluring আর মানুষটাও জানো তুমি ambitious…

রঞ্জন : At times, I should say inordinately ambitious.

লতা : Right, right. আমি তো আপত্তি করছি না।

রঞ্জন : যা হোক।

লতা : তা এই সেদিন, মাসখানেকও হয় নি, একদিন রাত করে বাড়ি ফিরে বলছেন, লতা, বাড়িটা তুমি তখন ছাড়িয়ে নিতে বলেছিলে, কথাটা শুনলে ভালোই করতাম। কেন না এখন আমার হাতে দেড়লাখ টাকাও নেই যে মাড়োয়ারীর টাকা শোধ করে দেই। অথচ হাতে আছে মাত্র দিন সাতেকের সময়। সে খাওয়া নেই, ঘুম নেই…একটি সময়ের জন্যে বাড়িতে থাকছে না, চোরের মতো গুটি গুটি রাত্রে বাড়ি ফিরছে—এমন একটা অবস্থার মধ্যে দিন যাচ্ছে তাই যে তোমায় আর সে কথা বেশি কি বলব!

রঞ্জন : Disturbing no doubt—ভাবনাচিন্তা হবারই কথা, কিন্তু আহার নিদ্রা ত্যাগ করে…

লতা : কি করবে! কি করতে বলো! বলে তোমার বাবার

কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসো, তোমার বাবার অনেক টাকা।

রঞ্জন : Just like him. তারপর ?

লতা : আচ্ছা বলো রঞ্জন, আমি মেয়ে হয়ে…, আজ কত বছর বিয়ে হয়েছে বলো ? আর তা ছাড়া বাবার আর্থিক অবস্থা আগেকার মতো এখন আর flourishing নয় ; বুড়ো হয়েছেন, আর তারপর তাঁরও liabilities আছে প্রচুর সংসারে…

রঞ্জন : না না সে হয় না। হয় না, আর তা ছাড়া ঠিকও নয়। তুমি কেন হাত পাততে যাবে তোমার বাবার কাছে ?

লতা : কখনও হয় ?

রঞ্জন : Silly. তা সে যা হোক, এত মুষড়ে পড়বার কি আছে ? বিপদ ঠিকই, কিন্তু ভেঙে পড়লে কুঞ্জলাল কি ছেড়ে কথা কইবে ?

লতা : ভেঙে পড়াটা ঠিক না মানি, কিন্তু একটা বিপদ যখন আসে রঞ্জন—তখন it is really very difficult to keep one's nose up.

রঞ্জন : Any way, আপাতত নাকটা একটু সরিয়ে নেবে ? খোঁচা লেগে যেতে পারে আমার চোখে।

লতা : সত্যিই এতদিনে বুঝি থ্যাবড়াই হলো নাকটা।

রঞ্জন : যাক গে, ছিরে একটা হয়েই যাবে।

লতা : কি করে রঞ্জন !

রঞ্জন : ভগবান আছেন।

লতা : আছেন কি ?

রঞ্জন : উঃ, সাংঘাতিক সব সাংসারিক বিষয়কর্মের কথা তুলে মাথাটাই তুমি আমার ধরিয়ে দিলে লতা, একটু কফি খাওয়াতে পারো ?

লতা : ওমা, এক্ষুনি আনছি। কি কাণ্ড !

রঞ্জন : আরে না ঠিক আছে। মাথাটা আমার ইদানিং ধরেই থাকে, ছাড়ে না।

লতা : তাই বুঝি ! মুশকিলেরই কথা হলো।

রঞ্জন : খুব মুস্কিল।

লতা : দেখি ঠিক হাওয়াইটা বাৎলাতে পারি কি না।

রঞ্জন : ভাখো।..

লতা : বেয়ারা! গোবর্ধন! মতি!

রঞ্জন : ...তবে তুমি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে।

লতা : বলছো।...

[চাকর গোবর্ধন-এর প্রবেশ]

...গোবর্ধন; কফি নিয়ে এসো।

রঞ্জন : [ঘড়ি দেখে] উঃ, সাড়ে আট। [পায়চারি করে] অমল কি আজকাল রোজই রাত করে বাড়ি ফিরছে নাকি?

লতা : প্রত্যেকটি দিন। দশটার এদিকে তো একদিনও নয়।

রঞ্জন : দশটা?

লতা : কোনো কোনোদিন এগারোটাও বেজে যায়।

রঞ্জন : করে কি এত রাত অবধি!

লতা : ভগবান জানেন।

রঞ্জন : ক্লাবে ট্রাবেও বড়ো একটা দেখতে পাই না।

লতা : বল্লুম না? কোনো কিছুরই ঠিক নেই তার।

[গোবর্ধন কফি দিয়ে যায়]

...এসো, কফি খাবে এসো।

রঞ্জন : আচ্ছা লতা, কুঞ্জলালকে অমল কি ইতিমধ্যে বাড়ির ব্যাপারটা নিয়ে approach করেছিল?—বলতে পারো?

লতা : বহুবার।

রঞ্জন : কি বলে সে।

লতা : কি আবার বলবে। পুরো টাকা ছাড়া সে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না বাড়ি।

রঞ্জন : পুরো টাকা?

লতা : পুরো টাকা।...আর কেনই বা সে করবে বলো? ব্যবসায়ী মানুষ। কেউ ছাড়ে?

রঞ্জন : আমি ঠিক ছেড়ে দিতাম।

লতা : তা তুমি বলতে পারো।

রঞ্জন : ব্যবসায়ীরা সত্যিই ছাড়ে না। তুমি আমি তো আর জাত-ব্যবসায়ী নই।...তোমার চেহারা লতা কিন্তু ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

লতা : আজ ছ মাস ঘুমোই নি রঞ্জন, কি বলবে ?

রঞ্জন : তাই মনে হচ্ছে যেন মোটা করে কাজল পরেছো। চোখটা তো ছিল।

লতা : তুমিই যা বলো রঞ্জন। রঞ্জন। রঞ্জন তুমি আমাকে…

রঞ্জন : টাকাটা যে আমি তোমায় কাল কি পরশু পৌঁছে দেবো, অমল যেন তার বিন্দুবিসর্গ না জানতে পারে·লতা, কেমন।…টাকার কথা বলছিলে না ?

লতা : কিন্তু রঞ্জন তুমি টাকা দেবে…

রঞ্জন : আমি ছাড়া দেড়লাখ টাকা তোমায় চট করে কে দেবে শুনি ?

লতা : সত্যি রঞ্জন তুমি…Really I have no words to express my feeling Ranjan…

[হাত জড়িয়ে ধরে। হাতে হাত নিয়ে বসে]

…টাকা তো নিলাম, তারপর রেয়েৎ দেবার ব্যাপারটা…

রঞ্জন : Payable when able. আর এর ভেতরে ধর যদি কুটুম্বিতেটা হয়েই যায়, তা হলে টাকাটা আমি তোমায় ঘটকালীর বাবদ-বরদারি হিসেবেও 'রাইট অফ' করে দিতে পারি। খুব একটা 'মিন সাম' হবে না আশা করি।

লতা : সত্যিই রঞ্জন, কথাটা তোমার মুখেই শোভা পায়।

[অমল শুভর প্রবেশ]

অমল : হালো হালো হালো হালো। তারপর রঞ্জন রায়, কতক্ষণ ?

রঞ্জন : অনেকক্ষণ। আজ যে এত তাড়াতাড়ি।

অমল : খবর পেয়ে ছুটে এলাম ঘর সামলাতে।

রঞ্জন : শেয়ার-মার্কেটে শুনতে পেলি বুঝি।

অমল : কোন জিনিসটার speculation হয় না ওখানে বলতে পারিস। খবর রাখিস না কিছুই।

রঞ্জন : রাসকেল।—রঞ্জন রায়ের সঙ্গে speculation-এ পেরে উঠবি ?

অমল : পারি আর নাই পারি, লড়তে দোষ কি ? অবিশ্যি সময়টা এখন একটু খারাপ যাচ্ছে।

রঞ্জন : কি রকম, দিনকাল ভালো যাচ্ছে না ?

অমল : খুব খারাপ, অত্যন্ত খারাপ।…তোর কি। তোরা আছিস,

unearned increment-এর টাকা খাচ্ছিস, আর এর বউ তার বউ···

রঞ্জন : এই মুখ সামনে কথা বলবি অমল। লতা, ask your husband to behave.

অমল : শালা, সংসার তো আর করলে না চাঁদ।

রঞ্জন : আরে চুপ কর চুপ কর। দালালের আবার সংসার কি রে?

অমল : সংসারে কোন তালব্য শ দালাল নয় রে? তাঁহা তাঁহা মহাপুরুষ থেকে শুরু করে আদার বেপারী পর্যন্ত কোন বেটা দালাল নয়, বলতে পারিস?

রঞ্জন : ও, রামকৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, চৈতন্য, বুদ্ধ, এঁরা সব দালাল, কেমন?

অমল : আলবাৎ দালাল। গোটা আধ্যাত্মিক দুনিয়ার ঠিকেদারি নিয়ে বসে আছে আর বলছিস দালাল নয়!

রঞ্জন : বাঃ!

অমল : বাঃ?

রঞ্জন : তা একাকার করছিস কেন রে মূর্খ। তাঁদের দুনিয়া আর তোর দুনিয়া কি এক?

অমল : এক এক, ও সব এক। তুই শালা communal minded তাই তাগাতাগি করছিস। বর্তমান democratic set up-এ তোকে থাকতে দেওয়াই উচিত নয়।

রঞ্জন : [ঘড়ি দেখে লাফিয়ে ওঠে] রাত সাড়ে দশটার পর অবশ্যই নয়।

অমল : আরে বোস না বোস না, কথা আছে।

রঞ্জন : বাকিটা বউকে বলিস।···আচ্ছা, তা হলে ঐ কথা রইলো।

অমল : কার সঙ্গে কি কথা? আমি জানতে পাবো না?

[লতা রঞ্জনকে এগিয়ে দিতে যায়]

রঞ্জন : আজ্ঞে না।

অমল : This is bad Ranjan I should say. আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গোপনে শলা আর পরামর্শ··· [লতাকে উদ্দেশ করে] ভাখো ভাখো, আবার তুমিও এগিয়ে চলে?—বাচ্চলে!

রঞ্জন : আচ্ছা চলি রে।

অমল : আর।...

[টিপয়ের ওপরে পড়ে থাকা সিগারেটের খালি প্যাকেটটা তুলে]

...এটা আবার কি ? কোষ্ঠীর ছক ! রঞ্জন রায়ের নাকি ?

[বিছানা নামিয়ে লতা ঘুরে আসে ইতিমধ্যে]

...আচ্ছা লতা !

লতা : উঁ।

অমল : আমাদের রাজযোটক ছিল, না ?

লতা : কেন বল তো ?

অমল : এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।

লতা : এমনিই ?

অমল : রঞ্জন তোমাকে বলছিল কিছু ?—এই টাকাকড়ির কথা ?

লতা : টাকাকড়ির কথা !

অমল : আহা কুঞ্জলালের মত রঞ্জনও তো আমার একজন বড়ো পাওনাদার। ইদানীং যে রকম ভাব জমাচ্ছে এসে, তাই ভাবছিলাম রঞ্জন আবার এই সময়টা তার টাকাকড়ি চেয়ে না বসে।

লতা : রঞ্জনকে তুমি চেনো নি। রঞ্জন সে ধরনের ছেলেই নয়।

অমল : ছেলে নয় ছেলে হতে কতক্ষণ ? এরা হচ্ছে জাত ব্যবসায়ীর ছেলে। রক্তে রক্তে এদের টাকা আনা পাই।

লতা : তুমি এ কথা বলতে পারো না অমল। রঞ্জন নাকি যা করেছে তোমার জন্যে, ছিঃ !

অমল : একেবারে ছিঃ হয়ে গেলাম, এর মধ্যেই ?

লতা : ভাই বন্ধু অনেকেই তো ছিল। কই, কেউ তো এসে জিজ্ঞেসাও করে নি ডেকে।

অমল : না, কেউ আসে নি কেউ ডাকে নি। কিন্তু তাতে করে রঞ্জন রায় সম্পর্কে তোমার এতটা sympathetic হয়ে ওঠবার কারণ কি লতা ? টাকা তুমি কি মনে করো সে একদিন উশুল করে নেবে না ?

লতা : নিলেও গলায় আঙুল দিয়ে কক্ষনো না। He is above such meanness. কি ভালো ! এতটুকু অহংকার নেই...

অমল : সমস্ত অহংকার বুঝি ইতিমধ্যেই সে চূর্ণ করে বসে আছে তোমার কাছে ? জানতাম না তো ?

লতা : তোমার মন জানলে বড্ড ছোট, অত্যন্ত নীচ।

অমল : তাতে করে তোমার মহাপ্রাণ হতে বাধা কোথায় লতা !

লতা : ছিঃ, আমি যদি কক্ষনো আর···। তোমার জন্যে আমি...

অমল : আরে কি আশ্চর্য, আমি ঠাট্টা করছিলাম। লতা !

লতা : সব কথা ঠাট্টা হয় না, জানো !

অমল : লক্ষীটি, রাগ করো না। তুমিই তো আমার সব। শুধু তো সহধর্মিনীই নও, সহমর্মিনীও বটে। তুমি চটে গেলে···। ছিঃ ! (আদর করে) ভালো কথা, টাকার কিছু হিল্লে করতে পারলে ?

লতা : না।

অমল : স্বামীর বিপদে না বলছো হিঁদু ঘরের তুমি কেমন বউ লতা ! দেড় লাখের অন্তত পঁচাত্তর হাজারের ব্যবস্থা করো যে করে পারো !

লতা : রঞ্জনের মতো ছেলে হয় না।

অমল : কুঞ্জলালের মতোও মানুষ হয় না। শুধু একটিবার, একটিবার যদি তুমি তাকে চিনতে। তা তুমি তো একবারও গেলে না !

[লতা ঘুরে তাকায় অমলের দিকে। স্বামীকে দেখে। অমল মুখ ঘুরিয়ে রেখে বিক্ষসংসার—ঠিক দালাল যেমন রেখে।]

পর্দা

চতুর্থ দৃশ্য

[সোফা সেটির কভার পাল্টে, ঝাড় পোঁছ করে ড্রইংরুমখানাকে সভ্যমতো আরও সুদৃশ্য করে তুলছে ভৃত্যগণ সুহাস-এর নির্দেশমতো। হাতে হাতে কাজ চলছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যালান্স করে ঘর সাজাচ্ছেন সুহাস এটা টেনে, সেটা সরিয়ে।]

সুহাস : [ভৃত্যকে] দাঁড়িয়ে রইলি কেনো কাঠপুতলির মতো। গদিগুলো এইবার ঠিক করে বসিয়ে দে।···নড়তেচড়তে বারোমাস।···

[স্বগত] এখনও মালী ফুল দিয়ে গেল না।…'বোল'-এর জলটা পাল্টে দিবি মনে করে।…ছ'টার পর থেকে সবাই যেন হাজির থেকো, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করতে না হয়।

অনৈক ভৃত্য : বড়োসাহেব ফোন করছেন।

সুহাস : লাইনটা দিতে বল। এখন আমি সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে পারব না।…

[চাকর লাইন দিয়ে যায়]

[স্বগত]…বীরু খবরটা পেলো কি না জানতেই পারলাম না। ফোন করে যে একটা খবরবার্তা নেবে।…ছবি কিছু এবার আমায় কিনতেই হবে।…

[চাকর রিসিভার এগিয়ে দেয়]

Hallo, কথা কইছি। কে, শঙ্খ? কি বল! কি? স্পষ্ট করে বল বাপু শুনতে পাচ্ছি নে।—হ্যাঁ তোর টেবিলে হো হো করে হাসছেন যে ভদ্রলোক তাঁকে থামতে বল না।…হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ সে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। অভ্যর্থনায় কোনো ত্রুটি না হয়—সেই জন্যেই তো মরে মরে সব ব্যবস্থা করলুম। কটায়? সাড়ে সাতটা? আর একটু সকাল সকালই আয় না। হ্যাঁ তা বৌমাকে একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে বলো, সেজেগুজে বেরুতে আবার দেরি না করেন। মনে রেখো বোনের বিয়ে দিচ্ছো। [ফোন রেখে দেন] দায়টা দেখছি আমারই।…

[রিসিভার রেখে দেন]

[ভৃত্যগণের প্রস্থান]

…কোনোমতে দায়টা উদ্ধার হলে বাঁচি। কারু তোয়াক্কা করব না।…কথা শুনলে গা জ্বলে যায়।—বৌমা গাড়ি নিয়ে অফিস থেকে ওঁকে তুলে আনবেন! যত সব বিবিয়ানা। কেন বাপু, তুমি তো শুনি অফিসার লোক, তোমার মাথার ওপর কথা কইবার লোক নেই। একটি দিনের জন্যে তুমি একটু আগে থাকতে আসতে পারো না? সব সাহেব হয়েছে!

[কথার মাঝখানে রসময়ের প্রবেশ]

রসময় : ইংরেজ আমলে আমরা ছিলাম সব মোসাহেব। এখন ইংরেজের অবর্তমানে আমরা হইছি 'সাব',—সব সাহেব।

সুহাস : আহা, তুমি আবার সাহেব ছিলে কবে। করতে তো গুরুগিরি, তখনও, এখনও। কলেজে ছাত্তর পড়াও।

রসময় : আহা গৌরবে বহুবচন, বোঝ না কেন? ছেলেরা তো তোমার সব সাহেব।

সুহাস : হ্যাঁ, বাঘের বেটা সব চিতেবাঘ। সব বউ-এর মুখ চেয়ে আছে। বউ কি বলে! ছ্যা ছ্যা, ব্যক্তিত্ব সব বাইরে। ভেতরে সব মেনীমুখো।

রসময় : কি করবে!

সুহাস : কেন, আর কোনো কর্তব্য নেই সংসারে?

রসময় : তোমার অতিথি-আপ্যায়নের তোড়জোড় শেষ হয়েছে? রঞ্জনের বাবা না কে যেন আসবেন বাড়িতে আজ শুনছিলাম।

সুহাস : না, রঞ্জনের বাবাই আসছেন। দেখো, বিজ্ঞানীদের আবার ভুলো মন। কাকা কি মামা বলে বসো না যেন মহীতোষ রায়কে।

রসময় : কিছু ফুল রাখতে পারতে।

সুহাস : ঐ তো বড়ো বৌমা নাকি মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে নিয়ে আসবেন ফুল আসবার পথে। বড্ড দেরি হয়ে যাবে…যাই আবার হুট করে হয়তো এসে পড়বেনখন। তৈরি হয়ে নিই গে।

রসময় : আহা দেখতে আসছেন তো কল্যাণীকে।

সুহাস : হ্যাঁ,—ছি। তুমি জামাকাপড় ছাড়ো।

রসময় : কেন, this is quite respectable.

সুহাস : মনে রেখো, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছো।…

[সুহাস-এর প্রস্থান]

[রসময় বুককেস থেকে একখানা বই উল্টেপাল্টে দেখেন]

রসময় : ইট-কাঠ-এর সঙ্গে কথা কইছি।

[চাকর এসে ফুল রেখে যায় ফুলদানিতে]

[স্বগত] Yes, the problem is to change it—at all times, in all ages.

[নেপথ্যে গাড়ির হর্ন-এর শব্দ। আস্তে থেকে জোরে একটানা বেজে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় হর্ন। উর্দিপরা চাকর বেয়ারাদের মধ্যে সকলের শরীরে চাঞ্চল্য দেখা যায়। সসম্ভ্রম অভিবাদন জানিয়ে তাদের সরে সরে দাঁড়ানোর সঙ্গে দেখা যায় মহীতোষ রায়কে। ষাট বছরের কাছাকাছি বয়েস। সম্ভ্রান্ত উজ্জ্বল চেহারা। ধীর গম্ভীর। পরনে প্রিন্সকোট আর প্যান্ট। হাতে লাঠি। শশব্যস্তে এগিয়ে যান রসময় অভ্যর্থনা জানাতে।]

মহীতোষ : [রসময়কে] আপনি নিশ্চয়ই কল্যাণীর বাবা হবেন।

রসময় : বসুন, বসুন।

মহীতোষ : আপনি ব্যস্ত হবেন না আমি বসছি।...আপনি বসুন।

রসময় : বাড়ি চিনে আসতে অসুবিধে হয় নি।

মহীতোষ : না কিছু না। ড্রাইভার তো দেখলাম ঠিকই নিয়ে এলো।

রসময় : হ্যাঁ মজুন তো প্রায়ই আসেন।

মহীতোষ : মজুন তো এখন আপনাদেরই ঘরের ছেলে। বাড়িতে আর কতক্ষণ। দিনেরবেলা তো দেখাসাক্ষাৎই হয় না। রাত্রে খাবার টেবিলে ইদানিং যদিবা দেখা হয় তো বলে, কল্যাণীদের বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। বুড়োবুড়ি আমাদের অবিশ্যি একটুখানি ফাঁকা ফাঁকা লাগে; কিন্তু উপায় নেই।

রসময় : তা তো লাগবারই কথা। দিনান্তে দেখাসাক্ষাৎও তো যা হবার হয় ওই সময়টাতেই।

মহীতোষ : ঐ সময়টাতেই। বাদবাকি অন্য সময়ের সবটুকুই তো বাইরে বাইরে;—অফিস, ক্লাব, ব্যস্।...এখন কথা হচ্ছে আমাদের তো একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে।

রসময় : তা তো বটেই, তা তো বটেই।

মহীতোষ : আমার তবু চলে যায়। কাজকর্ম ছাড়া বুড়োবয়সে দু-একটা বাতিক করে রেখেছি।......ওঁরই হয়েছে একটু অসুবিধে। সেকেলে ধরনের মানুষ, সোসাইটি-টোসাইটিও সেরকম পছন্দ করেন না। এখন হয়েছে শুধু ছেলের বউ; ছেলের বউ না হলে আর মন টিঁকছে না।

রসময় : তা তো হবেই। আর ওই তো একমাত্র ছেলে…

মহীতোষ : হ্যাঁ তা একমাত্রই বলতে পারেন। আগপক্ষের ছেলেমেয়ের সঙ্গে practically আমার কোনো সম্পর্কই নেই। ব্যাপারটা তাহলে একটু খুলেই বলি, They have disowned me, just the reverse. অথচ আমি কিন্তু কস্মিনকালেও তাদের ত্যাজ্য করি নি; যদিও তারা অবিশ্যি সেই কথাই বলে বেড়ায় শুনতে পাই।

রসময় : রঞ্জন তাহলে আপনার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান।

মহীতোষ : আজ্ঞে দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান।…বাপের টাকা থাকলে যা হয় আর কি!—তাঁরা মনে করলেন সৎমা আর সৎভাই মিলে তাঁদের সব বঞ্চিত করবে।—The same old stinky story. আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের সম্বন্ধ করতে চলিছি, তাই কিছুটা অন্তত আপনার কাছে আমার পরিষ্কার করে বলা দরকার।

রসময় : না, তাতে আর কি হয়েছে।…এখন কথা হচ্ছে যে এই বিবাহের ঘটনাটি সম্পর্কে আমি কিন্তু আদৌ জ্ঞাত ছিলাম না। সম্প্রতি বাড়ির তরফ থেকে আমাকে জানানো হয়েছে।

মহীতোষ : অ। আপনি বলছেন আপনি জানতেন না কিছু।

রসময় : আজ্ঞে না।

মহীতোষ : বুঝলাম।

রসময় : আর সত্যি কথা বলতে গেলে ছেলেমেয়েদের এই বিবাহাদির ব্যাপারে আমার তো কোনো ব্যক্তিগত মতামত নেই। মতামত থাকতেও পারে না। আগেও সে মতামত কোনোদিন exert করি নি, এখনও করি না। লেখাপড়া শিখেছে, ভালোমন্দ বুঝতে পারছে…কল্যাণী আপনার এই একুশ পেরিয়ে বাইশে পড়লো। ওরাই সব করে, তবে আমার শুধু একটা His majestys ratification—নাম দস্তখত, that I always do with a smiling face.

মহীতোষ : এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত রসময়বাবু। শুধু আমি এলাম, রঞ্জন আমার একমাত্র সন্তান, আপনার মেয়েকে সে ভালোবাসে…

রসময় : না না আপনি এসেছেন, সে তো আমার সৌভাগ্য।

মহীতোষ : সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের কথা কেউ-ই বলতে পারে না রসময়বাবু। ও ভবিতব্যে যা হবার তা হবেই। নইলে দেখুন ছেলের বিয়ে দেবো আমি, বাগ পে···। প্রস্তাবটা আমি আশা করেছিলাম মুখ্যতঃ আপনাদের তরফ থেকেই আসবে। কেন না usually এই সব সামাজিক ব্যাপারে তাই হয়।

রসময় : আপনি ভুল করছেন মহীতোষবাবু। আমি তো আপনাকে পূর্বেই বলেছি···

মহীতোষ : হ্যাঁ আপনি তো বল্লেন আপনি জানতেনই না ব্যাপারটা।

রসময় : বিন্দুবিসর্গ না।

মহীতোষ : উঁ।···এখন ঘটনা যাই হোক, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, লাখকথা না হলে শুনি আমাদের দেশে ছেলেপুলেদের বিয়েথা হয় না। কিন্তু আমার ছেলের বিয়ের ব্যাপারে আমি তো আপনাকে লাখকথা বলতে পারব না রসময়বাবু।

রসময় : এই দেখুন আপনি অযথা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। মেয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একটু কথাবার্তা করে দেখি।

মহীতোষ : তারপর বিয়েথা হলে হবে, আর নইলে হবে না, এই তো!

রসময় : না মানে, আপনি হয়তো আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না রায়মশাই।

মহীতোষ : আমি ঠিকই বুঝিছি।···আচ্ছা চলি, নমস্কার!

রসময় : নমস্কার।

[মহীতোষ রায়ের দ্রুত নিষ্ক্রমণ ও সুহাস-এর প্রবেশ]

সুহাস : কি হলো! মিঃ রায় চলে গেলেন?

রসময় : দেখলেই তো চলে গেলেন।

সুহাস : ওমা, এই এলেন, চলে গেলেন, কি হলো?

রসময় : শুধু গেলেন না, বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে গেলেন মনে হলো।

সুহাস : কেন?

রসময় : কেন তা তিনিই জানেন।

সুহাস : আমি জানতুম! এই জন্যেই আমি কংশ-কে আগে থেকে

পই পই করে বল্লুম বলি যে স্তাখ্, অফিস থেকে আজ একটু তাড়াতাড়ি আসিস ; ছি ছি ছি ছি ছি ছি।...

[কংশ ও পশ্চাতে তার স্ত্রী অ্যানির প্রবেশ]

কংশ : [স্ত্রীকে] কই এসো। [সুহাসকে] কি ব্যাপার, মা! মিঃ রায় এখনও আসেন নি ?

সুহাস : তোমরাই দেখালে বাবা। সেই আসা এলে...

কংশ : (ঘড়ি দেখে) Just half past six. ঠিক সাড়ে ছ'টা। সে কথা আমি তোমাকে তো ফোনেই বল্লুম।

সুহাস : না চল তোমরা ঠিক কাঁটায় কাঁটায় জানি। ছি ছি ছি ছি।

অ্যানি : তুমি তো আমাকে সাড়ে ছয়টা বলেছিলে!

কংশ : oh yes!

সুহাস : তা তো বুঝলাম yes, কিন্তু এদিকে যে সব কেলেঙ্কারী হয়ে গেল!

অ্যানি : [কংশকে] Anything wrong ?

কংশ : [সুহাসকে] মিঃ রায় এখনও আসেন নি, এই তো ? কাজের মানুষ হয়তো দেরি হচ্ছে। এক্ষুনি এসে পড়বেন আর কি। I know he will come.

মসময় : না না, he will not come. তিনি এসেছিলেন কিন্তু যে কারণেই হোক, he felt offended and walked out.

কংশ : Walked out! কারণ ?

মসময় : কারণ কি এখন সে কথার উত্তর দেওয়া তো আমার পক্ষে মুশকিল। এক হতে পারে রঞ্জনের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহের প্রস্তাব মাত্র-ই কেন আমি কৃতকৃতার্থ হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ি নি, এই ;—আর কি হতে পারে।

সুহাস : শোনো কথা। শুনলে তো ?...তুমি নিশ্চয়ই বাধ সেধেছিলে আমি বলবো। নইলে তাঁর মতো একজন মানী লোক উপযেচে বাড়ি বয়ে এসে কখনও মনক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যান! কি কথায় যেন কি কথা বলেছিলে! কি করে জানবো!

কংশ : যাক গে আমি এতক্ষণে সব বুঝতে পারছি। বাবার তো ও-সব আছেই। তবে এ কথাও আমি আপনাকে বলছি বাবা যে রঞ্জনের চাইতে যোগ্য পাত্র আপনি বাংলাদেশে পাবেন না।

সুহাস : [রসময়কে] আহা কি তোমার মেয়ে। অমন মেয়ে মেন মানুষের হয় না!

রসময় : নাঃ, অসম্ভব হলো বসে থাকা এখানে।

[মেজ ছেলে ইঞ্জিনিয়ার বীরেশের প্রবেশ]

বীরেশ : [বসে] তারপর, বৌদি কতক্ষণ?

অ্যানি : কিছুক্ষণ এসেছি।

বীরেশ : আচ্ছা। তা সব চুপচাপ। সাংসারিক কোনো কিছু…

কংশ : মিঃ রায় ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গেছেন বীরু।

বীরেশ : অ, But why at all ক্ষুব্ধ?

কংশ : কি বাবার সঙ্গে মতান্তর হয়েছিল।

রসময় : মতান্তর নয়, কথান্তর হয়েছিল মাত্র।

কংশ : কথান্তর হয়েছিল।

সুহাস : দু মিনিট এলেন না এলেন তাঁর মতো একজন গণ্যমান্য লোক,—তার সঙ্গে মতান্তর হলো, কথান্তর হলো, আমার বাপু মগজেই ঢুকছে না।

কংশ : আমারও না।

বীরেশ : তবু তো দেখছি তোমরা সব্বাই বোঝবার চেষ্টা করছো।

সুহাস : কেলেঙ্কারী, কেলেঙ্কারী!

[ছোট ছেলে Entrepremur,—বাঙাল অমল-এর প্রবেশ]

অমল : দাদা কতক্ষণ!

কংশ : তা বেশ কিছুক্ষণ।

অমল : [বীরেশকে] মেজদা।

বীরেশ : কই, তুমি তো খুব এলে!

অমল : তিন দিন হলো গাড়িটা বিগড়ে রয়েছে।

বীরেশ : I could send you my car. জানালে না কেন?

অমল : আর তা ছাড়া ব্যস্তও ছিলাম। year closing-এর সময়। outstanding billগুলো সব পড়ে আছে গবর্নমেন্টের ঘরে। টাকা বের করা সে এক অসম্ভব ব্যাপার [কংশকে] কই দাদা তোমার সেই Mr. Dey কিন্তু আমাকে কিছু সাহায্য করছেন না।

কংশ : কি বলে?

অমল : কিছু বল্লে তো বুঝতেই পারতুম। আমার পক্ষেও সুবিধে হতো কাজের।—ধন্নাই দিচ্ছি ধন্নাই দিচ্ছি, রা বাক্যি নেই ভদ্দরলোকের মুখে। কি রে বাবা।

কংশ : লোকটাই একটু ঐ প্রকৃতির। কথা বলে কম। তবে attend করে যাও। ছেড়ো না।

অমল : দেবো নাকি dose।

কংশ : ঐটি-ই করো না। তা হলেই সব কেঁচে যাবে।

অমল : X' mas day-তে কেমন কড়া তত্বটি পাঠালাম, তা বুঝি জানো না ?

কংশ : না।

অমল : ওঃ, সে জানলে দাদা, যেন জামাইতত্ব করছি। By air ফুল আনালুম দার্জিলিং থেকে। পড়বি তো পড় ঠিক সেই সময়েই আবার পড়লো গিয়ে তোমার সাহেবের ছেলের বিয়ে। তোলারাম মাড্ডনীরাম-এর দোকান থেকে সাত শ' চল্লিশের একখানা জড়োয়ার নেকলেস্ দিয়ে মুখ দেখে এলাম নববধূর···

বীরেশ : তবে তো মেরে দিয়েছো হে।

অমল : বলছো, কিন্তু বিল তো একখানাও পাশ করল না আজ পর্যন্ত। আমিও জোর দিচ্ছি না। টেণ্ডার আর টেণ্ডার-ই পাঠাচ্ছি নতুন বছরের। মা কালীর দয়ায় military supply-টা একবার পেয়ে যাই ; মা মা মা···[মা কালীর উদ্দেশ্যে যুক্তকর কপালে ঠেকায়। হঠাৎ সুহাসের প্রতি] তুমি কেন কথা কইছো না মা।···কি ব্যাপার। [বীরেশকে] একটু stiff মনে হচ্ছে আবহাওয়াটা। বড়দা। আজকে না রঞ্জনের বাবার আসবার কথা ছিল। what happened with that big guy ?

বীরেশ : Big guy turned out to be very small here and went away offended.

অমল : মানে ?

বীরেশ : আমি আর কিছু জানি না। So goes the report.

অমল : ব্যাপার কি মা ?

সুহাস : ব্যাপার আর কি ?—ওঁর সঙ্গে নাকি বিয়েথা-র ব্যাপার নিয়ে

কথা কাটাকাটি হয়েছে। তাই রাগ করে চলে গেছেন মিঃ রায়।

অমল : কি হয়েছে বাবা? বাবা!

মৃণময় : This is the third time you ask me the very same question. You people will make me mad.

অমল : আমি···আপনি কি বলছেন বাবা।

কংশ : অমল, Don't irritate him.

অমল : But why so fuss. তুমিই বলো না মা কি হয়েছে।

মৃণময় : কিছু হয় নি, কিছু বলি নি। বলবার ভেতরে শুধু বলিছি মেয়ে আমার বড় হয়েছে লেখাপড়া শিখেছে, তার যদি এ বিয়েতে মত থাকে তো তাহলে আমার কোনো বক্তব্যই নেই। বল অন্যায় কিছু বলিছি?

কংশ : অন্যায় তো কেউ-ই বলছে না। আপনি খামখা উত্তেজিত হচ্ছেন।

মৃণময় : না না, আমার পুত্রকন্যা সম্পর্কে আমি যদি এই ধারণা পোষণ করে থাকি যে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারে ভালোমন্দ যা হোক তারাই বুঝবে, এটা কি আমার পক্ষে অপরাধ? কি তোমরা আমাকে বোঝাতে চাও আমি জানি না। আর এই কথা বেই না বলা অমনি তিনি আমাকে বল্লেন, লাখ কথায় আর যার ছেলেরই বিয়ে হবে হোক, আমি আমার ছেলের বিয়ের ব্যাপারে কারো সঙ্গে একটি ছেড়ে দুটি কথা বলতে পারবো না। এ কোনো ভদ্রলোকের কথা হতে পারে না।।—আমার মেয়ের নাম 'ফ্যালনা' নয়।

বীরেশ : কেউ-ই তো সে কথা বলছে না।

মৃণময় : বলছে, তাই-ই বলছে।—কান নেই তাই তোমরা শুনতে পাও না, চোখ নেই তাই দেখতে পাও না, প্রাণ নেই তাই অনুভব করতে পারো না। আর নয় তো বুঝতে হবে আমি-ই কানা বোবা হয়ে গেছি, পঞ্চেন্দ্রিয় আমার শিথিল হয়ে গেছে।

সুহাস : ওমা, তুমি যে দেখছি ক্ষেপে উঠলে গা। বলি কেউ কি তা নিয়ে তোমাকে কোনো কথা শুনিয়েছে যে তুমি চেঁচাচ্ছো?

মৃণময় : শুনতে পেইছি বলেই না চেঁচাচ্ছি। এমনি চেঁচাচ্ছি? [উঠে পড়েন] কথা তুমি শুনতে পাও নি, কথা তুমি শুনতে পাবে

না। বহু কুটস্বার্থ একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে, বুঝলে?—হাড়িকাঠ, হাড়িকাঠ।

বীরেশ : আপনি বড্ড sentimental হয়ে পড়েন বাবা।

[প্রসন্ন-এর প্রস্থান]

কংশ : বড্ড hypersensative.

সুহাস : এত অসহ্য হলে চলে?

[কল্যাণীর প্রবেশ]

কল্যাণী : বাড়িতে এত চেঁচামেচি কিসের মা!

কংশ : তুমি-ই তো ঘটাচ্ছো।

কল্যাণী : আমি!

বীরেশ : রঞ্জনের সম্পর্কে তোমার মতামতটা কল্যাণী তুমি আমাদের স্পষ্ট করে জানালেই তো পারো। You know what I mean.

কল্যাণী : রঞ্জন সম্পর্কে আমার মতামত—তোমরা কি বলতে চাচ্ছ দাদা! বিয়ে? রঞ্জনকে আমি বিয়ে করবো কি না?

অমল : Yes, Just that. এবং নাটুকেপনা না করেই আমার মনে হয় তুমি বলতে পারো কথাটা।

কল্যাণী : এই সামান্য বিষয় নিয়ে আমার মনে হয় কোনো নাটক হয় না ছোড়দা।

বীরেশ : ঠিক আছে, ও aesthetics-এর প্রশ্নটা আমরা না হয় Aristotle-এর কাছ থেকেই জেনে নেবখন। আপাততঃ তুমি বলো, and that very unequivocally. রঞ্জন রায়কে তুমি বিয়ে করছো কি?

কল্যাণী : বিয়ে!

বীরেশ : হ্যাঁ।

কল্যাণী : না, কস্মিনকালে না।

অমল : মানে?

কংশ : তার সঙ্গে তোমার এত ভাব, এত মেলামেশা, এ তুমি কি বলছো কল্যাণী!

অমল : মাকে তুমি কি বলেছো?

কল্যানী : বিয়ে করবো কোনোদিন বলি নি।

সুহাস : আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

কল্যাণী : আমি কোনোদিন মা, কি আর কাউকে—রঞ্জন রায়কে বিয়ে করবো—এ কথাটা কক্ষনো বলি নি।

অমল : বলনি অথচ কথাটা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে রঞ্জন এ বাড়িতে আসছে, যাচ্ছে…

কল্যাণী : আমি জানি না। আর মেলামেশা করলেই যদি বিয়ে করতে হয়…

কংশ : সামাজিকভাবে তাই হয় কল্যাণী।

কল্যাণী : সমাজ। তুমি বলছো সমাজের কথা দাদা।

কংশ : হ্যাঁ, বলছি।

কল্যাণী : আমাদের আবার সমাজ কি দাদা?

কংশ : Just see. M.A. পাশ করেছো আর তুমি সমাজ চেনো না!

বীরেশ : If I remember, Sociology-তে তোমার জানতুম ভয়ানক interest ছিল একদিন কল্যাণী।

কংশ : আমি তোমার কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাঁজিপুঁথির সমাজের কথা কিন্তু বলি নি কল্যাণী, I mean the society that abides by the generally accepted norms of the elite society.

কল্যাণী : সেটা ঠিক সমাজ নয় দাদা। সেটা হলো সমাজের ভেতরকার ছোট্ট একটা গোষ্ঠী,—বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তার কিছুমাত্র যোগাযোগ নেই।

বীরেশ : ও বাবা, তুমি তো তাহলে সবই জানো দেখছি।

কংশ : [কল্যাণীকে] ওটা তোমার ব্যক্তিগত মতামত।

কল্যাণী : না, ব্যক্তিগত নয়। বহুজনের সঙ্গে আমার মতের মিল আছে।

অমল : হ্যাঁ, ইদানীং তুমি দেখছি বড্ড বেশি জেনে ফেলেছো। Anyway, রঞ্জনকে তাহলে তুমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিও কথাটা।

কল্যাণী : আবার তুমি একটা বাজে কথা বকছো ছোড়দা। রঞ্জনকে কেন আমি খামখা সে কথা বলতে যাবো?

অমল : বলবে, কেন না সে অনর্থক একটা ভুল ধারণা করে বসে আছে যে…

কল্যাণী : হ্যাঁ, কিন্তু তার ব্যক্তিগত ভুল ধারণা সংশোধন করবার কোনো দায়িত্বই আমার থাকতে পারে না।

কংশ : অমল, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও।

[কল্যাণীর দ্রুত প্রস্থান]

সুহাস : এমন বিপদে যেন মানুষ না পড়ে।...বীরু কি রাত্তিরে খেয়ে যাবি?

বীরেশ : আজ না মা। পরশু এসে খাবোখন।

[সুহাসের প্রস্থান]

কংশ : আমি উঠব।

অমল : কি উঠব উঠব করছ দাদা, বসো। কথা আছে।

কংশ : আবার কি কথা!

বীরেশ : শুধুই কথা?

অমল : না আছে। ভালো জিনিস আছে। রাম!

কংশ : নিয়ে এসো, নিয়ে এসো। মেজাজটাই আজ...(ইংরিজি সুর ভাঁজে) রাম!

বীরেশ : রাম!

[ভৃত্য রাম-এর প্রবেশ]

অমল : গেলাস দিয়ে যা।

[রাম-এর প্রস্থান]

বীরেশ : আমি অবিশ্যি একটু চড়িয়েই বেরিয়েছি।

অমল : কি খেলে?

বীরেশ : ঐ, যা হয় একটা হলো। হুইস্কিই হবে হয়তো। কিনতে হবে। ফুরিয়ে গেছে stock.

অমল : তুমি আজকাল বড্ড বেশি খাচ্ছ মেজদা।

বীরেশ : কই, না। ভীষণ কমিয়ে দিইছি। চার পেগ, কি খুব বেশি হলো তো পাঁচ পেগ। তার বেশি খাই না।

[রাম পেগ দিয়ে যায় চেলে]

অমল : বোতলটা রেখে পর্দাগুলো টেনে দিয়ে যা। আর তোর বৌদিকে কিছু খাবার-দাবার দিয়ে যেতে বল।

কংশ : To everybody's health.

[অমল খালি পাত্রগুলি পূর্ণ করে দেয়]

বীরেশ : Fine. হুইস্কি সব সময় 'নীট' খাবে।

অমল : মারামারি করে মাত্র সাত বোতল পেইছি।

কংশ : একটা বোতল দিয়ে দিও তো গাড়িতে।

অমল : আচ্ছা দাদা, ম্যাকফারসন কোম্পানির purchasing officer-এর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?

কংশ : যথেষ্ট, সেদিনও তো Dinner খেলুম একসঙ্গে।

অমল : তাই নাকি? আর আমি এদিকে এর ওর তার কাছে ঘুরে মরছি খামখা 'কোটেশন' নিয়ে। একটা যোগাযোগ হতে পারে না?

কংশ : গেলেই হতে পারে। Telephone করে একদিন চলে এসো আমার অফিসে lunch-এর আগে।

অমল : ঠিক আছে।

বীরেশ : কই ব্রাদার, চালো।

অমল : সে কি, তরতি করে দিলাম, already emptied.

বীরেশ : দেবে যখন রাজার মতো। কার্পণ্য করো কেন ব্রাদার।

অমল : আহা খাও না তুমি কত খাবে। আমি বলছি একটু রয়ে সয়ে···

বীরেশ : Night is not still young I presume. দাদা, কটা বেজেছে ঘড়িতে।

কংশ : দশটা, দশটা দশ।

বীরেশ : আবার ফিরতে হবে Camp-এ সত্তর মাইল উজিয়ে। রয়ে সয়ে মৌজ করবার সময় কোথায় ভাই!

কংশ : কি জানিস বীরু! সময় সত্যিই খুব সংক্ষেপ। ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে।

বীরেশ : আর আমাদের অবস্থাটা ঠিক সংক্রান্তিরেখায়। Between two edges.

কংশ : And that too very sharp.—যাকে বলে ক্ষুরধার। কি জানিস বীরু···

অমল : আচ্ছা দাদা, ম্যাকফারসন কোম্পানির ভেতরে রায়মশাই-এর কোনো হাত আছে বলতে পারো?

কংশ : রায়বাহাদুর মহীতোষ রায়-এর কথা বলছো?

অমল : হ্যাঁ।

বীরেশ : তাখ অমল, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, you have grown very selfish these days. দেখছিস দাদা একটা কথা কইছেন...

অমল : Oh I am really sorry মেজদাদা। বলো দাদা তুমি কি বলছিলে।

কংশ : কই কি বলছিলাম! বলছিলাম নাকি? মনে নেই তো!

বীরেশ : হ্যাঁ তুমি যেন একটা কি কথা বলছিলে আমায়। ঠিক বলো নি, সবে শুরু করছিলে আর কি, কি জানিস বীরু। ব্যস্, মাঝখান থেকে অমল অমনি কেটে দিলে কথাটা।

কংশ : কি বলছিলাম, হ্যাঁ, বলছিলাম আর বুঝি সামলাতে পারলুম না। পারতুম, জানিস বীরু, যদি আর মাত্র ছ-মাস সময় পেতাম। মাত্তর ছ-মাস। হুঃ! ছ-মাসের জায়গায় সময় পেলাম মাত্তর ছ-দিন।...ঠিক on the 7th day এসে পড়ল Hammerton সাহেব—15th এলো আর on the 3rd day, that is on the 17th call করল Conference. Bombay, Delhi, Madras-এর office representatives-দের special Plane-এ করে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে উড়িয়ে এনে ফেলা হলো কলকাতা—I was then running a risk of twenty five lakhs in cash and goods. তবু ছ-দিনের ভেতরে তিনটে Company খাড়া করে পনেরো লাখ টাকার হিসেব দেখিয়ে দিলাম—but the bloody gulf was as wide as hell—অন্যান্য provincial report তো তখন Hammerton সাহেবের হাতের মধ্যে কি না। কিছুতেই manage করতে পারলাম না! এখন কি যে করব ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। কাকেই বা কি বলি। As it appears, now there is not even an ear to talk to. এক অ্যানি, তাও আবার এত attached wife—this মহীতোষ রায় is a big shareholder in our Company. তাই একটা remote chance নেব ভেবেছিলাম রঞ্জনের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে দিয়ে Mr. Roy-কে কব্জা করে—that too, as it appears, is totally lost. তাই ভাবছি...

অমল : রঞ্জনকে আবার তুমি কেন জড়াচ্ছ দাদা! He has already invested a big lot of money in my firm.

বীরেশ : সেটা আবার কবে? তুমিও রঞ্জনকে…

অমল : কেন করব না মেজদা। কোন তাগদা করে না। টাকা তো লক্ষ্মী। যদি আপসে আসে হাতের মুঠোয় তো বলো ছেড়ে দেব? কেউ দেয়?

বীরেশ : শোধ দিতে পারবে? নিয়েছো তো বুঝলাম।

অমল : প্রশ্ন ওঠে না। রঞ্জন তো আমার পার্টনার!

বীরেশ : আচ্ছা!

অমল : তবে! অমল অতো কাঁচা কাজ করে না, জানলে মেজদা!

বীরেশ : না হলে বলব অবশ্যই creditable.

কংশ : কত টাকা invest করিয়েছ তুমি রঞ্জনকে দিয়ে বলো!

অমল : শুধু রঞ্জন নয়, রঞ্জনের মা মিসেস রায়ও এর ভেতরে আছেন।

কংশ : সত্যি!

[বীরেশ গান করে]

…শুনতে পাচ্ছ বীরেশ! (অমলকে) আচ্ছা অমল, মিসেস রায়ের টাকাটা তুমি আমাকে পাইয়ে দাও না। সব টাকাটা তো আর এখনই তোমার দরকার হচ্ছে না! কমিশন-এর পারসেন্টেজ আমি তোমায় অনেক বাড়িয়ে দেবো। অমল! লক্ষ্মী ভাই আমার!…

অমল : তা কি করে হয় দাদা!

[বীরেশ জোরে গান করে]

কংশ : তুমি বুঝতে পারছ না অমল, I am in a pit.

অমল : বুঝতে পাচ্ছি সবই কিন্তু তুমি আমাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করো না দাদা। এ হতে পারে না। প্রথমত এ হয় না, দ্বিতীয়ত মিসেস রায় তাতে করে রাজি হবেন না।

কংশ : How does it come to Mrs. Roy's knowledge. তিনি জানবেন কেমন করে?

অমল : না সে অসম্ভব দাদা। তুমি আমাকে অনুরোধ করো না।

ছোটোবেলায় তুমিই তো আমাকে বলতে দাদা, Every one has got to fight his own battle.

কংশ : হ্যাঁ বলতুম, কিন্তু this can be as well your battle অমল। তুমি আমার ছোটো ভাই—আমরা এক মায়ের পেটের সন্তান—we owe our allegiance to our common father.

অমল : সব সত্যি, সবই জানি দাদা। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না টাকা…

বীরেশ : Bravo Brother, ঠিক বলেছ, জিনিসটা যে টাকা, টাকা কখনও দেওয়া যায়! দাদা, দাদাটা একটা ইয়ে!

কংশ : আমার বিপদের মাত্রাটা তুমি আন্দাজ করতে পারবে না ভাই, ভাই…

বীরেশ : বিপদ! হুঁ! সবাই যে যার বিপদের কথা বলো। আর আমি শুধু শুনে যাব—এ-ও এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। বিপদের কথা তুমি আমায় কি বলবে দাদা! তোমার বিপদের তবু তো একটা মাত্রা আছে। আর আমার, আমার বিপদের কোনো মাত্রা-কাত্রা নেই। অথৈ জলে ডুবে আছে।

অমল : কেন, তোমার আবার বিপদ কি মেজদা! সুখের চাকরি, লাট না হয়েই বড়লাটের মাইনে পাচ্ছ…মেজদার আবার…।

বীরেশ : হ্যাঁ পাচ্ছি। কিন্তু সে মাইনেও আর বেশি দিন পাব না। ওদিকে Dam crack করতে শুরু করেছে।

অমল : কি Dam!

বীরেশ : বিশালাক্ষী Dam.

অমল : দৈর্ঘ্যে পনেরো শ ফিট আর প্রস্থে ধরো কম করে এক শ পঞ্চাশ ফিট…

বীরেশ : না না গোটাটা নয়।

কংশ : বেশ তো, না হয় দু ফার্লংই হলো—দু ফার্লং লম্বা আর চওড়ায় এক শ ফুট, ধর পঁচিশ ফুটই—কত ফুট crack করেছে বলে? সে তো বিরাট গর্ত, অনেক টাকা খাঁক—you can help me as well.

বীরেশ : কি বলছ কি! তুমি কি আমার হাতে হাতকড়া পরাতে চাও দাদা!

কংশ : ছি ছি, কার্ষ করছ কেন ভাই। ব্যক্তিগত বিপদের কথা আমি তো তোমায় সবই খুলে বল্লাম। বিশ্বাস না করো তুমি তোমার বৌদিকে জিজ্ঞাসা করো।

অ্যানি : বৌদি কি বলবে! বৌদি কি করতে পারে। আমি তখনই তোমাকে বলেছিলাম যেতে দাও তুমি আমাকে West Germany, I should meet Frederich there, তুমি কিছুতে শুনলে না।

অমল : কে ফ্রেডারিক বৌদি?

অ্যানি : The man who counts on such occasion. আমাদের কোম্পানির Managing Director. আমার সাথে তার বন্ধুত্ব আছে—A very fine man.

কংশ : No Ann, no. But then you would be risking yourself.

অ্যানি : That's your own misgiving.

কংশ : না।

অ্যানি : Bloody blood.

কংশ : Ann!

অ্যানি : I will go home at once.

কংশ : Darling!

অ্যানি : Come. Please come. বাড়ি চলো!

কংশ : Yes, to sweet home. Help me Ann....Good night বীরু, Good night অমল।

বীরেশ : Good night.

অ্যানি : Good night everybody.

অমল : Good night.

[অ্যানি ও কংশ-র প্রস্থান]

বীরেশ : চলি ভাই অমল। আমার অনেকটা পথ যেতে হবে।

অমল : যাবে! কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা ছিল মেজদা! বলো বাড়িতে যাব?

বীরেশ : না, বাড়িতে আমি থাকি কখন?

অমল : তবে অফিস-এ।

বীরেশ : Construction-এর কাজ চলছে, অফিস তো আমার সঙ্গে সঙ্গে move করছে, অফিস কোথায় ? তোমাদের মতো টেবিল-চেয়ারে বসতে পাই !

অমল : তবে ! এবার কিন্তু তোমাকে আমার কিছু টাকা দিতেই হবে।

বীরেশ : বলো তাহলে আর বাড়িতেও আসব না।

অমল : ছি ছি, বাবা মা রয়েছেন আর তুমি বাড়িতে আসবে না মানে !

বীরেশ : তোমার জন্তে শেষ পর্যন্ত আমার বাড়িতে আসাও বন্ধ করতে হবে দেখছি।

অমল : ছি মেজদা, কি যা তা বলছ ?

বীরেশ : খুঁচিয়ে ঘা করা তোমার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। তুমি একজন, বড়দা একজন। একটা কথা বলো তার risk বোঝ না।

অমল : Good night মেজদা !…

[বীরেশ-এর প্রস্থান]

…বেয়ারা ! রাম !

[ভৃত্য রাম-এর প্রবেশ]

…পরিষ্কার করে নিয়ে যা। …আর দিদিমণি, শুয়ে পড়েছে না জেগে আছে ?—হয়তো পাঠিয়ে দিস একবার।

[সোফায় এলিয়ে পড়ে]

[রাম-এর প্রস্থান ও লতা-র প্রবেশ]

লতা : বাব্বা, ভাঙল সভা ?

অমল : লতা ! বসো। আমি ভাবলাম তুমি বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছ।

লতা : তোমাদের জ্বালায় আবার ঘুমোবার যো আছে ? নিজেরা কানে শুনতে পাচ্ছিলে না তাই, নইলে বুঝতে যে সে কী হট্টগোল আর চেঁচামেচি। বীরদা বুঝি তোমায় শাসন করছিলেন ?

অমল : শাসন করছিলেন, আমাকে ! কই না।

লতা : কি জানি, সেই রকমই তো মনে হচ্ছিল। যে রকম ধমকে ধমকে কথা কইছিলেন !

অমল : না ও কিঞ্চিৎ পান করবার পর accent-এ কিঞ্চিৎ গণ্ডগোল হচ্ছিল।

লতা : গণ্ডগোল তো সব জায়গায়। রায়মশাই-এর ব্যাপার শুনলাম এসে। অত্যন্ত unfortunate.

অমল : Crazy ব্যাপার।

লতা : তারপর অ্যানির কাছে বড়দার ব্যাপারটাও শুনলাম কিছু কিছু। দুঃখু করে সে কত কথাই না কইছিল। সত্যি কি হবে বলো তো যদি এমন তেমন হয়।

অমল : ব্যাপার অবিশ্যি no doubt complicated. তবে এ সব তো অ্যানির জন্যেই। ইচ্ছে করলে সে আগে থাকতে বড়দাকে সামলে দিতে পারত না মনে করো? অত fast life lead করবার কোনো মানে হয়! আজ দুঃখু করলে কি হবে।

লতা : বলছিল ছোটঠাকুরপো যদি এই সময়টা…

অমল : জানি অ্যানি সেই কথাই বলবে। মানুষটা বিলিতি হলে কি হবে; চরিত্তিরটি একেবারে খেঁদি পেঁচির ছাঁচে ঢালা। আগে থাকতে ঠিক গাইতে সুরু করেছে। ছোট ঠাকুরপোর গাছ আছে টাকার।…এদিকে রায়মশাইকে বিগড়ে দিয়ে রুক্তা আবার এক situation করে বসে আছেন। ভাবছি রঞ্জন আবার ইতিমধ্যে টাকা-কাকা না demand করে বসে। অবিশ্যি অমল গুপ্তর ঠেঙে টাকা বার করা সহজ হবে না, investment is investment—কিন্তু business relation তো খারাপ হয়ে গেল। …principle দেখাচ্ছেন সব। আরে সংসারে যারা weak, তারাই principle-এর কথা বলে। সক্ষম যে, যার ক্ষমতা আছে, তারা principle নিয়ে মাথা ঘামায় না। they smiply get things done. And that is their principle. ও জ্ঞানের কথা আমি অনেক শুনিছি। আমি ঠেকে পড়লে কেউ আমাকে দেবে বলে।

লতা : কাউকে তো কিছু বলবার দরকার নেই। নিজের হিম্মতে দাঁড়িয়েছ, নিজের বুদ্ধিতে কাজ করে যাবে।

অমল : হ্যাঁ, কাজ, কাজই করতে হবে, কাজই করবার আছে। By the

by শ্বশুরমশাইকে টাকার কথা কিছু বলেছিলে? ও ভাখো সার্কুলার রোডের বাড়ি দেবেন, চা বাগানের শেয়ার দেবেন, ও সব হলো ভবিতব্যের কথা। বর্তমানে আমি হাতে কি পাচ্ছি! কিছু পাচ্ছি কি? না পাচ্ছি না?

লতা : ও তো ঘরের টাকা। তুমি চাইলেই পেতে পারো।

অমল : কি ঘরের টাকা! আমার বাবার টাকা আমার না, তার আবার শ্বশুরের!...

[লতা সকৌতুকে পেটকোমর থেকে একটা ব্যাগ বার করে টেনে আনে]

...কি ওটা?

লতা : টাকা।

অমল : টাকা!

লতা : ভাখো না, একেবারে ভরতি সোনাদানায়। টাকা টাকা করছিলে না

[উপুড় করে ঢেলে দেয়]

অমল : মানে!

লতা : মানে বাবার বীমা কোম্পানী ফেল পড়েছে। কোম্পানীর ঘরে চল্লিশ লাখ টাকার কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। বুঝতে পারলে। সে সাংঘাতিক গণ্ডগোল।

অমল : হরিবোল হরিবোল।

লতা : ছিঃ!

অমল : কি। তারপর?

লতা : তারপর আর কি! ঘরে টাকা সোনা যা ছিল সব গচ্ছিত রেখে গেছেন তোমার কাছে। বল্লেন, আমার এখন কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। অমলকে তুমি সব বুঝিয়ে বোলো। আমি দিল্লী চলে যাচ্ছি রাত্তিরের প্লেনে।

অমল : এ সবই তো দেখছি বুলিয়ন, সোনার বার!

লতা : টাকা আর টাকা—এবার তো নিজেই আগা খাঁ।

অমল : তবে তো আমি রাজা হে।

লতা : আর আমি?

অমল : বলো।

লতা : তুমি বলো।

অমল : রানী।...

[হঠাৎ চমকে ওঠে ওরা কোনো একটা শব্দ শুনে]

...কে ?

লতা : কে !

অমল : কেউ না।

লতা : ধরো।

অমল : চলো।

[ঐশ্বর্যের পেটিকা ওরা জড়াজড়ি ধরাধরি করে নিয়ে যায়]

অন্ধকারে পটক্ষেপ

[ক্রমশঃ

ভ্রম সংশোধন

জ্যৈষ্ঠসংখ্যায় কতগুলি গুরুতর মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেছে। ১২৩০ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্থলে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পড়তে হবে।

তাছাড়া ১১৬০ পৃষ্ঠার ২২তম পংক্তির Conceptional স্থলে Conceptnal ; ১১৬১ পৃষ্ঠার ১১তম পংক্তির সমাজন্ত্রী স্থলে সমাজতন্ত্রী, 'লোকায়ন্ত' স্থলে 'লোকায়ত' ; ১১৬৬ পৃষ্ঠার ২য় পংক্তির মজুরী স্থলে মজুরী ; ১১৭২ পৃষ্ঠার ২৫তম পংক্তির ১৯৪৯ মাত্র এক-পঞ্চমাংশর স্থলে ১৯৪৯ সালে জাতীয় আয়ে শ্রমিকদের অংশ কমে গেছে এক-পঞ্চমাংশ ; ১১৭৫ পৃষ্ঠার ৩য় পংক্তির 'Poner' স্থলে 'Power' ; ১১৮৩ পৃষ্ঠার ৩য় পংক্তির সবিশেষ স্থলে সব শেষের ; ১১৮৯ পৃষ্ঠার ১২তম পংক্তির 'Reinstated' স্থলে 'Revisited' পড়তে হবে।

১২৫৮ পৃষ্ঠার ২য়-৩য় পংক্তির শুদ্ধপাঠ হবে 'রূপকার' সম্প্রদায়ের অমৃতলাল বসু রচিত 'ব্যাপিকা বিদায়'।

বাঙলা 'ফাউস্ত' প্রসঙ্গে

পরিচয় সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয়, আপনার পত্রিকার চৈত্রসংখ্যায় 'পুস্তক পরিচয়'-এ শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় গ্যোতে-রচিত মূল জার্মান্ ফাউস্ত হতে অনূদিত আমার বাঙলা ফাউস্ত-এর যে নয় পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা প্রকাশ করেছেন, তাতে একস্থানে 'রাফায়েল'-এর উক্তি নামক আমার ক্ষুদ্র অনুবাদ কবিতা উদ্ধৃত করে জিজ্ঞাসা করেছেন, "এই অনুবাদে গদ্যের বদলে ছন্দ ব্যবহার করিয়াও কানাইবাবু, শেলীর ভাষায়, মৃতদেহে-প্রাণসঞ্চার করিতে পারিয়াছেন কি?" এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি তাঁকে কয়েকটি বক্তব্য নিবেদন করি। আশা করি, পাঠকবর্গের সুবিচারের খাতিরে এই বক্তব্যগুলি যত শীঘ্র সম্ভব 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত করবেন।

১। নীরেনবাবু রাফাএল-এর উক্তির আমার যে বাঙলা অনুবাদটি আকারে তুলেছেন সেটি আমার গ্রন্থের পরিশিষ্টের প্রথম পৃষ্ঠাতেই বর্জিত হয়ে নূতন প্রকাশিত হয়েছে, যথা:

> ভ্রাতৃসম মহাজ্যোতিষ্কগণ
> মণ্ডলমাঝে ধ্বনিছে তপন
> গানের ছন্দে, আগেরি মতন,
> আর সমাপিছে অশনির বেগে
> বিহিত আপন বিশ্বভ্রমণ।
> দেখি এ-দৃশ্য দেবদূতসার
> হয় বলীয়ান,
> যদিও বোঝে না তত্ত্ব ইহার
> অতি গরীয়ান!
> কল্পনাতীত সৃজন তোমার
> আজো অপূর্ব আদির প্রকার
> অতি মহীয়ান!

[ভুলক্রমে পরিশিষ্টে "বর্ণনাতীত" মুদ্রিত হয়েছে, হবে কল্পনাতীত, যা দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত হচ্ছে এবং এখন বর্তব্য।]

ওঁরই উক্তি থেকে মনে হয় উনি জার্মান্ ভালো জানেন। তাই আমি ওঁকে বিনীত অনুরোধ করি মূলের সঙ্গে এই অনুবাদটি তুলনা করতে,

তাহলে দেখবেন এর ভাবার্থ ও রস মূলের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক। আর যদি একটু দরদ দিয়ে এটি আবৃত্তি করেন তো বুঝবেন, ধ্বনি-ঝঙ্কারেও উভয়ের মিল আছে। আমি নিবেদন করি, জার্মান্‌ ও ইংরাজি অনেকটা একজাতীয় ভাষা, কিন্তু বাঙলা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। তাই এমন ভিন্নজাতীয় ভাষায় মূলের এতটা ধ্বনি-ঝঙ্কার আনাও দুঃসাধ্য। আমি ওঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, এই অনুবাদটি বর্জন করে উনি কেন বর্জিত অনুবাদটি বিশ্ববরেণ্য কবি শেলীর কবিতার সঙ্গে তুলনা করলেন?

২। উনি মূল থেকে মার্গারেত-এর অপূর্ব বিরহগীতিটি নিজে বাঙলায় অনুবাদ করে বেয়ার্ড টেলারসাহেবের অমন সুন্দর ইংরাজি অনুবাদ ও আমার বাঙলা অনুবাদের পাশাপাশি বসিয়ে 'পরিচয়'-এ প্রকাশ করলেন। ইহাই প্রমাণ করে ওঁর বিশ্বাস, উনি জার্মান্‌ ভালো জানেন। তবে কেন উনি অনুগ্রহ-পূর্বক অন্বয়-সমেত মূল কবিতাও উদ্ধৃত করে তার সঙ্গে আমার অনুবাদটি তুলনা করলেন না? তাহলে তো পাঠক বিচার করতে পারতেন কোনটি সত্যিই মূলের নিকট এসেছে। উনি তো নিজেই স্বীকার করেছেন আমি ইংরাজি অনুবাদ দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হই নি, কারণ আমি জানি, উনিও নিশ্চয় জানেন, অনুবাদ যত ভালোই হোক মূল থেকে কম বেশি সরে যাবেই, বিশেষ করে কবিতাতে।

৩। উনিই আমার ভূমিকা থেকে অনুগ্রহ করে উঠিয়েছেন, "আমি সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছি মূল জার্মান্‌ ফাউস্তের প্রত্যেকটি অংশের অবিকল ভাব সরল ও রসযুক্ত করে প্রকাশ করতে, অবশ্য খাঁটি বাঙলা পদ্ধতিতে।" ওঁকে এর জন্যে ধন্যবাদ জানাই। আর এ-ও ঐ ভূমিকাতে পরিষ্কার করে দিয়েছি এই পদ্ধতিটি কি? আমি লিখেছি, "সাহিত্যের অনুবাদে, বিশেষ করে ফাউস্তের ন্যায় মহাকাব্যের অনুবাদে বাঙালীর নিজস্ব রসসৃষ্টির প্রণালী কলাকৌশল ও ভঙ্গী অবলম্বন করলেই সে অনুবাদের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আসবে ও তা রসযুক্ত হবে।" এ-থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় আমি কোনো ইউরোপীয় ছন্দ বা মিলপ্রণালী ইচ্ছাপূর্বকই ব্যবহার করার চেষ্টা করি নি। আমি ওঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি তবু কেন উনি আমার অনুবাদ কবিতার ওঁর কথায় "মিল-গ্রন্থন"-এর বাঙলা কবিতা হিসাবে বিচার না করে, জার্মান্‌ বা ইংরাজি কবিতার সঙ্গে তুলনা করে দোষ ধরলেন?

উনি বিশ্ববরেণ্য কবি শেলীর যে অনুবাদ-কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, তা সত্যই

অপূর্ব। আমি পূর্বে কখনো এটি পড়ি নি, এই প্রথম ওঁর আলোচনায় পড়ে মুগ্ধ হয়েছি আর ওঁকে ধন্যবাদ দেই। কিন্তু উনি যদি এই অনবদ্য অনুবাদ মূলের সঙ্গে তুলনা করেন তো স্পষ্টই দেখবেন কবিবর শেলী মূলের অনেক জার্মান্ শব্দের আক্ষরিক ইংরাজি অনুবাদ ব্যবহার করেন নি। শুধু তাই নয়, গ্যোতের ছন্দও অনুকরণ করেন নি, যদিও সমস্ত ইউরোপীয় ভাষায় ছন্দপ্রণালী অনেকটা একজাতীয়। স্পষ্টই বোঝা যায় কবি শেলী মহাকবি গ্যোতের কবিতায় ভাব ও রস হৃদয়ঙ্গম করে তা আবার খাঁটি ইংরাজি ছন্দে ও খাঁটি ইংরাজি কবিতায় রূপ দিয়েছেন। তাই এর এমন ধ্বনি-ঝঙ্কার ভাবঘনত্ব ও স্বচ্ছন্দপ্রবাহ ফুটে উঠেছে। আমিও পূর্বের অনুচ্ছেদে এই কথাই নিবেদন করেছি যে ইহাই হল অনুবাদের প্রকৃষ্ট পন্থা।

কিন্তু নীরেনবাবু শেলীর কবিতায় যত প্রশংসাই করুন, অনুবাদের এ-পন্থায় বিশ্বাস করেন না। উনি লিখেছেন, "অনুবাদক হিসাবে তাঁহার (অর্থাৎ ফাউস্তের প্রথম ইংরাজি অনুবাদক বেয়ার্ড টেলার-এর) দাবি এই যে ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের ভাষা ও ছন্দ এতই সম্পত্তিপন্ন যে ফাউস্ত-এর মতো কঠিন কাব্যকেও ভাবে, ভাষায়, ছন্দে অবিকলভাবে ও আক্ষরিকভাবে প্রতিবিম্বিত করা মোটেই অসম্ভব নয়। ইহার জন্যে প্রয়োজন অনমনীয় প্রয়াস, যতক্ষণ না লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।" উনি যখন বেয়ার্ড টেলার-এর অনুবাদের এতই প্রশংসা করেছেন, উনি হয়তো মনে করেন টেলার সাহেব ওঁর উক্ত পন্থায় অনুবাদ রচনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। এখন দেখা যাক, টেলার সাহেব রাফায়েল-এর উক্তির কী অনুবাদ করেছেন :

Raphael : The sun-orb sings, in emulation,
'Mid brother-spheres, his ancient round :
His path predestined through creation
He ends with step of thunder-sound,
The angels from his visage splendid
Draw power whose measure none can say ;
The lofty works, uncomprehended,
Are bright as on the earliest day..

আমি নীরেনবাবুকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, এই অনুবাদে গদ্যের বদলে ছন্দ ব্যবহার করে, এমনকি গ্যোতের ছন্দ ব্যবহার করে, টেলারসাহেব শেলীর কথায়, মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছেন কি ?

১৫ই জুন, ১৯৬২   কানাইলাল গাঙ্গুলী

বাংলা ফাউস্ত প্রসঙ্গে

কানাইবাবুর পত্র পড়িলাম। প্রথমেই আমার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি যে তাঁহার গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে আমি মনোযোগ দিই নাই। তাই রাফায়েল-এর উক্তির যে অংশ আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম তাহার সংশোধিত পাঠ আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল। এখন সেটি পড়িবার পর দেখিতেছি যে প্রথম-পাঠের সহিত তাহার কিছু পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু দুই পাঠের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ কানাইবাবু কল্পনা করিয়াছেন তাহার সন্ধান পাইলাম না। কানাইবাবু যে জার্মান ভাষা প্রায় মাতৃভাষারই সমান জানেন, ইহা আমার অজানা ছিল না। সে তুলনায় জার্মান ভাষায় আমার অধিকার যৎসামান্য। আমি এককালে এই ভাষার কিছু চর্চা করিয়াছিলাম এদেশে বসিয়া, কোনো জার্মান শিক্ষকের সহায়তা পাই নাই। এখন অনেকদিনের অনভ্যাসে তাহাতেও প্রচুর মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। আমি কবুল করিতে একটুও কুণ্ঠিত নই যে ফাউস্ত আমি পড়িয়াছিলাম ইংরেজি অনুবাদের ও জার্মান অভিধানের উপর নির্ভর করিয়া। তাই কানাইবাবুর অনুবাদ প্রকাশিত হইলে আমি একান্ত আগ্রহে তাহা পড়িতে বসি। ফাউস্ত কাব্য-নাট্যে যে গীতিকবিতার প্রাচুর্য তাহা সকলেরই জানা কথা। আমার নজর তাই প্রথমেই পড়ে সেইদিকে। দেখিলাম কানাইবাবু মূলের গীতিধর্মিতার রূপ বজায় রাখার দিকে যথেষ্ট প্রয়াস করেন নাই। স্তবকগঠন ও মিলগ্রন্থন গীতিধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু তিনি সেগুলিকে বর্জন করিতে কুণ্ঠিত নন। একজন বাঙালী পাঠক হিসাবে এই তথ্যটি অন্য বাঙালী পাঠককে বোঝাইবার জন্যই আমাকে শেলী ও বেয়ার্ড টেলর-এর ইংরেজি অনুবাদকে কাজে লাগাইতে হইয়াছিল। ইহা তর্কাতীত যে শেলীর দৈবাধীন কবিপ্রতিভা বেয়ার্ড টেলর-এর ছিল না। তবুও রাফায়েল-এর উক্তির বেয়ার্ড টেলর কৃত অনুবাদ—আমি যতটুকু বাংলা, ইংরেজি ও জার্মান ভাষা বুঝি—কানাইবাবুর অনুবাদের চেয়ে মূলের নিকটতর। তাঁহার সমগ্র ফাউস্ত-এর দায়িত্বশীল ও কর্তব্যনিষ্ঠ অনুবাদের প্রয়াসকে আমি প্রকৃত শ্রদ্ধা করি। ইহার অনুরূপ প্রয়াসই আমি কানাইবাবুর নিকট প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা পাই নাই। তাহার কারণ, তাঁহার অনুবাদপদ্ধতি। "খাঁটি বাঙলাপদ্ধতি" বলিতে, কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে, তিনি কি বুঝিয়াছেন, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, কাজি নজরুল,

সুধীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ছন্দ-প্রতিভার অকৃপণ বর্ষণে বাংলাকাব্যের প্রকাশ-ভঙ্গির উর্বরতা অসাধারণ। চেষ্টা করিলে খাঁটি বাংলা ভাষায় জার্মান ছন্দের প্রতিরূপ অনেকাংশে অবিকৃত রাখা যাইত, ইহাই আমার ধারণা। আমি ছন্দবিশারদ নই, তবুও আলোচ্য অংশের একটি অনুবাদের চেষ্টা করিতেছি :

গাহিছেন সূর্যদেব, সনাতন সংক্রমণে,
প্রতিদ্বন্দ্বী তারাদলে সদর্প সঙ্গীত,
সমাপিয়া আপনার চিরাভ্যস্ত আবর্তনে
বজ্রের গর্জনসাথে, যথা নির্ধারিত।
দেবগণ বলদৃপ্ত এ প্রোজ্জ্বল দৃশ্যেতে
যাহার দ্যোতনা কেহ না পারে মাপিতে,
সৃষ্টির অচিন্ত্য কীর্তি এ বিপুল বিশ্বেতে
তেমনই মহিমময় যেমন আদিতে।

কানাইবাবুর নিকট আমার করজোড়ে নিবেদন যে তিনি যেন ভাবিয়া না বসেন যে এই প্রচেষ্টা দিয়া আমি প্রমাণ করিতে চাহিতেছি যে ফাউস্ত-এর অনুবাদে আমি শেলি বা বেয়ার্ড টেলর-এর সমতুল্য। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল এইটুকু দেখানো যে বাংলাছন্দের সাবলীলতা সম্বন্ধে কানাইবাবুর আস্থা একটু বেশি থাকিলে তাঁহার অনুবাদ মূলের আরো বেশি সমীপবর্তী হইতে পারিত।

মার্গারেত-এর বিরহগীতিটি আমি জার্মান হইতে অনুবাদ করিয়াছিলাম, কানাইবাবুর অনুবাদ আমার মনঃপুত না হওয়ায়। এ ক্ষেত্রেও, সাধারণ বাঙালীপাঠকের সুবিধার জন্য, বেয়ার্ড টেলর-এর অনুবাদ তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। আমার পরম সৌভাগ্যের কথা যে এই অনুবাদকে কানাইবাবু "সুন্দর" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমার বাংলা অনুবাদে কোথায় কোথায় ত্রুটি আছে তাহা দেখাইয়া দিলে আমি উপকৃত হইতাম। আমার অনুবাদ কানাইবাবুর অনুবাদের চেয়ে নিকৃষ্ট হইলেও তাহাতে আমার প্রবন্ধে কানাইবাবুর অনুবাদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছিল কি? কারণ, সে অনুবাদটিও তো সম্পূর্ণভাবেই উদ্ধৃত হইয়াছিল।

আমি কলিকাতার বাহিরে থাকায় কানাইবাবুর পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়া গেল। ইহার জন্য আমি দুঃখিত। তিনি যে আমাকে তাঁহার গ্রন্থখানি উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহাতে আমি কৃতজ্ঞ।

২৫শে জুন, ১৯৬২ নীরেন্দ্রনাথ রায়

পু স্ত ক প রি চ য়

কাজল। রমেশচন্দ্র সেন। শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন। ছ টাকা।

কাজল একটি মেয়ের নাম। কুলশ্রী নদীর ধারে এক গ্রাম, সেইখানে থাকত। গরীব গেরস্ত ঘরের মেয়ে। "উন্মুক্ত আকাশ, সবুজ গাছপালা, নদীর স্নিগ্ধ জল, মাঠের বুকে আকরান রঙের রোদ—এই ছিল তার জগৎ।" সে বালবিধবা, কিন্তু সুন্দরী। এবং তদুপরি, যৌবনের ভয়ঙ্কর আগুনের হাত থেকে "কাজলরূপী ঘৃত-কলসকে রক্ষা করার জন্ত তার উপর বিধিনিষেধের অন্ত ছিল না।"...অথস্থির, এইসব ক্রমবর্ধমান চাপ সহ্য করতে না পেরে, একটু হাল্কা পায়ে চলতে না পেরে—কাজলকে লুকিয়ে এসে দাঁড়াতে হতো কুলশ্রীর ঘাটে, যেখানে "তার বুকের ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষার মতন" ঢেউগুলো উঠেই আবার ভেঙে পড়ত। তাই দেখত কাজল এবং আরো কিরকম যেন একটা অস্পষ্ট হাহাকার বোধ করত। সুতরাং কোনো একদিন, কোনো এক পাঁচুদার সঙ্গে সে পালিয়ে এলো কলকাতায়।

কিন্তু যে-পল্লীতে তারা এসে উঠল, সেখানে "সন্ধ্যার পর ঘরে নাচ গান শুরু হয়। তবলা বাজে, সঙ্গে চলে হৈ হল্লোড়।" কাজল সহজেই সব বুঝতে পারল। বিদ্যাসাগরী মতে বিয়ে করবার স্বপ্ন দেখিয়ে পাঁচু তাকে এখানে যেমন অনায়াসেই এনেছিল, তেমনই হঠাৎ, কিছু না বলে একদিন এইখানেই তাকে, এই হিংস্র কঠিন আবহাওয়ায় ফেলে রেখে চলেও গেল, যা বলা যায়, আর ফিরল না তার ভাড়া-বাকি-পড়া ঘরে। তারপর বাড়ির গ্রামের সেই অপরূপ রৌদ্রছায়ায় ফিরতে না পেরে, কাজল আস্তে-আস্তে মিশে যায় পিরমিল (অর্থাৎ, প্রবীণা) বাড়িউলির অন্য সব পুরনো বাসিন্দা সুবালা, প্রিয় ও রসবতীদের দলে। প্রথম প্রথম, তবু যেন ঠিক ও-রকম হতে পারে না, অনেকটা অভিজাত আত্মবোধের কারণে, বাকিটুকু সহজাত ঘৃণায় লজ্জায়। ইতিমধ্যে ভদ্রসন্তান নির্মল চন্দ্রাবেরার চেষ্টায় ঠোক্কর খায়। টের পায় মেয়ে-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পুরাণসিন্ধু-র বাঁকা ইঙ্গিত। ফিরে আসতে হয়

এই অন্ধকারেরই দিকে। তার মনে হয় "পৃথিবীটা যেন পাঁচু আর পুরাণসিন্ধুতে ভরা।"

অবশেষে, তারপর, কাজলের ঘরে প্রথম 'বাবু' আসে। তবু ঠিক যেন 'বাবু' নয়। নাম, রথীন। শিক্ষিত ধনী যুবক—কাব্যভক্ত এবং ভদ্র, বুদ্ধিমান। স্বভাবতই, কাজলকে সে ভালোবেসেই চায়। কাজল এই গণিকাপল্লীতে থাকুক, এটা তার পছন্দ নয়। সুতরাং অন্য এক পরিষ্কার (?) পরিবেশে কাজলকে নিয়ে যায়। কিন্তু ঘটনার চাকাও ঘুরতে থাকে, যেমন ঘোরে। কাজল একটি ফুটফুটে কন্যাসন্তান প্রসব করে। শুধুমাত্র বিবাহটাই হয় না রথীনের সঙ্গে। কেন না, দুর্ভাগ্যক্রমে রথীন মারা গেছে ততদিনে। রথীন যে কাজলকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, এটা সত্য। কিন্তু 'ঘটনাচক্র' নামে অলক্ষ্য অথচ স্বাভাবিক বস্তুটি সত্যের উপর টেক্কার চালের খেলা দেখাবার ক্ষমতা রাখে; এবং সে 'ঘটনাচক্র' যদি স্বামী ধনতান্ত্রিক স্বার্থের অলৌকিক হাতের দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে ক্রমেই সহজতর হয়ে ওঠে হাজার-হাজার কাজলের অধঃপতন, ঐভাবে। ঘরে নতুন নতুন 'বাবু'র অনায়াস আগমন যতটা সম্ভব হয় এদের ক্ষেত্রে, ঠিক ততটাই অকল্পনীয় হয়ে উঠতে থাকে অন্য কোনো সুস্থ রথীনের সংসারে কাজলদের উদ্ধার। সুতরাং কাজলের কাছে রথীনের মতো আর কেউ এলো না। এলো স্খলিত, চরিত্রহীন, মদ্যপ প্রবৃত্তির ঘর্মমুগ। এবং আশ্চর্য, এই আবহাওয়ার মধ্যেও অপ্রত্যাশিত পদশব্দে হঠাৎ-ই এলো আরো দু-জন। তারা—সাধন ও হারীত। সাধনের যাওয়া-আসা উপন্যাসের অনেকটা জুড়ে। রথীনের বন্ধু সাধন। প্রাণে মনে কবি। সাধনের শ্রদ্ধা ও স্নেহ অহরহ কাজলকে স্নিগ্ধ করে রাখে। রথীনের অনুপস্থিতি, রথীনের মৃত্যু এবং এই উল্লোল গণিকাবৃত্তির চাবুকের দাগ ইত্যাদিকে ভুলিয়ে রাখে সাধনের অবাধ সরল আত্মীয়সুলভ ব্যবহার। সাধন কাজলের কাছে বন্ধুত্বের মমতাময় অধিকারে আসে। এবং আংশিকভাবে ভরাট করে রাখে তার পণ্য শরীর-মনের বিপুল ক্ষুধার্ত শূন্যতাকে। আর হারীত একজন পলাতক রাজনৈতিক কর্মী, যার পিছনে পুলিশ, সামনে অনিশ্চয়তার শঙ্কিত রক্তাক্ত রাস্তা। সাধনের বন্ধু। তার হাঁটুতে পুলিশের বুলেটের দগদগে ঘা। এবং যে কাজলের ঘরে কিছুসময় লুকিয়ে থাকতে এসে এক অন্য পৃথিবীর কথা নিঃশব্দে

তার অস্তিত্বে সঞ্চারিত করে দিয়ে যায়। যার ফলে, কাজল তার প্রতি মনে মনে ভীতি পোষণ করলেও, কী-এক অপরূপ সমবেদনায় হারীতের দারুণ ক্ষতটির নিরাময় করার জন্ত ব্যতিব্যস্ত, ব্যাকুল হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, এরা দু-জন কাজলের শরীরের প্রতি কোনো সম্পর্কিত ক্ষুধা পোষণ করে নি, যদিচ কাজলের উপস্থিতি এদের চোখে একটি সুন্দর কোমল বিস্ময়মাত্র ছিল।

উপন্যাসটিতে অনেক মানুষ অমানুষের ওঠা-বসা বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত হারীত ও সাধনই যে সর্বাধিক গভীর গভীর ছাপ রেখে যায়, এটাই এ-রচনার মাননির্ণয় করতে পেরেছে। রমেশবাবু কোথাও কোনো সামান্যতম সার্মন (যা প্রচার করার অসংখ্য সুযোগ এখানেও ছিল) দেন নি, শুধু সাদামাটা প্রতিটি চরিত্রের (পিরমিল বাড়িউলি, সুবালা, প্রিয়, আলতার মা, পুরাণসিন্ধু, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রভৃতি অনেকেই) মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছেন সাধারণ মানুষের অদেখা এক বিষণ্ণ, আহত জগৎ।

এই চরিত্রগুলির নির্বাচন যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনই অব্যর্থ। প্রেভোস্ত-এর 'মানোঁ', ডীফো-র 'মোল্ ফ্লাণ্ডার্স্', কুপরিন-এর 'য়্যামা' বা ইশারউড্-এর 'স্যালি বোয়েলস্'-এর সঙ্গে এদিক-সেদিকের নিকট-দূর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেলেও—কাজল ভারতীয় এবং মূলত বাঙালী, বলতে পারি। আর যেহেতু বাঙালী ও বাঙলা ভাষায় রচিত এই 'বিষয়ের' প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, সেই কারণেই হয়তো গল্পবস্তুর কাঠামো শক্ত থাকলেও, লেখক উপযুক্ত রকমের চরিত্রবিশ্লেষণে বা বিশদবর্ণনায় ততটা সোচ্চার নন (শেষ অংশে কাজলের চেতনাবিভ্রমের রিয়ালিটি স্বীকার করে নিয়েও বলছি)। কেননা; ভারতীয় মুড-এর ভাবপ্রবণ কোমলতা সেজন্ত দায়ী। ভণ্ডুল এবং রথীনই তার উদাহরণ। প্রয়োজনবোধে ভণ্ডুল যত সহজে ইতর, উদ্দাম ও চতুর হতে পেরেছে, রথীন আপনি পবিত্র (!) থেকেও ততটা অনায়াসে ঋজু, উজ্জ্বল ও নির্ভয় হতে পারে নি। এবং কাজলকে বিবাহ করার কঠিন সিদ্ধান্তে পৌঁছবার মুহূর্তেই তার মৃত্যু ঘটল। তদুপরি, যে ধনতান্ত্রিক চক্র কাজলকে ঐ বিপর্যয়ে টেনে নামিয়েছে, সে-প্রসঙ্গেও বড় একটা তাকে কথা বলতে শুনি নি। কাজল এক অপরূপ জীবন্ত রমণী হিসেবেই কী তার 'হার হাইনেস'

ছিল? অথবা, কাজলকে উদ্ধার করার নেশাটুকুই রথীন উপভোগ করতে চাইত?…রথীন কী কুপরিন-এর 'লিখোনিন' মাত্র, আর কাজল 'লিউব্কা'? —প্রশ্নগুলি করে রাখলাম অতি ছোট দু-একটি অসম্পূর্ণতার যথাযথ মীমাংসার আকাঙ্ক্ষায়। নচেৎ এটুকু বুঝতে পারি, 'মোল্ ফ্লাণ্ডার্স্'-জাতীয় বিদেশী লেখার rawness কিংবা সুস্পষ্ট ও চিত্রবৎ vividity ভারতীয় পাঠকের মেজাজে অনুধাবন করা এখনো অকল্পনীয়। সুতরাং তা লিখে ছাপানো হয়তো আরো দুষ্কর।

আশা করব, 'কাজল' অন্তত বহুপঠিত হোক; এবং মনে হয়, উপন্যাসটির ভাষান্তরে সেটি আরো বেশি করে সম্ভব।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

নরক। উমানাথ ভট্টাচার্য। কলকাতা। তিন টাকা পঁচাত্তর ন. প.।

'নীচের মহল', 'ঘূর্ণী', 'জল' ও 'শেষ সংবাদ' নাটকের রচয়িতা, মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা উমানাথ ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'নরক'।

নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই সাবলীলতা। প্রতিটি উপন্যাসে এ-ধরনের কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে বার করা কঠিন। এবং সহজ ও সাবলীল না হলে নাটকের বলিষ্ঠতার হানি ঘটে, উপন্যাসে তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

উমানাথ ভট্টাচার্য নাট্যকার বলেই হয়তো এঁর উপন্যাসটির গতি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। লেখকের বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। লেখার ভঙ্গিতে অনেক সময়েই এ বক্তব্য সুন্দরভাবে সরল, কখনো বা হয়তো অতিরিক্ত।

সারল্যের স্বাভাবিক পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রে বক্তব্য গ্রাহ্য মনে হয় না। সেজন্য হয়তো অনেক সময় দুর্বোধ্যতার আরোপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উমানাথবাবুর লেখার দৃষ্টিতে শেষোক্ত প্রয়োজন কখনোই হয় নি। তিনি স্বাভাবিক সারল্যের একধাপ নেমে এসে তাঁর বক্তব্যকে পাঠকের বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তোলেন, যখন তার সারল্যের জন্যই তাঁকে অস্বীকার করা সম্ভব হয় না। গণনাট্য আন্দোলনে যুক্ত লেখকের পক্ষে এ-ভঙ্গিতে এসে পৌঁছনো হয়তো স্বাভাবিক।

"খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে গণেশের ধারণা হয়েছিল, এদেশে কেরানীর অপ্রতুলতা নেই; সেই হিসাবে মাস্টারের সংখ্যা অনেক কম।…

খুব স্বাভাবিক। কেরানীগিরির বাজার বসেছিল দেড় শ বছর আগে। নতুন বাজার, নতুন সকাল,—সেদিন ক্রেতার অভাব ছিল না। পাঁচ টাকার সওদা পঁচিশ টাকায় বিকিয়েছে।...

দেড় শ বছর পরে আবার নতুন সকাল হয়েছে, সূর্য উঠেছে নতুন করে। কিন্তু বাজার বসে নি। ক্রেতা নেই; তাই কেরানীবাজারে ঝাঁট পড়ে না। পচা শাক-তরকারী আর মাছের আঁশ থকথক করছে; পা রাখার জায়গা কম। কেরানীর দল মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়।..."

এই জগৎটি লেখক সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। গণেশের অনেক আশার প্রথম চাকরি। তারপর হঠাৎ বিশ টাকার নোট আসে খামে। কর্তারা দিয়েথুয়ে খান। কৃপাদৃষ্টি করেন।

গণেশ মফঃস্বলে স্কুল মাস্টারি নেয়। এইসব স্কুলের দলাদলির জগৎ পরিষ্কার ও পাঠকের পরিচিত লাগে। কিন্তু সুকুমার ও তার বার-রেস্তোরাঁর জগৎ, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জগৎ, এমনকি পিম্প কথাটি পর্যন্ত লেখকের অজ্ঞাত বলে মনে হয়। তার কোনো ছবি উপন্যাসে স্পষ্ট ফোটেনি। এ অংশগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় বলেই হয়তো ত্রুটিটা মারাত্মক হয়নি।

উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ হরগোবিন্দবাবু-উপাখ্যান। বৃদ্ধ, চোখে ছানি। গণেশ ও তার সহকর্মী তাঁর বাধ্যতামূলক রিটায়ারের পরদিন অন্ধকার গলিতে গিয়ে দাঁড়ান।

"কয়েক হাত ঘুরে পুরনো পাকা বাড়িটার সামনে কিছু লোক ভীড় করে আছে। অনেকের হাতেই হারিকেন লণ্ঠন। গণেশ দেখল, সদরে মস্ত দরজা, কিন্তু একটাও কপাট নেই। গুহার অন্ধকার মুখের মতো।

কিন্তু এরা এখানে দাঁড়িয়ে কেন! কোন বিপদ ঘটেছে কি?

...কেন আপনারা খবর পান নি? হরগোবিন্দবাবু—"

উমানাথ ভট্টাচার্যের প্রথম উপন্যাসেই শতত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর সহজভঙ্গি জিতেছে। আশা করি আবার তিনি নরক ঘাঁটবেন—আরও বৃহত্তর সংহত নতুন উপন্যাসে।

শিবু দে

ক্রৌঞ্চ-নিষাদ। অজিত দাশ। এম. সি. সরকার (প্রাঃ) লিঃ। দু-টাকা।

মানুষের ছবি। সমীর মুখোপাধ্যায়। মিউ যুগের বাণী। তিন টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

দিনের পর দিন। রামগোপাল নাথ। আনন্দ পাবলিশার্স। দু-টাকা।

একখানি কাব্যগ্রন্থ ও একখানি উপন্যাস ইতিপূর্বে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও 'ক্রৌঞ্চ-নিষাদ'-এর লেখক শ্রীযুক্ত অজিত দাশকে যদি 'তরুণতম' বিশেষণে চিহ্নিত করি, তাহলে তিনি কি আহত হবেন? স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছি, উপরোক্ত বই দু-খানির নাম আলোচ্য উপন্যাসটির নামপত্র মারফৎ জানতে পারলুম। সুতরাং তাদের গুণাগুণ বলতে পারব না; 'ক্রৌঞ্চ-নিষাদ' পড়েছি, পড়া শেষ করার পর, মনে মনে ভেবেছি: লেখক যথার্থই 'তরুণতম'। দীর্ঘ তিনশ কুড়ি পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই শিথিল বাক্যবিন্যাস, অতর্কিত বাগ্মিতা, চরিত্রাঙ্কনের অর্ধস্ফুট আঁচড় স্পষ্টতই তরুণতম লেখকের চারিত্র্যকে প্রকট করে। এগুলি প্রত্যেকটি গুরুতর অভিযোগ সন্দেহ নেই; কিন্তু যখন দেখি, বইখানি দীর্ঘ হলেও সঙ্গত সময়ের চেয়ে অনেক বেশি লেগেছে শেষ করতে, যখন নায়ক সুকুমার থেকে আরম্ভ করে গাঁয়ের ডাক্তার সবাই একটু সুযোগ পেলেই দেশ-কাল-সমাজ নিয়ে বাচালতা করছে, যখন দেখি একটি কমিউনিস্ট চরিত্র বলছে, "এখনও সময় আছে। আমাদের দলে যোগ দিন। এখানে শাখা খুলুন"...ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন আমি নাচার। কিন্তু এমনিতর বিচ্যুতির পাশাপাশিই লেখকের সম্ভাবনাসূচক কিছু কিছু ব্যাপার আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রথমত, বিকারগ্রস্ত মননবিলাসের প্রকোপ থেকে সরে এসে শ্রীযুক্ত দাশ সহজ কাহিনীকে বিবৃত করেছেন সহজভাবে। সাহিত্যজীবনের প্রাথমিক পর্বে কাহিনী তথা চরিত্রচিত্রণে হাত পাকিয়ে তোলাই যুক্তিযুক্ত, ব্যক্তিগতভাবে আমার এই মত। দ্বিতীয়ত, অজস্র চরিত্রের আনাগোনার মধ্যে লেখক মূল কাহিনীসূত্রটি হারিয়ে ফেলেন নি। সরকারী পুনর্বাসনের কাজে নিযুক্ত সুকুমার তার কর্তব্যের প্রতিটি পর্বেই যে ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত যার অন্তে পরাজিত হওয়া ছাড়া নান্যপন্থা—এই ব্যাপারটি শ্রীযুক্ত দাশ চমৎকার দক্ষতায় উপন্যাসের মধ্যে রাখতে পেরেছেন। সরকারী উদ্বাস্তুনীতি সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের ধারণা ১৯৪৭ সাল থেকেই তৈরি; ইদানীং এই ধারণা বাংলাদেশের কিছু কথাকারের উপজীব্য বিষয় হয়েছে। অবশ্য এর অনেকগুলোই আধাবাস্তব কল্পনাবিলাস, অগভীর, কখনো বা

ভাবোদ্বেলতার অশ্রুতেই স্যাঁতসেতে। কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ এই বিশেষ সমস্যাটিকে শ্রীযুক্ত দাশ যেভাবে তাঁর উপন্যাসে বিবৃত করেছেন তা ত্বরিত সমীক্ষারই দৃষ্টান্ত। এবং সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি কেবলমাত্র এই কারণেই উপেক্ষা করা যেতে পারে। তবে নায়কচরিত্রটি কয়েকবার চোখের জল ফেলেছে, লেখক কি এর মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝতে দিয়েছেন যে সুকুমার রোম্যান্টিক, আবেগপ্রবণ এবং কোমলমতি যুবক? আর মহিলাদের যতখানি সুলভ দেখা গেল, বাস্তবে তা কি সত্য? সুকুমার যেখানে যেখানে গিয়েছে, সেখানেই হয় খুকু, নয় জ্যোৎস্নাময়ী, নইলে শুভ্রা তার সঙ্গে কখনো আলাপিত, কখনো প্রণয়াসক্ত হয়েছে কিম্বা আকৃষ্ট। হয়তো কুড়ি ফর্মার দীর্ঘ বইটি এর ফলে কিঞ্চিৎ রগালো আকর্ষণীয়তা পেয়ে থাকবে। যতদূর মনে হয় শ্রীযুক্ত দাশের অভিপ্রায় এইরকম কিছু নয়। বাজারচালু লেখকদের বস্তাপচা কৌশল শেষপর্যন্ত এক নবীন সাহিত্যিককে প্রভাবিত করবে, ভাবতে ইচ্ছা করি না। মলাটটি কিন্তু ভালো লাগলো না, যদিও তা ও. সি. গাঙ্গুলীর হাতের আঁকা। বলাবাহুল্য; 'প্রকাশকের নিবেদন'-এর মর্মচোরা বিজ্ঞাপনটি সুরুচির পরিপন্থী।

এখানেও প্রকাশকের নিবেদন। শ্রীযুক্ত সমীর মুখোপাধ্যায়ের 'মানুষের ছবি' উপন্যাসের গোড়াতেই প্রকাশক জানিয়েছেন,…"অস্তিত্বের যন্ত্রণায় অস্থির উপন্যাসটি আজ থেকে সাতবছর আগে অধুনাবিলুপ্ত একটি সাহিত্যপত্রে একদা যে যাত্রা সুরু করেছিল, লেখকের অনিচ্ছায় মাত্র দু-ফর্মা ছাপার পর তার চালভঙ্গ হয়।…আজ যখন নতুন করে আত্মপ্রকাশের আয়োজন হলো তখন দেখা গেল বাংলাসাহিত্যকে আগের চেয়ে অনেক তীব্রভাবে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ঘূর্ণিমণ্ডল স্পর্শ করেছে। লেখক এ সম্বন্ধে সজাগ ও অবহিত থেকেও এই উপন্যাসের রূপান্তর কামনা করেন নি।" উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ; কিন্তু গ্রন্থখানির আলোচনায় অনেকখানি সময় আমার লাঘব হয়ে গেছে প্রধানত এই উদ্ধৃতির সহায়তায়। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রকাশককে উল্টে ধন্যবাদই দিতে হয়। আমার যেটুকু বলবার আছে তা সামান্যই। বইখানির গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত একটা অগোছালো, ছাড়াছাড়া গল্প ছাড়া কিছু পাই নি। শুয়োর, সুবোধ, গাঁজাখোর সন্ন্যাসী, রাধা ("একটুও লজ্জা নেই রাধার"), মিয়াজান গাড়োয়ানের ঘোড়ার গাড়ি, ইত্যাদি

হাজারএক চরিত্র আর বাঁকালো যৌন-আবেদন 'মানুষের ছবি'কে রীতিমতো বাঁকালো করে তুলেছে। কিন্তু পড়ার ধৈর্য প্রায়ই আমার হারাতে হয়েছে—কাহিনীগত শিথিলতার জন্য। বইটির প্রথম পাতার প্রথম লাইনেই বানান ভুল এবং ছাপার ভুল (নাকি ভাষার?) চোখে পড়ল। "গঙ্গার ধারের নরম জ্যোৎস্নায় যখন নিবিড় হাওয়া বয়েছিল সেই মুগ্ধরাতে জয়োরটিতে এসেছিল চুপিচুপি।" মানে কি? "নিবিড় হাওয়া", "জয়োরটিতে"—এই জাতীয় শব্দ সমস্ত বইখানিতে ছড়ানো।

নামের দিক থেকে শ্রীযুক্ত রামগোপাল নাথও পূর্বোক্ত দুজনের মতোই আমার কাছে অশ্রুতপূর্ব। কিন্তু এঁর লেখার হাত যথেষ্ট তৈরি। "অভিভাবকের শাসন এড়িয়ে ভর দুপুরে যেন বাড়ি-পালানো বাচ্চা মেঘ-মেয়েরা বাতাসে শাদা ফ্রক উড়িয়ে এক পা দু পা করে আকাশের মাঠ পার হয়ে উধাও।"—এইরকম সপ্রতিভ উপমা এবং ভাষার সাহায্যে লেখক আমার মনোযোগকে বন্দী করতে পেরেছেন শেষপর্যন্ত। স্মৃতিসর্বস্ব বড়মিস্ত্রী বিনোদবিহারীর সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করে পরিমিত পরিসরের মধ্যে যে-গল্প তিনি লিখেছেন তা উপভোগ্য এবং কোনো কোনো অংশে মর্মস্পর্শী। বিলাসীর দিকে বিনোদের দ্বিধাজটিল দুর্বলতা অবশ্য অভিনাটকীয় পরিণতি পেয়েছে; আবেগের চড়াসুরে বইটির শেষাংশ বাঁধা; তবু অস্বীকার করা যায় না লেখকের মানুষ আঁকবার ক্ষমতাকে। তাই 'দিনের পর দিন' উপন্যাসখানি (বরং বলি, বড়গল্প) পড়ার পর স্বভাবতই শ্রীযুক্ত রামগোপাল নাথের পরবর্তী গ্রন্থ পড়বার ইচ্ছা রাখি।

একটি মুখ: তিনটি গল্প। বাসুদেব সাহা। আলকা-বিটা। তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.।
গাঁয়ের নাম কেয়াপুর। দীপককান্তি দে। আলকা-বিটা। তিন টাকা।
হাটি হাটি পা পা। সুভাষ চক্রবর্তী। ন্যাশনাল পাবলিশার্স। দু-টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

নতুন লেখক হিসেবেও ভাষায় ও বিষয়বস্তুর অবতারণায় কিছুটা পরিণত ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া দরকার। ভাষায় প্রভুতা অবশ্যই সহজসাধ্য নয়, কিন্তু সহজ স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে চলবেই না। বিষয়গত অভিনবত্ব নিশ্চয়ই পাকা কলমের কাজ, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে চরিত্রগুলি এবং কাহিনীকে—তা সে যেমনই হোক—যথাযথভাবে বিন্যস্ত করার দায়িত্ব

তরুণতম লেখককে পালন করতেই হয়। তাঁর 'একটি মুখ: তিনটি মন' নামক ৮১ পৃষ্ঠার বড়গল্পটিতে শ্রীযুক্ত বাসুদেব সাহা যথাসাধ্য সেই খাদ্যদ্রব্য-বিধান এবং বাধ্যিবাধকতার চেষ্টা করেছেন। কাহিনী অতিপ্রাকৃত প্রণয়কেন্দ্রিক; কাজল আর রাধার অন্তর্দ্বন্দ্বও প্রথাসিদ্ধভাবে রূপায়িত হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই ধরণের কাহিনীতে কথাবস্তুর আকর্ষণীয়তা তৈরি করাই হচ্ছে জরুরি; চরিত্রগুলির ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্ম প্রতিচিত্রণের কোনো অবকাশই এতে থাকে না। শ্রীযুক্ত সাহা সঙ্গতকারণেই গল্পতৈরির দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন এবং তাতে ভালো বই খারাপ হয় নি। প্রথম কয়েকটি পাতায় ভাষা ও অকারণ প্রতি বাক্যের জন্য এক একটি পংক্তি খরচ করার প্রবণতা অনেক বাঙালী বাজারচালু গোয়েন্দাকাহিনী লেখকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য পরে লেখক এই ব্যাধিমুক্ত হয়েছেন দেখে আশ্বস্ত হই।

শ্রীযুক্ত দীপককান্তি দে-র 'গাঁয়ের নাম কেয়াপুর' আরেকটি পরিচিত বিষয়ের উপর সহজ ভঙ্গিতে লেখা বড়গল্প। অনাথ রায় ও হারাধন মজুমদার নামক গ্রামের দুজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির জঘন্য বিভেদমূলক ও খ্যাতিলোলুপ মানসিকতার উদ্ঘাটনই এই গল্পটির উপজীব্য। তবে শ্রীযুক্ত দে-র হাত অপেক্ষাকৃত পরিণত; এবং এই গুণেই কাহিনী সামান্য হয়েও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। উভয় গ্রন্থেরই প্রকাশন পরিকল্পনা ব্যয়বহুল হলেও উন্নত শিল্পরুচির পরিচায়ক নয়।

গভীর বেদনার বিষয়, তৃতীয় গ্রন্থটির লেখক শ্রীযুক্ত সুভাষ চক্রবর্তী এখন লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর 'হাটি হাটি পা পা' উপন্যাসটিতে দোষত্রুটি হয়তো অনুপেক্ষনীয় নয়, কিন্তু বহু জায়গায় প্রশংসনীয় পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছি যা সময়কালে প্রযত্নের নিষ্ঠায় কেলাসিত হতে পারত। মৃত্যু সেই ভবিষ্যৎ-কে অঙ্কুরেই নষ্ট করে গেছে, উপন্যাসটি শেষ করার পর এই খেদ থেকে গেল।

শিবশম্ভু পাল

শিকারীর রোজনামচা ।। ইভান তুর্গেনেভ । বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো । পরিবেশক : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ । দু-টাকা একাশি ন. প. ।।

এই গ্রন্থে সঙ্কলিত নক্শাগুলি রুশসাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। এই গ্রন্থের অনেকগুলি চরিত্র ও ঘটনা প্রাক্‌বিপ্লব রুশদেশের দর্পণ। তুর্গেনেভের অসামান্য কবিত্ব ও গভীর পর্যবেক্ষণ বিষয় ও রচনারীতিকে অপরূপ মহিমা দিয়েছে। পরবর্তীকালে গর্কীর হাতে রিপোর্টাজ রচনা যে ঐতিহাসিক শিল্পচরিত্র অর্জন করেছিল, এই গ্রন্থের কোনো কোনো লেখায় তার পূর্বসূত্র আবিষ্কার করা যায়।

অনুবাদের মান সর্বত্র সমান না হলেও এই গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে।

প্যারীর পতন : একত্রে তিন খণ্ড ।। ইলিয়া এরেনবুর্গ। অনুবাদক : অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার, অনিলকুমার সিংহ। আট টাকা। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ।

বিশ্ববিখ্যাত এই উপন্যাসটি বাংলাদেশে নতুন পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। বহু পূর্বে বর্তমান অনুবাদকত্রয়ের অনুবাদে তিনখণ্ডে প্রকাশিত 'প্যারীর পতন' এদেশের সাধারণ পাঠকের সামনে উপন্যাসের এক অভিনব জগৎ উন্মোচিত করেছিল। সম্প্রতি ন্যাশনাল বুক এজেন্সী বইটির একত্র ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করলেন।

রুশ উপন্যাস ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহ্যে পুষ্ট এরেনবুর্গ বর্তমান-কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এবং 'প্যারীর পতন' নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যের এক সম্পদ। আমরা বিশ্বাস করি শুধু পাঠক নয়, বর্তমান লেখক সমাজেরও এই উপন্যাস পুনরায় অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করার প্রয়োজন আছে।

নবম তরঙ্গ। ইলিয়া এরেনবুর্গ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ। প্রথম খণ্ড, অনুবাদক : সোমনাথ লাহিড়ী। চার টাকা পঞ্চাশ ন. প.। দ্বিতীয় খণ্ড, অনুবাদক : সত্য গুপ্ত। দু-টাকা।

'প্যারীর পতন'-এর পর 'ঝড়' ও 'নবম তরঙ্গ'। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ক্রনিক্‌ল্ লিখেছেন এরেনবুর্গ। রুদ্ধশ্বাস কাহিনী ও আপাত সুখপাঠ্যতার অভাব বহু ক্ষেত্রে স্বীকার করে যাঁরা একবার এরেনবুর্গের বিশ্বে প্রবেশ

করবেন, পরিণামে তাঁরা লাভবান হবেন, সন্দেহ নেই। যদিও পরবর্তী দুটি প্রবহমান উপন্যাসরূপে 'পারীর পতন'-এর মহত্ত্ব ও সাফল্য অর্জন করে নি—এ-কথাও সত্য। এরেনবুর্গ চিরদিনই বিশিষ্ট লেখক, বিচিত্র মানুষ। সম্প্রতিকালে আরও একবার তাঁকে ঘিরে বিতর্ক উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'নবম তরঙ্গ' গ্রন্থের প্রকাশনা ও পাঠ অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। আশা করব অচিরে উপন্যাসটির অবশিষ্টাংশের প্রকাশনাও সুসম্পূর্ণ হবে।

স্তেফান জোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ: দ্বিতীয় খণ্ড। অনুবাদক: দীপক চৌধুরী। বর্ণা অ্যাণ্ড কোম্পানী। পাঁচ টাকা।

বাংলা ভাষায় জোয়াইগ বহুল প্রচারিত। তাঁর অনেকগুলি গল্প ও উপন্যাস পত্র-পত্রিকায় বা গ্রন্থাকারে ভাষান্তরিত হয়েছে। তথাপি খণ্ডে খণ্ডে জোয়াইগের এই গল্প সঙ্কলনের প্রকাশ অভিনন্দনযোগ্য। একত্রে লেখাগুলি পাওয়ায় পাঠক মাত্রেই লেখক সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা করতে পারবেন।

দীপক চৌধুরী মৌলিক রচনার থেকে অনুবাদকর্মে যে অধিকতর পারদর্শী—এই গল্প সংগ্রহে তিনি নিজেই তার প্রমাণ দিয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে 'খেলার রাজা দাবা' (The Royal Game), 'পলাতক' (The Runaway), 'অপরিচিতার পত্র' (Letter from an unknown woman), 'চন্দ্রালোকিত কানাগলি' (Moonbeam) ও 'লেপোরেলা' (Leporella)—মোট এই পাঁচটি গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। প্রতিটি গল্পেই জোয়াইগের রচনার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি পাই।

জোয়াইগ ইওরোপীয় সাহিত্যের এক বিচিত্র পুরুষ। বহু ভাষায় পারদর্শিতা, বহু দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, বহু মনস্বীর অন্তরঙ্গতা ও বিচিত্র জীবন জোয়াইগের জন্য যে ভূমি প্রস্তুত করেছিল—শেষ পর্যন্ত তিনি তার ওপর মহৎ সৃষ্টির সৌধ নির্মাণ করে যেতে পারেন নি। অথচ কবিতা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, জীবনী ও অনুবাদ—তিনি কি না লিখেছেন। বাস্তবিক জীবনী রচনায় ও অনুবাদে জোয়াইগ যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, সেই উচ্চতা তাঁর অনেকানেক মৌলিক সৃষ্টিশীল রচনা অর্জন করতে পারে নি—বহু সমালোচক এমন আক্ষেপ করেছেন। কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁর কটি গল্প সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। প্রথম খণ্ডে সঙ্কলিত 'অদৃশ্য শিল্প' (The

Invisible Collection) ও আলোচ্যখণ্ডের প্রথম দুটি গল্প এই জাতের রচনা। দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়েসে জোয়াইগকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছিল এবং সেই বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই বিপন্ন ব্যক্তি ও মানবতার অসামান্য আলেখ্য এই গল্প তিনটি।

উভয় খণ্ডেই অনুবাদ সম্পর্কে একটি অবান্তর ভূমিকা ও দ্বিতীয় খণ্ডে জোয়াইগের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে। অনুবাদ কোথাও কোথাও আড়ষ্ট। তথাপি উপরোক্ত গল্প তিনটির আকর্ষণে ও অন্য গল্পগুলির কারণে পাঠকমাত্রেই জোয়াইগের গল্প সংগ্রহ সংরক্ষণ করতে প্রলুব্ধ হবেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গান বাজনা শেখো। বৈদ্যনাথ ঘোষ। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। একটাকা পঞ্চাশ ন. প.।

প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী এই নাতিক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: "গান-বাজনা সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই তাদেরই জন্য বইখানি লেখা। কিন্তু এ ধরনের বই লেখা অত্যন্ত কঠিন এজন্য যে,...উচ্চ থেকে নিম্নস্তরে নেমে এসে শিশুদের মনস্তত্ত্বকে জেনে তাদের মতো বই লেখা বড়ই কঠিন। ..."গান-বাজনা শেখো" বইখানির ভাষা অত্যন্ত সরল এবং রচনাও তাৎপর্যপূর্ণ ও সার্থক হয়েছে বলে মনে করি। ...শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথবাবু নিজে একজন বিচক্ষণ সঙ্গীতশিল্পী এবং সঙ্গীতে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন।...গ্রন্থটি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতগুণীদের সমাজেও সমাদর লাভ করুক এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।"

সাহিত্য-চিত্রকলা-সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে এই ধরনের গ্রন্থের প্রয়োজন আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু তুলনায় গুণে বা পরিমাণে রচনা অল্প। আমরা আশা করি লেখক ও প্রকাশক এদিকে অধিকতর মনোযোগ দেবেন এবং পাঠককুল বর্তমান গ্রন্থের সমাদর করে তাঁদের উৎসাহ বর্ধন করবেন।

অনুভব। রাধানাথ সিংহ। 'পুস্তক'। দু-টাকা।
মানস প্রক্রিয়া। রাধানাথ সিংহ। 'পুস্তক'। দু-টাকা।

দুটি নাতিক্ষুদ্র কবিতা সঙ্কলন। প্রথম গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন: "…বর্তমান সাহিত্যের উদ্দেশ্য জনতার জীবনের জয়গান। রাজনীতির উদ্দেশ্য ঠিক তাই। অতএব সাহিত্য ও রাজনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রামায়ণ, মহাভারত একাধারে কাব্য, রাজনীতি ও সমরনীতি। বর্তমান ভারতীয় সাহিত্যে অভাব আছে তার।"

দ্বিতীয় গ্রন্থের ভূমিকা: "কবিতা…লিখি, আনন্দ ও বেদনার তীব্র অনুভূতিতে।"

সুতরাং দুটি গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে দুই মনোভাবের কবিতা আছে যদিও তা একই কবির একই রচনাভঙ্গির সাক্ষ্যবহ। দুটি গ্রন্থেই কবি আন্তরিক।

অথ নট ঘটিত। সূত্রধার। বসুধারা প্রকাশনী। তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

'সূত্রধার' নামের অন্তরালে যে মনস্বী নিজেকে গোপন রেখেছিলেন, নিকট অতীতে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে।

ঠিক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে না হলেও খানিকটা বৈঠকী ঢঙে লেখা এই সুখপাঠ্য গ্রন্থ বাংলা নাট্যজগতের ইতিহাস সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করে। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র এই গ্রন্থের অন্য আকর্ষণ।

ভারতের চিত্রকলা। অশোক মিত্র। পরিবেশক: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। পনেরো টাকা।

চিত্রকলা বিষয়ে খ্যাতনামা আলোচক শ্রীঅশোক মিত্র রচিত এই বৃহদায়তন গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সংযোজন। অনেকগুলি চিত্র গ্রন্থটির অতিরিক্ত সম্পদ।

বাংলার বেকার সমস্যা ও তার প্রতিকার। যামিনীরঞ্জন দাস। শ্রীপ্রকাশনী। একটাকা পঞ্চাশ ন. প.।

নাতিক্ষুদ্র আলোচনাগ্রন্থ।

চা মাটি মানুষ (২য় খণ্ড)। বীরেশ্বর বসু। কথামালা প্রকাশনী। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

চা-বাগান ও চা-শ্রমিকদের জীবনভিত্তিক উপন্যাসের মধ্যপর্ব।

গোড়ায় কবিতা। সুভাষ সরকার। মিত্রালয়। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

লেখকের প্রথম উপন্যাস।

নীল সমুদ্র॥ শিশিরকুমার দাশ। বেঙ্গল এণ্ড কোম্পানী। চার টাকা॥

কবি ও প্রাবন্ধিক শিশিরকুমার দাসের প্রথম উপন্যাস পাঠক মাত্রকেই কৌতূহলী করবে।

দুই সমতল। কার্তিক ভট্টাচার্য। ন্যাশনাল পাবলিশার্স। দু-টাকা।

লেখকের এই প্রথম উপন্যাসই তাঁর ভবিষ্যৎ রচনা সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টিতে সমর্থক।

দুই বন্ধু। আতাউর রহমান। এক টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

পূর্বপাকিস্তান থেকে প্রকাশিত তরুণ কবির কাব্যসঙ্কলন। বেশ কয়েকটি রচনায় কবিমনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বর্তমান।

মহাবোধ। মনীষা দেবী চট্টোপাধ্যায়। অর্চনা পাবলিশার্স। পঞ্চাশ ন. প.।

ক্ষুদ্র পদ্য সংকলন।

তাও-তে-চিং। লাওৎ সে। অনুবাদক: অবিন্দ্রেনাথ ঠাকুর। সাহিত্য অকাদেমী দু-টাকা।

সু-অনূদিত সুভাষিতাবলী।

কমলাল সেন

সংস্কৃতি সংবাদ

বিয়োগপঞ্জী

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে।

আমাদের এই অনাহার ও অকালমৃত্যুর দেশে আশি বছর আয়ু কম নয়। কিন্তু বিধানচন্দ্রের ক্ষেত্রে এ-মৃত্যু সর্বতোভাবে আকস্মিক। কারণ আমৃত্যু তিনি ছিলেন উদ্যমী পুরুষ। জন্মদিনের উৎসবে বন্ধুজন যখন তাঁর শতায়ু কামনায় নিশ্চিত ছিলেন, তখনই কাল তাঁকে হরণ করল। হয়তো তাই এই মৃত্যুর বেদনা দেশবাসীর মনে এমন বেজেছে। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর প্রবাদে পরিণত পারদর্শিতা, জাতীয় আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও ১৯৪৮ সাল থেকে দেশশাসন—এ-সমস্তের স্মরণ ও বিশ্লেষণ এখানে বাহুল্য মাত্র। বিধানচন্দ্রের আকস্মিক প্রয়াণে শাসনব্যবস্থা ও শাসকদলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো, হয়তো তা সংকটেরই নামান্তর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইস্লামিক ইতিহাসের অধ্যাপক ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। দীর্ঘদিন তিনি ইতিহাসের এই বিশেষ শাখাটির চর্চা ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রখ্যাত নট ছবি বিশ্বাসের অকালপ্রয়াণ ঘটেছে। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রাভিনেতৃসমাজের প্রবলতম ব্যক্তিত্ব। ছবি বিশ্বাসের শিল্পী জীবনও সর্বতোভাবে এই ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমাদের মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই গুণীর অবদান বড় সামান্য নয়।

মৃত্যুর স্পর্শের বাইরে জীবনের যে স্মৃতি, আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তা স্মরণ করি।

ইতিহাসের অভিপ্রায়

আলজিরীয়ার মুক্তিসংগ্রাম জয়যুক্ত হয়েছে। দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ সময়ব্যাপী আন্দোলন ও অপরিসীম মূল্যের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা।

আমরা অভিনন্দন জানাই আলজিরীয়ার সেই অনমনীয় মানুষদের, যাঁরা ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আমরা অভিনন্দন জানাই সেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ফরাসীদের, যাঁরা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অগ্রসর থেকে ইতিহাসের আরও এক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ফ্রান্সের ঔপনিবেশিকশক্তির আকাশচুম্বী স্পর্ধা অবনমিত করেছে এই যুক্ত শক্তি। আমরা স্মরণ করি তাঁদের—মুক্তির আদর্শে আজ যাঁরা শহীদ। শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের, যাঁরা লাঞ্ছিত হয়েছেন। আমরা ভরসা রাখি উৎসব সমারোহে আলজিরীয়বাসী কঠোর শিক্ষা বিস্মৃত হবেন না।

ঔপনিবেশিকতার ধারাবাহিক পরাভব ও স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিশ্বমানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ মস্কোর দিকে। পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির আহ্বানে এখন সেখানে বসেছে সর্বদেশ ও সমাজের প্রতিনিধি-সম্মেলন।

পৃথিবীর ইতিহাসে এতবড় সংকট আর আসে নি। সমরসজ্জা, পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ও যুদ্ধচক্রান্তের আয়োজন মানবসভ্যতাকে সর্বব্যাপী বিনাশের দ্বারপ্রান্তে এনেছে। অথচ এই সভ্যতাই গ্রহে গ্রহান্তরে মানুষের উপনিবেশ গড়ার স্পর্ধা রাখে।

পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ ও সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণের যে দাবি সোভিয়েত দেশ ও সমাজতান্ত্রিক জগৎ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে করে আসছেন—ধনতান্ত্রিক প্রচার কৌশলে তার আন্তরিকতা সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও সন্দিগ্ধ ছিলেন। আজও সে সন্দেহ সর্বাংশে ঘোচে নি। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে শান্তির আদর্শ যে প্রকৃত জনপ্রিয় হয়েছে, শান্তির সংগ্রাম যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে দেশে দেশে—তাতে সন্দেহ নেই। তাই নিউ-ইয়র্কের জননী পথে নেমেছেন তাঁর সন্তানের নিরাপত্তার দাবিতে, জাপানের যুবক দেশ থেকে আমেরিকান যুদ্ধ ঘাঁটি অপসারণের দাবিতে পথে পথে নেমেছে 'সর্প নৃত্যে', সংশয়ী রাসেল অলডারম্যাস্টন মার্চের পর আজ মস্কোয় তীর্থযাত্রী হতে চেয়েছেন।

দল-মত, জাতি-বর্ণ, জীবিকা-সংস্থান নির্বিশেষে পৃথিবীর তাবৎ শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ তথা শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ও জনসেবীর সর্বব্যাপী মনীষা ও আবেগের মিলন ঘটেছে এই সম্মেলনে।

ভারতবর্ষের শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দেশ কয়েকজনের এক

প্রতিনিধিমণ্ডলী এখন মস্কোতে। 'পরিচয়' সম্পাদক শ্রীগোপাল হালদার ও 'পরিচয়'গোষ্ঠীর শ্রীচিন্মোহন সেহানবিশ এই প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে আছেন।

সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আমরাও এই সম্মেলনের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কার্যসূচীর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছি।

শুধু দুঃখ হয়, যে সম্মেলন পৃথিবীর সর্বত্র প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে—আমাদের দেশে, আমাদের সংস্কৃতিসেবী ও বুদ্ধিজীবী মহলে তা সবিশেষ সাড়া তোলে নি।

ইতিহাসের যে অভিপ্রায় আলজিরীয়া ও মস্কোয় প্রকাশিত, তার থেকে কবে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব?

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়